

•

গৌতমসূত্র
বা
ন্যায়দর্শন

ও

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)

—:::—

পঞ্চম খণ্ড

মহানুহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

—:::—

কলিকাতা, ২৪৩৭ চন্দ্রপার সাকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-অন্দির
হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক
প্রকাশিত

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

କଳିକାତା ।

୧ନଂ ବେଥୁନ ରୋ, ଭାର . ମିହିର ଯନ୍ତ୍ରେ
ତ୍ରୀସର୍ବେଶ୍ବର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ବାରା ମୁଦ୍ରିତ ।

নিবেদন ।

এইবার ‘ত্ৰায়দৰ্শন’ৰ শেৰ খণ্ড সমাপ্ত হইল । ১০২০ বৰ্ষকে এই কাৰ্য্য আরম্ভ কৰিয়াই আমি যে মহা চিন্তাসাগরে নিপতিত হইয়াছিলাম, এত দিন পরে তাহার পরপারে পৌছিলাম । সেই অপার মহাসাগরের অতি চুল্লভ্য বহু বহু বিচিত্র তরঙ্গের ক্লেণ্ময় অৰ্ণাতে নিত্য অবসর হইয়া এবং তাহার মধ্যে অনেক সময়ে শাৰীৰিক, মানসিক ও পারিবারিক নানা ছুবছার প্রবল ঝটিকায় বিঘূৰ্ণিত এবং কোন কোন সময়ে মৃতপ্রায় হইয়াও যাহার করুণাময় কোমল হস্তের প্রেরণায় আমি জীবন লইয়া ইহার পরপারে পৌছিয়াছি, তাঁহাকে আজ কি বলিয়া প্রণাম কৰিব, তাহা জানি না । অন্ধ আমি, তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই । বলহীন আমি, তাঁহাকে কখনও ধৰিতেও পারি নাই । তাঁহার স্বরূপ বৰ্ণনে আমি একেবারেই অক্ষম । তাই ক্ষণস্থরে বলিতেছি,—

যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ ।

করিদপুর জেলার অন্তৰ্গত কৌড়কদোগ্রামনিবাসী সৰ্বশাস্ত্রপারদৰ্শী মহানৈয়ায়িক ৬জ্ঞানকীনাথ তর্কদত্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে ‘ত্ৰায়দৰ্শন’ অধ্যয়ন কৰিয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ একত্রে তাঁহার স্নেহময় আশীৰ্বাদ মাত্র সম্বল কৰিয়া আমি এই অসাধ্য কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হই । তিনি অল্পকি দিন পূৰ্বে স্বৰ্গত হইয়াছেন । আজ আমি আমার সেই পিতার ত্ৰায় প্রতিপালক এবং প্রথম হইতেই ত্ৰায়শাস্ত্রের অধ্যাপক পরমারাধ্য পরমাত্মন স্বৰ্গত শ্ৰীগুরুদেবের শ্ৰীচরণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ কৰিয়া, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কৰিতেছি । দীন আমি, অযোগ্য আমি, তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা কৰিতে অসমর্থ ।

পরে যে সমস্ত মহামনা ব্যক্তির নানারূপ সাহায্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও আজ আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ স্মরণ কৰিতেছি এবং অবশ্য কৰ্ত্তব্যবোধে যথাসম্ভব এখানে তাঁহাদিগেরও নামাদির উল্লেখ কৰিতেছি ।

১০১১ বৰ্ষাকের বৈশাখ মাসে পাবনা ‘দৰ্শন টোলে’ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমার পাবনায় অবস্থানকালে পাবনায় তদানীন্তন সরকারী উকিল, পাবনা ‘দৰ্শন টোলে’র সম্পাদক ও সংরক্ষক “গায়ত্ৰী” প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা রায় বাহাদুর শ্ৰীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ শৰ্ম্মচৌধুরী মহোদয় প্রথমে আমাকে এই কাৰ্য্যে উৎসাহিত করেন । তিনি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেশে শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষা ও শাস্ত্রচর্চায় সাহায্য কৰিতে সতত স্বভাবতঃই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । পূৰ্বে তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় ও কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি তাঁহার স্বভাবগুণেই পাবনায় আমাকে রক্ষা কৰিবার জন্ত এবং আমার প্রতিষ্ঠার জন্ত কত যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কৰিয়াছেন, অর্থদ্বারা, পুস্তকাদির দ্বারা এবং আমার বহু ছাত্র রক্ষার দ্বারা এবং আরও কত প্রকারে যে, আমার শাস্ত্রচর্চায় কিরূপ সাহায্য কৰিয়াছেন, তাহা যথাযথ বৰ্ণন কৰিবার কোন ভাষাই আমার নাই । তবে আমি এক কথায় মুক্তকণ্ঠে সত্যই বলিতেছি যে, সেই প্রসন্ননারায়ণের

প্রসন্নদৃষ্টি ব্যতীত আমার ছায় নিঃসহায় অযোগ্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ শাস্ত্রচর্চার কোন আশাই ছিল না। তিনিই আমার এই কার্যের মূল সহায়।

কিন্তু সুদূরত সহায় পাইয়াও এবং উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াও নিজের অযোগ্যতাবশতঃ আমার পক্ষে এই কার্য্য অসাধ্য বুঝিয়া এবং এই গ্রন্থের বহু বাধ-সাধা মুদ্রণও অসম্ভব মনে করিয়া আমি প্রথমে এই কার্য্যারম্ভ সাহসই পাই নাই। পরে পাবনা কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃতভাষাপক আমার ছাত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ঘোষল এম এ, বি এল, কাব্যতীর্থ, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ প্রতাহ আসিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলেন যে, ‘আপনি কিছু লিখিয়া দিলেই আমি তাহা লইয়া কলিকাতায় যাইয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, মহোদয়ের নিকটে উহা দিব। তিনি পরম বিদ্যোৎসাহী, বিশিষ্ট বোদ্ধা দার্শনিক, অশ্রুই তিনি তাঁহার সম্পাদিত “ব্রহ্মবিদ্যা” পত্রিকায় সাদরে উহা প্রকাশ করিবেন। এবং কালে পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের একটা ব্যবস্থাও তিনিই অবশ্য করিবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্রের অদমা আগ্রহ ও অনুরোধে আমি প্রথমে অতিকষ্টে কিছু লিখিয়া তাঁহার নিকটে দিয়াছিলাম। ক্রমে কয়েক মাস “ব্রহ্মবিদ্যা” পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে কিয়দংশ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন সুরোগ্য সম্পাদক, পরম বিদ্যোৎসাহী, টাকীর জমিদার, স্বনামখ্যাত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল মহোদয় উহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পরে আমার পত্র পাইয়াই তিনি সাগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করিলে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সাগ্রহে ঐ প্রস্তাবের বিশেষরূপ সমর্থন করেন। তাহার ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত হয়। উক্ত মহোদয়দ্বয়ের আন্তরিক আগ্রহ, বিশেষতঃ রায় যতীন্দ্রনাথের অদমা চেষ্টাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল। রায় যতীন্দ্রনাথ ৩১বর্ষক্ৰে গিয়াছেন। শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত হইলেই রায় যতীন্দ্রনাথ আমাকে প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে পাঠাইবার জন্ত পাবনায় পত্র লেখেন। সুতরাং তখন আমি বাধা হইয়া বহু কষ্টে দ্রুত লিখিয়া প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তাই প্রথম খণ্ডে অনেক স্থলে ভাষার আধিক্য এবং কোন কোন স্থলে পুনরুক্তিও ঘটিয়াছে। কিন্তু রায় যতীন্দ্রনাথ তাহাতে কোন আপত্তিই করেন নাই। পরন্তু তিনি আমাকে বিস্তৃত ভাষায় লিখিবার জন্তই অনেকবার পত্র দিয়াছেন। সংক্ষেপে লিখিলে এই অতি ছুরোধ বিষয় কখনই সুরোধ হইতে পারে না, ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু দিনের আকাজক্ষানুসারে, শিক্ষিত সমাজ যাহাতে গ্রন্থদর্শন ও বাৎস্তায়নভাষা বুঝিতে পারেন, বঙ্গভাষায় যেরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা উহা সুরোধ হয়, এই উদ্দেশ্যে আমাকে সরল ভাবে যে সমস্ত পত্র দিয়াছিলেন এবং আমি কলিকাতায় আসিলে সাহিত্য-পরিষদমন্দিরে সাক্ষাৎকারে আমাকে পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই

এখন আমার মনে হইতেছে। তিনি ৬১বর্ষ গমনের কিছু দিন পূর্বেও আমাকে সাগ্রহে অনেক দিন বলিয়াছিলেন, 'ত্ৰায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় ভাল করিয়া লিখিতে হইবে, উহা অতি দুর্লভ। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও উহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। আপনি যে ক্রমে উহার ব্যাখ্যা করিবেন, ক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় উহা ব্যক্ত করিয়া বুঝিয়া দিবেন, তাহা দেখিবার জন্ত এবং উহা বুঝিবার জন্ত আমি উৎকণ্ঠিত আছি। ত্ৰায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় না বুঝিলে ত্ৰায়শাস্ত্র বুঝা হয় না। সংক্ষেপের কোন অনুবাদ নাই। আপনি বিস্তৃত ভাষায় যেরূপেই হউক, উহা বুঝিয়া দিবেন। আপনি এখন হইতেই তাহার চিন্তা করুন।'

কিন্তু বিশ্রাম না হইলে ত আমরা বাহ্য চিন্তনীয়, তাহার বিশেষ চিন্তা করি না। তাই রায় যতীন্দ্রনাথের পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াও তখন সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করি নাই। পরে সময়ের অন্নতাবশতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছু সংক্ষেপে দ্রুত লিখিত হইয়াছে। তথাপি পঞ্চম অধ্যায়ে গোতমোক্ত "জাতি" ও "নিগ্রহস্থানে"র তত্ত্ব বুঝিতে এবং সে বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের বিভিন্ন মত ও বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতে আমি যথাসক্তি যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহা সফল হইবে কি না, জানি না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে বিষয়ে রায় যতীন্দ্রনাথের মন্তব্য আর শুনিতে পাইলাম না।

এই পুস্তকের সম্পাদন কার্য্যে যে সমস্ত গ্রন্থ আবশ্যক হইয়াছে, তাহার অনেক গ্রন্থই আমার নাই। সুতরাং বহু কষ্ট স্বীকারপূর্বক নানা সময়ে নানা স্থানে যাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ্য এই যে, কাশী গবর্ণমেন্ট কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সর্বশাস্ত্রবর্ষী মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্ম্ম-কবিরাজ এম এ মহোদয় এবং বোলপুর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ, নানাবিদ্যাবিহারদ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় এবং শান্তিপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতব্যাখ্যাতা আমার ছাত্র সুপণ্ডিত শ্রীমান্ রাধাবিনোদ গোস্বামী এবং আরও অনেক সদাশয় ব্যক্তি গ্রন্থাদির দ্বারা আমার বহু সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্ম্মকবিরাজ এম এ মহোদয় এই পুস্তক সম্পাদনের জন্ত আমার অর্থ সাহায্যও বর্তব্য বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইউ পি গবর্ণমেন্ট হইতে কএক বৎসরের জন্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, আমার অচিন্তিত আশাতীত উপকার করিয়াছেন। যদিও তিনি এ জন্ত কিছুমাত্র প্রশংসা চাহেন না, তথাপি অবশ্য কর্তব্যবোধে এবং আত্মতৃপ্তির জন্ত এই প্রসঙ্গে আমি এখানে তাঁহার ঐ মহামহত্ত্বের ঘোষণা করিতেছি।

নানা স্থানে অনেক গ্রন্থ পাইলেও অনেক স্থলে যথাসময়ে আবশ্যক গ্রন্থ না পাওয়ায় যথাস্থানে অনেক কথা লিখিতে পারি নাই। তবে কোন কোন স্থলে পরে আবার সেই প্রসঙ্গে সে বিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। কোন কোন স্থলে পরে আবার পূর্বলিখিত বিষয়ের তাৎপর্য্য বর্ণন এবং সংশোধনও করিয়াছি; পাঠকগণ সূচোপজ্ঞ দেখিয়াও সে বিষয় লক্ষ্য করিবেন এবং "টপ্পন"র মধ্যে যেখানে যে বিষয়ে দ্রষ্টব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সর্বত্র অবশ্য দেখিবেন। অনেক স্থলেই বাহুল্যভয়ে অনেক বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই।

কিন্তু যে যে গ্রন্থে সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিচার পাইয়াছি, তাহার যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছি।

বাঁহারা অমূল্যকিঞ্চিৎ পাঠক, তাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিবে তাঁহাদিগের অমূল্যকানের অনেক সুবিধা হইবে এবং পরিশ্রমের লাভব হইবে, ইহাই আমার ঐক্য উল্লেখের উদ্দেশ্য ।

আমি অনেক সময়েই দূরে থাকায় এবং আমার অক্ষমতাবশতঃ এই গ্রন্থের প্রক্. সংশোধন কার্যে বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারি নাই । তাই অনেক স্থলে অশুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং শুদ্ধি-পত্রেরও সমস্ত স্থলের উল্লেখ করিতে পারি নাই । এই খণ্ডের শেষ শুদ্ধি পত্রের পরিশিষ্টে কতিপয় স্থলের উল্লেখ করিয়াছি । পাঠকগণ শুদ্ধি পত্রে অবশ্যই দৃষ্টপাত করিবেন । এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত অবশ্য প্রকাশ্য এই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সুযোগ্য পণ্ডিত কোটালীপাড়া-নিবাসী গোতমকুলোদ্ভব শ্রী ভায়া প্রদত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রক্. সংশোধন করিয়াছেন । যদিও তিনি তাঁহার নিজ কর্তব্যানুরোধেই এই কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি এই কার্য্যে তাঁহার অনন্তসাধারণ দক্ষতা ও অতি কঠোর পরিশ্রমের সাহায্য না পাইলে, আমার দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পাদন সম্ভব হইত না এবং এই বৎসরেরও এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইত না । তিনি নিজে প্রেসে যাইয়াও এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন ।

আমার পাবনায় অবস্থানকালে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় । পরে আমি ৬কাশীধামের 'টীকমাণী' সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পৌষ মাসে ৬কাশী-ধামে গেলে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৩৩১ বঙ্গাব্দে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং চতুর্থ খণ্ডের অনেক অংশ মুদ্রিত হয় । পরে আমি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলে ঐ বৎসরেই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় । নানা কারণে মধ্যে মধ্যে অনেক সময় এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ থাকায় ইহার সমাপ্তিতে এত বিলম্ব হইয়াছে । কিন্তু রায় যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয় এবং বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু মহোদয় এবং সুযোগ্য সহকারী কর্মচারী শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার পাল এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্ত যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন । আর এই গ্রন্থের প্রকাশক সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহোদয়ের কথ্য কত বলিব । তিনি এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্ত প্রথম হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন । আমি কলিকাতায় আসিলে তিনি অনেক সময়ে নিজে আমার নিকটে আসিয়াও প্রক্. লইয়া গিয়াছেন । সরলতা ও নিরতিমানতার প্রতিমূর্ত্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীমান্ রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শীঘ্র এই গ্রন্থ সমাপ্তির জন্ত চিন্তা ও চেষ্টা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না । ইতি

শ্রীফণিভূষণ দেবশর্মা ।

কলিকাতা, আশ্বিন । ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ।

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী

(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আঙ্কিক)

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভাষ্যো—আত্মা প্রভৃতি সমস্ত প্রমেয় পদার্থের		তৃতীয় সূত্রে—অবয়ববিষয়ে অভিমান রাগ-	
প্রত্যেকের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ বলা		দেবাদি দোষের নিমিত্ত, এই সিদ্ধান্ত	
যায় না, যে কোন প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানও		প্রকাশ ৩৭	
মুক্তির কারণ বলা যায় না, সূত্ররাং প্রমেয়-		ভাষ্যো—অবয়ববিষয়ে অভিমানের ব্যাখ্যার	
তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ হইতে পারে না —		জ্ঞাত দৃষ্টান্তরূপে পুরুষের সম্বন্ধে স্ত্রী-সংজ্ঞা ও	
এই পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তত্ত্বের		স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষসংজ্ঞারূপ মোহ এবং উক্ত	
সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে যে, প্রমেয়বর্গের		স্থলে নিমিত্তসংজ্ঞা ও অমুগোপনসংজ্ঞারূপ	
মধ্যে যে প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান যে		মোহের ব্যাখ্যা। মুমুকুর পক্ষে ঐ সমস্ত	
জ্ঞানের সংসারের নিদান, সেই প্রমেয়ের		সংজ্ঞা বর্জনীয়, কিন্তু অশুভসংজ্ঞা	
তত্ত্বজ্ঞান তাহার মুক্তির কারণ। অনা-		চিন্তনীয়। অশুভসংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও উক্ত	
ত্মাতে আত্মমুদ্রিকপ মোহই মিথ্যাজ্ঞান,		সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ ... ৩৭—৩৮	
উহাকেই অহঙ্কার বলে। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের		চতুর্থ সূত্রে—অবয়ববীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে	
নিবৃত্তির জ্ঞাত শরীরাদি প্রমেয় পদার্থের		প্রথমে তদ্বিষয়ে সংশয় সমর্থন ... ৪৩	
তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যক। যুক্তির দ্বারা উক্ত		পঞ্চম সূত্রে—উক্ত সংশয়ের অনুপপত্তি	
সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনপূর্বক প্রথম সূত্রের		সমর্থন ৪৬	
অবতারণা ১—৪—৫—১৪		ষষ্ঠ সূত্রে—পূর্বপক্ষবাদীর মতে অবয়ববীর	
প্রথম সূত্রে—শরীরাদি জ্ঞাত পর্য্যন্ত যে দশবিধ		অপত্তাবশতঃও তদ্বিষয়ে সংশয়ের অনুপপত্তি	
প্রমেয় রাগ-দেবাদি দোষের নিমিত্ত,		কথন ৪৬	
তাহার তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি		সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সূত্রের দ্বারা	
কখন ১৪		অবয়ববীর তাহার অবয়বসমূহ কোনরূপে	
দ্বিতীয় সূত্রে—রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যা		বর্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়ব-	
সংকল্পের বিষয় হইয়া রাগদেবাদি দোষ		সমূহও অবয়ববীর কোনরূপে বর্তমান	
উৎপন্ন করে, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ		থাকিতে পারে না এবং অবয়বসমূহ হইতে	
দ্বারা মুমুকুর রূপাদি বিষয়সমূহের তত্ত্ব-		পৃথক স্থানেও অবয়ববীর বর্তমান থাকিতে	
জ্ঞানই প্রথম কর্তব্য, এই সিদ্ধান্তের		পারে না এবং অবয়বসমূহ ও অবয়ববীর	
প্রকাশ ২৮		ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহাও বলা	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যায় না ; অতএব অবয়বী নাই, অবয়বী		২০শ সূত্রে—উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন ...	৯১
অলৌক, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন ৪৭—৫৩		২১শ সূত্রে—পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তি খণ্ডনের	
একাদশ ও দ্বাদশ সূত্রে—পূর্বপক্ষবাদীর		জগৎ আকাশের বিভূত্ব সমর্থন ...	৯৪
পূর্বোক্ত যুক্তি খণ্ডন। ভাষ্য—অবয়ব-		২২শ সূত্রে—আকাশের বিভূত্বপক্ষে আপত্তি	
সমূহে অবয়বীর বর্তমানত্ব সমর্থনপূর্বক		খণ্ডন	৯৫
অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন ... ৫৫—৫৭		ভাষ্য—পরমাণু কার্য্য বা জগৎ পদার্থ হইতে	
১৩শ সূত্রে—পরমাণুপুঞ্জবাদীর মতে অবয়বী		পারে না, সুতরাং পরমাণুতে কার্য্যত্ব না	
না থাকিলেও অজ্ঞ দৃষ্টান্তের দ্বারা পুনর্বার		থাকায় কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর	
পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন ... ৬৭		অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না এবং	
১৪শ সূত্রে—পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ		পরমাণুর অবয়ব না থাকায় উপাদান-	
পরমাণুপুঞ্জও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে		কারণের বিভাগপ্রযুক্ত পরমাণুর বিনাশিত্ব-	
না,—এই যুক্তি দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত মতের		রূপ অনিত্যত্বও সম্ভব নহে, এই সিদ্ধান্তের	
খণ্ডন। ভাষ্য—সূত্রোক্ত যুক্তির বিশদ		সমর্থন	৯৭—৯৮
ব্যাখ্যা এবং পরমাণুপুঞ্জবাদীর অজ্ঞ		২৩শ ও ২৪শ সূত্রে—পূর্বপক্ষবাদীর অভিমত	
কথারও খণ্ডনপূর্বক সূত্রোক্ত যুক্তির		চরম যুক্তির দ্বারা পূর্বপক্ষরূপে পরমাণুর	
সমর্থন ৬৯—৭০		সাবয়বত্ব সমর্থন ১০০—১০১	
১৫শ সূত্রে—পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি		ভাষ্য—প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত পূর্বপক্ষের	
অনুসারে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হইলে		খণ্ডন ১০৭	
ঐ যুক্তির দ্বারা অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ		২৫শ সূত্রে—উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন দ্বারা	
হওয়ায় সর্বোপাধি সিদ্ধ হয়, এই আপত্তির		পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপন ১১০	
প্রকাশ ৭৫		ভাষ্য—সর্বোপাধিবাদী বা বিজ্ঞানমাত্রবাদীর	
১৬শ সূত্রে—পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা পরমাণুর		মতানুসারে সমস্ত জ্ঞানের ভ্রমত্ব সমর্থন-	
অভাব সিদ্ধ না হওয়ায় সর্বোপাধি সিদ্ধ হয়		পূর্বক ২৬শ সূত্রের অবতারণা।	
না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ। ভাষ্য—যুক্তির		২৬শ সূত্রে—বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে কোন	
দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থনপূর্বক		পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, অতএব	
পরমাণুর স্বরূপ প্রকাশ ... ৭৭—৭৮		বিষয়ের সত্তা না থাকায় সমস্ত জ্ঞানই অসদ-	
১৭শ সূত্রে—নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন		বিষয়ক হওয়ায় ভ্রম, এই পূর্বপক্ষের	
... .. ৮০		প্রকাশ ১২১	
১৮শ ও ১৯শ সূত্রে—সর্বোপাধিবাদীর অভিমত		২৭শ, ২৮শ, ২৯শ, ও ৩০শ সূত্রের দ্বারা উক্ত	
যুক্তি প্রকাশ করিয়া নিরবয়ব পরমাণু নাই,		পূর্বপক্ষের খণ্ডন ... ১২৪—১৮	
এই পূর্বপক্ষের সমর্থন ... ৮৯—৯০		৩১শ ও ৩২শ সূত্রে সর্বোপাধিবাদী ও বিজ্ঞান-	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মাত্রবাদীর মতানুসারে স্বপ্নাদি স্থলে যেমন বস্তুতঃ বিষয় না থাকিলেও অসৎ বিষয়ের ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমের অসৎ হইলেও তাহার ভ্রম হয়, এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ ১২৯		৩৭শ সূত্রে—সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থ জ্ঞান নাই—এই মতের খণ্ডনে চরম যুক্তির প্রকাশ। ভাষ্য—সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত মতের অনুপপত্তি সমর্থন ১৫১—৫২	
৩৩শ সূত্রে—উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন; ভাষ্য— বিচারপূর্বক পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তির খণ্ডন ১৩১—৩২		৩৮শ সূত্রে—সমাধিবিশেষের অভ্যাসপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপপত্তি কখন ... ১৮২	
৩৪শ সূত্রে—পূর্বোক্ত মত-খণ্ডনের জন্ত পরে স্মৃতি ও সংকল্পের বিষয়ের ত্রায় স্বপ্নাদি স্থলীয় বিষয়ও পূর্বোক্তভূত, স্মৃতরাং তাহাও অসৎ বা অলীক নহে, এই নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ।—ভাষ্যে বিচারপূর্বক যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন —১৩৫—৩৬		৩৯শ ও ৪০শ সূত্রে—পূর্বপক্ষরূপে সমাধি- বিশেষের অসম্ভাব্যতা সমর্থন ... ১৮৪—৮৫	
		৪১শ ও ৪২শ সূত্রে—পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডনের জন্ত সমাধিবিশেষের সম্ভাব্যতা সমর্থন ১৮৬—৮৮	
		৪৩শ সূত্রে—মুক্ত পুরুষেরও জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি প্রকাশ ১৯০	
		৪৪শ ও ৪৫শ সূত্রে—উক্ত আপত্তির খণ্ডন ১৯১—৯৩	
৩৫শ সূত্রে—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না, এই সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্বক পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তিবিশেষের খণ্ডন। ভাষ্য—মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকা স্থলেও ভ্রম- জ্ঞানের বিষয় অলীক নহে, ঐ সমস্ত স্থলেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না এবং মায়াদি স্থলে ভ্রমজ্ঞানও নিমিত্তবিশেষ- জন্ত, ইত্যাদি সিদ্ধান্তের সমর্থন দ্বারা সর্বাভাববাদীর মতের অনুপপত্তি সমর্থন। ১৪২—৪৩		৪৬শ সূত্রে—মুক্তিলাভের জন্ত যম ও নিয়ম দ্বারা এবং যোগশাস্ত্রোক্ত আত্মবিধি ও উপায়ের দ্বারা আত্ম-সংস্কারের কর্তব্যতা প্রকাশ ১৯৯	
		৪৭শ সূত্রে মুক্তিলাভের জন্ত আত্মকিকৌরুণ আত্মবিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণা এবং অভ্যাসের কর্তব্যতা এবং সেই আত্মবিদ্যা-বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদের কর্তব্যতা প্রকাশ ২০৭	
		৪৮শ সূত্রে—অনুশাস্ত্র শিষ্যাদির সহিত বাহ্য- বিচার করিয়া ওষ্মনির্ণয়ের কর্তব্যতা প্রকাশ ২০৯	
৩৬শ সূত্রে—ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া, তদ্বাচ্যেও জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যসমর্থন —১৫০		৪৯শ সূত্রে—পক্ষান্তরে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা উপস্থিত হইলে গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষ স্থাপন না করিয়াই সংবাদ	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কর্তব্য অর্থাৎ শুরু প্রভৃতির কথা শ্রবণ করিয়া, তদ্বারা নিজদর্শনের পরিশোধন কর্তব্য, এই চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ ... ২১১		অষ্টম সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধকের উত্তর। ভাষ্য—এ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ২১৯—৩০০	
৫০শ সূত্রে—ওঙ্ক-নিশ্চয়-রক্ষার্থ জল্প ও বিতণ্ডার কর্তব্যতা সমর্থন ... ২১৪		নবম সূত্রে—“প্রসঙ্গসম” ও “প্রতিদৃষ্টান্তসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উক্ত লক্ষণ- বয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ ৩০১-৩০২	
৫১শ সূত্রে—আত্মবিদ্যার রক্ষার উদ্দেশ্যেই জিগীষাবশতঃ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কখন কর্তব্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ ... ২১৭		দশম ও একাদশ সূত্রে—যথাক্রমে পূর্বসূত্রোক্ত “প্রতিষেধ”বয়ের উত্তর। ভাষ্য—এ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩০৫—৩০৮	
পঞ্চম অধ্যায়		দ্বাদশ সূত্রে—“অনুৎপত্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩০৯	
প্রথম সূত্রে—“সাধর্ম্যাসম” প্রভৃতি চতুর্বিংশ- শতি . প্রতিষেধের নাম-কীর্তনরূপ বিভাগ ... ২২১		ত্রয়োদশ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত “প্রতিষেধ”র উত্তর। ভাষ্য—এ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩১১—৩১২	
দ্বিতীয় সূত্রে—“সাধর্ম্যাসম” ও “বৈধর্ম্যাসম” নামক প্রতিষেধবয়ের লক্ষণ ... ২৫৭		চতুর্দশ সূত্রে—“সংশয়সম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩১৩	
ভাষ্য—উক্ত প্রতিষেধবয়ের সূত্রোক্ত লক্ষণ- ব্যাখ্যা এবং প্রকারভেদের উদাহরণ প্রকাশ ... ২৫৮—২৬৬		পঞ্চদশ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—এ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩১৫—৩১৬	
তৃতীয় সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধবয়ের উত্তর। ভাষ্য—উক্ত উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ২৬৯—২৭০		ষোড়শ সূত্রে—“প্রকরণসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩১৯—৩২০	
চতুর্থ সূত্রে—“উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ষড়্বিধ “প্রতিষেধে”র লক্ষণ। ভাষ্য—যথাক্রমে এ সমস্ত প্রতিষেধের লক্ষণব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ ... ২৭৬—২৮৫		সপ্তদশ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—এ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং “প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাস ও “প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ-ভেদ প্রকাশ ... ৩২৪	
পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত ষড়্বিধ প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—এ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ২৮৯—২৯৩		অষ্টাদশ সূত্রে—অহেতুসম প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—এ লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩২৮	
সপ্তম সূত্রে—“প্রাপ্তিসম” ও “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ২৯৫—২৯৬			

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৯শ ও ২০শ সূত্রে—“অহেতুসম” প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩৩০—৩৩২		৩৫শ ও ৩৬শ সূত্রে—“অনিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩৬৭—৩৭০	
২১শ সূত্রে—“অর্থানন্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৩৩		৩৫ সূত্রে—“নিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৭২	
২২শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩৩৫—৩৩৬		৩৬শ সূত্রে—“নিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্যব্যাখ্যা এবং বিচারপূর্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৭৫	
২৩শ সূত্রে “অবিশেষসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৩৯		৩৭শ সূত্রে—“কার্য্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৭৮	
২৪শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং বিচারপূর্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৪১		৩৮শ সূত্রে—“কার্য্যসম” প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৩৮৪—৩৮৫	
২৫শ সূত্রে—“উপপত্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৪৫		৩৯শ সূত্র ইহাতে পাঁচ সূত্রে—“বটপক্ষী”রূপ “কথাভাস” প্রদর্শন। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা উক্ত কথাভাসের বিশদ ব্যাখ্যা ও অসহুত্তরত্ব সমর্থন ... ৩৮৫—৩৮৮	
২৬শ সূত্রে পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের ব্যাখ্যা ... ৩৪৭			
২৭শ সূত্রে “উপলব্ধিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৪৯			
২৮শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ৩৫২			
২৯শ সূত্রে—“অনুপলব্ধিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উক্ত প্রতিষেধের উদাহরণস্থল প্রদর্শনপূর্বক উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৫৪			
৩০শ ও ৩১শ সূত্রে—পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্য—ঐ উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ... ৫৫৭—৩৬২			
৩২শ সূত্রে—“অনিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্য—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৩৬৫—৩৬৬			

দ্বিতীয় আঙ্কিক।

প্রথম সূত্রে—“প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি দ্বাবিংশতপ্রকার নিগ্রহস্থানের নামোল্লেখ ৪০৯	
দ্বিতীয়সূত্রে—“প্রতিজ্ঞাহানি”র লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ দ্বারা “প্রতিজ্ঞাহানি”র নিগ্রহস্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ ... ৪১৭—৪১৮	
তৃতীয় সূত্রে—“প্রতিজ্ঞান্তরে”র লক্ষণ। ভাষ্য—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা, উদাহরণ ও উহার নিগ্রহস্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ ... ৪২১—৪২২	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ সূত্রে—“প্রতিজ্ঞাবিরোধে”র লক্ষণ।		১৫শ সূত্রে—তৃতীয় প্রকার “পুনরুক্তে”র লক্ষণ।	
ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ ...	৪২৫	ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ ...	৪৫৭
পঞ্চম সূত্রে—“প্রতিজ্ঞাসম্মাসে”র লক্ষণ।		১৬শ সূত্রে—“অনুভাষণে”র লক্ষণ ...	৪৫৯
ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ ...	৪২৮	১৭শ সূত্রে—“অজ্ঞানে”র লক্ষণ ...	৪৬২
ষষ্ঠ সূত্রে—হেতুত্বের লক্ষণ। ভাষ্য—সাংখ্য-মতানুসারে উদাহরণ প্রকাশ ...	৪৩০	১৮শ সূত্রে—“অপ্রতিভা”র লক্ষণ ...	৪৬৩
সপ্তম সূত্রে—অর্থান্তরের লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ ...	৪৩৫	১৯শ সূত্রে—“বিক্ষেপে”র লক্ষণ ...	৪৬৫
অষ্টম সূত্রে—“নিরর্থকে”র লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ ...	৪৪০	২০শ সূত্রে—“মতানুজ্ঞা”র লক্ষণ ...	৪৬৮
নবম সূত্রে—“অবিজ্ঞাতার্থের”র লক্ষণ	৪৪৩	২১শ সূত্রে—“পর্য্যায়োজ্যোপেক্ষণে”র লক্ষণ।	
দশম সূত্রে—“অপার্থকে”র লক্ষণ। ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ ...	৪৪৬	ভাষ্য—উক্ত নিগ্রহস্থান মধ্যস্থ সভ্য কর্তৃক উদ্ভাব্য, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন	৪৭০
১১শ সূত্রে—“অপ্রাপ্তকালে”র লক্ষণ	৪৪৯	২২শ সূত্রে—“নিরনুযোজ্যানুযোগের লক্ষণ	৪৭২
১২শ সূত্রে—“নূনে”র লক্ষণ ...	৪৫১	২৩শ সূত্রে—“অপসিদ্ধান্তে”র লক্ষণ। ভাষ্য—উহার ব্যাখ্যাপূর্বক উদাহরণ প্রকাশ	৪৭৫
১৩শ সূত্রে—“অধিকে”র লক্ষণ ...	৪৫৩	২৪শ সূত্রে—প্রথম অধ্যায়ে যথোক্ত “হেতু-ভাস”সমূহের নিগ্রহস্থানত্ব কথন ...	৪৮০
১৪শ সূত্রে—“শব্দপুনরুক্ত” ও “অর্থপুনরুক্তে”র লক্ষণ।			
ভাষ্য—উদাহরণ প্রকাশ	৪৫৬		

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী

(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আঙ্গিক)

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আঙ্গিকে অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। প্রমেয় পরীক্ষা-সমাপ্তির পরেই প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা কর্তব্য। ঐ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কি, উহার বিষয় কি, কিরূপে উহা উৎপন্ন হয়, কিরূপে উহা পরিপালিত হয়, কিরূপে বিবর্তিত হয়, এই সমস্ত নির্ণয়ই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা, তজ্জগুই দ্বিতীয় আঙ্গিকের আরম্ভ। ত্রায়দর্শনের প্রথম সূত্রে যে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রে উহার লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, সেই প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানেরই পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম আঙ্গিকে যে ষট্ প্রমেয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার সহিত তত্ত্বজ্ঞানের কার্যত্বরূপ সাম্য থাকায় উভয় আঙ্গিকের বিষয়সাম্য প্রযুক্ত ঐ দ্বিতীয় আঙ্গিক চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশরূপে কথিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে বর্তমান উপাধ্যায়ের পূর্বপক্ষ ও উত্তরের ব্যাখ্যা এবং উদয়নাচার্য্যের কথা ... ৩—৪

আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত ষাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের ভাষ্যকারোক্ত প্রকার-চতুষ্ঠয়ের নাম ব্যাখ্যা ও আলোচনা ... ৮—৯

ত্রায়দর্শনের প্রথম সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারোক্ত হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য, এই চারিটি “অর্থপদে”র ব্যাখ্যায় বার্তিককার উদ্যোতকর “হান” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্র ঐ “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণ। উদ্যোতকরের উক্তরূপ অভিনব ব্যাখ্যার কারণ এবং তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যা ও টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্যপরিণতি আছে উদয়নাচার্য্যের কথা ... ৯—১০

গৌতমের মতে মুমুক্শুর নিজের আত্ম-সাক্ষাৎকার মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইলেও ঈশ্বরসাক্ষাৎকার ঐ আত্মসাক্ষাৎকারের সম্পাদক হওয়ার ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও মুক্তিলাভে কারণ। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এবং “শ্রায়কুসুমাজলি”র টীকাকার বরদরাজ ও বর্তমান উপাধ্যায়ের কথার আলোচনা ... ১৭—২০

কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ এবং তাঁহাদিগের মতে উদয়নাচার্য্যেরও উহাই মত। উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা। “মুক্তিবাদ” প্রাচ্যে গদাধর ভট্টাচার্য্য উক্ত মতের বর্ণন করিয়া প্রতিবাদ না করিলেও উহা তাঁহার নিজের মত নহে এবং উদয়নাচার্য্যেরও উহা মত নহে ... ২০—২২

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মতে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ”—এই প্রতিবাক্যে “আত্মনু” শব্দের দ্বারা মুমুক্শু নিজ আত্মাই পরিগ্রহীত হওয়ার উহার সাক্ষাৎকারই মুক্তির চরম কারণ। কিন্তু তাহাতে নিজ আত্মা ও পরমাত্মার অভেদধ্যানরূপ যোগবিশেষ অত্যা-বশ্যক। নচেৎ ঐ আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না। “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের উহাই তাৎপর্য। উক্ত মতে উক্ত প্রতিবাক্যের ব্যাখ্যা এবং “মুক্তিবাদ” গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যের উক্ত মতের প্রতিবাদের সমালোচনা ... ২২—২৪

গৌতমের মতে যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান এবং পরমেশ্বরে পরাভক্তিও মুমুক্শুর আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। শ্রীধর স্বামিপাদ ভক্তিকেই মুক্তির সাধন বলিয়া সমর্থন করিলেও তিনিও পরমেশ্বরের অনুগ্রহলব্ধ আত্ম-জ্ঞানকে সেই ভক্তির ব্যাপাররূপে উল্লেখ করায় আত্মজ্ঞান যে মুক্তির চরম কারণ, ইহা তাঁহারও স্বীকৃতই হইয়াছে। তাঁহার মতে ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। উক্তি বিষয়ে ভগবদ্গীতার টীকার সর্বশেষে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তব্যাখ্যা ... ২৪—২৫

“জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদে”র কথা। আচার্য্য শঙ্করের সহ পূর্ব হইতেই উক্ত মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বামুনাচার্য্য প্রভৃতিও পরে অল্প ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত মতেরই সমর্থন করেন। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও “জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়বাদ”ই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ এবং গৌতমের সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। সাংখ্যসূত্রে উক্ত মতের প্রতিবাদই হইয়াছে। মহা-নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে অনেক স্মৃতি ও পুরাণের বচন দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন করিলেও পরে তিনিও উক্ত মত পরিভ্যাগ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ উক্ত মতের ঘোর প্রতিবাদী। উক্ত মতের প্রতিবাদে ভগবদ্গীতার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের উক্তি। যোগবাশিষ্ঠের টীকাকারের মতে “জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ” যোগবাশিষ্ঠেরও সিদ্ধান্ত নহে ... ২৫—২৮

দ্বিতীয় সূত্রে—“সংকল্প”শব্দের অর্থ বিষয়ে আলোচনা। ভাষ্যকারের মতে উহা মোহবিশেষরূপ মিথ্যা সংকল্প। ভগবদ্গীতার “সংকল্পপ্রভবানু কামানু” (৬,২৪) ইত্যাদি শ্লোকেও “সংকল্প”শব্দের উক্তরূপ অর্থই বহুসম্মত। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ স্থলেও আকাঙ্ক্ষাবিশেষকেই সংকল্প বলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের কথার সমর্থন ... ২৯—৩০

জীবনমুক্তি বিষয়ে বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকের উক্তি। ভগবদ্গীতা, সাংখ্যসূত্র, যোগসূত্র ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতির দ্বারা জীবনমুক্তির সমর্থন। জীবনমুক্ত ব্যক্তি প্রারম্ভ কক্ষের ফলভোগের জন্য জীবিত থাকেন। কারণ, ভোগ ব্যতীত কাহারও প্রারম্ভ কক্ষের

বিষয়

পৃষ্ঠা

ক্ষয় হয় না। উক্ত বিষয়ে বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রমাণানুসারে শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা। শঙ্করের মতে জীবমুক্ত ব্যক্তিরও অবিদ্যার লেশ থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি অনেক উহা স্বীকার করেন নাই। উক্ত মত খণ্ডনে বিজ্ঞান ভিক্ষুর কথা ৩০—৩৩

প্রারম্ভ কৰ্ম্ম হইতেও যোগাভাস প্রবল অর্থাৎ ভোগ ব্যতীতও যোগবিশেষের দ্বারা প্রারম্ভ কৰ্ম্মেরও ক্ষয় হয়, এই মতসমর্থনে “জীবমুক্তিবিবেক”গ্রন্থে বিদ্যারণ্য-মুনির যুক্তি এবং যোগবাশিষ্ঠের বচনের দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন। আচার্য্য শঙ্কর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি উক্ত মতের সমর্থন করেন নাই। যোগবাশিষ্ঠের বচনেরও উল্লেখ করেন নাই। মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে ভোগ তত্ত্বজ্ঞানেরই ব্যাপার, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারম্ভ কৰ্ম্মক্ষয় করে। উক্ত মতে বক্তব্য ৩৩—৩৫

যোগবাশিষ্ঠে দৈববাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা সর্বসিদ্ধি ঘোষিত হইয়াছে। ইহা জন্মে ক্রিয়মাণ শাস্ত্রীয় পুরুষকার প্রবল হইলে প্রাক্তন বৈবাক্য ও বিধবৃত্ত করিতে পারে, ইহাও কথিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের উক্তির তাৎপর্য্য-বিষয়ে বক্তব্য। দৈব ও পুরুষকার বিষয়ে মহর্ষি বাজবল্ক্যের কথা ৩৫

পরম আত্মর ভক্তবিশেষের ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে ভোগ ব্যতীতও প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ক্ষয় হয়,—এই মত সমর্থনে গোবিন্দভাষ্যে গোড়ীর বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথা এবং তৎসম্বন্ধে বক্তব্য। জীবমুক্তিসমর্থনে আচার্য্য শঙ্কর ও বাচস্পতি মিশ্রের শেষ কথা ৩৬—৩৭

“সমবায়” নামক নিত্যসম্বন্ধ কণাদ ও গোতম উভয়েরই সম্মত। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে ঐ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষও হয়। বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে উহা অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত অনুমান বা যুক্তির ব্যাখ্যা। সমবায় সম্বন্ধ-খণ্ডনে অট্টবতবাদী চিৎসুখমুনি এবং অত্রাত্ম আচার্য্যের কথা এবং তদ্বত্তবে ত্রায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা। ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্যগণ ভাট্ট সম্প্রদায়ের সম্মত “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেও নবানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি উহা স্বীকার করিয়াই সমবায় সম্বন্ধ এবং তাহার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মৌমাংসাচার্য্য প্রভাকর সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াও উহার নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই ৬০—৬৩

ত্রায়সূত্রানুসারে বিচারপূর্বক অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনে বাৎস্তায়নের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা। ত্রায়দর্শনে গোতমের খণ্ডিত পূর্বপক্ষই পরবর্তী কালে বৌদ্ধসম্প্রদায় নানা প্রকারে সমর্থন করিয়াছিলেন। অবয়বীর অস্তিত্বখণ্ডনে বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের অপর যুক্তিবিশেষের ব্যাখ্যা ও তৎখণ্ডনে উদ্যোতকের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা ৬৪—৬৬

বিষয়

পৃষ্ঠা

অবয়বীর অস্তিত্ব-সমর্থনে উদ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্র নীল পীতাদি বিজাতীয় রূপবিশিষ্ট সূত্র-নির্মিত বস্তাদিতে “চিৎ” নামে অতিরিক্ত রূপই স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিষয়ে মতভেদ আছে। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীন-সম্মত “চিৎ”রূপ অস্বীকার করিলেও জগদীশ, বিশ্বনাথ ও অন্নং ভট্ট প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত প্রাচীন মতই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মতভেদের যুক্তি ও তদ্বিষয়ে আলোচনা ৬৬—৬৭

সর্কাস্ত্রবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বাহ্য পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র এবং প্রত্যক্ষ। উক্ত মত খণ্ডনে বাৎস্তায়নের কথা। পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইলে প্রত্যেক পরমাণুরও প্রত্যক্ষ কেন হয় না? এতদ্বস্তরে বৈভাষিক বৌদ্ধাচার্য্য ভাস্কর্য্য গুপ্ত প্রভৃতির কথা। তাঁহার মতে পরমাণুসমূহ সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অসংযুক্তভাবে কোন স্থানে কোন পরমাণুর সত্তাই নাই। তাঁহার উক্ত মত খণ্ডনে “তদ্ব-সংগ্রহ” গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত্র রক্ষিতের কথা ৭৩—৭৪

“পরং বা ক্রটেঃ” এই সূত্রের দ্বারা পরমাণুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় যুক্তি ও উক্ত বিষয়ে মতভেদের আলোচনা। “ক্রটি” শব্দের দ্বারা ত্রসরেণুই বিবক্ষিত। গবাক্ষরক্ষুগত সূর্য্যাকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান ক্ষুদ্র রেণুই ত্রসরেণু। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ—ময়ূ ও যজ্ঞবল্ক্যের বচন। অপরার্ককৃত টীকা ও “বীরমিত্তোদয়” নিবন্ধে যজ্ঞবল্ক্য-বচনের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাষ্যে বৈশেষিক মতানুসারে ষাণ্মুকত্রয়জনিত অবয়বী ত্রবাই ত্রসরেণু বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমাণুর কথা এবং তাহার ব্যাখ্যায় টীকাকারগণের কথার আলোচনা ৮১—৮৩

“পরং বা ক্রটেঃ” এই সূত্র দ্বারা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে রঘুনাথ শিরোমণির মতানুসারে দৃশ্যমান ত্রসরেণুকেই সর্কাস্ত্রপেক্ষা সূক্ষ্ম ত্রব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও উহা গৌতমের সূত্রার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, গৌতম পূর্বে পরমাণুকে অতীন্দ্রিয় বলিয়াছেন। দৃশ্যমান ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক এবং তাহার অবয়ব পরমাণু, ইহাই শ্রীমদ্ভাষ্যে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ দিকান্ত। “চরকসংহিতা”তেও পরমাণুর অতীন্দ্রিয়তাই কথিত হইয়াছে। “দিকান্তমুক্তাবলী”তে বিশ্বনাথও রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মত খণ্ডন করিয়া অতীন্দ্রিয় পরমাণুই সমর্থন করিয়াছেন। গবাক্ষরক্ষে, দৃশ্যমান ত্রসরেণুই পরমাণু, ইহা বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের মত। উহা রঘুনাথ শিরোমণির নিজের উদ্ভাবিত নব্য মত নহে। “শ্রীমদ্ভাষ্য” উক্ত মতের উল্লেখ ও উক্ত মত খণ্ডনে উদ্যোতকর প্রভৃতির কথা ৮৫—৮৬

পরমাণুত্রয়ের সংযোগে কোন ত্রব্য উৎপন্ন হয় না, এবং ষাণ্মুকত্রয়ের সংযোগেও কোন ত্রব্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পরমাণুত্রয়ের সংযোগেই “ষাণ্মুক” নামক ত্রব্য উৎপন্ন

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

হয় এবং দ্বাণুত্রয়ের সংযোগেই “ত্র্যসরেণু” বা “ত্রণুক” নামক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উক্ত দিক্কাঙ্কে “ভামতী” গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণিত যুক্তি। “ত্রাণুক” ও “ত্র্যসরেণু” শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা। ত্র্যসরেণুর ষষ্ঠ ভাগই পরমাণু। উক্ত বিষয়ে “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকায় মহাদেব ভট্টের নিজ মন্তব্য নিম্নমাণ। পরমাণুর নিত্যত্ব ও আয়ত্ত্ববাদ কণাদের দ্বারা গৌতমেরও সম্মত

... ১৬-১৮

আকাশ-ব্যুত্তিভেদ প্রযুক্ত পরমাণু সাবয়ব অর্থাৎ অনিত্য। আকাশব্যুত্তিভেদ অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশের সংযোগ নাই, ইহা বলিলে আকাশের সর্বব্যাপিণ্ডের হানি হয়—এই মতের খণ্ডনে “শ্রাব্যবর্ত্তিকে” উদ্যোতকের বিশদ বিচার এবং “আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য এবং টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণির কথা

... ২৩-২৪

নিরবয়ব পরমাণু-সমর্থনে হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য ভদন্ত শুভ শুশ্রু ও কাশ্মীর বৈভাষিক বৌদ্ধাচার্য্যগণের কথা এবং তাঁহাদিগের মত খণ্ডনে মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য অশ্বজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধুর কথা।

নিরবয়ব পরমাণু খণ্ডনে “বিজ্ঞপ্তিমাাত্রতাসিক্তি” গ্রন্থে বসুবন্ধুর “ষট্কেণ যুগপদ-যোগাৎ” ইত্যাদি কতিপয় কারিকা ও তাহার বসুবন্ধুকৃত ব্যাখ্যা এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত্র রক্ষিত ও তাঁহার শিষ্য কমল শীলের কথা

... ১০৫-১০৬

পরমাণুরও অবশ্য অংশ বা প্রদেশ আছে। কারণ, পরমাণু জন্ত দ্রব্য এবং পরমাণুর মূর্ত্তি আছে, দিগ্দেশ ভেদ আছে এবং পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ জন্মে; যাহার অংশ বা প্রদেশ নাই, তাহাতে সংযোগ হইতে পারে না। মধ্যস্থিত কোন পরমাণুতে তাহার চতুর্দিক্ এবং অধঃ ও উর্দ্ধদেশ হইতে একই সময়ে ছয়টি পরমাণু আদিয়াও সংযুক্ত হয়, অতএব সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর অবশ্য ছয়টি অংশ বা প্রদেশরূপ অবয়ব আছে, “ষট্কেণ যুগপদযোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা”। অতএব নিরবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হয় না। দিগ্দেশ ভেদ থাকায় কোন পরমাণুর একত্বও সম্ভব হয় না। বসুবন্ধু প্রভৃতির এই সমস্ত যুক্তি ও অত্যাশ্রয় যুক্তি খণ্ডনে উদ্যোতকের কথা এবং বিচারপূর্ব্বক পরমাণুর কোন অংশ বা অবয়ব নাই, পরমাণু নিরবয়ব নিত্য, এই মতের সমর্থন

... ১১৩-১১৬

বসুবন্ধু প্রভৃতির যুক্তি-খণ্ডনে “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা এবং তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণির—“ষট্কেণ যুগপদযোগাৎ” ইত্যাদি অপর বৌদ্ধ কারিকার উল্লেখপূর্ব্বক নিরবয়ব পরমাণুতে কিরূপে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগের উপপত্তি হয় এবং উক্ত বৌদ্ধকারিকার পরাধীনে কথিত দিগ্দেশভেদ, ছায়া ও আবরণ, এই হেতুত্রয়ের দ্বারাও পরমাণুর সাবয়বত্ব কেমন সিদ্ধ হয় না, এই বিষয়ে রঘুনাথ শিরোমণির উত্তর এবং পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধযুক্তি-খণ্ডনে উদ্যোতকের শেষ কথা

... ১১৬-১১৭

নিরবয়ব পরমাণু-সমর্থনে শ্রাব্য-বৈভাষিক-সম্প্রদায়ের সমস্ত বখার সার মর্ম্ম

... ১১৮

পরমাণুর নিত্যত্ব-খণ্ডনে সাংখ্যপ্রচলন-ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষুর কথা। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক শ্রুতি কালবশে বিলুপ্ত হইলেও মহর্ষি কপিলের “নাগুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতঃ”—এই সূত্র এবং “অথো মাত্ৰাবিনাশিত্বঃ”—ইত্যাদি মনু-স্মৃতির দ্বারা ঐ শ্রুতি অমুম্বয়। উক্ত মতের সমালোচনা ও গ্রাম-বৈশাখিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “বিশ্বতশ্চক্ষুৰ্ভূত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “পতত্র” শব্দের অর্থ নিত্য পরমাণু। সূত্রসাং পরমাণুর নিত্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধ। উক্ত শ্রুতিবাক্যের উদয়নোক্ত ব্যাখ্যা ... ১১৮—১২০

স্বপ্ন, মায়ী ও গন্ধৰ্ব্বনগর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত সুপ্রাচীন কাল হইতেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত পরবর্তী বৌদ্ধসম্প্রদায়েরই উদ্ভাবিত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সূত্রসাং গ্রামসূত্রে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া, ঐ সমস্ত সূত্র পরে রচিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যায় না এবং ঐ সমস্ত পূর্বপক্ষপ্রকাশক সূত্র দ্বারা গৌতমও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহাও বলা যায় না ... ১৩১

কণাদোক্ত “স্বপ্ন” ও “স্বপ্নাস্তিক” নামক জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা। স্বপ্নজ্ঞান অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ। “স্বপ্নাস্তিক” স্মৃতিবিশেষ। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদোক্ত ত্রিবিধ স্বপ্নের বর্ণন। প্রশস্তপাদের মতে পূর্বে অননুভূত অপ্রসিদ্ধ পদার্থেও অদৃষ্ট-বিশেষের প্রভাবে স্বপ্ন জন্মে। উক্ত মতানুসারে নৈষধীয় চরিতে শ্রীহর্ষের উক্তি ... ১৩৩—১৩৪

গৌতমের মতে স্বপ্নজ্ঞান সর্বত্রই স্মৃতির গ্রাম পূর্বানুভূতবিষয়ক অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ। ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতিবিশেষ। উক্ত উভয় মতেই পূর্বে অননুভূত বা একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে স্বপ্ন জন্মিতে পারে না। অতএব সমস্ত স্বপ্নের বিষয়ই যে কোনরূপে পূর্বজ্ঞাত। উক্ত মতের অনুপপত্তি ও তাহার সমাধানে গ্রামসূত্ররচিবাবিশ্বনাথ ও ভট্ট কুমারিলের উত্তর ... ১৪০—১৪২

“মায়ী” ও গন্ধৰ্ব্বনগরের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এবং “মায়ী” শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগের আলোচনা। “মায়ী” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় রামানুজের কথা এবং তৎসম্বন্ধে বক্তব্য ... ১৪৫—১৪৭

“শূন্যবাদে”র সমর্থনে “মাধ্যমিককারিকা”য় এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থনে “লঙ্কাবতার-সূত্রে”ও স্বপ্ন, মায়ী ও গন্ধৰ্ব্বনগর প্রভৃতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি গৌতমের সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা ও তাহার খণ্ডন করিলেও বাৎস্তায়নের ব্যাখ্যায় দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু বাৎস্তায়নের ব্যাখ্যায় দ্বারাও ফলতঃ বিজ্ঞানবাদেরও খণ্ডন হইয়াছে ... ১৫৬

“গ্রামবার্ত্তিক” উদ্যোতকরের বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যাপূর্বক বস্তুবস্তু ও তাহার শিষ্য দিঙ্নাগ প্রভৃতির উক্তির প্রতিবাদ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি এবং

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক।

পরে শাস্ত্র রক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি ক্রমশঃ হুস্ম বিচার দ্বারা উদ্যোতকরের উক্তি
প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদিগের পরে বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচন এবং বাচস্পতি
মিশ্র এবং তাঁহার পরে উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর ভট্ট ও জয়স্ব ভট্ট প্রভৃতি পূর্বোক্ত বৌদ্ধ
মতের বহু বিচারপূর্বক খণ্ডন করেন ... ১৫৮-১৬১

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বমত-সমর্থনে মূল সিদ্ধান্ত ও তাহার যুক্তি।
“সহোপলন্তনয়মাৎ” ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এবং বৈভাষিক বৌদ্ধা-
চার্য্য ভদন্ত শুভ গুপ্তের প্রতিবাদ। তদন্তরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের কথা।
উক্ত কারিকায় “সহ” শব্দের অর্থ সাহিত্য নহে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন উপ-
লব্ধিই সহোপলন্ত। শাস্ত্র রক্ষিতের কারিকায় উক্ত অর্থের স্পষ্ট প্রকাশপূর্বক বিজ্ঞান-
বাদের সমর্থন। “সহোপলন্তনয়মাৎ” ইত্যাদি কারিকা বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত
এবং উদ্যোতকর তাঁহার পূর্ববর্ত্তী, ইহা বুঝিবার পক্ষে কারণ ... ১৬২—১৬৫

শঙ্করাচার্য্যের পূর্বেও বহু নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতি আচার্য্য বৈদিক ধর্ম্ম
রক্ষার্থ নানা স্থানে বৌদ্ধ মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শঙ্করের পূর্বে ভারতে
প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, এই মন্তব্যো কিঞ্চিৎ বক্তব্য ... ১৬৬

বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনে নানা গ্রন্থে কথিত মুক্তিসমূহের সার ধর্ম্ম এবং “আত্মতত্ত্ব-বিবেক”
গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা ... ১৬৬—১৭০

“খ্যাতি” শব্দের অর্থ এবং “আত্মখ্যাতি”, “অসংখ্যাতি”, “অখ্যাতি”, “অত্মখ্যা-
খ্যাতি” এবং “অনির্বচনীয়খ্যাতি” এই পঞ্চবিধ মতের ব্যাখ্যা। জয়স্ব ভট্ট
“অনির্বচনীয়খ্যাতি”র উল্লেখ না করিয়া চতুর্বিধ খ্যাতি বলিয়াছেন। “অত্মখ্যাতি”র
অপর নামই “বিপরীতখ্যাতি”। ত্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসক্তি
স্বীকার করিয়া ভ্রম স্থলে “অত্মখ্যাতি”ই স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের
অধ্যাসভাষ্যে প্রথমেই উক্ত মতের উল্লেখ হইয়াছে। “জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসক্তি”র খণ্ডন-
পূর্বক “অনির্বচনীয়খ্যাতি”র সমর্থনে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের কথা এবং
তদন্তরে ত্রায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর
“অখ্যাতি”বাদী। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই যথার্থ। জগতে ভ্রমজ্ঞানই নাই। রামানুজের
মতেও ভ্রমজ্ঞান বা অধ্যাস নাই। উক্ত মত খণ্ডন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের যুক্তি ১৭০—১৭৫

“অসংখ্যাতি”বাদের আলোচনা। অসংখ্যাতিবাদী গগনকুসুমাদি অলীক
পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্থলবিশেষে অলীক বিষয়ে শাস্ত্র
জ্ঞান পাতঞ্জল সম্প্রদায় এবং কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেকেরও সম্মত। নাগার্জ্জুনের
ব্যাক্যমুসারে শূন্যবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়কে অসংখ্যাতিবাদী বলা যায় না। কারণ,
তাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থ “অসং” বলিয়াই নির্ধারিত নহে। উক্ত মতেও “সাংবৃত্ত”

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

ও পারমার্থিক, এই দ্বিবিধ সত্য স্বীকৃত হইলেও যাহা পারমার্থিক সত্য, তাহাও “সৎ” বলিয়াই নির্দ্ধারিত সনাতন সত্য নহে ; তাহা চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত “শূন্য” নামে কথিত। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের মতে যাহা পারমার্থিক সত্য, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম “সৎ” বলিয়াই নির্দ্ধারিত সনাতন সত্য। সুতরাং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ পূর্বোক্ত শূন্যবাদ বা বিজ্ঞান-বাদেরই প্রকারান্তর, ইহা বলা যায় না ... ১৭৫—১৭৭

বিজ্ঞানবাদী “যোগাচার” বৌদ্ধসম্প্রদায় “আত্ম-খ্যাতি”বাদী। “আত্ম-খ্যাতি-বাদে”র ব্যাখ্যা ও যুক্তি। বিজ্ঞানবাদের প্রকাশক দিঙ্নাগের বচন। “আত্ম-বিজ্ঞান” ও “প্রতিবিজ্ঞানে”র ব্যাখ্যা। সর্কাস্তিবাদী মৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ও ব্রহ্মস্থলে আত্ম-খ্যাতিবাদী। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন সৎ পদার্থ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্য পদার্থের সম্ভাবনা নাই। শিষ্যগণের অধিকারানুসারে বুদ্ধদেবের উপদেশ-ভেদ ও তন্মূলক মতভেদের প্রমাণ ... ১৭৭—১৭৯

সর্কাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ই পরে “হীনযান” নামে কথিত হইয়াছেন। বিজ্ঞান-বাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় “মহাযান” সম্প্রদায় নামে কথিত হইয়াছেন। সর্কাস্তি বাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ভেদ এবং তন্মধ্যে “সংমিতীয়” সম্প্রদায়ের কথা। গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও “বিজ্ঞানবাদ” প্রভৃতি অনেক নাস্তিক মতের প্রকাশ হইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ “লঙ্কাবতীরহস্ত্রেয়” কোন কোন কৈকেয় কোন শব্দ বা প্রতিপাদ্য গ্রহণ করিয়াই পরে ত্রায়দর্শনে কোন সূত্র রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান প্রকৃত হেতু নাই ... ১৭৯—১৮১

গৌতমের মতে যুক্তিতে নিত্যস্থলের অসম্ভবতার সমর্থক শ্রীবেদান্তাচার্য্য বেক্ট-নাথের কথা। জীবন্তুক্তি গৌতমেরও সম্মত। আচার্য্য শঙ্করের মতে জীবন্তুক্তি পুরুষেরও শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত অবিদ্যার লেশ থাকে। অবিদ্যার লেশ কি? এ বিষয়ে শঙ্কর মতের ব্যাখ্যা। শ্রীগোবিন্দ ও চিংমুখমুনির উত্তর ও উক্ত মতের প্রমাণ ... ১৮৫

ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে ভোগ ব্যতীতও প্রারম্ভ কর্ণের ক্ষয় হয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতি-পাদনে “ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধু” গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর কথা এবং গোবিন্দ ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথার আলোচনা। শ্রীমদ্ভাগবতের “স্বাদোহপি সদাঃ সর্বদাঃ কল্পতে” এই বাক্যের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় টীকাকারগণের কথা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা ... ১৯৬—১৯৮

মুক্তিলাভের জন্য গৌতম যে, যম ও নিয়মের দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য বলিয়াছেন, সেই যম ও নিয়ম কি? এবং আত্মসংস্কার কি? এই বিষয়ে ভাষ্যকার প্রভৃতির মতের আলোচনা। মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, গৌতমীয় তন্ত্র এবং যোগদর্শনে বিভিন্ন প্রকারে কথিত “যম” ও “নিয়ম”ের আলোচনা। যোগদর্শনোক্ত

বিষয়

পৃষ্ঠা

ঈশ্বরপ্রতিধানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদের আলোচনা। ঈশ্বরে সর্বকর্মের অর্পণরূপ	
ঈশ্বরপ্রতিধান গোঁতমের মতেও যুক্তি লাভে অত্যাবশ্যক	২০৮—২০৯
জিগীষামূলক “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”র প্রয়োজন কি? কিরূপ স্থলে কেন উহা কর্তব্য,	
এ বিষয়ে গোঁতমের সূত্রানুসারে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথা এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্য	
রামানুজের ব্যাখ্যানস্বারে “শ্রায়ণবিশুদ্ধি” গ্রন্থে বেকটনাথের কথা	২১৪—২১৮

পঞ্চম অধ্যায়

“জাতি” শব্দের নানা অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ। গোঁতমের প্রথম সূত্রোক্ত “জাতি”	
শব্দ পারিভাষিক, উহার অর্থ অসহজতরবিশেষ। পারিভাষিক “জাতি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায়	
ভাষ্যকারের কথা এবং বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকোষ্ঠি ও ধর্মোত্তরাচার্যের কথার আলোচনা	২২৪—২২৭
ভায়দর্শনে শেষে “জাতি”র সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বাৎস্তায়ন,	
উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের উত্তরের ব্যাখ্যা	২২৮—২৩০
গোঁতমোক্ত “সাধর্ম্যসমা” ও “বৈধর্ম্যসমা” প্রভৃতি নামে “সম” শব্দের অর্থ কি?	
উহার দ্বারা “জাতি”র প্রয়োগ স্থলে কাহার কিরূপ সাম্য গোঁতমের অভিপ্রেত, এ বিষয়ে	
বাৎস্তায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য প্রভৃতির মতের আলোচনা	২৩৫—২৩২
গোঁতমোক্ত “জাতি”তত্ত্বের ব্যাখ্যায় নানা গ্রন্থকারের বিচার ও মতভেদের কথা।	
“শ্রায়ণবর্তিকে” চতুর্দশ জাতিবাদীর মতের সমর্থনপূর্বক উক্ত মত খণ্ডনে উদ্যোতকরের	
উত্তর	২৩২—২৩৪
যথাক্রমে সংক্ষেপে গোঁতমোক্ত “সাধর্ম্যসমা” প্রভৃতি চতুর্বিংশতি প্রকার “জাতির”	
স্বরূপ, উদাহরণ ও অসহজতরত্বের যুক্তি প্রকাশ	২৩৫—২৪৪
“জাতি”র সপ্তাঙ্গের বর্ণন ও স্বরূপব্যাখ্যা। “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নাচার্যের	
“জাতি”র সপ্তাঙ্গপ্রকাশক শ্লোক এবং উহার জ্ঞানপূর্ণকৃত ব্যাখ্যা	২৪৫—২৪৬
“কার্য্যসমা” জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকোষ্ঠির কারিকা এবং	
উহার মত খণ্ডনে বাচস্পতি মিশ্রের কথা	৩৮৩—৩৮৪
সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহের “কাব্যালঙ্কার” গ্রন্থে “সাধর্ম্যসমা” প্রভৃতি জাতির	
বহুত্বের উল্লেখ। “সর্বদর্শনসংগ্রহে” “নিত্যসমা” জাতি-বিষয়ে উদয়নাচার্যের মতানু-	
সারে মাধ্বদম্প্রদায়ের কথা	৩৮৮
“নিগ্রহস্থান” শব্দের অন্তর্গত “নিগ্রহ” শব্দের অর্থ কি? কোথায় কাহার কিরূপ	
নিগ্রহ হয় এবং “বান” বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষা না থাকায় কিরূপ নিগ্রহ	
হইবে, এই সমস্ত বিষয়ে উদ্যোতকর ও উদয়নাচার্য প্রভৃতির উত্তর	৪০৭—৪০৮
যথাক্রমে সংক্ষেপে “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের স্বরূপ-প্রকাশ	৪১০—৪১২

নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ-স্বত্রোক্ত “বিপ্রতিপত্তি” ও “অপ্রতিপত্তি”র স্বরূপ ব্যাখ্যা ও সামান্য লক্ষণ-ব্যাখ্যায় মতভেদ। নিগ্রহস্থানের সামান্য-লক্ষণ-স্বত্র-ব্যাখ্যায় বরদাস্তার কথা ও তাহার সমালোচনা। সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহারই প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে। তাহাও অনন্ত প্রকারে সম্ভব হওয়ায় নিগ্রহস্থান অনন্ত প্রকার। উক্ত বিষয়ে উদ্ভোতকরের কথা ... ৪১২—৪১৩

“নিগ্রহস্থানে”র স্বরূপ ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মচর্চা কারিক। ও তাহার ব্যাখ্যা। বৌদ্ধমতপ্রচার গোতমোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই। অনেক নিগ্রহস্থান উন্নত প্রাপত্য বন্নিয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মচর্চা প্রভৃতির প্রতিবাদে খণ্ডনপূর্ব্বক গোতমের মত-সমর্থনে বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্টের কথা ... ৪১৪—৪১৭

“অর্থাস্তরে”র উদাহরণে ভাষাকারোক্ত নাম, আখ্যান, উপসর্গ ও নিপাতের লক্ষণের বাচস্পতি মিশ্রকৃত ব্যাখ্যায় সমালোচনা এবং উক্ত বিষয়ে উদ্ভোতকর ও নাগেশ ভট্ট প্রভৃতির কথার আলোচনা ... ৪১৭—৪২০

গোতমোক্ত “নিরর্থকে”র স্বরূপ ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মতের আলোচনা ৪২১

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির কথিত ত্রিবিধ “অবিজ্ঞাতার্থে”র উদাহরণ ব্যাখ্যা ... ৪২২—৪২৫

“অপার্থকে”র প্রকারভেদ ও উদাহরণের ব্যাখ্যা। পদগত ও বাক্যগত অপার্থক্য দোষ সর্ব্বসম্মত। “কিরাতাজ্জুগীষ”কাব্যে উক্ত দোষের উল্লেখ ও তাহার তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় টীকাকার মল্লিনাথের কথা। ভাস্কর “কাবালিকার” গ্রন্থে “অপার্থকে”র লক্ষণ ও উদাহরণ। পতঞ্জলির মহাভাষা “অনর্থক” নামে অপার্থকের উল্লেখ ও তাহার উদাহরণ। “অপার্থকে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বাৎসায়ন ভাষ্যে মহাভাষ্যের সন্দর্ভই যথাযথ উদ্ধৃত হয় নাই ... ৪২৭—৪২৯

গোতমের চরম স্বত্রোক্ত “চ”শব্দ এবং হেতুভাসের ব্যাখ্যায় নানামতের কথা ... ৪৩১—৪৩৩

“তাৎপর্য্যটীকা”কার প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রই ৮৪১ খৃষ্টাব্দে “শ্রায়শ্চী-নিবন্ধ” রচনা করেন, তিনি উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার মতে শ্রায়দর্শনের স্বত্রসংখ্যা ৫২৮। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী “স্মৃতিনিবন্ধ”কার বাচস্পতি মিশ্র “শ্রায়শ্চৌদ্ধার” গ্রন্থের কর্ত্তা। তাঁহার মতে শ্রায়দর্শনের স্বত্রসংখ্যা ৫৩১ ... ৪৩৩—৪৩৪

ভাস্কর কবি তাঁহার “প্রতিমা” নাটকে মেধাতিথির শ্রায়শাস্ত্র বন্নিয়া গোতমের শ্রায়শাস্ত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। মেধাতিথি গোতমেরই নামান্তর। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এবং ভাস্করির স্থপ্রাচীনত্ব-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা ... ৪৩৫

বৌদ্ধাচার্য্য বহুবন্ধু ও দিগ্‌নাগ এবং তাঁহাদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রায়চার্য্য উদ্ভোতকরের সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ... ৪৩৫—৪৩৬

ন্যায়দর্শন

বাৎসর্যনভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় আঙ্কিক

ভাষ্য। কিন্তু খলু ভো যাবন্তো বিষয়াস্তাবৎ প্রত্যেকং তত্ত্বজ্ঞান-
মুৎপদ্যতে ? অথ কচিছুৎপদ্যত ইতি । কশ্চাত্ত বিশেষঃ ? ন তাবদে-
কৈকত্র যাবদ্বিষয়মুৎপদ্যতে, জ্ঞেয়ানামানন্ত্যাৎ । নাপি কচিছুৎপদ্যতে,
যত্র নোৎপদ্যতে, তত্রানিবৃত্তো মোহ ইতি মোহশেষপ্রসঙ্গঃ । ন চান্য-
বিষয়েণ তত্ত্বজ্ঞানেনান্যবিষয়ো মোহঃ শক্যঃ প্রতিষেদ্ধুমিতি ।

মিথ্যাজ্ঞানং বৈ খলু মোহো ন তত্ত্বজ্ঞানস্থানুৎপত্তিমাাত্রং, তচ্চ
মিথ্যাজ্ঞানং যত্র বিষয়ে প্রবর্তমানং সংসারবীজং ভবতি, স বিষয়স্তত্ত্বতো
জ্ঞেয় ইতি ।

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) যাবৎ বিষয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মা প্রভৃতি যতসংখ্যক
প্রমেয় আছে, সেই সমস্ত প্রমেয়ের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রমেয়েই কি (মুমুকুর) তত্ত্বজ্ঞান
উৎপন্ন হয়, অথবা কোন প্রমেয়বিশেষেই উৎপন্ন হয় ? (প্রশ্ন) এই উভয় পক্ষে
বিশেষ কি ? (উত্তর) যাবৎ বিষয়ের এক একটি বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান
উৎপন্ন হয় না । কারণ, জ্ঞেয় বিষয় অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় অসংখ্য । কোন
বিষয়েও অর্থাৎ যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদি বিষয়েও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়
না । (কারণ, তাহা হইলে) যে বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সেই বিষয়ে মোহ
নিবৃত্ত না হওয়ায় মোহের শेषাপত্তি হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ে মোহ থাকিয়া
যায় । কারণ, অপ্রতিষেদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান অপ্রতিষেদ্ধ মোহকে নিবৃত্ত করিতে পারে না ।

১। "তৈ" শব্দঃ খলু পূর্বপক্ষাক্ষরাদি, "খলু" শব্দো চেতুর্থো । অমুক্তঃ পূর্বপক্ষো যস্যামিথ্যাজ্ঞানং মোহ
ইতি ।—ভাৎসর্যটীকঃ ।

(উত্তর) পূর্বপক্ষ অযুক্ত, যে হেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তত্ত্বজ্ঞানের অমুৎপত্তি-মাত্র মোহ নহে। সেই মিথ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে প্রবর্তমান (উৎপাদ্যমান) হইয়া সংসারের কারণ হয়, সেই বিষয়ই তত্ত্বতঃ জ্ঞেয়, অর্থাৎ সেই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই তদ্বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মোক্ষের কারণ হয়।

টিপ্পনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে “সংশয়”, “প্রমাণ” ও “প্রমের” পদার্থ পরীক্ষিত হইয়াছে। “প্রয়োজন” প্রভৃতি অবশিষ্ট অপরিক্ষিত পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় হইলে ঐ সমস্ত পদার্থেরও পূর্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয় পরীক্ষার পরেই “যত্র সংশয়ঃ”—(১।১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে।^১ এখানে স্মরণ করা আবশ্যিক যে, শ্রীমদাশ্রমের সর্বপ্রথম সূত্রে যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় “প্রমের” পদার্থের অর্থাৎ আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমের-তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদক ও রক্ষক বলিয়া উহা মোক্ষলাভের পরম্পরা-কারণ বা প্রযোজক। মহর্ষি শ্রীমদাশ্রমের “দুঃখ-জন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তাঁহার ঐ তাৎপর্য বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে মহর্ষির যুক্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে “অপবর্গ” পদ্যন্ত প্রমের-পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন এই দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রারম্ভে মহর্ষির পরীক্ষণীয় এই যে, আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমের কথিত হইয়াছে, উহাদিগের প্রত্যেকের তত্ত্বজ্ঞানই কি মুমুক্শুর উৎপন্ন হয়, অথবা যে কোন প্রমের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞানই কি মোক্ষের কারণ, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ? ভাষ্যকার প্রথমে প্রশ্নরূপে এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিবার জন্য প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উভয় পক্ষে বিশেষ কি? অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ, এই উভয় পক্ষে

১। তাৎপর্যটীকাকার এখানে “যত্র সংশয়ঃ” ইত্যাদি সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষ্য ও বার্তিকের ব্যাখ্যানুসারে অন্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা জটীকা)। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম তাঁহার প্রথম সূত্রোক্ত “প্রয়োজন” প্রভৃতি অনেক পদার্থের পরীক্ষা করেন নাই। সংশয় হইলে ঐ সমস্ত পদার্থের পরীক্ষাও যে কর্তব্য, ইহা তাঁহার অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং তিনি যে, “যত্র সংশয়ঃ” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন এবং তাৎপর্যটীকাকারও তাঁহার নিজমতানুসারেই এখানে উক্ত সূত্রের ঐরূপই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা অশুভই বলা যায়। বৃত্তিকার বিবরণেও ঐ সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার ও বার্তিকার অন্ত কারণে অন্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সূত্র বহু অর্থের সূচনা থাকে, ইহা সূত্রের লক্ষণেও কথিত আছে। সুতরাং উক্ত বিবিধ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত সূত্রার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে আর কোন বক্তব্য থাকে না।

যদি কোন বিশেষ না থাকে অর্থাৎ ঐ উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষই যদি নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর পূর্বোক্ত বিচারের আবশ্যকতা থাকে না; কারণ, উহার যে কোন পক্ষই বলা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অবকাশই নাই। ভাষ্যকার এতদ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থনের জন্ত পরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞেয় বিষয় (আত্মাদি প্রত্যেক প্রমেয়) অনন্ত বা অসংখ্য। অর্থাৎ অনন্ত কালেও উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে, এ জন্ত উহা মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। আবার যে কোন আত্মাদি প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অত্যাশ্রয় যে সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে না, সেই সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে মোহের নিবৃত্তি বা বিনাশ না হওয়ায় মোহের শেষ থাকিয়া যাইবে। কোন এক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান তদভিন্ন বিষয়ে মোহ নিবৃত্ত করিতে পারে না। মোহ থাকিলে তন্মূলক রাগ ও দ্বেষও অবশ্যই জন্মিবে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষ থাকিলে জীবের সংসার অনিবার্য। সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব। ফলকথা, পূর্বোক্ত উভয় পক্ষই যখন উপপন্ন হয় না, সুতরাং প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞান বা প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞান যে মোক্ষের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত পূর্বপক্ষ।

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তত্ত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তি বা অভাব মোহ নহে, অতএব পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত। ভাষ্যে “বৈ” শব্দটি পূর্বপক্ষের অযুক্ততাদ্যোক্তক। “খলু” শব্দটি হেতু। ভাষ্যকারের উদ্ভরের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদি বিষয়ে অথবা যে কোন আত্মাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই মোহ নহে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান সে নিজের অভাবরূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়াই মোক্ষের কারণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের নিদান যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই মোহ। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিয়াই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়। ভাষ্যকার শেষে ইহা স্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন যে, সেই মিথ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া সংসারের নিদান হয়, সেই বিষয়ই যুমুকুর তত্ত্বতঃ জ্ঞেয়। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদি বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই তাহার সংসারের নিদান। সুতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে তাহার নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানই আবশ্যক। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান অনাবশ্যক। যাহা আবশ্যক, তাহা অসম্ভব নহে। শ্রবণ মননাদি উপায়ের দ্বারা পূর্বোক্ত সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যুমুকুর ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত। পরে ইহা পরিষ্কৃত হইবে।

প্রথম আঙ্কিকে প্রমেয় পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, আবার মহর্ষির এই দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রয়োজন কি? এতদ্বারা এখানে “তাৎপর্য্যপরিণতি” গ্রন্থে মহাত্মনৈয়ামিক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রমেয় পরীক্ষার পরে এই আঙ্কিকে সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষণীয়। অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কি? এবং উহার বিষয় কি? কিরূপে উহা উৎপন্ন হয়? কিরূপে উহা

পরিপালিত হয় ? কিৰূপে উহা বিবৰ্দ্ধিত হয় ? ইহা অবশ্য বক্তব্য। সূতরাং ঐৰূপে তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষাই এই আত্মিকের প্রয়োজন। “তাৎপর্য্যপরিপূৰ্ণ”র টীকায় বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় এখানে পূৰ্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ত্ৰায়দৰ্শনে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দিষ্টও হয় নাই, লক্ষিতও হয় নাই। সূতরাং মহৰ্ষি গৌতম তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে পারেন না। উদ্দেশ ও লক্ষণ ব্যতীত পরীক্ষা ইহাতে পারে না। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় আত্মিকের বিষয়-সাম্য না থাকিলে উহা এক অধ্যায়ের দুইটি অবয়ব বা অংশ ইহাতে পারে না। এতদ্বারা বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ত্ৰায়দৰ্শনের প্রথম সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সূত্রেই উহা লক্ষিত হইয়াছে। সূতরাং এই আত্মিকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা ইহাতে পারে। এবং এই অধ্যায়ের প্রথম আত্মিক কার্য্যরূপ ছয়টি প্রমেয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানও কার্য্যরূপই অর্থাৎ জ্ঞান পদার্থ, সূতরাং প্রথম আত্মিকের বিষয় ষট্ প্রমেয় এবং এই আত্মিকের বিষয় তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যরূপ সাম্যও আছে। তবে তত্ত্বজ্ঞান অপবৰ্গের কারণ বলিয়া অপবৰ্গের পরীক্ষার পূৰ্বেই উহার পরীক্ষা করা উচিত, এইরূপ আপত্তি ইহাতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষার পূৰ্বে যে সকল প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, সেই অপবৰ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রমেয়েরই পরীক্ষা কর্তব্য, নাচেং সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা ইহাতে পারে না। তাই মহৰ্ষি প্রমেয়পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছেন।

ভাষ্য। কিং পুনস্তন্মিথ্যাজ্ঞানং ? অনাত্মান্যাত্মগ্রহঃ—অহমস্মীতি মোহোহহঙ্কার ইতি, অনাত্মানং খল্বহমস্মীতি পশ্যতো দৃষ্টিরহঙ্কার ইতি। কিং পুনস্তদর্থজাতং, যদ্বিষয়োহহঙ্কারঃ ? শরীরেন্দ্রিয়-মনোবেদনা-বুদ্ধয়ঃ।

কথং তদ্বিষয়োহহঙ্কারঃ সংসারবীজং ভবতি ? অয়ং খলু শরীরাদ্যর্থ-জাতমহমস্মীতি ব্যবসিত'স্তদুচ্ছেদেনাত্মোচ্ছেদং মন্যমানোহনুচ্ছেদ-তৃষ্ণাপরিপ্লুতঃ পুনঃ পুনস্তদুপাদত্তে, তদুপাদদানো জন্মমরণায় যততে, তেনাবিযোগান্নাত্যস্তং দুঃখাদ্বিমুচ্যত ইতি।

যস্ত দুঃখং দুখায়তনং দুঃখানুষক্তং সূখঞ্চ সৰ্ব্বমিদং দুঃখমিতি পশ্যতি, স দুঃখং পরিজানাতি। পরিজ্ঞাতঞ্চ দুঃখং প্রহীণং ভবত্যানুপাদানং সবিষায়বৎ। এবং দোষান্ কস্ম চ দুঃখহেতুরিতি পশ্যতি। ন চাপ্রহীণেষু দোষেষু দুঃখপ্রবন্ধোচ্ছেদেন শক্যং ভবিতুমিতি দোষান্ জহাতি। প্রহীণেষু চ দোষেষু “ন প্রবৃতিঃ প্রতিসন্ধানায়ৈ”তুক্তং।

১। এখানে নিশ্চয়ার্থক “ব” ও “অ” পূর্বক “সো” ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে “ত” প্রত্যয়ে “বাবাসত” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জ্ঞানার্থ ধাতু ও গত্যর্থ ধাতুর মধ্যে পরিগৃহীত হওয়ার এখানে কর্তৃবাচ্যে ত প্রত্যয় নিপ্প্রমাণ বটে। তৎকালের উক্ত প্রয়োগও উহার সমর্থক।

প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখানি চ জ্ঞেয়ানি ব্যবস্থাপয়তি, কৰ্ম্মচ
দোষাংশ্চ প্রহেয়ান্ ।

অপবর্গোহধিগন্তব্যস্তথাধিগমোপায়স্তত্ব-জ্ঞানং ।

এবং চতস্রভির্বিধাভিঃ প্রমেয়ং বিভক্তমাসেবমানস্তাত্ত্ব্যস্ততো ভাব-
য়তঃ সম্যগ্দর্শনং যথাভূতাববোধস্তত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে ।

অনুবাদ । (প্রশ্ন) সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞান কি ? (উত্তর) অনাত্মাতে
আত্মবুদ্ধি । বিশদার্থ এই যে, “আমি হই” এইরূপ মোহ অহঙ্কার, (অর্থাৎ)
অনাত্মাকে (দেহাদিকে) “আমি হই” এইরূপ দর্শনকারী জীবের দৃষ্টি অহঙ্কার, অর্থাৎ
ঐ অহঙ্কারই মিথ্যাজ্ঞান ।

(প্রশ্ন) যদ্বিষয়ক অহঙ্কার, সেই পদার্থসমূহ কি ? (উত্তর) শরীর, ইন্দ্রিয়,
মন, বেদনা ও বুদ্ধি ।

(প্রশ্ন) তদ্বিষয়ক অহঙ্কার সংসারের বীজ হয় কেন ? (উত্তর) যেহেতু এই
জীব শরীরাদি পদার্থসমূহকে “আমি হই” এইরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট হইয়া সেই
শরীরাদির উচ্ছেদপ্রযুক্ত আত্মার উচ্ছেদ মনে করিয়া অনুচ্ছেদতৃষ্ণায় অর্থাৎ
শরীরাদির চিরস্থিতি-বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই শরীরাদিকে গ্রহণ করে,
তাহা গ্রহণ করিয়া জন্ম ও মরণের নিমিত্ত যত্ন করে, সেই শরীরাদির সহিত অবিয়োগ-
বশতঃ দুঃখ হইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হয় না ।

কিন্তু যিনি দুঃখকে এবং দুঃখের আয়তনকে অর্থাৎ শরীরকে এবং দুঃখানুযুক্ত
সুখকে “এই সমস্তই দুঃখ”, এইরূপে দর্শন করেন, তিনি দুঃখকে সর্বতোভাবে
জানেন । এবং পরিজ্ঞাত দুঃখ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় অগ্রহণবশতঃ “প্রহীণ”
অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয় । এইরূপ তিনি দোষসমূহ ও কৰ্ম্মকে দুঃখের হেতু, এইরূপে
দর্শন করেন । দোষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে দুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতে পারে
না, এ জন্য দোষসমূহকে ত্যাগ করেন । দোষসমূহ (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) পরিত্যক্ত
হইলে “প্রবৃদ্ধি (কৰ্ম্ম) প্রতিসন্ধানের অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিমিত্ত হয় না”—ইহা
(প্রথম আহ্নিকের ৬৩ম সূত্রে) উক্ত হইয়াছে ।

(অতএব যুমুক্ষু কর্তৃক) প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখও জ্ঞেয় বলিয়া (মহর্ষি)
ব্যবস্থাপন করিয়াছেন এবং কৰ্ম্ম ও প্রকৃষ্টরূপে হেয় দোষসমূহও জ্ঞেয় বলিয়া

ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অপবর্গ (মুমুকুর) অধিগম্য (লভ্য), তাহার লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান।

এইরূপ চারিটি প্রকারে বিভক্ত প্রমেয়কে অর্থাৎ পূর্বোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে সম্যকরূপে সেবাকারী (অর্থাৎ) অভ্যাসকারী বা ভাবনাকারী মুমুকুর সম্যক দর্শন (অর্থাৎ) যথাভূতাববোধ বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্বে যে মিথ্যাজ্ঞানকে মোহ বলিয়া জীবের সংসারের নিদান বলিয়াছেন, ঐ মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে এবং উহার বিরুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকায় ভাষ্যকার পরে নিজমত ব্যক্ত করিতে প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সেই মিথ্যাজ্ঞান কি? তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে যথাক্রমে বৈদান্তিক, সাঙ্খ্য ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সম্মত তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া শেষে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ইহাতে ভিন্ন নিত্য আত্মার দর্শনকেই “বুদ্ধ”গণ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে ত্রায়নতের ব্যাখ্যায় তাহার পূর্বোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া ভাষ্যকারোক্ত ত্রায়নতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ মতকেই তিনি বুদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে নিজমত বলিয়াছেন যে, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যাজ্ঞান। পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনাত্মা দেহাদি পদার্থে “আমি” বলিয়া যে মোহ, উহা অহঙ্কার। পরে উহাই বুঝাইতে আবার বলিয়াছেন যে, জীব অনাত্মা দেহাদি পদার্থকে “আমি” বলিয়া যে দর্শন করিতেছে, অর্থাৎ দেহাদি জড় পদার্থকেই আত্মা বলিয়া যে মানস প্রত্যক্ষ করিতেছে, উহাই তাহার অহঙ্কার, উহাই মোহ, উহাই মিথ্যাজ্ঞান।

ভাষ্যকার এখানে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ পদার্থ বিষয়ে অহঙ্কারকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া জীবের সংসারের কারণ বলিয়াছেন, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ত পরে প্রশ্নপূর্বক বলিয়াছেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধি। ভাষ্যকার প্রভৃতি সূত্র ও ছুঃখকে অনেক স্থানে “বেদনা” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। এখানেও ভাষ্যকারোক্ত “বেদনা” শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ জীবমাত্রই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন লাভ করিলে বুদ্ধি এবং সূত্র ও ছুঃখ লাভ করে। তখন ইহাতে ঐ শরীরাদি সমষ্টিকেই “আমি” বলিয়া বোধ করে। শরীরাদি ঐ সমস্ত পদার্থে তাহার যে ঐ আত্মবুদ্ধি, উহাই তাহার অহঙ্কার। ঐ অহঙ্কার তাহার সংসারের কারণ কেন হয়? ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে আবার প্রশ্নপূর্বক বলিয়াছেন যে, জীব, শরীরাদি পূর্বোক্ত পদার্থগুলিকেই “আমি” বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, ঐ শরীরাদির উচ্ছেদকেই আত্মার উচ্ছেদ বলিয়া মনে করে। আত্মার উচ্ছেদ কাহারও কাম্য নহে, পরন্তু উহা সকল জীবেরই বিকিষ্ট। সুতরাং পূর্বোক্ত শরীরাদি পদার্থের কখনও উচ্ছেদ না হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় আকুল ইহা জীবমাত্রই পুনঃ পুনঃ ঐ শরীরাদি গ্রহণ করে। সুতরাং জীবমাত্রই তাহার জন্ম ও মরণের জন্ত নিজেরই যত্ন করে। তাই পূর্বোক্ত কারণ থাকিলে তাহার ঐ শরীরাদির সহিত বিয়োগ বা বিচ্ছেদ না হওয়ায় তাহার আত্মাত্মিক ছুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, জীব-

মাত্রই তাহার শরীরাদি পদার্থকেই “আমি” বলিয়া বুঝে। অনাদি কাল হইতে তাহার ঐ শরীরাদি পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারবশতঃই নানাবিধ কৰ্মজন্ম পুনঃ পুনঃ শরীরাদি পরিগ্রহরূপ সংসার হয়। সুতরাং জীবমাত্রই পূর্বোক্তরূপ অহঙ্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ কৰ্ম দ্বারা তাহার নিজের জন্ম ও মরণের কারণ হওয়ায় পূর্বোক্তরূপ অহঙ্কার তাহার সংসারের কারণ হয়। উক্ত অহঙ্কারের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত উহার উচ্ছেদ না হওয়ায় জীবের সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে না। এই বিষয় ত্রায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যটিপ্পনীতে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

পূর্বোক্তরূপ অহঙ্কারবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানশূন্য জীবের সংসার হয়, ইহা প্রথমে বলিয়া, পরে অহঙ্কারশূন্য তত্ত্বজ্ঞানীর ঐ সংসার নিবৃত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার “বস্তু” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যিনি হুঃখ এবং হুঃখের আয়তন নিজ শরীর ও সুখকে হুঃখ বলিয়া দর্শন করেন, তিনি হুঃখের তত্ত্ব বুঝিয়া, ঐ সমস্ত পদার্থকে বিষমিশ্রিত অম্মের ত্রায় পরিত্যাগ করেন। এইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহ এবং শুভাশুভ কৰ্ম্মকে হুঃখের হেতু বলিয়া দর্শন করেন। পূর্বোক্ত দোষসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে জীবের হুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতেই পারে না—এ জন্ম তিনি ঐ দোষসমূহকে পরিত্যাগ করেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ বিনষ্ট হইলে তখন তাহার শুভাশুভ কৰ্ম্ম তাহার পুনর্জন্মের কারণ হয় না, ইহা মহর্ষি পূর্বোই বলিয়াছেন। সুতরাং সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সংসারনিবৃত্তি হওয়ায় তাহার অপবর্গ অবশ্যস্বাবী।

ভাষ্যকার পূর্বে মোহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্মই শুভাশুভ কৰ্ম্মরূপ “প্রবৃত্তি” এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ “দোষ” এবং “প্রত্যভাব” “ফল” ও “হুঃখ” ও মুমুক্শুর জ্ঞেয় বলিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থও মুমুক্শুর অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রমোদবর্গের মধ্যে উহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং সর্বশেষে অপবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, অপবর্গই মুমুক্শুর অধিগন্তব্য অর্থাৎ চরম লভ্য। অপবর্গের জন্মই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। কারণ, ঐ অপবর্গ লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানলভ্য অপবর্গও মুমুক্শুর জ্ঞেয়। অপবর্গলাভে অপবর্গের তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যক। সুতরাং অপবর্গও প্রমোদমধ্যে উদ্ভিষ্ট এবং লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১ম সূত্রে) (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্গ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রত্যভাব, (১০) ফল, (১১) হুঃখ ও (১২) অপবর্গ—এই দ্বাদশ পদার্থকে “প্রমোদ” বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঐ দ্বাদশবিধ প্রমোদ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা তাঁহার “হুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার ত্রায়দর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যও প্রথমে ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন কিরূপে সেই প্রমোদ-তত্ত্বজ্ঞানের উপপত্তি হইবে, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, চারিটি প্রকারে বিভক্ত পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রমোদকে সম্যকরূপে সেবা করিতে করিতে অর্গাৎ উহাদিগের অভ্যাস বা উহাদিগের যথার্থ স্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে

“সম্যাকদর্শন” উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়। উহাকেই বলে “মথাভূতাববোধ”, উহাকেই বলে “তত্ত্বজ্ঞান”। ভাষ্যকার ঐ স্থলে বিশদবোধের জন্তই ঐরূপ একার্থ-বোধক শব্দত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্বোক্ত সেবা, অভ্যাস ও ভাবনা একই পদার্থ হইলেও পূর্বোক্ত প্রমেয় পদার্থবিষয়ে মুমুক্শুর সুদৃঢ় ভাবনার উপদেশের জন্তই ঐরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়-বিষয়ে নানা-প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানকেই সেই সমস্ত প্রমেয়-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং উহার বিপরীত জ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থকে যে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন, ঐ চারিটি প্রকার কি? ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত সন্দর্ভানুসারে কেহ বুঝিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত অহঙ্কারের বিষয় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ই তাঁহার অভিপ্রেত প্রথম প্রকার। প্রেতাভাব, ফল ও হুংখরূপ প্রমেয় “জ্ঞেয়”, উহা দ্বিতীয় প্রকার। কর্ম ও দোষরূপ প্রমেয় “হেয়”, উহা তৃতীয় প্রকার। অপবর্গ “অধিগন্তব্য”, উহা চতুর্থ প্রকার। ইহাতে বক্তব্য এই যে, আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ই ত মুমুক্শুর জ্ঞেয়, সুতরাং কেবল প্রেতাভাব, ফল ও হুংখ, এই তিনটি প্রমেয়কে ভাষ্যকার “জ্ঞেয়” বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না। এবং হুংখ ও হুংখের হেতু সমস্ত প্রমেয়ই যখন “হেয়”, তখন তিনি কেবল কর্ম ও দোষরূপ প্রমেয়কে “হেয়” বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন না। পরন্তু ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদনা ও বুদ্ধির মধ্যে প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চতুর্থ প্রমেয় ইন্দ্রিয়ার্থ নাই। সুতরাং আত্মা ও ইন্দ্রিয়ার্থ পূর্বকথিত কোন প্রকারের অন্তর্গত না হওয়ায় আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে পূর্বোক্তরূপ চারি প্রকার বলিয়া বুঝা যায় না, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

আমাদিগের মনে হয়, ভাষ্যকার আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে (১) হেয়, (২) অধিগন্তব্য, (৩) উপায় ও (৪) অধিগন্তা, এই চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন। আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে শরীর হইতে হুংখ পর্য্যন্ত দশটি প্রমেয় “হেয়”। হুংখের স্থায় হুংখের হেতুগুলিও হেয়, তাই ভাষ্যকার ঐ দশটি প্রমেয়কেই (১) “হেয়” বলিয়া একটি প্রকার বলিয়াছেন। হেয় ও হেয়হেতু, এই উভয়ই হেয়। ভাষ্যকার হুংখের স্থায় এখানে রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহকেও “প্রাহেয়” বলিয়াছেন, এবং পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যে শরীর হইতে হুংখ পর্য্যন্ত দশটি প্রমেয়কেই ঐ দোষের হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং হেয় ও উহার হেতু বলিয়া তাঁহার মতে শরীরাদি দশটি প্রমেয়ই “হেয়” নামক প্রথম প্রকার, ইহা বুঝা যায়। তাহার পরে চরম প্রমেয় অপবর্গ, “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ মুমুক্শুর লভ্য, উহা হেয় নহে, এই জন্ত উহাকে (২) “অধিগন্তব্য” নামে দ্বিতীয় প্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত শরীরাদি দশবিধ প্রমেয়ের অন্তর্গত যে বুদ্ধি, উহার মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই হেয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে বুদ্ধি, তাহা ত হেয় নহে, উহা পূর্বোক্ত অপবর্গলাভের উপায়—এই জন্ত পৃথক করিয়া ঐ তত্ত্বজ্ঞানরূপ

বুদ্ধিকেই (৩) “উপায়” নাম তৃতীয় প্রকার প্রণয় বলিয়াছেন। সর্বপ্রথম প্রণয় আত্মা, তিনি ঐ তত্ত্বজ্ঞানরূপ উপায় লাভ করিলে তাঁহার অধিগন্তব্য অপবর্গ লাভ করিবেন। সুতরাং তিনি “হেয়”, “অধিগন্তব্য”ও “উপায়” ইহাতে পৃথক্ প্রকার প্রণয়। তিনি “হেয়”ও নহেন, “অধিগন্তব্য”ও নহেন, “উপায়”ও নহেন। তিনি “অধিগন্তব্য”, সুতরাং তাঁহাকে ঐ নামে অথবা ঐরূপ অথ কোন নামে চতুর্থ প্রকার প্রণয় বলিতে হইবে। পূর্বোক্তরূপ চতুর্বিধ প্রণয়ের তত্ত্বজ্ঞানই মুমুক্শুর আবশ্যক। কারণ, মুক্তিলাভ করিতে হইলে আমার হেয় ও লভ্য কি এবং তাহার লাভের উপায় কি, এবং আমি কে? ইহা যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে। হেয় ও লভ্য কি, তাহা যথার্থরূপে না বুঝিলে উহার ভাগ ও লাভের উপায়ের জ্ঞান প্রাপ্ত ও সকল হয় না এবং সেই উপায় কি, তাহাও যথার্থরূপে না বুঝিলে তত্ত্বজ্ঞান যথার্থ প্রবৃত্তি হইতেও পারে না। এবং সেই ভাগ ও লাভের কর্তা কে? অধিগন্তব্য বা পরমপুরুষার্গ মোক্ষ কাহার হইবে? তাহার স্বরূপ কি? ইহাও যথার্থরূপে না বুঝিলে সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না। অতএব যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ সকল বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংস করিয়া মুমুক্শুর মুক্তির সাঙ্গাৎ কারণ হয়, ঐ সবস্তু পদার্থই প্রণয় নামে কথিত হইয়াছে। আত্মাদি অপবর্গ পর্যন্ত সেই দ্বাদশবিধ প্রণয় পূর্বোক্ত চারি প্রকারে বিভক্ত।

এখানে স্মরণ করা অত্যাবশ্যক যে, ভাষ্যকার প্রথমসূত্রভাষ্যে আত্মাদি প্রণয়বর্গেরই তত্ত্বজ্ঞান-জ্ঞান মোক্ষলাভ হয়, ইহা বলিয়া উহা সমর্থন করিবার জ্ঞান পরে বলিয়াছেন যে,—“হেয়ং তত্ত্ব নির্বর্তকং, হাননাত্যন্তিকং, ততোপায়োহধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্যর্থপদানি সমাগ্ৰবুদ্ধা নিঃশ্রেয়স-মধিগচ্ছতি” (প্রথম খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য)। সেখানে বার্তিককারের ব্যাখ্যানুসারেই ভাষ্যকারোক্ত চারিটি “অর্থপদ”র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও তাৎপর্য্যপরি-
শুদ্ধিকার উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও ঐ ব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেখানে বার্তিককার যে ভাষ্যকারোক্ত “হান” শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ

১। তচ্চৈতত্ত্বজ্ঞানং ত্রাণনুগত ইতি ভাষ্যং। হেয়হানোপায়াদিগন্তব্যভেদাচ্চত্বার্যর্থপদানি সমাগ্ৰবুদ্ধা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি। “হেয়ং” হুঃখং, “এত” নির্বর্তকং”মবিদ্যাত্মকং ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি। “হানং” তত্ত্বজ্ঞানং, “ততোপায়ঃ” শাস্ত্রং। “অধিগন্তব্যোঃ” মোক্ষঃ। এতানি চত্বার্যর্থপদানি সর্বাস্বাভ্যাসবিদ্যাঃ সর্বাচার্য্যৈর্গীত্ব ইতি। —আর্য্যবার্ত্তিক।

নিঃশ্রেয়সহেতুভাব সিদ্ধানন্ত “হানু” পশ্চৎ উদ্যতে “অনুগতে”। তত্ত্বজ্ঞানোপাদেহি সাঙ্গাৎ ওষিষ-
মিথ্যাজ্ঞানানি নিবৃত্তিক্রমেণ অপবর্গেণ পাদ ইতি দ্বিতীয়সূত্রোক্তানুগতে। তদন্তঃসং “তচ্চৈতত্ত্বজ্ঞানং” ইত্যাদি “ধিগচ্ছতি”-
তত্ত্বমনুষ্য বাচ্যে “হেয়ং”মিতি। মিথ্যাজ্ঞানমাত্মাদিষু প্রময়েষু অবিদ্যা। তন্মূলং তুলা। উল্লঙ্ঘনকৈতৎ—
দেবৈ পি দৃষ্টব্যঃ। তন্মূলো চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। তদেতচ্ছ্রেয়ঃ।

“হানং তত্ত্বজ্ঞানং”, ইহাতে হানন তৎসর্কঃ। তত্ত্ব প্রমাণোপায়ঃ শাস্ত্রং, অধিগন্তব্যো মোক্ষঃ। এবমবহবান্
বিভজ্য তাৎপর্য্যমাহ “এতানী”তি। এতানি চত্বার্যর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি। ন কেবলং হেয়াধিগন্তব্যানিভেদেন
ষাণশবিধঃ প্রময়েঃ ধর্ম্মরতন্ত্ববিষয়তত্ত্বজ্ঞানায় চ লোপকরণস্বাভিধানপ্রমাণব্যাংপাদনং সূত্রকরণস্য সম্যক্তমপিতু
সর্বকামসেবাভ্যাসবিদ্যাচার্য্যাদিগামিতি তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ। —তাৎপর্য্যটীকা। [শেষ অংশ পরপৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য]

তত্ত্বজ্ঞানকে বলিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানসাধন প্রমাণ, এবং ঐ প্রমাণের উপায় বলিয়াছেন শাস্ত্র । তাৎপর্য্যপরিপূর্ণকিঞ্চিৎ উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ বলিয়া গিয়াছেন । কিন্তু বার্তিককার প্রভৃতির উক্তরূপ ব্যাখ্যায় যে কষ্টকল্পনা আছে এবং নানা কারণে ঐরূপ ব্যাখ্যা যে সকলে গ্রহণ করিবেন না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । কারণ, ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, (১) হেয়, (২) হেয়হেতু, (৩) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ হেয় ছাংখ্যের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি এবং উহার জন্য অধিগন্তব্য বা লভ্য (৪) “উপায়” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, এই চারিটি অর্থপদের সম্যক বুঝিলে মোক্ষ লাভ করে । “হেয়” বলিয়া পরে “আত্যন্তিক হান” বলিলে যে, উহার দ্বারা পূর্বোক্ত হেয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সরলভাবে বুঝা যায় এবং পরে উহার “উপায়” বলিলে উহার দ্বারা যে, পূর্বোক্ত আত্যন্তিক ছাংখ্যনিবৃত্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞানই সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য । পরন্তু সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রেই সমস্ত আচার্য্যই যে, পূর্বোক্ত চারিটি অর্থপদ বলিয়াছেন, ইহা বার্তিককারও পূর্বোক্ত স্থলে বলিয়া গিয়াছেন । কিন্তু অগ্ন্যাত্ম অধ্যাত্মবিদ্যাত্ম যে বার্তিককারের ব্যাখ্যাত চারিটি অর্থপদই কথিত হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না । সাংখ্যাচার্য্য দিঙ্কানভিষ্ণু সাংখ্যপ্রচলনভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই মোক্ষশাস্ত্র (সাংখ্যশাস্ত্র) চিবিৎসাশাস্ত্রের স্থায় চতুর্বাহ । যেমন বোম্ব, অগ্নোগ্য, বোম্বের নিদান ও ঔষধ, এই চারিটি বাহ বা সমূহ চিবিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তদ্রূপ হেয়, হান এবং হেয়হেতু ও হানোপায়, এই চারিটি বাহ মোক্ষশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য । কারণ, ঐ চারিটি মুমুক্ষুদিগের জিজ্ঞাসিত । তন্মধ্যে ত্রিবিধ ছাংখ্য (১) হেয় । উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই (২) হান । অবিবেক বা অবিদ্যা (৩) হেয়হেতু । বিবেকখ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞানই (৪) হানোপায় । বৌদ্ধাদিশাস্ত্রেও পূর্বোক্ত হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়, এই চতুর্বাহইব উল্লেখ দেখা যায় । অগ্ন্যাত্ম আচার্য্যগণও আত্যন্তিক ছাংখ্যনিবৃত্তিকেই “হান” বলিয়াছেন, এবং তত্ত্বজ্ঞানকেই উহার “উপায়” বলিয়াছেন । বার্তিককার উদ্ভ্যোতকের স্থায় আর কেহ যে, “হানং তত্ত্বজ্ঞানং, তত্ত্বোপায়ঃ শাস্ত্রঃ” এইরূপ কথা বলিয়াছেন এবং বাচস্পতি মিশ্রের স্থায় আর কেহ যে, অর্থপদের ব্যাখ্যা করিতে “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দের প্রমাণ অর্থ বলিয়াছেন, ইহা দেখা যায় না । অবশ্য উদ্ভ্যোতক “উপায়” শব্দ দ্বারা শাস্ত্রকেই গ্রহণ করার তজ্জ্ঞ ও বাচস্পতি মিশ্র “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা “তত্ত্ব জ্ঞানোপায়েন” এইরূপ প্রাপ্তি অল্পসংরে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায় । কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণ শাস্ত্রেই উপদিষ্ট হওয়ায় শাস্ত্রকেই উহার উপায় বলা যায় । কিন্তু উদ্ভ্যোতক ভাষ্যকারোক্ত চারিটি অর্থপদের ব্যাখ্যা করিতে “হানং তত্ত্বজ্ঞানং” এই কথা লিখিয়াছেন কেন ? এবং বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহাননীযিগণই বা উহার সমর্থন করিয়াছেন কেন ? ইহা প্রণিধানপূর্বক বুঝা আবশ্যক ।

নহু “হান”পদমাত্তান্ত্রিকপদসমভিহারাদপবর্গে বর্ত্তিত, তৎ কথং তত্ত্বজ্ঞানমুচ্যত ইত্যত আহ “হীয়েতে হী”তি । করণপূর্ণপরিমাণিত্ত্বজ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানং বিস্মিতং । ভাববুৎপত্তা তু আত্যন্তিকপদসমভিহারাদপবর্গ ইত্যর্থঃ । তাৎপর্য্যপরিপূর্ণকি । (এশিয়াটিক সোসাইটি চর্চিতে মুদ্রিত “তাৎপর্য্যপরিপূর্ণকি” ২৩৭—২৪০ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য) ।

আমরা বুঝিয়াছি যে, ভাষ্যকার এখানে পূর্নোক্ত ভাষ্যে “অপবর্গোহিগন্তব্যঃ” এই কথা বলায় তিনি প্রথম সূত্রভাষ্যেও চারিটি অর্থপদ বলিতে পূর্নোক্ত সন্দর্ভে সর্বশেষে “অবিগন্তব্য” শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম সূত্রেও “নিঃশ্রয়স” শব্দের পরে “অধিগম” শব্দের প্রয়োগ থাকায় নিঃশ্রয়স বা অপবর্গই যে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। উদ্যোতকর প্রকৃতিও ভাষ্যোক্ত “অধিগন্তব্য” শব্দের অর্থ বোঝানরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। এখন যদি ভাষ্যকারোক্ত অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা অপবর্গই বৃত্তিতে হয়, তাহা হইলে আর সেখানে ভাষ্যকারোক্ত “হান” শব্দের দ্বারা অপবর্গ বুঝা যায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ভাষ্যকারের “আত্যস্তিকং হানং” এই কথার দ্বারা বদ্বারা আত্যস্তিক ছুৎপেনিহিত হয়, এইরূপ অর্থে তদ্বজ্ঞানই বৃত্তিতে হয়। এই জন্যই উদ্যোতকর সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“হানং তদ্বজ্ঞানং”। বাচস্পতি নিশা আবার ঐ তদ্বজ্ঞান শব্দের অর্থ বদ্বিয়াছেন প্রমাণ। অদৃষ্ট তাঁহার ঐরূপ ব্যাখ্যার কারণ থাকিলেও উহা সর্বসম্মত হইতে পারে না। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্নোক্ত সূত্রে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই চতুর্থ অর্থপদ বলিয়া প্রকাশ করিলে তাঁহার পূর্নোক্ত ‘হান’ শব্দের দ্বারা অর্থ অর্থই যে বৃত্তিতে হইবে, ইহা স্বীকার্য। ভাষ্যকারের পূর্নোক্ত “তত্ত্বাপায়ঃ অধিগন্তব্য ইত্যোতানি চত্বার্ব্যর্থপদানি” এই সন্দর্ভে অধিগন্তব্য শব্দটি উপায়ের বিশেষণ মাত্র, উহা অপবর্গ বোধের জন্য প্রযুক্ত হয় নাই, উহার পূর্ন “হানমাত্যস্তিকং” এই কথার দ্বারাই তৃতীয় অর্থপদ অপবর্গ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ “অধিগন্তব্য” শব্দটি ব্যর্থবিশেষণ হয়। ভাষ্যকার ঐ স্থলে আর কোন অর্থপদেরই ঐরূপ কোন অনাবশ্যক বিশেষণ করেন নাই, পরন্তু চারিটি অর্থপদ বলিতে সর্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও প্রণিধানপূর্বক চিন্তা করা আবশ্যক। এবং এখানে পূর্নোক্ত ভাষ্যে “অপবর্গোহিগন্তব্যঃ” এই কথার দ্বারা অপবর্গকেই যে তিনি অধিগন্তব্য বদ্বিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। এখানে পবে ঐ অপবর্গ নামেরই উপায় বলিতে শেষে বদ্বিয়াছেন, “তদধিগমোপায়স্তদ্বজ্ঞানং”। কিন্তু প্রথম সূত্রভাষ্যে পূর্নোক্ত সন্দর্ভে “তত্ত্বাপায়ঃ” এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার পূর্নোক্ত আত্যস্তিক হানেরই উপায় বলিয়া সর্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের দ্বারা চতুর্থ অর্থপদ অপবর্গই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার ঐ স্থলে সর্বশেষে অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়া “ইত্যোতানি চত্বার্ব্যর্থপদানি” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় তাহার শেযোক্ত অধিগন্তব্যই যে তাঁহার বিবক্ষিত চতুর্থ অর্থপদ, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকার যে তাঁহার কথিত উপায়েরই বিশেষণমাত্র বোধের জন্য শেষে ঐ অধিগন্তব্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। ঐ স্থলে ঐরূপ বিশেষণ-প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন নাই। পূর্নোক্তরূপ চিন্তা করিয়াই বার্তিককার পূর্নোক্ত স্থলে ভাষ্যকারোক্ত “হান” শব্দের দ্বারা তদ্বজ্ঞানই বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন “হানং তদ্বজ্ঞানং” এবং তিনি ভাষ্যকারোক্ত “হেয়ং তস্মৈ নিকর্ষকং” এই বাক্যের দ্বারা হেয় ছুৎ এবং উহার জনক বা হেয়হেতু শরীরাদিকেও হেয় বদ্বিয়াই গ্রহণ করিয়া প্রথম অর্থপদ বদ্বিয়াছেন। হেয় ও হেয়হেতুকে পৃথকভাবে দুইটি অর্থপদ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারোক্ত চারিটি অর্থপদের সংগতি হয় না, তাহা হইলে শেযোক্ত অপবর্গকে

গ্রহণ করিয়া অর্থপদ পাঁচটি হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। তাই বার্তিককার ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,—“হেদ্বহানোপায়াধিগন্তব্যভেদাচ্চত্বাৰ্থ্যর্থপদানি”। পরে লিখিয়াছেন,—“এতানি চত্বাৰ্থ্যর্থপদানি সৰ্ব্বাস্বধ্যাত্মবিদ্যাসু সৰ্ব্বাচার্য্যৈৰ্ব্যন্তে”। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি”। “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন, “পদ” শব্দের অর্থ স্থান। পুরুষের যাহা প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরুষার্থ। পরমপুরুষার্থ মোক্ষ পূর্বোক্ত হেয় প্রভৃতি চারিটিতে অবস্থিত। কারণ, ঐ চারিটির তত্ত্বজ্ঞান মুমুক্শুর সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান ধ্বংস করিয়া মোক্ষের কারণ হয়। তাই ঐ চারিটিকে “অর্থপদ” বা পুরুষার্থস্থান বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ স্থলে বার্তিককারের শেষ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, হেয় ও অধিগন্তব্যাদিভেদে দ্বাদশবিধ প্রমের প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই প্রমেরবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত শাস্ত্র ত্রায়কথন ও প্রমাণ ব্যুৎপাদন যে কেবল মহর্ষি গোতমেরই সম্মত, তাহা নহে। কিন্তু সমস্ত অধ্যাত্মবিৎ আচার্য্যগণেরই সম্মত, ইহাই পূর্বোক্ত বার্তিক সন্দর্ভের তাৎপর্য্য। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি পূর্বে যে চারিটি অর্থপদ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে গোতমোক্ত শরীরাদি একাদশ প্রমেরও আছে। শরীরাদি দশটি প্রমের (১) হেয় এবং চরম প্রমের অপবর্গ (৪) অধিগন্তব্য। প্রণা প্রমের আত্মা ও চরম প্রমের অপবর্গ উপাদেয়। সুতরাং হেয় ও উপাদেয় ভেদে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেরকে দুই প্রকারও বলা যায়। আবার হেয়, অধিগন্তব্য, উপায় ও অধিগন্ত্য, এই চারি প্রকারও বলা যায়। পূর্বোক্ত তাৎপর্য্যটীকাসন্দর্ভে “হেয়াধিগন্তব্যাদিভেদেন” এইরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হয়। তাহা হইলে তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্বোক্ত ভাষ্যকুণ্ডারে দ্বাদশ প্রমেরকে চতুর্বিধই বলিয়াছেন বুঝা যায়। কেবল হেয় ও অধিগন্তব্য বলিলে শরীরাদি একাদশ প্রমেরের দুইটি প্রকারই বুঝা যায়। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ বুদ্ধি ও প্রথম প্রমের আত্মা না থাকার আরও দুইটি প্রকার বলিতে হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে, এখানে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেরকে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন, তাহারও উপপত্তি হয়। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বে যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেরকেই চারিটি অর্থপদ বলিয়া সেখানেও প্রমেরের পূর্বোক্ত চারিটি প্রকারই বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু বার্তিককার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে উহা বুঝিবার বাধকও আছে। কারণ, সেখানে বার্তিককার “উপায়” শব্দের দ্বারা শাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার সেখানে বার্তিককারোক্ত ‘তত্ত্বজ্ঞান’ শব্দের দ্বারা প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ প্রমাণ ও শাস্ত্র প্রমেরবিভাগে বিবক্ষিত নহে। পরন্তু প্রথম প্রমের আত্মা পূর্বোক্ত চারিটি অর্থপদের মধ্যে নাই। সুতরাং পূর্বে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেরকেই যে চারিটি “অর্থপদ” বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত চারিটি অর্থপদের মধ্যে শরীরাদি একাদশ প্রমের থাকায় ঐ সমস্ত প্রমেরের তত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ, ইহাও ঐ কথার দ্বারা বলা হইয়াছে। সেখানে ভাষ্যকারের উহাই প্রধান বক্তব্য। আত্মার তত্ত্বজ্ঞান যে মুক্তির কারণ, ইহা সর্বসম্মত। আত্মার ত্রায় শরীরাদি একাদশ প্রমেরের তত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ এবং ত্রায়দর্শনের দ্বিতীয় স্তরের দ্বারাই যে, উহাও অনুদিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন

করিতেই ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে “হেয়ং” ইত্যাদি পূর্বোক্ত সন্দর্ভ বলিয়াছেন। বার্তিককার উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে শেষে যে, উক্ত চারিটী অর্থপদ সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যায় সমস্ত আচার্য্য কর্তৃক বর্ণিত, ইহা বলিয়াছেন, তাহাও অসত্য নহে। কারণ, সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রেই হেয় ও অবিগন্তব্য বর্ণিত হইয়াছে এবং তত্ত্বজ্ঞান ও উহার উপায় শাস্ত্রও বর্ণিত হইয়াছে। মোক্ষশাস্ত্রের আচার্য্য দার্শনিক ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই “হেয়” প্রভৃতি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে শাস্ত্রও অর্থপদের মধ্যে গণ্য। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্বোক্ত বার্তিক-সন্দর্ভের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণ ও প্রমাণ-ব্যুৎপাদন মহর্ষি গোতমের দ্বারা সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যায় আচার্য্যেরই সম্মত, ইহাই বক্তব্য বুঝা যায়। তাহা হইলে তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন প্রমাণকেই বার্তিককার “তত্ত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বলা যায়। সে যাহা হউক, ফল কথা মোক্ষশাস্ত্রে যেমন বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতির কথিত (১) হেয়, (২) হান, (৩) হেয়হতু ও (৪) হানোপায়, এই চতুর্ভূহ প্রতিপাদ্যরূপে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ (১) হেয়, (২) হান, (৩) উপায় ও (৪) অবিগন্তব্য, এই চারিটীও “অর্থপদ”রূপে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রভাষ্যে “হেয়ং” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত সেই চারিটী অর্থপদই প্রকাশ করিয়াছেন। মোক্ষশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পূর্বোক্ত চতুর্ভূহ তিনি ঐ স্থলে প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং বার্তিককারের পূর্বোক্তরূপ অর্থপদচতুষ্টয়-ব্যাখ্যা একেবারে অগ্রাহ্য বলা যায় না। বার্তিককারের পূর্বোক্ত “হানং তত্ত্বজ্ঞানং” এই ব্যাখ্যার গৃহ কারণও পূর্বে বলিয়াছি। উহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য এই যে, প্রচলিত বার্তিক গ্রন্থের যে পাঠ অনুসারে পূর্বে ভাষ্যকারোক্ত “অর্থপদ”চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ঐ পাঠ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের সময়েও যে বিবাদ ছিল, তখনও কোন কোন বার্তিকপুস্তকে ঐ পাঠ ছিল না, ইহা তাৎপর্য্যপরিভুক্তি গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের নিজের কথায় দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র নিঃসন্দেহে ঐ পাঠের উত্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই হেতুর দ্বারা উদয়নাচার্য্য সেখানে ঐ পাঠের প্রকৃতত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে ঐ অংশ দেখা যায় না। পরে এনির্গাটিক্ মোসাইটী হইতে প্রকাশিত সটীক তাৎপর্য্য-পরিভুক্তি গ্রন্থে নিম্নে (২৩৭ পৃষ্ঠায়) ঐ অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও অশুদ্ধি আছে। তবে তাৎপর্য্যপরিভুক্তিকার উদয়নাচার্য্য ঐ অংশের টীকা করায় তাঁহার মতে বার্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার ঐ সমস্ত পাঠ যে প্রকৃত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যাহারা বার্তিককারের পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাকে যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বার্তিকের পূর্বোক্ত বিবাদাম্পদ পাঠকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও বার্তিককারের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন। সুযোগে ঐ স্থলে বার্তিকাদি গ্রন্থের মূল সন্দর্ভগুলি দেখিয়া উক্ত বিষয়ে বিচার করিবেন।

১। অত্র “হেয়ং” ইত্যাদি পূর্বোক্ত সন্দর্ভ ১২। ২। হেয়ং বহুবচন। ৩। টীকাভূতা সিদ্ধান্তস্থাপিতভাষ্য। ৪। চর্চামণি-ভাষ্য লেখকদেবগোপালকৃতঃ। অনুথ। ভাষ্য তাৎপর্য্যার্থঃ। ৫। হেয়ং হতুঃ—ইত্যাদি তাৎপর্য্যপরিভুক্তি। ২৩৮ পৃষ্ঠা।

অত্র ভাষ্যস্থ ২৩৭ পৃষ্ঠায় তাৎপর্য্যপরিভুক্তি হইতে বার্তিকের পূর্বোক্ত সন্দর্ভটীকা হইয়াছে। বর্তমান মুদ্রিত টীকা।

ভাষ্য । এবঞ্চ —

সূত্র । দোষনিমিত্তানাং তদ্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ ॥১॥৪১১॥

অনুবাদ । এইরূপ হইলেই “দোষনিমিত্ত”সমূহের অর্থাৎ শরীরাদি ছঃখ পণ্যন্ত প্রমেয়সমূহের তদ্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয় ।

ভাষ্য । শরীরাদিছঃখান্তং প্রমেয়ং দোষনিমিত্তং তদ্বিময়ত্বান্মিথ্যা-
জ্ঞানম্ । তদিদং তদ্বজ্ঞানং তদ্বিময়মুৎপন্নমহঙ্কারং নিবর্তয়তি, সমানে
বিষয়ে তয়োর্বিরোধোৎপাদ্যঃ । এবং তদ্বজ্ঞানাদ্ “ছঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-
মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ” ইতি । স চায়ং
শাস্ত্রার্থসংগ্রহোহনুদ্যতে নাপূর্বো বিধীয়ত ইতি ।

অনুবাদ । শরীরাদি ছঃখ পণ্যন্ত প্রমেয় দোষনিমিত্ত ; কারণ, মিথ্যাজ্ঞান সেই
শরীরাদিনিষয়ক হয় । সেই এই তদ্বজ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি ছঃখ পণ্যন্ত প্রমেয়-
বিষয়ক তদ্বজ্ঞান সেই সমস্ত প্রমেয়বিষয়ক উৎপন্ন অহঙ্কারকে (মিথ্যাজ্ঞানকে)
নিবৃত্ত করে । কারণ, একই বিষয়ে সেই তদ্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধ আছে ।
এইরূপ হইলে তদ্বজ্ঞানপ্রযুক্ত “ছঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের
উত্তরোত্তরের বিনাশ হইলে তদনন্তরের অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞানাদির অব্যবহিত
পূর্বোক্ত দোষাদির বিনাশপ্রযুক্ত অপবর্গ হয় ।” সেই ইহা কিন্তু শাস্ত্রার্থসংগ্রহ
অনুদিত হইয়াছে, অপূর্ব (পূর্বের অন্ত) বিহিত হয় নাই ।

টীপনী । ভাষ্যকার প্রথমে যুক্তির দ্বারা এই সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করায় পরে “এবঞ্চ”
বলিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তি
অনুসারেই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত বর্ণিয়াছেন যে, “দোষনিমিত্ত”গুলির তদ্বজ্ঞান প্রযুক্ত
অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয় । ভাষ্যকারের মতে এখানে বহুবচনান্ত “দোষনিমিত্ত” শব্দের দ্বারা শরীরাদি
ছঃখপণ্যন্ত প্রমেয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত । বস্তুতঃ মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১৯ সূত্র) আত্মা প্রভৃতি
অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রমেয় বর্ণিয়াছেন, তন্মধ্যে শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্গ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি,
দোষ, প্রেত্যভাব, ফল ও ছঃখ, এই দশটি প্রমেয়ই দোষের নিমিত্ত । জীবের ঐ শরীরাদি
থাকা পর্য্যন্তই তাহার রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ জন্মে । দোষও দোষান্তরের কারণ হয় ।
প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চরম প্রমেয় অপবর্গকে দোষের নিমিত্ত বলা যায় না । কারণ, মুক্ত পুরুষের
আত্মা ও অপবর্গ বিদ্যমান থাকিলেও কোন দোষ জন্মে না । সুতরাং শরীরাদি ছঃখপণ্যন্ত দশটি
প্রমেয়ই এই সূত্রে “দোষনিমিত্ত” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই দোষের

সাক্ষাৎ নিমিত্ত। প্রথম অধ্যায়ে “দুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধে মিথ্যাজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্বকই দোষের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত প্রমেয়গুলি দোষের নিমিত্ত কেন হয়? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—মিথ্যাজ্ঞানের শরীরাদিবিষয়কত্ব। অর্থাৎ যে মিথ্যাজ্ঞান জীবের দোষের সাক্ষাৎ কারণ, উহা শরীরাদিবিষয়ক হওয়ার তৎসম্বন্ধে ঐ শরীরাদি দোষের নিমিত্ত হয়। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধের ভাষ্যে ঐ শরীরাদি দুঃখপর্য্যন্ত প্রমেয়বিষয়েও নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণনা করিয়া, উহার বিপরীত জ্ঞানগুলিকেই সেই শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন। এখানে মহর্ষি এই স্কন্ধের দ্বারা ঐ শরীরাদির তত্ত্বজ্ঞান যে, তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক হয়, ইহা বলিয়াছেন; উহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার এখানে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু একই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধ আছে, অতএব শরীরাদিবিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা সেই শরীরাদিবিষয়েই যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিবৃত্ত করে। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং একই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। পরজাত তত্ত্বজ্ঞান পূর্বজাত মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। শরীরাদিবিষয়ক আত্মাত্মিকরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা ঐ শরীরাদিবিষয়ে অনাত্মাত্মিকরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই বিনষ্ট হয়। ঐ তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ মিথ্যাজ্ঞানের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতে পারে না। এক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অণুবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, একই বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। সুতরাং শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয়বিষয়েও যখন জীবের নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান আছে এবং তৎপ্রযুক্ত জীবের সংসার চইতেছে, তখন ঐ শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানও তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মোক্ষের কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি এই স্কন্ধের দ্বারা ঐ শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ক অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, ইহা বলিয়া শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানও যে সুসূক্ষ্ম স্বাদৃশক অর্থাৎ উহাও যে মুক্তির কারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি “দুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বারাই যে উহাও এই সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে এখানে “এবং তত্ত্বজ্ঞানাত্মক” এই বাক্যের প্রয়োগপূর্বক মহর্ষির “দুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, এখানে মহর্ষি “দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ” এই স্কন্ধের দ্বারা তাঙ্গা বলিয়াছেন, তাহা তাহাব পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধেরই অঙ্গবাদ, ইহা অপূর্ব বিধান নহে। অর্থাৎ পূর্বক ঐ দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বারা যে শাস্ত্রার্থসংগত বা সংক্ষেপে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য এখানে এই স্কন্ধটি বলা হইয়াছে। যাহা অপূর্ব অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বক যাহা বলেন নাই, এমন কোন নূতন সিদ্ধান্ত এই স্কন্ধের দ্বারা বলা হয় নাই। ভাষ্যকারের গৃহ্য তাৎপর্য্য এই যে, “দুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে “দোষের” নিবৃত্তি হয়, দোষের নিবৃত্তি হইলে পশ্চাদ্বর্ষ্যকপ প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়, ঐ প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে “জন্মের” নিবৃত্তি হয়, “জন্মের” নিবৃত্তি হইলে “দুঃখের” নিবৃত্তি হয়, সুতরাং তখন অপবর্গ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক কি? এবং কোন্ পদার্থবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান সেখানে মিথ্যাজ্ঞান শব্দের

দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা স্পষ্ট বরিয়্য বলা আবশ্যক। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানই যে মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক, ইহা যুক্তিসিদ্ধই আছে। কিন্তু কোন্ পদার্থবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহা দ্বিতীয় সূত্রে স্পষ্ট বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষিব এই অনুবাদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞান কেবল আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নহে। শরীরাদিবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান। সুতরাং উহাও ঐ সূত্রে মিথ্যাজ্ঞান শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে। শরীরাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই উহার নিবর্তক। এইরূপ নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান যে সংসারের নিদান, ইহা সিদ্ধই আছে। সুতরাং ঐ মিথ্যাজ্ঞান শব্দের দ্বারা নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানও পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক। এইরূপ অপবর্গবিষয়ক নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানও অপবর্গ-লাভের যোগ অন্তরায় হইয়া সংসারের নিদান হয়। সুতরাং অপবর্গবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহারও নিবৃত্তি করিতে হইবে। ফলকথা, যে সকল পদার্থবিষয়ে যেরূপ মিথ্যাজ্ঞান সংসারের নিদান বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ, ঐ সমস্ত পদার্থবিষয়ে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞানই ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের দ্বিতীয়াংশ। মহর্ষি ঐ সমস্ত পদার্থকেই “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। মহর্ষিকথিত প্রথম প্রমেয় জীবাত্মা। তাঁহার মতে জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন। তন্মাত্মা জীবের নিজশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাই নিজের আত্মা। সেই নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাহার সংসারের নিদান। সমস্ত আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তাহার সংসারের নিদান নহে। কারণ, জীব তাহার নিজের শরীরাদিকেই তাহার আত্মা বলিয়া বুঝিয়া, ঐ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ রাগদ্বेषাদি দোষ দাভ করিয়া, তজ্জগৎ নানাবিধ শুভাশুভ কর্মফলে নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানাবিধ সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। সুতরাং তাহার সংসারের নিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে তাহার নিজের আত্ম-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই আবশ্যক। তাহা হইলেই তাহার শরীরাদি অনাত্ম পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। সুতরাং নিজের আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই পূর্বোক্তরূপ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। ঋতির দ্বারাও উক্ত দ্বিতীয়াংশ বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি গোতম যখন এই সূত্রের দ্বারা শরীরাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেও মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ নহে। তাঁহার মতে প্রথম প্রমেয় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান, ঐ আত্মাও শরীরাদি একাদশ প্রমেয়বিষয়ক (সমূহালম্বন তত্ত্বজ্ঞান) হইয়াই ঐ আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়বিষয়ক সর্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বলিতে হইবে। এই বিষয়ে অত্রাণ্ড কথা এই আত্মিকের শেষভাগে পাওয়া যাইবে।

১। “অত্মায়া অরে ত্রুট্যাঃ শ্রোত্রযো মন্তব্যঃ” ইত্যাদি।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫।

“আত্মানকে বিজ্ঞানীরা দক্ষমত্যাতি পুঙ্খঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কাশ্য শরীরমমুৎসজরেৎ”।

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১২।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ মহর্ষি গৌতমের প্রমেরবিভাগস্থে (১।১।৯ স্থে) “আত্মন” শব্দের দ্বারা জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা, উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং “আত্মন” শব্দের দ্বারা যে, ঐ উভয় আত্মাকেই গ্রহণ করা যায়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি (চতুর্থ খণ্ড, ৬০—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ “আত্মন” শব্দের দ্বারা কেবল জীবাশ্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ত্রায়দর্শনে প্রমেরমধ্যে এবং ষোড়শ পদার্থের মধ্যেই পরমাশ্মা ঈশ্বরের বিশেষরূপে উল্লেখ হয় নাই কেন? এ বিষয়ে প্রথম খণ্ড (৮৭—৯১ পৃষ্ঠায়) যথামতি কারণ বর্ণন করিয়াছি। সে সকল কথার সার মর্ম্ম এই যে, যে সমস্ত পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান হওয়ায় উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির কারণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি গৌতম ত্রায়দর্শনে “প্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়া বলিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর তাঁহার মতে জগতের নিমিত্তকারণ ও জীবাশ্মা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়াই স্বীকৃত। সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তাঁহার মতে জীবের সংসারের নিদান না হওয়ায় তিনি প্রমেরবিভাগস্থে প্রথমে “আত্মন” শব্দের দ্বারা কেবল জীবাশ্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, তাঁহার মতে ঈশ্বর সামান্যতঃ প্রমের হইলেও “হেয়” ও “অধিগন্তব্য” প্রভৃতি পূর্বোক্ত কোন প্রকার প্রমের নহেন। সুতরাং ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎকারণ না হওয়ায় তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত পরিভাষিত “প্রমের” পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে মুমুক্শুর পক্ষে তাঁহার পূর্বোক্ত জীবাশ্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমের পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত ঐ প্রমের পদার্থের যে মনন আবশ্যক, ঐ মননের নির্বাহ ও তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার জন্তই এই ত্রায়দর্শনের প্রকাশ হইয়াছে। তাই উহার জন্তই ত্রায়দর্শনে প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থেরও উল্লেখপূর্বক ঐ সমস্ত পদার্থেরও তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন “প্রস্থান” অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য আছে। প্রস্থানভেদেই শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে। সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ ত্রায়শাস্ত্রেরই পৃথক প্রস্থান। উহা অত্র শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। কিন্তু অত্র শাস্ত্রেও ঐ চতুর্দশ পদার্থ স্বীকৃত। এইরূপ ঈশ্বর প্রভৃতি বেদসিদ্ধ সমস্ত পদার্থ মহর্ষি গৌতমেরও স্বীকৃত। তিনি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে “সিদ্ধান্তে”র উল্লেখ করায় সিদ্ধান্তস্বরূপে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে যে ভাবে প্রমাণাদি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ অনাবশ্যক। কারণ, তাঁহার মতে ঈশ্বর জীবের সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় কোন প্রমের নহেন; মুমুক্শুর কর্তব্য তাদৃশ প্রমের মননের নির্বাহক বিচারাস্ত্র কোন পদার্থও নহেন।

তবে কি মহর্ষি গৌতমের মতে মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই? কেবল তাঁহার পরিভাষিত জীবাশ্মাদি প্রমেরতত্ত্বজ্ঞানই কি মুক্তির কারণ? এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গৌতমের মতেও মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান যে মুক্তিলাভে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শ্রোত সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রতিপ্রাণাণ্যসমর্থক মহর্ষি গৌতমেরও যে উহা সম্মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিত্য-

বর্ণন তমসঃ পরন্তাৎ । তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পশ্বা বিদ্যাতেহয়নায়” ॥—(৩৮) এই
 প্রতিবাক্যে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান যে, মুক্তিলাভে নিতান্তই আবশ্যক, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে । মুক্তির
 অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও পূর্বে উক্ত প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ।
 (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । ফল কথা, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তিলাভে অত্যাৱশ্যক, ইহা সমস্ত
 জ্ঞানার্চাৰ্য্যগণেরই সম্মত । কারণ, উহা শ্রুতিসম্মত সত্য । এই জন্তই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য
 তাঁহার শ্রীমদ্বৈশ্বক্যলিঙ্গে মুমুক্শুর পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্ত ঈশ্বর মননের উপায়
 বর্ণন করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার দ্বিতীয় কারিকার টীকায় বরদরাজ প্রথমে পূর্বপক্ষের উত্থাপন-
 পূর্বক সমাধান করিয়াছেন যে,^১ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার অমুগ্রহসহকৃত জীবাশ্রিতত্ব-
 জ্ঞানই মুক্তির কারণ । বরদরাজ উহা সমর্থন করিতে শেষে “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে
 পরঞ্চাপরঞ্চ” এবং “দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া” ইত্যাদি প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন । অর্থাৎ
 তাঁহার মতে উক্ত শ্রুতির দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও অপরব্রহ্ম জীবাশ্রিত, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের জ্ঞানই
 মুক্তিলাভে আবশ্যক বলিয়া কথিত হইয়াছে । তাঁহার পরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহানৈয়ায়িক
 বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও ঐ স্থলে “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে” এই প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও
 অপরব্রহ্ম জীবাশ্রিত, এই উভয়ের জ্ঞানই যে মুক্তির কারণ বলিয়া শ্রুতিসিদ্ধ, ইহা সমর্থন
 করিয়াছেন । কিন্তু উক্ত প্রতিবাক্যে জীবাশ্রিতকেই যে অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহা আর কেহই
 ব্যাখ্যা করেন নাই । ঐরূপ ব্যাখ্যার কোন মূলও পাওয়া যায় না । আমরা মৈত্রায়ণী উপনিষদে
 দেখিতে পাই,—“দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ । শব্দব্রহ্মণি নিষাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি” ॥
 (ষষ্ঠ প্র, ২২) । এখানে শব্দব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে । প্রাগোপনিষদে দেখিতে পাই,
 —“এতদৈ সত্যকাম পরমপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোক্কারঃ” (৫১২) । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সগুণ ও নিগুণ-
 ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম স্বীকার করিয়া, সগুণ ব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলিয়াছেন ।—(বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ,
 তৃতীয় পাদ, ১৪শ সূত্রের শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য) । অবশ্য “ব্রহ্মন্” শব্দের দ্বারা কোন স্থলে
 জীবাশ্রিতও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও কোন স্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যা
 করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । বেদান্তদর্শনের “সামীপ্যাত্ম কৃত্বাপদেশঃ” (৪৩৩)
 এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্যবশতঃ জীবাশ্রিতেও “ব্রহ্মন্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,
 এইরূপ অর্থও নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন । কিন্তু “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে”
 ইত্যাদি প্রতিবাক্যে যে, জীবাশ্রিতকেই অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই ।
 সে যাহাই হউক, উক্ত সিদ্ধান্তে “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে” ইত্যাদি পূর্বোক্ত প্রতিবাক্য প্রমাণ

১। নমু দেহাদিবিভাবিতরক্তস্ত নিত্যাত্মাপরাত্মানন্তত্ত্বজ্ঞানং সংসারনিধানতদ্বিষয়ামখ্যাভ্যাসানি নিবৃত্তিধারেণ
 নির্বাণকারণং বর্ণয়ন্তি । যথাহঃ—“হঃখজন্ম ধবুভ-দোষ-মখ্যাঃ জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তন্নন্তরাপাচ্ছাদপবর্গ” ইতি ।
 বিবেচিত্যায় “নাশ্চতত্ত্ববিবেক” ইতি কিস্মিনে পরমাত্মনিরূপণেত্যাহ “বর্ণাপবর্গয়ো” রিতি । সাক্ষাৎকৃতপরমেশ্বর-
 প্রসাদসহকৃতমেবহি জীবাশ্রিতজ্ঞানমপবর্গমাতনোতি । তথা চামনন্তি—“দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরঞ্চ”, “দ্বা সুপর্ণা
 সমুজ্জা সখায়া” ইত্যাদি ।—বরদরাজকৃত টীকা ।

না হইলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের “আত্মানঞ্চৈবিকানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ” ইত্যাদি পূর্বোক্ত
 প্রতিবাক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি প্রতিবাক্য উক্ত
 সিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করা যায়। বর্ধমান উপাধ্যায় মুক্তিসাধনে নিজের আত্মসাক্ষাৎ-
 কারের জ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়া, শেষে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের
 পরাম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ‘ঈশ্বরমনন মুমুক্শুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার
 সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। উহার সম্পাদক ঈশ্বরমননের জ্ঞান ঈশ্বরসাক্ষাৎ-
 কারও ঐরূপে পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। কারণ, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার ঈশ্বরবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান
 নিবৃত্ত করিলেও উহা সংসারের নিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক না হওয়ায় মহর্ষি গৌতমোক্ত প্রকারে
 মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না। কিন্তু উহা গৌতমোক্ত মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ “প্রমেশ্বর”-তত্ত্ব-
 সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া মুক্তির প্রযোজক বা পরম্পরাকারণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য।

ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুক্শুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারের সম্পাদক হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের মননই বা
 কিরূপে নিজের আত্মসাক্ষাৎকারে উপযোগী হইবে? ইহার ত কোন যুক্তি নাই? ইহা চিন্তা
 করিয়া শেষে বর্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, অথবা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনা করিলে তজ্জন্ম
 একটা অদৃষ্টবিশেষ জন্মে, অথবা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানজন্মই অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়, তদ্বারাই উহা
 মুক্তির কারণ হয়। শ্রুতির দ্বারা যখন ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুক্তির হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন
 উহার উপপত্তির জন্ম অদৃষ্টবিশেষই উহার দ্বাররূপে কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান
 কোন অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারাই মুক্তির হেতু হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।
 নচেৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক না হওয়ায়, উহা সেই মিথ্যাজ্ঞানের
 নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হইতে না পারায় অতঃ কোনরূপে মুক্তির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং
 উহা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারাই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাচীন টীকা-
 কার বরদরাজ কিন্তু ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যখন ঈশ্বরসাক্ষাৎ-
 কারও মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎকৃত পরমেশ্বরের অনুগ্রহ মুক্তির সহকারী
 কারণ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য বুঝা যায়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তখন তাঁহার অনুগ্রহে
 মুমুক্শুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া, ঐ আত্মবিষয়ক সর্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া
 উহা মুক্তির কারণ হয়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার অনুগ্রহের মহিমায় মুমুক্শুর আবশ্যক
 জ্ঞানের উৎপত্তি ও অভিলষিতসিদ্ধি অবশ্যই হইতে পারে, এ বিষয়ে অতঃ যুক্তি অনাবশ্যক। বস্তুতঃ
 “ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিঃ.....তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”—(মুণ্ডক, ২।২) এই শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বর-

১। ঈশ্বরমননঞ্চ মোক্ষহেতুঃ, “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাতঃ পশ্য বিদ্যাতেহয়নার” ইতি শ্রুত্যা স্বাত্মজ্ঞানস্তেব
 ঈশ্বরজ্ঞানস্তাপি তদ্বৈতত্বপ্রতিপাদনাৎ, “যে ব্রহ্মণী বেদিতবে,” ইত্যত্র বেদনমাত্রস্ত আকাজিকত্বেন প্রকৃতত্বাৎ, “শ্রোতব্যা
 নন্তব্য” ইত্যাদেশয়রাচ্চ। ঈশ্বরমননঞ্চ যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানোন্মূলনদ্বারা নোপযোগি, তথাপি স্বাত্মসাক্ষাৎকার এব উপ-
 যুক্ত্যতে। যদাহঃ “সহি তত্ত্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকারস্তোপকরোতী”তি। যথা শ্রুত্যা তদ্বৈতত্বে প্রমাণিতে তদনুপ-
 পত্ত্যাহদৃষ্টমেব তদ্বারাৎ বজ্ঞতে।—বর্ধমানকৃত টীকা।

সাক্ষাৎকার যে “হৃদয়গ্রন্থি”র ভেদক, অর্থাৎ জীবের অনাদিসিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞিত সংস্কারের বিনাশক, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে মুমুকুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই মুক্তির কারণ হয়, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। তবে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার মুমুকুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা নিজের আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের শ্রায় সাক্ষাৎভাবে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া তদ্ব্যাহাই সংসারনিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলিয়া গিয়াছেন,—“সহি তত্ত্বতো জাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকার-স্তোপকরোতি”। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারের সহায় হয়। পূর্বোক্তরূপ কার্য্যকারণভাব শ্রুতিসিদ্ধ হইলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানজন্তু অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা অনাবশ্যক। বরদরাজ ও তৎপূর্ববর্তী আর কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকও ঐরূপ অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা করেন নাই। “প্রকাশ” টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের শেযোক্ত “বদ্ধা” কল্প বা চরম কল্পনায় তাঁহার নিজেরও আস্থা ছিল না, ইহাও বলা যায়। সে যাহাই হউক, ফলকথা, নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে পূর্বোক্তরূপে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও যে মুক্তির কারণ, ইহা স্বীকৃত সত্য। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই জন্তই তাঁহার “শ্রায়কুসুমাজলি” গ্রন্থে মুমুকুর পক্ষে ঈশ্বরের মননরূপ উপাসনার নির্বাহের জন্তু বিবিধ তত্ত্ব বিচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিচারপূর্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াও ঐ মননের সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রুতিতে জীবাত্মার শ্রায় পরমাশ্রায়ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। পরমাশ্রায় তত্ত্বজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারের জন্তু তাঁহারও যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য।

কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উদয়নাচার্য্যের “শ্রায়কুসুমাজলি” গ্রন্থানুসারে এক সময়ে ইহাও সমর্থন করিয়াছিলেন যে, কেবল ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। তাঁহাদিগের কথা এই যে, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় হইলেও যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে। “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আত্মন্” শব্দের দ্বারা যদিও জীবাত্মাকেও বুঝা যায়, কিন্তু “বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাত্তঃ পস্থা বিদ্যাতেহয়নায়” ॥ এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মোক্ষের কারণ বলিয়া স্পষ্ট কথিত হওয়ায় “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুতিবাক্যেও “আত্মন্” শব্দের দ্বারা পরমাশ্রায়ই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উদয়নাচার্য্যের শ্রায়কুসুমাজলি গ্রন্থের—“শ্রায়চর্চেরমীশস্ত মননব্যপদেশভাক্। উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা ॥”—এই কারিকাও সংগত হয়। কারণ, মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ হইলে তাহাতে পরমাশ্রায় মননরূপ উপাসনা অনাবশ্যক। নিজের আত্মার মনন না করিয়া উদয়নাচার্য্য পরমাশ্রায় পরমেশ্বরের মনন করিবেন কেন? সুতরাং তাঁহার মতেও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারই যে মুক্তির কারণ, ইহাই বুঝা যায়। যদিও ঈশ্বরসাক্ষাৎকার মুমুকুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক

হইতে পারে না, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে উহা ঐ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারের বিনাশের কারণ হয়, ইহা স্বীকার করা যায়। অথবা সংসারনিদান ঐ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার নাশের জন্যই মুমুকুর নিজের আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা স্বীকার্য। কিন্তু মুক্তিলাভে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই কারণ। যদি বল, যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তখন ঐ যোগজ সন্নিকর্ষজন্য সমগ্র বিশ্বেরই সাক্ষাৎকার হইবে। তাহা হইলে “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে “এব” শব্দের দ্বারা যে, অস্ত্র পদার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না। কারণ, যোগজ সন্নিকর্ষজন্য ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কেবল ঈশ্বরমাত্রাবিষয়ক নহে। সুতরাং উক্ত প্রতিবাক্যের দ্বারা যে, যোগজ সন্নিকর্ষ-জন্য ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণরূপে কথিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যাহারা মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিবেন, তাঁহা-নিগের মতেও ত ঐ আত্মসাক্ষাৎকার দেহাদিভেদবিষয়ক হওয়ায় কেবল আত্মবিষয়ক হইবে না। সুতরাং “তমেব বিদিত্বা” এই প্রতিবাক্যে তাঁহাদিগের মতেও “তৎ” শব্দের দ্বারা নিজের আত্মমাত্রের গ্রহণ কোনরূপেই সম্ভব নহে। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতির উপক্রমে পুরাণ পুরুষ পরমেশ্বরেরই উল্লেখ হওয়ায় উহার পরাধীন “তৎ” শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরই যে বুঝিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং “তমেব বিদিত্বা” এই বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বরবিষয়ক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই গ্রহণ করিয়া, উহাকেই মুক্তির কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যোগজ সন্নিকর্ষজন্য ঐ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কেবল পরমেশ্বরমাত্র-বিষয়ক। সুতরাং “তমেব” এই স্থলে “এব” শব্দ প্রয়োগের অনুপপত্তি নাই। আর ঐ “এব” শব্দকে “বিদিত্বা” এই পদের পরে যোগ করিয়া “তৎ বিদিত্বৈব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যে সমাধান, তাহা উভয় মতেই তুল্য। অর্থাৎ অস্ত্র সম্প্রদায়ের স্ত্রী আমরাও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ ব্যাখ্যা আমরা সংগত মনে করি না। কারণ, “তৎ বিদিত্বৈব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে ঐ শ্রুতিস্থ “এব” শব্দের সার্থক্য থাকে না। কারণ, উক্ত পক্ষে পরে “নান্নঃ পশ্বা বিদ্যাতেহন্নান্য” এই বাক্যের দ্বারাই “এব” শব্দ প্রয়োগের ফলসিদ্ধি হইয়াছে। আমরা দিগের মতে ঐ “এব” শব্দের অস্ত্র যোগ করিতে হয় না, উহার বৈয়র্থ্যও নাই। যদি বল, “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি নানা প্রতিবাক্যের দ্বারা “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার্য হইলে, ঐ জ্ঞান ত কেবল ঈশ্বরবিষয়ক নহে? সুতরাং “তমেব বিদিত্বা” এই বাক্যে “এব” শব্দের উপপত্তি কিরূপে হইবে? এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি নানা প্রতিবাক্যের দ্বারা “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের অভেদচিস্তানরূপ যে যোগবিশেষ, উহার অভ্যাসের দ্বারা পরে ঈশ্বরমাত্রাবিষয়ক নির্বিকল্পক সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, ইহাই ঐ সমস্ত প্রতিবাক্যের তাৎপর্য। পূর্বোক্তরূপ ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। সুতরাং “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের যথার্থার্থেই সামঞ্জস্য হয়। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য পূর্বোক্তরূপ বিচারের সহিত পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহার কোন প্রতিবাদ বা প্রশংসা করেন নাই।

উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে “আত্মান্” শব্দের দ্বারা যে পরমাত্মাই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু উহার পূর্বে

“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আশ্রয়নস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে “আশ্রয়ন” শব্দের দ্বারা জীবাশ্রয় কথিত হওয়ার সেখানে পরেও “আশ্রয়ন” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত জীবাশ্রয় গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। অবশ্য শুদ্ধাষ্টমতে জীবাশ্রয় ও পরমাশ্রয় বাস্তব অভেদবশতঃ পরমাশ্রয়সাক্ষাৎকার হইলেই জীবাশ্রয়সাক্ষাৎকার হয়। সুতরাং সেই মতে ঐ “আশ্রয়ন” শব্দের দ্বারা পরমাশ্রয় বুঝিলেও সামঞ্জস্য হইতে পারে। কিন্তু দ্বৈতবাদী পূর্বোক্ত নৈমিত্তিকসম্প্রদায়বিশেষের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যে “আশ্রয়ন” শব্দের দ্বারা পরমাশ্রয়কেই গ্রহণ করিলে সামঞ্জস্য হয় না। কারণ, জীবের নিজের আশ্রয়বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান, যাহা তাহার সংসারের নিদান বলিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধ, ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ত উহার বিপরীত জ্ঞানরূপ নিজের আশ্রয়সাক্ষাৎকার যে মুমুকুর অবশ্য কর্তব্য, ইহা উক্ত সম্প্রদায়েরও স্বীকার্য। তাহা হইলে পূর্বোক্ত “আশ্রয় বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে, মুমুকুর নিজের আশ্রয়সাক্ষাৎকার কর্তব্য বলিয়া বিহিত হয় নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যে, কেবল পরমাশ্রয়সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই বা কিরূপে বুঝা যায়? কারণ, মুমুকুর নিজের আশ্রয়সাক্ষাৎকারও মুক্তির কারণ বলিয়া শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ। পরন্তু মহানৈমিত্তিক উদয়নাচার্য্যও “আশ্রয়তত্ত্ববিবেক” ও “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” গ্রন্থে মুমুকুর নিজের আশ্রয়বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকে তাহার সংসারের নিদান বলিয়া, উহার নিবর্তক নিজের আশ্রয়সাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি “শ্রীকৃষ্ণমাঞ্জলি” গ্রন্থে ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করায় কেবল ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার মতেও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নিজের আশ্রয়সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিতেই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। তাহার জন্ত ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণমাঞ্জলি গ্রন্থে বিচারপূর্বক ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। টীকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহারাও উদয়নের মতে পরমাশ্রয়সাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই।

গদাধর ভট্টাচার্য্য “মুক্তিবাদ” গ্রন্থে পূর্বোক্ত মত প্রকাশের পরে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈমিত্তিকগণের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে “স হোবাচ নবা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আশ্রয়নস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” (২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আশ্রয়ন” শব্দের দ্বারা নিরতিশয় প্রিয় নিজের আশ্রয় উপক্রান্ত হওয়ার উহার পরভাগে “আশ্রয় বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আশ্রয়ন” শব্দের দ্বারা নিজের আশ্রয় বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুকুর নিজের আশ্রয় সাক্ষাৎকারই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং তাহার সম্পাদক ঐ আশ্রয় শ্রবণাদিই মুক্তির পরম্পরা কারণ, ইহাই বুঝা যায়। উহার দ্বারা পরমাশ্রয় সাক্ষাৎকার ও শ্রবণ-মননাদি যে মুক্তির কারণ, ইহা বুঝা যায় না। যদি বল, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা না গেলেও “তমেব বিদিত্বাহতিমুত্থ্যমতি”

ইত্যাদি প্রতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে মুক্তির কারণ, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। এতদ্বারা তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তখন তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান-জ্ঞান সংস্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়ায় মুক্তি হইয়াই যায়। সুতরাং তাঁহার ঐ মুক্তিতে আর পরমাত্মসাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া স্বীকার করার কোন প্রয়োজন বা যুক্তি নাই। অতএব “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-চিন্তনরূপ যোগাভ্যাস মুমুকুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া, তদ্বারা মুক্তিতে উপযোগী হয়। ঐ যোগাভ্যাস ব্যতীত মুমুকুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেই উক্ত প্রতিবাক্যে “এব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং “বিদ” ধাতুর দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অভেদ জ্ঞানরূপ যোগই প্রকটিত হইয়াছে। দৈবতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতে ঐ অভেদজ্ঞান আহাৰ্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও উহার অভ্যাস মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করে। উক্ত প্রতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্যই যুক্তিসিদ্ধ হইলে “তমেব বিদিত্বা” এই স্থলে “তং বিদিত্বৈব” এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। তাহাতে “নাথঃ পঞ্চা বিদ্যাতেহয়নায়” এই পরভাগও ব্যর্থ হয় না। কারণ, ঐ পরভাগ পূর্ব্বোক্ত “এব” শব্দেরই তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্ত কথিত হইয়াছে। যেমন কালিদাস রঘুবংশে “মহেশ্বরস্ত্যাক্ষক এব নাপরঃ” (৩৪৯) এই বাক্যে “এব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াও পরে আবার “নাপরঃ” এই বাক্যের দ্বারা উহারই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া, উক্ত মতে দোষ বলিতে কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, “যোগিনস্তং প্রপশুস্তি ভগবন্তমধোক্ষজং” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারই যোগাভ্যাসের ফল, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সুতরাং মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকারকেই পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাসের ফল বলিলে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধ হয়।

এখানে গদাধর ভট্টাচার্য্যের এইরূপই তাৎপর্য্য হইলে বিচার্য্য এই যে, পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার অনেক যোগাভ্যাসের ফল, ইহা শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত মতবাদী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিরও স্বীকৃত। কিন্তু তাঁহারা যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদচিন্তারূপ যোগবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধ হইবে কেন? পরন্তু পূর্ব্বোক্ত মতবাদিগণ “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের কেন যে পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে গিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। উক্ত প্রতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মুক্তিলাভে অত কোন পন্থা নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। উহার দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারই যে মুক্তির কারণ, মুক্তিলাভে আর কিছুই আবশ্যক নহে, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার যে তাঁহার সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইহাও প্রতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় “তমেব বিদিত্বাহতি-মৃত্যুমেতি” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের দ্বারা যে, মুক্তির প্রতি উক্ত কারণেরও নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকার না হইলে মুমুকুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইতে

পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান না হইলে আর কোন উপায়েই মুমুক্শু নিজের আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিলে আর কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যে “তমেব” এই স্থলে “এব” শব্দের দ্বারা উহার পূর্বে পুরাণ পুরুষ পরমাত্মার যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, সেই রূপেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, অতঃপর কোন কল্পিত রূপে তাঁহাকে জানিলে উহা মুমুক্শুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করে না, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। ঐ “এব” শব্দের দ্বারা যে জীবাত্মার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। অথবা সেই পুরাণ পুরুষ পরমাত্মার যাহা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা যোগজসম্বন্ধবিশেষজ্ঞ, কেবল সেই পরমাত্মাবিশয়ক সাক্ষাৎকার, তাহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে “তমেব বিদিত্বা” এই বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত বলিয়া উক্ত স্থলে “এব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে “বিদিত্বা” এই পদের পরে “এব” শব্দের যোগ করিয়া “তং বিদিত্বৈব” এইরূপ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক এবং উক্ত শ্রুতিপাঠানুসারে ঐ শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্যও প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু পূর্বে বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধান মুক্তির উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু “তমেব বিদিত্বা” এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝা যায়। অবশ্য ঈশ্বর-প্রণিধানও মুক্তিজনক তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি গোতমও পরে “তদর্থং যমনিয়মাত্মাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্মবিদ্যুপায়ৈঃ” (৪৬শ) এই সূত্রের দ্বারা মুক্তিলাভে যোগশাস্ত্রোক্ত “নিয়মের” অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে আবশ্যক, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থতত্ত্বজ্ঞান হইলেই তাঁহার মতে মুক্তি হইতে পারে, ইহা কখনই বলা যায় না; পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। পরন্তু পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত বেদবোধিত পরমাত্মতত্ত্বের যথার্থ বোধ হইতেই পারে না; সুতরাং ঐ ভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব, ইহা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। সুতরাং বেদপ্রামাণ্যসমর্থক পরমভক্ত মহর্ষি গোতমেরও যে উহাই সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে তাঁহার মতে ঐ পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রেময়তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। ঈশ্বরে পরাভক্তি ও তজ্জ্ঞান তাঁহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঐ প্রেময়তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদক হইয়া পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। ভক্তি যে জ্ঞানেরই সাধন এবং জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু এই জগতে নাই, জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তিলাভ হয়, এই সমস্ত তত্ত্ব ভগবদ্গীতাত্তেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অবশ্য পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতার টীকার সর্ব্বশেষে “গীতার্থসংগ্রহ” বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে পরমেশ্বরের অনুগ্রহলব্ধ আত্মজ্ঞানকে ঐ ভক্তির ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে ভক্তিজন্য আত্মজ্ঞান, তজ্জ্ঞান মুক্তি, ইহাই ফলতঃ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি আত্মজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্যাপার কেবল ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিতে পারেন নাই, ইহা

প্রণিধানপূর্বক বুঝা আবশ্যক। তিনি দেখানে ভগবদ্গীতার অনেক বচনের দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও দ্রষ্টব্য। সে বাহ্য হউক, মূলকথা, মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিরূপে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার মতে যে সকল পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান হওয়ায় উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎভাবে ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া, তদ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থকেই তিনি “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়া উহাদিগের উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ সমস্ত প্রমেয় পদার্থের মনন নির্বাহের জন্যই এই হায়শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তিরূপে উহার পূর্বে ও পরে আর বাহ্য বাহ্য আবশ্যক, তাহা তাঁহার এই শাস্ত্রে বিশেষ বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য নহে। সকল পদার্থ তাঁহার প্রকাশিত এই শাস্ত্রের “প্রস্থান”ও নহে। তাই তিনি মুক্তিরূপে প্রথমে নানা কৰ্ম, ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান অত্যাৱশ্যক হইলেও বিশেষরূপে তাহা বলেন নাই—শাস্ত্রান্তর হইতেই ঐ সমস্ত জানিতে হইবে। এই আশ্রিত্যের শেষে সংক্ষেপে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে।

মুক্তির কারণ বিষয়ে আর একটি সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ মত আছে,—তাঁহার নাম “জ্ঞানকৰ্ম-সমুচ্চয়বাদ”। এই মতে কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম-সহিত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ঐ কৰ্ম ও তত্ত্বজ্ঞান, এই উভয়ই তুল্যভাবে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। সুতরাং মুক্তির পূর্ষ পর্য্যন্ত সামর্থ্য ও অধিকারানুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্মানুষ্ঠানও কর্তব্য। আচার্য্য শঙ্করের বহু পূর্ষ হইতেই সম্প্রদায়বিশেষ উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আবার বিশিষ্টাদৈতবাদের উপদেষ্টা যানুনাচার্য্য উক্ত মতের সমর্থন ও প্রচার করেন। তাঁহার পরে রামানুজ বিশদ বিচারপূর্বক উক্ত মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার “বেদার্থসংগ্রহ” উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া শেষে পরমশুক যানুনা-

১। ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্ত তৎপ্রসাদান্নবোধতঃ।

সুখং বন্ধনমুক্তিঃ স্থানিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥

তথাহি “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভত্বেনশুখা। ভক্ত্যা ত্বনশুখা শক্য অহমেবংবিধে’হর্জুন” ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্ত্যে-
মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বপ্রাপ্ত্যং, তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোৎপাদনাবাস্তবমাত্মবুদ্ধি। মোক্ষহেতুরিতি স্মৃতিং
প্রতীয়তে। জ্ঞানশ্চ চ তত্ত্ববাস্তবপারিত্যমেব যুক্তং, “তেষাং সত্যতত্ত্বজ্ঞানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকঃ। দদামি বুদ্ধি-
যোগং তং যেন সামুপযাস্তি তে। মদভক্ত এতৎক্লাম মদভাবয়োপপদ্যতে” ইত্যাদিবচনাৎ। নচ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং,
“সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাং ভক্ত্যা মানসিজানাত্যিবান্ যচ্চাস্মি তদ্বতঃ”—ইত্যাদৌ ভেদেন নির্দেশাৎ।
ন চৈবং সতি “তমেব বিদিত্বাত্তিমুক্ত্যমেতি নাস্ত্যঃ পস্থা বিদ্যতেহহনায়ে”তি প্রতিবিরোধঃ শঙ্করীয়ঃ, ভক্ত্যবাস্তবপারিত্যজ-
জ্ঞানশ্চ, নহি কাঠেঃ পচতাত্ত্বজ্ঞে জ্ঞানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ “যস্ত দেবে পরা ভক্তির্যং দেবে তথা শুরো।
তস্মৈশ্চেত কথিতা হর্ষঃ প্রকাশয়ে মহাত্মনঃ ॥” (যেতাশ্বতর), “দেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ম তদ্রকং ব্যাচষ্টে” (মুসিংহ-
পূর্বতাপনী ১৭), “হঃমৈব বৃত্তে তেন লভ্যঃ” (কঠ) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিপূরণবচনান্যেবং সত্য সমঞ্জসানি ভবন্তি
তস্মাদ্ভগবদ্-ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং।—স্বামিতীকার শেষ।

চার্য্যপাদের উক্তির দ্বারাও উহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি শ্রীভাষ্যে তাঁহার ব্যাখ্যাত মতের প্রামাণিকত্ব ও অতিপ্রাচীনত্ব সমর্থন করিতে বেদান্তসূত্রের বোধায়নকৃত সূত্রপ্রাচীন বৃত্তির উল্লেখ করায় বৃত্তিকার বোঝানই প্রথম বেদান্তসূত্রের দ্বারা উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, উক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, “ঈশ” উপনিষদের “অবিদ্যায়া মৃত্যুং ত. স্বা বিদ্যায়ামৃৎমৃত্যুতে” এই শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু-তরণের উপদেশ থাকায় কর্ম ও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। কারণ, ঐ “অবিদ্যা” শব্দের অর্থ বিদ্যাভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, ইহাই বুঝা যায়। আর কোন অর্থ ঐ স্থলে সংগত হয় না। “বিদ্যা” শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। উহা ভক্তিরূপ ধ্যান বা “ঈশানস্মৃতি”। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্মসহিত জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। বস্তুতঃ স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে এমন অনেক বচন পাওয়া যায়, যদ্বারা সরলভাবে উক্ত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। নব্যনৈয়ায়িকাচার্য্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি”র শেষে প্রথমে উক্ত মত সমর্থন করিতে ভগবদ্গীতার “স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ” (১৮।৪১) ইত্যাদি বচন এবং বিষ্ণুপুরাণের “তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ। তৎপ্রাপ্তিহর্কীকৃত্যনং কর্ম চোক্তং মহামতে॥” এই বচন এবং হারীতসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের “উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং বথা থে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাস্বতং।” এই (১০ন) বচন এবং “জ্ঞানং প্রধানং নতু কর্ম হীনং কর্ম প্রধানং নতু বুদ্ধিহীনং। তস্ম দ্বয়োরেব ভবেৎ প্রসিদ্ধির্ন হোকপক্ষা বিহগঃ প্রয়াতি॥” ইত্যাদি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও তাঁহার নিজস্বতানুসারে বহু বিচারপূর্বক উক্ত মত সমর্থন করিতে অনেক শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বৃত্তি এই যে, শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রানুসারে প্রত্যহ পাপ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির মুক্তি হইতেই পারে না (“শ্রীমদ্বন্দ্বলী” ২৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ভগবান্ শঙ্করচার্য্য উক্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, কেবল তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্বে নিষ্কামভাবে অল্পাধিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানেরই সাধন হয়। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্ত কর্মানুষ্ঠান না করিলে তত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকারই হয় না। সুতরাং কর্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির অভাবে তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় মুক্তিলাভ অসম্ভব,—এই তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে অনেক স্থানে কর্মকে ঐরূপে মুক্তির সাধন বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্মও যে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, সুতরাং মুক্তির পূর্ক পর্য্যন্ত কর্ম কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। কারণ, শ্রুতিতে যুগ্মক সন্ন্যাসীর পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মত্যাগেরও বিধি আছে। এবং “ব্রহ্ম-সংস্পৃহমৃৎস্বমতি” এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীই মুক্তি লাভ করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপরিত্যাগজন্ত পাপ বৃদ্ধিরও কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি পূর্কশ্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। “অপাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই ব্রহ্মসূত্র “অথ” শব্দের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তই সূচিত

হইয়াছে। পরন্তু “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “কৰ্ম্মভিশ্চৈত্য়মুশময়ো নিষেধঃ” ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কৰ্ম্ম দ্বারা যে মুক্তিলাভ হয় না, ইহাও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অবশ্য ষাহারা জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদী, তাঁহারা ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যে “কৰ্ম্মন্” শব্দের দ্বারা কাম্য কৰ্ম্মই ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের গ্রাম্য কেবল সন্ন্যাসাশ্রমীই মুক্তিলাভে অধিকারী, এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করেন না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর আরও বহু বিচার করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত “জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদে”র খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের “অশৌচ্যানবশোচস্বং” ইত্যাদি (১১শ) শ্লোকের অবতারণার পূৰ্ব্বেও উক্ত মতের প্রকাশ ও সমর্থন করিয়া, পরে গীতার্গ পর্য্যালোচনার দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডনপূৰ্ব্বক উপসংহারে অতিবিশ্বাসের সহিত লিখিয়াছেন,—“তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিন্ কৰ্ম্মসমুচ্চিভাদিতি নিশ্চিতোহর্থঃ। যথা চারমর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ”। ফলকথা, আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সকলেই উক্ত জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদের প্রতিবাদই করিয়া গিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণের প্রথম সর্গেও “উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং” ইত্যাদি (৭ম) শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু সেখানে টীকাকার আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতী শঙ্করের সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্ত পরবর্তী মণিকাচোপাখ্যান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগবাশিষ্ঠেও কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই পরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে “জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদ” যোগবাশিষ্ঠের সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। যোগবাশিষ্ঠের পাঠকগণ টীকাকারের ঐ কথাতেও লক্ষ্য করিবেন। মহর্ষি গোতমও জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদের কোন কথা বলেন নাই। পরন্তু তাঁহার “ভূঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্র ও এখানে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার মতেও যে কেবল প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাংলায়ন প্রভৃতি গ্রাম্যচার্য্যগণও উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থন করিলেও পরে তিনিও ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ,—কৰ্ম্ম ঐ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া মুক্তির জনক, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন^১। তাহা হইলে কৰ্ম্ম ও জ্ঞান যে, তাঁহার মতে তুল্যভাবেই মুক্তির জনক নহে, ইহা তিনি পরে স্বীকার করায় তাঁহাকে আর জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদী বলা যায় না। তবে বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট যে, জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি মহর্ষি কণাদ বা প্রশস্তপাদের কোন উক্তির দ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। বৈশেষিকসূত্র ও যোগসূত্রের দ্বারাও উক্ত মত বুঝা যায় না।

১। বস্তুতঃ দৃঢ়ভূমিসংবাদসমিখ্যাজ্ঞানোন্মূলং বিনা ন মোক্ষ ইত্যুক্তবাদিসিদ্ধং “.....কৰ্ম্মণাঃ তত্ত্বজ্ঞান-
ভারাপি মুক্তিজনকত্বসম্ভবাৎ, প্রমাণবতো গৌরবঞ্চ ন দোষাৎ”—ইত্যাদি স্মরণীয়মানচিন্তামণির শেষভাগ।

সাংখ্যসূত্রে উক্ত সমুচ্চয়বাদের খণ্ডনও দেখা যায়^১। মূলকথা, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির চরম কারণ, ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত। অবশ্য ঐ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে আরও নানা মতের প্রকাশ হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না ॥ ১ ॥

ভাষ্য। প্রসংখ্যানানুপূর্বী তু খলু —

অনুবাদ। “প্রসংখ্যানে”র অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আনুপূর্বী (ক্রম) কিন্তু (পরবর্তী সূত্রদ্বারা কথিত হইতেছে)

সূত্র। দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সংকল্প-
কৃতাঃ ॥২॥৪১২॥

অনুবাদ। রূপাদি বিষয়সমূহ “সংকল্পকৃত” অর্থাৎ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইয়া দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের জনক হয়।

ভাষ্য। কামাবিষয়া ইন্দ্রিয়ার্থা ইতি রূপাদয় উচ্যন্তে। তে মিথ্যা-সংকল্প্যমানা রাগ-দ্বেষ-মোহান্ প্রবর্তয়ন্তি, তান্ পূর্বং প্রসংখ্যাকৃত। তাংস্চ প্রসংখ্যাকৃতান্ রূপাদিবিষয়ো মিথ্যাসংকল্পে নিবর্ততে। তন্নিবৃত্তা-বধ্যাত্মা শরীরাদি প্রসংখ্যাকৃত। তৎপ্রসংখ্যানাদধ্যাত্মবিষয়োহহঙ্কারো নিবর্ততে। সোহয়মধ্যাত্মা বহিঃস্চ বিবিক্তচিত্তে বিহরন্ মুক্ত ইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থগুলি কাম অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়, এ জন্ম “রূপাদি” কথিত হয়। সেই রূপাদি, মিথ্যা সংকল্পের বিষয় হইয়া রাগ, দ্বেষ ও মোহকে উৎপন্ন করে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রথমে “প্রসংখ্যান” করিবে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রসংখ্যানকারা মুমুক্শুর রূপাদিবিষয়ক মিথ্যা সংকল্প নিবৃত্ত হয়। সেই মিথ্যা সংকল্পের নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে শরীরাদিকে “প্রসংখ্যান” করিবে, অর্থাৎ সমাধির দ্বারা এই সমস্ত শরীরাদি আত্মা নহে, এইরূপ দর্শন করিবে। সেই শরীরাদির প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত অধ্যাত্মবিষয়ক অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ ষাঁহার পূর্বোক্ত অহঙ্কার নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করত “মুক্ত” ইহা কথিত হন, অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তিকে জীবমুক্ত বলে।

টিপ্পনী। শরীরাদি ছঃখপৰ্য্যন্ত দোষনিমিত্তসমূহের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ঐ তত্ত্বজ্ঞান মুমুক্শুর অবশ্য কর্তব্য, ইহা প্রথম সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এখন

১। জ্ঞানামুক্তিঃ। বঙ্কো বিপৰ্য্যয়াৎ। নিয়ন্তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পো ॥—সাংখ্যদর্শন, ৩য় অঃ, ২৩শ, ২৪শ, ২৫শ সূত্র অষ্টবা।

ঐ তত্ত্বজ্ঞানের আনুপূর্ববর্তী অর্গাৎ ক্রম কিরূপ? কোন্ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রথমে কর্তব্য, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি এই দ্বিতীয় সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে “প্রসংখ্যানানুপূর্ববর্তী তু খলু” এই কথা বলিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রসংখ্যানং সমাধিজং তত্ত্বজ্ঞানং”। প্রাণুর্ভবক “চক্ষু” ধাতু হইতে এই “প্রসংখ্যান” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। উহার অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। শ্রবণ ও মননের পরে সমাধিজাত তত্ত্বদাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট জ্ঞান, উহাই মুক্তির কারণ। উহা না হওয়া পর্য্যন্ত অনাদি মিথ্যাজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। তাই তাৎপর্যটীকাকার এখানে প্রসংখ্যান শব্দের পূর্বাভাসরূপ অর্গেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনেও “প্রসংখ্যানেপ্যকুসীদন্ত” ইত্যাদি—(৪।২:) সূত্রে “প্রসংখ্যান” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সূত্রার্গ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্গগুলি কামবিষয়, এ জন্ত “রূপাদি” কথিত হয়। তাৎপর্য এই যে, প্রথম অধ্যায়ে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই যে পঞ্চ পদার্থ ইন্দ্রিয়ার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহারা কামবিষয় বা কাম্য, এ জন্ত রূপাদি নামে কথিত হয়। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ঐ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্গগুলিই রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ, এই ক্রমে এবং ঐ সমস্ত নামে কথিত হইয়াছে। ঐ রূপাদি বিষয়গুলিতে যে সময়ে মিথ্যা সংকল্প বা মোহবিশেষ জন্মে, তখন উহারা ঐ সংকল্পানুসারে বিষয়বিশেষ রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন করে। মুমুক্শু সেই রূপাদি বিষয়সমূহকেই সর্বাঙ্গে প্রসংখ্যান করিবেন। অর্গাৎ রাগাদি দোষজনক বলিয়া প্রথমে ঐ সমস্ত বিষয়েরই তত্ত্ব দাক্ষাৎ করিবেন। তাৎপর্যটীকাকার ইহার যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমাধিজাত তত্ত্বদাক্ষাৎকাররূপ যে প্রসংখ্যান, তাহা রূপাদি বিষয়েই সূকর, এ জন্ত প্রাথমিক সাধকের ঐ রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বদাক্ষাৎকারেই সর্বাঙ্গে প্রযত্ন কর্তব্য। ভাষ্যকার উক্ত যুক্তি অনুসারে রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বদাক্ষাৎকারেরই প্রথম কর্তব্যতা প্রকাশ করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বদাক্ষাৎকারজন্ত ঐ রূপাদি বিষয়ে মিথ্যা সংকল্প বা মোহবিশেষ নিবৃত্ত হয়। তাহার পরে আত্মাতে শরীরাদির প্রসংখ্যান কর্তব্য। তজ্জন্ত আত্মবিষয় অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। আত্মাতে শরীরাদির প্রসংখ্যান কি? এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে,—“এই শরীরাদি আত্মা নহে” এইরূপে যে ব্যতিরেক দর্শন, অর্থাৎ আত্মা ও শরীরাদির ভেদদাক্ষাৎকার, উহাই আত্মাতে শরীরাদির প্রসংখ্যান। উহাই মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান। শরীরাদি পদার্থে আত্মার ভেদ দর্শনই উপনিষদ্রুত আত্মদর্শন, ইহাই উদ্যোতকর প্রভৃতি শ্রীমদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। কলকথা, শরীরাদি ছুঃখপর্য্যন্ত দোষনিমিত্ত যে সমস্ত প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানের কর্তব্যতা প্রথম সূত্রে সূচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই প্রথম কর্তব্য। তাহার পরে শরীরাদি ও আত্মার তত্ত্বজ্ঞান কর্তব্য। তত্ত্বজ্ঞানের এই ক্রম প্রদর্শনের জন্তই মহর্ষি এই দ্বিতীয় সূত্রটি বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতির তাৎপর্য।

ভাষ্যকার এই সূত্রে “সংকল্প” শব্দের দ্বারা যে মিথ্যা সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার মতে মোহবিশেষ, ইহা পূর্বে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ১১শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকার ও বার্তিককারের মতভেদ ও বাচস্পতি মিশের সমাধানও চতুর্থ খণ্ডে লিখিত

হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ৩২৭—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । কিন্তু বার্তিককার পূর্বে অনুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকে “সংকল্প” বলিলেও এখানে তিনিও এই সূত্রোক্ত সংকল্পকে নোহবিশেষই বলিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে লিখিয়াছেন,—“সংকল্পঃ সমীচীনত্বেন ভাবনং, তদ্বিশয়ীকৃত্য রূপাদয়ো দোষশ্চ রাগাদের্নিমিত্তং” । অর্থাৎ সম্যক্ কল্পনা বা সমীচীন বলিয়া যে ভাবনা, উহাই এখানে সূত্রোক্ত “সংকল্প” । রূপাদি বিষয়গুলি ঐরূপ ভাবনার বিষয় হইলে তখন উহার রাগাদিদোষ উৎপন্ন করে । এখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত ঐ সংকল্প পদার্থও যে মোহবিশেষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ভগবদ্গীতার “সংকল্পপ্রভবান্ কামান্” (৬।২৪) ইত্যাদি শ্লোকেও “সংকল্প” শব্দ ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাষ্যকার শঙ্কর ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি উহা ব্যক্ত না করিলেও আনন্দগিরি উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ” । যাহা শোভন নহে, তাহাকে শোভন বলিয়া যে ভ্রম, তাহাকে বলে শোভনাধ্যাস । টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী ঐ স্থলে সুব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন,—“সংকল্প ইব সংকল্পো দৃষ্টেষপি বিষয়েষু শোভনত্বাদি-দর্শনেন শোভনাধ্যাসঃ” । সুতরাং তাঁহার মতেও ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকোক্ত “সংকল্প” যে মোহবিশেষ বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, এ বিষয়েও সংশয় নাই । কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,—“সংকল্প ইদং মে ভূয়াদিতি চেতোবৃত্তিঃ” । তাঁহার মতে “ইহা আমার হউক,” এইরূপ আকাঙ্ক্ষায়ক চিত্তবৃত্তিবিশেষই সংকল্প । বস্তুতঃ সংকল্প শব্দের ঐ অর্থই সুপ্রসিদ্ধ । ভগবদ্গীতার ঐ বর্ষ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ঐ সুপ্রসিদ্ধ অর্থেই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু পরে ২৪শ শ্লোকে “সংকল্পপ্রভবান্ কামান্” এই স্থলে নোহবিশেষ অর্থেই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বহুসম্মত । কারণ, নোহবিশেষ হইতেই কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এখানেও ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই সূত্রকারোক্ত রাগাদির জনক সংকল্পকে মোহ-বিশেষই বলিয়াছেন । ভাষ্যকার এখানে “নিখ্যা” শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূত্রোক্ত “সংকল্প” শব্দের ঐ অর্থবিশেষ ব্যক্ত করিয়াছেন । বার্তিককারও এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, “এই সমস্ত রূপাদি আমারই” এইরূপে অসাধারণভাবে প্রতীতির জনক যে নিশ্চয় অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রমবিশেষ, তাহাই রূপাদি বিষয়ের নিখ্যা সংকল্প । সুতরাং “এই সমস্ত আমারই নহে, উহা তঙ্কর, অগ্নি ও জ্ঞাতিবর্গসাধারণ” এইরূপে সাধারণ বলিয়া ঐ রূপাদি বিষয়ের প্রসংখ্যান করিতে হইবে । উহার দ্বারাই রূপাদিবিষয়ক পূর্বোক্ত নিখ্যা সংকল্প বা নোহবিশেষের নিবৃত্তি হয় ।

ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে আত্মবিষয়ক সর্বপ্রকার অহঙ্কার নিবৃত্তি হইলে, তখন তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করত মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । অর্থাৎ মুক্তির জন্ম তখন তাঁহার আর কিছুই কর্তব্য থাকে না । ঐরূপ ব্যক্তিকেই জীবমুক্ত বলা হইয়াছে । বস্তুতঃ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—“যতেহ্লিয়-মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ । বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥” (৫।২৮) । টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবৈত্যর্থঃ ।” অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মুক্তই । বার্তিককার উদ্যোতকরও এখানে সর্বশেষে “জীবন্নে-

বহি বিদ্বান্ সংহর্ষায়াসাত্ম্য মুচ্যতে” এই শাস্ত্রবাক্য বা শাস্ত্রমূলক প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণার পূর্বে যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্তি দ্বিবিধ, পরা ও অপরা। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনন্তরই কাহারও পরা মুক্তি অর্থাৎ বিদেহমুক্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সেই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তাঁহার পরিদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়া বাইতে পারেন না। অতত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপদেশ শাস্ত্র হইতে পারে না - তত্ত্বদর্শীর উপদেশই শাস্ত্র। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরাই জীবিত থাকিয়া শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার মুক্তির চরম কারণ। সুতরাং তাঁহারাও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে মুক্তিনাভ করিয়াছেন। উহা অপরা মুক্তি, ঐ অপরা মুক্তির নামই জীবনমুক্তি। উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে সেখানেও শেষে “জীবমেবহি বিদ্বান্” ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও “জীবনমুক্তশ্চ” (৭৮) এই সূত্রের পরে ৫ সূত্রের দ্বারা জীবনমুক্তের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে “উপদেশোপদেশেষ্ট্রাত্ত্বং তৎসিদ্ধিঃ” (৭৯) এবং “ইতরথাহরূপরম্পরা” (৮১) এই সূত্রের দ্বারা জীবনমুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশটা হইতে পারেন না; সুতরাং তত্ত্বদর্শী জীবনমুক্তের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, এই যুক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং “প্রতিশ্চ” (৮০) এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত যুক্তি বা অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতও যে, জীবনমুক্তের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ আছে, ইহা কথিত হইয়াছে। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে তজ্জন্ম কর্মক্ষয় হওয়ায় আর শরীরধারণ বা জীবন রক্ষা কিরূপে হইবে? এতদ্বত্তরে শেষে “চক্রভ্রমণবদ্ধতশরীরঃ” (৮২) এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যেমন কুন্তকারের কর্মনিবৃত্তি হইলেও পূর্বকৃত কর্মজন্ম বেগবৎ তৎ ক্রিয়াকাল পর্য্যন্ত স্বয়ংই চক্র ভ্রমণ করে, তদ্রূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে সঞ্চিত কর্মক্ষয় হইলেও এবং অত্যাশুভাত্ত কর্ম উৎপন্ন না হইলেও প্রারব্ধ কর্মজন্ম কিছু কাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ বা জীবন রক্ষা হয়। পরে “সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ” (৮৩) এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, তত্ত্বদর্শী জীবনমুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অল্পাবশিষ্ট বিষয়সংস্কার থাকে, উহা তাঁহাদিগের শরীর ধারণের হেতু। কেহ কেহ ঐ “সংস্কার” শব্দের দ্বারা অবিদ্যাসংস্কার বুঝিয়া জীবনমুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিদ্যা-সংস্কারের লেশ থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অত্যাশু কোন কোন গ্রন্থেও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সাংখ্যচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা কেবল জন্মাদিরূপ কর্মবিপাকারম্ভেই কারণ। যোগদর্শনভাষ্যে ব্যাসদেবও ঐরূপই বলিয়া গিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্মফল ভোগে অবিদ্যাসংস্কারের কোন আবশ্যকতা নাই। মুঢ় জীবের যে কর্মফলভোগ, তাহাই অবিদ্যাসংস্কারসাপেক্ষ। তত্ত্বদর্শী জীবনমুক্ত ব্যক্তিদিগের উৎকট রাগাদি না থাকায় তাঁহাদিগের সুখদুঃখভোগ প্রকৃত ভোগ নহে; কিন্তু উহা ভোগাভাস। পরন্তু তত্ত্বদর্শী জীবনমুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিদ্যাসংস্কারের লেশ থাকিলে তাঁহাদিগেরও কর্মজন্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকে মুক্ত বলা বাইতে পারে না। পরন্তু তাঁহাদিগেরও অবিদ্যা থাকিলে তাঁহাদিগের তত্ত্বোপদেশ যথার্থ উপদেশ হইতে পারে

না। সূত্রাং অক্ষপরম্পরাপত্তি-দোষ অনিবার্য। বিজ্ঞানভিক্ষু শেষ কথা বলিয়াছেন যে, জীবমুক্ত-দিগের অবিদ্যাসংস্কারের লেশ স্বীকারে কিছুমাত্র প্রয়োজন ও প্রমাণ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের বিষয়-সংস্কারলেশ অদৃশ্য স্বীকার্য। উহাই তাঁহাদিগের শরীর ধারণের হেতু। পূর্বোক্ত সাংখ্যসূত্রে “সংস্কারলেশ” শব্দের দ্বারা ঐ বিষয়সংস্কারলেশই কথিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসাভাষ্যে উক্ত মত বিশদরূপে সমর্থন করিয়াছেন। মূলকথা, জীবমুক্তি শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। সাংখ্যদর্শনের শ্রায় যোগদর্শনেও শেষে “ততঃ ক্লেশকর্ষনিবৃত্তিঃ” (৪।৩০। এই সূত্রের দ্বারা জীব-মুক্তি স্থচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব সেখানে “ক্লেশকর্ষনিবৃত্তৌ জীবন্তেব বিদ্বান্ বিমুক্তৌ ভবতি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা জীবমুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। “জীবমুক্তিবিবেক” গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি কঠোপনিষদের “বিমুক্তশ্চ বিমুক্ত্যেত” এই শ্রুতিবাক্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের “যদা সৰ্বৈ প্রমুক্ত্যন্তে কামা যেহন্ত হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতৌ ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্র্যতে” ॥ এই শ্রুতিবাক্য এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন জীবমুক্তিবিষয়ে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (জীবমুক্তিবিবেক, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৬২—১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দত্তাত্রেয়-প্রাক্ত “জীবমুক্তিগীতা” প্রভৃতি আরও নানা শাস্ত্রগ্রন্থে জীবমুক্তির স্বরূপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের “তত্ত্ব তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত্থ সম্পদ্যন্ত” (৫।১৪।২) এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির যে মুক্তির জন্ত আর কোন কর্তব্য থাকে না, কেবল প্রারব্ধ-কর্মভোগের জন্তই তিনি কিছুকাল জীবিত থাকেন, এই সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্ত বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের সর্বশেষে—“ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাহং সম্পদ্যতে” (১৯শ) এই সূত্রের দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ভোগদ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম ক্ষয় করিয়া মুক্ত হন, ইহা কথিত হইয়াছে। উহার পূর্বে “অনারব্ধকর্মণ্যেব তু পূর্বৈ তদবধেঃ” (১৫শ) এই সূত্রের দ্বারাও ঐ শ্রুতি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম দ্বিবিধ—(১) সঞ্চিত ও (২) প্রারব্ধ। যে কর্মের কার্যের অর্থাৎ ফলের আরম্ভ হয় নাই, তাহার নাম সঞ্চিত কর্ম। পূর্বোক্ত বেদান্তসূত্রে “অনারব্ধকর্মণ্যে” এই দ্বিবিচিন্তাস্ত পদের দ্বারা ঐ সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরূপ দ্বিবিধ কর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি “অনারব্ধকর্মণ্যে” এই শব্দের দ্বারা ঐ দ্বিবিধ সঞ্চিত কর্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর যে কর্মের কার্যের অর্থাৎ ফলের আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ যে কর্মদ্বারা সেই জন্মলাভ বা শরীরারম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম প্রারব্ধ-কর্ম। পূর্বোক্ত বেদান্তসূত্রানুসারে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐ কর্মকে বলিয়াছেন—“আরব্ধকর্মণ্যে”। পূর্বোক্ত “ভোগেন ত্বিতরে” ইত্যাদি শেষ সূত্রে “ইতরে” এই দ্বিবিচিন্তাস্ত পদের দ্বারা ঐ আরব্ধকর্মণ্যে পুণ্য ও পাপরূপ দ্বিবিধ প্রারব্ধ কর্মই গৃহীত হইয়াছে। বাক্য পূর্বোক্ত “অনারব্ধকর্মণ্যে সঞ্চিত কর্মের ইতর, তাহাই আরব্ধকর্মণ্যে প্রারব্ধ কর্ম। উহার মধ্যে পূর্ণ পূর্ণ জন্মান্তরসঞ্চিত এবং ইহজন্মেও তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বপর্য্যন্ত সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরূপ কর্মই বেদান্তসূত্রোক্ত “অনারব্ধকর্মণ্যে” সঞ্চিত কর্ম। তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখনই ঐ সমস্ত সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদান্তদর্শনে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ও ঐ তাৎপর্য্যই বলিয়াছেন,

“জ্ঞানায়িঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভগ্নসাং কুরুতে তথা” (৪।৩৮)। কিন্তু পূৰ্বোক্ত আরক-কাৰ্য্য পুণ্য ও পাপৰূপ প্রারককৰ্ম্ম ভোগমাত্রনাশ। ভোগ ব্যতীত কোন কালেই উহার ক্ষয় হয় না। তাই ঐ প্রারক কৰ্ম্মকেই গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম বহ্নকোটিশতৈরপি”। বেদাস্তদৰ্শনে পূৰ্বোক্ত “ভোগেন দ্বিতরে ক্ষয়িত্বাহং সম্পদ্যতে” এই সূত্ৰের দ্বারা তত্ত্বদাক্ষাৎকার হইলেও ভোগের দ্বারা সঞ্চিত কৰ্ম্ম হইতে “ইতর” প্রারককৰ্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার পরে দেহ-পাত হইলে বিদেহমুক্তি বা পরামুক্তি লাভ হইবে, এই সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত হইয়াছে। “তস্ত তাবদেব চিরং যাবন বিমোক্ষোহং সম্পংস্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত সিদ্ধান্তের মূল। যাহারা শীঘ্রই প্রারক কৰ্ম্মক্ষয় করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগবলে কাৰ্য্যবাহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগদ্বারা সমস্ত প্রারক কৰ্ম্মক্ষয় করেন, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বাংলায়নও অগ্ন প্রসঙ্গে ঐ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ শাস্ত্রে “ক্রিয়মাণ,” “সঞ্চিত” ও “প্রারক” এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মবিভাগও দেখা যায়। দেবীভাগবতে ঐ ত্রিবিধ কৰ্ম্মের পরিচয়াদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বৰ্ত্তমান কৰ্ম্মকে “ক্রিয়মাণ” কৰ্ম্ম এবং অনেক-জন্মকৃত পুরাতন কৰ্ম্মকে সঞ্চিত কৰ্ম্ম এবং ঐ সঞ্চিত কৰ্ম্মনমূহের মধ্যেই দেহারম্মকালে কাল-প্রেৰিত হইয়া দেহারম্মক কতকগুলি কৰ্ম্মবিশেষকে প্রারক কৰ্ম্ম বলা হইয়াছে (দেবীভাগবত, ৬।১০।৯, ১১।১।১১।২২—৪ দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, যে কৰ্ম্মদ্বারা জীবের সেই জন্ম বা দেহবিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা প্রারককৰ্ম্ম এবং উহা ভোগমাত্রনাশ। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও উহা ভোগ করিবার অগ্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, কারণ, ভোগ ব্যতীত কিছুতেই উহার ক্ষয় হয় না, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বিদ্যারণ্য মুনি “জীবমুক্তিবিবেক” গ্রন্থে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠায়) চরমকল্পে প্রারককৰ্ম্ম হইতেও যোগাভ্যাসের প্রাবল্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে সেখানে বলিয়াছেন যে, যোগাভ্যাসের প্রাবল্যবশতঃই উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি যোগীদিগের যোগপ্রভাবে স্বেচ্ছায় দেহতাগ উপপন্ন হয়। পরে তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া তদ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বাশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—“এই সংসারে সকলেই সম্যক্ অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মরূপ পুরুষকারের দ্বারা সমস্তই লাভ করিতে পারে”^১। যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্শুপ্রকরণে দৈববাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রবিহিত পুরুষকারের সৰ্ব্বসাধকত্ব বিশেষরূপে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ পুরুষকার বে, অনর্থের কারণ, ইহাও কথিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার “পঞ্চদশী” গ্রন্থে “ভৃগুদীপে” দৈবের প্রাধাত্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—“অবশ্যস্তাভিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্বদি। তদা হঃখৈর্ন লিপ্যরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥” কিন্তু জীবমুক্তিবিবেক গ্রন্থে পরে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বচন দ্বারা বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার “অনুভূতিপ্রকাশ” গ্রন্থেও প্রারককৰ্ম্ম ও জীবমুক্তি বিষয়ে আরও বহু বহু কথা বলিয়াছেন। “জীবমুক্তিবিবেক”র বহুবিজ্ঞ টীকাকার নানা প্রমাণ ও বিস্তৃত বিচারের দ্বারা

১। সৰ্ব্বমবেবহি সদা সংসারে রঘুনন্দন।

সম্যক্ প্রযুক্তাং সৰ্ব্বেণ পৌরুষাং সমাপ্যতে ॥—যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্শু প্রকরণ, চতুর্থ সর্গ।

বিরোধ ভঞ্জনপূৰ্বক তাঁহাৰ চৰম সিদ্ধান্ত সমর্থন কৰিয়াছেন। অন্তঃসন্ধিঃ পৃষ্ঠক ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ কৰিলে উক্ত বিষয়ে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি যোগপ্রভাবে ভোগ ব্যতীতও প্রারক কৰ্মক্ষয় হয়, তাহা হইলে “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম কল্পকোটি-শতৈরপি” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং “ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপয়িত্বা” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও ভগবান্ শঙ্করা-চাৰ্য্যৰ ব্যাখ্যাৰ কিৰূপে সামঞ্জস্য হইবে, ইহা চিন্তা কৰা আবশ্যক। পরন্তু যদি ভোগ ব্যতীতও যোগপ্রভাবেই সমস্ত প্রারক-কৰ্মের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তত্ত্বদক্ষাৎকার কৰিয়াও যোগীৰ কায়-বৃহনিন্মাণের প্রয়োজন কি? এবং যোগদৰ্শনে উহাৰ উল্লেখ আছে কেন? ইহাও চিন্তা কৰা আবশ্যক। যোগপ্রভাবে যোগীৰ যে কায়বৃহ নিৰ্মাণে সামৰ্গ্য জন্মে এবং ইচ্ছা হইলে তিনি অতি শীঘ্রই সমস্ত প্রারককৰ্ম ভোগের জন্ত কায়বৃহ নিৰ্মাণ করেন, ইহা ত যোগশাস্ত্রানুসারে সকলেরই স্বীকাৰ্য্য। তাহা হইলে উদ্দালক ও বোতহব্য প্রভৃতি যে সমস্ত যোগী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ কৰিয়াছি-লেন, তাঁহারাও নানা স্থানে অতি শীঘ্রই কায়বৃহ নিৰ্মাণপূৰ্বক ভোগ দ্বাৰাই সমস্ত প্রারক কৰ্ম ক্ষয় কৰিয়াছিলেন, ইহাও ত অবশ্য বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যে তাহাই করেন নাই, ইহা নিৰ্ণয় কৰিবার কি প্রমাণ আছে? এইরূপ সৰ্বত্রই ভোগদ্বাৰাই প্রারককৰ্মবিশেষের ক্ষয় স্বীকাৰ কৰিলে কোন অন্তঃসন্ধি হয় না। নচেৎ “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম কল্পকোটিশতৈরপি” “অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভং।” ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের কিৰূপে উপপত্তি হইবে? কেহ কেহ উক্ত স্মৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহাৰ প্রামাণ্যই নাই, এইরূপ বিচাৰেরও অবতারণা কৰিয়াছেন। কারণ, “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি” এই (মুণ্ডক)-শ্রুতিবাক্যের দ্বাৰা তত্ত্বজ্ঞান সৰ্বকৰ্মেরই নাশক, ইহাই বুঝা যায়। সূত্রাৎ উহাৰ বিরুদ্ধ কোন স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না; এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু “তস্ত তাবদেব চিরং” ইত্যাদি (ছান্দোগ্য)-শ্রুতি-বাক্যের সহিত সন্মত্বে উক্ত শ্রুতিবাক্যও “কৰ্ম্মন্” শব্দের দ্বাৰা প্রারক ভিন্ন সমস্ত কৰ্ম্মই বিবক্ষিত বুঝিলে উক্ত শ্রুতির সহিত উক্ত স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। পূৰ্বোক্ত “ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপয়িত্বা” ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের দ্বাৰাও উক্তরূপ শ্রোত সিদ্ধান্তই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার “জ্ঞানায়িঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি” (৪।৩৮) এই শ্লোকে ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণও সৰ্বকৰ্ম্ম বলিতে প্রারক ভিন্ন সমস্ত কৰ্ম্মই ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। কিন্তু “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি”র শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক বিচাৰ কৰিয়া, সৰ্বশেষে তত্ত্বজ্ঞানকে সৰ্বকৰ্ম্মনাশক বলিয়াই সিদ্ধান্ত কৰিয়াছেন। তাঁহাৰ মতে ভোগ তত্ত্বজ্ঞানেরই ব্যাপার। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন কৰিয়া তদ্বাৰা অবশিষ্ট প্রারক কৰ্ম্মের নাশক হয়। সূত্রাৎ “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি” এই শ্রুতিবাক্য ও ভগবদ্গীতার “জ্ঞানায়িঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি” এই বাক্যে “কৰ্ম্মন্” শব্দের অর্থসংকোচ কৰা অনাবশ্যক। কিন্তু তাঁহাৰ উক্ত মত পূৰ্বোক্ত “ভোগেন দ্বিতরে” ইত্যাদি বেদান্ত-

১। উচ্যতে বৰ্ণণেঃ ভোগব্যবস্থেহপি জ্ঞানস্য কৰ্ম্মনাশকত্বং। ভোগস্য তত্ত্বজ্ঞানব্যাপারত্বং।—“ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি”র শেষ।

স্বত্রবিরুদ্ধ হয় কি না, উক্ত স্বত্রে “তু” শব্দের দ্বারা ভোগই প্রারম্ভ কর্ণের নাশক, তত্ত্বজ্ঞান উহার নাশক নহে, ইহাই স্থচিত হইয়াছে কি না, ইহা সুধীগণ প্রণিধানপূর্বক চিন্তা করিবেন।

অবশ্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্শুপ্রকরণে (৫৬৭৮ সর্গে) ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কৰ্ম প্রবল হইলে উহা প্রাক্তন কৰ্মকে নিবৃত্ত করিতে পারে, ঐহিক শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারা প্রাক্তন দৈবকে নিবৃত্ত করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণকাম হওয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রারম্ভ কৰ্ম ভিন্ন প্রাক্তন অতীত দৈবই শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, ইহাই সেখানে তাৎপর্য্য বুঝিলে কোন শাস্ত্রবিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। “ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপয়িত্বা” ইত্যাদি বেদান্তসূত্রানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে শ্রৌত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধের কোন আশঙ্কা থাকে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের বিচার বা সমর্থন না করিলেও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক বিদ্যারণ্য মুনি কেন তাহা করিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত ঐহিক পুরুষকারের দ্বারা সমস্ত প্রাক্তন কৰ্মেরই নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহাই যোগবাশিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হইলে ঐ শাস্ত্রীয় কৰ্মবিশেষ ইহজন্মেই সমস্ত প্রারম্ভ কৰ্মের ভোগ সম্পাদন করিয়াই স্থলবিশেষে উহার বিনাশ সাধন করে, ইহাও তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত কৰ্মবিশেষ ইহ জন্মেই সমস্ত প্রারম্ভ কৰ্মের ফলভোগ জন্মাইয়া পরম্পরায় সমস্ত প্রারম্ভ নাশের কারণ হয়। আর যোগবাশিষ্ঠে যে, দৈববাদীর ঈন্দ্র ও শাস্ত্রীয় পুরুষকারের প্রাধান্য বোধিত হইয়াছে, তাহাতে দৈবমাত্রবাদী অকৰ্ম্মা ব্যক্তিদিগের কৰ্মে প্রবর্তনই উদ্দেশ্য বুঝা যায়। কারণ, পূর্বতন দেহোৎপন্ন দৈব না থাকিলেও কেবল শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারাই ইহকালে সর্বসিদ্ধি হয়, ইহা আর্থ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। উক্ত বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে বেদমূলক প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত আর্থ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু যোগবাশিষ্ঠে যে শাস্ত্রীয় পুরুষকারের সর্বসাধকত্ব বোধিত হইয়াছে, এবং প্রতিকূল দৈবস্বংসের জন্ত শাস্ত্রে যে নানাবিধ কৰ্মের উপদেশ হইয়াছে, ঐ সমস্ত কৰ্ম বা ঐহিক পুরুষকারও কি দৈব ব্যতীত হইতে পারে? এবং সকলেই কি বিশ্বামিত্র সাবিত্রী প্রভৃতির গ্ৰায উৎকট তপস্বী করিতে পারে? প্রবল দৈবের প্রেরণা ব্যতীত ঐ সমস্ত কৰ্মে কাহারও প্রবৃত্তিই জন্মে না। অনাদি সংসারে সকল জীবই দৈবের প্রেরণাবশতঃই পুরুষকার করিতেছে, ইহা পরম সত্য। শাস্ত্রীয় পুরুষকারও অপর দৈবকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই ভাবে দৈবের প্রাধান্যও সমর্থিত হয়। কলকথা, সমস্ত কৰ্মসিদ্ধিতেই পুরুষকারের গ্ৰায দৈবও নিতান্ত আবশ্যক। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তুল্যভাবেই বলিয়া গিয়াছেন,—“দৈবে পুরুষকারে চ কৰ্মসিদ্ধির্কব্যবস্থিতা।”^১ ভারতের কবিও ভারতীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—“প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা”।

মূল কথা, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রারন্ধ কৰ্ম ভোগের জন্ত যে কিছুকাল জীবনধারণ করেন এবং ভোগ ব্যতীত যে কাহারই প্রারন্ধ কৰ্মক্ষয় হয় না, ইহাই বহুদম্বত প্রাচীন সিদ্ধান্ত। অবশ্য গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারে গোবিন্দভাষ্যে পরম আতুর ভক্ত-বিশেষের সম্বন্ধে ভোগ ব্যতীতই শ্রীভগবানের রূপায় সমস্ত প্রারন্ধ কৰ্মের ক্ষয় হয়, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন^১ এবং বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষোক্ত “উপপদ্যতে চাপ্পলভ্যতে চ” এবং “সৰ্ব্বধৰ্ম্মোপপত্তেচ” এই শূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যাস্তর করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের পক্ষপাত না থাকিলেও ভক্তবিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে এবং উহা তাঁহার দোষ নহে,—পরস্তু গুণ। কিন্তু শ্রীভগবান্ পরম আতুর ভক্ত-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ তাঁহার প্রারন্ধ কৰ্মসমূহ তাঁহার আত্মীয়বর্গকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে লইয়া যান। তখন হইতে তাঁহার আত্মীয়বর্গই তাঁহার অবশিষ্ট প্রারন্ধ কৰ্মভোগ করে, ইহাই বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরে সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ে ঋতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক^২। সুতরাং স্থলবিশেষে অত্নের ভোগ হইলেও প্রারন্ধ কৰ্ম যে অশ্রু ভোগা, ভোগ ব্যতীত যে উহার ক্ষয় হইতেই পারে না, ইহা বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরও স্বীকৃত, সন্দেহ নাই। নচেৎ শ্রীভগবান্ রূপায় হইয়াও তাঁহার পরম আতুর ভক্তবিশেষকে নিজের নিকটে লইবার জন্ত তাঁহার আত্মীয়বর্গকে ভোগের জন্ত তাঁহার প্রারন্ধ কৰ্মসমূহ দান করিবেন কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই বা উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন কেন? অবশ্য করুণাময় শ্রীভগবানের করুণাশ্রুণে ভক্তবিশেষের পক্ষে সমস্তই হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন এখানে যে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে “মুক্ত” বলিয়াছেন, সেই জীবনমুক্ত ব্যক্তি প্রারন্ধ কৰ্ম ভোগের জন্ত কিছু কাল জীবনধারণ করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করেন এবং তাঁহার উপলব্ধ তত্ত্বের উপদেশ করেন, ইহাই পূর্বাচার্য্যগণ সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন^৩। উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে

কেচিদ্দৈবাং স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারণতঃ ।

সংযোগে কেচিদ্বিচ্ছন্তি ফলং কুণলবুদ্ধয়ঃ ॥

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন ব্রথস্যান্ধতিভবৎ ।

এবং পুরুষকারণে বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ম অঃ, ৩৪৯, ৫০, ৫১ ।

১। ব্রহ্মৈকরতানাং পরমাতুরাণাং কেবাঙ্কিন্নিরপেক্ষাণাং বিটৈব ভোগমুত্তরোঃ পুণ্যাপায়োর্বিশেষঃ শ্রাৎ ।

২। তন্মাদতিপ্রোদসাং স্বং ব্রহ্মমূর্ত্তানাম্ কেবাঙ্কিভক্তানাং স্বান্তিলম্বমসহিষ্ণুরীষদন্তঃপ্রাদ্ধকানি তদীয়েভ্যাঃ প্রদায় তান্ স্বান্তিকং নরতীতি বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে”।—বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, প্রথম পাদের ১৭শ শূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য ।

৩। সম্যগ্জ্ঞানাদিগমাদধৰ্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ ।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রলম্বৎসুতশরীঃ ।—সাংখ্যকারিকা, (৬৭ম কারিকা) ।

বেদান্তদর্শনের পূর্বোক্ত “অনারক্কার্যো এবতু” (৪।১।১৫) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষ ইহাও বলিয়াছেন যে, “অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা কক্ষিকালং শরীরং ধ্রিয়তে ন বা ধ্রিয়তে”। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি কিছুকাল শরীর ধারণ করেন কি না, এই বিষয়ে বিবাদই করা যায় না। শঙ্করাচার্য্য সর্বশেষে চরম কথা বলিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশের দ্বারা জীবন্মুক্তের লক্ষণই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে “প্রজহাতি যদা কামান্” ইত্যাদি (৫৫শ) শ্লোকের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তদ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই স্বরূপবর্ণন হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ শ্লোকের টীকায় উহা সমর্থন করিতে মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সেখানে জীবন্মুক্তির শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের “যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষশ্চ হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥” (৪।৪।৭) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলকথা, জীবন্মুক্তি বেদাদিশাস্ত্রসিদ্ধ। অনেক জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্তও দেহধারণ করিয়া বর্তমান ছিলেন এবং এখনও অবশ্য অনেক জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বর্তমান আছেন, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্বোক্ত “অনারক্কার্যো এবতু” (৪।১।১৫) ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-ভামতীতে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও হিরণ্যগর্ভ, মনু ও উদ্দালক প্রভৃতি দেবর্ষিগণের অবিদ্যা নিখিল ক্লেশনিবৃত্তি ও ব্রহ্মজ্ঞতা এবং শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞতা ও মহাকল্প, ব্রহ্ম ও মন্বন্তরাদি কাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ যে শ্রুত হয়, ইহারও উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন ॥২॥

ভাষ্য। অতঃপরং কাচিৎ সংজ্ঞা হেয়া কাচিদ্ভাবয়িতব্যেতু্যপ-
দিশ্যতে, নার্থ-নিরাকরণমর্থোপাদানং বা। কথমিতি ?

অনুবাদ। অনন্তর কোন্ সংজ্ঞা হয়, কোন্ সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহা উপদিষ্ট হইতেছে, অর্থের নিরাকরণ অথবা অর্থের গ্রহণ হইতেছে না (অর্থাৎ পরবর্তী সূত্রের দ্বারা বাহ্যবিষয়ের খণ্ডন বা সংস্থাপন করা হয় নাই, কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে।) (প্রশ্ন) কিরূপে ?

সূত্র। তন্নিমিত্তস্ববয়ব্যভিমানঃ ॥৩॥৪১৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল কারণ কিন্তু অবয়বি-বিষয়ে অভিমান।

ভাষ্য। তেষাং দোষাণাং নিমিত্তস্ববয়ব্যভিমানঃ। সা চ খলু স্ত্রীসংজ্ঞা সপরিষ্কারা পুরুষশ্চ, পুরুষসংজ্ঞা চ স্ত্রীয়াঃ সপরিষ্কারা, নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ। নিমিত্তসংজ্ঞা—রসনাশ্রোত্রং, দন্তোষ্ঠং, চক্ষুর্নাসিকং।

অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা—ইথমোষ্ঠাবিতি । সেয়ং সংজ্ঞা কামং বর্দ্ধয়তি তদনু-
যক্তাংশ্চ দোষানু বিবর্জ্জনীয়ানু, বর্জ্জনস্তৃপ্তাঃ ।

ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা—কেশ-লোম-মাংস-শোণিতাস্থি-স্নায়ু-শিরা-কফ-
পিত্তোচ্চাদিসংজ্ঞা, তামশুভসংজ্ঞেত্যাচক্ষতে । তামশু ভাবয়তঃ
কামরাগঃ প্রহীয়তে ।

সত্যেব চ দ্বিবিধে বিষয়ে কাচিৎ সংজ্ঞা ভাবনীয়া কাচিৎ পরিবর্জ্জ-
নীয়েতু্যপদিশ্যতে,—যথা বিষমস্পৃহেহ্মেহ্মসংজ্ঞোপাদানায় বিষমংজ্ঞা
প্রহাণায়ৈতি ।

অনুবাদ । সেই দোষসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মূল কারণ কিন্তু অবয়ববিষয়ে
অভিমান । সেই অভিমান, যথা—পুরুষের সম্বন্ধে সপরিষ্কার স্ত্রীসংজ্ঞা অর্থাৎ এই
স্ত্রী সুন্দরী, এইরূপ বুদ্ধি, এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে সপরিষ্কার পুরুষসংজ্ঞা, অর্থাৎ এই
পুরুষ সুন্দর, এইরূপ বুদ্ধি । এবং নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা । নিমিত্তসংজ্ঞা
যথা—রসনা ও শ্রোত্র, দন্ত ও ওষ্ঠ, চক্ষু ও নাসিকা (অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের
পরস্পরের রসনা, শ্রোত্র ও দন্তাদি বিষয়ে যে সামান্যজ্ঞান, তাহার নাম নিমিত্তসংজ্ঞা) ।
অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা যথা—দন্তসমূহ এই প্রকার,—ওষ্ঠদ্বয় এই প্রকার ইত্যাদি (অর্থাৎ
স্ত্রী বা পুরুষের দন্তাদিতে অন্য পদার্থের সাদৃশ্যমূলক আরোপবশতঃ পূর্বোক্তরূপ যে
বুদ্ধি, তাহার নাম অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা) । সেই এই সংজ্ঞা কাম বর্দ্ধন করে এবং সেই
কামানুষক্ত বিবর্জ্জনীয় দোষসমূহ বর্দ্ধন করে, এই সংজ্ঞার কিন্তু বর্জ্জন কর্তব্য ।

ভিন্নপ্রকার অবয়বসংজ্ঞা,—কেশ, লোম, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা,
কফ, পিত্ত ও উচ্চাদি (মূত্রপুরীষাদি) সংজ্ঞা, সেই অবয়বসংজ্ঞাকে (পণ্ডিতগণ)
“অশুভ সংজ্ঞা” ইহা বলেন । সেই অশুভসংজ্ঞাকে ভাবনা করিতে করিতে তাহার
কাম-রাগ অর্থাৎ কামমূলক রাগ প্রহীণ (পরিত্যক্ত) হয় ।

দ্বিবিধ বিষয়ই বিদ্যমান থাকিলেও কোন সংজ্ঞা ভাব্য, কোন সংজ্ঞা বর্জ্জনীয়, ইহা
উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন বিষমিশ্রিত অগ্নে অন্নসংজ্ঞা—গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞা
পরিত্যাগের নিমিত্ত হয় ।

টিপ্পনী । রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইলে দোষের নিমিত্ত হয়, ইহা পূর্বস্মৃতি
উক্ত হইয়াছে । তদ্বারা সর্বত্রই ঐ রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই কর্তব্য, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে ।
কিন্তু রাগাদি দোষসমূহের মূল কারণ কি ? এবং উহার নিবৃত্তির জন্ত বর্জ্জনীয় ও চিস্তনীয় কি ?

ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা অবয়ববিষয়ে অভিমানকে দোষসমূহের মূলকারণ বলিয়া কোন সংজ্ঞা বর্জনীয় ও কোন সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহার উপদেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্তিককার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের দ্বারা কোন সংজ্ঞা বর্জনীয় এবং কোন সংজ্ঞা চিন্তনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা অর্থের অর্থাৎ বাহ্যবিষয় বা অবয়ববীর খণ্ডন অথবা স্থাপন হয় নাই।

বস্তুতঃ মহর্ষি পরবর্তী প্রকরণের দ্বারাই বিশেষ বিচারপূর্বক অবয়ববীর সংস্থাপন করায় প্রকরণানুসারে এই সূত্রে তাঁহার পূর্বোক্তরূপ উদ্দেশ্যই বুঝা যায়। কিন্তু অবয়বো না থাকিলে তদ্বিষয়ে অভিমান বলাই যায় না। সুতরাং যাহারা অবয়বো মানেন না, তাঁহাদিগের প্রত্যাখ্যান এই সূত্রের উদ্দেশ্য না হইলেও ফলে ইহার দ্বারা তাহাও হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে অবয়ববীর খণ্ডন বা সংস্থাপন যে এখানে মহর্ষির উদ্দেশ্য নহে, ইহা স্বীকার্য্য। বার্তিককারও এখানে লিখিয়াছেন যে, যথাব্যবস্থিত বিষয়েই কিছু চিন্তনীয় ও কিছু বর্জনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত সংকল্পই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বলিয়া সরলভাবে বুঝা যায়। তাহা হইলে অবয়ববিষয়ে অভিমান পূর্বসূত্রোক্ত সংকল্পের নিমিত্ত, ইহাই সূত্রার্থ বুঝা যায়। “শ্রায়সূত্রবিবরণ”কার রাধানোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য নিজে উক্তরূপই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা রাগাদি দোষসমূহই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা প্রথমই লিখিত হইয়াছে।

অবয়ববিষয়ে অভিমান কিরূপ? ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিবার জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যেমন পুরুষের পক্ষে সুন্দরী স্ত্রীতে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা এবং স্ত্রীর পক্ষে সুন্দর পুরুষের সপরিষ্কারা পুরুষসংজ্ঞা, ইহা তাহাদিগের অবয়ববিষয়ে অভিমান। “সংজ্ঞা” বলিতে এখানে জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষই বুঝা যায়। বার্তিককারও এখানে শেযোক্ত “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা”কে মোহ বলিয়া “সংজ্ঞা” শব্দের জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। “পরিষ্কার” শব্দের বিশুদ্ধতা অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা প্রকৃত স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের সৌন্দর্য্যই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা, এই কথার দ্বারা সৌন্দর্য্যবিষয়ী স্ত্রীবুদ্ধি ও পুরুষবুদ্ধি বুঝা যায়। স্ত্রীবুদ্ধি ও পুরুষবুদ্ধিতে স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের পরিষ্কার অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বিষয় হইলে ‘এই স্ত্রী সুন্দরী’ এবং ‘এই পুরুষ সুন্দর’ এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে। ঐ বুদ্ধিকে সপরিষ্কারা স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা বলা যায়। ঐ পরিষ্কার বা সৌন্দর্য্য তখন স্ত্রী ও পুরুষের আসক্তিরূপ বন্ধনের প্ররোজক হওয়ায় যদ্বারা ঐ বন্ধন হয়, এই অর্থে ঐ সৌন্দর্য্যকেও বন্ধন বলা যায়। তাই বার্তিককার লিখিয়াছেন,—“পরিষ্কারো বন্ধনঃ।” কোন কোন পুস্তকে “পরিষ্কারশ্চ নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ” এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। কিন্তু বার্তিকের পাঠানুসারে উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বার্তিককার পূর্বোক্তরূপ

জীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন,—“তত্রাপি চ যে সংজ্ঞে—নিমিত্তসংজ্ঞা অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা চ।” জীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা স্থলে জী ও পুরুষের দস্তাদি বিষয়ে দস্তাদি নিমিত্ত নিবন্ধন দস্তাদিরূপে যে বুদ্ধি, তাহাকে “নিমিত্তসংজ্ঞা” বলা হইয়াছে। এবং ঐ দস্তাদি বিষয়ে “দস্তাসমূহ এই প্রকার”, “ওষ্ঠদ্বয় এই প্রকার”, ইত্যাদিরূপে যে বুদ্ধি, তাহাকে “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা” বলা হইয়াছে। মুদ্রিত “বৃত্তি”পুস্তকে যে “অনুরঞ্জনসংজ্ঞা” এইরূপ পাঠ এবং “অতএব ভাষ্যাদৌ পরিস্কারবুদ্ধিরনুরঞ্জনসংজ্ঞা” ইত্যাদি পাঠ দেখা যায়, উহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ভাষ্যাদি গ্রন্থে “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা” এইরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,^১ “ব্যঞ্জন” শব্দের অর্থ এখানে অবয়বীর অবয়বসমূহ। কারণ, অবয়বসমূহের সহিত অবয়বীর উপগন্ধি হয় অর্থাৎ অবয়বসমূহই সেই অবয়বীর ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। সুতরাং যদ্বারা অবয়বী ব্যক্ত হয়, এই অর্থে “ব্যঞ্জন” শব্দের দ্বারা অবয়বীর অবয়বসমূহ বুঝা যায়। “অনু” শব্দের সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া “অনুব্যঞ্জন” শব্দের দ্বারা অবয়বসমূহের সাদৃশ্য বুঝা যায়। সেই সাদৃশ্যবশতঃই অবয়বসমূহ অল্প পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। যেমন দস্তাসমূহে দাড়িম্ববীজের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে দাড়িম্ববীজের আরোপ করিয়া এবং বিশ্বফলের সহিত ওষ্ঠদ্বয়ের সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে বিশ্বফলের আরোপ করিয়া যে সংজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষ জন্মে, উহাকে পূর্বোক্ত অর্থে “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা” বলা যায়। বার্তিককারও “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা”র অল্প পদার্থের আরোপের উল্লেখ করিয়া ঐ সংজ্ঞাকে মোহ বলিয়াছেন এবং উহা রাগাদির কারণ বলিয়া বর্জনীয়, ইহা বলিয়াছেন। পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে তাৎপর্যটীকাকার এখানে পৃথী ছন্দের একটি ও মালিনী ছন্দের একটি শৃঙ্গাররসায়ক উৎকৃষ্ট কবিতার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা”র উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারোক্ত “অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা”র কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি উহার উদাহরণ প্রকাশ করিতে শ্লোক লিখিয়াছেন,—“খেলৎখঞ্জননয়না পরিণতবিষাধরা পৃথুপ্রাণী। কমলমুকুলস্তনীয়ং পূর্ণেন্দুমুখী সুখায় মে ভবিতা” ॥ পুরুষের পক্ষে কোন জীতে ঐরূপ সংজ্ঞা বা বুদ্ধিবিশেষ কামাদিবর্জক হওয়ায় অনিষ্ট সাধন করে, সুতরাং উহা বর্জনীয়। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্বোক্তরূপ জীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞা বলিয়া, পরে ঐ স্থলেই নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন-পূর্বক বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত সংজ্ঞা কাম ও কানমূলক বর্জনীয় দোষসমূহ বর্জন করে। সুতরাং ঐ সংজ্ঞা যে বর্জনীয়, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ। তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন, “বর্জনস্বভাঃ”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার যে সংজ্ঞা, যাহাকে মহর্ষি এই শব্দে অবয়ববিষয়ে অভিমান বলিয়াছেন, উহাই বর্জনীয় বা হেয়, উহা ভাবনীয় বা চিন্তনীয় নহে। কারণ, উহার ভাবনায় কামাদির বুদ্ধি হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানার্থী উহা বর্জন করিবেন।

ভাষ্যকার পরে “ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থলে জী ও পুরুষের

১। ব্যঞ্জনান্যবয়বিনোঃ বয়ববাস্তবঃ সহোপলম্ব্যঃ, তেষামনুব্যঞ্জনং তৎসাদৃশ্যং -তেন ভগারোপঃ :—তাৎপর্য-টীকা।

শরীরে কেশলোমাদি সংজ্ঞাকে ভিন্নপ্রকার “অবয়বসংজ্ঞা” বলিয়া উহার নাম “অশুভসংজ্ঞা” এবং ঐ সংজ্ঞাকে ভাবনা করিলে স্ত্রী ও পুরুষের কামমূলক রাগ বা আসক্তির ক্ষয় হয়, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং ঐ অবয়বসংজ্ঞা বা অশুভসংজ্ঞাই যে ভাবনীয়, ইহাই ঐ কথার দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের সৌন্দর্য্যাদি চিন্তা না করিয়া যদি তাহাতে অবস্থিত কেশ, লোম, মাংস, রক্ত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, কক, পিত্ত ও মূত্র প্রভৃতি পদার্থগুলির চিন্তা করা যায় এবং ঐ সংজ্ঞা বা কেশাদিবৃদ্ধির পুনঃ পুনঃ ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে কামমূলক আসক্তি ক্ষয়ে ক্রমশঃ বৈরাগ্য জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। বিবেকো ব্যক্তিগণ পূর্বেকৃত “অশুভসংজ্ঞা”কেই ভাবনা করেন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণে উহা নানাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিখ্যাত উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—“চর্চনির্ম্মিতপাত্রীং মাংসাস্বকৃপ্পূরিতা। অস্ত্রাং রজ্যতি যো মূঢ়ঃ পিশাচঃ কস্ততোহধিকঃ॥” পুরুষ স্ত্রীকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ তাহার স্ত্রীতে বৈরাগ্য জন্মে, সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানার্থী নিজের দেহাদিতেও পূর্বেকৃতরূপ “অশুভসংজ্ঞা” ভাবনা করিবেন। এইরূপ কোপনীয় শত্রুতে ঘেষাবর্দ্ধক যে সংজ্ঞা বা বুদ্ধিবিষেয, তাহাও বর্জ্জনীয়। বৃত্তিকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—“নাং ঘেষ্যামৌ ছুরাতার ইষ্টাদিষু যথেষ্টতঃ। কণ্ঠ-পীঠং কুঠারেন ছিরাহস্ত স্ত্রাং সূখী কদা॥” অর্থাৎ এই ছুরাতার সর্বত্র স্বার্থের জন্ত আমাকে ঘেষ করে। আমি কুঠারের দ্বারা কবে ইহার কণ্ঠপীঠ ছেদন করিয়া সূখী হইব—এইরূপ বুদ্ধি ঘেষাবর্দ্ধক, সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে অশুভসংজ্ঞাই ভাবনীয়। বৃত্তিকার উক্ত স্থলে অশুভসংজ্ঞার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,—“মাংসাস্বকৃকৌসময়ো দেহঃ কিং মেহপরাধ্যতি। এতম্মাদপরঃ কৰ্ত্তা কৰ্ত্তনীয়ঃ কথং মদা॥” অর্থাৎ ইহার মাংস-রক্তাদিময় দেহ আমার সম্বন্ধে কি অপরাধ করিয়াছে? এই দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ যে কৰ্ত্তা, অর্থাৎ অচ্ছন্দ্য অদাহ নিত্য আত্মা, তাহাকে আমি কিরূপে ছেদন করিব? এইরূপ বুদ্ধিই পূর্বেকৃত স্থলে “অশুভসংজ্ঞা”। ঐ অশুভসংজ্ঞা ভাবনা করিলে ক্রমশঃ শত্রুতে ঘেষ নিবৃত্ত হয়; সুতরাং উহাই ভাবনীয়। পূর্বেকৃত ঘেষাবর্দ্ধক যে সংজ্ঞা, উহা বর্জ্জনীয়। বৃত্তিকার উহাকে “শুভসংজ্ঞা” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতিও ভাবনীয় সংজ্ঞাকে “অশুভ-সংজ্ঞা” বলয় বর্জ্জনীয়সংজ্ঞার প্রাচীন নাম “শুভসংজ্ঞা” ইহা বুঝা যায়।

বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে ভাষ্যকারের “ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা” ইত্যাদি সন্দর্ভের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঐ স্থলে ভাষ্যকারের প্রকৃত পাঠ কি, তদ্বিষয়েও সংশয় জন্মে। ভাষ্যে “বর্জ্জনমস্ত্রা ভেদেন” এই পর্য্যন্তই বাক্য শেষ হইলে ভেদ করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া বা বিশেষ করিয়া ঐ সংজ্ঞার বর্জ্জন কর্ত্তব্য, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। অথবা পূর্বেকৃত স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুষসংজ্ঞার ভেদ বা বিশেষ যে নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুবাজনসংজ্ঞা, তাহার সহিত ঐ সংজ্ঞার বর্জ্জন কর্ত্তব্য; ইহাও ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। আর যদি “বর্জ্জনমস্ত্রাঃ” এই পর্য্যন্তই বাক্য শেষ হয়, তাহা হইলে পরে “ভেদেনাবয়বসংজ্ঞা” ইত্যাদি পাঠে “ভেদেন” এই স্থলে বিশেষণ তৃতীয়া বিভক্তি বুঝিয়া ভেদ-

বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবয়বসংজ্ঞা হইতে ভিন্ন প্রকার অবয়বসংজ্ঞা—কণলোমাদিসংজ্ঞা, উহার নাম অশুভসংজ্ঞা, ইহাই ভাষাকারের তাৎপর্য বুঝা যায়। কারণ, ভাষাকার প্রথমে যে, নিমিত্তসংজ্ঞা বলিয়াছেন, উহাও বস্তুতঃ একপ্রকার অবয়বসংজ্ঞা। তাৎপর্যটীকাকারও প্রথমে ঐ নিমিত্তসংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিতে স্ত্রীর দস্ত ওষ্ঠ নাসিকাাদিক অবয়ব বলিয়াছেন। এবং পরেও তিনি নিমিত্তসংজ্ঞাকেই “অবয়বসংজ্ঞা” বলিয়াছেন বুঝা যায়। সুতরাং ঐ নিমিত্তসংজ্ঞারূপ অবয়বসংজ্ঞা হইতে শেযোক্ত কণলোমাদি অবয়বসংজ্ঞা ভিন্ন প্রকার, ইহা ভাষাকার বলিতে পারেন। “চরকসংহিতা”র শারীরস্থানের ৭ম অধ্যায়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বর্ণন দ্রষ্টব্য। সুধীগণ এখানে ভাষাকারের তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন।

তবে কি পূর্বোক্ত নিমিত্তসংজ্ঞারূপ অবয়বসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞার বিষয়ই নাই? কেবল শেযোক্ত অশুভসংজ্ঞার বিষয়ই আছে, অর্থাৎ যে সংজ্ঞা বর্জ্যনীয়, তাহার বিষয় পদার্থের অস্তিত্বই নাই, ইহাই কি স্বীকার্য? এতদ্বারা সর্বশেষে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, বর্জ্যনীয় সংজ্ঞার বিষয় এবং ভাবনীয় অশুভসংজ্ঞার বিষয়, এই দ্বিবিধ বিষয়ই বস্তুতঃ বর্তমান আছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থিত বিষয়ই কোন সংজ্ঞা ভাবনীয়, কোন সংজ্ঞা বর্জ্যনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন বিষমিশ্রিত অন্ন অন্নসংজ্ঞা, গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞা পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়। তাৎপর্য এই যে, বিষমিশ্রিত অন্ন বা মধুতে বিষবুদ্ধি হইলে উহা পরিত্যাগ করে, অন্নাদিবুদ্ধি হইলে উহা গ্রহণ করে। ঐ স্থলে বিষ ও অন্নাদি, এই দ্বিবিধ বিষয়ই পরমার্থতঃ বর্তমান আছে। কিন্তু উহাতে বৈরাগ্যের নিমিত্ত বিষসংজ্ঞাই সেখানে গ্রহণ করিবে। এইরূপ পূর্বোক্ত স্ত্রীসংজ্ঞার বিষয় স্ত্রীপদার্থ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সংজ্ঞার বিষয় হইয়া দ্বিবিধই আছে, তথাপি উহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্ত পূর্বোক্ত বর্জ্যনীয় সংজ্ঞার বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শেযোক্ত অশুভ সংজ্ঞার বিষয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে তত্ত্বজ্ঞানার্থী সকল বিষয়েই বর্জ্যনীয়সংজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিয়া ভাবনীয় অশুভসংজ্ঞাকে ভাবনা করিবেন। ঐ ভাবনার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার সেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে। ফলকথা, পূর্বোক্তরূপ স্ত্রীসংজ্ঞা, পুরুষসংজ্ঞা এবং নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞাই ঐরূপ স্থলে অবয়ববিষয়ে অভিমান, উহাই সেই বিষয়ে রাগাদি দোষের নিমিত্ত, সুতরাং উহা বর্জ্যনীয়, ইহাই মহর্ষির গৃঢ় তাৎপর্য ॥৩॥

তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥

১। তৎ কিমিদানীমবয়বানুব্যঞ্জনসংজ্ঞাচার্কিনঃ? নাস্তি? অশুভসংজ্ঞাবিষয় এব পরমন্তীতাত অ'হ, “সত্যেবচ দ্বিবিধে বিষয়” ইতি। দ্বিবিধ এ'গসৌ কামিনীলক্ষণে। বিষয়স্তথাপি রাগাদিগ্রহণার্থমবয়বাদিসংজ্ঞাগোচরত্বং পরিত্যজ্য অশুভসংজ্ঞাগোচরত্বমশ্রোপাদীয়তে বৈরাগ্যোৎপাদনায়েতার্থঃ। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ যথা “বিষসম্পৃক্তে” ইতি। ন ই বিষমধুনী পরমার্থতো ন স্তঃ, অপিতু বৈরাগ্যায় বিষসংজ্ঞা তত্রোপাদীয়ত ইত্যর্থঃ—তাৎপর্যটীকা।

ভাষ্য । অথেন্দানীমর্থং নিরাকরিয়তাহবয়বি-নিরাকরণমুপপাদ্যতে ।*

অনুবাদ । অনন্তর এখন যিনি “অর্থ”কে নিরাকরণ করিবেন অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের খণ্ডন যাঁহার উদ্দেশ্য, তৎকর্তৃক অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদিত হইতেছে । (অর্থাৎ মহর্ষি এখন তাঁহার যুক্তি অনুসারে প্রথমে পূর্বপক্ষরূপে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতেছেন) ।

সূত্র । বিদ্যাঃবিদ্যাঃদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ ॥৪॥৪১৪॥

অনুবাদ । বিদ্যা ও অবিদ্যার (উপলক্ষি ও অনুপলক্ষিব) দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ সন্নিয়কক ও অসন্নিয়ককবশতঃ (অবয়ববিষয়ে) সংশয় হয় ।

ভাষ্য । সদসতোরূপলস্তাদ্বিদ্যা দ্বিবিধা । সদসতোরনুপলস্তাদবিদ্যাপি দ্বিবিধা । উপলভ্যমানেহবয়বিনি বিদ্যাঃদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ । অনুপলভ্যমানে চাবিদ্যাঃদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ । সোহয়মবয়বী যদ্যুপলভ্যতে অথাপি নোপলভ্যতে, ন কথঞ্চন সংশয়ান্মুচ্যতে ইতি ।

অনুবাদ । সৎ ও অসতের উপলক্ষিবশতঃ বিদ্যা (উপলক্ষি) দ্বিবিধ । সৎ ও অসতের অনুপলক্ষিবশতঃ অবিদ্যাও (অনুপলক্ষিও) দ্বিবিধ । উপলভ্যমান অবয়ববিষয়ে বিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয় । অনুপলভ্যমান অবয়ববিষয়েও অবিদ্যার দ্বৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয় । (তাৎপর্য্য) সেই এই অবয়বী যদি উপলব্ধ হয় অথবা উপলব্ধ না হয়, কোন প্রকারেই সংশয় হইতে মুক্ত হয় না ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বসূত্রে যে অবয়ববিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, সেই অবয়ববিষয়ে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিবাদ থাকায় এখন এই প্রকরণের দ্বারা বিচারপূর্বক অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন । কারণ, অবয়বীর অস্তিত্বই না থাকিলে তদ্বিষয়ে অভিমান বলাই যায় না । কিন্তু অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে হইলে তদ্বিষয়ে সংশয় প্রদর্শনপূর্বক পূর্বপক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক । তাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা অবয়ববিষয়ে সংশয় সমর্থন করিয়াছেন । পরবর্তী পূর্বপক্ষ-সূত্রগুলির দ্বারা অবয়বীর অভাবই সমর্থন করায় এই সূত্রে

* এখানে “অবয়বুপপাদ্যতে” এবং “অবয়বিনুপপাদ্যতে” এইরূপ পাঠই মুদ্রিত নানা পুস্তকে দেখা যায় । কিন্তু উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায় না । এখানে তাৎপর্য্যটিকানুসারেই ভাস্যপাঠ গৃহীত হইল । “তদেব স্বমতেন প্রসংখ্যানোপদেশমুক্ত্য। পরাভিমতপ্রসংখ্যানং নিরাবর্ত্তমুপপত্ততি—অথেন্দানীমর্থং নিরাকরিয়ত। বিজ্ঞানবাদিনা অবয়বিনিরাকরণমুপপাদ্যতে” ।—তাৎপর্য্যটিকা ।

অবয়ববিষয়ে সংশয়ই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্বপ্রকরণে নিজমতে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়া, এখন যাহারা অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং পরমাণুও স্বীকার করেন না, কেবল জ্ঞানমাত্রই স্বীকার করেন, সেই বিজ্ঞানবাদীদিগের অভিমত তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের মতানুসারে প্রথমে অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদন করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত অবয়বসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা অর্থবিশেষেই হইতে পারে। কিন্তু জগতে অর্থমাত্রই অলীক, জ্ঞানের বিষয় “অর্থ” অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর বাস্তব কোন সত্তাই নাই। জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ। সুতরাং বাহ্য পদার্থের সত্তা না থাকায় তদ্বিষয়ে পূর্বোক্তরূপ সংজ্ঞা স্বয়ং সম্ভবই হয় না। তাই মহর্ষি এখানে পুনর্বার অবয়বপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া প্রথমে সংশয় ও পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পরে পূর্বপক্ষবাদীদিগের যুক্তি খণ্ডনপূর্বক তাঁহার পূর্বকথিত অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বারা তাঁহার পূর্বসূত্রোক্ত অবয়ব-বিষয়ে অভিমান (স্ত্রীসংজ্ঞা পুরুষসংজ্ঞা প্রভৃতি) উপপাদিত হইয়াছে।

সূত্রে “বিদ্যা” শব্দের অর্থ উপলব্ধি এবং “অবিদ্যা” শব্দের অর্থ অনুপলব্ধি। “বিদ্যাঃবিদ্যা” এই দ্বন্দ্বনামাসের শেষোক্ত “দ্বৈবিধ্যা” শব্দের পূর্বোক্ত “বিদ্যা” ও “অবিদ্যা” শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায়, উপলব্ধি দ্বিবিধ এবং অনুপলব্ধিও দ্বিবিধ। দ্বিবিধ বলিতে এখানে (১) সন্ধিষয়ক ও (২) অসন্ধিষয়ক। অর্থাৎ সৎ বা বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রমবশতঃ উপলব্ধি হয়। যেমন তড়াগাদিতে বিদ্যমান জলের উপলব্ধি হয়, এবং মরীচিকায় ভ্রমবশতঃ অবিদ্যমান জলের উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধি অসদ্বিষয়ক। এইরূপ ভূগর্ভস্থ জল বা রত্নাদি বিদ্যমান থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, এবং অনুৎপন্ন বা বিনষ্ট ও শশশৃঙ্গাদি অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অবয়বীর উপলব্ধি হইলেও ঐ উপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়ববিষয়ক? অথবা অবিদ্যমান অবয়ববিষয়ক? এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। তাহার ফলে অবয়ববিষয়েই সংশয় উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবয়বীর উপলব্ধি না হইলেও ঐ অনুপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়বীরই অনুপলব্ধি, অথবা অবিদ্যমান অবয়বীরই অনুপলব্ধি? এইরূপ সংশয়বশতঃ শেষে অবয়ববিষয়েই সংশয় জন্মে। উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির পূর্বোক্তরূপ দ্বৈবিধ্যাই ঐরূপে অবয়ববিষয়ে সংশয়ের প্রবোজক হওয়ায় মহর্ষি সূত্র বলিয়াছেন,—“বিদ্যাঃবিদ্যাঃদ্বৈবিধ্যাং সংশয়ঃ”। ফলকথা, অবয়বী থাকিলে এবং না থাকিলেও যখন তাহার উপলব্ধি হইতে পারে, এবং ঐ উভয় পক্ষে তাহার অনুপলব্ধিও হইতে পারে, তখন উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির পূর্বোক্তরূপ দ্বৈবিধ্যাবশতঃ অবয়বীর অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় অবশ্যই হইতে পারে। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের ২০শ সূত্রে শেষে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের পৃথক কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু বার্তিককার প্রভৃতি ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে যথাস্থানে বার্তিককার প্রভৃতির কথা লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২১৫—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বার্তিককার এখানেও তাঁহার পূর্বোক্ত মতের উল্লেখ করিয়া

বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বৈবিধ্য যে, সংশয়ের পৃথক্ কারণ নহে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখানে অত্র কোন প্রকারে এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্তরও করেন নাই।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া, এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “বিদ্যা” শব্দের অর্থ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। “অবিদ্যা” শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। প্রমা ও ভ্রম-ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। সুতরাং ঐ দ্বৈবিধ্যবশতঃ অবয়ববিষয়ে সংশয় জন্মে। কারণ, অবয়বীর জ্ঞান হইলে ঐ জ্ঞানে প্রমা ও ভ্রম-জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম যে জ্ঞানত্ব, তাহার জ্ঞানবশতঃ এই জ্ঞান কি প্রমা অথবা ভ্রম? এইরূপে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য-সংশয় হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত শেষে অবয়ববিষয়ে সংশয় জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই সেই বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ জ্ঞান যথার্থও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। সুতরাং সেই জ্ঞান কি যথার্থ অথবা ভ্রম? এইরূপ সংশয়ও অবশ্যই হইতে পারে। তাহা হইলে সেই স্থানে সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থও তখন সন্দিগ্ধ হইয়া যায়। বৃত্তিকার এখানে জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়কেই ঐ জ্ঞানবিষয়ের সংশয়ের হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম অধ্যায়ে সংশয়সামান্যলক্ষণ-সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও পরে জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়কে বিষয়ের সংশয়ে হেতু বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকে মহর্ষি কণাদ অন্তর্কীষয়ক সংশয় ও উহার কারণ প্রদর্শন করিতে সূত্র বলিয়াছেন,—“বিদ্যাঃবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ” (২০শ)। শব্দের মিশ্র শেষে এই সূত্রে “বিদ্যা” শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান এবং “অবিদ্যা” শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জ্ঞান কখনও বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ হয়, আবার কখনও অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমও হয়। সুতরাং কোন বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইলে ঐ বস্তু সৎ অথবা অসৎ? অথবা ঐ জ্ঞান যথার্থ, কি ভ্রম? এইরূপ সংশয় জন্মে। কিন্তু এখানেও ঐরূপ সংশয় সাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্মই হইয়া থাকে। উহার প্রতিও পৃথক্ কোন কারণ নাই।

শব্দের মিশ্র শেষে মহর্ষি গৌতমের “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ” ইত্যাদি (১১।২৩) সংশয়সামান্য-লক্ষণ-সূত্রের উদ্বারপূর্বক ভাষ্যকার বাৎসর্য্যন যে, ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক্ কারণ বলিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত কণাদসূত্র-সম্মত নহে বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যিক যে, মহর্ষি গৌতমের “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ” ইত্যাদি সূত্রে “উপলব্ধি” ও “অনুপলব্ধি” শব্দের পরে “অব্যবস্থা” শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং এই সূত্রে ‘উপলব্ধি’বোধক “বিদ্যা” শব্দ ও অনুপলব্ধিবোধক “অবিদ্যা” শব্দের পরে “দ্বৈবিধ্য” শব্দের প্রয়োগ আছে। মহর্ষি কণাদের পূর্বোক্ত সূত্রে “দ্বৈবিধ্য” শব্দের প্রয়োগ নাই। মহর্ষি গৌতমের এই সূত্রোক্ত “বিদ্যা”র দ্বৈবিধ্য ও “অবিদ্যা”র দ্বৈবিধ্য বিরূপে হইতে পারে এবং উহা বিরূপেই বা সংশয়ের প্রযোজক হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যিক। গৌতমের এই সূত্রে “দ্বৈবিধ্য” শব্দের প্রয়োগ থাকায় বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কেই তিনি দ্বিবিধ বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই প্রবৃত্ত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার্য্য কি না, ইহাও সুযোগ্য প্রণিধানপূর্বক চিন্তা করিবেন ॥৪॥

শূত্র । তদসংশয়ঃ পূর্বহেতুপ্রাসঙ্গিকঃ ॥৫৥৪১৫॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হওয়ার সেই সংশয় হয় না ।

ভাষ্য । তদ্বিত্ত্বানুপপন্নঃ সংশয়ঃ । কস্মাৎ ? পূর্বোক্তহেতুনা-
প্রতিষেধাদতি প্রত্যাস্তরাস্ত ইতি ।

অনুবাদ । সেই অবরবি-বিষয়ে সংশয় উপপন্ন হয় না । (প্রশ্ন) কেন ?
(উত্তর) পূর্বোক্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত অবরবিসাধক হেতুসমূহের প্রতিষেধ
(খণ্ডন) না হওয়ার প্রত্যাস্তরের আরস্ত অর্থাৎ অবরব হইতে পৃথক্ প্রত্যাস্ত উৎপত্তি
আছে অর্থাৎ ইহা স্বীকার্য্য ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এখন নিজমতানুসারে পূর্বহেতুপ্রাসঙ্গিক সংশয়ের খণ্ডন করিতে এই শূত্রের দ্বারা
পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অবরবিবিষয়ে সংশয় হইতে পারে না । কারণ, পূর্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
(১.১৩৪(৩৫)৩৬) অনেক হেতুর দ্বারা অবরবী “প্রসিদ্ধ” অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ করা হইয়াছে ।
কিন্তু সিদ্ধ পদার্থ, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না । কারণ, যে পদার্থবিষয়ে সংশয় হইবে, সেই পদার্থের
সিদ্ধি না নিশ্চয় ঐ সংশয়ের প্রতিবন্ধক । ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে,
অবরবীর সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির খণ্ডন না হওয়ার অবরব হইতে পৃথক্ প্রত্যাস্ত অবরবীর যে আরস্ত
বা উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার্য্য । স্বীকার অর্থ প্রকাশের জন্য ভাষ্যকার অন্তর্ভুক্ত “অতি” এই অব্যয়
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায় (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৫॥

শূত্র । স্বত্যানুপপত্তেরপি ন সংশয়ঃ ॥৬॥৪১৬॥

অনুবাদ । (উত্তর) “স্বত্তির” অর্থাৎ অবরবীতে অবরবসমূহের এবং অবরব-
সমূহে অবরবীর বর্তমানতা বা স্থিতির অনুপপত্তিবশতঃও (অবরবীর নাস্তিও সিদ্ধ
হওয়ার অবরবিবিষয়ে) সংশয় হয় না ।

ভাষ্য । স্বত্যানুপপত্তেরপি তর্হি সংশয়ানুপপত্তিনাস্ত্যবরবীতি ।

অনুবাদ । তাহা হইলে “স্বত্তির” অনুপপত্তিপ্রযুক্তও সংশয়ের অনুপপত্তি,
(যেহেতু) অবরবী নাই ।

টিপ্পনী । পূর্বহেতুপ্রাসঙ্গিক পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই শূত্রের দ্বারা অবরবীর নাস্তিপ্রমাণবিশেষের
কথা বলিয়াছেন যে, যদি বল, অবরবীর অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ার তদ্বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না,
তাহা হইলে আমরা বলিব, অবরবীর নাস্তিই সিদ্ধ হওয়ার তদ্বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হয় না ।
কারণ, অবরবী স্বীকার করিতে হইলে ঐ অবরবীতে তাহার অবরবসমূহ বর্তমান থাকে, অবরব
সেই অবরবসমূহে সেই অবরবী বর্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু অবরবীতে

টিপ্পনী। “বৃত্তানুপপত্তি” প্রযুক্ত অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না, ইহা পূর্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে। এখন ঐ “বৃত্তানুপপত্তি” কেন হয়? ইহা প্রকাশ করিয়া পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রে দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সর্বাংশে এবং একাংশেও তাহার অবয়বগুলির বৃত্তিত্ব বা বর্তমানতা নাই। অর্থাৎ অবয়বীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়াই তাহাতে অবয়বগুলি বর্তমান থাকে, ইহা যেমন বলা যায় না, তদ্রূপ অবয়বীর একাংশেই তাহার এক একটি অবয়ব বর্তমান থাকে, ইহাও বলা যায় না। সুতরাং অবয়বীতে অবয়বসমূহের বর্তমানতার কোনরূপ উপপত্তি না হওয়ায় অবয়বীর অভাব, অর্থাৎ অবয়বী নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, “অবয়বী” স্বীকার করিতে হইলে তাহা অবয়ববিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহাতে তাহার অবয়বগুলি বর্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষকে অবয়বী এবং উহার শাখাদিকে উহার অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা হইলে বৃক্ষ শাখাদি অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ বৃক্ষ শাখাদি আছে, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন এই যে, ঐ বৃক্ষরূপ একটি অবয়বীর সর্বাংশেই কি তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? অথবা ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বীর এক এক অংশে তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? বৃক্ষরূপ অবয়বীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া তাহার এক একটি অবয়ব থাকে, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বী, তাহার শাখাদি অবয়ব হইতে বহুপরিমাণ। শাখাদি অবয়ব তদপেক্ষায় ক্ষুদ্রপরিমাণ। সুতরাং অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদবশতঃ ঐ বৃক্ষের কোন অবয়বই সমস্ত বৃক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে থাকিতে পারে না। বৃক্ষের সর্বাংশে তাহার কোন অবয়বেরই “বৃত্তি” অর্থাৎ বর্তমানতা সম্ভব নহে। ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রব্য তদপেক্ষায় মহতঃপরিমাণ দ্রব্যের সর্বাংশে বর্তমান থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক অবয়ব অবয়বীর সর্বাংশে বর্তমান আছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার উক্ত পক্ষ সমর্থন করিতে আরও একটি হেতু বলিয়াছেন যে, কোন অবয়ব যদি সেই অবয়বীর সর্বাংশেই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই অবয়বীতে অগ্নি অবয়বের সম্বন্ধাভাবের প্রসঙ্গ হয়। অতএব অবয়বীতে তাহার সর্বাংশে কোন অবয়ব নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, যদি অবয়বীর সর্বাংশেই তাহার অবয়বের বর্তমানতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে অবয়ব অবয়বীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান আছে, সেই অবয়বের সহিতই ঐ অবয়বীর সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। অগ্নি অবয়বের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ অবয়বী সেই এক অবয়বদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাহাতে অগ্নি অবয়বের স্থান হইতে পারে না। কোন আসনের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া কেহ উপবেশন করিলে তাহাতে যেমন অগ্নি ব্যক্তির সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব হয় না, তদ্রূপ অবয়বীতে তাহার সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া কোন অবয়ব বর্তমান থাকিলে তাহাতে অগ্নি অবয়বের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাতে অগ্নি অবয়বের সম্বন্ধ নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা যাইবে না।

যদি পূর্বোক্ত কারণে বলা যায় যে, অবয়বীর একদেশ বা একাংশেই তাহাতে অবয়বগুলি বর্তমান থাকে, অর্থাৎ এক একটি অবয়ব, ঐ অবয়বীর এক এক অংশে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ত

আর পূর্বোক্ত অনুপপত্তি ও আপত্তি নাই। কিন্তু এই দ্বিতীয় পক্ষও বলা যায় না। কারণ, যে সমস্ত পদার্থকে ঐ অবয়বীর একদেশ বলিবে, ঐ সমস্ত পদার্থ ত উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সমস্ত অবয়ব ভিন্ন ইহার একদেশ বলিয়া পৃথক অবয়ব ত নাই। তাৎপর্য্য এই যে, কোন অবয়ব যদি অবয়বীর একদেশে থাকে, ইহা বন্টিতে হয়, তাহা হইলে সেই অবয়ব সেই অবয়ব-রূপ একদেশেই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বই সেই সেই অবয়ব-রূপ একদেশ বা অংশবিশেষেই অবয়বীতে বর্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, কোন পদার্থই নিজে যেমন নিজের আধার হয় না, তদ্রূপ অত্র আধারে থাকিতেও নিজেই নিজের অচ্ছেদকও হয় না। ফলকথা, অবয়বীর একদেশে যে অবয়ব ঐ অবয়বীতে থাকিবে, ঐ অবয়ব হইতে ভিন্ন পদার্থ যদি ঐ একদেশ হয়, তাহা হইলেই উহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন একদেশভূত অবয়ব ত নাই। অবশ্য বৃক্ষাদি অবয়বীর ভিন্ন ভিন্ন বহু অবয়ব আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এক অবয়ব অত্র অবয়বরূপ একদেশে -সেই অবয়বীতে বর্তমান আছে, ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের নিম্নস্থ শাখা উহার উচ্চস্থ শাখারূপ প্রদেশে ঐ বৃক্ষে আছে, ইহা সম্ভবই নহে। সুতরাং বৃক্ষের সেই নিম্নস্থ শাখা সেই শাখারূপ একদেশেই ঐ বৃক্ষে থাকে, ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে বন্টিতে হইবে। কিন্তু তাহা ত বলা যায় না। বার্তিককার এই পক্ষে শেষে পূর্ববৎ ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কোন অবয়ব সেই অবয়বরূপ একদেশেই ঐ অবয়বীতে বর্তমান থাকে, তাহা হইলেও উহা কি সেই অবয়বের সর্বাংশে অথবা একাংশে অবয়বীতে বর্তমান থাকে, ইহা বক্তব্য। কিন্তু পূর্ববৎ উহার কোন পক্ষই বলা যাইবে না। উক্ত উভয় পক্ষেই পূর্বোক্তরূপ দোষ অনিবার্য্য। সুতরাং অবয়ব অবয়বীতে তাহার একদেশে বর্তমান থাকে, এই দ্বিতীয় পক্ষও কোনরূপে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং অবয়বীতে কোনরূপেই অবয়বসমূহের বৃদ্ধি বা বর্তমানতার উপপত্তি না হওয়ায় অবয়বী নাই, ইহাই সিদ্ধ হয় ॥৭॥

ভাষ্য। অথাবয়বেষেবাবয়বী বর্ততে—

অনুবাদ। যদি বল, অবয়বসমূহেই অবয়বী বর্তমান থাকে, (এতদ্বারা পূর্ব-পক্ষবাদী বন্টিতেছেন)—

সূত্র। তেষু চারিত্তেরবয়ব্যভাবঃ ॥৮॥৪১৮॥

অনুবাদ। সেই অবয়বসমূহেও (অবয়বীর) বর্তমানতা না থাকায় অবয়বী নাই।

ভাষ্য। ন তাবৎ প্রত্যবয়বং বর্ততে, তয়োঃ পরিমাণভেদাৎ, দ্রব্যস্ত চৈকদ্রব্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপ্যেকদেশৈঃ, সর্বৈষ্মন্তাবয়ব্যভাবাৎ। তদেবং ন যুক্তঃ সংশয়ো নাস্ত্যবয়বীতি।

অমুবাদ। প্রত্যেক অবয়বে (অবয়বী) বর্তমান থাকে না। যেহেতু সেই অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং দ্রব্যের অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া স্বীকৃত বৃক্ষাদি দ্রব্যের একদ্রব্যত্বের আপত্তি হয় (অর্থাৎ বৃক্ষাদিদ্রব্য তাহার প্রত্যেক অবয়বরূপ এক এক দ্রব্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা একদ্রব্যশ্রিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়)। একদেশসমূহে সমস্ত অবয়বেও (এক অবয়বী) বর্তমান থাকে না, যেহেতু অল্প অবয়ব নাই। (অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বীর একদেশগুলিই তাহার অবয়ব, উহা হইতে পৃথক কোন অবয়ব তাহার নাই)। সুতরাং এইরূপ হইলে (অবয়ব-বিষয়ে) সংশয় যুক্ত নহে, (কারণ) অবয়বী নাই।

টিপ্পনী। অবয়ববিবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, অবয়বীতে তাহার অবয়বসমূহ বর্তমান থাকে, ইহা ত আমরা বলি না। কিন্তু অবয়বসমূহই অবয়বী বর্তমান থাকে, ইহাই আমরা বলি। “অবয়বী” বলিলে অবয়বের সম্বন্ধবিশিষ্ট, এই অর্থই বুঝা যায়। অবয়ব ও অবয়বীর আধারাধেয়ভাব সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে অবয়বই আধার, অবয়বী আধেয়। সুতরাং অবয়বীতে তাহার অবয়বগুলি কোনরূপে বর্তমান থাকিতে না পারিলেও অবয়বগুলিতেই অবয়বী বর্তমান থাকে, এই সিদ্ধান্তে কোন অল্পপপত্তি বা আপত্তি না থাকায় অবয়বী নাই, ইহা আর সমর্থন করা যায় না। এতদ্বারা নহণি এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহও অবয়বীর “বৃত্তি” বা বর্তমানতা সম্ভব না হওয়ায় ঐ পক্ষও বলা যায় না, সুতরাং অবয়বী নাই। অবয়বসমূহও অবয়বীর বর্তমানতা কেন সম্ভব নহে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পূর্ববৎ প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ অবয়বী তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ প্রত্যেক অবয়বে বর্তমান থাকিতে পারে না। কারণ, ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রব্য কখনই বৃহৎপরিমাণ দ্রব্যের আধার হইতে পারে না। পরন্তু তাহা স্বীকার করিলে অবয়বীর একদ্রব্যত্ব বা একদ্রব্যশ্রিতত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, অবয়বগুলি পৃথক পৃথক এক একটী দ্রব্য। ঐ এক এক দ্রব্যেই যদি সম্পূর্ণ অবয়বীর বর্তমানতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ অবয়বী যে একদ্রব্যশ্রিত, এক দ্রব্যেই উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যে “একং দ্রব্যং আশ্রয়ো যত্ন” এই অর্থে “একদ্রব্য” শব্দটি বহুব্রীহি সমাস। উহার অর্থ একদ্রব্যশ্রিত। সুতরাং “একদ্রব্যত্ব” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—একদ্রব্যশ্রিতত্ব। অবয়বী একদ্রব্যশ্রিত, ইহা স্বীকার করিলে অবয়বী সেই একদ্রব্যজাত, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে দোষ কি? ইহা বুঝাইতে বাস্তবিককার পূর্ববৎ এখানে বলিয়াছেন যে, যে অবয়বটি অবয়বীর আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিব, ঐ অবয়বই সেই অবয়বীর জনক, ইহাই তখন বলিতে হইবে। তাহা হইলে সেই অবয়বীর সর্বদা উৎপত্তির আপত্তি হয়। তাৎপর্যটীকাকার এই আপত্তির কারণ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, একাধিক দ্রব্যের পরস্পর সংযোগেই এক অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই একাধিক অবয়বরূপ দ্রব্যই সেই অবয়বীর আধার ও উপাদান-কারণ হয়, ইহা স্বীকার

করা যায়। তাহা হইলে সেই একাধিক অবয়বের পরস্পর সংযোগের উৎপত্তির কারণ সর্বদা সম্ভব না হওয়ায় সর্বদা অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা বলা যায়। কিন্তু যদি পৃথক্ভাবে প্রত্যেক অবয়বকেই অবয়বীর আশ্রয় বলিয়া ঐ স্থলে প্রত্যেক অবয়বকেই পৃথক্ভাবে ঐ অবয়বীর উপাদান-কারণ বজিতে হয়, তাহা হইলে আর উহার উৎপত্তিতে অনেক অবয়বের সংযোগের কোন অপেক্ষা না থাকায় এক অবয়বজন্তই সর্বদা সেই অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, ঐ অবয়বীর জনক সেই অবয়বমাত্র যে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্য্যন্ত উহার উৎপত্তি কেন হইবে না? বাস্তবিককার শেষে পূর্বপক্ষবাদীর কথানুসারে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত আরও বলিয়াছেন যে, অবয়ববিবাদী যে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক নানক অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ঐ পরমাণু তাঁহার মতে নিত্য বলিয়া উহার বিনাশ নাই। সুতরাং কারণের বিনাশজন্ত দ্ব্যণুকের বিনাশ হয়, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। কারণের বিভাগজন্তই দ্ব্যণুকের নাশ হয়, ইহাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে ঐ দ্ব্যণুক নামক অবয়বী যদি উহার অবয়ব পরমাণুতে পৃথক্ভাবেই বর্তমান থাকে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট প্রত্যেক পরমাণুই যদি তাঁহার মতে ঐ দ্ব্যণুকের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পরমাণুই পৃথক্ভাবে ঐ দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উহাতে পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগের অপেক্ষা না থাকায় সংযুক্ত পরমাণুদ্বয়ের বিভাগকেও দ্ব্যণুক নাশের কারণ বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার উক্ত পক্ষে দ্ব্যণুক নাশের কোনই কারণ সম্ভব না হওয়ায় দ্ব্যণুকের অবিনাশিত্বরূপ নিত্যত্বের আপত্তি হয়। কিন্তু দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হওয়ায় উহাকে অবিনাশী নিত্য বলা যায় না। উৎপত্তিবিশিষ্ট ভাব পদার্থ অবিনাশী, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। অবয়ববিবাদীরাও দ্ব্যণুকের অবিনাশিত্ব স্বীকার করেন না।

যদি বলা যায় যে, অবয়বী তাহার প্রত্যেক অবয়বে পৃথক্ভাবে বর্তমান থাকে না, কিন্তু সমস্ত অবয়বেই তাহার এক এক অংশের দ্বারা বর্তমান থাকে। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে পূর্ববৎ বলিয়াছেন যে, অবয়বীর যে সমস্ত অবয়ব, তাহাই ত উহার একদেশ বা একাংশ এবং তাহাকে অবয়বীর একদেশ বলা হয়, তাহা উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন বৃক্ষের শাখা বৃক্ষের একটি অবয়ব, উহাকেই বৃক্ষের একদেশ বলা হয়। ঐ একদেشرূপ শাখা হইতে ভিন্ন অবয়বরূপ কোন শাখা বৃক্ষে নাই। সুতরাং বৃক্ষের শাখাদি সমস্ত অবয়বে এক এক দেশে বা ঐ শাখাদিরূপ এক এক অংশে বক্ষরূপ অবয়বী বর্তমান থাকে, ইহা বলা যায় না। উহা বলিতে হইলে ঐ সমস্ত একদেশকে বৃক্ষরূপ অবয়বীর জনক শাখাদি অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়ব বলিতে হয়। কিন্তু তাহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের একদেশ ঐ সমস্ত শাখাদি হইতে পৃথক্ কোন শাখাদি বৃক্ষে নাই। অতএব অবয়বসমূহেও যখন অবয়বীর বর্তমানতা কোনরূপে সম্ভব হয় না, তখন অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং অবয়ববিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। অবয়ববিবাদীরাও অলীক বিষয়ে সংশয় স্বীকার করেন না ॥৮॥

সূত্র । পৃথক্ চাবয়বেভ্যোহিত্যঃ ॥১॥৪১৯॥

অনুবাদ । এবং অবয়বসমূহ ইহাতে পৃথক্ স্থানেও (অবয়বীর) “বৃত্তি” অৰ্থাৎ বৰ্ত্তমানতা না থাকায় অবয়বী নাই ।

ভাষ্য । “অবয়ব্যভাব” ইতি বৰ্ত্ততে । ন চায়ং পৃথগবয়বেভ্যো বৰ্ত্ততে, অগ্রহণামিত্যত্ৰপ্রসঙ্গাচ্চ । তস্মান্নাস্ত্যবয়বীতি ।

অনুবাদ । “অবয়ব্যভাবঃ” ইহা (পূৰ্ব্বসূত্রে) আছে, অৰ্থাৎ পূৰ্ব্বসূত্র ইহাতে ঐ পদটি এই সূত্রে অনুরক্ত হইতেছে । (সূত্রার্থ) এই অবয়বী অবয়বসমূহ ইহাতে পৃথক্ স্থানেও বৰ্ত্তমান নাই । যে হেতু (অত্ৰ) প্রত্যক্ষ হয় না এবং নিত্যত্বের আপত্তি হয় (অৰ্থাৎ অনাধার অবয়বী স্বীকার করিলে উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়) অতএব অবয়বী নাই ।

টিপ্পনী । যদি কেহ বলেন যে, অবয়বী তাহার অবয়বসমূহ ইহাতে পৃথক্ কোন স্থানেই বৰ্ত্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিব,—অবয়বসমূহে বৰ্ত্তমান না থাকিলেই যে অবয়বী অলীক, ইহা কেন হইবে ? এতদ্ব্তরে পূৰ্ব্বপক্ষসমর্থক মহৰ্ষি আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ ইহাতে পৃথক্ কোন স্থানেও অবয়বী বৰ্ত্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই । অবয়ব ব্যতিরেকে অত্ৰ অবয়বী নাই, ইহা কিরূপে বুঝিবে ? ভাষ্যকাব ইহার হেতু বলিয়াছেন,—“অগ্রহণাৎ” । অৰ্থাৎ অবয়বসমূহ ইহাতে পৃথক্ কোন স্থানে অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অত্ৰও অবয়বী নাই, ইহা বুঝা যায় । বার্ত্তিককার ঐ তাৎপৰ্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“অবয়বব্যতিরেকেণাত্ৰ বৰ্ত্তমান উপলভ্যত ?” অৰ্থাৎ অবয়বী যদি অবয়ব ব্যতিরেকে অত্ৰ কোন স্থানে বৰ্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে তাহার প্রত্যক্ষ হউক ? কিন্তু তাহা ত হয় না । অবয়ব ব্যতিরেকে কেহই অবয়বীর প্রত্যক্ষ করে না । অবয়ববিবাদী পরিশেষে যদি বলেন যে, আচ্ছা, অবয়বী কোন স্থানে বৰ্ত্তমান না হইলেই বা ক্ষতি কি ? আমরা অগত্যা অনাধার অবয়বীই স্বীকার করিব ? এ জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“নিত্যত্ৰপ্রসঙ্গাচ্চ” । অৰ্থাৎ তাহা হইলে অবয়বীর নিত্যত্বাপত্তি হয় । কারণ, যে দ্রব্যের কোন আধার নাই, যাহা কোন দ্রব্যে বৰ্ত্তমান থাকে না, সেই অনাধার দ্রব্যের নিত্যত্বই অবয়ববিবাদীরা স্বীকার করেন । যেমন গগন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য । কিন্তু অবয়বীর নিত্যত্ব তাহারাও স্বীকার করেন না । ফলকথা, অবয়বসমূহ ইহাতে পৃথক্ৰূপে কোন স্থানে অবয়বীর বৃত্তি বা বৰ্ত্তমানতাও কোনরূপেই উপপন্ন না হওয়ায় অবয়বিনামক জন্ত দ্রব্য কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না । পরন্তু অবয়বীর অভাব বা অলীকত্বই সিদ্ধ হয় ।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি বল, অস্তিত্ব বা অনাধার অবয়বীই স্বীকার করিব ? এই জন্ত পূৰ্ব্বপক্ষসমর্থক মহৰ্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার বলিয়াছেন যে, অবয়ব-

সমূহ হইতে পৃথক্ অবয়বী নাই। কেন নাই? এতদ্বারা সূত্রশেষে বলা হইয়াছে “অবৃত্তেঃ”। অর্থাৎ অবয়বীর “বৃত্তি” বা কোন স্থানে বর্তমানতা না থাকায় তাহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বৃত্তিকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অথবা অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে সর্বাংশে অথবা একাংশে থাকে না, কিন্তু স্বস্বরূপেই থাকে, ইহা বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী এই সূত্রের দ্বারা ঐ পক্ষও নিজ মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ অবয়বী নাই। কারণ, “অবৃত্তেঃ” অর্থাৎ যেহেতু অবয়বীর বৃত্তি বা বর্তমানতা নাই। অবয়বী কোন স্থানে বর্তমান না থাকিলে উহা অনাধার দ্রব্য হওয়ায় উহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বৃত্তিকার পূর্বোক্ত সপ্তম ও অষ্টম সূত্রে ভাষ্যকারের বাক্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেকের মতে উহা মহর্ষির সূত্র, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সপ্তম সূত্রের অবতারণায় ভাষ্যকার “তদ্বিত্ত্বজ্ঞে” এই বাক্যের প্রয়োগ করায় এবং এই সূত্রের ভাষ্যরস্তু অষ্টম সূত্র হইতে “অবয়ব্যভাবঃ” এই পদের অন্বয়ভিত্তি উল্লেখ করায় সুপ্রাচীন ভাষ্যকারের মতে যে ঐ দ্বৈতী ন্যায়সূত্র, এ বিষয়ে সংশয় হয় না। তথাপি বৃত্তিকারের যে, কেন ঐ বিষয়ে সংশয় ছিল, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। মুদ্রিত “ন্যায়বাস্তিক” পুস্তকে “পৃথক্ চাবয়বেভ্যোহবয়ব্যবৃত্তেঃ” এইরূপ সূত্রপাঠ দেখা যায় ॥ ৯ ॥

সূত্র। ন চাবয়ব্যবয়বাঃ ॥১০॥৪২০॥

অনুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহও নহে অর্থাৎ অবয়বসমূহে অবয়বীর ভেদের প্রায় অভেদও আছে, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। ন চাবয়বানাং ধর্ম্মোহবয়বী, কস্মাৎ? ধর্ম্মমাত্রস্তা ধর্ম্মভি-
রবয়বৈঃ পূর্ববৎ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ পৃথক্ চাবয়বেভ্যো ধর্ম্মভ্যো ধর্ম্মস্তা-
গ্রহণাদিতি সমানং।

অনুবাদ। অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মমাত্রও নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ধর্ম্মমাত্রের অর্থাৎ ধর্ম্মমাত্র বলিয়া স্বীকৃত অবয়বীর ধর্ম্মী অবয়বসমূহের সহিত পূর্ববৎ সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না এবং ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানে ধর্ম্ম অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সমান অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা পূর্ববৎ এই পক্ষেরও অনুপপত্তি সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। কাহারও মতে অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মমাত্র, কিন্তু উহা অবয়বসমূহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থও নহে, অত্যন্ত অভিন্ন পদার্থও নহে। কারণ, অত্যন্ত ভিন্ন এবং অত্যন্ত অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একে অপরের ধর্ম্ম বা ধর্ম্মী হয় না। ঐরূপ পদার্থদ্বয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। সুতরাং অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কণঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। তাহা হইলে অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কণঞ্চিৎ অভেদ-সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, ইহাও বলা যাইতে পারে। সংকার্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ও সূত্রাদি অবয়ব হইতে বস্তাদি অবয়বীর আত্যন্তিক ভেদ

স্বীকার করেন নাই। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট প্রভৃতিও উহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই উক্ত বিষয়ে নানা বিচার ও মতভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় অবয়ব ও অবয়বীর অভেদবাদী। কোন কোন সম্প্রদায় ভেদাভেদবাদী। অসৎকার্য্যবাদী সম্প্রদায় আত্যন্তিক ভেদবাদী। এখানে পূর্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বশেষে মহর্ষি পূর্বোক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহও নহে। অর্থাৎ উহা অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যে অভিন্ন, ইহাও বলা যায় না। অবশ্য অবয়বী যদি অবয়বসমূহের ধর্ম্য হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে কেহ উহাকে অবয়বসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্নও বলিতে পারেন। কিন্তু অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্য হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর কথা সমর্থন করিতে তাহার পূর্বোক্ত হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অবয়বী যদি অবয়বসমূহের ধর্ম্মমাত্র হয়, তাহা হইলেও ত ধর্ম্ম অবয়বসমূহে উহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অবয়বসমূহে যে অবয়বী কোনরূপেই বর্ত্তমান হয় না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মী অবয়বসমূহের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ায় অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্ম, ইহাও বলা যায় না। আর যদি কেহ বলেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহের ধর্ম্মই বাটে, কিন্তু উহা ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্‌রূপে বা পৃথক্‌ স্থানেই বর্ত্তমান থাকে। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্‌ রূপে বা পৃথক্‌ স্থানে উহার ধর্ম্ম অবয়বীর যে প্রত্যক্ষ হয় না, এই হেতু পূর্ববৎ এই মতেও তুল্য। অর্থাৎ ঐ হেতুর দ্বারা ধর্ম্ম অবয়বী যে, ধর্ম্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্‌ স্থানে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা পূর্ববৎ সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই মতেও পূর্ববৎ ঐ কথা বলা যায় না। অবয়বসমূহের ধর্ম্ম অবয়বী কোন স্থানেই বর্ত্তমান থাকে না, উহার কোন আধার নাই, ইহা বলিলে পূর্ববৎ উহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়, ইহাও এখানে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন। এবং পরে তিনি আবও বলিয়াছেন যে, অবয়বী সমস্ত অবয়বে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে অবয়বী অবয়বসমূহ মাত্র, ইহাই কলতঃ স্বীকৃত হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বার্ত্তিককারের ঐ কথার গৃঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী অবয়বসমূহে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে অবয়বীর সেই একদেশগুলি অবয়বসমূহে বর্ত্তমান থাকে কি না, ইহা বক্তব্য। একদেশগুলি যদি অবয়বসমূহে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ একদেশগুলিই বস্তুতঃ অবয়বী, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐ একদেশগুলি নানা পদার্থ, উহা অবয়বসমষ্টি হইতে কোন পৃথক্‌ পদার্থ নহে। সুতরাং অবয়বী ঐ একদেশ বা অবয়বসমষ্টি মাত্র, ইহাই কলতঃ স্বীকৃত হয়। বার্ত্তিককার সর্বশেষে আরও বলিয়াছেন যে, অবয়বী এক অবয়বে একদেশে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিলে কোন এক অবয়বের প্রত্যক্ষ হইলেই তৎস্থানে সেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। যেমন বস্তুর অবয়ব স্ত্ররাশির মধ্যে একটি সূত্রের প্রত্যক্ষ হইলে কখনই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না।

তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্বোক্ত মতবিশেষের উল্লেখ ও সমর্থনপূর্বক উহার খণ্ডনার্থ এই সূত্রের অবতারণা করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর মতানুসারে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীতে অবয়বসমূহের ভেদের স্থায় অভেদও আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, ভেদের অভাব অভেদ,

অভেদের অভাব ভেদ। সুতরাং উহা পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া কখনই একাধারে থাকিতে পারে না। পরন্তু যদি অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যন্তিক অভেদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবয়বীকে অবয়বসমূহের ধর্ম বলা যায় না। কারণ, আত্যন্তিক অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের ধর্মধর্মিভাব হইতে পারে না। সুতরাং অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যন্তিক ভেদই স্বীকার্য। তাহা হইলে অবয়বীকে অবয়বসমূহের ধর্ম ও বলা যাইতে পারে। কারণ, যেমন আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন পদার্থের কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন পদার্থ-বিশেষের ধর্মধর্মিভাবও স্বীকার্য। সুতরাং অবয়বী অবয়বসমূহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ, কিন্তু উহার ধর্ম, ইহাই স্বীকার্য হইলে পূর্বোক্ত দোষ অনিবার্য। কারণ, অবয়বী যে অবয়বসমূহে কানকপেই বর্তমান হইতে পারে না, ইহা পূর্বপক্ষবাদী পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অবয়বী অবয়বসমূহ কোনরূপে বর্তমান হইতে না পারিলে উহা অবয়বসমূহের ধর্ম হইতে পারে না। ন্তিকার বিধানাথ এই সূত্রের সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী ও অবয়বসমূহ যে অভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ ঐ উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদই সম্বন্ধ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কেহ সূত্রকেই বলা যায় এবং সূত্রকেই গৃহ বলা যায় না। পরন্তু অভেদ সম্বন্ধে আধারাদেয় ভাবেরও উপপত্তি হয় না। সূত্র ও বস্তু অভিন্ন, কিন্তু সূত্র ঐ বস্তুর আধার, ইহা বলা যায় না। চতুর্থ খণ্ডে সংস্কার-ভেদের সমালোচনায় উক্ত বিষয়ে অত্যাশ্চর্য কথা দৃষ্টব্য ॥ ১০॥

সূত্র। একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশব্দপ্রয়োগানুপপত্তে- রপ্রশ্নঃ ॥১১॥৪২১॥

অনুবাদ। (উত্তর) এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের অনুপপত্তি-
শিতঃ (পূর্বোক্ত) প্রশ্ন হয় না।

ভাষ্য। কিং প্রত্যবয়বং কৃৎস্নোহবয়বী বর্ততে অথৈকদেশেনেতি
নোপপদ্যতে প্রশ্নঃ। কস্মাৎ? একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশব্দ-
প্রয়োগানুপপত্তেঃ। কৃৎস্নমিত্যনেকশাশেযাভিধানং, একদেশ
ইতি নানাত্বে কস্মাচ্চিদভিধানং। তাবিনৌ কৃৎস্নৈকদেশশব্দৌ ভেদবিষয়ো
নিকস্মিন্ অনুপপদ্যতে, ভেদাভাবাদিতি।

অনুবাদ। কিং প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবয়বী বর্তমান থাকে? অথবা এক-
দ্বারা বর্তমান থাকে? এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর)
হেতু এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ
ই যে, “কৃৎস্ন” এই শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ কণন হয়। “একদেশ”

এই শব্দের দ্বারা নানান অর্থাৎ পদার্থের ভেদ থাকিলে কোন একটি পদার্থের কখন হয়। সেই এই “কুৎস্ন” শব্দ ও “একদেশ” শব্দ ভেদবিষয়, একমাত্র পদার্থে উপপন্ন হয় না। কারণ, ভেদ নাই। অর্থাৎ অবয়বী একমাত্র পদার্থ, সুতরাং তাহাতে “কুৎস্ন” শব্দ ও “একদেশ” শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন না হওয়ায় পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত সপ্তম সূত্র হইতে চারি সূত্র দ্বারা অবয়বী নাই অর্থাৎ অবয়বী অলীক, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, এখন তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই সূত্র ও পরবর্তী দ্বাদশ সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। সপ্তম সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর কথা বলা হইয়াছে যে, অবয়বসমূহ সমস্ত অবয়বীতে বর্তমান থাকে না এবং অবয়বীর একদেশেও বর্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই। কিন্তু অবয়বীতে যে তাহার অবয়বসমূহ বর্তমান থাকে, ইহা মহর্ষি গোতম ও তন্মতাবলম্বীরা কহিয়াছেন সিদ্ধান্ত নহে। তাঁহাদিগের মতে সমবায়িকারণেই সমবায় সম্বন্ধে তাহার কার্য্য বর্তমান থাকে। অবয়বসমূহই অবয়বীর সমবায়িকারণ। সুতরাং ঐ অবয়বসমূহই সমবায় সম্বন্ধে অবয়বী বর্তমান থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তেও পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই পূর্ববৎ প্রশ্ন করিবেন যে, কি প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবয়বীই বর্তমান থাকে? অথবা একদেশের দ্বারা বর্তমান থাকে? এতদ্বাবে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঐরূপ প্রশ্নই হয় না। কাবণ, বক্ষ্যাদি অবয়বীগুলি পৃথক পৃথক এক একটি পদার্থ। যে কোন একটি অবয়বীকে গ্রহণ করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে ভেদ নাই। অনেক পদার্থেই পরস্পর ভেদ থাকে, একমাত্র পদার্থে উহা থাকে না। সুতরাং তাহাতে ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি না হওয়ায় পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, “কুৎস্ন” শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ বলা হইয়া থাকে। এবং “একদেশ” শব্দের দ্বারা অনেক পদার্থের মধ্যে কোন একটি বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পদার্থ অনেক হইলে সেখানেই ঐ সমস্ত পদার্থের সমস্তকে বলিবার জন্য “কুৎস্ন” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং ঐ স্থলে তন্মধ্যে কোন একটি পদার্থ বক্তব্য হইলেই “একদেশ” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং “কুৎস্ন” শব্দ ও “একদেশ” শব্দ ভেদ শব্দ বা ভেদবিষয়। অর্থাৎ পদার্থের ভেদ স্থলেই ঐ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং বৃক্ষাদি এক একটি অবয়বী গ্রহণ করিয়া কোন অবয়বীতেই “কুৎস্ন” শব্দ ও “একদেশ” শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয় না। কারণ, এক পদার্থ বলিয়া ঐ অবয়বীর ভেদ নাই। বাহ্য বস্তুতঃ এক, তাহাতে “কুৎস্ন” ও “একদেশ” বলা যায় না। অবশ্য এক অবয়বীরও অনেক অবয়ব থাকায় সেই অবয়বসমূহে “কুৎস্ন” শব্দের প্রয়োগ এবং উহার মধ্যে কোন অবয়ব গ্রহণ করিয়া “একদেশ” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদী যে, এক অবয়বীকেই গ্রহণ করিয়া তাহাতেই “কুৎস্ন” শব্দ ও “একদেশ” শব্দ প্রয়োগ-পূর্বক ঐরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহাই উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য।

ফলকথা, পৃথক্ পৃথক্ এক একটি অবয়বী তাহার সমবায়িকারণ অবয়বসমূহে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে। তাহাতে “কুৎস্ন” ও “একদেশে”র কোন প্রসঙ্গ নাই। যেমন দ্রব্যে দ্রব্যে জাতি এবং ঘটাদি দ্রব্যে ঘটাদি জাতি নিরবচ্ছিন্নরূপেই সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ অবয়বসমূহেও অবয়বী নিরবচ্ছিন্নরূপেই সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং অবয়বী অবয়বসমূহেও কোনরূপে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা বলিয়া অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, ইহা কখনই সমর্থন করা যায় না ॥১১॥

ভাষ্য । অন্ত্যাবয়বভাবান্নৈকদেশেন বর্ত্ততে ইত্যাহেতুঃ—

অনুবাদ । অত্র অবয়ব না থাকায় (অবয়বী) একদেশ দ্বারা বর্ত্তমান থাকে না, ইহা অহেতু অর্থাৎ হেতু হয় না ।

সূত্র । অবয়বান্তরাভাবেহপ্যরন্তেরহেতুঃ ॥১২॥৪২২॥*

অনুবাদ । (উত্তর) অত্র অবয়ব থাকিলেও (অবয়বীর) অবর্ত্তমানতাবশতঃ (“অবয়বান্তরাভাৎ” ইহা) অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না ।

ভাষ্য । অবয়বান্তরাভাদিতি । যদ্যপ্যেকদেশোহবয়বান্তরভূতঃ স্রা-
ভথাপ্যবয়বেহবয়বান্তরং বর্ত্ততে, নাবয়বীতি । অন্ত্যাবয়বভাবেহপ্যরন্তে-
রবয়বিনো নৈকদেশেন বর্ত্তিরন্ত্যাবয়বভাবাদিত্যাহেতুঃ ।

বর্ত্তিঃ কথমিতি চেৎ ? একস্রানেকত্রাশ্রয়াশ্রিতসম্বন্ধলক্ষণা প্রাপ্তিঃ ।
আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ কথমিতি চেৎ ? যস্ম যতোহন্যত্রাত্তলাভানুপপত্তিঃ স
আশ্রয়ঃ । ন কারণদ্রব্যেভ্যোহন্যত্র কার্যাদ্রব্যমাত্মনং লভতে । বিপর্যয়স্তু
কারণদ্রব্যেষ্টিতি । নিত্যেষু কথমিতি চেৎ ? অনিত্যেষু দর্শনাৎ
সিদ্ধং । নিত্যেষু দ্রব্যেষু কথমাশ্রয়াশ্রিতভাব ইতি চেৎ ? অনিত্যেষু
দ্রব্যগুণেষু দর্শনাদাশ্রয়াশ্রিতভাবস্য নিত্যেষু সিদ্ধিরিতি ।

তস্মাদবয়ব্যভিমানঃ প্রতিষিধ্যতে নিঃশ্রেয়সকামস্য, নাবয়বী, যথা
রূপাদিষু মিথ্যাসঙ্কল্পো ন রূপাদয় ইতি ।

অনুবাদ । “অবয়বান্তরাভাৎ” এই বাক্য অহেতু । (কারণ) যদিও অবয়-

* মূলত অনেক পুস্তকে এবং “আয়বাস্তিক” ও “আয়বাস্তিকানাংক” এই স্থলে “অবয়বান্তরাভাবেহপ্য” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু উহা যে প্রকৃত পাঠ নহে, ইহা এই সূত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিলে সচক্ষেই বুঝা যায়। ভাবাকারের ব্যাপার দ্বারাও উহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

বাস্তবভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে অণু অবয়বই থাকিতে পারে, অবয়বী থাকিতে পারে না। (সূত্রার্থ) অণু অবয়ব থাকিলেও অবয়বীর অবর্তমানতাবশতঃ (অবয়বসমূহে) অবয়বীর একদেশদ্বারা বর্তমানতা নাই, (সূত্রাং) “অণাবয়বাতাবাৎ” ইহা অহেতু [অর্থাৎ অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারাও বর্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে পূর্বপক্ষবাদী যে “অণাবয়বাতাবাৎ” এই হেতুবাচ্য বলিয়াছেন, উহা হেতু হয় না। কারণ, ঐ অবয়বীর একদেশ হইতে ভিন্ন অবয়ব থাকিলেও এক অবয়বে অপর অবয়বই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না। সূত্রাং উক্ত হেতুর দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর সাধ্যাসিদ্ধি হয় না, উহা হেতুই হয় না]।

(প্রশ্ন) বৃত্তি কিরূপ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ সমবায়নামক সম্বন্ধ। আশ্রয়াশ্রিত ভাব কিরূপ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) যে পদার্থ হইতে অণুত্র যাহার আত্মলাভের অর্থাৎ উৎপত্তির উপপত্তি হয় না, সেই পদার্থ তাহার আশ্রয়। কারণদ্রব্য হইতে অণুত্র অর্থাৎ জন্ম দ্রব্যের সমবায়িকারণ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থেই জন্মদ্রব্য আত্মলাভ করে না অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কারণদ্রব্যসমূহে বিপর্যয় [অর্থাৎ কারণদ্রব্যসমূহ, (অবয়ব) জন্মদ্রব্য (অবয়বীতে) উৎপন্ন হয় না, উহা হইতে অণুত্র উৎপন্ন হয়, সূত্রাং জন্মদ্রব্য কারণদ্রব্যের আশ্রয় নহে] (প্রশ্ন) নিত্যপদার্থে কিরূপ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অনিত্য পদার্থবিশেষে দর্শনবশতঃ সিদ্ধ হয়। বিশদার্থ এই যে, (প্রশ্ন) নিত্যদ্রব্যসমূহে কিরূপে আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অনিত্য দ্রব্য ও গুণপদার্থসমূহে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে আশ্রয়াশ্রিত ভাবের সিদ্ধি হয়।

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবয়ববিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অবয়বী নিষিদ্ধ হয় নাই। যেমন রূপাদি বিষয়ে মিথ্যাসংকল্পই নিষিদ্ধ হইয়াছে, রূপাদি বিষয় নিষিদ্ধ হয় নাই।

টিপ্পনী। অবয়বী তাহার নিজের সর্বাবয়বে একদেশ দ্বারাও বর্তমান থাকে না—এই পক্ষ সমর্থন করিতে পূর্বপক্ষবাদী হেতুবাচ্য বলিয়াছেন,—“অণাবয়বাতাবাৎ”। পূর্বোক্ত অষ্টম সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও পূর্বপক্ষবাদীর উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাচ্য বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর কোন হেতুবাচ্য যে হেতু হয় না, ইহা সমর্থন করিতে “অণববাস্তবভাবোহপ্যবৃত্তেঃ” এই কথার দ্বারা অণু

অবয়ব থাকিলেও অবয়বী তাহার নিজের অবয়বসমূহে একদেশদ্বারা বর্তমান থাকিতে পারে না, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পূৰ্বপক্ষবাদীর “অতাবয়বভাবাৎ” এই হেতুবাক্যকেই গ্রহণ করিয়া মহর্ষি যে, এই সূত্রের দ্বারা উহাকেই অহেতু বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এবং পরে ভাষ্যারম্ভে “অতাবয়বভাবাৎ” এই পূৰ্বোক্ত হেতুবাক্যের অর্থানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, “অবয়বাস্তরাভাবাদিতি”। সূত্রোক্ত “অহেতু” শব্দের পূৰ্বে ঐ বাক্যের যোগ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির “অবয়বাস্তরাভাবেহ্যবৃত্তেঃ” এই কথার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও অবয়বাস্তরভূত একদেশ থাকে, তাহা হইলেও অবয়বে সেই অবয়বাস্তরই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বী তাহার নিজের অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারা বর্তমান থাকে না, ইহা সমর্থন করিতে পূৰ্বপক্ষবাদী হেতু বলিয়াছেন,—অবয়বাস্তরাভাব। অর্থাৎ অবয়বী যে সমস্ত অবয়বে একদেশ দ্বারা বর্তমান থাকিবে, সেই সমস্ত অবয়বই তাহার একদেশ, উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব তাহার একদেশ নাই। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, উহা হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব থাকিলে সেই একদেশ দ্বারা অবয়বী তাহার সৰ্বাবয়বে বর্তমান থাকিতে পারে, ইহা পূৰ্বপক্ষবাদী স্বীকার করেন। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সেই সমস্ত অবয়ব ভিন্ন আর অবয়ব নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা থাকিলেও ত ওদ্বারা অবয়বী তাহার সৰ্বাবয়বে বর্তমান হইতে পারে না। কারণ, সেই অবয়বীর উপক্ৰমে অবয়ব স্বীকার করিলে সেই পৃথক্ অবয়বই উহার অত্যাগ অবয়বে বর্তমান থাকিতে পারে; তাহাতে অবয়বী বর্তমান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ পূৰ্বপক্ষবাদীর যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অত্যাগ অবয়ব থাকা না থাকা, উভয় পক্ষেই অবয়বে অবয়বীর বর্তমানতা সম্ভব হয় না। সুতরাং তিনি যে, অবয়বী তাহার সৰ্বাবয়বে একদেশদ্বারাও বর্তমান থাকে না, এই প্রতিজ্ঞার সাধন করিতে “অতাবয়বভাবাৎ” এই হেতুবাক্য বলিয়াছেন, উহা হেতু হয় না।

পূৰ্বোক্ত (১১শ ১২শ) দুই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি কেবল পূৰ্বপক্ষবাদীর বাধক যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিজমতে অবয়বীতেই তাহার অবয়বসমূহ বর্তমান থাকে, অথবা অবয়বসমূহই অবয়বী বর্তমান থাকে এবং সেই বর্তমানতা কিরূপ? তাহা মহর্ষি এখানে বলেন নাই। ত্রায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ তাহা বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার নিজে এখানে পরে আবশ্যক বোধে প্রশ্নপূর্বক মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধরূপ যে প্রাপ্তি, তাহাই ঐ উভয়ের বৃত্তি বা বর্তমানতা। “প্রাপ্তি” শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রাচীন কালে সম্বন্ধ বুঝাইতে “প্রাপ্তি” শব্দের প্রয়োগ হইত। প্রকৃত স্থলে অবয়বসমূহই অবয়বীর আশ্রয়, অবয়বী তাহার আশ্রিত। সুতরাং অবয়বসমূহই অবয়বী বর্তমান থাকে। ঐ স্থলে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি সমবায় নামক শব্দক। বার্তিককার উদ্ভোক্তকর এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে লিখিয়াছেন,—“বৃত্তিরবয়বসম আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ সমবায়াত্মকঃ সম্বন্ধঃ।” আশ্রয়াশ্রিত ভাব বিকল্পে বুঝা যায়? এতদ্বারা ভাষ্যকার পরে

বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ ইহঁতে ভিন্ন পদার্থে যাহার উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ যে পদার্থেই যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পদার্থই তাহার আশ্রয়। জ্ঞাত্র দ্রব্যের সমবায়িকারণ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ ঐ জ্ঞাত্র দ্রব্যের অবয়বসমূহ, তাহাতেই ঐ জ্ঞাত্র দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উহা ইহঁতে অত্র কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অবয়বীর সমবায়িকারণ অবয়বসমূহই তাহার আশ্রয়। কিন্তু সেই অবয়বসমূহ অবয়বী দ্রব্যে উৎপন্ন না হওয়ায় অবয়বী দ্রব্য সেই অবয়বসমূহের আশ্রয় নহে। অবয়বসমূহ ও তজ্জাত অবয়বী দ্রব্যের এই যে আশ্রয়ান্বিতভাব, ইহা ঐ উভয়ের সমবায়নামক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অবয়বসমূহে যে অবয়বী আশ্রিত বা বর্তমান হয়, তাহাতে উভয়ের কোন সম্বন্ধ আবশ্যিক। কিন্তু ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কারণ, সংযোগসম্বন্ধ স্থলে দ্রব্যদ্বয়ের “বুতসিদ্ধি” থাকে অর্থাৎ অসংযুক্ত ভাবেও ঐ দ্রব্যদ্বয়ের বিদ্যমানতা থাকে। কিন্তু অবয়বসমূহ ও অবয়বীর অসম্বন্ধ ভাবে কখনই বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। অবয়বসমূহ ও অবয়বীর কখনও বিভাগ হয় না। সুতরাং অবয়ব ও অবয়বীর সংযোগসম্বন্ধ কখনই উপপন্ন হয় না। তাই মহর্ষি কণাদে বলিয়াছেন, “বুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে।” “ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ” (বৈশেষিক-দর্শন, ৭ম অঃ, ২য় আঃ, ১৩শ ও ২৬শ সূত্র)। মূলকথা, অবয়বসমূহরূপ কারণ এবং অবয়বী দ্রব্যরূপ কার্য্যের অত্র কোন সম্বন্ধ উপপন্ন না হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য, ইহাই মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। যথোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় “উপস্কার”কর শব্দের মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রে “কার্য্যকারণয়োঃ” এই বাক্যটি উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রদর্শনমাত্র। উহার দ্বারা কার্য্য ও কারণ ভিন্ন অনেক পদার্থও মহর্ষি কণাদের বিবক্ষিত। কারণ, কার্য্য-কারণভাবশূন্য অনেক পদার্থেরও সমবায় সম্বন্ধেই আশ্রয়ান্বিতভাব স্বীকার করিতে হইবে। অত্র কোন সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হয় না। যেমন গো প্রভৃতি দ্রব্যে যে গোহ প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে, তাহা সমবায় ভিন্ন অত্র কোন সম্বন্ধে উপপন্ন হয় না। শব্দের মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে শেষে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কথিত যুক্তি অন্তসারে বিচার দ্বারা সমবায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। এবং তিনি যে পূর্বেই “প্রত্যক্ষমযুখে” বিচার দ্বারা “সমবায়প্রতিবন্ধি” নিরাস করিয়াছেন, ইহাও সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন। “সমবায়” সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে তুল্যযুক্তিতে অভাব পদার্থের “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ আপত্তিও “সমবায়প্রতিবন্ধি”। ভাট সমপ্রদায় ঐ “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা বলিয়া শব্দের মিশ্র “উপস্কারে” উক্ত মতেরও সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি “প্রত্যক্ষমযুখেই” বিশেষ বিচার করিয়া, উক্ত বিষয়ে সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তদ্বচিস্তামণি”র শব্দের নিশ্চকৃত টীকার নাম “চিস্তামণিমবুখ”। তন্মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকাই “প্রত্যক্ষমযুখ”নামে কথিত হইয়াছে ; উহা শব্দের মিশ্রের পৃথক কোন গ্রন্থ নহে। মূলকথা,

১। “বুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে।” অর্থঃ সম্বন্ধ ইহঁতে প্রত্যয়ভেদঃ স সমবায়ঃ প্রশস্তপাদ-ভাষ্যশেবে সমবায়পদার্থানুগুণং প্রকৃত্য। “অসম্বন্ধকারণানবদমানমস্বঃ বুতসিদ্ধিঃ।”—উপস্কার।

প্রকৃত স্থলে অবয়বসমূহে যে অবয়বীভব্যা বিদ্যমান থাকে, তাহা কোন সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু সংযোগাদি অল্প কোন সম্বন্ধও ঐ স্থলে স্বীকার করা যায় না। তাই মহর্ষি কণাদ সমবায় নামক অতিরিক্ত একটি নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত যুক্তি অনুসারে মহর্ষি গোতমও উহা স্বীকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনিও কণাদের ত্রায় আরম্ভবাদই সমর্থন করিয়াছেন এবং অসৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়া উপাদানকারণ ও কার্যের আত্যন্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে “অনেকদ্রব্যসমবায়ঃ” (১৩৮) ইত্যাদি সূত্রেও “সমবায়” সম্বন্ধবোধক সমবায় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও ঐরূপ সূত্রই বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড—১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আরও নানা কারণে মহর্ষি গোতমও যে সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সংকার্য্যবাদী মাংখ্যাতি সম্প্রদায় “সমবায়” সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। মাংখ্যাসূত্রকার বলিয়াছেন,—“ন সমবায়োহস্তি প্রমাণাভাবাৎ” (১৯৯)। পরবর্তী সূত্রে তিনি সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা অনুমানপ্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিয়া প্রমাণাভাব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (১২১৩) ছই সূত্রের দ্বারাও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কণাদসূত্রোক্ত যুক্তির সনালোচনাদি করিয়া বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সমবায় সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বহু আচার্য্য উক্ত বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া সমবায় সম্বন্ধ সমর্থন করার শঙ্করাচার্য্যের মত সমর্থনের জন্য মহানৈয়ায়িক চিৎসুখ মুনি “তত্ত্বপ্রদোপিকা” (চিৎসুখী) গ্রন্থে সমবায়সমর্থক প্রশস্তপাদ, উদয়নাচার্য্য, ত্রীধর ভট্ট, বল্লভাচার্য্য, বাদীশ্বর, সর্কদেব ও শিবান্দিত প্রভৃতি আচার্য্যগণের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সমবায় সম্বন্ধের কোন লক্ষণই বলা যায় না এবং তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, ইহা বিস্তৃত সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ঐ বিচার সুধীগণের অবশ্য পাঠ্য। বাহুল্যভয়ে তাহার সেই মনস্ত বিচারের প্রকাশ ও আলোচনা করিতে পারিলাম না।

চিৎসুখ মুনির কণার প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সম্বন্ধিভিন্ন যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহাই সমবায়, ইহাই সমবায় সম্বন্ধের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। গগনাদি নিত্যপদার্থে যে সম্বন্ধে অভাব পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা ঐ গগনাদিস্বরূপ; সুতরাং উহা অভাবপদার্থের সম্বন্ধী অর্থাৎ আশ্রয় হওয়ায় নিত্যসম্বন্ধ হইলেও সম্বন্ধিভিন্ন নহে। অতএব ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। আকাশাদি বিহু পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগসম্বন্ধ স্বীকার করিলে ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত সমবায়-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ নিত্য সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কারণ, উহা স্বীকার করিলে নিত্য বিভাগও স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু চিৎসুখমুনির প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা নিত্য-সংযোগ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহার সম্বন্ধত্ব স্বীকার করা যায় না। বিশিষ্টবুদ্ধির জনক না হওয়ায় উহার সম্বন্ধত্বই নাই। আর যদি উহার সম্বন্ধত্বও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমবায়লক্ষণে সংযোগভিন্নত্ব বিশেষণ প্রদেশ করিয়াও উক্ত অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ বারণ করা যাইতে

পারে। সমবায় সম্বন্ধের যে, কোন লক্ষণই বলা যায় না, ইহা বলা যাইতে পারে না। আর চিৎস্বথমুনি যে ভাবে বিচার করিয়া সমস্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার ঐ সমস্ত বিচারই অসম্ভব হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যিক।

সমবায় সম্বন্ধ প্রমাণ কি? এতদ্ব্যতীত নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অনেক স্থলে সমবায়সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন এবং তাঁহারা উক্ত সম্বন্ধের সাধক অনুমানপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। “শ্রায়লীলাবতী” গ্রন্থে বৈশেষিক বল্লভাচার্য্য বৈশেষিক মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমানপ্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তী “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” প্রভৃতি নব্য গ্রন্থেও সেইরূপ অনুমানই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অনুমান বা যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি-বিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান, তাহা বিশেষ্য ও বিশেষণের কোন সম্বন্ধবিষয়ক। কারণ, ঐরূপ কোন সম্বন্ধকে বিষয় না করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে না। যেমন কোন গুরু ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে “এই ঘট গুরুরূপবিশিষ্ট” এইরূপ যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাতে ঐ ঘট ও তাহার গুরু রূপের কোন সম্বন্ধও অবশ্যই বিষয় হয়। কিন্তু ঘট ও তাহার রূপের কখনই বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় ঐ উভয়ের সংযোগসম্বন্ধ কিছুতেই বলা যায় না। ঐ উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধও বলা যায় না। কারণ, ঘট ও তাহার রূপ অভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ, অভিন্ন পদার্থ হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষকালে উহার সেই রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট প্রত্যক্ষকালে উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন করে না? সুতরাং ঘট এবং তাহার রূপ ও তদগত রূপত্বাদি জাতি যে অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যায় না; শ্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং পূর্বেক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানে “সমবায়” নামক অতিরিক্ত একটা সম্বন্ধই বিষয় হয়, সমবায় সম্বন্ধই ঘটে গুরু রূপ থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য।

সমবায়বিরোধীদিগের চরম কথা এই যে, সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উহা কোন্ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে? কোন্ সম্বন্ধে বিষয় করিয়া তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে? ইহাও ত বলিতে হইবে। অতএব কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে সেই সম্বন্ধ আবার কোন্ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে? ইহাও বলিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। যদি স্বরূপসম্বন্ধই সমবায়সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, ইহাই শেষে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে গুণ, কর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতিও স্বরূপসম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই বলিব। অবয়ব ও অবয়বীর এবং দ্রব্য ও গুণাদির স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিলেই উপপত্তি হইতে পারে। অতিরিক্ত একটা সমবায় নামক সম্বন্ধ কল্পনার কোন কারণই নাই। এতদ্ব্যতীত সমবায়বাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঘটাদি দ্রব্য যে রূপাদি গুণ ও কর্ম্মাদি বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধেই থাকে বলিলে ঐ সম্বন্ধ কাহার স্বরূপ, তাহা নির্দারণ করিয়া বলা যায় না। কারণ, ঘটাদি দ্রব্যও অনন্ত, তাহার গুণকর্ম্মাদিও অনন্ত। অনন্ত পদার্থকেই স্বরূপসম্বন্ধ বলিয়া কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের স্বীকৃত সমবায় নামক যে অতিরিক্ত সম্বন্ধ, তাহা সর্বত্র এক। সুতরাং উহা স্বায়ক স্বরূপসম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে, ইহা অবশ্যই বলা যায়। কারণ, ঐ স্বরূপসম্বন্ধ

সেই এক সমবায় হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। তাহার সম্বন্ধও উহা হইতে অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ঐরূপ স্থলে অনবস্থা বা কল্পনাগৌরবের কোন আশঙ্কা নাই। পরন্তু যে স্থলে অগ্র সম্বন্ধের বাধক আছে, অগ্র কোন সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই বাধ্য হইয়া স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। গুণ ও কৰ্ম্মাদি পদার্থের সমবায় নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধই অল্পভবসিদ্ধ ও সম্ভব, সুতরাং ঐ স্থলে স্বরূপসম্বন্ধ বলা যায় না। কিন্তু অভাবপদার্থস্থলে আমরা যে স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছি, তাহা অনেক স্থলে অভাবের অনন্ত আধারস্বরূপ হইলেও স্বীকার্য। কারণ, ঐ স্থলে সমবায়সম্বন্ধ বলা যায় না। ঐরূপ অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ স্বীকারও করা যায় না। পরবর্তী কালে নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অভাব পদার্থের ভাট্টসম্মত “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরেও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য শঙ্কর মিশ্র যে প্রত্যক্ষময়ুখে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া সমবায়সম্বন্ধের বাধক নিরাস করিয়া গিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে ইহাও বক্তব্য যে, সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে যদি তুল্য যুক্তিতে অভাব পদার্থের “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার্য্যই হয় এবং উহা প্রমাণসিদ্ধই হয়, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধের খণ্ডন হয় না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। “পদার্থতত্ত্বনিরূপণ” গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণি সমবায়সম্বন্ধ এবং উহার নানাত্ব স্বীকার করিয়াই অভাবের “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া স্বরূপসম্বন্ধই স্বীকার করিলে সমবায়সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। কারণ, সমবায় স্থলেও স্বরূপসম্বন্ধই বলা যাইতে পারে।

পরন্তু কেবল গ্রাম্যবৈশেষিকসম্প্রদায়ই যে সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, আর কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ই উহা স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা সকলেই সমবায় সম্বন্ধের সাধক যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। প্রতিভার অবতার মীমাংসাকাব্য গুরু প্রভাকরও গ্রাম্য-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের গ্রাম্য ব্যক্তি হইতে ভিন্ন জাতির সমর্থন করিয়া জাতি ও ব্যক্তির সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই^১। তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক মহামনীষী শালিকনাথ “প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে “জাতি-নির্ণয়” নামক তৃতীয় অধ্যায়ে নিচায়পূর্বক প্রভাকরের মতের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে অবয়বীর খণ্ডনে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত রতিবিবক্লাদিরও উল্লেখ করিয়া বিচার দ্বারা খণ্ডনপূর্বক অবয়বীরও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শালিকনাথের উক্ত গ্রন্থে অবয়বী এবং সমবায়ের সমর্থনে গুরু প্রভাকরের যুক্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথায় অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, গগনাদি নিত্য জব্যের আশ্রয় কোন

১। “সমবায়ঞ্চ ন বয়ং কাশ্যপীয়া ইব নিত্যমপেয়ং” ইত্যাদি “প্রকরণপঞ্চিকা”—২৬ পৃষ্ঠা সঙ্কলন। বৈশেষিকদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ সূত্রের “উপস্থান” ভ্রম।

অবয়ব না থাকায় উহার উপাদানকারণ বা কোন কারণই নাই। সূত্রাং ঐ সমস্ত দ্রব্যে আশ্রয়াশ্রিতভাব কিস্তি দ্বিগুণ হইবে? আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও ত পদার্থের সত্তা স্বীকার করা যায় না। কারণ, যে পদার্থের কোন আশ্রয় বা আধার নাই, তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। তাই ভাষ্যকার শেষে নিজেই উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়া, তদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, অনিত্য দ্রব্যাদিতে যখন আশ্রয়াশ্রিতভাব দেখা যায়, তখন তদুদ্ভূতান্তে নিত্য দ্রব্যাদিতেও উহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ দ্রব্যাদি হেতুর দ্বারা উহা নিত্য দ্রব্যাদিতে অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, সূত্রাং স্বীকার্য। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, গগনাদি নিত্য দ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধে কোন আশ্রয় বা আধার না থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে মহাকালই উহার আশ্রয় আছে। সূত্রাং গগনাদি নিত্য দ্রব্যেরও আশ্রয়াশ্রিতভাব অসম্ভব নহে। কালিক সম্বন্ধে মহাকাল যে, নিত্যদ্রব্য গগনাদিরও আধার, ইহা প্রাচীন মত বলিয়া ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, উক্ত মত স্বীকার না করিলে এখানে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও কিন্তু উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোনামিও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, তদনুসারে গঙ্গেশোক্ত ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণের অষ্টরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন^১। নিত্যদ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধে আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকিলেও নিত্য দ্রব্য ও তদন্ত নিত্যগুণ পরিমাণাদির সমবায় সম্বন্ধেই আশ্রয়াশ্রিতভাব আছে। ঐরূপ যে যুক্তির দ্বারা দ্রব্য ও গুণের আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, সেই যুক্তির দ্বারা কর্ম ও জাত্যাদি পদার্থের সম্বন্ধেও আশ্রয়াশ্রিত ভাব সিদ্ধ হয়। ঘটাদি জাতি ও “বিশেষ” নামক নিত্য পদার্থও উহাদিগের আশ্রয় দ্রব্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধেই বর্তমান থাকে। মহর্ষি কণাদের উক্ত সিদ্ধান্ত ও তাহার কথিত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক ষট্পদার্থ যে মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহা ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারাও সমর্থিত হয় (প্রথম খণ্ড—১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার উপসংহারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতএব মুমুকুর পক্ষে অবয়ববিষয়ে অভিমানই নিবন্ধ হইয়াছে—অবয়বী নিবন্ধ হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, এখানে অবয়বীর বাধক যুক্তি খণ্ডিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধক যুক্তি কথিত হওয়ায় অবয়বীর অন্তা বলা যায় না এবং উহার অলৌকিকত্বকেও তদ্বজ্ঞান বলা যায় না। তাই মহর্ষি পূর্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে অবয়ববিষয়ে অভিমানকেই রাগাদি দোষের মূল কারণ বলিয়া, ঐ অভিমানকে বর্জনীয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, যেমন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রে মিথ্যাসংকল্পের বিষয় রূপাদিকে রাগাদি দোষের নিবৃত্তি বলিয়া, ঐ মিথ্যাসংকল্পকেই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, রূপাদি বিষয়কে প্রতিষেধ করা হয় নাই, তদ্রূপ অবয়ববিষয়ে পূর্বোক্তরূপ অভিমানকেই প্রতিষেধ করা হইয়াছে—অবয়বী সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিষেধ করা হয় নাই। কারণ, অবয়বী ও

১। অগ্নির নিত্যত্বের আশ্রিতত্বমহোক্তে।—ভাষ্যপরিচ্ছেদ। আশ্রিতত্ব সমবায়াদিসম্বন্ধে প্রত্নমতঃ। বিশেষণতয়া নিগ্ৰহানামপি কালাদৌ প্রভেদঃ।—বিশ্বনাথকৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। “স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদে প্রত্নমতমতেহু” ইত্যাদি। রঘুনাথ শিরোনামিকৃত ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণদর্পিত।

রূপাদি বিষয় প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। উহা পরস্পরার্থঃ বিদ্যমান আছে। সুতরাং উহাদিগের অন্যত্ব বা অলৌকিক সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

পরবর্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় মহর্ষি গোতমের খণ্ডিত পূর্বোক্ত মতই বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হীনয়ানসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিয়াই উহাকে পরমাণুপুঞ্জ বলিতেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী নাই। ভাষ্যকার বাংলায়ন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ বিচারপূর্বক উক্ত মতেরই খণ্ডন করিয়া অতিরিক্ত অবয়বীর সংস্থাপন করিয়াছেন। সেখানে মহর্ষির সূত্রের দ্বারাও উক্ত মতকেই পূর্বপক্ষরূপে বর্ণিতে পারা যায়। এখানে মহর্ষির পরবর্তী সূত্রের দ্বারাও উক্ত মতেরই আবার সমর্থন ও খণ্ডন বুঝা যায়। অবশ্য বিজ্ঞানবাদীরাও অবয়বী মানিতেন না। কিন্তু তাঁহার প্রমাণও অস্বীকার করিয়া জ্ঞানকেই একমাত্র সম্পদার্থ বলিয়া সমর্থন করিতেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্বপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির পরবর্তী সূত্র ও ভাষ্যকারের বিচারের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। সে বাহ্যই ইউক, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে, নানা প্রকারে অবয়বীর খণ্ডন করিয়া মহর্ষি গোতম ও বাংলায়নের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বৌদ্ধ যোগে অপর কোন নৈয়ায়িক ত্রাণদর্শনের মধ্যে পূর্বোক্ত সূত্রগুলি পচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ কোন কোন প্রমাণই নাই। ভাষ্যকারের পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অবয়বীর খণ্ডন করিতে আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করায় তৎকালে মহানৈয়ায়িক উদ্যোতকর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ বিচার দ্বারা ঐ সমস্ত যুক্তিও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানেও পূর্বে তাঁহাদিগের আর একটি বিশেষ কথা রিখিত করিয়াছেন যে, যদি অতিরিক্ত অবয়বী থাকে, তাহা হইলে উহাতে অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ রূপ থাকা আবশ্যিক। নাচেং উহার চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, রূপশূন্য দ্রব্যের চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অবয়বীতে অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ কোন রূপ দেখা যায় না। সুতরাং অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অবয়বী নাই। এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অবয়বীর যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তাহাতে পৃথক্ রূপও অবশ্যই আছে। অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ ভাবে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলেও উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। উহা স্বীকার না করিলে অবয়বীর সার্বজনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। অবশ্য অবয়বীর প্রত্যক্ষের তায় অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহারও রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার্য। কিন্তু সেই রূপপ্রযুক্তই অবয়বীর প্রত্যক্ষ বলা যায় না। কারণ, অথ দ্রব্যের রূপপ্রযুক্ত রূপশূন্য দ্রব্যের চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ হইলে বস্তুদি দ্রব্যের রূপপ্রযুক্ত ঐ বস্তুদিগত বায়ুরও চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুদি অবয়বীর যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা যখন পরমাণুপুঞ্জ বা অলৌকিক হইতেই পারে না, তখন উহাতে অবয়বের রূপ হইতে পৃথক্ রূপ অবশ্যই আছে, এবং সেই অবয়বের রূপই সেই অবয়বীর রূপের অসমবাসিকারণ, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। পূর্বোক্তরূপ কার্যকারণভাব স্বীকার করায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোন বিরোধ নাই। কিন্তু যিনি অবয়বীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া উহার রূপান্তর নির্দেশ করিতে বলিবেন, তাঁহার

সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইবে। কারণ, অবয়বীর রূপান্তর-নির্দেশ করিতে বলিলে অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্তহানি হওয়ায় নিগ্রহ অনিবার্য।

উদ্যোতকর পূর্বোক্ত প্রকারে অবয়বের রূপভ্রম অবয়বীর পৃথক রূপ সমর্থন করিতে শেষে কোন কোন অবয়বীতে চিত্ররূপও স্বীকার করিয়াছেন। নীল পীতাদি পৃথক পৃথক বিজাতীয় রূপবিশিষ্ট সূত্রসমূহের দ্বারা যে বস্ত্র নির্মিত হয়, সেই বস্ত্ররূপ অবয়বীতে নীল পীতাদি কোন বিশেষ রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, উহার উপাদানকাণ্ড সূত্রসমূহে সর্বত্রই নীল পীতাদি কোন বিশেষ রূপ নাই। অব্যাপ্যবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপও জন্মিতে পারে না। কারণ, রূপ মাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি। অর্থাৎ রূপ নিজের আশ্রয়-দব্যকে ব্যাপ্ত করিয়াই থাকে, ইহাই দেখা যায়। সূত্ররাং পূর্বোক্ত বস্ত্রে “চিত্র” নামে বিজাতীয় ব্যাপ্যবৃত্তি একটি রূপবিশেষই জন্মে, ইহাই স্বীকার্য। অত্র নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে পূর্বোক্ত ঐ বস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন অব্যাপ্যবৃত্তি রূপবিশেষই জন্মে। সেই রূপসমষ্টই “চিত্র” বলিয়া প্রতীত হয় এবং “চিত্র” নামে কথিত হয়। উহার কোন রূপই ঐ বস্ত্রের সর্বত্রব্যাপ্ত করিয়া না থাকায় ঐ সমস্ত রূপ সেখানে অব্যাপ্যবৃত্তি। উক্ত বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ মতভেদ আছে। সর্বশাস্ত্রজ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট “বৈয়াকরণলঘুমঞ্জরী” গ্রন্থে শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্বে তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র শেষোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া এখানে “চিত্র” রূপেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রূপত্ব হেতুর দ্বারা নীল পীতাদি সমস্ত রূপেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। রূপ কখনই অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না। সূত্ররাং নীল পীতাদি নানা রূপবিশিষ্ট সূত্রসমূহ-নির্মিত বস্ত্রে “চিত্র” নামে একটি ব্যাপ্যবৃত্তি পৃথক রূপই আমরা স্বীকার করি। তাহা হইলে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ঐ স্থলে অবয়বীর রূপান্তরের যে গল্পপন্থির সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও থাকে না। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার নিজমতপ্রতিপাদক “পদার্থতত্ত্বনিকূপণ” গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের খণ্ডিত ঐ মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহা তাঁহারই নিজের উদ্ভাবিত নব্য মত নহে। তিনি রূপমাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম অস্বীকার করিয়া পূর্বোক্ত বস্ত্রাদিতে সূত্রাদি অবয়বের নীল পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-ভ্রম অব্যাপ্যবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন নীলপীতাদি রূপবিশেষই স্বীকার করিয়া, সেই রূপসমষ্টই “চিত্র” বলিয়া প্রতীত ও “চিত্র” নামে কথিত হয়, ইহাই বলিয়াছেন। তিনি রূপমাত্রেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব নিয়ম অস্বীকার করিয়া উক্ত মত সমর্থন করিতে “পদার্থতত্ত্বনিকূপণ” গ্রন্থে শেষে শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক নীল রূপের বক্ষণ-বোধক বচনটীও উদ্ধৃত

১। লোহিতো যস্ত বর্ণেন মুগে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ ।

যেতঃ পূরবিমাণাভ্যাং স নীলবর্ণ উচ্যতে ॥

“ভুক্তিতত্ত্ব” স্মার্ত রঘুনন্দনের উদ্ধৃত শব্দবচন। এখন প্রচলিত মুদ্রিত “শব্দমাণ্ডিক্য”র উক্ত বচন দেখা যায় না। “লিপিতসংহিতা”র পারিভাষিক নীল রূপের বক্ষণ-বোধক প্রত্যেক বচন (২৪শ) দেখা।

টিপনী। মহর্ষি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে “সর্বগ্রহণমবয়বাসিদ্ধেঃ” এই শ্লোকের দ্বারা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পূর্বোক্ত পঞ্চম শ্লোকের দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া, পরে কতিপয় শ্লোকের দ্বারা অবয়ব-বিষয় বাধক যুক্তির উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। এখন যিনি অবয়বী অস্বীকার করিয়া দৃশ্যমান বস্তুাদি পদার্থকে পরমাণুপুঞ্জমাত্র বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই পূর্বপক্ষবাদী অথ একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষি-কথিত অবয়বীর সাধক পূর্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করায়, তাহারও উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করা এখানে আবশ্যক বোধ্য, এই শ্লোকের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর সেই কথা বলিয়াছেন যে, যেমন বাহার চক্ষু তিমির-রোগগ্রস্ত, ঐ ব্যক্তি ক্ষীণদৃষ্টিবশতঃ একটি কেশ দেখিতে না পাইলেও কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়, তদ্রূপ চক্ষুশ্রান্ত ব্যক্তির এক একটি পরমাণু দেখিতে না পাইলেও পরমাণুপুঞ্জ অর্থাৎ সংযুক্ত পরমাণুসমূহ দেখিতে পায়। দৃশ্যমান বস্তুাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ আনন্দও স্বীকার করি, কিন্তু উহা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে “সর্বগ্রহণমবয়বাসিদ্ধেঃ” (২।১।৩৪) এই শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যদি অবয়বী সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী না থাকে, তাহা হইলে কেন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ; সুতরাং উহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। বস্তুাদি পদার্থ যদি বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জই হয়, তাহা হইলে কোনরূপেই উহার প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। সর্গজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষের অপমান করাও যায় না। প্রত্যক্ষ না হইলে তদানুগত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও হইতে পারে না। সুতরাং বস্তুাদি পদার্থ যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য স্থল অবয়বী, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি উহার পরবর্তী শ্লোকের দ্বারা দেখানো ইহাও বলিয়া আসিয়াছেন যে, যদি বস্তু—দ্রুত সেনা ও বনের ত্রায় পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয়। কোনরূপেই উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত “সর্বগ্রহণমবয়বাসিদ্ধেঃ” এই শ্লোকের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীকে মহর্ষি প্রত্যবস্থান করিলেও অর্থাৎ তাহার নতে দোষ বলিলেও তিনি যখন আবার অথ একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যক্ষের উপপত্তি সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন তাহার সেই বখারও উল্লেখপূর্বক মহর্ষির পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থন করা আবশ্যক। তাই মহর্ষি এখানে আবার দুইটি শ্লোকের দ্বারা তাহাই করিয়াছেন। সপ্রয়োজন পুনরুক্তির নান অলুপদ, উহা পুনরুক্তি-দোষ নহে, ইহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আশ্লিকের শেষে মহর্ষি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই শ্লোকের অবতারণা করিতে “প্রত্যবস্থিতোহুপ্যতদাহ” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্তরূপ প্রয়োজনই ব্যক্ত করিয়াছেন বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের শেষে “সাদৃশ্যবৈধর্ম্ম্যাত্মাং প্রত্যবস্থানং জ্ঞাতিঃ” এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—“প্রত্যবস্থানং দৃশ্যভিধানং”। অর্থাৎ “প্রত্যবস্থান” শব্দের ফলিতার্থ দোষকথন। তাহা হইলে বাহ্যকে তাহার নতে দোষ বলা হয়, তাহাকে “প্রত্যবস্থিত” বলা যায়। পূর্বপক্ষবাদী পূর্বোক্ত শ্লোকের দ্বারাই “প্রত্যবস্থিত” হইয়াছেন। তথাপি আবার অথ একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহার নতে পরমাণুপুঞ্জরূপ বস্তুাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। “তৈমিরিক” ব্যক্তির কেশপুঞ্জবিষয়ক প্রত্যক্ষই তাহার সেই দৃষ্টান্ত। “সুশ্রুতসংহিতা”র উত্তরতমোঃ

প্রথম অধ্যায়ে এবং মাধব করের “নিদান” গ্রন্থেও “তিমির” নামক নেত্র-রোগের নিদানাদি কথিত হইয়াছে। “তিমির” শব্দের উত্তর স্বার্থে তৎকৃত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন “তৈমির” শব্দের দ্বারাও ঐ “তিমির” রোগ বুঝা যায়। যাহার ঐ রোগ জন্মিয়াছে, তাহাকে “তৈমিরিক” বলা হয়। তাহার ঐ রোগবশতঃ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় ক্ষুদ্র এক একটি কেশের প্রত্যক্ষ না হইলেও অনেক বেশ সংযুক্তাবস্থায় কোন স্থানে থাকিলে সেই কেশপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইলে ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু স্থূল হইলে প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অশ্রুতও দেখা যায়। যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকের গ্রায় ক্ষুদ্র অক্ষর দেখিতে পারেন না, কিন্তু স্থূল অক্ষর দেখিতে পারেন। এইরূপ পূর্বপক্ষবাদীর মতে আমরা প্রত্যেক পরমাণু দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু অনেক পরমাণু একত্র সংযুক্ত হইলে সেই পরমাণুপুঞ্জ আমরা দেখিতে পাই। পূর্বোক্ত তৈমিরিক ব্যক্তির কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষের গ্রায় আনাদিগের পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ আনাদিগের গুণাদি পদার্থবিষয়ক যে প্রত্যক্ষ, তাহা বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক। সুতরাং উহার অল্পপক্ষি নাই। ভাষ্যকার উপসংহারে পূর্বপক্ষবাদীর ঐ মূল সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন ॥১৩॥

সূত্র । স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়স্য পটুমন্দভাবাদ্-
বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ ॥১৪॥৪২৪॥

অনুবাদ । (উত্তর) নিজ বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও মন্দতাবশতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের “তথাভাব” অর্থাৎ পটুতা ও মন্দতা হয় ; অবিষয়ে অর্থাৎ যে পদার্থ সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় না।

ভাষ্য । যথাবিষয়মিন্দ্রিয়াণাং পটুমন্দভাবাদ্বিষয়গ্রহণানাং পটুমন্দভাবো ভবতি । চক্ষুঃ খলু প্রকৃষ্যমাণং নাবিষয়ং গন্ধং গৃহ্ণাতি, নিকৃষ্যমাণঞ্চ ন স্ববিষয়াৎ প্রচ্যবতে । সোহয়ং তৈমিরিকঃ কশ্চিচ্চক্ষুর্বিষয়ং কেশং ন গৃহ্ণাতি, গৃহ্ণাতি চ কেশসমূহং, উভয়ং হ্যতৈমিরিকেণ চক্ষুষা গৃহ্যতে । পরমাণবস্তুতৌন্দ্রিয়া ইন্দ্রিয়াবিষয়ভূতা ন কেনচিদিন্দ্রিয়েণ গৃহ্যন্তে, সমুদিতাস্তু গৃহ্যন্তে ইত্যবিষয়ে প্রবৃত্তিরিন্দ্রিয়স্য প্রসজ্যেত । ন জাত্বর্থান্তরমণুভ্যো গৃহ্যত ইতি । তে খল্বিমে পরমাণবঃ সন্নিহিতা গৃহ্যমাণা অতৌন্দ্রিয়ত্বং জহতি । বিযুক্তাশ্চাগৃহ্যমাণা ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বং ন লভন্ত ইতি । সোহয়ং দ্রব্যান্তরানুৎপত্তাবতিমহান্ ব্যাঘাত ইত্যুপপদ্যতে দ্রব্যান্তরং, যদগ্রহণস্য বিষয় ইতি ।

সঞ্চয়মাত্রং বিষয় ইতি চেৎ ? ন, সঞ্চয়স্য সংযোগভাব-
তস্য চাতীন্দ্রিয়াশ্রয়স্যাগ্রহণাদযুক্তং । সঞ্চয়ঃ খল্বনেকস্য সংযোগঃ,
স চ গৃহমাণাশ্রয়ো গৃহতে, নাতীন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ । ভবতি হৌদমনেন সংযুক্ত-
মিতি, তস্মাদযুক্তমেতদिति ।

গৃহমাণশ্চেন্দ্রিয়েণ বিষয়শ্চাবরণাদনুপলক্ষিকারণমুপলভ্যতে ।

তস্মান্নেন্দ্রিয়দৌর্বল্যাদনুপলক্ষিরণনাং, যথা নেন্দ্রিয়দৌর্বল্যাচ্চক্ষুষা--
হনুপলক্ষিগন্ধাদীনামিতি ।

অনুবাদ । যথাবিষয়ে অর্থাৎ স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়েই ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা ও
মন্দতাবশতঃ বিষয়ের প্রত্যক্ষসমূহের পটুতা ও মন্দতা হয় । যেহেতু প্রকৃষ্ট চক্ষুও
নিজের অবিসয় গন্ধকে গ্রহণ করে না । নিকৃষ্ট চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হয় না
[অর্থাৎ উহাও কেবল তাহার নিজের গ্রাহ্য বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মায় । তাহার অগ্রাহ্য
গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না] । সেই এই অর্থাৎ পূর্বদৃষ্টোক্ত কোন
তৈমিরিক ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় একটি কেশ প্রত্যক্ষ করে না,—কিন্তু কেশ-
সমূহ প্রত্যক্ষ করে । “অতৈমিরিক” (তিমিররোগশূন্য) ব্যক্তি কর্তৃক চক্ষুর দ্বারা
উভয়ই অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেশ এবং কেশপুঞ্জ, এই উভয়ই গৃহীত হয় । কিন্তু
পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূতই নহে বলিয়া কোন
ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় না । “সমুদিত” অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা পুঞ্জীভূত
পরমাণুসমূহই গৃহীত হয়—ইহা বলিলে অবিসয়ে অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে,
এমন পদার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি প্রসক্ত হউক ? (কারণ, পূর্বদৃষ্টবাদীর মতে)
কখনও পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ গৃহীত হয় না । (পরন্তু পূর্বোক্ত মতে)
সেই এই সমস্ত পরমাণুগুলিই সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট হইয়া
গৃহমাণ (প্রত্যক্ষবিষয়) হওয়ায় অতীন্দ্রিয়ত্ব ত্যাগ করে এবং বিযুক্ত অর্থাৎ বিভক্ত
বা বিশ্লিষ্ট হইয়া গৃহমাণ না হওয়ায় ইন্দ্রিয়বিষয়ত্ব লাভ করে না, অর্থাৎ তখন
আবার ঐ সমস্ত পরমাণুই অতীন্দ্রিয় হয় । দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন
অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি না হইলে সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ অতি মহান
ব্যঘাত (বিরোধ) হয়, এ জন্ম যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এমন দ্রব্যান্তর
(অবয়বী) উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় ।

(পূর্বদৃষ্ট) সঞ্চয়মাত্র বিষয় হয় অর্থাৎ পরমাণুগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না,

কিন্তু উহাদিগের সঞ্চয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না,— (কারণ) সঞ্চয়ের সংযোগরূপতাবশতঃ এবং অতীন্দ্রিয়াশ্রিত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, অনেক দ্রব্যের সংযোগই সঞ্চয়, সেই সংযোগও “গৃহমাণাশ্রয়” হইলেই অর্থাৎ যাহার আশ্রয় বা আধার গৃহমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়, এমন হইলেই গৃহীত হয়। “অতীন্দ্রিয়াশ্রয়” অর্থাৎ যাহার আধার অতীন্দ্রিয়, এমন সংযোগ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না। যেহেতু “এই দ্রব্য এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত” এইরূপেই (সংযোগের প্রত্যক্ষ) হয়। অতএব ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমাধানও অযুক্ত।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহমাণ বিষয়েরই (কোন স্থলে) অনুপলব্ধির কারণ আবরণাদি উপলব্ধ হয় [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকাতাই প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার সম্বন্ধেই কোন স্থলে প্রত্যক্ষ-প্রতিবন্ধক আবরণের উপলব্ধি হয়। অতীন্দ্রিয় পরমাণুর সম্বন্ধে উহা বলা যায় না]।

অতএব যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যপ্রযুক্ত নহে, তদ্রূপ পরমাণুসমূহের অপ্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যপ্রযুক্ত নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তমূলক পূর্বস্বত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে এই স্বত্রদ্বারা সর্বসম্মত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহের নিজ নিজ বিষয় ব্যবস্থিত আছে। সকল বিষয়ই সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হওয়ায় ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ব্যবস্থা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয় পটু বা প্রকৃষ্ট হইলেই তজ্জন্তু সেই বিষয়-প্রত্যক্ষও পটু বা প্রকৃষ্ট হয় এবং সেই ইন্দ্রিয় মন্দ বা নিকৃষ্ট হইলেই তজ্জন্তু সেই বিষয়-প্রত্যক্ষও মন্দ বা নিকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে বিষয় যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যই নহে, তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিই হয় না। ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এখানে মহর্ষির ঐ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃষ্ট চক্ষুও গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মায় না এবং নিকৃষ্ট অর্থাৎ রোগাদিবশতঃ ক্ষীণশক্তি চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হয় না। অর্থাৎ উহাও উহার নিজের অবিসয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় না। কারণ, ইন্দ্রিয় যেমনই হউক, কোন কালেই নিজের অবিসয়ে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পটুতাবশতঃই তাহার নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ পটু হয়। মন্দতাবশতঃই তাহার নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ মন্দ হয়। উদ্দ্যোতকর পটু ও মন্দ প্রত্যক্ষের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সামান্য, বিশেষ ও তদ্বিশিষ্ট সেই সম্পূর্ণ বিষয়টির প্রত্যক্ষই পটু প্রত্যক্ষ। আর সেই বিষয়টির সামান্যমাত্রের আলোচনাই তাহার মন্দ প্রত্যক্ষ। মহর্ষি এই স্বত্র দ্বারা পূর্বোক্তরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, তৈমিরিক ব্যক্তি একটি কেশ দেখিতে পায় না, কিন্তু

কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়—এই দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহা সমর্থন করা যায় না। কারণ, কেশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। তৈমিরিক ব্যক্তি তাহার চক্ষুরিন্দিয়ের নৌর্দ্ব্যবশতঃ একটি কেশ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তিমিররোগশূন্য ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ কেশ ও কেশপুঞ্জ, উভয়েরই প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ কেশ চক্ষুরিন্দিয়ের অবিয়র পদার্থ নহে। কিন্তু পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয় পদার্থ—উহা কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিষয় কেশ উহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সমুদিত অর্গাৎ পরস্পর সংযুক্ত পদমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলিলেও ইন্দ্রিয়ের অবিয়রে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, যে পদার্থ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, তাহা পরস্পর সংযুক্ত হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদীদের মতে পরমাণুসমূহ ভিন্ন কোন দ্রব্যাস্তরের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, উহারা সেই দ্রব্যাস্তর অর্গাৎ আনাদিগের সমস্ত পুণক অবয়বী স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যক্ষ পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও উহারা সন্নিহিত অর্গাৎ পরস্পর সংযুক্ত হইলে তখন আব অতীন্দ্রিয় থাকে না। তখন উহারা অতীন্দ্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা লাভ করে। কিন্তু উহারা বিন্যুক্ত বা বিশিষ্ট হইলে তখন আবার অতীন্দ্রিয় হয়। ভাষ্যকার এই কথার উল্লেখপার্কক বলিয়াছেন যে, পরমাণু হইতে দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া পূর্বোক্তরূপ সমাপ্তন করিতে গেলে অতি মহান্ ব্যাঘাত অর্গাৎ বিরোধ হয়। কারণ, অতীন্দ্রিয়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব পরস্পর বিকল্প পদার্থ। উহা একাধারে কখনই থাকিতে পারে না। সুতরাং পরমাণুতে কোন সময়ে অতীন্দ্রিয়ত্ব ও কোন সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব কখনই সম্ভব নহে। পূর্বোক্তরূপ বিরোধবশতঃ উহা কোনকালেই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পরমাণু হইতে দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য। সেই দ্রব্যাস্তর অর্গাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হুল অবয়বীই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও উহা হইতে ভিন্ন অবয়বীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা স্বীকারে কোন বিরোধ নাই। ফলকথা, ঘটাদি দ্রব্যের সর্কজনসিক প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বী স্বীকার্য, ইহাই মহর্ষির মূল বক্তব্য।

পূর্বপক্ষবাদী শেষে যদি বলেন যে, পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ পরস্পর সংযুক্ত পরমাণুসমূহেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমরা বলিব যে, পরমাণুর যে সঞ্চয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। পরমাণুগুলি নক্ষিত বা মিত্তি হইলে তখন তাহাদিগের ঐ সঞ্চয়মাত্রই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদ্বত্তরে বলিয়াছেন যে, উহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগই উহাদিগের “সঞ্চয়”; উহা ভিন্ন উহাদিগের “সঞ্চয়” বলিয়া অন্য কোন পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ সংযোগের আশ্রয় যদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ হয়, তাহা হইলে তদাশ্রিত ঐ সংযোগেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে সংযোগের আশ্রয় বা আধার গৃহমাণ অর্গাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সেই সংযোগেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। কারণ, যে দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ জন্মে, সেই দ্রব্যদ্বয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াই “এই দ্রব্য

এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত” এইরূপে সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ হবে। সেই দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ ব্যতীত এইরূপে তদগত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণুগুলি যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তদগত সংযোগেরও প্রত্যক্ষ কোনরূপেই সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত সমাধানও অযুক্ত।

পূর্বপক্ষবাদী অগত্যা শেষে যদি বলেন যে, যেমন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কোন আবরণ বা ঐক্য অথবা কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে সেখানে ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ আবরণাদি প্রতিবন্ধকবশতঃই পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। বস্তুতঃ পরমাণু প্রত্যক্ষের অসম্ভব অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। উহার পরস্পর সংযুক্ত হইলে তখন আবরণাদি প্রতিবন্ধকের অপগন হওয়ায় তখন উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়। ভাষ্যকার শেষে উক্ত অসংকল্পনারও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহ্যমান হয়, অর্থাৎ অনেক স্থানে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই পদার্থেরই কোন স্থানে আবরণাদিকে অপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বলা যায়। অর্থাৎ সেই পদার্থেরই কোন স্থানে প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানেই প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকরূপে আবরণাদি স্বীকার করা যায়। কিন্তু যে পদার্থের কোন কালে কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার সম্বন্ধে আবরণাদি কল্পনা করা যায় না। পরমাণুর কোন কালে কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ না হওয়ায় উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ইহাই নিশ্চয় আছে। উহা অতীন্দ্রিয় নহে, কিন্তু সর্বদা সর্বত্র উহা কোন পদার্থের দ্বারা আবৃত আছে, অথবা বিবৃক্তাবস্থায় উহার প্রত্যক্ষের কোন প্রতিবন্ধক অবশ্যই থাকে, সংযুক্তাবস্থায় আবার সেই প্রতিবন্ধক থাকে না, এইরূপ কল্পনায় কিছুমাত্র প্রমাণ নাই এবং উহা অসম্ভব।

ভাষ্যকার উপসংহারে পূর্বস্বত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিতে নহর্ষির এই স্বত্রোক্ত মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অতএব যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ কাহারই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্লভ্যপ্রযুক্ত নহে, তদ্রূপ পরমাণুসমূহের যে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাও কাহারও ইন্দ্রিয়ের দৌর্লভ্যপ্রযুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি বিষয়গুলি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই নহে, এই জন্যই চক্ষুর দ্বারা কোন ব্যক্তিরই কোন কালে ঐ গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। তৈমিরিক ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্লভ্যবশতঃ যেমন একটি কেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্লভ্যবশতঃই চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা যেমন কোনরূপেই বলা যাইবে না, তদ্রূপ সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্লভ্যবশতঃই প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও কোনরূপেই বলা যাইবে না। কিন্তু পরমাণুগুলি সর্বেন্দ্রিয়ের অবিষয় বা অতীন্দ্রিয় বলিয়াই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই স্বীকার্য্য। নহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।১।৩৫শ সূত্রে) “নাভীন্দ্রিয়ত্বাণূনাং” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত মত-খণ্ডনে যে মূলযুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই সূত্রেও ঐ মূল যুক্তিই অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বস্বত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া অবগতির অন্তিম সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাংলায়ন পরমাণুপুঞ্জবাদী তৎকালীন বৈভাসিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমস্ত কথারই খণ্ডন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আ০, ৩৬শ সূত্রভাষ্যে) এবং এই সূত্রের ভাষ্যে উক্তরূপ বিচার

কৰিয়াছেন। কিন্তু পরমাণুপঞ্জবাদী বৌদ্ধনাস্তিক্যের মত শেয়ে অনেক বিচারপূৰ্ণক সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন যে, সংযুক্ত পরমাণুসমূহই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে প্রতি-ক্ষণে পরমাণু উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও অসংযুক্ত ভাবে প্রত্যেক পরমাণু উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে। কারণ, স্বতন্ত্রভাবে অসংযুক্ত অবস্থায় উহার কোন স্থানে সম্ভবই নাই। ভাস্কর্য্য শিল্পকলা এই মতের সমর্থন কৰিয়াছিলেন, ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মহাদার্শনিক শাস্ত্র রক্ষিতের “তত্ত্বসংগ্রহ”র পঞ্জিকাংকর বৌদ্ধ মহাদার্শনিক কমল-নীলের উক্তি দ্বারা জানা যায়। শাস্ত্র রক্ষিতও “তত্ত্বসংগ্রহ” তাঁহার সম্মত বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্য ভদ্রশ্রুত শিল্পকলা উক্ত মতও খণ্ডন কৰিয়া গিয়াছেন^১। তিনি বলিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ যদি সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং ঐ অবস্থায় স্বরূপতাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আর উহাদিগের নিরংশয় থাকে না। অর্থাৎ পরমাণুসমূহের যে অংশ নাই, ইহা আর বলা যায় না। কারণ, সংযুক্ত পরমাণুসমূহেরই উৎপত্তি হইলে প্রত্যেক পরমাণুই উহার অংশ হওয়ায় উহা নিরংশ হইতে পারে না। আর যদি ঐ পরমাণুসমূহ নিরংশই হয়, তাহা হইলে উহা মূর্ত হইতে পারে না। মূর্ত না হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব সংযুক্ত হইয়াই পরমাণুসমূহ উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে উহা সাংশ ও মূর্ত, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু হইতে অভিন্ন বলা যাইবে না। পরমাণু হইতে ভিন্ন সাংশ পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তস্থানি হইবে। এখানে ভাষ্যকার বাৎসর্য্যনের “সমুদিতাস্ত গৃহন্তে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত মতেরও খণ্ডন হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, পূৰ্ণপক্ষণাদির মতে পরমাণু হইতে ভিন্ন কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পরমাণুসমূহ প্রত্যেকই অতীন্দ্রিয় বলিয়া সংযুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাঁহা স্বভাবতই অতীন্দ্রিয়, তাহাই আবার কোন অবস্থায় লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। সুতরাং পরমাণুসমূহ সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এই মতও সমর্থন করা যায় না। ভাষ্যকারের দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত বিচারের দ্বারাও উক্ত মতের খণ্ডন বুঝা যায় ৷১৪৥

১। অথাপি স্থাৎ সমুদিতা এবোৎপদ্যন্তে বিনশন্তি চেতি সিদ্ধান্তান্নৈককপরমাণুপ্রতিভাস ইতি, যথোক্তং ভদ্রশ্রুতশ্রুতেন,—“প্রত্যেকপরমাণুনাং স্বভাবো নান্তি সম্ভবঃ। অতঃপি পরমাণুনাং লৌকিকপ্রতিভাসনং” ॥ ইতি। তদেত-
দনুভবমিতি দর্শয়ন্যাহ, “সাহিতোনাপী”তি।—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা।

২। সাহিতোনাপি জাতাস্তু স্বরূপেণৈব ভাসিনঃ।

তদ্ব্যস্তানংশরূপং ন চ তাস্মৈ দশ্যমী।

লক্ষ্যপচয়পর্য্যন্তং কপাং তেমাং সমস্তু চেৎ।

কথং নাম নাত্তে মূর্ত্তাভবেদ্ব্যবধানাদিবং।

—তত্ত্বসংগ্রহ ॥ গাইকোয়াড়, ওরিয়েন্টাল, সিরিজ—৫৫১, পৃষ্ঠা।

সূত্র । অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমাশ্রয়ঃ ॥

॥১৫॥৪২৫॥

অনুবাদ । পরন্তু এইরূপ অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্তরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ “প্রলয়” অর্থাৎ সর্বভাব পর্য্যন্ত (অথবা পরমাণু পর্য্যন্ত) হইবে [অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকথিত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অবয়বে সর্বথা বর্তমানত্বের অভাববশতঃ অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হওয়ায় একেবারে সর্বভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষের বিষয় না থাকায় প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকথিত “বৃত্তি-প্রতিষেধ” সম্ভবই হয় না। আশ্রয়ের অভাবে উহার অস্তিত্বই থাকে না]।

ভাষ্য । যঃ বস্তুবয়বিনোহবয়বেষু বৃত্তিপ্রতিষেধোদভাবঃ সোহয়-মবয়বস্থাবয়বেষু প্রসজ্যমানঃ সর্বপ্রলয়ায় বা কল্পেত, নিরবয়বাদ্বা পরমাণুতো নিবর্তেত । উভয়থা চোপলন্ধিবিসয়স্থাভাবঃ, তদভাবা-দূপলন্ধ্যভাবঃ । উপলন্ধ্যাশ্রয়শ্চায়ং বৃত্তিপ্রতিষেধঃ—স আশ্রয়ং ব্যাঘ্নমাত্মবাতায় কল্পত ইতি ।

অনুবাদ । অবয়বসমূহে অবয়বীর বর্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত যে অভাব, সেই ইহা অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধেও (বর্তমানত্বের অভাবপ্রযুক্ত) প্রসজ্যমান (আপোক্তমান) হইয়া সকল পদার্থের অভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা সর্বভাবেরই সাধক হইবে, অথবা নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে। উভয় প্রকারেই অর্থাৎ সর্বভাব অথবা পরমাণুমাত্র, এই উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়াভাবপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের অভাব হয়। কিন্তু এই “বৃত্তি-প্রতিষেধ” অর্থাৎ অবয়বীর অভাব সমর্থন করিতে পূর্বপক্ষবাদীর কথিত অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্বথা বর্তমানত্বাভাব প্রত্যক্ষাশ্রিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উহা সম্ভবই হয় না, (সূত্রায়ং) সেই বৃত্তিপ্রতিষেধ আশ্রয়কে (প্রত্যক্ষকে) ব্যাহত করায় আত্মনাশের নিমিত্তই সমর্থ হয়। [অর্থাৎ সর্বভাব অথবা পরমাণুমাত্র স্বীকার্য হইলে প্রত্যক্ষের উচ্ছেদ হওয়ায় তন্মূলক “বৃত্তিপ্রতিষেধ” সম্ভবই হয় না। কারণ, উহা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেরই উচ্ছেদ করে, উহার অস্তিত্বই থাকে না। সূত্রায়ং উহা অবয়বীর অভাবের সাধক হইতেই পারে না]।

টিপ্পনী : মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনে তাঁহার দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত মূল যুক্তির সমর্থন করিয়া, এখন তদনুসারে এই সূত্রদ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত বাধক যুক্তির খণ্ডনে তাঁহার বক্তব্য চরম কথা বলিয়াছেন যে, অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে সর্বাংশেও বর্তমান থাকে না, একদেশের দ্বারাও বর্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই, ইত্যাদি কথার দ্বারা পূর্বপক্ষবাদী যেরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়াছেন, ঐরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ “প্রলয়” অর্থাৎ সর্বাভাব পর্য্যন্ত হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ যুক্তি অনুসারে অবয়বীর শ্রায় অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হইলে সর্বাভাবই সিদ্ধ হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষবাদী তাঁহার পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়া অবয়বের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব সম্বন্ধেও ঐরূপে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ অবয়বগুলি কোথায় কিরূপে বর্তমান থাকে ? যদি এক অবয়ব অত্র অবয়বে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে পূর্ববৎ জিজ্ঞাস্য এই যে, উহা কি সর্বাংশে বর্তমান থাকে, অথবা একাংশের দ্বারা বর্তমান থাকে ? পূর্বপক্ষবাদী তাঁহার পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর শ্রায় অবয়বেরও অভাব স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে সূত্রকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বী কোনরূপেই বর্তমান হইতে পারে না, এই যুক্তির দ্বারা পূর্বপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়াছেন, উহা তাঁহার ঐ যুক্তি অনুসারে অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধেও প্রসক্ত হইয়া সর্বাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা সর্বাভাবের সাধক হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত যুক্তি অনুসারে যদি অবয়বসমূহে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবয়বসমূহে অবয়বের অভাবও সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে অবয়বী ও অবয়ব, উভয়ই না থাকায় একেবারে সর্বাভাবই সিদ্ধ হইবে। পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, ঘটাদি অবয়বীর শ্রায় উহার অবয়ব এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি যে সমস্ত অবয়ব তোমাদিগের মতে সাবয়বত্ববশতঃ অবয়বী বলিয়াও স্বীকৃত, তাহা ত পূর্বোক্ত যুক্তিতে আমরাও স্বীকার করি না। আমরাদিগের মতে ঐ সমস্ত অবয়বও নাই। কিন্তু আমরা পরমাণু স্বীকার করি। আমরাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থ সমস্তই পরমাণুপুঞ্জমাত্র। পরমাণু নিরবয়ব পদার্থ। সুতরাং তাহার অংশ না থাকায় সর্বাংশ ও একাংশ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ প্রণয় হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর এই কথা মনে করিয়া তদনুসারে দ্বিতীয় বিকল্প বলিয়াছেন,—“নিরবয়বাদ্বা পরমাণুতো নিবর্ত্তেত”। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্কথা বর্তমানত্বের অনুপপত্তিবশতঃ পূর্বপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাবপ্রসঙ্গের আপত্তি করিয়াছেন, উহা (১) সর্কাভাব হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (২) পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (৩) কুত্ৰাপি নিবৃত্ত হইবে না, এই তিনটি পক্ষ উক্ত বিষয়ে সম্ভব হয়। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথম বিকল্পের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া, দ্বিতীয় বিকল্পের অনুপপত্তি বুঝাইতে প্রথমে লিখিয়াছেন,—“উপলক্ষণৈকতদাপ্রলয়াদিতি—আপরমাণো-

রিতাপি দ্রষ্টব্যঃ।” অর্থাৎ এই সূত্রে “আপ্রলয়াৎ” এই বাক্যটি উপলক্ষণ। উহার দ্বারা পরে “আপরমাণোর্বা” এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বৃত্তিতে হইবে। বার্তিককারও এখানে পরে “নিরবয়বাদা পরমাণুতো নিবর্ততে” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় বিকল্পও এখানে সূত্রকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত বিকল্পদ্বয়ের উল্লেখপূর্বক মহর্ষির নিগূঢ় মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয় না থাকায় প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। কারণ, যদি একেবারে সর্বসত্তাবই স্বীকৃত হয়, জগতে কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে কাহার প্রত্যক্ষ হইবে? উক্ত মতে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক কোন জ্ঞানই ত থাকে না। আর যদি পরমাণুসত্তাই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়াভাবে প্রত্যক্ষ থাকে না। কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ, উহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। প্রত্যক্ষ না থাকিলে তন্মূলক অত্র জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদী যে, অবয়বসমূহে অবয়বীর সর্বথা বর্তমানত্বের অভাব বলিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোনরূপেই বলা যায় না। একেবারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে তন্মূলক অত্র জ্ঞানও অসম্ভব হওয়ায় অবয়বী কি তাহার অবয়বসমূহে সর্বাংশে বর্তমান থাকে অথবা একাংশের দ্বারাই বর্তমান থাকে? এইরূপ বিকল্পই করা যায় না। সুতরাং অবয়বী তাহার অবয়বসমূহে কোনরূপেই বর্তমান থাকে না, ইহা নির্ধারণ করাও যায় না। দ্বন্দ্বকথা, পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকথিত অবয়বসমূহে অবয়বীর যে বৃত্তিপ্রতিষেধ, উহা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করার নিজের বিনাশেরই কারণ হয়, অর্থাৎ উহা নিজের অস্তিত্বেরই ব্যাধাতক হয়। সুতরাং উক্ত মতে উহা অবয়বীর অভাবের সাধক কিরূপে হইবে? অর্থাৎ যে “বৃত্তি-প্রতিষেধ” প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভবই হয় না, প্রত্যক্ষ যাহার আশ্রয়, তাহা যদি ঐ প্রত্যক্ষের উচ্ছেদেরই কারণ হয়, তাহা হইলে উহার নিজের উচ্ছেদেরও কারণ হইবে। উহার অস্তিত্বই সম্ভব হইবে না। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী উহাকে অবয়বীর অভাবের সাধকরূপে উল্লেখ করিতেই পারেন না। অত্র কথ্য পরবর্তী সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥১৫॥

ভাষ্য। অথাপি—*

সূত্র। ন প্রলয়োহুসদ্বাবাৎ ॥১৬॥৪২৬॥

অনুবাদ। “প্রলয়” অর্থাৎ সর্বসত্তাব নাই, যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব আছে।

ভাষ্য। অবয়ববিভাগমাত্রিত্য বৃত্তিপ্রতিষেধাদভাবঃ প্রসজ্যমানো নিরবয়বাৎ পরমাণোনিবর্ততে ন সর্বপ্রলয়ায় কল্পতে। নিরবয়বত্বস্ত পরমাণো’বিবর্তাগেহ্লতরপ্রসঙ্গস্ত যতো নান্নীয়স্তত্রাবস্থানাৎ। লোক্যন্ত

* “অথাপি”তি অপি চেত্যর্থঃ। অপিচ প্রলয়মভ্যুপগম্য “আপ্রলয়া”দিত্যি, বস্তুতঃ “ন প্রলয়োহুসদ্বাবাৎ”। —তাৎপর্যটীকা।

১। নিরবয়বত্ব প্রমাণমাহ “নিরবয়বত্বস্ত পরমাণোনিবর্ততে”। —তাৎপর্যটীকা।

খলু প্রবিভজ্যমানাবয়বশ্চাল্লতরমল্লতমমুত্তরমুত্তরং ভবতি । স চায়মল্লতর-
প্রসঙ্গো যস্মাৎশাল্লতরমস্তি যঃ পরমোহ্লল্লতত্র নিবর্ততে, যতশ্চ নাল্লীয়োহস্তি,
তং পরমাণুং প্রচক্ষাহে ইতি ।

অনুবাদ । অবয়ব-বিভাগকে আশ্রয় করিয়া “বৃত্তিপ্রতিষেধ”প্রযুক্ত (অবয়ব-
পরম্পরার) অভাব প্রসজ্যমান হইয়া নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হয়, (সুতরাং)
সর্বাব্যবহাের নিমিত্ত সমর্থ হয় না [অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার আর
পূর্বোক্তরূপে “বৃত্তিপ্রতিষেধ”প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হয় না । সুতরাং পরমাণুর
অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সর্বাব্যবহাের সিদ্ধ হয় না] । পরমাণুর নিরবয়বত্ব কিন্তু বিভাগ
করিলে অল্পতরপ্রসঙ্গের যে দ্রব্য হইতে অতি ক্ষুদ্র নাই, সেই দ্রব্যে অবস্থানপ্রযুক্ত
সিদ্ধ হয় । যেমন বিভজ্যমানাবয়ব অর্থাৎ যাহার অবয়বের বিভাগ করা হয়, সেই
লোষ্টের উত্তর উত্তর অল্পতর ও অল্পতম হয় । সেই এই অল্পতরপ্রসঙ্গ, যাহা হইতে
অল্পতর নাই, যাহা পরম অল্প অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতে নিবৃত্ত হয় । যাহা
হইতে অতিক্ষুদ্র নাই, সেই পদার্থকে আমরা পরমাণু বলি ।

টিপ্পনী । পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে মহর্ষি “প্রলয়” অর্থাৎ সর্বাব্যবহাের স্বীকার
করিয়াই পূর্বসূত্রে “আপ্রলয়াৎ” এই কথা বলিয়াছেন । কিন্তু ঐ যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না
হওয়ায় সর্বাব্যবহাের সিদ্ধ হয় না । পূর্বপক্ষবাদীও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করার মহর্ষি তাঁহার মতে
“প্রলয়” বলিতেও পারেন না । তাই মহর্ষি পরে আবার এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ
প্রলয় নাই । কারণ, পরমাণুর অস্তিত্ব আছে । ফলকথা, মহর্ষি পরে এই সূত্র দ্বারা পূর্বসূত্র-
সূচিত প্রথম পক্ষ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বুদ্ধিস্থ দ্বিতীয় পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া, ঐ পক্ষেও পূর্বপক্ষ-
বাদীর পূর্বকথিত “বৃত্তিপ্রতিষেধ”র অনুপপত্তি সূচনা করিয়া গিয়াছেন । তাই ভাষ্যকারও
মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই পূর্বসূত্রভাষ্যে পরে “নিরবয়বত্বা পরমাণুতো নিবর্ততে” এই দ্বিতীয়
বিকল্পের উল্লেখ করিয়া, ঐ পক্ষেও প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায় পূর্বপক্ষবাদীর কথিত “বৃত্তিপ্রতিষেধ”
যে উপপন্নই হয় না, আশ্রয়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহার যে অস্তিত্বই থাকে না, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন ।
তাৎপর্যটীকাকারও সূত্রকারের নূনতা পরিহারের জন্ত পূর্বসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ঐ
সূত্রে “আপ্রলয়াৎ” এই বাক্যটি উপলক্ষণ ; উহার দ্বারা উহার পরে “আপরমাণোর্কা” এই বাক্যও
মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বৃত্তিতে হইবে । ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যই ব্যক্ত করিতে
প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগকে আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্তরূপে “বৃত্তিপ্রতিষেধ”প্রযুক্ত অবয়ব-
পরম্পরার যে অভাবের প্রসঙ্গ বা আপত্তি হয়, ঐ অভাব নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হওয়ায়
সর্বাব্যবহাের নিমিত্ত সমর্থ হয় না, অর্থাৎ উহা সর্বাব্যবহাের সাধন করিতে পারে না । তাৎপর্য এই যে,

অবয়বী তাহার অবয়বনমূহ কোনরূপে বর্তমান হয় না অর্থাৎ অবয়বোক্তে সর্বথা বর্তমানত্বাভাবই পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকথিত “বৃত্তিপ্রতিষেধ”। উহা স্বীকার করিলে সেই অবয়বীর অবয়বনমূহরও বিভাগকে আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত অবয়বও তাহার অবয়বে কোনরূপে বর্তমান হয় না, ইহা বলিয়া পূর্ববৎ “বৃত্তিপ্রতিষেধ”প্রযুক্ত সেই অবয়বনমূহর অভাব সিদ্ধ হইলেও ঐ অভাব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ অবয়বের বিভাগকে আশ্রয় করিয়া সেই অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব, তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরাকে গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত “বৃত্তিপ্রতিষেধ”প্রযুক্ত পরমাণুর পূর্ব পর্য্যন্ত অবয়বপরম্পরার অভাবই সিদ্ধ হইতে পারে, পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহাতে পূর্বোক্ত “বৃত্তিপ্রতিষেধ” সম্ভবই হয় না। পরমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বর্তমান হয়? এইরূপ প্রশ্নই করা যায় না। ভাষ্যকার এখানে “নিরবয়বাৎ পরমাণোর্নিবর্ত্ততে” এই বাক্যে “নিরবয়বাৎ” এই হেতুগর্ভ বিশেষণ-পদের দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব প্রকাশ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। এখন যদি পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সর্বভাব সিদ্ধ হয় না। পূর্বোক্ত মতেও পরমাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সকল পদার্থেরই অভাব বলা যায় না। তাই মহর্ষি পরে আবার নিজেই বলিয়াছেন,—“ন প্রলয়োহণ্ডাদবাৎ”। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন অদৃশ্য দ্ব্যণুক এবং দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্রব্যও অনেক স্থানে “অণু” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। অভিযানেও “লব,” “লেশ,” “কণ” ও “অণু” শব্দ এক পর্যায়ে উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি নিজের তৃতীয় অধ্যায়ে “মহদণুগ্রহণাৎ” (১৩৩) এই সূত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশেষ অর্থেও “অণু” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে “অণু” শব্দ যে নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় পরমাণু তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা এখানে বক্তব্য বিষয়ে প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকর ৩৬শ সূত্রেও “নাতীন্দ্রিয়ত্বান্ধনূনাৎ” এই উত্তর-বাক্যে “অণু” শব্দের দ্বারা পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবল “অণু” শব্দ যে স্থানসূত্রে পরমাণু তাৎপর্য্যেও প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার পূর্বে যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে বুঝিব? পরমাণুর নিরবয়বত্ব বিষয়ে যুক্তি বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের এবং তাহার অবয়বগুলির বিভাগ করিলে সেই বিভক্ত অবয়বগুলি পর পর পূর্বোপেক্ষায় ক্ষুদ্র হয়। পরে যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, যাহার আর বিভাগ হয় না, সেই দ্রব্যেই ঐ ক্ষুদ্রতরত্ব প্রশঙ্গের অবস্থান হয় অর্থাৎ সেই পর্য্যন্তই ক্ষুদ্রতরত্ব প্রশঙ্গ হয়। উহার পরে আর কোন অবয়ব না থাকায় উহা হইতে আর ক্ষুদ্রতর দ্রব্য সম্ভব হয় না, এ ক্ষুদ্র পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বোক্ত কথা বুঝাইয়া পরমাণুর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, একটি গোষ্ঠের অবয়বনমূহের যখন পর পর বিভাগ করা হয়, তখন প্রথম বিভক্ত অবয়ব ঐ গোষ্ঠে অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর হয়, তাহার অবয়ব উহা হইতে ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে উত্তর উত্তর অর্থাৎ পর পর বিভক্ত দ্রব্যগুলি ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে যতই বিভাগ করা যায়, ক্রমশঃ

পূর্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র দ্রব্যই উদ্ভূত হয়। কিন্তু ঐ যে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতমত্বের প্রত্যক্ষ, উহার অবশ্য কোন স্থানে নিবৃত্তি আছে। ঐরূপ বিভাগ করিতে করিতে এমন স্থানে পৌঁছবে, যাহার আর বিভাগ হয় না। সুতরাং সেই স্থানেই অর্থাৎ যে দ্রব্যের আর বিভাগ হয় না, যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, সেই নিরবয়ব দ্রব্যই পূর্বাঙ্ক ক্ষুদ্রতরত্ব প্রত্যক্ষের নিবৃত্তি হয়। সেই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নিরবয়ব দ্রব্যই পরমাণু।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ চরম কল্প পূর্বসূত্রকে পূর্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়ববিদ্যার প্রথম পর্য্যন্ত অবয়ববিভাগস্বীকার স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যয়ে সমস্ত পৃথিব্যাতির বিনাশ হওয়ায় পুনর্বার সৃষ্টি হইতে পারে না। মহর্ষি উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, “প্রথম” অর্থাৎ সমস্ত পৃথিব্যাতির নশ হয় না। কারণ, পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং ঐ নিত্য পরমাণু হইতে দ্বাণুকাদিক্রমে পুনর্বার সৃষ্টি হয়। “তায়সূত্র-বিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও বৃত্তিকারের এই চরম ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য মহর্ষির পূর্বসূত্রটিকে পূর্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষি বক্তব্য স্মরণ ও স্মরণগত হয়। কিন্তু মহর্ষি পূর্বসূত্রে “চ” শব্দের প্রয়োগ করায় উহার দ্বারা তিনি যে, পূর্বাঙ্ক মতে দোষান্তরই সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ অতীতপূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকথিত যুক্তি খণ্ডনের জন্তই যে তিনি ঐ সূত্রট বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ পূর্বসূত্রে “চ” শব্দের প্রতি মনোযোগ করিয়াই উহাকে পূর্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পূর্বাঙ্করূপেই পূর্বসূত্র ও এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকারও প্রথমে পূর্বসূত্রকে পূর্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই ॥ ১৬ ॥

সূত্র । পরং বা ক্রটেঃ ॥১৭॥৪২৭॥*

অনুবাদ । “ক্রটি”র অর্থাৎ দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম “ত্রসরেণু” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরই পরমাণু।

ভাষ্য । অবয়ববিভাগস্থানবস্থানাদ্ভব্যাপ্যামসংখ্যেয়ত্বাৎ ক্রটিহিনিবৃত্তি-
রিত্তি ।

অনুবাদ । অবয়ববিভাগের অনবস্থানবশতঃ সাবয়ব দ্রব্যসমূহের অসংখ্যেয়ত্ব-
প্রযুক্ত ক্রটিহিনিবৃত্তি হয় [অর্থাৎ যদি লোফট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব-

* অতীতপূর্বপক্ষ এতদবয়ববিভাগঃ কস্মিন্ ভবতীত্যত আহ “পরং বা ক্রটেঃ” । ক্রটিত্রসরেণুরিত্যনর্থাস্তরং । “জালমূর্খ্যমরীচিস্থং এসরেণু রজঃ সূত্রং” । যদি ক্রটেঃ পরং দ্বিত্রিপদকেহবয়ববিভাগো ন ব্যবতিষ্ঠতে, ততোহবয়ব-
বিভাগস্থানবস্থানাদ্ভব্যাপ্যামসংখ্যেয়ত্বাৎ ক্রটিহিনিবৃত্তিঃ, ক্রটিরপি স্মরণে তুল্যপরিমাণঃ স্তাৎ । ন খণ্ডনস্তাবয়বত্ব-
কশ্চিৎশেষ ইত্যর্থঃ ।—তাৎপৰ্য্যটিকা ।

বিভাগের কোন স্থানে অবস্থান না হয়, যদি ঐ বিভাগের শেষই না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্য অসংখ্য অর্থাৎ অনন্তাবয়ব হওয়ায় বাহা “ক্রটি” নামক দৃশ্য ক্ষুদ্র দ্রব্য, উহার ক্রটিই থাকে না] ।

টিপ্পনো । পূর্বস্বত্রোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবয়বাবয়ববিভাগ অনন্ত, অর্থাৎ উহার অন্ত বা শেষ নাই, ইহা কেন বলা যায় না ? অর্থাৎ সমস্ত অবয়বেরই বিভাগ থাকায় সমস্ত অবয়বেরই অবয়ব আছে । সুতরাং বাহা পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহারও অবয়ব আছে এবং ঐ অবয়বেরও অবয়ব আছে । এইরূপে অবয়ববিভাগের কুত্ৰাপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি না থাকিলে নিরবয়ব পরমাণু কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? মহর্ষি এই ক্রটিই শেষে আবার এই স্বত্রের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত “অণু” অর্থাৎ পরমাণুর পরিচয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি সূচনা করিতে বলিয়াছেন যে, “ক্রটি”র পরই পরমাণু । পূর্বস্বত্রোক্ত পরমাণুই এই স্বত্রে মহর্ষির লক্ষ্য । তাই এই স্বত্রে “পর” শব্দের দ্বারা ঐ পরমাণুরই পরিচয় সূচিত হইয়াছে বুঝা যায় । এবং “পর” শব্দের দ্বারা মহর্ষির মতে “ক্রটি”ই যে পরমাণু নহে, উহার পরে উহা হইতে ভিন্ন পদার্থই পরমাণু, ইহাও সূচিত হইয়াছে । “বা” শব্দের অর্থ এখানে অবধারণ । উহার দ্বারা “ক্রটি”র অবয়ববিভাগের যে বিশ্রাম বা নিবৃত্তি আছে, তাহার অবধারণ করা হইয়াছে । “ক্রটি” শব্দের দ্বারা ঐ অবধারণের যুক্তি সূচিত হইয়াছে । অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশেষকে “ক্রটি” বলা হয়, উহারও অবয়ব বিভাগের যদি কুত্ৰাপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে উহাকে “ক্রটি”ই বলা যায় না, উহার ক্রটিই থাকে না । মহর্ষি “ক্রটি” শব্দের দ্বারাই পূর্বোক্তরূপ যুক্তির সূচনা করিয়া নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন । ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ যুক্তি প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগের যদি অবস্থান অর্থাৎ কোন স্থানে অবস্থিতি বা বিশ্রাম না থাকে, অর্থাৎ যদি “ক্রটি” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যেরও অবয়বের অবয়ব, তাহার অবয়ব, তাহার অবয়ব, এইরূপে অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাবয়ব দ্রব্যমাত্রেরই অসংখ্য অবয়ব হওয়ায় অসংখ্যতাবশতঃ ক্রটিই থাকে না । বার্তিককার উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগ অনন্ত হইলে বাহা “ক্রটি” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্য, তাহা “অমেয়” হইয়া পড়ে । অর্থাৎ সংখ্যা, পরিমাণ ও গুরুত্ববিশিষ্ট “ক্রটি” নামক দ্রব্যে কিরূপ গুরুত্ব আছে ও কত সংখ্যক পরমাণুর দ্বারা উহা গঠিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করা যায় না । কারণ, উহার অন্তর্গত পরমাণুর সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না । সুতরাং যেমন অসংখ্য পরমাণুর দ্বারা গঠিত হিমালয় পর্বত অমেয়, তদ্রূপ ক্রটিও অমেয় হইয়া পড়ে । কিন্তু “ক্রটি”ও যে, হিমালয় পর্বতের ন্যায় অসংখ্য পরমাণুগঠিত, সুতরাং অমেয়, ইহা ত কেহই বলিতে পারেন না । তাৎপর্যটাকাঙ্কায় বাচস্পতি মিশ্র মহর্ষির যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যদি “ক্রটি” অর্থাৎ “ত্রসরেণু” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবয়বেই অবয়ব-বিভাগ বাবস্থিত না হয়, তাহা হইলে উহার অবস্থানপ্রযুক্ত সাবয়ব দ্রব্যসমূহ অসংখ্য বা অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় “ক্রটি”র ক্রটিই থাকে না এবং তাহা হইলে ক্রটিও অমেরু পর্বতের সহিত তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে । কারণ, উক্ত মতে অমেরু পর্বতের

অবয়বপরম্পরার যেমন সংখ্যা করা যায় না, উহার অন্ত নাই, তদ্রূপ “ক্রটি”রও অবয়বপরম্পরার অন্ত না থাকিলে স্মেরু ও ক্রটির পরিমাণগত কোন বিশেষ থাকে না। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র শারীরকভাষ্যের “ভাষ্যী” টীকাতেও (২।২।১১) “পরমাণুকারণবাদ” বুঝাইতে পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থনে বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব থাকিলে অনন্তাবয়বত্ববশতঃ স্মেরু পর্বত ও রাজসর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি হয়। পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে অত্যাশ্রয় গ্রন্থকারও পরমাণুর সাবয়বত্বপক্ষে উক্ত চরম আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। (চতুর্থ খণ্ড, ২৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ এই সূত্রোক্ত “ক্রটি” শব্দের অর্থ দ্ব্যণুক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, ক্রটির পরই অর্গাৎ দ্ব্যণুকের অর্দ্ধাংশই পরমাণু। অবশ্য এই ব্যাখ্যায় প্রকৃতার্থ স্মরণ হয়। কিন্তু “ক্রটি” শব্দের দ্ব্যণুক অর্থে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তাৎপর্যটীকাকার প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যাকারগণ ত্রসরেণুকেই ক্রটি বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে যে দ্ব্যণুক নামক দ্রব্য জন্মে, ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে ত্রসরেণু নামক দৃশ্য দ্রব্য জন্মে। গবাক্ষরক্ষুগত সূর্য্যাকিরণের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেণু দেখা যায়, তাহাকেই মনাদি ঋষিগণ ত্রসরেণু বলিয়াছেন। মনুসংহিতায় ঐ পরিমাণকে দৃশ্য পরিমাণের মধ্যে সর্ব প্রথম বলিয়া কথিত হইয়াছে^১। পরে আট ত্রসরেণু এক লিঙ্কা, তিন লিঙ্কা রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপ গৌর সর্ষপ, ইত্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণবিশেষের সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও ঐরূপ নানা পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও প্রথমে গবাক্ষরক্ষুগত সূর্য্যাকিরণের মধ্যস্থ দৃশ্যমান রেণুকেই ত্রসরেণু বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অপারক টীকা ও “বীরমিত্রোদয়” নিবন্ধে উক্ত বচনের ব্যাখ্যায় ত্রায়-বৈশেষিক-শাস্ত্র-সম্মত ত্রসরেণুই যাজ্ঞবল্ক্যের অভিনত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে^২। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে তাঁহার কথিত ত্রসরেণুর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচনের পূর্ব্বাঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রবোর পরিমাণ বা গুরুত্ববিশেষেরই “ত্রসরেণু” প্রভৃতি পরিভাষা উক্ত হইয়াছে^৩ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কালবিশেষের

১। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ ।

প্রথমং তৎ প্রমাণানং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে ॥—মনুসংহিতা, ৮ম অঃ, ১৩২ শ্লোক ।

২। জালসূক্ষ্মমরীচিস্তং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতং ।

ত্রেহস্তৌ লিঙ্কা তু তান্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে ॥—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, আচার অধ্যায়,

রাজসর্ষপ-প্রকরণ—৩৬০ম শ্লোক ।

গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিতাকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তনীতা দ্ব্যণুকত্রয়ারকং দৃশ্যতে রজঃ, তৎ ত্রসরেণুরিতি মনাদিভিঃ স্মৃতং ॥—অপারক টীকা ।

গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিতাকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তনীতা দ্ব্যণুকত্রয়ারকং রজো দৃশ্যতে তৎ ত্রসরেণুরিতি মনাদিভিঃ স্মৃতং ॥—বীরমিত্রোদয়, ২৯৪ পৃষ্ঠা ।

৩। “জালান্তরগতেঃ সূর্য্যকরৈর্বংশী বিলোকাতে ।

ত্রসরেণুস্ত বিজ্ঞেয়স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ ।

ত্রসরেণোস্ত পর্যায়নামা বংশী নিগদ্যতে” ॥—পরিভাষাপ্রদীপ, ১ম খণ্ড ।

স্বরূপ বুঝাইতে ঐ কালের পরমাণু, অণু, ত্রসরেণু ও ক্রটি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও প্রথম শ্লোকে^১ জ্ঞাত দ্রব্যের চরম অংশকে পরমাণু বলিয়া পার্থিবাদি পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। টীকাকার বীর রাঘবাচার্য্য প্রভৃতি কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেও প্রাচীন টীকাকার পূজাপাদ শ্রীধর স্বামী, বিজয়ধ্বজতীর্থ, বল্লাভাচার্য্য এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উক্ত শ্লোকে “পরমাণু” শব্দের দ্বারা কাল ভিন্ন পার্থিবাদি পরমাণুই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রচলিত ত্রায়-বৈশেষিক মতানুসারে গবাস্করকে দৃশ্যমান ত্রসরেণুর বর্ষ অংশই যে পরমাণু, ইহাও ঐ স্থানে লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে “নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ” এই বাক্যের দ্বারা শ্রীধর স্বামী পরমাণুসমূহকেই এক অবয়বী বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক কোন অবয়বী নাই, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পঞ্চম স্কন্ধের “যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ” এই^২ বাক্যের দ্বারা যে অবয়বীর নিরাকরণপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার টীকার ব্যাখ্যা করিতে “দীপিনী” টীকায় রাধারমণদাস গোস্বামীও উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বল্লাভাচার্য্য ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাকারগণ উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদের অর্থরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাণুসমষ্টিকেই যে অবয়বী বলিয়া ভ্রম হইতেছে, বস্তুতঃ উহা হইতে ভিন্ন অবয়বী নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে অদ্বৈতমতানুসারেই পরমাণুসমূহকে অবিদ্যাকল্পিত বলা হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। এবং উক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে “যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ” এই বাক্যের দ্বারা যে, পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবয়বীর অসম্ভাবি কথিত হইয়াছে, ইহাও নির্দ্বিধাদে প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী না থাকিলে ঘটাদি বাহ্য পদার্থের যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্বরণ করা আবশ্যিক। বেদান্তদর্শনেও “না ভাব উপলব্ধেঃ” (২।২।২৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বাহ্য পদার্থের অলীকত্ব প্রতিপত্ত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তদর্শনের ঐ সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারাও ঘটাদি অবয়বী যে অলীক নহে এবং পরমাণুসমষ্টিরূপও নহে, ইহা স্বীকার্য্য হইলে শ্রীমদ্ভাগবতেরও উহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে অদ্বৈতমতানুসারে পরমাণু ও অবয়বী, সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত। শ্রীধর স্বামীদের ঐ ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতানুসারেই এবং কার্য্য ও কারণের অভেদ পক্ষ গ্রহণ করিয়াই সংগত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও পরমাণু ও অবয়বীর ব্যবহারিক সত্তা অবশ্যই আছে। অদ্বৈত-মতেও উহা একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। সুধীগণ শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের সমস্ত টীকা দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন।

১। চরমঃ সদ্‌বিশেষণাননেকোৎসংযুক্তঃ সদা।

পরমাণুঃ স বিস্কৃত্যো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।১।

২। এবং নিরুক্তং ক্ষিতিকল্পবৃত্তমসম্বন্ধানং পরমাণবো মে।

অবিদ্যায়া মনসা কল্পিতান্তে যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ১২শ অঃ ৯ম শ্লোক।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই সূত্রে “বা” শব্দের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করিয়া চরম কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ক্রটি হইতে পর অর্থাৎ স্বল্প পরমাণু, অথবা ক্রটিতেই বিশ্রাম, এই বিকল্পই সূত্র-কারের অভিপ্ৰায়। “ত্ৰায়সূত্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এখানে বৃত্তিকারের সমস্ত ব্যাখ্যাই অনুবাদ করিয়া, পরে “নব্যাস্ত” ইত্যাদি শব্দভেদ দ্বারা অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন যে, “ক্রটেহেতোঃ পরং পরসর্গীয়ং জগদ্রব্যমিত্যর্থঃ”। অর্থাৎ সূত্রে “পর” শব্দের দ্বারা প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে প্রথম যে দ্রব্য জন্মে, তাহাই বিবক্ষিত। ঐ দ্রব্য ক্রটিহেতুক অর্থাৎ ত্রসরেণুই উহার উপাদান-কারণ। ঐ ত্রসরেণুও যে অবয়ব আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহার সাবয়বত্বসাধক হেতু অপ্রযোজক। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ পরে রঘুনাথ শিরোমণির মতানুসারেই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝা যায়। কারণ, রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার “পদার্থতত্ত্বনিরূপণ” গ্রন্থে “ক্রটি” অর্থাৎ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম সমর্থন করিয়া পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চাক্ষুষ দ্রব্যত্ববশতঃ ত্রসরেণুও অবয়ব আছে, ইত্যাদি প্রকারে অনুমান করিতে গেলে ঐরূপ অনুমান দ্বারা অনন্ত অবয়বপরম্পরা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হয়। সূত্ররাং যখন কোন দ্রব্যে বিশ্রাম স্বীকার করিতেই হইবে, তখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করা উচিত। ঐ ত্রসরেণুই নিত্য নিরবয়ব দ্রব্য। উহাতে প্রত্যক্ষজনক নিত্য মহত্বই আছে। তথাপি অজ্ঞাত দ্রব্য হইতে অণুকণ্টপরিমাণ বা ক্ষুদ্র পরিমাণপ্রযুক্তই উহাকে “অণু” বলিয়া ব্যবহার হয়। কারণ, মহৎ পদার্থেও মহত্তম পদার্থ হইতে ক্ষুদ্র-পরিমাণ-প্রযুক্ত অণু বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও তৃতীয় অধ্যায়ে “মহদণুগ্রহণাৎ” (১।৩৩) এই সূত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যেও “অণু” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, রঘুনাথ শিরোমণির সমর্থিত উক্ত মত গোতম-মতবিরুদ্ধ। কারণ, মহর্ষি গোতম অতীন্দ্রিয় পরমাণুই স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিক ৩৬শ সূত্রে “নাভী-ল্লিয়ত্বাদণুনাং” এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি পরে এখানে চরম কল্পে ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ঘটাদি দ্রব্যকে যাহারা পরমাণুপুঞ্জ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে তিনি ঘটাদি দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষের আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, ত্রসরেণুই পরমাণু হইলে উহা অতীন্দ্রিয় নহে। গবাক্ষরক্তগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে স্বল্প রেণু দেখা যায়, তাহাই “ত্রসরেণু”, ইহা মন্বাদি ধ্বিগণও বলিয়া গিয়াছেন। সূত্ররাং উহার প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় পক্ষীভূত ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ অবশ্যই হইতে পারে। তাহা হইলে মহর্ষি আর কোন্ যুক্তির দ্বারা অবয়বের অস্তিত্ব সমর্থন করিবেন? তাহা বলা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি এখানে তাহা কিছুই বলেন নাই। সূত্ররাং তিনি যে, শেষে কল্পাস্তরেও ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে “ক্রটি”

১। পরমাণুদ্ব্যণুকয়োঃ মানভাবঃ, ক্রটীণেব বিশ্রামাৎ। ক্রটিঃ সমন্যতঃ চাক্ষুষদ্রব্যাদ্ধটবৎ, তে চ সমন্যগ্নিনঃ সমন্যতঃ চাক্ষুষদ্রব্যাদিসমবাহিতমর্শিত চাক্ষুগোচরং। ২. ত্রয়ী ৩. দৃশ্যদ্রব্যাদিসমবাহিতাদিভিরন্যাস্ত ৩৩ সমবাহিতপদস্পর্শাসিদ্ধ-
এবং ৩৬। অণুং ঘটাদিশ্চাপুণ্ডপরিমাণনিমিত্তেন মন্যতাপি মহত্তমাদণুকবৎ ৩৭।—পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।

অর্থাৎ “ত্রসরেণু” ইহাতে ভিন্ন অতীন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই পরমাণু, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি এই সূত্রে “পর” শব্দের দ্বারাও তাহাই সূচনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। মূলকথা, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে কল্পান্তরে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেও উহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা স্বীকার্য। রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে তাহার নিজের মত সমর্থন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা যায় না। বিশ্বনাথ “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে কিন্তু মহর্ষি গোতম-সম্মত অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মতের উল্লেখ-পূর্বক প্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে, ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিলে উহার মহৎ পরিমাণকেও নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ সর্বত্রই অনেক-দ্রব্যবত্তা প্রযুক্ত উৎপন্ন পদার্থ, ইহা দেখা যায়। সুতরাং উহা নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং উহার পরে অতীন্দ্রিয় পরমাণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বনাথ শেষে মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে তাহার মতবিরুদ্ধ মতেরও কেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন? ইহা স্মরণ বিচার করিবেন। ত্রায়দর্শনের সনানতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনেও পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বই মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। “চরক-সংহিতাতে”ও পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়^১। পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, রঘুনাথ শিরোমণির স্বীকৃত ও সমর্থিত পূর্বোক্ত মত তাহারই উদ্ভাবিত নহে। কারণ, ত্রায়বার্ত্তিক প্রাচীন ত্রায়চার্য্য উদ্যোতকের উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, বাৎসর্য-পুত্র বৈভাবিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে^২ কোন সম্প্রদায় গবাক্ষরকে, দৃশ্যমান ত্রসরেণুকেই পরম অণু অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহাদিগের মতে ত্রায়সূত্রকার মহর্ষি গোতমোক্ত দোষের পরিহার করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মতে ঘটাদি দ্রব্য দৃশ্যমান ত্রসরেণুপুঞ্জ নাত্র; সুতরাং উহার প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি নাই। উদ্যোতকের উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, গোতম মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ত্রসরেণু ভেদা, অর্থাৎ উহার ভেদ বা বিভাগ আছে। সুতরাং উহাকে পরমাণু বলা যায় না। কারণ, পরমাণু অভেদা। যাহার ভেদ বা বিভাগ করা যায় না, তাহার আর অংশ নাই, তাহাই ত পরমাণু। ত্রসরেণুর যে বিভাগ বা অংশ আছে, এ বিষয়ে প্রশ্নাগ কি? এতদুত্তরে উদ্যোতকের বলিয়াছেন যে, যেহেতু উহা অস্মদাদির বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য, অতএব ঘট্টের ত্রায় উহারও বিভাগ আছে। উদ্যোতকের প্রদর্শিত ঐ অনুমানকে গ্রহণ করিয়াই পরবর্ত্তী গোতম মতব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকগণ “ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপে অনুমান দ্বারা ত্রসরেণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ত্রসরেণুর অবয়ব থাকিলে তাহারও অবয়ব আছে। কারণ, বাহ্য চাক্ষুষ দ্রব্যের অবয়ব, তাহারও সাবয়বত্ব ঘটের অবয়বে সিদ্ধ আছে। সুতরাং

১। “শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যায়। ভবন্ত্যপি বহুখান্ডিত্যমোক্ষাদতীন্দ্রিয়বাক্যে” ইত্যদি। —শারীরস্থান, ৭ম স্কন্ধ, শ্লোক ২৪৭।

২। একে তু বাতায়নজিহ্বাদৃশ্যং ক্রটিং পরমাণুং বণয়ন্তি, তন্ন যুক্তং, তস্ত ভেদাত্বাৎ। অভেদঃ পরমাণুভির্দাত্তাক্রটি-

ঃ কদমবগম্যতে ভিদ্ধতে ক্রটিগতিঃ। জবদে মত স্মাদাদিবাতকরণপ্রত্যক্ষদ্রব্যটবদিতি” ইত্যাদি—দ্বিতীয়

৩। প্রথম সূত্রিক “সাধাভাদবয়বানি সন্ধেহঃ”—এই সূত্রের ব্যাখ্যিক (২৩২ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

“ত্রসরেণোরবয়বঃ সাবয়বঃ ঘটাবয়বঃ” এইরূপে অনুমান দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়বেরও অবয়ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐরূপে তাহারও অবয়ব সিদ্ধ করিতে গেলে অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তিমূলক অবস্থা-দোষ হয়, তাহাতে স্মেরু পর্বত ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি দোষও হয়। এ জন্ত শ্রায়-বৈশেষিকসম্প্রদায় পূর্বোক্ত ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বেই বিশ্রাম স্বীকার করিয়া, উহাকেই পরমাণু বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যখন কোন দ্রব্য অবয়ববিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বে বিশ্রাম স্বীকার করার বাধা কি আছে? ঘটাদিদ্রব্য ত্রসরেণু অপেক্ষায় অনেক বড়, সুতরাং তাহার অবয়বের অবয়বও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় তাহারও অবয়ব অবশ্য স্বীকার্য্য এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু ত্রসরেণুর অবয়বের যে অবয়ব, তাহারও অবয়ব স্বীকারের কোন কারণ নাই। আর যদি পূর্বোক্তরূপে অনুমান করিয়া তাহারও অবয়ব সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেও নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব খণ্ডিত হইবে না। কারণ পূর্বোক্ত যুক্তিতে বাধা হইয়া যখন কোন স্থানে অবয়ব-বিভাগের বিশ্রাম বা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, তখন সেই দ্রব্যই নিরবয়ব পরমাণু বলিয়া সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বে বিশ্রাম স্বীকার করিয়া উহাই পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক, ঐ দ্ব্যণুকের অবয়বই পরমাণু। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে যে দ্ব্যণুকেরই উৎপত্তি হয়, ইহা প্রশস্তপাদদের উক্তির দ্বারাও প্রাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া দৃষ্টা যায় (প্রশস্তপাদভাষ্য, ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্র “ভামতী” গ্রন্থে বেদান্তদর্শনের “মহদ্বীর্ঘবদ্বা” (২২।১১) ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণায় যে বৈশেষিকসম্প্রদায়সিদ্ধ পরমাণুবাদপ্রক্রিয়ার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও দ্ব্যণুকের অবয়বকেই পরমাণু বলিয়া এবং দ্ব্যণুকত্রাদি হইতেই ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া বৈশেষিকসম্প্রদায়ের পরম্পরাপ্রাপ্ত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। “শ্রায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্ট এবং “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ঐ সমস্ত যুক্তিরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (“শ্রায়কন্দলী” ৩২ পৃষ্ঠা ও “শ্রায়মঞ্জরী” ৫০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

“ভামতী” গ্রন্থে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের স্বাক্ষরিত যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে না। কারণ, কোন ঘটের নির্বাহক পরমাণুগুলিকেই যদি ঐ ঘটের উপাদান-কারণ বলা যায়, তাহা হইলে মুদগরপ্রহার দ্বারা ঐ ঘট চূর্ণ করিলে তখন একেবারে তাহার উপাদান-কারণ ঐ সমস্ত পরমাণুগুলিরই পরম্পর বিভাগ হইবে। কারণ, তাহা না হইলে ঐ স্থানে ঐ ঘটের বিনাশ হইতে পারে না। উপাদান-কারণের বিভাগ বা বিনাশ ব্যতীত জন্ত দ্রব্যের বিনাশ হয় না। কিন্তু যদি মুদগর প্রহারের পরেই সমস্ত পরমাণুরই বিভাগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তখন আর কিছুই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই বিভক্ত পরমাণুসমূহ সমস্তই অতীন্দ্রিয়। কিন্তু মুদগর প্রহারের দ্বারা ঘট চূর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও তখন শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, ঘট চূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইলেও তখন একেবারে পরমাণু-গুলির পরম্পর বিভাগ হয় না। অতএব ঐ সমস্ত পরমাণুই ঐ ঘটের উপাদান-কারণ নহে। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমেই ক্রমশঃ ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার্য্য। (তৃতীয় খণ্ড, ৯৫

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্বোক্ত বৃত্তিতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান-কারণ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইলে পরমাণুত্রয়ের সংযোগেও কোন দ্রব্যান্তর জন্মে না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পরমাণুত্রয়েরও বহুত্ব আছে। সুতরাং প্রথমে পরমাণুত্রয়ের সংযোগেই দ্ব্যণুক নামক দ্রব্য জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগে কোন দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঐ দ্রব্যান্তর ব্যর্থ হয়। কারণ, ঐ দ্রব্যান্তর আর একটি দ্ব্যণুকবিশেষই হয়, উহা পূর্বজাত দ্ব্যণুক হইতে স্থূল হইতে পারে না। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্ব ও মহৎপরিমাণাদি যাহা যাহা জ্ঞাত দ্রব্যের স্থূলত্ব বা মহৎপরিমাণের উৎপাদক হয়, দ্ব্যণুকদ্বয়ে তাহার কিছুই নাই। দ্ব্যণুকদ্বয়ে বহুত্বও নাই, মহৎপরিমাণও নাই, “প্রচয়” নামক সংযোগবিশেষও নাই। সুতরাং দ্ব্যণুকদ্বয়জাত দ্রব্যান্তরে মহত্ব বা স্থূলত্বের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় উহার উৎপত্তি নিষ্কল হয়। দ্ব্যণুকের পরে আবার অপর দ্ব্যণুকবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার অনাবশ্যক। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাণুত্রয়ের সংযোগে প্রথমে দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর উৎপত্তি হইলে, উহার পরে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগেই “ত্র্যণুক” নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়। এইরূপ দ্ব্যণুকচতুষ্টয়াদির সংযোগে “চতুরণুক” প্রভৃতি অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। দ্ব্যণুকত্রয়ে বহুত্ব সংখ্যা থাকায় উহা হইতে উৎপন্ন ত্র্যণুক বা তদনুগত স্থূলত্ব অর্থাৎ মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে। সেখানে উপাদান-কারণ, দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যাই ঐ মহৎপরিমাণের কারণ। শ্রীমদ্বাচস্পতি নিশ্চ, উদয়নাচার্য্য, শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ অনেক স্থানে ত্রসরেণুকে “ত্র্যণুক” শব্দের দ্বারাও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমাণু ত্রয় দ্ব্যণুকেরও মহত্ব না থাকায় দ্ব্যণুককেও “অণু” বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনটি “অণু” অর্থাৎ দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন, এইরূপ অর্থে “ত্রসরেণু”কে “ত্র্যণুক”ও বলা যায়। বাচস্পতি নিশ্চ প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থেই তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার “ত্রসরেণু” নামই প্রসিদ্ধ। মনাদি সংহিতাতেও ঐ নামেরই উল্লেখ আছে। কেহ কেহ “ত্রিভিঃ সহিতো রেণুঃ” এই অর্থে “ত্রসরেণু” শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া পরমাণুত্রয় সহিত রেণু অর্থাৎ যে রেণুতে অবয়বরূপে তিনটি পরমাণু থাকে, তাহাই “ত্রসরেণু” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ ব্যুৎপত্তিতে কোন প্রমাণ নাই। মনে হয়, গবাক্ষরক্ষুগত সূর্য্যাকিরণের মধ্যে যে রেণু পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে দিয়া “ত্রস” অর্থাৎ চরিয়ু বা জঙ্গম, তাহাকে ঐ জগত্ই “ত্রসরেণু” বলা হইয়াছে। “ত্রস” শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ, তৃতীয় খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সে যাহাই হউক, মূলকথা, পূর্বোক্ত ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক এবং ঐ দ্ব্যণুকের অবয়বই নিরবয়ব পরমাণু এবং নিরবয়বত্ববশতঃ ঐ পরমাণু নিত্য, ইহাই ত্রায়-বৈশেষিকমস্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই সূত্রে সর্বনাম “পর” শব্দের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়বই মহর্ষির বুদ্ধিস্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়

১। কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্বাৎ প্রচয়বিশেষনাচ মহৎ ॥ বেদান্তদর্শনের (২২, ১১শ সূত্রের) শাবীরক ভাষ্যে “কণাচার্য্যের উদ্ধৃত কণাদসূত্র। কিন্তু এখন প্রচলিত বৈশেষিকদর্শনে ঐরূপ সূত্র নাই। ঐ স্থানে “কারণবহুত্বাচ্চ” (১৭শ স্কো) এইরূপ সূত্র দেখা যায়। শঙ্কর মিশ্রের অনেক পূর্বেরই আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত পূর্বোক্ত কণাদসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা উক্ত সূত্রের “উপস্কার” দেখিলেই বুঝা যাইবে।

আহ্নিক “নাগ্ননিত্যত্বাৎ” (২৩শ) এই সূত্রের দ্বারা এবং পরবর্তী “অন্তর্কর্ষিণি” ইত্যাদি বিংশ সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বই যে, মহর্ষি গোতমের সম্মত, সূত্ররাং মহর্ষি কণাদের তায় তিনিও যে, আরম্ভবাদেবই সমর্থক, ইহাও বুঝা যায় (৪র্থ খণ্ড, ১৫৯—৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । তিনি এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক “ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যত্বাৎ” (১১শ) এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত আরম্ভবাদের প্রকাশও করিয়াছেন । সূত্ররাং তাঁহার মতে পরমাণু যে, নিরবয়ব ও নিত্য এবং ঐ পরমাণু হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহই নাই । তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তানুসারেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে দ্ব্যণুকনামক অবয়বীর উৎপত্তি এবং ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে “ত্রসরেণু” বা “ত্র্যণুক” নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন । রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে ত্রসরেণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলেও গোতম-মতব্যাখ্যাতা পূর্বাচার্য্যগণ তাহা করেন নাই । “ত্রসরেণু” বর্ষ ভাগই যে পরমাণু, এ বিষয়ে একটি বচনও পূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে । “তায়কোমে”ও উক্ত বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে^১ । “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকায় দাক্ষিণাত্য মহাদেব ভট্ট গবাক্ষরক্ষুগত সূর্য্যাকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান রেণুকে “দ্ব্যণুক” বলাই উচিত বলিয়া শেষে যে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয় ও প্রমাণবিরুদ্ধ । মন্বাদি ঋষিগণ যে, ঐ রেণুকে “ত্রসরেণু” বলিয়াছেন এবং তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি নিশ্চয় যে, এই সূত্রোক্ত “ত্রটি” ও ত্রসরেণু একই পদার্থ বলিয়া উহার স্বরূপবোধক যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের পূর্বোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । “ত্রটি” শব্দের অর্থ অতিক্ষুদ্র, ইহা অভিধানেও বর্ণিত হইয়াছে । তদনুসারেও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে যাহা সর্বাংশে ক্ষুদ্র, সেই ত্রসরেণুকেও “ত্রটি” বলা যায় । কিন্তু বাচস্পতি নিশ্চয় প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া ঐ ত্রসরেণুকেই “ত্রটি” বলিয়াছেন । রঘুনাথ শিরোমণি ও অত্যাগ্র নৈয়ায়িকও ত্রসরেণু অর্থেই “ত্রটি” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে যে “ত্রসরেণু”র পরে “ত্রটি”র উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কালবিশেষের সংজ্ঞা । অর্থাৎ সেখানে কালবিশেষকেই ত্রসরেণুভিন্ন “ত্রটি” নামে প্রকাশ করা হইয়াছে । সূত্ররাং উহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে ।

মূলকথা, মহর্ষি এই সূত্রে “ত্রটি” শব্দের দ্বারা নিরবয়ব অতিক্ষুদ্র পরমাণুর অস্তিত্বে পূর্বোক্ত-রূপ যুক্তি সূচনা করিয়া, ঘটাদি অবয়বী যে, ঐ পরমাণুপুঞ্জমাত্র নহে—কারণ, তাহা হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ না হইলেও পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকথিত “বস্ত্তিপ্রতিষেধ”ও সম্ভব হয় না, সূত্ররাং উহার দ্বারা অবয়বীর অভাব সমর্থন করাও সম্ভবই হয় না, ইহাও সূচনা করিয়া গিয়াছেন । তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অত্র প্রসঙ্গে অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে সাধক যুক্তি প্রকাশ করিলেও তদ্বিষয়ে অত্যাগ্র বাধক যুক্তির খণ্ডন ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না । সুপ্রাচীন কাল হইতেই অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে । যোগদর্শনের ব্যাস-ভাষ্যও অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিচার

ও সমর্থন দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও (৩।১৮) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং অবয়বীর অস্তিত্ব বিবাদগ্রস্ত বা সন্দিগ্ধ হইলেও মহর্ষি পূর্বোক্ত তৃতীয় সূত্রে অবয়ববিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া উপদেশ করিতে পারেন না। তাই তিনি ঐ সূত্রের পরেই এখানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়া অবয়ববিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেখপূর্বক উহার খণ্ডন দ্বারা আবার অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং পরবর্তী প্রকরণের দ্বারা নিরবয়ব নিত্য পরমাণুর অস্তিত্বের বাধক যুক্তির খণ্ডনপূর্বক তাঁহার পূর্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্ব স্মৃদু করিয়া গিয়াছেন ॥১৭॥

অবয়বাবয়ববিপ্রকরণ সমাপ্ত ॥২॥

ভাষ্য। অথেনানীমানুপলন্তিকঃ সর্বং নাস্তীতি মন্যমান আহ—

অনুবাদ। অনন্তর এখন সমস্ত পদার্থই নাই অর্থাৎ অবয়বীর ন্যায় পরমাণুও নাই, উপলব্ধিও বস্তুতঃ নাই, এই মতাবলম্বী “আনুপলন্তিক” (সর্বশূন্যতাবাদী) বলিতেছেন—

সূত্র। আকাশব্যতিভেদাত্তদনুপপত্তিঃ ॥১৮॥৪২৮॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) “আকাশব্যতিভেদ” প্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত তাহার অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। তস্মাণোনিরবয়বত্বানুপপত্তিঃ। কস্মাৎ? আকাশ-ব্যতিভেদাৎ। অন্তর্বহিঃচাণুরাকাশেন সমাবিষ্টো ব্যতিভিন্নঃ। ব্যতিভেদাৎ সাবয়বঃ, সাবয়বত্বাননিত্য ইতি।

অনুবাদ। সেই নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) “আকাশব্যতিভেদ”-প্রযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে আকাশ কর্তৃক সমাবিষ্ট হইয়া ব্যতিভিন্ন অর্থাৎ অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযুক্ত। ব্যতিভেদপ্রযুক্ত সাবয়ব, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি এখন নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্বের বাধক যুক্তি খণ্ডন করিয়া, উহার অস্তিত্ব স্মৃদু করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি বা সিদ্ধি হয় না। এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুই যে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা তাঁহার এই বিচারের দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং পূর্বসূত্রে যে, তিনি নিরবয়ব পরমাণুর কথাই বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য। কারণ, তাহা বলিলেই তিনি এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা ঐ নিরবয়ব পরমাণুকেই

গ্রহণ কৰিতে পাবেন। নিরবয়ব পরমাণুর দিক্ৰি কেন হয় না? ইহা সমর্থন কৰিতে পূৰ্বপক্ষবাদী হেতু বলিয়াছেন—“আকাশব্যতিভেদঃ”। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে যে আকাশের সমাবেশ অর্থাৎ সংযোগবিশেষ আছে, উহাই এখানে পূৰ্বপক্ষবাদীর অভিমত “আকাশব্যতিভেদ”। এই ব্যতিভেদ আছে বলিয়া পরমাণু সাবয়ব, ইহা স্বীকাৰ্য্য। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ উহার অবয়ববিশেষ। উহার সহিত আকাশের সংযোগ স্বীকাৰ্য্য হইলে ঐ অবয়বের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকাৰ্য্য। তাহা হইলে পরমাণু যে সাবয়ব পদার্থ, ইহা স্বীকার কৰিতে হইবেই। অর্থাৎ পরমাণু স্বীকার কৰিতে গেলে উহারও অবয়ব স্বীকার কৰিতে হইবে। সুতরাং উহার অনিত্যত্বও স্বীকার কৰিতে হইবে। কারণ, সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং পূৰ্বোক্তরূপ বাধক যুক্তিবশতঃ নিরবয়ব নিত্য পরমাণুর দিক্ৰি হয় না। ভাষ্যকার প্রথমে উক্ত মতকে “আনুপলব্ধিক”র মত বলিয়া এই পূৰ্বপক্ষস্থত্র অবতারণা কৰিয়াছেন। যিনি “উপলব্ধ” অর্থাৎ প্রত্যক্ষদি কোন জ্ঞানের ই বাস্তব সত্তা মানেন না, সুতরাং পরমাণুও মানেন না, এতাদৃশ সৰ্বশূন্যতাবাদীকে “আনুপলব্ধিক” বলা যায়। ভাষ্যকার “আনুপলব্ধিক” শব্দের প্রয়োগ কৰিয়া পরে “সৰ্বং নাস্তিতি মতমানঃ” এই বাক্যের দ্বারা উহারই ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সৰ্বভাববাদী, তিনিই এখানে ভাষ্যকারোক্ত “আনুপলব্ধিক”। তাঁহার গূঢ় অভিপ্ৰাণ এই যে, পরমাণুর অবয়ব না থাকিলে পরমাণু তাহার অবয়বে কিরূপে বৰ্ত্তমান থাকে? এইরূপ প্রশ্ন করা যায় না। সুতরাং পরমাণু তাহার অবয়বে কোনরূপেই বৰ্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহা বলিয়া পূৰ্বোক্ত “বৃত্তিপ্রতিষেধ” প্রযুক্ত পরমাণুর অভাব সিদ্ধ করা যায় না। কিন্তু যদি পরমাণুর অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে তাহারও অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরা সিদ্ধ কৰিয়া ঐ পরমাণু ও তাহার অবয়বপরম্পরা নিজ নিজ অবয়বে কোনরূপেই বৰ্ত্তমান থাকিতে পারে না, ইহা সমর্থন কৰিয়া পূৰ্বোক্ত “বৃত্তিপ্রতিষেধ” প্রযুক্ত ঐ পরমাণু ও উহার অবয়বপরম্পরারও অভাব সিদ্ধ করা বাইবে। তাহা হইলে আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না—“সৰ্বং নাস্তি” ইহাই সিদ্ধ হয়। মহর্ষি পূৰ্বে “সৰ্বমভাবঃ” ইত্যাদি (৪।১।৩৭) সূত্রের দ্বারা যে মতের প্রকাশ কৰিয়াছেন, উহা হইতে এখানে এই মতের অবশ্যই বিশেষ আছে। কিন্তু তাৎপৰ্য্যটীকাকার সেই স্থলের ত্ৰায় এখানেও “শূন্যতাবাদে”র কথাই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা কৰিব। চতুর্থ খণ্ড—১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

সূত্র। আকাশাসৰ্বগতত্বং বা ॥১৯॥৪২৯॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে অর্থাৎ পূৰ্বোক্ত “আকাশব্যতিভেদ” নাই, ইহা বলিলে আকাশের অসৰ্বগতত্ব (অসৰ্বব্যাপিত্ব) হয়।

ভাষ্য। অথৈতন্মেঘাতে—পরমাণোরন্তর্নাস্ত্যাকাশমিত্যসৰ্বগতত্বং প্রসজ্যতে ইতি।

অনুবাদ । আর যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশ নাই, এ জগৎ (আকাশের) অসর্বগতত্ব প্রসক্ত হয় ।

টিপ্পনী । পূৰ্ব্বপক্ষবাদী যে “আকাশব্যতিভেদ”কে হেতু করিয়া পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন, উহা অস্বীকার করিলে ত তিনি আর নিজ মত সমর্থন করিতে পারেন না, তাই তিনি ঐ পক্ষে এই সূত্রের দ্বারা পরেই বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে আকাশের সর্বগতত্ব সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় । অর্থাৎ আমরা আকাশাদি কিছুই না মানিলেও তোমরা যখন আকাশকে সর্বগত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছ, এবং পরমাণুকেও মূর্ত্ত দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন পরমাণুর অভ্যন্তরেও আকাশের সংযোগ তোমাদিগের স্বীকার্য্য । কারণ, তোমাদিগের মতে সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্বগতত্ব । সুতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরের সহিত আকাশের সংযোগ না থাকিলে উহার সর্বগতত্ব থাকে না । উহার অসর্বগতত্বেরই আপত্তি হয় । কিন্তু উহা স্বীকার করিলে তোমাদিগের সিদ্ধান্তহানি হইবে । সুতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগেও আকাশের সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় তোমাদিগের মতেও পরমাণুর সাবয়বত্ব অনিবার্য্য ॥১৯॥

**সূত্র । অন্তরহিঞ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনা-
দকার্য্যে তদভাবঃ ॥২০॥৪৩০॥**

অনুবাদ । (উত্তর) “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শব্দের দ্বারা জগৎ দ্রব্যের কারণান্তর অর্থাৎ উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষ কথিত হওয়ায় অকার্য্য দ্রব্যে (নিত্যদ্রব্য পরমাণুতে) তাহার অভাব (অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ না থাকায় তাহার সহিত আকাশের সংযোগ বলাই যায় না । সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না) ।

ভাষ্য । “অন্তর”রিতি পিহিতং কারণান্তরৈঃ কারণমুচ্যতে । “বহি”-
রিতিচ ব্যবধায়কমব্যবহিতং কারণমেবোচ্যতে । তদেতৎ কার্য্যদ্রব্যস্য
সম্ভবতি, নাণোরকার্য্যত্বাৎ । অকার্য্যে হি পরমাণাবন্তরবহিরিত্যস্মাভাবঃ ।
যত্র চাস্মি ভাবোহণুকার্য্যং তৎ, ন পরমাণুঃ । যতো হি নান্নতরমস্তু, স
পরমাণুরিতি ।

অনুবাদ । “অন্তর” এই শব্দের দ্বারা কারণান্তরগুলির দ্বারা “পিহিত” অর্থাৎ বহির্ভাগস্থ অবয়বগুলির দ্বারা ব্যবহিত কারণ (মধ্যভাগস্থ উপাদান-কারণ অবয়ব-বিশেষ) কথিত হয় । “বহিস্” এই শব্দের দ্বারাও ব্যবধায়ক অব্যবহিত কারণই অর্থাৎ যাহা মধ্যভাগের ব্যবধায়ক, কিন্তু অন্য কোন অবয়ব দ্বারা ব্যবহিত নহে, সেই বহির্ভাগস্থ অবয়ববিশেষই কথিত হয় । সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত “অন্তর”

শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বাচ্য অবয়বরূপ উপাদান-কারণ, জ্ঞাত্রদ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব হয়, অকার্য্যত্ব অর্থাৎ অজ্ঞাত্র বা নিত্যত্ব প্রযুক্ত পরমাণুর সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। যেহেতু “অকার্য্য” পরমাণুতে অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিই হয় না, যাহা কোন কারণের কার্য্যই নহে, আমাদিগের সম্মত সেই পরমাণু নামক নিত্যদ্রব্যে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, ইহার অভাব। যাহাতে কিন্তু এই অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের “ভাব” অর্থাৎ সত্তা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন দ্যাণুকাদি জ্ঞাত্রদ্রব্য, পরমাণু নহে। যেহেতু যাহা হইতে সূক্ষ্মতর নাই, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য, যাহার কোন অবয়ব বা অংশই নাই, তাহাই পরমাণু।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শব্দ জ্ঞাত্রদ্রব্যের উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষেরই বাচক। সুতরাং নিত্য দ্রব্য পরমাণুতে “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বাচ্য সেই উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। পরমাণুর সম্বন্ধে “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বার্থ প্রয়োগই হইতে পারে না। সূত্রে “অন্তর” ও “বহিস্” এই দুইটি অবয়ব শব্দের দ্বারা মহর্ষি ঐ দুইটি শব্দকেই এখানে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সূত্রবশতঃই উহার পরে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে যে “আকাশব্যতিভেদ”কে হেতু বলিয়াছেন, উহা অসিদ্ধ। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সহিত আকাশের সংযোগই তাঁহার অভিমত “আকাশব্যতিভেদ”। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরও নাই, বহির্ভাগও নাই। সুতরাং তাহার সহিত আকাশের সংযোগ সম্ভবই নহে। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগও অলীক। সুতরাং উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু অকার্য্য অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য, তাহার কোন কারণই না থাকায় “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বাচ্য যে উপাদানকারণবিশেষ, তাহাও নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, জ্ঞাত্রদ্রব্যের সম্বন্ধেই সম্ভব হয়। কারণ, জ্ঞাত্রদ্রব্যের অবয়ব আছে। ঐ সমস্ত অবয়বই তাহার উপাদান বা সমবাগিকারণ। তন্মধ্যে যাহা বাহ্য অবয়বের দ্বারা আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত, তাহাই “অন্তর” শব্দের বাচ্য, তাহাকে মধ্যাবয়ব বলা যায়। আর যাহা ঐ মধ্যাবয়বের ব্যবধায়ক বা আচ্ছাদক, এবং অজ্ঞাত্র অবয়বের দ্বারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত নহে, তাহাই “বহিস্” শব্দের বাচ্য, তাহাকে বাহ্যাবয়ব বলা যায়। সুতরাং “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বাচ্য যে পূর্ব্বোক্ত উপাদানকারণ, যাহাকে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ বলা হয়, তাহা নিত্যদ্রব্য পরমাণুর সম্বন্ধে কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যাহাতে উহা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য দ্যাণুক প্রভৃতি সাবয়ব জ্ঞাত্রদ্রব্য, তাহা ত পরমাণু নহে। কারণ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব নাই, তাহাই পরমাণু।

বার্তিককার এখানে বিশদ বিচারের জন্ত বলিয়াছেন যে, যিনি “আকাশব্যতিভেদ” প্রযুক্ত পরমাণু অনিত্য, ইহা বলিতেছেন, তাঁহাকে ঐ “ব্যতিভেদ” কি, তাহা জিজ্ঞাস্য। যদি পরমাণু ও আকাশের সম্বন্ধমাত্রই “আকাশব্যতিভেদ” হয়, তাহা হইলে উহা পরমাণুর অনিত্যতার সাধক হয় না। আর যদি সম্বন্ধ বা সংযোগমাত্রই পরমাণুর অনিত্যতার সাধক হয়, তাহা হইলে “আকাশ” শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ। পরন্তু পরে “সংযোগোপপত্তেশ্চ” এই সূত্রের দ্বারা উহা কথিত হওয়ায় এখানেও আবার উহাই বলিলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। সুতরাং পরমাণু ও আকাশের সম্বন্ধমাত্র অথবা সংযোগমাত্রই “আকাশব্যতিভেদ” নহে। যদি বল যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে সম্বন্ধ অথবা পরমাণুর অবয়বের সহিত আকাশের সম্বন্ধই “আকাশব্যতিভেদ”, কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণু নিত্যদ্রব্য, তাহার অবয়ব নাই। যদি বল, পরমাণুর অবয়বসমূহের বিভাগই “আকাশব্যতিভেদ” অর্থাৎ আকাশ পরমাণুর অবয়বগুলিকে ভেদ করিয়া উহাদিগের যে বিভাগ জন্মায়, তাহাই “আকাশব্যতিভেদ”—কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে। কারণ, পরমাণু নিত্যদ্রব্য, তাহার অবয়বই নাই। জন্ত দ্রব্যের অবয়ব থাকায় তাহারই বিভাগ হইতে পারে। পরন্তু পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলেও ত আকাশ তাহার বিভাগের কারণ হয় না। কারণ, ঐ বিভাগ কৰ্ম্মজন্ত। তাহাতে আকাশ নিমিত্ত নহে। যদি বল, অভ্যন্তরে যে ছিদ্র, তাহাই “ব্যতিভেদ”; কিন্তু ইহাও এখানে বলা যায় না। কারণ, সাবয়ব যে দ্রব্যের মধ্যে অবয়ব নাই, সেই দ্রব্যের মধ্যস্থানকেই ছিদ্র বলে। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার ছিদ্র সম্ভবই হয় না। ফলকথা, পূর্বপক্ষবাদী তাঁহার কথিত “আকাশব্যতিভেদ”কে যাহাই বলিবেন, তাহাই তাঁহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, যাহা ব্যভিচারী বা অসিদ্ধ, তাহা কখনও সাধ্যসাধক হয় না। বার্তিককার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী “সর্বগতত্ব” শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই পক্ষান্তরে আকাশের অসর্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্বগতত্ব। মূর্ত দ্রব্য পরমাণুর সহিতও আকাশের সংযোগ থাকায় তাহার সর্বগতত্ব অব্যাহতই আছে। পরমাণুর অভ্যন্তরে ঐ সংযোগ না থাকায় আকাশের সর্বগতত্ব থাকে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তরই নাই। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগ অসম্ভব, এবং অলীক পদার্থ সর্বশব্দের বাচ্যও নহে। সুতরাং যে সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সত্তা আছে, তাহাই “সর্ব” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আকাশের সর্বগতত্বের কোন হানি হইতে পারে না। উদয়নাচার্যের “আত্মবিবেক”র টীকায় নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও উদয়নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ঐরূপ কথাই লিখিয়াছেন^১। তিনি আকাশের সহিত পরমাণুর অভ্যন্তরে সংযোগকেই “আকাশব্যতিভেদ” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া পরমাণুর অভ্যন্তর অলীক বলিয়াই উহা সম্ভব নহে, ইহা বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য সেখানে পূর্বপক্ষবাদীর “পরমাণুঃ সাবয়বঃ” এই

১। আকাশেন পরমাণোব্যতিভেদঃ অভ্যন্তরে সংযোগঃ, অভ্যন্তরভাবাদেব অসম্ভবী। সর্বগতত্বস্ত বিভূনাং সর্বমূর্তসংযোগিতামাত্রং। নিরবয়বস্ত অণাঃ পরমাণুসদৃশাঃ “পরমাণুঃ” সাবয়বঃ। ইতি প্রতিজ্ঞাপদয়োঃ স্যাত ইত্যর্থঃ।—আত্মতত্ত্ববিবেকদীপিত।

প্রতিজ্ঞাবাক্যে “পরমাণুঃ” এবং “সাবয়বঃ” এই পদদ্বয়ের যে ব্যাঘাত বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন যে, যিনি পরমাণু মানেন না, তিনি উহাকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিতেই পারেন না। আর যদি তিনি পক্ষগ্রহণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া উহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে “সাবয়বঃ” এই পদের দ্বারা উহাকে সাবয়ব বলিতে পারেন না। কারণ, নিরবয়ব অণুই পরমাণু শব্দের অর্থ। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী ঐরূপ প্রতিজ্ঞাই করিতে পারেন না। অত্যাগ্র কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥ ২০ ॥

সূত্র । শব্দ-সংযোগ-বিভবাক্ষ সর্বগতঃ ॥২১॥৪৩১॥

অনুবাদ । শব্দ ও সংযোগের “বিভব” অর্থাৎ আকাশে সর্বত্র উৎপত্তিবশতঃই (আকাশ) সর্বগত ।

ভাষ্য । যত্র কচিছুৎপন্নঃ শব্দা বিভবন্ত্যাকাশে তদাশ্রয়া ভবন্তি । মনোভিঃ পরমাণুভিস্তৎকার্যৈশ্চ সংযোগা বিভবন্ত্যাকাশে ! নাসংযুক্ত-মাকাশেন কিঞ্চিন্মূর্তদ্রব্যমুপলভ্যতে, তস্মান্নাসর্বগতমিতি ।

অনুবাদ । যে কোন প্রদেশে উৎপন্ন সমস্ত শব্দই আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ) আকাশাশ্রিত হয় । সমস্ত মন, সমস্ত পরমাণু ও তাহার কার্যদ্রব্য-সমূহের (দ্যাণুকাদি জন্তু দ্রব্যের) সহিত সংযোগও আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয় । আকাশের সহিত অসংযুক্ত কোন মূর্ত দ্রব্য উপলব্ধ হয় না । অতএব আকাশ অসর্বগত নহে ।

টিপ্পনী । পূর্বপক্ষবাদী পক্ষান্তরে আকাশের যে, অসর্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন, তাহা পরিহার করিতে মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের বিভববশতঃই আকাশ সর্বগত, ইহা সিদ্ধ হয় । “বিভব” শব্দের অর্থ এখানে বিশিষ্ট উৎপত্তি অর্থাৎ সর্বত্র উৎপত্তি । অর্থাৎ যে কোন প্রদেশেই শব্দ উৎপন্ন হইলে ঐ শব্দ আকাশেই সর্বত্র উৎপন্ন হয় । আকাশই সর্বত্র শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়া আশ্রয় । তাই শব্দমাত্রই আকাশাশ্রিত হয় । ভাষ্যকার “বিভবন্ত্যাকাশে” এই বাক্য বলিয়া উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“তদাশ্রয়া ভবন্তি” । সেই আকাশ যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় আকাশাশ্রিত । তাৎপর্য্য এই যে, সর্বত্রই শব্দ উৎপন্ন হওয়ায় সর্বত্রই তাহার আশ্রয় আকাশ আছে, ইহা সিদ্ধ হয় । কারণ, আকাশ ব্যতীত কুত্রাপি শব্দ জন্মিতে পারে না । সর্বত্র আকাশই শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়া আশ্রয় । সুতরাং সর্বদেশে সর্বত্রই যখন শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, তখন সর্বত্র আকাশের সত্তাও স্বীকার্য্য । তাই আকাশকে সর্বগত বা সর্বব্যাপী বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে । “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ” এই প্রতিবাক্যের দ্বারাও আকাশের সর্বগতত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত-রূপেই বুঝিতে পারা যায় । (চতুর্থ খণ্ড, ১৬১—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

এইরূপ শব্দের জায় সংযোগের “বিভব”বশতঃ আকাশের সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। ভাবাকার ইহা বুঝাইতে জীবের সমস্ত মন এবং পার্থিবাদি সমস্ত পরমাণু এবং উহার কার্য্য দ্বাণুচাদি জন্ত দ্রব্যসমূহের সহিত সংযোগকে সূত্রোক্ত “সংযোগ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সমস্ত সংযোগও আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশের সহিত সংযুক্ত নহে, এমন কোন মূর্ত্ত দ্রব্যের উপলব্ধি হয় না। অতএব আকাশ অসর্বগত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্বগতত্ব। নববিধ দ্রব্যের মধ্যে পার্থিবাদি পরমাণু এবং তাহার কার্য্য দ্বাণুচাদি সমস্ত জন্ত দ্রব্য এবং মন, এইগুলিই মূর্ত্তদ্রব্য। ঐ সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সর্বত্রই আকাশের সংযোগ থাকায় আকাশের সর্বগতত্বের হানি হয় না। পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ অলীক বলিয়া উহার সহিত সংযোগ অসম্ভব। কিন্তু পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগ অবশ্যই আছে। অতএব আকাশের অসর্বগতত্বের আপত্তি হইতে পারে না। বার্ত্তিককারের মতে এখানে “সর্বসংযোগশব্দবিভবাচ্চ সর্বগতঃ” ইহাই সূত্রপাঠ। সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগই তিনি “সর্বসংযোগ” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে “শব্দসংযোগবিভবাচ্চ” এইরূপই সূত্রপাঠ বুঝা যায়। শ্রীমদ্-বাচস্পতি মিশ্রের “জায়সূচীনিবন্ধ” এবং “জায়সূত্রোক্তারে”ও “শব্দসংযোগবিভবাচ্চ” এইরূপই সূত্রপাঠ আছে। রত্নিকার বিশ্বনাথও ঐরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের যে “বিভব” অথবা শব্দজনক সংযোগের যে বিভব, অর্থাৎ সার্বত্রিকত্ব, তৎপ্রযুক্ত আকাশ সর্বগত, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সর্বদেশেই শব্দের উৎপত্তি হওয়ায় সর্বদেশেই শব্দজনক সংযোগ স্বীকার্য্য। সুতরাং আকাশের সর্বমূর্ত্তসংযোগিত্বরূপ সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যও রত্নিকারের পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। আকাশের ও আত্মার সর্বগতত্ব সমর্থনে বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ সূত্র বলিয়াছেন,— “বিভবান্নগণাকাশস্তথাচাত্মা (৭।১।২২)। শব্দের মিশ্র এই সূত্রোক্ত “বিভব” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগ। কিন্তু মহর্ষি গোটমের এই সূত্রে “বিভব” শব্দের পূর্বে “সংযোগ” শব্দের প্রয়োগ থাকায় “বিভব” শব্দের ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। তাই রত্নিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বিভবঃ সার্বত্রিকত্বঃ” ॥২১॥

সূত্র । অব্যূহাবিষ্ফট্ত-বিভূত্বানি চাকাশধর্ম্মাঃ ॥২২॥৪৩২॥

অনুবাদ । কিন্তু অব্যূহ, অবিষ্ফট্ত ও বিভূত্ব আকাশের ধর্ম্ম [অর্থাৎ কোন সক্রিয় দ্রব্যের দ্বারা আঘাত করিলেও আকাশের আকারান্তরের উৎপত্তি (ব্যূহ) হয় না এবং আকাশের সহিত সংযোগবশতঃ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ানিরোধও (বিষ্ফট্ত) হয় না। সুতরাং আকাশের বিভূত্ব ও (সর্বব্যাপিত্ব) সিদ্ধ হয়]।

ভাষ্য । সংস্পর্শতা প্রতিঘাতিনা দ্রব্যেণ ন ব্যূহতে—যথা কাষ্ঠে-

নোদকং । কস্মাৎ ? নিরবয়বত্বাৎ । সংসর্পচ্চ প্রতিঘাতি দ্রব্যং ন বিচ্ছিন্নভাতি,
নাস্ত্য ক্রিয়াহেতুং গুণং প্রতিবন্ধাতি । কস্মাৎ ? অস্পর্শত্বাৎ । বিপর্য্যয়ে হি
বিচ্ছিন্নস্তো দৃষ্ট ইতি—স ভবান্ স্পর্শবতি দ্রব্যে দৃষ্টং ধর্ম্মং বিপরীতে
নাশঙ্কিতুমর্হতি ।

অনুবাদ । সম্যক্ ক্রিয়াবিশিষ্ট অর্থাৎ অতিনেগজ্ঞ ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি-
দ্রব্য কর্তৃক (আকাশ) ব্যূহিত হয় না অর্থাৎ আকারান্তর প্রাপ্ত হয় না, যেমন কাষ্ঠ
কর্তৃক জল ব্যূহিত হয় । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) নিরবয়বত্বপ্রযুক্ত (অর্থাৎ)
আকাশের অবয়ব না থাকায় উহা ব্যূহিত হইতে পারে না এবং (আকাশ) সম্যক্
ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি দ্রব্যকে বিচ্ছিন্ন করে না । (অর্থাৎ) ঐ দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ
গুণকে (বেগাদিকে) প্রতিবন্ধ করে না । (প্রশ্ন)—কেন ? (উত্তর) স্পর্শশূণ্যতা-
প্রযুক্ত । (অর্থাৎ আকাশের স্পর্শ না থাকায় আকাশ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ার
কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিতে পারে না) । যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে অর্থাৎ অস্পর্শত্বের
অভাব (স্পর্শবত্তা) থাকিলে বিচ্ছিন্ন দেখা যায় । সেই আপনি অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী
স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যে দৃষ্ট ধর্ম্মকে (বিচ্ছিন্নকে) বিপরীত দ্রব্যে অর্থাৎ স্পর্শশূণ্য দ্রব্যে
আশঙ্কা করিতে পারেন না ।

টিপ্পননী । আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ যদি সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে যেমন জলমধ্যে
কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে অথবা নৌকাদি আনিলে ঐ জলের বাহন হয়, তদ্রূপ সক্রিয় প্রতি-
ঘাতিদ্রব্যমাত্রেরই সংযোগে সর্ব্বত্র আকাশের বাহন কেন হয় না ? এবং আকাশ সর্ব্বত্র গমনকারী
মনুষ্যাদির গমনক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ গমনক্রিয়া রুদ্ধ করে না কেন ?
তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ আপত্তির নিবারক বলিয়াই এই স্তরের অবতারণা করিয়াছেন । তিনি
পূর্বে “ব্যূহনে”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোৎপন্ন দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগ নষ্ট করিয়া দ্রব্য-
স্তরের আরম্ভক সংযোগের উৎপাদনই ব্যূহন । (তৃতীয় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । যেমন জলমধ্যে
কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে তখন সেই জলের আরম্ভক অবয়বসংযোগ নষ্ট হয় এবং তখন সেই জলের
অবয়বেই পরস্পর অল্প সংযোগ উৎপন্ন হয় ; তজ্জগৎ সেখানে তজ্জাতীয় অল্প জলেরই উৎপত্তি হয় ।
সেখানে ঐ কাষ্ঠাদি কর্তৃক সেই অল্প জলের আরম্ভক অবয়বসংযোগের যে উৎপাদন, উহাই ব্যূহন ।
কিন্তু আকাশে উহা হয় না । অর্থাৎ আকাশে কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলেও তাহার কোন অংশে কিছু-
মাত্র আকারের পরিবর্তন হয় না । ভাষ্যকার “ন ব্যূহতে” এই বাক্যের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন ।
এবং পরে “যথা কাষ্ঠেনোদকং” এই বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া উহা বুঝাইয়াছেন ।
অত্যল্প ক্রিয়াবিশিষ্ট যে কোনরূপ দ্রব্যের সংযোগে আকাশে পূর্ব্বোক্ত “ব্যূহনের” প্রসক্তি বা আপত্তি
হয় না । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“সংসর্পতা প্রতিঘাতিনা দ্রব্যেণ” । “সং”পূর্ব্বক “নৃপ”

ধাতুর অর্থ সম্যক্ গতি। সূত্রায় উহার দ্বারা অতিবেগজ্ঞ ক্রিয়াবিশেষও বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে “সংস্পর্শ” শব্দের দ্বারা ঐরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট, ইহা বুঝা যায়। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্রব্য অতিবেগজ্ঞ ক্রিয়াবিশেষ উপপন্ন হইলেও উহার সংযোগে আকাশে বাহনের আপত্তি করা যায় না। কারণ, ঐরূপ সূক্ষ্মদ্রব্য প্রতিবাতী দ্রব্য নহে। কাষ্ঠাদি প্রতিবাতী দ্রব্য কর্তৃক আকাশে বাহন কেন হয় না? এতদ্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“নিরবয়বত্বাৎ”। অর্থাৎ আকাশের অবয়ব না থাকায় তাহাতে বাহন হইতে পারে না। দ্রব্যাস্তরের জনক অবয়বসংযোগের উৎপাদনরূপ বাহন নিরবয়ব দ্রব্যে সম্ভবই নহে। সূত্রায় “অবাহ” আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম। এবং আকাশ, পূর্বোক্তরূপ প্রতিবাতী কোন দ্রব্যেরই বিষ্টস্ত করে না। সূত্রায় “অবিষ্টস্ত”ও আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম। অবিষ্টস্ত কি? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে নিজেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ বেগাদি গুণের অপ্রতিবন্ধই ‘অবিষ্টস্ত’। ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাকে “অবিঘাত” নামে উল্লেখ করিয়া যেখানেও ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য সেখানেই ব্যক্ত হইয়াছে (তৃতীয় খণ্ড, ১২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূল কথা, আকাশ ভিত্তি প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের জায় মনুষ্যাদির গমনাদিক্রিয়ার কার্য্য বোদি রুদ্ধ কবিয়া ঐ গমনাদিক্রিয়া রুদ্ধ করে না। কেন করে না? এতদ্বন্ধে ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন “অস্পর্শত্বাৎ”। পরে তিনি উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অস্পর্শত্বের বিপর্য্যয় (অভাব) স্পর্শবস্তুর থাকিলেই বিষ্টস্ত দেখা যায়। অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যই মনুষ্যাদির গমনাদির ক্রিয়ার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া ঐ ক্রিয়া রুদ্ধ করে, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সূত্রায় পূর্বপক্ষবাদী স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যেই যে বিষ্টস্ত দৃষ্ট হয়, নিঃস্পর্শ দ্রব্য আকাশে তাহার আপত্তি করিতে পারেন না। বার্তিককার এখানে “স ভগান্ সাবয়বে স্পর্শবতি দ্রব্যে” এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও ঐরূপ পাঠ হইতে পারে। কিন্তু বার্তিককার অবাহ ও অবিষ্টস্ত, এই উভয় ধর্ম সমর্থন করিতেই “অস্পর্শত্বাৎ” এই একই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ভাষ্যকারের জায় “নিরবয়বত্বাৎ” এই হেতুবাক্য বলেন নাই। ভাষ্যকার যে ক্রিয়া হেতু গুণ বলিয়াছেন, তাহা প্রশস্তপাদোক্ত গুরুত্বাদি গুণের মধ্যে কোন গুণ? পূর্বোক্ত “অবাহ” ও “অবিষ্টস্ত” আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় আকাশের বিহীনও নির্বিবাদে সিদ্ধ হয়। আকাশ পূর্বোক্ত ধর্মত্রয়বিশিষ্ট বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহানুসারে নিয়োগ এবং প্রতিষেধও উপপন্ন হয় না (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম আঙ্কিকের ৫১শ সূত্র দ্রষ্টব্য।) এই সূত্রের “চ” শব্দটি “তু” শব্দের সমানার্থ।

ভাষ্য। অণুবয়বস্যাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকার্য্যপ্রতিষেধঃ।
সাবয়বত্বে চাণোরণুবয়বোহণুতর ইতি প্রসঙ্গ্যতে। কস্মাৎ? কার্য্য-

১। গুরুত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রযত্ন-ধর্মাদর্শ-সংযোগবিশেষাঃ ক্রিয়াহেতবঃ।—প্রশস্তপাদভাষ্য, কালী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণ-দ্রব্যয়োঃ পরিমাণভেদদর্শনাৎ । তস্মাদণুবয়বস্থাণুতরত্বং । যন্ত সাবয়বোহণুকার্য্যং তদিতি । তস্মাদণুকার্য্যমিদং প্রতিষিধ্যত ইতি ।

কারণবিভাগাচ্চ কার্য্যস্যানিত্যত্বং নাকাশব্যতিভেদাৎ ।
লোকেষ্টাবয়ব-বিভাগাদনিত্যত্বং নাকাশসমাবেশাদিতি ।

অনুবাদ । (উত্তর) পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্ব-প্রসঙ্গবশতঃ অণুকার্য্যের অভাব, অর্থাৎ পরমাণুরূপ কার্য্য নাই । বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর সাবয়বত্ব হইলে পরমাণুর অবয়ব অণুতর অর্থাৎ ঐ পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র, ইহা প্রসঙ্গ হয় । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু কার্য্যদ্রব্য ও কারণদ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ দেখা যায় । অতএব পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্ব (প্রসঙ্গ হয়) । কিন্তু যে পদার্থ সাবয়ব, তাহা পরমাণুর কার্য্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্রব্যণুকাদি দ্রব্য । অতএব এই অণুকার্য্য অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর অভিমত পরমাণুরূপ কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ।

পরন্তু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত কার্য্যের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, “আকাশব্যতিভেদ”-প্রযুক্ত নহে । (যথা) লোকেষ্টের অবয়ববিভাগ-প্রযুক্তই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, আকাশের সমাবেশপ্রযুক্ত নহে ।

টিপ্পনী । পূর্বপক্ষবাদী শেষে বলিতে পারেন যে, পরিমাণ নিত্য হইতে পারে না । কারণ, জগতে পদার্থ থাকিলে সেই সমস্ত পদার্থই কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞাত হইবে । সুতরাং পরিমাণ থাকিলে উহাও কার্য্য । তাহা হইলে “পরিমাণনিত্যঃ কার্য্যবদবটবৎ” এইরূপে অনুমান দ্বারা পরিমাণের অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে । ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া পরে এখানে উক্তরূপ অনুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পরিমাণ কার্য্য হইতে পারে না । পরিমাণরূপ কার্য্য নাই । সুতরাং পরিমাণে কার্য্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা পরিমাণের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাষ্যে “অণুকার্য্যপ্রতিষেধঃ” এবং “অণুকার্য্যমিদং” এই দুই স্থলে “অণুকার্য্য” শব্দটি কর্ম্মধারয় সমাস । “অণুকার্য্যং তৎ” এই স্থলে যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস । ভাষ্যে এখানে পরিমাণ তৎ-পর্ষ্যেই “অণু” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । পরিমাণরূপ কার্য্য নাই কেন, ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি পরিমাণ কার্য্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য উহার অবয়ব স্বীকার করিয়া সেই অবয়বকে পরিমাণের উপাদান বা সমবায়িকারণ বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে সেই সমবায়িকারণ অবয়ব যে অণুতর, অর্থাৎ ঐ পরিমাণ হইতেও ক্ষুদ্র, ইহা স্বীকার্য্য । কারণ, সর্বত্রই কার্য্যরূপ দ্রব্য ও কারণরূপ দ্রব্যের পরিমাণভেদ দেখা যায় । কার্য্যদ্রব্য অপেক্ষায় তাহার কারণদ্রব্য যে অবয়ব, তাহা ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে । সুতরাং পরিমাণরূপ কার্য্যের অবয়ব যে উহা হইতে ক্ষুদ্রই হইবে, ইহা স্বীকার্য্য । কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে সেই অবয়বের অবয়ব এবং তাহার অবয়ব, ইত্যাদিরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া সসঙ্গ পরিমাণের কুতাপি বিশ্রাম নাই, সর্বাপেক্ষা

স্বল্প কোন দ্রব্য নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ এবং স্তম্ভপৰ্বত ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি-দোষ অনিবার্য। পরন্তু তাহা হইলে “পরমাণু” শব্দের প্রয়োগই হইতে পারে না। কারণ, যাহা অণুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বল্প, তাহাকেই পরমাণু বলা হইয়া থাকে। নচেৎ “পরম” এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ বার্থ। কিন্তু যদি সমস্ত অণুরই অবয়ব থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত অবয়বই তাহার কার্য্য অণু হইতে অণুতর হইবে। সর্বাপেক্ষায় অণু অর্থাৎ যাহা হইতে আর অণুতর নাই, এমন কিছুই থাকিবে না। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদী কাহাকে পরমাণু বলিবেন? তিনি “পরমাণু” শব্দের দ্বারা যাহাকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাই তাঁহার মতে যখন সাবয়ব, তখন তাহা ত সর্বাপেক্ষায় অণু হইবে না? সর্বাপেক্ষায় অণু না হইলেও আমরা তাহাতে “পরমাণু” শব্দের মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করিতে পারি না। কুত্রাপি মুখ্য প্রয়োগ সম্ভব না হইলে গৌণ প্রয়োগও বলা যায় না। ভাষ্যকার “অণুতরত্বপ্রসঙ্গাৎ” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ অনুপপত্তিরও সূচনা করিয়াছেন। মূলকথা, পরমাণুরূপ কার্য্য নাই, উহা হইতেই পারে না। যাহা পরমাণু, তাহা অবশ্যই নিরবয়ব। সুতরাং তাহা উৎপন্ন হইতেই পারে না। অতএব তাহাতে কার্য্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু পরমাণুত্ব হেতুর দ্বারা সমস্ত পরমাণুতে নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হওয়ায় নিরবয়ব দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বই সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, যাহা পরমাণু, তাহা সাবয়ব হইতেই পারে না। যাহা সাবয়ব, তাহা পরমাণুর কার্য্য দ্বাণুকাদি দ্রব্য। ভাষ্যকার “যন্ত সাবয়বঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্তরূপ অনুমানেরও সূচনা করিয়াছেন বুঝা যায়। অর্থাৎ যাহা নিরবয়ব নহে, তাহা পরমাণু নহে—যেমন দ্বাণুকাদি, এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরণের দ্বারা পরমাণুত্ব হেতুতে নিরবয়বত্ব, ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ “পরমাণুনিরবয়বঃ পরমাণুত্বাৎ” এইরূপে পরমাণুতে নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হয়। সমস্ত পরমাণুতে নিরবয়বত্বের অনুমানে পরমাণুত্বও হেতু হইতে পারে।

ভাষ্যকার শেষে পরমাণুর বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বও যে সিদ্ধ হয় না, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কারণের বিভাগপ্রযুক্তই কার্য্য দ্রব্যের বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশব্যতি-ভেদপ্রযুক্ত উহা সিদ্ধ হয় না। যেমন লোষ্টের অবয়ববিভাগপ্রযুক্তই উহার বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, লোষ্ট্রমধ্যে আকাশ-সমাবেশ-প্রযুক্ত উহা সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন বিনষ্ট লোষ্ট্রের অবয়বরূপ উপাদান-কারণের বিভাগ হওয়ায় উহার বিনাশ স্বীকার করা যায়, লোষ্ট্র-মধ্যে আকাশসমাবেশ আছে বলিয়াই যে উহার বিনাশ সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। এইরূপ পরমাণুতে আকাশসমাবেশ আছে বলিয়া যে উহার বিনাশ সিদ্ধ হয়, তাহা বলা যায় না। অর্থাৎ পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগনাই যদি আকাশব্যতিভেদ হয়, তাহা হইলে উহা পরমাণুতে অবশ্যই আছে। কিন্তু উহার দ্বারা পরমাণুর বিনাশিত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর অবয়ব না থাকায় অবয়ব-রূপ কারণের বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় লোষ্ট্রের ত্রায় উহার বিনাশিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। নিরবয়ব পরমাণুবিরোধী পূর্বপক্ষবাদীদিগের অজ্ঞাত বিশেষ কথা ও তাহার উক্তর পরবর্তী তিনটি সূত্রে পাওয়া যাইবে ॥২২॥

সূত্র । মূর্ত্তিমতাক্ষ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব-সম্ভাবঃ ॥

॥২৩॥৪৩৩॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) কিন্তু, মূর্ত্ত অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের “সংস্থান” অর্থাৎ আকৃতির সম্ভাব্যতা (পরমাণুসমূহের) অবয়বের সম্ভাব্যতা আছে ।

ভাষ্য । পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরশ্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে । যতঃ সংস্থানং সৌহবয়বসন্নিবেশঃ । পরিমণ্ডলাশ্চাণবস্তুস্মাৎ সাবয়বা ইতি ।

অনুবাদ । স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের অর্থাৎ পৃথিব্যাदि ভূতচতুষ্টয়ের ত্রিকোণ, চতুরশ্র, সম, পরিমণ্ডল, এই সমস্ত “সংস্থান” আছে । সেই যে “সংস্থান,” তাহা অবয়বসমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতি । পরমাণু-সমূহ কিন্তু “পরিমণ্ডল” অর্থাৎ পরিমণ্ডলাকৃতিবিশিষ্ট, অতএব সাবয়ব ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পরমাণুর সাবয়ব-সাধনে পূর্বোক্ত হেতু (আকাশব্যতিরেক) খণ্ডন করিয়া এখন এই সূত্রের দ্বারা অপর হেতুর উল্লেখপূর্বক পুনর্বার পূর্বপক্ষরূপে পরমাণুসমূহের সাবয়ব সমর্থন করিয়াছেন । “সংস্থানে”র উপপত্তি অর্থাৎ সংস্থানবত্তা বা আকৃতিমতাই সেই অপর হেতু । “সংস্থান” বলিতে অবয়বসমূহের সন্নিবেশ অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ । যেমন বস্তুর উপাদান-কারণ সূত্রসমূহের যে পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ, যাহা ঐ বস্তুর অসমবাসি কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই ঐ বস্তুর “সংস্থান” । উহাকেই আকৃতি বলে । উহা গুণ পদার্থ । সূত্রে “উপপত্তি” শব্দের অর্থ এখানে সম্ভাব্যতা । পরমাণুসমূহ সংস্থানের সম্ভাব্যতা আছে, অতএব অবয়বের সম্ভাব্যতা অর্থাৎ সম্ভাব্যতা আছে । কারণ, অবয়ব না থাকিলে পূর্বোক্ত সংস্থান বা আকৃতি থাকিতে পারে না, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর বক্তব্য । পরমাণুসমূহে যে সংস্থান আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মূর্ত্ত দ্রব্যমাত্রেরই সংস্থান আছে । যে পরিমাণ কোন পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট, তাহাকে “মূর্ত্তি” ও “মূর্ত্ত্ব” বলা হইয়াছে । সর্বব্যাপী আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ভিন্ন পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যই ঐ মূর্ত্তি বা মূর্ত্ত্ব আছে । কিন্তু ভাষ্যকার এখানে মনকে ত্যাগ করিয়া স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত্ত দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়কেই সূত্রোক্ত “মূর্ত্তিমৎ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং” । কারণ, মূর্ত্ত্ব বা পরিচ্ছিন্ন হেতু স্পর্শশূন্য মনেও আছে । তাহাতে ব্যতিরিক্ত প্রদর্শন করিলে পূর্বপক্ষবাদীর উহাতেও সংস্থানবত্তার সাধন করিতে হইবে । কিন্তু তাহা অনাবশ্যক । কেবল স্পর্শবত্তা হেতু গ্রহণ করাই তাঁহার কর্তব্য ; উহাতে লাভবও আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য মনে হয় । সূত্রোক্ত “মূর্ত্তি”বিশিষ্ট বা মূর্ত্ত দ্রব্যকেই পরিচ্ছিন্ন দ্রব্য বলে । ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্পর্শবিশিষ্ট

পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যসমূহের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের ত্রিকোণ, চতুরঙ্গ, সম, ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ বর্তুল, এই সমস্ত “সংস্থান” আছে। পরমাণুসমূহে “পরিমণ্ডল” নামক সংস্থান আছে। তাই পরে পরমাণুসমূহকে পরিমণ্ডল বলিয়াছেন। যদিও পূর্বোক্ত ত্রিকোণ প্রভৃতি সংস্থানেরই প্রকারবিশেষ। সূত্রাং ত্রিকোণত্ব প্রভৃতি ঐ সংস্থান বা আকৃতিরই ধর্ম। কিন্তু ঐ আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যকেও “ত্রিকোণ” প্রভৃতি বলা হয়। অর্থাৎ যে দ্রব্যের সংস্থান ত্রিকোণ, তাহাতে ঐ ত্রিকোণত্ব ধর্মের পরম্পরা সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া, সেই দ্রব্যকেও ত্রিকোণ বলা হয়। এবং যে দ্রব্যের সংস্থান “পরিমণ্ডল”, তাহাকেও পরিমণ্ডল বলা হয়। সেখানে ‘পরিমণ্ডল’ শব্দের অর্থ পরিমণ্ডলাকৃতিবিশিষ্ট। ভাষ্যকার ঐ অর্থেই পরে পরমাণুসমূহকে পরিমণ্ডল বলিয়াছেন এবং তজ্জগত্ই ঐ স্থলে পুংলিঙ্গ “পরিমণ্ডল” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ, ঐ স্থলে “পরিমণ্ডল” শব্দ পরমাণুর বিশেষণবোধক। মূলকথা, পূর্বপক্ষবাদী পরমাণুতে পরিমণ্ডলাকৃতি আছে, ইহা বলিয়াই পরমাণুরও সাবয়বত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকর কিন্তু এখানে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন,—“সাবয়বাঃ পরমাণবো মূর্তিমত্বাদিতি, সংস্থানবদ্বাচ সাবয়বা ইতি”। অর্থাৎ তাহার মতে পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব-সাধনে মূর্তিমত্ব অর্থাৎ মূর্তিত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব প্রথম হেতু, এবং সংস্থানবদ্ব দ্বিতীয় হেতু, ইহাই এখানে পূর্বপক্ষসমর্থক মহর্ষির তাৎপর্য। কিন্তু সূত্রপাঠ ও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা সবলভাবে ইহা বুঝা যায় না। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ-ব্যাখ্যায় সংস্থানবদ্ব হেতুর দ্বারাই পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছেন। পরমাণুসমূহের ঐ সংস্থানের নাম “পরিমণ্ডল”। ত্রায়-বৈশেষিকমতে পরমাণুর সে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ, তাহাকেই “পরিমণ্ডল” বলা হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ “নিত্যং পরিমণ্ডলং” (৭।১।২০) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণুর পরিমাণকেই “পরিমণ্ডল” বলিয়া নিত্য বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্ত-পাদ ও ত্রায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি উহাকে “পারিমাণ্ডল্য” বলিয়াছেন। কণাদসূত্রোক্ত “পরিমণ্ডল” শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্বিত প্রত্যয়ে ঐ “পারিমাণ্ডল্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার এই সূত্রে “চ” শব্দকে “তু” শব্দের সমানার্থক বলিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের নিবর্তক বলিয়াছেন ॥২৩॥

সূত্র । সংযোগোপপত্তেচ্চ ॥২৪॥৪৩৪॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) এবং সংযোগের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণুসমূহে সংযোগের সত্তা বা সংযোগবত্তাপ্রযুক্ত (পরমাণুসমূহের) অবয়বের সত্তা আছে।

ভাষ্য । মধ্যে সম্বন্ধঃ পূর্বাপরাভ্যামণুভ্যাং সংযুক্তস্তয়োর্ব্যবধানং কুরুতে । ব্যবধানেনানুস্মীয়তে পূর্বভাগেন পূর্বোণাণুনা সংযুজ্যতে,

পরভাগেন পরমাণুনা সংযুক্ত্যতে। যৌ তৌ পূর্বাপরৌ ভাগৌ তা-
বস্তাবয়বৌ। এবং সর্বতঃ সংযুক্ত্যমানস্ত সর্বতো ভাগা অবয়বা ইতি।

অনুবাদ। মধ্যস্থানে বর্তমান পরমাণু পূর্ব ও অপর অর্থাৎ ঐ পরমাণুর পূর্ব-
দেশস্থ ও পশ্চিমদেশস্থ পরমাণুদ্বয় কর্তৃক সংযুক্ত হইয়া, সেই পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধান
করে। ব্যবধানের দ্বারা অনুমিত হয়—(ঐ মধ্যস্থ পরমাণু) পূর্বভাগে পূর্বপরমাণু
কর্তৃক সংযুক্ত হয়, পরভাগে অপর পরমাণু কর্তৃক সংযুক্ত হয়। সেই যে, পূর্ব-
ভাগ ও অপরভাগ, তাহা এই পরমাণুর অবয়ব। এইরূপ সর্বত্র অর্থাৎ অধঃ ও
উর্দ্ধ প্রভৃতি দেশেও (অন্য পরমাণু কর্তৃক) সংযুক্ত্যমান হওয়ায় সেই পরমাণুর
সর্বত্র ভাগ (অর্থাৎ) অবয়বসমূহ আছে।

। মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর চরম হেতুর উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত পূর্ব-
পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পূর্বসূত্র হইতে “অবয়বসম্ভাবঃ” এই বাক্যের অনুবৃত্তি এখানে মহর্ষির
অভিপ্রেরিত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে “সংযোগোপপত্তিশ্চাবয়বসম্ভাবঃ” ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত
বাক্য বুঝা যায়। “উপপত্তি” শব্দের অর্থ এখানে সত্তা বা বিদ্যমানতা। তাহা হইলে সংযোগিত্বই
এখানে পূর্বপক্ষবাদীর অভিमत হেতু বুঝা যায়। তাই বার্তিককার প্রথমই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—
“সাবয়বত্বং সংযোগিত্বাদিতী সূত্রার্থঃ”। পরে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্বসূত্রে “সংস্থান” শব্দের
দ্বারা সংযোগবিশেষই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। কারণ, অবয়ব-সংযোগবিশেষই “সংস্থান” শব্দের
অর্থ। কিন্তু এই সূত্রে “সংযোগ” শব্দের দ্বারা সংযোগমাত্রই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। সূত্রার্থ
পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। বস্তুতঃ এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে পূর্বপক্ষ বুঝা যায় যে, যে হেতু
পরমাণুতে সংযোগ জন্মে,—কারণ, পরমাণুবাদীদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণ্ডক নামক
অবয়বীর উৎপত্তি হয়, অতএব পরমাণু সাবয়ব। কারণ, নিরবয়ব জড়ব্য সংযোগ জন্মিতে পারে না।
সংযোগ জন্মিলেই কোন অবয়ববিশেষের সহিতই উহা জন্মে। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব না থাকিলে
তাহাতে সংযোগোৎপত্তি হইতেই পারে না। “পরমাণুকারণবাদ” খণ্ডন করিতে শারীরকভাবে
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও উক্ত যুক্তির দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ খণ্ডন করিয়া উক্ত মতেরই
খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্বেই শ্রীমদাশ্রম পূর্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন
করিতে এই সূত্রে উক্ত যুক্তির উল্লেখ হইয়াছে। পরে বিজ্ঞানবাদী ও সর্বশূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়
নানারূপে উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে বহু
প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎশ্রায়ন এখানে পূর্বপক্ষের সমর্থন করিতে
বলিয়াছেন যে, কোন একটি পরমাণু মধ্যস্থানে বর্তমান আছে, এমন সময়ে তাহার পূর্ব ও পশ্চিম
স্থানস্থ অর্থাৎ বামস্থ ও দক্ষিণস্থ দুইটি পরমাণু আসিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া, পশ্চিমপরমাণুর

ব্যবধান করে। ঐ ব্যবধানের দ্বারা অবশ্যই অনুমান করা যায় যে, সেই মধ্যস্থ পরমাণু তাহার পূর্বভাগে পূর্বস্থ পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়, এবং পরভাগে পশ্চিমস্থ পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়। তাহা হইলে সেই মধ্যস্থ পরমাণু পূর্বভাগ ও অপরভাগ সিদ্ধ হওয়ায় উহার দুইটি অবয়বই সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই পূর্বভাগ ও অপর ভাগকে তাহার অবয়বই বলিতে হইবে। এইরূপ সেই মধ্যস্থ পরমাণু অধঃ ও উর্দ্ধ প্রভৃতি স্থানস্থ পরমাণু সহিতও তাহার সংযোগ হওয়ায় উহার সর্বত্রই “ভাগ” অর্থাৎ অবয়ব আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। অতএব পূর্নাক্তরূপে সমস্ত পরমাণুতেই একেপ অস্ত্রান্ত পরমাণু সংযোগ হওয়ায় সেই সংযোগবস্তুর হেতুর দ্বারা সমস্ত পরমাণুই সাবয়ব, অর্থাৎ সমস্ত পরমাণুরই নানা অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ হয়।

পূর্নাক্ত যুক্তি বুঝাইতে “শ্রাব্যবার্ত্তিক” উদ্যোতকর “ষট্‌কেন যুগপদ্ব্যোগাৎ” ইত্যাদি বৌদ্ধ কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, একটি পরমাণু একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ষড়ংশ, ইহা স্বীকার্য। কারণ, একই স্থানে ছয়টি সংযোগ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ হইয়া থাকে। আর যদি ঐ পরমাণুর একই প্রদেশে ছয়টি পরমাণুর ছয়টি সংযোগ জন্ম, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে “পিণ্ডঃ শ্রাদ্ধমাত্রকঃ” অর্থাৎ ঐ সাতটি পরমাণুর পবম্পা সংযোগে যে পিণ্ড উৎপন্ন হইবে, তাহা পরমাণুমাত্রই হয়, অর্থাৎ উহা স্থূল হইতে পারে না। সূত্রাৎ দৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থাকিলেই তাহার সহিত অস্ত্রান্ত পরমাণু সংযোগবশতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রথিমা বা বিস্তৃতি হইতে পারে। কিন্তু পরমাণু কোন প্রদেশ না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। একই প্রদেশে বহু পরমাণুর সংযোগ হইলেও তাহা হইতে পারে না। বস্তুতঃ একই প্রদেশে অনেক সংযোগ জন্ম হইতে পারে না এবং পরমাণু কোন প্রদেশ বা অবয়ব না থাকিলে তাহার সহিত বহু পরমাণু সংযোগই জন্মিতে পারে না। কিন্তু মধ্যস্থানে বর্তমান একটি পরমাণুর চতুর্দিক এবং অধঃ ও উর্দ্ধ, এই ছয় দিক হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে যখন ঐ পরমাণুর নিকটবর্তী হয়, তখন সেই ছয় পরমাণুর সহিত সেই পরমাণুর যুগপৎ সংযোগবশতঃ উহার যে ছয়টি অংশ ব অবয়ব আছে, ইহা স্বীকার্য। তাই বলা হইয়াছে, “ষট্‌কেন যুগপদ্ব্যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। ষষ্ঠাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ শ্রাদ্ধমাত্রকঃ ॥”

উদ্যোতকর এখানে “অগ্রমেবার্গঃ কারিকয়া গীয়াতে” এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানমাত্রবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর “বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি” গ্রন্থের “বিংশতিকা” কারিকার অন্তর্গত উক্ত কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঐ গ্রন্থ উক্ত কারিকার ভূতীয় পাঠে “ষষ্ঠাং সমানদেশত্বাৎ” এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠই যে প্রকৃত, ইহা বসুবন্ধুর নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। সূত্রাৎ এখানে “শ্রাব্যবার্ত্তিক” পুস্তকে মুদ্রিত “ষষ্ঠাং সমানদেশত্বাৎ” এইরূপ পাঠ এবং “সর্বদর্শনসংগ্রহে” (বৌদ্ধদর্শনে) মাধবাচার্য্যের উদ্ধৃত ঐ কারিকায় “তেষামপ্যেকদেশত্বাৎ” এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। শ্রাব্যবার্ত্তিক পরে উদ্যোতকরের “ষষ্ঠাং সমানদেশত্বাদিতিবাক্যং” এইরূপ উক্তিও দেখা যায়। সূত্রাৎ ঐকার পূর্নাক্ত কারিকায় অত্ররূপ পাঠ, সংশোধকের অনবধানভাঙ্গুলক সন্দেহ নাই। উদ্যোতকর

পরেও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে বসুবন্ধুর “বিংশতিকা কারিকা”র অন্তর্গত তৃতীয় কারিকার’ প্রতি-
পাদ্য বিষয়ের খণ্ডন পূর্বক সপ্তম কারিকার পূর্বাঙ্ক’ উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রকাশপূর্বক
নিজ সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং উদ্যোতকর যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর
“বিংশতিকা কারিকা”ও প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।
এই বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের প্রধান আচার্য্য অদ্বৈতের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি প্রথমে হীনযান
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্গত মর্যাস্ত্রিবাদী বৈভাষিকসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পরে জ্যেষ্ঠ অদ্বৈত
কর্তৃক বিজ্ঞানবাদী যোগাচারমতে দীক্ষিত হইয়া মহাযানসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। প্রখ্যাত
বৌদ্ধনৈয়ায়িক দিঙ্নাগ তাঁহারই প্রধান শিষ্য। তিনিও প্রথমে নাগদত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ
করিয়া হীনযানসম্প্রদায়েই প্রবিষ্ট ছিলেন। পরে বসুবন্ধুর পাণ্ডিত্যাদি-প্রভাবে মহাযান-
সম্প্রদায়ের অপূর্ণ অভ্যাসে তিনিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন
ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হীনযানসম্প্রদায়ের প্রবর্তক সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক
বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্য পদার্থের সত্তা সমর্থন করিয়া ঐ বাহ্য পদার্থকে পরমাণুপুঞ্জমাত্র বলিতেন।
বসুবন্ধু “বিংশতিকা কারিকা”র দ্বারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন করিতে পরমাণু খণ্ডন করিয়া উক্ত
মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে “ত্রিংশিকা-বিজ্ঞপ্তি কারিকা”র দ্বারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন
করিয়াছেন। বৌদ্ধাচার্য্য স্থিরমতি উহার ভাষ্য করিয়া বিশদ ভাবে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু প্রভৃতির তৎকালে অতি প্রবল
বিবাদ ঘটিয়াছিল, ইহা তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত গ্রন্থের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈভাষিক বৌদ্ধ-
সম্প্রদায়ের সম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বিষয় খণ্ডন করিতে বসুবন্ধু বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বিষয়
বৈশেষিকাদি মতানুসারে অবয়বরূপ একও বলা যায় না; অনেক পরমাণুও বলা যায় না; সংহত
অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণুসমষ্টিও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ
হয় না? তাই পরে “যটকেন যুগপদযোগাৎ” ইত্যাদি কারিকার দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুর অসিদ্ধি
সমর্থন করিয়াছেন। হীনযানসম্প্রদায়ের সংরক্ষক কাশ্মীরীয় বৈভাষিকগণ পরমাণুর সংঘাতে
সংযোগ স্বীকার করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে সংহত বা
পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে সংযোগ হইতে পারে। বসুবন্ধু পরে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে “পরমাণো-
রসংযোগে” ইত্যাদি কারিকার দ্বারা বলিয়াছেন যে, যখন প্রত্যেক পরমাণুতেই সংযোগ অসম্ভব, তখন
উহার সংঘাতেও সংযোগ হইতে পারে না। কারণ, উক্ত মতে ঐ সংঘাত বা সমষ্টিও নিরবয়ব প্রত্যেক
পরমাণু হইতে কোন পৃথক পদার্থ নহে। বসুবন্ধু পরে “দিগ্ভাগভেদো যস্যাস্তি” ইত্যাদি কারিকার

১। দেশাদিনিয়মঃ সিদ্ধঃ স্বপ্নবৎ প্রেতবৎ পুনঃ।

সন্তানানিয়মঃ সর্কৈঃ পুণ্যদ্যাদিদর্শনে ॥৩॥—বিংশতিকা কারিকা ॥

২। কস্মিণো বাসনাশ্চত্র কলমশ্চত্র বদ্যতে।

তত্রৈব নেমাতে যত্র বাসন। কিং নু কারণং ॥৭॥—বিংশতিকা কারিকা ॥

দ্বারা পরমাণুর একত্ব যে সম্ভব হয় না এবং পরমাণু নিরবয়ব হইলে ছায়া ও আবরণ সম্ভবই হয় না, ইহাও বলিয়াছেন^১। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বসুবন্ধুর অনেক পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত্র রক্ষিতও “তত্ত্বসংগ্রহ” পুস্তকে পরমাণুখণ্ডনে বসুবন্ধুর যুক্তিবিশেষের সমর্থন করিয়াছেন^২। পরে তিনি তাঁহার মূল যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাঁহা একত্বভাবশূন্য এবং

১। ন চৈদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুঃ । ন চ তৎ সৎ তৎ সম্মতং পরমাণুর্ন সিধতি ॥১১॥

যট্কেম যুগপদযোগাৎ পরমাণোঃ বড়ংশতা । যন্মাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ ॥১২॥

পরমাণোরসংযোগে তৎসংঘাতোত্তিস্তি কস্ত সৎ । ন চানবয়বত্বেন তৎসংযোগো ন সিধতি ॥১৩॥

দিগ্ভাগভেদে যন্তাস্তি তৈশ্চকত্বং ন যুজ্যতে । ছায়াবৃত্তী কথং বাহ্যন্তো ন পিণ্ডশ্চ তত্ত্ব তে ॥১৪॥

—বসুবন্ধুর ত্রিংশতিকাকারিকা ॥

যড়্ভো দিগ্ভাঃ যড়্ভিঃ পরমাণুভিঃ যুগপদযোগে সতি পরমাণোঃ বড়ংশতা প্রাপ্নোতি । একত্বং যো দেশস্তত্রাত্ম-
সংশয়ঃ । অথ যত্র চৈকত্ব পরমাণোর্দেহঃ স এব সন্নাং ?—তন সর্কেবাং সমানদেশত্বাৎ সর্কে পিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাৎ
পদম্পর্ষাবত্বেরকাতি ন কচ্চিৎ পিণ্ডো দৃশ্যঃ স্যাৎ । নৈব হি পরমাণবঃ সংযুক্তস্তে, নিরবয়বত্বাৎ ॥১২॥

মাজ্জৈম দেমপ্রসঙ্গঃ, সংহতাস্ত পদম্পর্ষং সংযুক্তস্ত ইতি কাম্মারবেভামিকাস্ত ইদং প্রকৃৎ, যঃ পরমাণুনাং সংঘাতো
ন স তেত্বেত্বার্থান্তরমিতি পরমাণোরসংযোগে “তৎসংঘাতোত্তিস্তি কস্ত সৎ” সংযোগ ইতি বস্তুতে । “ন চানবয়বত্বেন তৎসং-
যোগো ন সিধতি” (১৩)। অথ সংঘাতা অপাত্তোত্ত্বাৎ ন সংযুক্ত্যন্তে, ন তর্হি পরমাণুনাং নিরবয়বত্বাৎ সংযোগো ন সিধ্যতীতি
বক্তবাং, সাবয়বত্বাপি হি সংঘাতস্ত সংযোগানভুগামত্বং । তস্মাৎ পরমাণুবৎ স্বেবাং ন সিধতি, যদিচ পরমাণোঃ সংযোগ
ইযাতে যদি বা নেবাং ত ॥১৩॥

“দিগ্ভাগভেদে যন্তাস্তি তৈশ্চকত্বং ন যুজ্যতে” । অতো হি পরমাণোঃ পূর্কদিগ্ভাগো বাবদধোদিগ্ভাগ ইতি ।
দিগ্ভাগভেদে সতি কথং তদাত্মকত্ব পরমাণোরেকত্বং লোকাতে । “ছায়াবৃত্তী কথং বা”—যদোকৈকত্ব পরমাণোর্দিগ্ভাগ-
ভেদো ন স্যাদিদিগ্ভোগদয়ে কথমাত্র ছায়া ভবতাত্ত্বাতপঃ । নহি তত্ৰাত্মঃ প্রদেশোত্তিস্তি যত্রাতপো ন স্যাৎ । আবরণক
কথং ভবতি পরমাণোঃ পরমাণুস্তরেণ, যদি দিগ্ভাগভেদো নেবাতে । নহি কচ্চিদপি পরমাণোঃ পরভাগোত্তিস্তি, যত্রা-
গমনাদন্তোনাগত্ব প্রতীয়াতঃ স্যাৎ । অসতি চ প্রতীয়াতে সর্কেবাং সমানদেশত্বাৎ সর্কে সংঘাতঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাদিত্ত্বাৎ ।
কিনং পিণ্ডস্ত তে ছায়াবৃত্তী, ন, পরমাণোরিতি,—কিং পণ্ পরমাণুভোহন্তঃ পিণ্ড ইযাতে, সন্ত তে স্তাতাং, নেতাহ
“যন্তো ন পিণ্ডশ্চ তত্ত্ব তে” (১৪) । যদি নানাঃ পরমাণুভাঃ পিণ্ড ইযাতে, ন তে তন্তোতি সিদ্ধং ভবতি” ইত্যাদি ।
(উদ্ধৃত কারিকারয়ের বসুবন্ধুর ত্রিংশতিকাকারিকা) । পারিসে মুদ্রিত লেভি মাত্তেবেন সম্পাদিত “বিজ্ঞানমাত্রতাসিদ্ধি” প্রকৃৎ ।

২। সংযুক্তং দূরদেশস্তং নৈরন্তর্য্যাবাস্তিতং ।

একাধুভিমুখং রূপং যদগোমধ্যবর্ত্তিনঃ ॥

অদ্বন্দ্বরাভিমুখো ন তদেব যদি কল্লাতে ।

অচয়ো ভূধরাদীনামেব সতি ন যুজ্যতে ॥

অদ্বন্দ্বরাভিমুখো রূপক্ষেদন্তদিযাতে ।

কথং নাম ভবেদেকং পরমাণুস্তথা সতি ॥

—“তত্ত্বসংগ্রহ”, গাইনোয়াড ওবিংটাল সিঙ্গ, ৫৫৬ পৃষ্ঠা ।

অনেকস্বভাবশূণ্য, অর্থাৎ বাহ্য একও হইতে পারে না, অনেকও হইতে পারে না, তাহা সৎ পদার্থ নহে। তাহা অসৎ—যেমন গগনপদ্ম। পরমাণু একস্বভাবও নহে, অনেকস্বভাবও নহে। সুতরাং উহা গগনপদ্মের তায় অসৎ। পরমাণুবাদীদের মতে কোন পরমাণুই অনেক নহে। কিন্তু কোন পরমাণু একও হইতে পারে না। শাস্ত রক্ষিত ইহা সমর্থন করিতে বস্তুবন্ধুর তায় প্রত্যেক পরমাণুরই যে অধঃ ও উর্দ্ধ প্রভৃতি দিগ্ভাগে ভেদ আছে, সুতরাং উহার একত্ব সম্ভব নহে, ইহা বুঝাইয়াছেন। শাস্ত রক্ষিতের উপযুক্ত শিষ্য মহামনীষী কমলশীল “তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা”য় বহু বিচার করিয়া শাস্ত রক্ষিতের যুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে পরমাণু-বাদী বৈভাবিকসম্প্রদায়ের মধ্যে মতগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্তই থাকে, ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। অপর সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরমাণুসমূহ সতত সান্তরই থাকে অর্থাৎ কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না। অত্র সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরমাণুসমূহ দগুন নিরন্তর ভয়, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে না, তখন উহাদিগের “স্পৃষ্ট” এই সংজ্ঞা হয়। তন্মধ্যে ভদন্ত শুভ গুপ্ত প্রথমে কৃত মতের সমর্থক। পরমাণুসমূহের পরস্পর সঙ্গি-ধান হইলেও সংযোগ জন্মে না, কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, এই দ্বিতীয় মতটি আমরা অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। কিন্তু উহা কাহার মত, তাহা কমলশীলও ব্যক্ত করিয়া নছেন নাই। তৃতীয় মতও দ্বিতীয় মতের অনুরূপ। পূর্বে কৃত মতগণেই নব্যবর্তী পরমাণু অত্যাশ্রয় বহু পরমাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে দিগ্ভাগে সেই পরমাণু ভেদ যৌকার্য্য। নচেৎ প্রচয় বা স্থূলতা হইতে পারে না। কাবণ, পরমাণুবাদীদের মতে পরমাণু অংশ বা অবয়ব নাই। শাস্ত রক্ষিতের কারিকার ব্যাখ্যার দ্বারা কমলশীল ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং উহা সমর্থন করিতে বস্তুবন্ধুর “দিগ্ভাগভেদো যন্তাশ্চি তৈশ্চৈকং ন যুক্ত্যতঃ” এই কারিকার্কও সেখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্বে তিনি উক্ত বিষয়ে ভদন্ত শুভ গুপ্তের সমাধানের উল্লেখ বিবিধও খণ্ডন করিয়াছেন। পাবে অতি সূক্ষ্ম প্রদর্শিত পরমাণু, উহাও অবয়ব বহুনা কবিলে সে সমস্ত অবয়বও অতি সূক্ষ্মই হইবে, অনবস্থা হইলেও ক্ষতি নাই, ইহাও অপর সম্প্রদায়ের মত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া শাস্ত রক্ষিতের কারিকার দ্বারা উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃক্ৰিংশু তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ “তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা” পাঠ করিলে পরমাণুবাদী বৈভাবিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কত প্রকারে যে পরমাণু বস্তু সমর্থন করিয়াছিলেন এবং উহাদিগের সহিত বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দীর্ঘকাল যাবৎ কিরূপে বিবাদে লিপ্সিচ্ছিলেন, তান্বেদক হইতে নানা প্রকারে দক্ষাস্তবাদের প্রবল প্রতিবাদে হীনবান-সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদে হীনবান হইয়াছিলেন, তাহা বুঝতে পারিবেন। বিজ্ঞানবাদের প্রচারক মহাবান-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ পরমাণুর অবয়ব সমর্থনে আরও অনেক ছেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। তায়-বাটিকে উদ্ভোতক-ব তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের “আত্মতত্ত্ববিন্যাস”র টীকায় নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোনথির উদ্ধৃত “যটকেন যুগপদ্ব্যগাৎ” ইত্যাদি কারিকার পরাধ্ব অত্যাশ্রয়

হেতুরও উল্লেখ দেখা যায় ; পরে তাহা ব্যক্ত হইবে । কলকণা, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদশাদায় নানা হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাব্যস্তত্ব সাধন করিয়াছেন । সর্লীভাববাদীও ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাব্যস্তত্ব সমর্থন করিয়াছেন । পরমাণুর অবয়বপরম্পরা সিদ্ধ হইলে সেই সমস্ত অবয়বও তাহার অবয়বে কোনরূপে বর্তমান হইতে পারে না, সুতরাং পরমাণু নাই, এইরূপে পূর্ববৎ বিচার করিয়া পরমাণুর অভাব সাধন করাই বিজ্ঞানবাদের আশ্রয় সর্লীভাববাদীও গৃহীত উদ্দেশ্য । অতঃপর পরমাণুর পূর্বোক্ত বাধক যুক্তিসমূহের খণ্ডন পাওয়া যাইবে ।

ভাষ্য । যত্রাবৎ মূর্ত্তিমতাং সংস্থানোপপত্তেরবয়বসম্ভাব ইতি, অত্রোক্তং, কিমুক্তং ? বিভাগেহল্লতরপ্রসঙ্গস্য যতো নাল্লীয়স্তত্র নিব্বতে ৩,—অণুবয়বস্য চাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকার্য্য-প্রতিষেধ ইতি ।

যৎ পুনরেতৎ “সংযোগোপপত্তেশ্চ”তি—

স্পর্শবত্বাদব্যবধানমাশ্রয়স্য চাব্যাপ্ত্যা ভাগভক্তিঃ, উক্ত-
ধাত্ত । স্পর্শবানুঃ স্পর্শবতোরণেঃ প্রতিঘাতাদব্যবধায়কো ন
সাবয়বত্বাৎ । স্পর্শবত্বাচ্চ ব্যবধানে সত্যগুণসংযোগো নাশ্রয়ঃ ব্যাপ্তোতীতি
ভাগভক্তির্ভবতি ভাগবানিবায়মিতি । উক্তধাত্ত—“বিভাগেহল্লতর-
প্রসঙ্গস্য যতো নাল্লীয়স্তত্রাবস্থানাৎ” তদবয়বস্য চাণুতরত্ব-
প্রসঙ্গাদণুকার্য্যপ্রতিষেধ ইতি ।

অনুবাদ । (উত্তর) মূর্ত্তি দ্রব্যসমূহের সংস্থানবৎপ্রযুক্ত (পরমাণুর) অবয়ব
আছে, এই যে (পূর্ববিপক্ষ কথিত হইয়াছে), এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন) কি
উক্ত হইয়াছে ? (উত্তর) “বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর
নাই, তাহাতেই নিব্বত্তিপ্রযুক্ত” এবং “পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্বপ্রসঙ্গবশতঃ
পরমাণুরূপ কার্য্য নাই,” ইহা উক্ত হইয়াছে ।

আর এই যে, সংযোগবৎপ্রযুক্ত (পরমাণুর) অবয়ব আছে, ইহার (উত্তর)—
স্পর্শবৎপ্রযুক্ত ব্যবধান হয় এবং আশ্রয়ের অব্যাপ্তিবশতঃ ভাগভক্তি হয় । এই
বিষয়েও উক্ত হইয়াছে ।

বিশদার্থ এই যে, স্পর্শবিশিষ্ট পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট পরমাণুদ্বয়ের প্রতিঘাত-
প্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয়, সাব্যস্তবৎপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয় না । এবং স্পর্শবৎপ্রযুক্ত
ব্যবধান হইলে পরমাণুর সংযোগ আশ্রয়কে (পরমাণুকে) ব্যাপ্ত করে না, এ জগত্

ভাগভক্তি আছে (অর্থাৎ) এই পরমাণু ভাগবিশিষ্টের শ্রীমদাচার্য হয়। এ বিষয়েও (পূর্বে) উক্ত হইয়াছে —“বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর নাই, তাহাতে অবস্থানপ্রযুক্ত” এবং “সেই পরমাণুর অবয়বের অণুতরপ্রসঙ্গবশতঃ পরমাণুরূপ কার্য্য নাই।”

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত “মূর্ত্তিমতাক্ষ” ইত্যাদি সূত্র এবং “সংযোগোপপত্ত্যেচ্চ” এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি পরে আবার যে পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, পরবর্তী সূত্রের দ্বারা তিনি তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বেই এখানে স্বতন্ত্রভাবে ঐ পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন। ভাষ্যকার আরও অনেক স্থলে স্বতন্ত্রভাবে পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়া, পরে মহর্ষির উত্তরসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে প্রথমে প্রথমোক্ত “মূর্ত্তিমতাক্ষ” ইত্যাদি (২৩শ) সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কি উক্ত হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত ষোড়শ সূত্র এবং দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যশেষে পরমাণুর নিরবয়বত্ব-সাধক যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই যথাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। ষোড়শ সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক যুক্তি বলিয়াছেন যে, জগৎ দ্রব্যের বিভাগ হইলে সেই বিভক্ত দ্রব্যগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের অবশ্যই কোন স্থানে অবস্থান বা নিবৃতি আছে। সুতরাং যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতেই তাহার নিবৃতি স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই দ্রব্য যে নিরবয়ব, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, সেই দ্রব্যেরও অবয়ব থাকিলে তাহাতে ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের নিবৃতি বলা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের কোন স্থানে নিবৃতি স্বীকার না করিলে অনবস্থা দি দোষ অনিবার্য্য। দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব ঐ পরমাণু হইতে অবশ্য ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে আবার সেই অবয়বেরও অবয়ব উহা হইতেও ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকার করিয়া পরমাণুর কার্য্যত্ব বা জগৎ স্বীকার করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে কোন পদার্থকেই পরমাণু বলা যায় না। যাহা সর্বাপেক্ষা অণু, অর্থাৎ যাহা হইতে আর অণু বা সূক্ষ্ম নাই, তাহাই ত “পরমাণু” শব্দের অর্থ। সুতরাং যাহাকে পরমাণু বলিবে, তাহার আর অবয়ব নাই। সুতরাং তাহা কার্য্য অর্থাৎ অণু কোন অবয়বজগৎ পদার্থ নহে, ইহাই স্বীকার্য্য। ফলকথা, পূর্বোক্তরূপ সূত্র যুক্তির দ্বারা যখন পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পরমাণুর যে সংস্থান নাই, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুতে সংস্থানবৎ হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর সাবপবৎ সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকার পরে “যৎ পুনর্যেতৎ • সংযোগোপপত্ত্যেচ্চিতি” ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা সংযোগবৎপ্রযুক্ত পরমাণুর অবয়ব আছে, এই শেষোক্ত পূর্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া “স্পর্শবদ্ধাদ্যাবধানং” ইত্যাদি “উক্তঞ্চাত্র” ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা উহারও উত্তর বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যলক্ষণানুসারে “স্পর্শবানণুঃ” ইত্যাদি

সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত কথাই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সন্দর্ভের পরে “উক্তঞ্চাত্র” এই কথার দ্বারা যাহা তাঁহার বিবক্ষিত, পরে “উক্তঞ্চাত্র” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা প্রকাশ করিবার জন্তই পরে তাঁহার পূর্বোক্ত “উক্তঞ্চাত্র” এই কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে। ভাষ্যকার “সংযোগোপপত্তেঃ” এই সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে উহার খণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, মধ্যস্থ পরমাণু যে, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধায়ক হয়, তাহা ঐ পরমাণুদ্বয়ের স্পর্শবদ্ধ-প্রযুক্ত, সাবয়বত্বপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ পরমাণুর স্পর্শ থাকায় মধ্যস্থ পরমাণুতে উভয় পার্শ্বস্থ পরমাণুর প্রতীঘাত বা সংযোগবিশেষ জন্মে। তৎপ্রযুক্তই ঐ মধ্যস্থ পরমাণু সেই পার্শ্বস্থ পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধান করে। ঐ ব্যবধানের দ্বারা ঐ পরমাণুর যে অবয়ব আছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ ব্যবধান অবয়বপ্রযুক্ত নহে। অবয়ব না থাকিলেও স্পর্শবদ্ধপ্রযুক্তই ঐ ব্যবধান হইতে পারে এবং ঐ স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের উভয় পার্শ্বে ঐরূপ দ্রব্যদ্বয় উপস্থিত হইলেই তাহার ব্যবধান হইয়া থাকে। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব না থাকিলেও স্পর্শ আছে বলিয়া তাহারও ব্যবধান হয়। কিন্তু অস্ত্রাত্ম সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রয় দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রূপ পরমাণুর সংযোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে না। সংযোগের স্বভাবই এই যে, উহা কুত্রাপি নিজের আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, এ জন্ত পরমাণুর ভাগ অর্থাৎ অংশ বা অবয়ব না থাকিলেও উহাতে ভাগের “ভক্তি” আছে। অর্থাৎ পরমাণু ভাগবান্ (সাবয়ব) দ্রব্যের সদৃশ হয়। যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে ঐ সাদৃশ্যবিশেষই “ভক্তি” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উদ্যোতকর পূর্বে ঐ “ভক্তি” শব্দের ঐরূপই অর্থ বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও (৭২১৬ সূত্রে) “ভক্তি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ “ভক্তি” শব্দ হইতেই “ভাক্ত” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রায়দর্শনেও (২১২১৫ সূত্রে) “ভাক্ত” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মূলকথা, অস্ত্রাত্ম সাবয়ব পদার্থের সংযোগ যেমন তাহার আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রূপ পরমাণুর সংযোগও পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে না। এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃই পরমাণু সাবয়ব না হইলেও সাবয়বের ত্রায় কথিত হয়। পূর্বোক্তরূপ সাদৃশ্যই উহার মূল। ভাষ্যকার পরমাণুর পূর্বোক্তরূপ সাদৃশ্যকেই এহার “ভাগভক্তি” বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাগ (অংশ) নাই, কিন্তু ভাগবান্ পদার্থের সহিত ঐরূপ সাদৃশ্য আছে, উহাকেই বলিয়াছেন “ভাগভক্তি”। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্ত “উক্তঞ্চাত্র” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত “উক্তঞ্চাত্র” এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত ষোড়শ সূত্রের ভাষ্যে এবং দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে পূর্বে পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক যে যুক্তি বলিয়াছি, তদ্বারাই পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং পূর্বপক্ষবাদী সেই পূর্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে না পারায় আর কোন হেতুর দ্বারাই পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত যুক্তিতে যখন জন্ত দ্রব্যের বিভাগের কোন এক স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে, কোন দ্রব্যকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিতেই

হইবে, তখন আর তাহার অবয়ব স্বীকার করাই যাইবে না। সুতরাং তাহাকে কার্য্য বলাও যাইবে না। অতএব পরমাণু নিবয়ব হইলেও তাহাতেও সংযোগোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সংযোগবদ্ধপ্রযুক্ত তাহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২৪॥

ভাষ্য। “মূর্ত্তিমতাক্ষ সংস্থানোপপত্তেঃ” “সংযোগোপপত্তেঃ” পরমাণুনাং সাবয়বত্বমিতি হেত্বোঃ—

সূত্র। অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেঃপ্রতিষেধঃ॥

॥২৫॥৪৩৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) মূর্ত্তি দ্রব্যসমূহের সংস্থানবদ্ধপ্রযুক্ত এবং সংযোগবদ্ধপ্রযুক্ত পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব,—এই পূর্বদপক্ষে হেতুদ্বয়ের অনবস্থাকারিত্ববশতঃ এবং অনবস্থার অনুপপত্তিবশতঃ (পরমাণুসমূহের নিরবয়বত্বের) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। যাবন্মূর্ত্তিমদ্যাবচ্চ সংযুক্ত্যতে, তৎ সর্ব্বং সাবয়বমিত্যনবস্থাকারিণাবিমৌ হেতু। সা চানবস্থা নোপপদ্যতে। সত্যাননবস্থাত্যাং সত্যৌ হেতু স্মাতাং। তস্মাদপ্রতিষেধোহয়ং নিরবয়বত্বশ্চেতি।

বিভাগস্ত চ বিভজ্যমানহানির্মোপপদ্যতে—তস্মাৎ প্রলয়ান্ততা নোপপদ্যত ইতি।

অনবস্থাত্যাঞ্চ প্রত্যধিকরণং দ্রব্যাবয়বানামানন্ত্যাং পরিমাণভেদানাং গুরুত্বস্ত চাগ্রহণং, সমানপরিমাণত্বকাবয়বাবয়বিনোঃ পরমাণুবয়ব-বিভাগাদূর্দ্ধমিতি।

অনুবাদ। যত বস্তু মূর্ত্তিনিশিষ্ট অর্থাৎ মূর্ত্তি এবং যত বস্তু সংযুক্ত হয়, সেই সমস্তই সাবয়ব, ইহা বলিলে এই হেতুদ্বয় অনবস্থাকারী অর্থাৎ অনবস্থাদোষের আপাদক হয়। সেই অনবস্থাও উপপন্ন হয় না। অনবস্থা “সত্য” অর্থাৎ প্রামাণিকী হইলে (পূর্বোক্ত) হেতুদ্বয় “সত্য” অর্থাৎ পরমাণুর সাবয়বত্বসাধক হইতে পারিত। অতএব ইহা (পরমাণুর) নিরবয়বত্বের প্রতিষেধ নহে।

বিভাগের সম্বন্ধে কিন্তু “বিভজ্যমানজানি” অর্থাৎ বিভাগাধারদ্রব্যের অভাব উপপন্ন হয় না। অতএব বিভাগের প্রলয়ান্ততা উপপন্ন হয় না। অনবস্থা হইলে কিন্তু প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়বের অনন্ততাবশতঃ পরিমাণভেদের এবং গুরুত্বের

জ্ঞান হইতে পারে না এবং পরমাণুর অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্য-পরিমাণতা হয় ।

টিপ্পনী । মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত “মূর্ত্তিমতাক্ষ” ইত্যাদি সূত্রোক্ত এবং “সংযোগোপপত্তেশ্চ” এই সূত্রোক্ত হেতুদ্বয় যে পরমাণুব সাবয়বত্বের সাধক হইতে পারে না, সূত্ররাং উহার দ্বারা পরমাণুব নিরবয়বত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন হয় না, ইহা বলিয়া তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । তাই ভাষ্যকারও প্রথমে “হেত্বোঃ” ইত্যন্ত সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষির এই সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের “হেত্বোঃ” এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত “অনবস্থাকারিত্বাৎ” এই বাক্যের গোঁঘাই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে এবং সূত্রের শেষোক্ত “অপ্রতিষেধঃ” এই বাক্যের পূর্বে “পরমাণুনাং নিরবয়বত্বাৎ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া সূত্রার্থ বর্ণিতে হইবে । তাহা হইলে মহর্ষির বক্তব্য বুঝা যায় যে, যেহেতু পূর্বোক্ত “সংস্থানবত্ব” ও “সংযোগবত্ব” এই হেতুদ্বয় অনবস্থাদোষের আপাদক এবং ঐ অনবস্থাও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য্য নহে, অতএব উহার দ্বারা পরমাণুসমূহের নিরবয়বত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না । ভাষ্যকার পরে সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা বুঝাইতে বর্ণিয়াছেন যে, যত বস্তু মূর্ত্ত এবং যত বস্তু সংযোগ-বিশিষ্ট, সেই সমস্তই সাবয়ব, এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া মূর্ত্তত্ব অথবা সংস্থানবত্ব এবং সংযোগ-বত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করিতে গেলে উহার দ্বারা পরমাণুর অবয়বের অবয়ব এবং তাহারও অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তি হওয়ায় অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য । সূত্ররাং উক্ত হেতুদ্বয় অনবস্থাকারী হওয়ায় উহা পরমাণুব সাবয়বত্বের সাধক হইতে পারে না । অবশ্য অনবস্থা প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন হইলে উহা দোষ নহে, উহা স্বীকার্য্য । কিন্তু এখানে ঐ অনবস্থার উপপত্তিও হয় না । তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রেই বলিয়াছেন,—“অনবস্থানুপপত্তেশ্চ ।” ভাষ্যকার মহর্ষি তাঁৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বর্ণিয়াছেন যে, অনবস্থা “সত্য” অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ হইলে উক্ত হেতুদ্বয় “সত্য” অর্থাৎ সাধ্যসাধক হইতে পারিত । কিন্তু উহা প্রমাণসিদ্ধ হয় না । এখানে মহর্ষির ঐ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ অনবস্থা যে দোষ নহে, উহা স্বীকার্য্য, এই সিদ্ধান্তও সূচিত হইয়াছে । তাই পূর্বাচার্য্যগণ প্রামাণিক অনবস্থা দোষ নহে, ইহা বলিয়া অনেক স্থলে উহা স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন । নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রামাণিক অনবস্থাকে অনবস্থাদোষই বলেন নাই । তিনি এ জন্ত অনবস্থার লক্ষণবাক্যে “অপ্রামাণিক” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য) ।

পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, আমরাও বিভাগকে অনন্ত বলি না । আমাদের মতে বিভাগ প্রণয়াস্ত । অর্থাৎ, জন্ত দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যেখানে প্রলয় বা সর্ব্বাভাব হইবে, আর কিছুই থাকিবে না, সেখানেই বিভাগের নিবৃত্তি হইবে । সূত্ররাং পরমাণুর অবয়বের ত্রায় তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধি হইতে পারে না । কারণ, পরমাণুর বিভাগ করিতে গেলে যেখানে আর কিছুই থাকিবে না, সেখানে আর অবয়বসিদ্ধি সম্ভবই হইবে না । ভাষ্যকার এ জন্ত তাঁহার পূর্বকথিত অনবস্থা সমর্থনের জন্ত পরে বলিয়াছেন যে, বিভাগ প্রণয়াস্ত,

ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, বাহার বিভাগ হইবে, সেই বিভাজ্যমান দ্রব্য বিদ্যমান না থাকিলে ঐ বিভাগ থাকিতে পারে না। বিভাজ্যমান দ্রব্যের হানি (অভাব) হইলে সেই চরম বিভাগের আধার থাকে না। সুতরাং বিভাগ কোথায় থাকিবে? অতএব বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে উহার আধার সেই দ্রব্যও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরও বিভাগ গ্রহণ করিয়া ঐরূপে বিভাগকে অনন্তই বলিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য।

পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ঐ অনবস্থা স্বীকারই করিব? উহা স্বীকারে দোষ কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অনবস্থা স্বীকার করিলে প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়ব অনন্ত হওয়ায় ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ ও গুরুত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞাত দ্রব্যে যে নানাবিধ পরিমাণ ও গুরুত্ববিশেষ আছে, তাহা ঐ সমস্ত দ্রব্যের অবয়বপরম্পরার ন্যূনাধিক্য বা সংখ্যাবিশেষের নির্ণয় দ্বারাই বুঝা যায়। কিন্তু যদি ঐ সমস্ত দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার অন্তই না থাকে, তাহা হইলে উহার পরিমাণবিশেষ ও গুরুত্ববিশেষ বুঝিবার কোন উপায়ই থাকে না। ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্যপরিমাণেরও আপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিয়া, সেই অবয়বেরও বিভাগ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনন্ত অবয়ব-পরম্পরা স্বীকার করিলে ঐ সমস্ত অবয়বকে অবয়বীও বলিতে হইবে। কারণ, বাহার অবয়ব আছে, তাহাকেই অবয়বী বলে। তাহা হইলে ঐ সমস্ত অবয়ব ও অবয়বীকে তুল্যপরিমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত অবয়বেরই অনন্ত অবয়বপরম্পরা স্বীকৃত হইয়াছে। যদি অবয়ব ও অবয়বী, উভয়ই অনন্তাবয়ব হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়েরই তুল্যপরিমাণ স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা যায় না। কারণ, অবয়বী হইতে তাহার অবয়ব ক্ষুদ্রপরিমাণই হইয়া থাকে, ইহা অত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ অবয়ব পরমাণু হইতে ক্ষুদ্র, এবং তাহার অবয়ব উহা হইতেও ক্ষুদ্র, ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্বোক্ত অনবস্থা স্বীকার করিলে উহা সম্ভবই হয় না। কারণ, সমস্ত অবয়বেরই অনন্ত অদ্বয় থাকিলে ঐ সমস্তই তুল্যপরিমাণ হয়। মূল কথা, পূর্বোক্ত অনেক দোষবশতঃ পূর্বোক্তরূপ অনবস্থা কোনরূপেই উপপন্ন না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না। অতএব পরমাণুতেই বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহার নিবয়বত্বই সিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারাই উহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাতে সাবয়বত্বের অনুমানে সমস্ত হেতুই ছুট, ইহাই এখানে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য। মহর্ষি পূর্বপ্রবরণে “পরং বা ত্রুটেঃ” এই শেষ সূত্রে “ত্রুটি” শব্দের প্রয়োগ করিয়া যে যুক্তির সূচনা করিয়াছেন, এই প্রকরণের এই শেষ সূত্রের দ্বারা সেই যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই শ্রায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্যগণ পরমাণুর সাবয়বত্ব পক্ষে অনবস্থাদি দোষের উল্লেখপূর্বক পরমাণুর নিবয়বত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর পরমাণুর নিবয়বত্বসাধক পূর্বোক্ত যুক্তি বিশদভাবে বুঝাইবার জ্ঞান এখানে বলিয়াছেন যে, জ্ঞাত দ্রব্যের বিভাগের অন্ত বা নিবৃত্তি কোথায়? ইহা বিচার করিতে গেলে

ঐ বিভাগ (১) পরমাণুস্ত অথবা (২) প্রলয়ান্ত অথবা (৩) অনন্ত, এই পক্ষত্রয় ভিন্ন আর কোন পক্ষ গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উহা ভিন্ন আর কোন পক্ষই নাই। কিন্তু যদি ঐ বিভাগকে “প্রলয়ান্ত”ই বলা যায়, তাহা হইলে প্রলয় অর্থাৎ একেবারে সর্বাত্মক হইলে তখন বিভজ্যমান কোন দ্রব্য না থাকায় ঐ চরম বিভাগের কোন আধার থাকে না ; বিভাগের অনাধারতাপত্তি হয়। কিন্তু অনাধার বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং “প্রলয়ান্ত” এই পক্ষ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। বিভাগ “অনন্ত” এই তৃতীয় পক্ষে অনবস্থা-দোষ হয়। তাহাতে ত্রসরেণুর অমেয়ত্ব-পত্তি ও তন্মূলক স্মেরু ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি দোষ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিভাগ “পরমাণুস্ত” এই প্রথম পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পরমাণুতেই বিভাগের নিবৃত্তি হয়। পরমাণুর আর বিভাগ হয় না। সুতরাং পরমাণুর যে অবয়ব নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে আর কোন হেতুর দ্বারা পরমাণুতে সাবয়বত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, নিবয়ব পরমাণু স্বীকার করিয়া তাহাকে সাবয়ব বলাই যাইতে পারে না। সুতরাং “পরমাণুঃ সাবয়বঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে দুইটি পদই ব্যাহত হয়। “আত্মতত্ত্ব-বিবেক” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও শেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। উদ্যোতকর “সাবয়ব” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণু সাবয়ব, ইহা বলিলে পরমাণুকে কার্য্যবিশেষই বলা হয়। কিন্তু কার্য্যত্ব ও পরমাণুত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। যাহা পরমাণু, তাহা কার্য্য হইতে পারে না। উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, যদি বল, প্রত্যেক পরমাণু তৎপূর্বজাত অপর পরমাণুর কার্য্য। প্রতিক্ষণে এক পরমাণু হইতেই অল্প এক পরমাণুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা বলিলেও কোন পরমাণুকেই সাবয়ব বলিতে পারিবে না। পূর্বোক্ত ঐ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগই করিতে হইবে। কারণ, যাহার অবয়ব অনেক, তাহাকেই সাবয়ব বলা হয়। যদি বল, পরমাণুব কার্য্যত্বই আমাদিগের সাধ্য, পরমাণু-জ্ঞাত্বই হেতু। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, একমাত্র কারণজ্ঞ কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য জন্মিতেছে, কিন্তু তাহার কারণ একটিমাত্র পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু তাহা হইলে সর্বদাই পরমাণুর কারণ যে কোন একটি পরমাণু থাকায় সর্বদাই উহার উৎপত্তি হইবে। কোন সময়েই উহার প্রাগভাব থাকিবে না। কিন্তু যাহার প্রাগভাবই নাই, তাহার উৎপত্তিও বলা যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকারেও পরমাণুর কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু যদি এক পরমাণুকেই পরমাণুর কারণ বলিয়া এবং ঐ কারণকেই অবয়ব বলিয়া পরমাণুকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, তোমাদিগের মতে কোন পদার্থই এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী না হওয়ায় কার্য্য পরমাণুর উৎপত্তিকালে পূর্বজাত সেই কারণ-পরমাণুটি না থাকায় তোমরা ঐ পরমাণুকে সাবয়ব বলিতে পার না। কারণ, যাহা অবয়ব সহিত হইয়া বিদ্যমান, তাহাই ত “সাবয়ব” শব্দের অর্থ। পরমাণুর উৎপত্তিকালে তাহার অবয়ব বিনষ্ট হইলে তাহাকে সাবয়ব বলা যায় না। অতএব তোমাদিগের মতে “সাবয়ব” শব্দের অর্থ কি ? তাহা বক্তব্য। কিন্তু তোমরা তাহা বলিতে পার না। উদ্যোতকর পরে “মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ সাবয়বঃ পরমাণুঃ” এই বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তোমার মতে পরমাণু যদ্বারা মূর্ত্তিমান, ঐ মূর্ত্তিপদার্থ কি ? এবং উহা কি

পরমাণু হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন পদার্থ? যদি বল, রূপাদিবিশেষই মূর্তি, তাহা হইলে তুমি পরমাণুকে মূর্তিমান্ বলিতে পার না। কারণ, তোমার মতে সর্বাপেক্ষাপ্রাপ্ত রূপাদিই পরমাণু। উহা হইতে ভিন্ন কোন পরমাণু তুমি স্বীকার কর না। তাহা হইলে পরমাণু মূর্তিমান্, ইহা বলিলে রূপাদি রূপাদিবিশিষ্ট, এই কথাই বলা হয়। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। পরন্তু তাহা বলিলে ঐ “মূর্তি” শব্দের উভয় “মতুপ্” প্রত্যয়ও উপপন্ন হয় না। কারণ, ভিন্ন পদার্থ না হইলে “মতুপ্” প্রত্যয় হয় না। ফলকথা, পরমাণুর মূর্তি যে, পরমাণু হইতে পৃথক পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ মূর্তি কি? তাহা এখন বক্তব্য। উদ্দ্যোতকর পূর্বে পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, পরমহ্রস্ব ও পরম অণু, এই ষট্ প্রকার পরিমাণকে “মূর্তি” বলিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমহ্রস্ব ও পরমাণু পরমহ্রস্ব দ্রব্যেই থাকে। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহা বলিয়া আকাশাদি সর্বব্যাপী দ্রব্যে পরমহ্রস্ব ও পরমদীর্ঘত্ব, এই পরিমাণদ্বয় গ্রহণ করিয়া অষ্টবিধ পরিমাণ বলিয়াছেন। শেষোক্ত পরিমাণদ্বয় “মূর্তি” নহে, ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ কিন্তু উদ্দ্যোতকরের পরিমাণ-বিভাগ স্বীকার না করিয়া অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই চতুর্বিধ পরিমাণই বলিয়াছেন। সাংখ্যাত্তরকার তাহাও অস্বীকার করিয়া (৫ন অঃ, ৯০ সূত্রে) পরিমাণকে দ্বিবিধই বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের যে পরিমাণ, উহাই মূর্তি বা মূর্ত্ত্ব বলিয়া ত্রায়-বৈশেষিকসম্প্রদায় পরমাণু ও মনেও উহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের মতে সাবয়বত্বের সাধক হয় না। কারণ, মূর্ত্ত্ব দ্রব্য হইলেই যে তাহা সাবয়ব হইবে, এমন নিয়ম নাই। উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, “সংস্থানবিশেষবত্ত্ব” হেতু পরমাণুতে অসিদ্ধ। কারণ, সংস্থান-বিশেষবত্ত্ব ও সাবয়বত্ত্ব একই পদার্থ। সুতরাং উহার দ্বারাও পরমাণুর সাবয়বত্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল, পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের পূর্নোক্ত পরিমাণই “সংস্থান” শব্দের অর্থ। কিন্তু তাহা হইলে প্রথমে “মূর্ত্তিমত্বাৎ” এই বাক্যের দ্বারাই ঐ হেতু কথিত হওয়ায় আবার “সংস্থানবিশেষবত্ত্বাচ্চ” এই হেতুবাক্যের পৃথক্ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং “মূর্ত্তি” ও “সংস্থান” যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকৃতই হওয়ায় পরে আবার উহা অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যায় না।

উদ্দ্যোতকর পরে পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক মূল যুক্তির পুনরুল্লেখপূর্ব্বক “ষট্ কেন যুগপদ-যোগাৎ” ইত্যাদি কারিকার উদ্ধার ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া উক্ত বাধক যুক্তি খণ্ডন করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, মধ্যস্থ পরমাণুর উর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী ছয়টি পরমাণুর সহিত যে সমস্ত সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে দুই দুইটি পরমাণু গ্রহণ করিয়া বিচার করিলে বক্তব্য এই যে, সেই মধ্যস্থ পরমাণুটির পূর্ব্বস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহা কেবল সেই দুইটি পরমাণুতেই জন্মে, পশ্চিমস্থ পরমাণুতে জন্মে না। এবং মধ্যস্থ পরমাণুর পশ্চিমস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহাও কেবল সেই উভয় পরমাণুতেই জন্মে, পূর্ব্বস্থ পরমাণুর সহিত জন্মে না। এইরূপে ঐ স্থলে সমস্ত সংযোগই ভিন্নদেশস্থ হওয়ায় সমানদেশস্থ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা করা যায় না। আর যদি ঐ স্থলে সেই মধ্যস্থ পরমাণুতেই যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই মধ্যস্থ পরমাণুর প্রদেশ বা বিভিন্ন অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

কারণ, ঐরূপ স্থলে সেই এক পরমাণুতেই ষট্‌পরমাণুর সংযোগ একই স্থানে স্বীকার করা যায়। তাহাতে ঐ সংযোগের সমানদেশত্ব স্বীকার করিলেও ঐ পরমাণুসমূহের সমানদেশত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় পূর্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ যে দিকে পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই দিকেই ঐ পরমাণুর প্রদেশ বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার বাস্তব কোন প্রদেশ থাকিতে পারে না। কারণ, জন্ম দ্রব্যের উপাদান-কারণ অবয়ব-রূপ দ্রব্যই “প্রদেশ” শব্দের মুখ্য অর্থ। মহর্ষি নিজেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে “কারণদ্রব্যস্ত প্রদেশ-শব্দেনাভিধানাং” (২।১৭) এই শ্রুতির দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। সূত্রাং পূর্বোক্ত স্থলে পরমাণুর সম্বন্ধে কল্পিত প্রদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না। উদ্যোতকর পরে “দিগ্-দেশভেদো যস্তাস্তি তন্ত্ৰৈকত্বং ন যুজ্যতে” এই কারিকাদ্বি উদ্ধৃত করিয়া, তদন্তরে বলিয়াছেন যে, আমরা ত পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ স্বীকার করি না। পরমাণুর পূর্বদিকে এক প্রদেশ, পশ্চিমদিকে অপর প্রদেশ, ইত্যাদিরূপে পরমাণুতে দিগ্‌দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর সংযোগ থাকায় ঐ সমস্ত সংযোগকেই পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ বলা হয়। কিন্তু মুখ্যতঃ পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর সংযোগ থাকিলেও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। পূর্বোক্ত বস্তুবন্ধুর (১৪শ) কারিকায় কিন্তু “দিগ্‌ভাগভেদো যস্তাস্তি” এইরূপ পাঠ আছে। বস্তুবন্ধু উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমাণুর পূর্বদিগ্‌ভাগ, অধোদিগ্‌ভাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌ভাগ আছে। সূত্রাং তৎস্বরূপ পরমাণুর একত্ব সম্ভব নহে। যদি প্রত্যেক পরমাণুরই দিগ্‌ভাগভেদ না থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে কোন স্থানে ছায়া এবং কোন স্থানে আতপ কিরূপে থাকে? কারণ, উহার অত্র প্রদেশ না থাকিলে সেখানে ছায়া থাকিতে পারে না এবং দিগ্‌ভাগভেদ না থাকিলে এক পরমাণুর অপর পরমাণুর দ্বারা আবরণও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর কোন অপর ভাগ না থাকিলে সেই ভাগে অপর পরমাণুর সংযোগবশতঃ প্রতিঘাত হইতে পারে না। প্রতিঘাত না হইলে সমস্ত পরমাণুরই সমানদেশত্ববশতঃ সমস্ত পরমাণুসংঘাত পরমাণুমাত্রই হয়, উহা স্থল পিও হইতে পারে না। ফলকথা, প্রত্যেক পরমাণুরই যদি দিগ্‌ভাগভেদ অর্থাৎ ছয় দিকে সংযোগবশতঃ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে ছয়টা পরমাণুই বলিতে হয়। সূত্রাং কোন পরমাণুরই একত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যটীকাকারও ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে উদ্যোতকর যে, “দিগ্‌ভাগভেদো যস্তাস্তি” এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তবে তিনি ঐ স্থলে পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ খণ্ডন করিয়াও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন এবং ছায়া ও আবরণকেও পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধকরূপে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মূর্ত্ত্ব ও স্পর্শবস্ত্ত্বপ্রযুক্তই ছায়া ও আবরণ হইয়া থাকে, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত্ত্ব দ্রব্যই অত্র দ্রব্যকে আবৃত করে, ইহাই দেখা যায়। ঐ আবরণে তাহার অবয়ব প্রযোজক নহে। কোন দ্রব্যে অপর দ্রব্যের সম্বন্ধের প্রতিবেদ করাই “আবরণ” শব্দের অর্থ। যেখানে অল্পসংখ্যক তৈজস পরমাণুর আবরণ হয়, সেখানে ছায়া বোধ

হইয়া থাকে। উদ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যেখানে অল্প তেজঃপদার্থ থাকে, অর্থাৎ সর্বতঃ সম্পূর্ণরূপে আলোকের অভাব থাকে না, সেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম “ছায়া” বলিয়া কথিত হয়, এবং যেখানে তেজঃ পদার্থ সর্বতো নিবৃত্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যোগ্য বিশিষ্ট আলোক যেখানে কুত্রাপি নাই, সেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম “অন্ধকার” নামে কথিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মকেই লোকে “ছায়া” নামে প্রকাশ করে এবং পূর্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মকেই লোকে “অন্ধকার” নামে প্রকাশ করে। বস্তুতঃ পূর্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্মই যে ছায়া ও অন্ধকার পদার্থ, তাহা নহে। উদ্যোতকরও এখানে তাহাই বলেন নাই। কারণ, তিনিও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের অষ্টম সূত্রের বার্তিকে ভাষ্যকারের শ্রায় ছায়া যে দ্রব্যপদার্থ নহে, কিন্তু অভাব পদার্থ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে শ্রায়-বৈশেষিকমতানুসারে অন্ধকার যে কোন ভাব পদার্থের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু উহা তেজঃ পদার্থের অভাব, ইহা বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলকথা, দিগ্দেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণকে হেতু করিয়া তদ্ব্যাহার ও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও উদ্যোতকর বুঝাইয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনের “অবিদ্যা” (৪।১।৫) এই সূত্রের “উপদ্বারে” শব্দর মিশ্রও পূর্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধনে “ছায়াবদ্বাং” এবং “আবৃত্তিমদ্বাং” এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে মুদ্রিত পুস্তকে “আবৃত্তিমদ্বাং” এই পাঠ এবং টীকাকারের “আবৃত্তিঃ স্পন্দনভেদঃ” এই ব্যাখ্যা ভ্রম-কল্পিত। “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“সংযোগব্যবস্থাপনেনৈব ষট্‌কেন যুগপদযোগাদ্দিগ্দেশভেদাচ্ছায়াবৃত্তিভ্যামিত্যাদয়ো নিরস্তাঃ”। অর্থাৎ নিরবয়ব পরমাণুতে সংযোগের ব্যবস্থাপন করায় তদ্ব্যাহারই যুগপৎ ষট্‌ পরমাণুর সহিত সংযোগ, দিগ্দেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণ প্রভৃতি হেতু নিরস্ত হইয়াছে। টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ঐ স্থলে “ষট্‌কেন যুগপদযোগাৎ” ইত্যাদি যে কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পরাধ্বং দিগ্দেশভেদ এবং ছায়াও আবরণ ও পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধকরূপে কথিত হইয়াছে। এবং উদয়নাচার্য্যের পূর্বোক্ত সন্দর্ভানুসারে তৎকালে বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত যে, উক্তরূপ করিবার দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য সমস্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উদয়নাচার্য্যের উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা কেন যে পরমাণুর “সাংশতা” বা সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,^১ যে দ্রব্যে সংযোগ জন্মে, সেই দ্রব্যের স্বরূপই অর্থাৎ সেই দ্রব্যই ঐ সংযোগের সমবায়িকারণ। উহার

১। ষট্‌কেন যুগপদযোগাৎ পরমাণোঃ ষড়্‌ংশতা।

দিগ্‌দেশভেদতচ্ছায়াবৃত্তিভ্যাক্ষান্ত সাংশতা ॥”

২। তদেতত্ত্ববিবর্ত্তিত “সংযোগে”তি। স্বরূপনিবন্ধনং সংযোগিত্বং নাংশমপেক্ষতে। যুগপদনেকমূর্ত্তসংযোগিত্ব-
কানেকদিগবচ্ছেদেনাবিরুদ্ধং। প্রাচ্যাদিবাগদেহোহপি প্রতীচ্যাদ্যসংযোগিত্বে সতি প্রাচ্যাদিসংযোগিত্বাৎ। সাবয়বেহপি
দীর্ঘদণ্ডাদৌ মধ্যবর্ত্তিনমপেক্ষ্য প্রাচ্যাদিবাগদেহবিরহাৎ। ছায়াপি যদি প্রামাণিকী, তদা তেজোগতিপ্রতিবন্ধক-
সংযোগভেদাৎ। এতেনাবরণং ব্যাখ্যাৎ।—“আত্মতত্ত্ববিবেক”দীপ্তি।

অংশ বা অবয়ব উহাতে কারণই নহে। সুতরাং সংযোগ দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না। সুতরাং নিরবয়ব পরমাণুতেও সংযোগ জন্মিতে পারে। যুগপৎ অনেক মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগও ভিন্ন ভিন্ন দিগ্বিশেষে হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। কারণ, যে দিগ্বিশেষে পরমাণুবন্ধনের সংযোগ জন্মে, সেই দিগ্বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়াতেই ঐ সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তি উপপন্ন হয়। কোন প্রদেশ বা অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেই যে সংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, ইহা ত বলা যাইবে না। তবে আর নিরবয়ব দ্রব্যে সংযোগ হইতে পারে না, ইহা কোন্ প্রমাণে বলা যাইবে? অবশ্য সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ সর্বত্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্বারা সংযোগ-মাত্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যায় না। নিরবয়ব আত্মা ও মনের সংযোগ স্বীকার্য্য হইলে ঐরূপ অনুমানের প্রামাণ্যই নাই। ফলকথা, নিরবয়ব দ্রব্যেরও পরস্পর সংযোগ স্বীকারে কোন বাধা নাই। ঐ সংযোগের আশ্রয় পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায় উহা অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু দিগ্বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ার উহার অব্যাপ্যবৃত্তি উপপন্ন হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি শেষে পরমাণুতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি ব্যবহারেরও উপপাদন করিয়া দিগ্দেশভেদে যে, পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণু-প্রযুক্ত কোন স্থানে ছায়া প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় অথবা পরমাণুতে ছায়া প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বলিব যে, পরমাণুতে তেজঃ পদার্থের গতিপ্রতিবন্ধক কোন সংযোগবিশেষ প্রযুক্তই ঐ ছায়ার উপপত্তি হয় এবং তৎপ্রযুক্তই আবরণেরও উপপত্তি হয়। উহাতে পরমাণুর অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। সুতরাং ছায়া ও আবরণ পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হয় না। এ বিষয়ে উদ্যোতকের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। উদ্যোতকের পরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পরমাণুতে যে, ক্রিয়াবস্ত্র প্রভৃতি হেতুর দ্বারা সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত হেতুও নানা-দোষদৃষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, তাঁহারা ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে ঐ সমস্ত হেতু অনিত্যত্বের জনকও নহে, ব্যঞ্জকও নহে, ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্বশেষে চরম কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীরা পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া না বুঝিলে তাঁহাদিগের মতে ঐ সমস্ত পদার্থেরই সত্তা না থাকায় তাঁহারা পরমত-খণ্ডনের জন্য ঐ সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারেন না। যে পদার্থ নিজের উপলব্ধই নহে, তাহা খণ্ডনের জন্যও ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আর যদি তাঁহারা ঐ সমস্ত পদার্থ প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়াই পরপ্রতিপাদনের জন্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ত উহা স্বমতসিদ্ধই হইবে। ঐ সমস্ত পদার্থকে আর পরপক্ষসিদ্ধ বলা যাইবে না। বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় কিন্তু অপরপক্ষ-সম্মত প্রমাণাদি পদার্থ অবলম্বন করিয়াই বিচার করিয়াছেন এবং নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার বাস্তব নহে। স্নেহ ও সর্ষপের বিষম-পরিমাণত্বাদি ব্যবহারও কাল্পনিক। অনাদি মিথ্যা সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই জগতে বিচিত্র মিথ্যা ব্যবহারাদি চলিতেছে।

সুতরাং তদ্বারা পরমাণু প্রভৃতি বস্তু সিদ্ধি হইতে পারে না। পরবর্তী প্রকরণে তাঁহাদিগের এই মূল মত ও তাহার খণ্ডন পাওয়া যাইবে।

নিরবয়ব পরমাণু সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সমস্ত কথার সার মর্ম্ম এই যে, প্রমাণের সত্তা ব্যতীত কেহ কোন সিদ্ধান্তই স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যায়। অতএব প্রমাণের সত্তা সকলেরই স্বীকার্য্য। প্রমাণ দ্বারা নিরবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হওয়ায় উহার সংযোগও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, জ্ঞাত্র দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যে স্থানে ঐ বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই পরমাণু। তাহাতে সংযোগ সম্ভব না হইলে বিভাগ থাকিতে পারে না। কারণ, যে দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগই হয় নাই, তাহার বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঐ সংযোগ কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেও দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাও অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম সত্য। কিন্তু সংযোগমাত্রই কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন, এই নিয়ম সত্য নহে। কারণ, নিরবয়ব আত্মা ও মনের পরস্পর সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। কোন পরমাণুর চতুর্দ্বার এবং অধঃ ও উর্দ্ধ, এই ছয় দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণুর সহিত যুগপৎ সংযোগ হইলেও ঐ সংযোগ সেই সমস্ত দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্নই হইবে। তদ্বারা পরমাণুর ছয়টি অবয়ব সিদ্ধ হয় না এবং ঐ স্থলে সেই সাতটি পরমাণুর যোগে কোন দ্রব্যবিশেষেরও উৎপত্তি হয় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান-কারণ হয় না। এ বিষয়ে বাচস্পতি নিশ্চের কথিত যুক্তি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং “পিণ্ডঃ স্তাদণুমাত্রকঃ” এই কথার দ্বারা বস্তুবদ্ধ যে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও করা যায় না। কারণ, ঐ স্থলে কোন দ্রব্যপিণ্ডই জন্মে না। দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে যে ত্রসরেণু নামক পিণ্ড জন্মে, তাহাতে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যাই মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন করে। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্বসংখ্যাও জ্ঞাত্র দ্রব্যের প্রথিনা অর্গাৎ মহৎ পরিমাণের অত্বতন কারণবিশেষ। পরমাণু-দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন দ্ব্যণুক নামক দ্রব্যে ঐ মহৎ পরিমাণের কোন কারণই না থাকায় উহা জন্মে না। সুতরাং ঐ দ্ব্যণুকও অণু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইলেও তজ্জাত্র দ্রব্যের প্রথিনা হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। প্রত্যেক পরমাণুরই দিগ্‌ভাগভেদ আছে, সুতরাং কোন পরমাণুই এক হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। কারণ, প্রত্যেক পরমাণুর সম্বন্ধে ছয় দিক্ থাকিলেও তাহাতে পরমাণুর ভেদ হইতে পারে না। অর্থাৎ তদ্বারা প্রত্যেক পরমাণুই ষট্‌পরমাণু, ইহা কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক পরমাণুই এক। সুতরাং পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, ইহা বলিয়া গগন-পদ্মের ন্যায় উহার অলৌকিকত্বও সমর্থন করা করা যায় না।

পূর্বোক্ত পরমাণু বিচারে আস্থিকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন যে, “নাগ্নিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ” (৫৮৭) এই সাংখ্যসূত্রে পরমাণুর কার্য্যত্ব প্রতিসিদ্ধ বলিয়া পরমাণুর অনিত্যত্বই সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুতে যে কার্য্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ এবং উহা যে নিত্য, ইহা কিরূপে বলা যায়? বাহা প্রতিসিদ্ধ, তাহা ত কেবল তর্কের দ্বারা অস্বীকার করা যাইবে না?

এতদ্ব্যন্তরে ত্রায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, পরমাণুর কার্যত্ব বা জগৎত্ববোধক কোন শ্রুতি-বাক্য দেখা যায় না। সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্টের উক্ত “প্রকৃতিপুরুষাদিত্যং সর্ব-মনিত্যং” এই বাক্য যে প্রকৃত শ্রুতিবাক্য, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও পরমাণুর জগৎত্ববোধক কোন শ্রুতিবাক্য দেখাইতে পারেন নাই। তাই তিনি পূর্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, যদিও কালবশে লোপাদিপ্ৰযুক্ত আমরা সেই শ্রুতি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আচার্য্য কপিলের উক্ত সূত্র এবং মনুস্মৃতিবশতঃ ঐ শ্রুতি অনুমেয়। তিনি পরে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের “অথো মাত্ৰাবিনাশিত্বো দশাৰ্দ্ধানাঞ্চ বাঃ স্মৃতাঃ” (২৭শ) ইত্যাদি বচনটি উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বচনের দ্বারা যে, পরমাণুই ত্রায়-বৈশেষিক শাস্ত্রসম্মত নিত্যত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা নিজ মতানুসারে বুঝাইয়াছেন। মনুস্মৃতিতে শ্রুতির সিদ্ধান্তই কথিত হওয়ায় উক্ত মনু-বচনের সমানার্থক কোন শ্রুতিবাক্য অদৃষ্ট ছিল বা আছে, ইহা অনুমান করিয়া পরমাণুর কার্যত্ববোধক সেই শ্রুতিবাক্যকে তিনি অনুমেয় শ্রুতি বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত মনু-বচনে “মাত্ৰা” শব্দের দ্বারা সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চতন্মাত্রা গ্রহণ করিয়া, উহারই বিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে। এবং প্রথমে ঐ “মাত্ৰা”রই বিশেষণ-বোধক “অণী” শব্দের প্রয়োগ করিয়া উহাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে পরমাণু অর্থে “অণু” শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। “দ্ব্যৌ মাত্ৰা” এইরূপ প্রয়োগের ত্রায় “অণী মাত্ৰা” এই প্রয়োগে গুণবাচক “অণু” শব্দেরই জ্বলিলে “অণী” এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা দ্রব্যাত্মক পরমাণু গ্রহণ করা যায় না। মেধাতিথি প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণও উক্ত বচনের দ্বারা বিজ্ঞান ভিক্ষুর ত্রায় কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চ তন্মাত্রার বিনাশ কথিত হইলেও তদ্বারা ত্রায়-বৈশেষিক-সম্মত পরমাণুর বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, ত্রায় বৈশেষিক-সম্মত নিত্য পরমাণু ঐ পঞ্চতন্মাত্রাও নহে, উহা হইতে উৎপন্নও নহে। ফল কথা, উক্ত মনু-বচনের দ্বারা ত্রায়-বৈশেষিক-সম্মত পরমাণুর কার্যত্ব বা জগৎত্ববোধক শ্রুতির অনুমান করা যায় না। পরন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে যে আচার্য্য কপিলের বাক্যের দ্বারা ঐরূপ শ্রুতির অনুমান করিয়াছেন, তাহাও নির্বিবাদে স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, উক্ত সাংখ্যসূত্রটি যে, মহর্ষি কপিলেরই উচ্চারিত, ইহা বিবাদগ্রস্ত। পরন্তু যদি উক্ত কপিল-সূত্রের দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যায়, তাহা হইলে আচার্য্য মহর্ষি গোতমের সূত্রের দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যাইবে না কেন? মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয় অধ্যায়ে “নাণুনিত্যত্বাৎ” (২১২৪) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত “অন্তর্কর্ষহিষ্ট” ইত্যাদি (২০শ) সূত্রে পরমাণুকে “অকার্য্য” বলিয়াছেন। মহর্ষি কণাদও “সদকারণবন্নিত্যং” (৪।১।১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি কপিলের বাক্যের দ্বারা শ্রুতির অনুমান করা যায়, কিন্তু মহর্ষি গোতম ও কণাদের বাক্যের দ্বারা তাহা করা যায় না, ইহা বলিতে গেলে কোন দিনই বিবাদের অবসান হইবে না। বেদ-প্রামাণ্যসমর্থক মহর্ষি গোতম ও কণাদ বুদ্ধিমানকল্পিত কেবল তর্কের দ্বারা ঐ সমস্ত অবৈদিক সিদ্ধান্তেরও সমর্থন

কৰিয়া গিয়াছেন, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, মহৰ্ষি গৌতম তৃতীয় অধ্যায়ে “শ্রুতি-প্রামাণ্যাক্ত” (১।৩১) এই সূত্রের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, ইহা তাঁহারও সিদ্ধান্তরূপে সূচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি ত্ৰায়চার্য্য ও বৈশেষিকাচার্য্যগণও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্যই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “শ্রায়-কুসুমাজলি”র পঞ্চম স্তবকে ত্ৰায়গতানুসারে ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার ঐ অনুমান যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরন্তু শ্রুতিসম্মত, ইহা দেখাইতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “বিশ্বত-শ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরত বিশ্বতঃ পাং। সংবাহভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈন্দ্র্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥” (৩।৩) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত শ্রুতিবাক্যে “পতত্র” শব্দের দ্বারা মহৰ্ষি গৌতম-সম্মত নিত্য পরমাণুকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্বে ঐ নিত্য পরমাণুসমূহে অধিষ্ঠান করতঃ সৃষ্টির নিমিত্ত উহাদিগের দ্বাণুকাভিজনক পরস্পর সংযোগ উৎপন্ন করেন। ঐ শ্রুতিবাক্যে “পতত্রৈঃ পরমাণুভিঃ সংজনয়ন্” সমুৎপাদয়ন্ “সংধমতি” সংযোজয়তি” এইরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ সতত গমন করিতেছে, উহারা গতিশীল। এ জন্ত “পতন্তি গচ্ছন্তি” এই অর্থে পতত্বানুপিপন্ন “পতত্র” শব্দ পরমাণু সংজ্ঞা। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে “পতত্র” শব্দের দ্বারা পরমাণুই কথিত হইয়াছে। ফলকথা, উদয়নাচার্য্যের মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্বও সিদ্ধ হওয়ায় উহার নিত্যত্বসাধক অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরন্তু শ্রুতিসম্মত। অবশ্য উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ শ্রুতিব্যাখ্যা অত্র সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। উহা সর্বসম্মত ব্যাখ্যা হইতেও পারে না। কিন্তু তিনি যে, তাঁহার ব্যাখ্যাত গৌতম মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা স্বীকার করেন নাই, পরন্তু উহা শ্রুতিসম্মত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। শ্রুতিব্যাখ্যার মতভেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। উদয়নাচার্য্য যেমন উক্ত শ্রুতিবাক্যে “পতত্র” শব্দের দ্বারা পরমাণুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্রূপ স্বমত সমর্থনের জন্ত অত্রাশ্রয় দার্শনিকগণও অনেক স্থলে শ্রুতিস্থ অনেক শব্দের দ্বারা কষ্টকল্পনা করিয়া অনেক অপ্রসিদ্ধ অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা যাইবে না। তন্মধ্যে কাহার কোন্ ব্যাখ্যা প্রকৃত, কোন্ ব্যাখ্যা কাল্পনিক, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে সেই ভগবান্ বেদপুরুষের বহু সাধনা করা আবশ্যক। কেবল লৌকিক বুদ্ধি ও লৌকিক বিচারের দ্বারা নির্বিকার কোন দিনই উহার নির্ণয় হইতে পারে না।

এখন এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারম্ভে “আনুপলব্ধিক”কেই পূর্বপক্ষবাদী বলিয়া সেখানে বাহার মতে “সর্বং নাস্তি”অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, তাহাকেই “আনুপলব্ধিক” বলিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটিকাকার বাচস্পতি মিশ্র ঐ স্থলে আনুপলব্ধিকের মতে

১। ধটেন পরমাণুরূপ-প্রধানাধিষ্টেয়ত্বং,—তেহি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাৎ,—পতন্তীতি। সং ধমতি সং জনয়ন্তিচ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়ন্তিতার্থঃ।—শ্রায়কুসুমাজলি, পঞ্চম স্তবক, তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যার শেষ ভাগ স্রষ্টব্য।

শূন্যতাই সকল পদার্থের তত্ত্ব, ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি প্রথম আফ্রিকের “সর্বমভাবঃ” (৪১১৩৭) ইত্যাদি স্মৃত্তোক্ত মতকেও শূন্যতাবাদীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই শূন্যতাবাদের প্রাচীন কালে নানারূপে ব্যাখ্যা হইয়াছিল। তজ্জন্য শূন্যতাবাদীদিগের মধ্যেও সম্প্রদায়ভেদ ও মতভেদ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন শূন্যবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, কোন পদার্থের অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, ইহাই তাহার সমস্ত শূন্যবাদ। সুতরাং কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই, একেবারে “সর্বং নাস্তি”, এই মত একপ্রকার শূন্যতাবাদ নামে কথিত হইলেও উহা নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যাত শূন্যবাদ নহে; যে মতে “সর্বং নাস্তি” উহাকে সর্বাভাববাদও বলা যাইতে পারে। এই সর্বাভাববাদিগণও বিজ্ঞানবাদীদিগের যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “আনুপলব্ধিক”কেই পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন। পূর্বে “সর্বমভাবঃ” (৪১১৩৭) ইত্যাদি স্মৃতির দ্বারা যে সকল পদার্থের অসম্ভাবাদের বিচার ও খণ্ডন হইয়াছে, উহা “অসদবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে। উক্ত মতে সমস্ত ভাব পদার্থই অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত। অর্থাৎ ভাবপদার্থ বলিয়া যে সমস্ত পদার্থ প্রতীত হইতেছে, উহা অসৎ, ইহাই এক প্রকার একান্তবাদ বলিয়া সেখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। উক্ত মতে অসৎ পদার্থেরই বাস্তব উপলব্ধি হয়, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারম্ভে যাহাকে “আনুপলব্ধিক” বলিয়াছেন, তাহার মতে উপলব্ধি পদার্থও বস্তুতঃ নাই, ইহা ঐ “আনুপলব্ধিক” শব্দের দ্বারাও বুঝা যায়। তাহা হইলে পূর্বোক্ত মত হইতে তাহার মতে যে কিছু বিশেষ আছে, ইহাও বলা যায়। সুবীণণ এ বিষয়ে প্রণিধান করিবেন। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে ॥২৫॥

নিরবয়ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। যদিদং ভবান্ বুদ্ধীরাশ্রিত্য বুদ্ধিবিষয়াঃ সম্ভূতি মন্যতে, মিথ্যাবুদ্ধয় এতাঃ। যদি হি তত্ত্ব-বুদ্ধয়ঃ স্যুর্ক্বদ্ব্য বিবেচনে ক্রিয়মাণে যাথাঅ্যং বুদ্ধিবিষয়াণামূলভ্যেত ?

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) এই যে আপনি নানা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধির বিষয়সমূহ আছে, ইহা স্বীকার করিতেছেন, এই সমস্ত মিথ্যাবুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম। কারণ, যদি ঐ সমস্ত বুদ্ধি তত্ত্ববুদ্ধি (যথার্থ বুদ্ধি) হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিতে গেলে তখন বুদ্ধির বিষয়সমূহের যাথাঅ্য (প্রকৃত স্বরূপ) উপলব্ধ হউক ?

সূত্র। বুদ্ধ্যা বিবেচনাতু ভাবানাং যাথাঅ্যানুপলব্ধিস্তত্ত্বপকর্ষণে পটসদ্ভাবানুপলব্ধিবত্তদনুপলব্ধিঃ ॥

॥২৬॥৪৩৬॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে তৎপ্রযুক্ত ভাব-

সমূহের অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকৃত সমস্ত পদার্থেরই যাথাক্রম (স্বরূপের) উপলব্ধি হয় না। তন্তুর অপকর্ষণ করিলে অর্থাৎ বস্তুর উপাদান বলিয়া স্বীকৃত সূত্রগুলির এক একটি করিয়া বিভাগ করিলে বস্তুর অস্তিত্বের অনুপলব্ধির ন্যায় সেই অনুপলব্ধি অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপের অনুপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। যথা অয়ং তন্তুরয়ং তন্তুরয়ং তন্তুরিতি প্রত্যেকং তন্তু বিবিচ্য-
মানেষু নার্থান্তরং কিঞ্চিৎপলভ্যতে যং পটবুদ্ধির্বিষয়ঃ স্যাৎ। যাথাত্ম্যা-
নুপলব্ধেরসতি বিষয়ে পটবুদ্ধির্ভবন্তী মিথ্যাবুদ্ধির্ভবতি, এবং
সর্বত্রোতি।

অনুবাদ। যেমন ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, ইহা সূত্র—এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেকে
সমস্ত সূত্রগুলি বিবিচ্যমান হইলে তখন আর কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় না—যাহা
বস্ত্রবুদ্ধির বিষয় হইবে। যাথাক্রম অনুপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত সূত্রগুলির
এক একটি করিয়া অপকর্ষণ করিলে তখন বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায়
অসং বিষয়ে জায়মান বস্ত্রবুদ্ধি মিথ্যাবুদ্ধি হয়। এইরূপ সর্বত্রই মিথ্যাবুদ্ধি
হয়।

টিপ্পনী। সূত্রে “তু” শব্দের দ্বারা প্রকরণান্তরের আরম্ভ স্থিতি হইয়াছে। উদ্যোতকর
প্রভৃতির মতে এই প্রকরণের নাম “বাহ্যার্থভঙ্গনিরাকরণপ্রকরণ”। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে
জ্ঞান ভিন্ন উহার বিষয় বাহ্য পদার্থের সম্ভা নাই, এই বিজ্ঞানবাদই প্রধানতঃ এই প্রকরণের দ্বারা
নিরাকৃত হইয়াছে। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “যদিদং
ভবান্” ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতে লিখিয়াছেন,—“বিজ্ঞানবাদ্যাহ”। কিন্তু ভাষ্যকারের
ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদীই যে পূর্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু
তাঁহার পূর্বোক্ত “আনুপলব্ধিক” বা সর্বাভাববাদীই পূর্বপক্ষবাদী, ইহাই বুঝা যায়। ভাষ্যকার
এখানে প্রথমে “যদিদং ভবান্” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার
পূর্বোক্ত “আনুপলব্ধিক”র পরিগৃহীত চরম যুক্তি বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। তাই ভাষ্যকার এখানে
বিশেষ করিয়া অত্র পূর্বপক্ষবাদীর উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যটিপ্পনীতে ইহা
ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতে এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে
তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই স্বরূপের অনুপলব্ধি হয়। পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝাইতে
বলিয়াছেন যে, যেমন সূত্রসমূহের অপকর্ষণ করিলে বস্তুর অস্তিত্বের অনুপলব্ধি, তদ্রূপ সর্বত্র
সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপের অনুপলব্ধি। ভাষ্যকার সূত্রার্থ-ব্যাখ্যায় মহর্ষির ঐ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা

করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন বস্তুর উপাদান সূত্রগুলিকে এক একটি করিয়া ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, ইহা সূত্র, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সর্বশেষে ঐ সমস্ত সূত্র ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেখানে “বস্ত্র” এইরূপ বুদ্ধির বিষয় কিছুই নাই, ইহা স্বীকার্য। কারণ, যদি ঐ সমস্ত সূত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ঐ স্থলে অবশ্যই তাহার স্বরূপের উপলব্ধি হইত। কিন্তু ঐ স্থলে বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় ইহা স্বীকার্য যে, বস্ত্র অসৎ। অসৎ বিষয়েই “বস্ত্র” এইরূপ বুদ্ধি জন্মে। সুতরাং উহা ভ্রমাত্মক বুদ্ধি। অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পূর্বোক্ত স্থলে বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সূত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা স্বীকার করিলেও সূত্রের যখন স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তখন সূত্রের সত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রবুদ্ধিকে মিথ্যাবুদ্ধি বলা যাইবে না। ভাষ্যকার এই জন্ত শেষে বলিয়াছেন, “এবং সর্বত্র”। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, যেমন সূত্রগুলিকে পূর্বোক্তরূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে আর বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ ঐ সমস্ত সূত্রের অবয়ব বা অংশগুলিকেও এক একটি করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে ঐ সমস্ত সূত্রেরও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এবং সেই সমস্ত অংশের অংশগুলিকেও পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে উহাদিগেরও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এইরূপে সর্বত্রই কোন বস্তুরই স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সকল বস্তুই অসৎ। সুতরাং সকল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম, ইহা স্বীকার্য। বার্তিককার পূর্বপক্ষবাদীর চরম অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপে বস্ত্রের অবয়ব সূত্র এবং তাহার অবয়ব অংশ এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি পরমাণু পর্য্যন্ত বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে যেমন ঐ সমস্ত পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ পরমাণুসমূহেরও অবয়ব প্রভৃতির ঐরূপে বিবেচন করিলে শেষে প্রলয় অর্থাৎ সর্বাভাবই হয়। সুতরাং সকল পদার্থেরই অসত্তাবশতঃ সমস্ত বুদ্ধিই ভ্রম, ইহা স্বীকার্য। সর্বাভাববাদীও অবয়ববিতাগকে “প্রলয়ান্ত” বলিয়া পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছেন। পূর্বপ্রকরণে তাঁহার অগ্র যুক্তির সমর্থন ও খণ্ডন হইয়াছে। পরে এই প্রকরণে সকল পদার্থের অসত্তাসমর্থক পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাও পুনর্বার তাঁহার উক্ত মত পূর্বপক্ষরূপে সমর্থিত হইয়াছে, ইহাও বার্তিককারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার, ভাষ্যকার ও বার্তিককারের “যদিদং ভবান্” ইত্যাদি প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা বিজ্ঞানবাদেরই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বস্ত্র যদি সূত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে সূত্র হইতে ভিন্নরূপেই বস্ত্রের উপলব্ধি হইত। এইরূপ সূত্রের অবয়ব অংশ এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি এবং পরমাণুও পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে উহাদিগের পৃথক কোন স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় স্থূল বা ক্ষুদ্র কোন বাহ্য বস্তুই বস্তুতঃ নাই। সমস্ত বুদ্ধিই নিজের অবাহ আকারকে বাহ্যরূপে বিষয় করায় মিথ্যাবুদ্ধি। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাযানসম্প্রদায়ের পরিপোষক যোগাচারসম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথা পরে ব্যক্ত হইবে। বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধ গ্রন্থ “লঙ্কাবতাসূত্রে”ও মহর্ষি গোতমের এই সূত্রোক্ত যুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। “সর্বদর্শনসংগ্রহে” মহামনীষী মাধবাচার্য্য বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে

“লঙ্ঘ্যবতারস্থত্রে”র ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন’। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও ঐ সমস্ত মতের প্রচার ও নানা প্রকারে সমর্থন হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করির ৥২৬৥

সূত্র । ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥৪৩৭॥

অনুবাদ । (উত্তর) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অহেতু [অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যে সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলক্ষিকে তাঁহার নিজমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন, এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে উহার সাধক হেতু বলিয়াছেন, উহা ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না] ।

ভাষ্য । যদি বুদ্ধ্যা বিবেচনং ভাবানাং, ন সর্বভাবানাং যাথাঅ্যানুপলক্ষিঃ । অথ সর্বভাবানাং যাথাঅ্যানুপলক্ষির্ন বুদ্ধ্যা বিবেচনং । ভাবানাং বুদ্ধ্যা বিবেচনং যাথাঅ্যানুপলক্ষিঃ চতি ব্যাহতত্বতে । তদ্বক্ত-
“অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমাপ্রলয়া” দিতি ।

অনুবাদ । যদি পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলক্ষি হয় না । আর যদি সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলক্ষি হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হয় না । (অতএব) পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন এবং স্বরূপের অনুপলক্ষি ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ হয় । “অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গশ্চৈবমাপ্রলয়াৎ” (১৫শ) এই সূত্রের দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে । [অর্থাৎ উপলক্ষির বিষয়াভাবে উপলক্ষি না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে কোন হেতুই যে থাকে না, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারা অভিমত সিদ্ধি যে সম্ভবই হয় না, ইহা ঐ সূত্রের দ্বারা পূর্বে কথিত হইয়াছে] ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বসূত্রোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতুই হয় না । কারণ, উহা ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ । তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষবাদী বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সকল পদার্থেরই স্বরূপের উপলক্ষি হয় না, এই কথা বলিয়া সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলক্ষিকেই উহার অভাবের সাধক হেতু বলিয়াছেন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে সেই অনুপলক্ষির সাধক হেতু বলিয়াছেন । কিন্তু ঐ উভয় হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ । ভাষ্যকার এই বিরোধ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধির দ্বারা সকল পদার্থের বিবেচন হয়, তাহা

২ । তদ্বক্তা ভগবতা লঙ্ঘ্যবতারে—বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে ।

অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ ॥

ইদং বস্তুবলয়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতাঃ ।

যথা যথার্থশ্চিন্ত্যাস্তে বিনীর্ঘ্যাস্তে তথা তথা ॥—সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ।

হইলে স্বরূপের অনুপলব্ধি থাকে না। কারণ, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইলে স্বরূপের উপলব্ধিই হয়। কোন পদার্থের স্বরূপ না থাকিলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইতেই পারে না। স্বরূপের অনুপলব্ধি হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনও হয় না। সুতরাং পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন ও স্বরূপের অনুপলব্ধি একত্র সম্ভব না হওয়ায় উহা পরস্পর বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্বপক্ষবাদী পদার্থসমূহের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে হেতুরূপে স্বীকার করায় স্বরূপের উপলব্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং পদার্থের স্বরূপ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য হওয়ায় তাঁহার অভিমত সিদ্ধি হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া তাহার স্বরূপের অনুপলব্ধি সমর্থন করিবে, ঐ পদার্থকে কোন পদার্থবিশেষ হইতেই বিবেচন করিতে হইবে। যে পদার্থ হইতে ঐ বিবেচন হয়, তাহাকে ঐ বিবেচনের “অবধি” বলা হয়। ঐ “অবধি” না থাকিলে সেই বিবেচন হইতেই পারে না। সুতরাং ঐ বিবেচন-নির্কীর্ষের জন্ত যে পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য, ঐ পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি ও সত্তা তাঁহার অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই পদার্থের কোন স্থানে অবস্থান স্বীকার না করিলে অনবস্থা-দোষ ও তন্মূলক অন্ত্যান্ত দোষ অনিবার্য্য। ফলকথা, পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন স্বীকার করিতে গেলেই ঐ বিবেচনের “অবধি” কোন পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন ও সকল পদার্থের অনুপলব্ধি পরস্পর বিরুদ্ধ। পূর্বোক্ত ১৫শ স্রুতের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির বিষয় না থাকিলে উপলব্ধিরও অভাব হওয়ায় সেই উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে হেতু সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আশ্রয়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় আত্মবাতী হয়, উহা আত্মলাভ করিতেই পারে না। ভাষ্যকার এখানেও তাঁহার ঐ যুক্তি স্বরণ করাইবার জন্ত শেষে পূর্বোক্ত ঐ স্রুতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বার্তিককার সর্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত “সর্বমভাবঃ” (৪।১।৩৭) ইত্যাদি স্রুতোক্ত মতে যে দোষ বলিয়াছি, তাহা এখানেও বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত মতে যে ব্যাঘাতচতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই মতেও আছে। এই স্রুতোক্ত ব্যাঘাতের শ্রায় সেই ব্যাঘাতচতুষ্টয়ও এখানে পূর্বপক্ষবাদীর স্বমত-সিদ্ধির বাধক। বার্তিককারের পূর্বপ্রদর্শিত সেই ব্যাঘাতচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা চতুর্থ খণ্ডে ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥২৭॥

সূত্র । তদাশ্রয়ত্বাদপৃথগ্গ্রহণং ॥২৮॥৪৩৮॥

অমুবাদ । (উত্তর) তদাশ্রিতত্ববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যদ্রব্যের কারণ-দ্রব্যশ্রিতত্ব-বশতঃ (কারণ-দ্রব্য হইতে) পৃথকরূপে জ্ঞান হয় না।

ভাষ্য । কার্য্যদ্রব্যং কারণ-দ্রব্যশ্রিতং, তৎকারণেভ্যঃ পৃথগ্-নোপলভ্যতে । বিপর্য্যয়ে পৃথগ্গ্রহণাৎ ! যত্রাশ্রয়াশ্রিতভাবো নাস্তি,

১। যশ্চ “সর্বমভাবো ভাবেষিতরেতরাপেক্ষসিদ্ধে”রিতোত্মিন্ বাদে দোষ উক্তঃ স ইহাপি দ্রষ্টব্য ইতি।
—শ্রায়বার্তিক।

তত্র পৃথগ্গ্রহণমিতি । বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং পৃথগ্গ্রহণমতীন্দ্রিয়ে-
ষণ্যু । যদিহি ত্রিয়েণ গৃহ্যতে তদেতয়া বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানমশ্ৰুদিতি ।

অনুবাদ । কার্য্যদ্রব্য কারণদ্রব্যাপ্রতি, সে জন্ত কারণ-দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক-
রূপে উপলব্ধ (প্রত্যক্ষ) হয় না । যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত
বিপরীত স্থলেই পৃথকরূপে জ্ঞান হয় । (তাৎপর্য্য) যে স্থলে আশ্রয়াশ্রিতভাব
নাই, সেই স্থলে পৃথকরূপে জ্ঞান হয় । কিন্তু পদার্থসমূহের (বস্ত্রাদি পদার্থের)
বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনাপ্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ বিষয়ে পৃথকরূপে জ্ঞান হয় ।
(তাৎপর্য্য) যাহা (বস্ত্রাদি) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা এই বুদ্ধির দ্বারা
বিবিচ্যমান হইয়া অন্য অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়া গৃহীত
হয় ।

টিপ্পনী । পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই আপত্তি করিবেন যে, বস্ত্রাদি দ্রব্য যদি তাহার উপাদান সূত্রাদি
হইতে ভিন্ন পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে ঐ সূত্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে বস্ত্রাদি দ্রব্যের
পৃথক উপলব্ধি হউক ? কিন্তু তাহা ত হয় না । কুত্ৰাপি সূত্র হইতে পৃথকরূপে বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয়
না । এতদন্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তদাশ্রিতত্ববশতঃ পৃথকরূপে জ্ঞান হয় না ।
পূর্বপক্ষবাদী যে সূত্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া বস্ত্রাদি দ্রব্যের স্বরূপের অনুপলব্ধি
বলিয়াছেন, ঐ সূত্রাদি দ্রব্যই এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ এবং সেই সূত্রাদি দ্রব্য
যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শব্দের দ্বারা তদাশ্রিত, এই অর্থ ই মহর্ষির
বিবক্ষিত । সূত্রাদি দ্রব্য হইতে বস্ত্রাদি দ্রব্যের যে পৃথকরূপে জ্ঞান হয় না, মহর্ষি এই সূত্রে তাহার
হেতু বলিয়াছেন—তদাশ্রিতত্ব । ভাষ্যকার মহর্ষির যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, কার্য্যদ্রব্য কারণ-
দ্রব্যাপ্রতি, এই জন্ত ঐ কারণ-দ্রব্য হইতে কার্য্যদ্রব্যের পৃথকরূপে জ্ঞান হয় না । কারণ, উহার
বিপরীত স্থলেই অর্থাৎ যে স্থানে উভয় দ্রব্যের আশ্রয়াশ্রিতভাব নাই, সেই স্থলেই উভয় দ্রব্যের
পৃথকরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, ঐ সমস্ত
সূত্র সেই বস্ত্রের উপাদান কারণদ্রব্য । বস্ত্র উহার কার্য্যদ্রব্য । উপাদান-কারণ-দ্রব্যই কার্য্যদ্রব্যের
উৎপত্তি হয় । সুতরাং কার্য্যদ্রব্য তাহার উপাদান-কারণেই সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে ।
উপাদান-কারণই কার্য্যদ্রব্যের আশ্রয় হওয়ায় সূত্রসমূহ বস্ত্রের আশ্রয় এবং বস্ত্র উহার আশ্রিত ।
সূত্র ও বস্ত্রের ঐ আশ্রয়াশ্রিতভাব আছে বলিয়াই সূত্র হইতে বস্ত্রের পৃথকরূপে জ্ঞান হয় না । কারণ,
বস্ত্রে চক্ষুঃসংযোগকালে উহার আশ্রয় সূত্রেও চক্ষুঃসংযোগ হওয়ায় সূত্রেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ।
এবং ঐ সমস্ত সূত্রেই বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সূত্র হইতে ভিন্ন কোন স্থানে বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হয়
না । কিন্তু গো এবং অশ্বাদি দ্রব্যের ঐরূপ আশ্রয়াশ্রিতভাব না থাকায় পৃথকরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া
থাকে । সূত্র হইতে বস্ত্রের অপৃথক গ্রহণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে
কএকটি পক্ষ খণ্ডনপূর্বক বলিয়াছেন যে, সূত্র হইতে ভিন্ন স্থানে বস্ত্রের অদর্শনই ঐ অপৃথকগ্রহণ

বলিতে হইবে। কিন্তু উহা সূত্র ও বস্তুর অভেদের সাধক হয় না। কারণ, বস্তু সূত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইলেও সূত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিদ্যমান থাকে, এই জন্মই উহা হইতে ভিন্ন স্থানে বস্তুর অদর্শন হয়। সুতরাং সূত্র ও বস্তুর ভেদ সত্ত্বেও ঐক্য অপৃথক্ গ্রহণের উপপত্তি হওয়ায় উহার দ্বারা সূত্র ও বস্তুর অভেদ সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সূত্র হইতে বস্তুর পৃথক্ গ্রহণ না হইলেও ঐ সূত্র হইতে পরমাণু পর্যন্ত বিবেচন করিলে পরমাণুসমূহ হইতে ঐ বস্তুর পৃথক্ গ্রহণ অশুভ স্বীকার্য। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়। বস্তুর প্রত্যক্ষস্থলে সূত্রের প্রত্যক্ষ হইলেও পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং অনুমানসিদ্ধ সেই সমস্ত পরমাণু হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে উহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা পূর্বোক্তরূপ ঐ বুদ্ধির দ্বারাই বিবিচ্যমান হইয়া অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়াই গৃহীত হয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও বস্তাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে তাহার ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, ভেদের প্রত্যক্ষে আধারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই অপেক্ষিত। ঐ ভেদের প্রতিযোগীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা না থাকিলেও উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথা দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্ত তাহার সম্মত বুঝা যায় ॥২৮॥

সূত্র । প্রমাণতশ্চাৰ্থ-প্রতিপত্তেঃ ॥২৯॥৪৩৯॥

অনুবাদ । (উত্তর) এবং যেহেতু প্রমাণের দ্বারা পদার্থের উপলব্ধি হয় (অতএব পূর্বপক্ষবাদীর হেতু অহেতু) ।

ভাষ্য । বুদ্ধ্য্য বিবেচনাদ্ভাবানাং যথাত্তোপলব্ধিঃ । যদস্তি যথাচ, যন্নাস্তি যথাচ, তৎ সৰ্বং প্রমাণত উপলব্ধ্যা সিধ্যতি । যাচ প্রমাণত উপলব্ধিস্তদ্বুদ্ধ্য্য বিবেচনং ভাবানাং । তেন সৰ্বশাস্ত্রাণি সৰ্বকৰ্ম্মাণি সৰ্বৈ চ প্রাণিনাং ব্যবহার্য ব্যাপ্তাঃ । পরীক্ষমাণো হি বুদ্ধ্য্যহধ্যবশ্চতি ইদমন্তীদং নাস্তীতি । তত্র সৰ্বভাবানুপপত্তিঃ ।

অনুবাদ । বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনাপ্রযুক্ত পদার্থসমূহের স্বরূপের উপলব্ধি (স্বীকার্য) । কারণ, যে বস্তু আছে ও যে প্রকারে আছে, এবং যাহা নাই ও যে প্রকারে নাই, সেই সমস্ত, প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধিপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যাহা কিন্তু প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি, তাহাই সকল পদার্থের বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। তদ্বারা সর্বশাস্ত্র, সর্বকৰ্ম্ম ও প্রাণিগণের সমস্ত ব্যবহার ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বত্রই বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন থাকে। কারণ, পরীক্ষক ব্যক্তি “ইহা আছে,” “ইহা নাই” ইহা বুদ্ধির দ্বারাই নিশ্চয় করে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সত্য অবশ্য স্বীকার্য হইলে সকল পদার্থের অনুপপত্তি (অসত্তা) নাই।

টিপ্পন। পূর্বোক্ত “বাহতত্বদেহতুঃ” (২৭৭) এই সূত্র হইতে “অহতুঃ” এই পদের অমুভূতি এই সূত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। পূর্বোক্ত ঐ সূত্রে পূর্বপক্ষবাদীর হেতুকে মহর্ষি বিরুদ্ধ বলিয়া অহেতু বলিয়াছেন। শেষে এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদীর ঐ হেতুই অসিদ্ধ। সুতরাং উহা অহেতু। ঐ হেতু অসিদ্ধ কেন? ইহা বুঝাইতে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে, বেহেতু প্রমাণ দ্বারা পদার্থের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষবাদী বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনাপ্রযুক্ত সকল পদার্থের স্বরূপের অনুপলব্ধিকে তাঁহার স্বমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনাপ্রযুক্ত সকল পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধিই স্বীকার্য্য হইলে ঐ হেতু তাঁহার নিজের কথাবল্যারেই অসিদ্ধ হইবে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে মহর্ষির অভিন্নত যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বস্তু আছে এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেকোন বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া আছে, এবং যাহা নাই এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেকোন বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া নাই, সেই সমস্তই প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি প্রযুক্তই সিদ্ধ হয়, প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি ব্যতীত কোন বস্তুরই সত্তা ও অসত্তা প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না। পূর্বপক্ষবাদীও বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন স্বীকার করিয়া প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণ দ্বারা যে উপলব্ধি, তাহাই ত বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। এবং সর্বশাস্ত্র, সর্বকর্ম ও সমস্ত জীবব্যবহার উহার দ্বারা ব্যাপ্ত। অর্থাৎ সর্বত্রই বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন আছে। উহা ব্যতীত শাস্ত্র, কর্ম ও জীবব্যবহার কিছুই হইতে পারে না। পরীক্ষক অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণয়কারী ব্যক্তিও “ইহা আছে” এবং “ইহা নাই”, ইহা বুদ্ধির দ্বারাই নির্ণয় করেন। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় প্রমাণ দ্বারা বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি হয় না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং সকল পদার্থের অসত্তা হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণ দ্বারা বস্তুস্বরূপের যথার্থ উপলব্ধিই স্বীকার্য্য হইলে সেই সমস্ত বস্তুর সত্তাই সিদ্ধ হয়। বস্তুস্বরূপের অনুপলব্ধি অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা সকল বস্তুর অসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথার দ্বারা তিনি যে তাঁহার পূর্বোক্ত সর্বাভাববাদী “অনুপলব্ধিক”কেই পূর্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যের দ্বারা ইহা আরও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই ভাষ্যরস্তুে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ”। বার্তিককার সেখানে লিখিয়াছেন যে, “প্রমাণতঃ” এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচনের অর্থ প্রকাশের জন্যই “তসিল্” প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। বার্তিককারের তাৎপর্য্য সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষির এই সূত্রেও “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা বার্তিককারের পূর্ব-কথিত উদ্দেশ্য গ্রহণ করা যায় ॥ ২৯ ॥

সূত্র । প্রমাণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাং ॥৩০॥৪৪০॥

অমুবাদ । (উত্তর) প্রমাণের সত্তা ও অসত্তাপ্রযুক্ত (সর্বাভাবের উপপত্তি হয় না) ।

ভাষ্য । এবঞ্চ সতি সৰ্বং নাস্তীতি নোপপদ্যতে, কস্মাৎ ?
 প্রমাণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাং । যদি সৰ্বং নাস্তীতি প্রমাণমুপপদ্যতে,
 সৰ্বং নাস্তীত্যেতদ্ব্যাহৃত্যে । অথ প্রমাণং নোপপদ্যতে সৰ্বং নাস্তীত্যস্তু
 কথং সিদ্ধিঃ । অথ প্রমাণমন্তরেণ সিদ্ধিঃ, সৰ্বমন্তীত্যস্তু কথং ন সিদ্ধিঃ ।

অনুবাদ । এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি স্বীকার্য্য
 হইলে “সমস্ত বস্তু নাই” ইহা উপপন্ন হয় না । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর)
 প্রমাণের অনুপপত্তি ও উপপত্তিপ্রযুক্ত । (তাৎপর্য্য) যদি “সমস্ত বস্তু নাই”
 এই বিষয়ে প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে “সমস্ত বস্তু নাই” ইহা ব্যাহত হয় । আর যদি
 প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে “সমস্ত বস্তু নাই” ইহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে ? আর যদি
 প্রমাণ ব্যতীতই সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে “সমস্ত বস্তু আছে” ইহার সিদ্ধি কেন হয় না ?

টিপ্পন্য । মহর্ষি পূর্বোক্ত “সর্বাভাববাদ” খণ্ডন করিতে শেষে এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা
 বলিয়াছেন যে, প্রমাণের অনুপপত্তি ও উপপত্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বস্তুই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না ।
 ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির বিবক্ষিত ঐ সাধা প্রকাশ করিয়া মহর্ষির সূত্রবাক্যের উল্লেখপূর্বক
 উহার হেতু প্রকাশ করিয়াছেন । পরে মহর্ষির তাৎপর্য্য বাক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত বস্তুই নাই,
 অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থই নাই, এই বিষয়ে যদি প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রমাণ-পদার্থের
 সত্তা থাকায় সকল পদার্থের অসত্তা থাকিতে পারে না । প্রমাণের সত্তা ও সমস্ত পদার্থের অসত্তা
 পরস্পর বিরুদ্ধ । আর যদি সকল পদার্থ নাই, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে
 কিরূপে উহা সিদ্ধ হইবে ? প্রমাণ ব্যতীত কিছু সিদ্ধ হইতে পারে না । সর্বাভাববাদী যদি বলেন যে,
 প্রমাণ ব্যতীতই উহা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই আছে, ইহা কেন সিদ্ধ হইবে না ? প্রমাণ
 ব্যতীত সকল পদার্থের অসত্তা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সত্তা সিদ্ধ হইবে না, ইহার কোন কারণ থাকিতে
 পারে না । সুতরাং প্রমাণের সত্তা ও অসত্তা, এই উভয় পক্ষেই যখন পূর্বোক্ত সর্বাভাববাদীর উপপত্তি
 হয় না, তখন কোনরূপেই উহা উপপন্ন হইতে পারে না । প্রমাণের উপপত্তি অর্থাৎ সত্তা এবং অনুপপত্তি
 অর্থাৎ অসত্তা, এই উভয়ই উক্ত মতের অনুপপত্তি বা অসিদ্ধির প্রয়োজক হওয়ায় মহর্ষি এই সূত্রে ঐ
 উভয়কেই হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে প্রথমে “অনুপপত্তি” শব্দের প্রয়োগ
 করিলেও ভাষ্যকার “উপপত্তি” পদার্থই প্রথম বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়া প্রথমে উহাই গ্রহণ করিয়াছেন ॥৩০॥

সূত্র । স্বপ্ন-বিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানঃ॥

॥৩১॥৪৪১॥

মায়া-গন্ধর্বনগর-যুগতৃষ্ণিকাবদ্বা ॥৩২॥৪৪২॥

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়-
 বিষয়ক ভ্রম হয় ।

অথবা মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকা-প্রযুক্ত ভ্রমের শ্রীমদগীতা এই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়।

ভাষ্য। যথা স্বপ্নে ন বিষয়াঃ সন্ত্যথ চাভিমানো ভবতি, এবং ন প্রমাণানি প্রমেয়ানি চ সন্ত্যথচ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানো ভবতি।

অনুবাদ। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয়সমূহ নাই অথচ “অভিমান” অর্থাৎ নানা-বিষয়ক ভ্রম হয়, এইরূপ প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহও নাই, অথচ প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক ভ্রম হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা যে চরম কথা বলিয়াছেন, তদন্তরে পূর্বপক্ষবাদীর চরম কথা এই যে, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই এবং প্রমেয়ও নাই। সুতরাং বাস্তব প্রমাণের দ্বারা কোন বাস্তব প্রমেয়সিদ্ধিও হয় না। প্রমাণ-প্রমেয়ভাবই বাস্তব নহে। কিন্তু উহা অনাদি সংস্কারপ্রযুক্ত কল্পনামূলক। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানা বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা ঐ সমস্ত বিষয়ের সত্তা না থাকায় অসদ্বিষয়ক বলিয়া ভ্রম, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় “ইহা প্রমাণ” ও “ইহা প্রমেয়”, এইরূপে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহাও ভ্রম। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয় সংপদার্থ নহে। অসৎ বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা অবশ্যই ভ্রম। আপত্তি হইতে পারে যে, জাগ্রদবস্থায় যে অসংখ্য বিষয়জ্ঞানজন্ত লোকব্যবহার চলিতেছে, উহা স্বপ্নাবস্থার বিষয়জ্ঞান হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সুতরাং তদদৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত বিষয়জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। এ জন্ত পূর্বোক্ত মতবাদীরা শেষে বলিয়াছেন যে, জাগ্রদবস্থাতেও যে বহু বহু ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহাও সর্বসম্মত। ঐন্দ্রজালিক মায়া প্রয়োগ করিয়া বহু অসদ্বিষয়ে দ্রষ্টার ভ্রম উৎপন্ন করে। এবং আকাশে গন্ধর্ব-নগর না থাকিলেও কোন কোন সময়ে গন্ধর্বনগর বলিয়া ভ্রম হয় এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, ইহা ত সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং জাগ্রদবস্থার ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানও ভ্রম, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। মহর্ষি এখানে পূর্বোক্ত দুইটি সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষরূপে পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্য ও বার্তিকে “মায়া-গন্ধর্ব” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা দেখা যায় না; সুতরাং উহা প্রকৃত শ্রীমদগীতা কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র এখানে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সমর্থনের জন্ত “মায়া-গন্ধর্ব” ইত্যাদি বাক্যের পূর্বোক্তরূপ প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন এবং তিনি “শ্রীমদগীতানিবন্ধে”ও উহা সূত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। মিথিলেশ্বরস্বরূপ নব্য বাচস্পতি মিশ্রও “শ্রীমদগীতাব্যাখ্যায়” “মায়াগন্ধর্ব” ইত্যাদি সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উহা সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরবর্তী ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যে মায়া, গন্ধর্বনগর ও মৃগতৃষ্ণিকার ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর কথিত ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত জ্ঞানেরই যে ভ্রমই সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে বার্তিককারও “মায়াগন্ধর্বনগর-

মৃগতৃষ্ণিকান্বা” এই বাক্যের উল্লেখপূর্বক পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত নানা কারণে উহা যে, মহর্ষি গোতমেরই সূত্র, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত “স্বপ্নাবস্থাভিমানবৎ” ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্য দ্বারাই ঐ দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ ব্যক্ত হওয়ায় ভাষ্যকার পৃথক্ করিয়া আর উহার ভাষ্য করেন নাই, ইহাই এখানে বুদ্ধিতে হইবে। ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়েও এক স্থানে মহর্ষি গোতমের দুইটি সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের ভাষ্য করেন নাই (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং পরেও স্পষ্টার্থ বলিয়া কোন সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এবং ব্যাখ্যা না করার পূর্বোক্তরূপ কারণও তিনি সেখানে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ৪৮শ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এখানে ইহা অবশ্য বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ই যে প্রথমে উক্ত মায়াদি দৃষ্টান্তের উদ্ভাবন ও উল্লেখ করিয়া তদ্বারা তাঁহাদিগের মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তদনুসারেই পরে ত্রায়দর্শনে উক্ত সূত্রদ্বয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা কোনরূপেই নির্ণয় করা যায় না। কারণ, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নানা মতের সমর্থন ও প্রচার হইয়াছে। মৈত্রী উপনিষদেও চতুর্থ প্রপাঠকে দেখা যায়, “ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনং” ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী বৈদিকসম্প্রদায়ও শ্রুতি অনুসারে কোন কোন অংশে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বিবর্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতানুসারে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু উহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও যে এখানে মহর্ষি গোতমের উক্ত দুইটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া, তদ্বারা মহর্ষি গোতমকেও অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অমূলক। কারণ, মহর্ষি গোতম এখানে উক্ত দুইটি পূর্বপক্ষসূত্র বলিয়া, পরে কতিপয় সূত্রের দ্বারা উহার খণ্ডনই করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার সমর্থিত অগ্রাগ্র সমস্ত সিদ্ধান্তও অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ কি না, তাহাও প্রণিধানপূর্বক বুঝা আবশ্যক। তৃতীয় খণ্ডে আত্মপরীক্ষার শেষে এবং চতুর্থ খণ্ডে কএক স্থানে এ বিষয়ে যথামতি আলোচনা করিয়াছি। সুধীগণ নিরপেক্ষভাবে উহার বিচার করিবেন ৩১৩২॥

সূত্র । হেতুভাবাদসিদ্ধিঃ ॥৩৩॥৪৪৩॥

অনুবাদ । (উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অসিদ্ধি [অর্থাৎ অত্যাৱশ্যক হেতুর অভাবে কেবল পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বোক্ত মতের সিদ্ধি হইতে পারে না]।

ভাষ্য । স্বপ্নান্তে বিষয়াভিমানবৎ প্রমাণ-প্রমেয়াভিমানো ন পুন-
জ্জাগরিতান্তে বিষয়োপলব্ধিবদিত্যত্র হেতুর্নাস্তি,—হেতুভাবাদসিদ্ধিঃ ।
স্বপ্নান্তে চাসন্তো বিষয়া উপলভ্যন্ত ইত্যত্রাপি হেতুভাবঃ ।

প্রতিবোধেহনুপলভ্যাদিতি চেৎ ? প্রতিবোধবিষয়োপ-
লভ্যাদপ্রতিষেধঃ । যদি প্রতিবোধেহনুপলভ্যং স্বপ্নে বিষয়া ন

সম্ভীতি, তর্হি ন ইমে প্রতিবুদ্ধেন বিষয়া উপলভ্যন্তে, উপলন্তাৎ সম্ভীতি ।
বিপর্য্যয়ে হি হেতুসামর্থ্যৎ । উপলন্তাৎ সম্ভাবে সত্যানুপ-
লন্তাদভাবঃ সিধ্যতি । উভয়থা ত্বভাবে নানুপলন্তস্য সামর্থ্যমস্তুি ।
যথা প্রদীপস্তাভাবাদ্রূপস্তাদর্শনমিতি তত্র ভাবেনাভাবঃ সমর্থ্যত ইতি ।

স্বপ্নান্তবিকল্পে চ হেতুবচনং । “স্বপ্নবিষয়াভিমানব”দিতি ক্রবতা
স্বপ্নান্তবিকল্পে হেতুর্বাচ্যঃ । কশ্চিৎ স্বপ্নো ভয়োপসংহিতঃ, কশ্চিৎ
প্রমোদোপসংহিতঃ, কশ্চিছুভয়বিপরীতঃ, কদাচিৎ স্বপ্নমেব ন পশ্যতীতি ।
নিমিত্তবতস্ত স্বপ্নবিষয়াভিমানস্য নিমিত্তবিকল্পাদ্বিকল্পোপপত্তিঃ ।

অনুবাদ । স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়, কিন্তু
জাগ্রদবস্থায় বিষয়ের উপলব্ধির ন্যায় নহে—এই বিষয়ে হেতু নাই, হেতুর অভাব-
বশতঃ সিদ্ধি হয় না । এবং স্বপ্নাবস্থায় অসৎ বিষয়সমূহই উপলব্ধ হয়, এই
বিষয়েও হেতুর অভাব ।

(পূর্বপক্ষ) “প্রতিবোধ” অর্থাৎ জাগরণ হইলে অনুপলব্ধিবশতঃ, ইহা যদি
বল ? (উত্তর) জাগরণে বিষয়ের উপলব্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না । বিশদার্থ
এই যে, যদি জাগরণ হইলে (স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহের) উপলব্ধি না হওয়ায় স্বপ্নে
বিষয়সমূহ নাই অর্থাৎ অসৎ, ইহা বল, তাহা হইলে “প্রতিবুদ্ধ” (জাগরিত) ব্যক্তি
কর্তৃক এই যে, সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইতেছে, উপলব্ধিবশতঃ সেই সমস্ত বিষয় আছে
অর্থাৎ সৎ, ইহা স্বীকার্য্য । যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে হেতুর সামর্থ্য থাকে ।
বিশদার্থ এই যে, উপলব্ধিপ্রযুক্ত সত্তা (বিপর্য্যয়) থাকিলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অভাব
সিদ্ধ হয় । কিন্তু উভয়থা অভাব হইলে অর্থাৎ বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, এই
উভয় পক্ষেই বিষয়ের অভাব সিদ্ধ হইলে অনুপলব্ধির (বিষয়াভাব সাধনে) সামর্থ্য
থাকে না । গেমন প্রদাপের অভাবপ্রযুক্ত রূপের দর্শনাভাব হয়, এ জগৎ সেই স্থলে
“ভাবে”র দ্বারা অর্থাৎ কোন স্থলে প্রদাপের সত্তাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তার দ্বারা
“অভাব” (প্রদীপাভাবপ্রযুক্ত রূপদর্শনাভাব) সমর্থিত হয় ।

এবং “স্বপ্নান্ত বিকল্পে” অর্থাৎ স্বপ্নের বিবিধ কল্প বা বৈচিত্র্যে হেতু বলা আবশ্যক ।
বিশদার্থ এই যে, “স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের ন্যায়” এই কথা যিনি বলিতেছেন, তৎকর্তৃক
স্বপ্নেব বৈচিত্র্যে হেতু বক্তব্য । কোন স্বপ্ন ভয়ান্বিত, কোন স্বপ্ন আনন্দান্বিত, কোন

স্বপ্ন ঐ উভয়ের বিপরীত, অর্থাৎ ভয় ও আনন্দ, এই উভয়শূন্য,--কদাচিৎ স্বপ্নই দেখে না।

কিন্তু স্বপ্নে বিষয়ভ্রম নিমিত্তবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বা হেতুবিশেষ-জন্ম হইলে তাহার হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হেতুর অভাববশতঃ সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর মতে হেতু না থাকায় তাঁহার ঐ মতের সিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত “হেতুভাবে”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের দ্বারা প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান ভ্রম, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিষয়োপলব্ধির দ্বারা উহা যথার্থ নহে, এই বিষয়ে পূর্বপক্ষবাদীর মতে কোন হেতু নাই এবং স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত বিষয় যে অসৎ, এই বিষয়েও তাহার মতে কোন হেতু নাই। এবং স্বপ্নের যে বিকল্প অর্থাৎ বৈচিত্র্য, তাহারও হেতু বলা আবশ্যক। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে তাহারও কোন হেতু নাই। ভাষ্যকারের প্রথম কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত জ্ঞান যে ভ্রম, ইহা পরে উহার বাধক কোন জ্ঞান ব্যতীত প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং জাগ্রদবস্থায় জ্ঞানকেই উহার বাধক বলিতে হইবে। তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। তাহা হইলে জাগ্রদবস্থায় সেই যথার্থ জ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ, ইহাও ত বলিতে পারি। জাগ্রদবস্থায় যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ নহে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা উহা ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। ভাষ্যে “স্বপ্নান্ত” ও “জাগরিতান্ত” শব্দের অর্থ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থা। ঐ স্থলে অবস্থা অর্থে “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও ইহাই লিখিয়াছেন। উপনিষদেও “স্বপ্নান্ত” ও “জাগরিতান্ত” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়^১। কিন্তু সেখানে আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অতুচ্ছ। বস্তুতঃ “স্বপ্ন” নামক ভ্রমজ্ঞানই স্বপ্নাবস্থা। কদাচিৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের “ইহা আমি দেখিয়াছি” এইরূপে স্বপ্নাবস্থাতেই স্মরণ হয়। উহা স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নের অন্তে গিয়া, এ জন্ম ঐ স্মরণীয়ক জ্ঞানবিশেষ “স্বপ্নান্তিক” নামে কথিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ “তথা স্বপ্নঃ” এবং “স্বপ্নান্তিকঃ” (নান্দ্যনন্দ) এই দুই সূত্রের দ্বারা আত্মমনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কারবিশেষজন্ম “স্বপ্ন” ও “স্বপ্নান্তিক” জন্মে, ইহা বলিয়াছেন। তদনুসারে বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ তাহার কথিত চতুর্নিধ ভ্রমের মধ্যে চতুর্থ স্বপ্নকে আত্মমনঃসংযোগবিশেষ ও সংস্কারবিশেষজন্ম অবিদ্যমান বিষয়ে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত “স্বপ্নান্তিক” নামক জ্ঞান স্মৃতি, উহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং উহা স্বপ্নজ্ঞান নহে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। দ্বারাচার্য্য-গণের মতেও স্বপ্নজ্ঞান অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, উহা স্মৃতি নহে। প্রশস্তপাদ ঐ স্বপ্নকে

১। স্বপ্নান্তঃ প্রাপ্তিতত্ত্বকোভো যেনাপ্রপণ্ডিতঃ - কঠোপনিষৎ, চতুর্থবর্গ। স্বপ্নান্তঃ স্বপ্নাবস্থা-সংযোগবিশেষ-মিত্যর্থঃ। তথা জাগরিতান্তঃ জাগ্রদবস্থা-সংযোগবিশেষকোভো স্বপ্নান্তঃস্মরণভাৱে। - শঙ্করভাষ্য।

(১) সংস্কারের পটুতা বা আধিক্যজন্য, (২) ধাতুদোষজন্য এবং (৩) অদৃষ্টবিশেষজন্য—এই ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কামী অথবা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যে সময়ে তাহার প্রিয় অথবা ঘেযা ব্যক্তিকে ধারাবাহিক চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হয়, তখন তাহার ঐ সমস্ত চিন্তা বা স্মৃতিসমুত্তিই সংস্কারের আধিক্য-প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাকার হয় অর্থাৎ সেই চিন্তিত বিষয় স্বপ্নজ্ঞানের জনক হয়। ধাতুদোষজন্য স্বপ্ন ঐরূপ নহে। তাহাতে পূর্বের কোন চিন্তার অপেক্ষা নাই। যেমন বাতপ্রকৃতি অথবা বাত-দূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশ-গমনাদি দর্শন করে। পিত্তপ্রকৃতি অথবা পিত্তদূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নি-প্রবেশ ও স্বর্ণপর্বতাদি দর্শন করে। শ্লেষ্মপ্রকৃতি অথবা শ্লেষ্মদূষিত ব্যক্তি নদী, সমুদ্র প্রতরণ ও হিমপর্বতাদি দর্শন করে। প্রশস্তপাদ পরে বলিয়াছেন যে, নিজের অনুভূত অথবা অননুভূত বিষয়ে প্রসিদ্ধ পদার্থ অথবা অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে শুভমূচক গজারোহণ ও ছত্রলাভাদিবিষয়ক যে স্বপ্ন জন্মে, তাহা সমস্তই সংস্কার ও ধর্ম্মজন্য এবং উহার বিপরীত অশুভমূচক তৈলাভাজন ও গর্দভ, উষ্ট্রে আরোহণাদিবিষয়ক যে স্বপ্ন জন্মে, তৎসমস্ত অধর্ম্ম ও সংস্কারজন্য। শেষে বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অজ্ঞাত পদার্থ বিষয়ে অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই স্বপ্ন জন্মে। দার্শনিক-চূড়ামণি মহাকবি শ্রীহর্ষ ও নৈষধীয় চরিতে বলিয়াছেন,—“অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাং করোতি স্মৃতি-জ্ঞানদর্শনাতিথিং” (১।৩৯)। দময়ন্তী নলরাজাকে পূর্বের প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, ইহা শ্রীহর্ষ উক্ত শ্লোকে “অদৃষ্টবৈভবাং” এই হেতুবাচ্যের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতমের সূত্রানুসারে ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি শ্রীমদাচার্য্যগণ পূর্বানুভূত বিষয়েই সংস্কারবিশেষজন্য স্বপ্ন সমর্থন করিয়াছেন। একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে স্বপ্ন জন্মিতে পারে না। প্রশস্তপাদও স্বপ্নজ্ঞানে “স্বাপ” নামক সংস্কারকে কারণ বলিয়াছেন। নল রাজা দময়ন্তী কর্তৃক পূর্বের অদৃষ্ট হইলেও অজ্ঞাত ছিলেন না। তদ্বিষয়ে দময়ন্তীর শ্রবণাদি জ্ঞানজন্য সংস্কার পূর্বের অবশ্যই ছিল। ফলকথা, একেবারে অজ্ঞাত বিষয়েও যে স্বপ্নজ্ঞান জন্মে, ইহা বাৎস্তায়ন প্রভৃতির সম্মত নহে। পরবর্তী সূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা সর্বসম্মত। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি স্বপ্নকালে দৃষ্টার সম্মুখে বিদ্যমান না থাকায় স্বপ্নজ্ঞান অসদ্বিষয়ক অর্থাৎ অবিদ্যমানবিষয়ক। কিন্তু পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদীর মতে উহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি যে অলীক, এ বিষয়ে তাঁহার নতে কোন সাধক হেতু নাই। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যদি বল, স্বপ্নের পরে জাগরণ হইলে তখন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলির উপলব্ধি না হওয়ায় ঐ সমস্ত বিষয় যে অলীক, ইহা সিদ্ধ হয়। তৎকালে বিষয়ের অভাব সাধনে পরে জাগ্রদবস্থায় অনুপলব্ধিই হেতু। কিন্তু ইহা বলিলে জাগ্রদবস্থায় অজ্ঞাত সময়ে নানা বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিষেধ বা অভাব হইতে পারে না। সেই সমস্ত বিষয়কে সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত বিষয়ের অসত্তা সিদ্ধ করিতে হইলে উপলব্ধিপ্রযুক্ত বিষয়ের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, যেহেতু বিপর্য্য থাকিলেই হেতুর সামর্থ্য থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বপক্ষ-বাদী যে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অসত্তা বলিয়াছেন, উহার বিপর্য্য বা বৈপরীত্য হইতেছে—উপলব্ধি-

প্রযুক্ত সত্তা। উহা স্বীকার না করিলে অনুপলক্ষির দ্বারা বিষয়ের অভাব সাধন করা যায় না। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্নের পরে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অনুপলক্ষিস্থলের ত্রায় জাগ্রদবস্থায় অতীত সময়ে নানা বিষয়ের উপলক্ষিস্থলেও যখন সেই সমস্ত বিষয়ের অভাবই স্বীকৃত, তখন স্বপ্নস্থলে পরে অনুপলক্ষি হেতুর দ্বারা তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অসত্তা সিদ্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার মতে ঐ অনুপলক্ষি হেতু বিষয়ের অভাব সাধনে সমর্থ নহে। কারণ, তাঁহার মতে উপলক্ষি হইলেও বিষয়ের সত্তা নাই। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন অন্ধকারে প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপ দর্শন না হওয়ায় সেখানে প্রদীপের সত্তাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তা আছে বলিয়াই তদ্বারা সেই রূপদর্শনাভাব সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে প্রদীপ থাকিলে রূপ দর্শন হইয়া থাকে, এ জগত্ই প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত যে রূপ-দর্শনাভাব, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি ঐ স্থলে প্রদীপ থাকিলেও রূপ দর্শন না হইত, তাহা হইলে প্রদীপের অভাব রূপ দর্শনাভাবের সাধক হেতু হইত না। বস্তুতঃ ঐ স্থলে প্রদীপের সত্তা রূপদর্শনের হেতু বলিয়াই প্রদীপের অসত্তা রূপের অদর্শনের হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায়। এইরূপ জাগ্রদবস্থায় নানা বিষয়ের উপলক্ষি ঐ সমস্ত বিষয়ের সত্তার সাধক হইলেই স্বপ্নের পরে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অনুপলক্ষি ঐ সমস্ত বিষয়ের অসত্তার সাধক হইতে পারে। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে ঐ অনুপলক্ষি ঐ সমস্ত বিষয়ের অসত্তার সাধক হেতু হয় না। সুতরাং তাঁহার মতে ঐ বিষয়ে কোন হেতু নাই।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্ন-বিকল্পেরও কোন হেতু নাই। বিকল্প বলিতে বিবিধ কল্প বা নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বৈচিত্র্য। কোন স্বপ্নে তৎকালে ভয় জন্মে, কোন স্বপ্নে আনন্দ জন্মে, কোন স্বপ্নে ভয়ও নাই, আনন্দও নাই, এইরূপে স্বপ্নের যে বৈচিত্র্য এবং উহার মধ্যে কোন সময়ে যে, ঐ স্বপ্নের নিরন্তর, এ বিষয়ে অবশ্য হেতু বলিতে হইবে। কারণ, হেতু ব্যতীত উহার উপপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে যখন কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, তখন তিনি উক্ত বিষয়ে কোন হেতু বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে উক্ত বিষয়ে কোন হেতু নাই। কিন্তু “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” এই কথা বলিয়া যখন তিনি স্বপ্ন স্বীকার করিয়াছেন, তখন ঐ স্বপ্নের বৈচিত্র্যের হেতু কোন পদার্থ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য। তাহা হইলে সেই নিমিত্ত বা হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ স্বপ্নের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। আমাদের মতে সেই হেতুর সত্তা ও বৈচিত্র্য থাকায় উহা উপপন্ন হয়। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে তাহা উপপন্ন হয় না। সুতরাং হেতুর অভাববশতঃ তাঁহার মতের সিদ্ধি হয় না ॥৩৩॥

সূত্র । স্মৃতি-সংকল্পবচ্চ স্বপ্নবিষয়াভিমানঃ ॥

॥৩৪॥৪৪৪॥

অনুবাদ । এবং স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের ত্রায় (পূর্ববানুভূতবিষয়ক)।

ভাষ্য । পূর্বোপলব্ধবিষয়ঃ । যথা স্মৃতিশ্চ সংকল্পশ্চ পূর্বোপ-

লব্ধবিষয়ো, ন তস্মৈ প্রত্যাখ্যানায় কল্পতে, তথা স্বপ্নে বিষয়গ্রহণং পূর্বোপলব্ধবিষয়ং ন তস্মৈ প্রত্যাখ্যানায় কল্পত ইতি । এবং দৃষ্ট-বিষয়শ্চ স্বপ্নান্তো জাগরিতান্তেন । যঃ স্বপ্তঃ স্বপ্নং পশ্যতি, স এব জাগ্রৎ স্বপ্নদর্শনানি প্রতিসন্ধতে ইদমদ্রাক্ষমিতি । তত্র জাগ্রদ্বুদ্ধিবৃত্তিবশাৎ স্বপ্নবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি ব্যবসায়ঃ । সতি চ প্রতিসন্ধানে যা জাগ্রতো বুদ্ধি-বৃত্তিস্তদ্বশাদয়ং ব্যবসায়ঃ স্বপ্নবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি ।

উভয়াবিশেষে তু সাধনানর্থক্যং । যস্মৈ স্বপ্নান্তজাগরিতান্তয়ো-রবিশেষস্তস্য “স্বপ্নবিষয়াভিমানব”দিতি সাধনমনর্থকং, তদাশ্রয়প্রত্যা-খ্যানাৎ ।

অতস্মিৎ স্তু দিতি চ ব্যবসায়ঃ প্রধানাশ্রয়ঃ । অপুরুষে স্থাণৌ পুরুষ ইতি ব্যবসায়ঃ স প্রধানাশ্রয়ঃ । ন খলু পুরুষেহনুপলব্ধে পুরুষ ইতাপুরুষে ব্যবসায়ো ভবতি । এবং স্বপ্নবিষয়স্য ব্যবসায়ো হস্তিনমদ্রাক্ষং পর্বতমদ্রাক্ষমিতি প্রধানাশ্রয়ো ভবিতুমর্হতি ।

অনুবাদ । পূর্বানুভূতবিষয়ক অর্থাৎ সূত্রোক্ত স্বপ্নবিষয়াভিমান পূর্বানুভূত সৎপদার্থবিষয়ক । (তাৎপর্য) যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্বানুভূতবিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত সমর্থ হয় না, তদ্রূপ স্বপ্নে বিষয়জ্ঞানও পূর্বানুভূত-বিষয়ক হওয়ায় সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত সমর্থ হয় না অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানও তাহার বিষয়ের অসত্তা সাধন করিতে পারে না ।

এইরূপ হইলে “স্বপ্নান্ত” অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরূপ স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থা কর্তৃক দৃষ্ট-বিষয়কই হয় (অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইয়াছে, স্বপ্নজ্ঞানে তাহাই বিষয় হয়) । যে ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগ্রত হইয়া “ইহা দেখিয়াছিলাম” এইরূপে স্বপ্নদর্শনগুলি প্রতিসন্ধান (স্মরণ) করে । তাহা হইলে অর্থাৎ ঐ প্রতিসন্ধান হইলে জাগ্রত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ স্বপ্নে বিষয়াভিমান মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় হয় । তাৎপর্য এই যে, প্রতিসন্ধান হইলেই অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে স্বপ্নদর্শনের স্মরণপ্রযুক্তই জাগ্রত ব্যক্তির যে বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হয়, তৎপ্রযুক্ত “স্বপ্নে বিষয়াভিমান মিথ্যা” এই নিশ্চয় জন্মে ।

উভয়ের অবিশেষ হইলে কিন্তু সাধনের আনর্থক্য হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাহার মতে স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার বিশেষ নাই, তাঁহার “স্বপ্নে বিষয়াভিমানের ন্যায়” এই সাধন অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তাঁহার আশ্রয়ের প্রত্যাখ্যান হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ঐ স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় যথার্থজ্ঞান একেবারেই স্বীকার করেন না।

তদভিন্ন পদার্থে “তাহা,” এইরূপ রূপব্যবসায় কিন্তু প্রধানাশ্রিত। তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ ভিন্ন স্থাণুতে “পুরুষ” এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জন্মে, তাহা প্রধানাশ্রিত। যে হেতু, পুরুষ অনুপলব্ধ হইলে অর্থাৎ কখনও বাস্তব পুরুষের যথার্থ প্রত্যক্ষ না হইলে পুরুষ ভিন্ন পদার্থে “পুরুষ” এইরূপ নিশ্চয় (ভ্রম) হয় না। এইরূপ হইলে “হস্তী দেখিয়াছিলাম,” “পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম” এইরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের নিশ্চয়ও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য [অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় প্রধান জ্ঞান। সুতরাং কোন স্থলে ঐ প্রধান জ্ঞান না হইলে তদ্বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়-নিশ্চয়ও তদ্বিষয়ে যথার্থজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হয় না]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে পরে এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের তুল্য। ভাষ্যকার সূত্রশেষে “পূর্ব্বোপলব্ধবিষয়ঃ” এই পদের পূরণ করিয়া মহর্ষির বুদ্ধিস্থ তুল্যতা বা সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার বিষয় পূর্ব্বে উপলব্ধ হইয়াছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ঐ পদের দ্বারা পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক, এই অর্থ বুঝা যায়। তাহা হইলে সূত্রশেষে ঐ পদের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বানুভূত পদার্থবিষয়ক, তদ্রূপ স্বপ্নে বিষয়াভিমান অর্থাৎ স্বপ্ননামক ভ্রমজ্ঞানও পূর্ব্বানুভূত-পদার্থবিষয়ক। ভাষ্যকার অত্ৰ “সংকল্প”কে মিথ্যা জ্ঞানবিশেষ বলিলেও এখানে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনারূপ ইচ্ছাবিশেষই যে “সংকল্প” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা তাঁহার সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রাণনারূপ সংকল্পই নিয়মতঃ পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক হইয়া থাকে। বুদ্ধিকার বিশ্বনাথ এখানে “সংকল্প” শব্দের দ্বারা জ্ঞানবিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ অর্থ প্রসিদ্ধ নহে। প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা সমুচিত নহে। জ্ঞানদর্শনে পূর্ব্বে আরও অনেক সূত্রে “সংকল্প” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বার্তিককার উদ্যোতকর তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকেই সংকল্প বলিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে ৩২৭—২৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ব্বানুভূত পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা তাহার সেই সমস্ত বিষয়ের অসত্তা সাধন করিতে পারে না, তদ্রূপ স্বপ্ন-

জ্ঞানও পূর্বানুভূত পদার্থবিষয়ক হওয়ায় উহা তাহার বিষয়ের অসত্তা সাধন করিতে পারে না। অর্থাৎ স্মৃতি ও সংকল্পের দ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ও অসৎ বা অলৌক হইতে পারে না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের পূর্বে ঐ বিষয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা সৎ পদার্থ, ইহা স্বীকার্য। স্বপ্নজ্ঞান কিরূপে পূর্বানুভূত-পদার্থবিষয়ক হয়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হইলে “স্বপ্নান্ত” অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরূপ স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থায় কর্তৃক দৃষ্টবিষয়কই হয়, ইহা স্বীকার্য। অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দেখিয়াছে বা জানিয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই বিষয় হওয়ায় উহা পূর্বানুভূত পদার্থবিষয়কই হইয়া থাকে। ভাষ্যে “দৃষ্টবিষয়শ্চ” এই স্থলে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। দৃষ্ট হইয়াছে বিষয় বাহার, এই অর্থে “দৃষ্টবিষয়” শব্দে বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। যদিও জাগ্রৎ ব্যক্তিই সেই বিষয়ের দ্রষ্টা, তথাপি তাহার জাগরিতাবস্থায় ঐ বিষয়ের দর্শন হওয়ায় তাহাতেই সেই বিষয়দর্শনের কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “জাগরিতাশ্চেন”। যাহা কর্তা নহে, কিন্তু কর্তার কার্যের সহায়, তাহাতেও প্রাচীনগণ অনেক স্থলে কর্তৃত্বের বিবক্ষা করিয়া সেইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অন্তর্গত ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ১৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে বুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্মৃষ্ট হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগরিত হইয়া “আমি ইহা দেখিয়াছিলাম” এইরূপে ঐ স্বপ্নদর্শন স্মরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে বিষয়ে স্বপ্নদর্শন হয়, সেই বিষয়টি পূর্বানুভূত না হইলে তদ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার না জন্মিলেও তদ্বিষয়ে স্বপ্নদর্শন এবং ঐ স্বপ্নদর্শনের পূর্বোক্তরূপে স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু যখন তদ্বিষয়ে স্বপ্নদর্শনের পূর্বোক্তরূপে স্মরণ হয় এবং ঐ স্মরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের দ্বারা সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও বিষয় হয়, তখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েও সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তদ্বিষয়ে পূর্বানুভবও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পূর্বানুভব সংস্কারের কারণ। অতএব স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলি যে জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট বা অনুভূত, ইহা স্বীকার্য। ভাষ্যকার এখানে “বঃ স্মৃষ্টঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত বুক্তিও স্মরণ করাইয়াছেন যে, একই আত্মা স্বপ্নদর্শন হইতে উহার স্মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইলে স্বপ্নদর্শনের স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণের দ্বারা যে চিরস্থায়ী এক আত্মা সিদ্ধ হয়, এবং অতীত জ্ঞানের স্মরণে যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই পদার্থত্রয়ই বিষয় হয়, ইহা ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূলকথা, স্বপ্নজ্ঞান পূর্বানুভূত পদার্থবিষয়ক। সুতরাং জাগরিতাবস্থায় যে বিষয় দৃষ্ট বা অনুভূত, সেই সৎপদার্থই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা অসৎ অর্থাৎ অলৌক নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বপ্নজ্ঞান অসদ্বিষয়ক হইলেই অসদ্বিষয়বস্তু হেতুর দ্বারা উহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু যদি উহা সদ্বিষয়কই হয়, তাহা হইলে উহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় কিরূপে হইবে? স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা ত উভয় পক্ষেই সম্ভব। ভাষ্যকার এই জন্য পরেই বলিয়াছেন যে, স্বপ্নদর্শনের পূর্বোক্তরূপে স্মরণ হইলেই জাগ্রৎ ব্যক্তির বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তিবশতঃ তাহার ঐ স্বপ্নজ্ঞান মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। অর্থাৎ তখন জাগ্রৎ ব্যক্তির এইরূপ বুদ্ধি-

বিশেষের উৎপত্তি হয় যে, আমি যে বিষয় দেখিয়াছিলাম, তাহা কিছুই এখানে নাই। এখানে অবিদ্যমান বিষয়েই আমার ঐ জ্ঞান হইয়াছে। তাই আমি এখানে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি করিতেছি না। এইরূপ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তাহার পূর্বজাত স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা নিশ্চয় হয়। কারণ, যে স্থানে যে বিষয় নাই, সেই স্থানে সেই বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রম। স্বপ্ন-দ্রষ্টা যে স্থানে নানা বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই স্থানে সেই সমস্ত বিষয়ের অভাবের বোধ হইলেই তাহার সেই পূর্বজাত স্বপ্নজ্ঞানের ভ্রমনিশ্চয় অবশ্যই হইবে। উহাতে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অলৌকিকজ্ঞান অনাবশ্যক। ফলকথা, স্বপ্নজ্ঞান অলৌকিকবিষয়ক নহে। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার নিকটে অবিদ্যমান পদার্থ উহাতে বিষয় হওয়ায় ঐ অর্থেই কোন কোন স্থানে উহাকে অসদ্বিষয়ক বলা হইয়াছে।

পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, স্বপ্নজ্ঞান পূর্বানুভূতবিষয়ক হইলেও তাহার বিষয়ের সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণ, আমাদের মতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। সুতরাং সমস্ত বাহ্য বিষয়ই অসৎ বা অলৌকিক। জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ের ভ্রমজ্ঞান হয়, তদ্বৎই ঐ সমস্ত বিষয়ে সংস্কার জন্মে। সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞানজন্ম অনাদি সংস্কারবশতঃই স্বপ্নজ্ঞান ও তাহার স্মরণ হয়। উহার জন্ম বিষয়ের সত্তা স্বীকার অনাবশ্যক। ভাষ্যকার এ জন্ম পরে পূর্বপক্ষবাদীর উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিতে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিতজ্ঞানের বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ ঐ উভয় জ্ঞানই ভ্রম হইলে পূর্বপক্ষবাদীর “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” এই দৃষ্টান্তবাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তিনি স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় কোন যথার্থ জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদী যখন যথার্থজ্ঞান একেবারেই মানেন ন', তখন তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। সুতরাং উহাও অলৌকিক। সুতরাং তাঁহার “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” এই যে সাধন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত মতের সাধক দৃষ্টান্তবাক্য, তাহা নিরর্থক। উহার কোন অর্থও নাই, উহার দ্বারা তাঁহার মতসিদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞানই জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা তাহা নহে, তাহাতে “তাহা” এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। যেমন স্থাপু (শাখা-পল্লবশূন্য বৃক্ষ) পুরুষ নহে, কিন্তু তাহাতে কোন সময়ে পুরুষ বলিয়া যে ভ্রম জন্মে, উহা পূর্বে বাস্তব পুরুষে যথার্থ পুরুষ-বুদ্ধিরূপ প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। কারণ, যে ব্যক্তি কখনও বাস্তব পুরুষ দেখে নাই, তাহার স্থাপুতে পুরুষ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। কারণ, স্থাপুর সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তখন তাহাতে বাস্তব পুরুষের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত সেই বাস্তব পুরুষের স্মরণ হয়। তাহার পরে “ইহা পুরুষ” এইরূপে স্থাপুতে পুরুষ-ভ্রম হয়। কিন্তু পূর্বে পুরুষবিষয়ক সংস্কার না থাকিলে তখন পুরুষের স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ ভ্রমও হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ ভ্রমজ্ঞানের নির্দাহের জন্ম ঐ স্থলে পুরুষবিষয়ক যে সংস্কার আবশ্যক, উহার জন্ম পূর্বে বাস্তব পুরুষবুদ্ধিরূপ যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক। স্থাপুতে পুরুষবুদ্ধি হইতে বাস্তব পুরুষে পুরুষবুদ্ধি প্রধান জ্ঞান, এবং উহা ব্যতীত ঐ ভ্রমজ্ঞান জন্মিতেই পারে না, এ জন্ম ভাষ্যকার ঐ ভ্রমজ্ঞানকে প্রধানাশ্রিত বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের যুক্তি সেখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮১—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, স্থাপুতে পুরুষ-বুদ্ধির শ্রায় সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই প্রধানাশ্রিত, ইহা স্বীকার্য।

ভাষ্যকার উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির যে, “হস্তী দেখিয়াছিলাম,” “পর্বত দেখিয়াছিলাম,” এইরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব-পক্ষবাদীর মতে স্বপ্নজ্ঞানের শ্রায় জাগরিতাবস্থার সমস্ত জ্ঞানও ভ্রম। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, যাহা স্বীকার না করিলে পূর্বপক্ষবাদীও স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না, সেই জ্ঞানও তাঁহার মতে ভ্রম বলিয়া উহাও প্রধানাশ্রিত অবশ্যই হইবে। তাঁহার মতে ঐ জ্ঞানেরও ভ্রমদ্ববশতঃ উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য হয়। তাই বলিয়াছেন,—“প্রধানাশ্রয়ো ভবিতুমর্হতি”। প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “প্রধানাশ্রয়” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় প্রধানাশ্রিত। মূলকথা, পূর্বোক্ত কারণে স্বপ্নজ্ঞানের আশ্রয় প্রধানজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে জাগরিতাবস্থায় যথার্থজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। সেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় সৎপদার্থই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান পূর্বানুভূত সৎপদার্থবিষয়কই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা পূর্বে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহা অসৎ অর্থাৎ অলীক হইতে পারে না। অলীক বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান কেহই স্বীকার করেন না, তাহা হইতেই পারে না। সুতরাং যথার্থ জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে তাহার বিষয়ের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত মত কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই আপত্তি হয় যে, যাহা পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, এমন অনেক বিষয়েও স্বপ্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও নানা বিচিত্র দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্নের বর্ণন দেখা যায়—যাহার অনেক বিষয়ই পূর্বানুভূত নহে। “ঐতরেয় আরণ্যকে”র তৃতীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে “অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশুতি, স এনং হস্তি, বরাহ এনং হস্তি” ইত্যাদি ঋতিবাক্যের দ্বারা মরণস্থচক দুঃস্বপ্ন ও তাহার শাস্তি কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে ত্রিভুটীর বিচিত্র স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রে আরও নানা স্থানে নানাবিধ স্বপ্ন ও তাহার ফলাদি বর্ণিত হইয়াছে। “বীরমিত্রোদয়” নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩৩৩-৪০ পৃষ্ঠা) ঐ সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। শাস্ত্রবর্ণিত ঐ সমস্ত স্বপ্নের সমস্ত বিষয়ই যে, স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্বানুভূত, ইহা বলা যাইবে না। পরন্তু স্বপ্নে কোন সময়ে নিজের মস্তক ভক্ষণ, মস্তক ছেদন এবং সূর্য্যধারণ, সূর্য্যভক্ষণাদি কত কত অননুভূত বিষয়েরও যে জ্ঞান জন্মে, তদ্বিষয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা বহু বহু প্রামাণিক ব্যক্তিই সাক্ষী আছেন। সুতরাং উহা অস্বীকার করা যাইবে না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্বোক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া তত্ত্বতরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিজের শিরশ্ছেদনাদি দর্শন স্থলেও ঐ জ্ঞানের বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঐ স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্বানুভূত। অর্থাৎ নিজের

মস্তক তাহার পূর্বানুভূত এবং ছেদনাদি ক্রিয়াও তাহার পূর্বানুভূত। অতএব ঐ ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধও তাহার পূর্বানুভূত। উহার মধ্যে কোন পদার্থই ঐ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির একেবারে অজ্ঞাত নহে। সেই ব্যক্তি নিজের মস্তকে ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধ কখনও না দেখিলেও উহা অতএব দেখিয়াছে। নিজ মস্তকে ঐ সম্বন্ধবোধই তাহার ভ্রম এবং ঐ ভ্রমই তাহার স্বপ্ন। উহাতে পূর্বে নিজ মস্তকে ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধবোধ অনাবশ্যক। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ মস্তকাদি পদার্থগুলির বোধ ও তজ্জন্ত সংস্কার আবশ্যক। কারণ, নিজ মস্তকাদি পদার্থ বিষয়ে কোন সংস্কার না থাকিলে ঐরূপ স্বপ্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও ছেদনক্রিয়া দেখে নাই অথবা তদ্বিষয়ে তাহার অত কোনরূপ জ্ঞানও নাই, সে ব্যক্তি স্বপ্নেও ছেদনক্রিয়াকে ছেদন বলিয়া বুঝিতে পারে না। ফলকথা, স্বপ্নজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ই পৃথক্ পৃথক্ রূপেও পূর্বানুভূত না হইলে তদ্বিষয়ে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞান সর্বত্রই সংস্কারজন্য। মহর্ষি গোতমও এই সূত্রে স্বপ্নজ্ঞানকে স্মৃতি ও সংকল্পের তুলা বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা তাঁহার মতে স্বপ্নজ্ঞান যে, স্মৃতি নহে, কিন্তু স্মৃতির ত্রায় সংস্কারবিশেষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও স্বপ্নজ্ঞানকে অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে একেবারে অননুভূত অপ্রসিদ্ধ পদার্থে সংস্কার না থাকায় অদৃষ্টবিশেষের প্রভাবেই স্বপ্নজ্ঞান জন্মে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন^১। কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই সূত্রানুসারে ত্রায়াচার্য্যগণ উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে স্বপ্নজ্ঞান সর্বত্রই সংস্কার-বিশেষজন্য, সূত্রাং সর্বত্রই পূর্বানুভূতবিষয়ক। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিলও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-মত খণ্ডন করিতে সর্বত্র স্বপ্নজ্ঞানকে পূর্বানুভূত বাহ্য পদার্থবিষয়ক বলিয়াই বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন^২। তিনি উহা সমর্থন করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বপ্নজ্ঞানের কোন বিষয় ইহা জন্মে অনুভূত না হইলেও পূর্বতন কোন জন্মে উহা অবশ্য অনুভূত। যে কোন জন্মে, যে কোন কালে, যে কোন দেশে অনুভূত বিষয়ই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় ইহা থাকে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও ইহাই

১। অতন্তাপ্রসিদ্ধেনু স্বতঃ পরতচ্চাপ্রতীতেষু চন্দ্রাদিত্যভক্ষাদিষু জ্ঞানং, তদদৃষ্টাদেন, অননুভূতেষু সংস্কারাভাবাৎ।
—“শ্রায়কন্দলী”, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

২। স্বপ্নাদিপ্রত্যয়ে বাহ্যং সর্বথা নহি নোপাতে। সর্বত্রালম্বনং বাহ্যং দেশকালানুগাংস্বকং ॥

জন্মন্তেকত্র ভিন্নে বা তথা কালান্তরেহপি বা। তদ্দেশো বাহ্যদেশো বা স্বপ্নজ্ঞানস্ত গোচরঃ ॥

—শ্লোকবার্তিক, “নিরালম্বনবাদ”, ১০৭—২।

কিমিতি নেমাতেহত আহ সর্বত্রোতি। বাহ্যমেব দেশান্তরে কালান্তরে বাহ্যনুভূতমেব স্বপ্নে স্মর্যমাণং দোষবশাৎ সন্নিহিতদেশকালবস্তুয়াবগম্যতেহতোহত্রাপি ন বাহ্যভাব ইতি। ননু অননুভূতমপি কচিৎ স্বপ্নেবগম্যতেহত আহ “জন্মনী”তি। অনন্তরদিবসানুভূতস্ত স্বপ্নে বর্ত্তমানবদবগমাৎ স্মৃতিরেব তাবৎ স্বপ্নজ্ঞানমিতি নিশ্চীয়তে, অতএবাপি স্মৃতি-মেব যুক্তং। ততশ্চাস্মিন্ জন্মনি অননুভূতস্তাপি স্বপ্নে দৃশ্যমানস্ত জন্মান্তরাদাবনুভবঃ কল্পাত ইতি।—পার্ব্যসারথি-মিশ্রকৃত টীকা।

সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশেষ এই যে, কুমারিলের মতে স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতিবিশেষ, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা পার্শ্বনার্থি মিশ্র ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তসূত্রানুসারে স্বপ্নদর্শনকে স্মৃতি বলিয়া, উহা যে, জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, স্মরণে উহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করা যায় না, ইহা বুঝাইয়াছেন^৩। স্মরণে তাহার মতেও স্বপ্নজ্ঞান যে, সর্বত্রই সংস্কারবিশেষজ্ঞ, স্মরণে পূর্বানুভূতবিষয়ক, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যাহা স্মৃতি, তাহা সংস্কার ব্যতীত জন্মে না। যে বিষয়ে যাহার সংস্কার নাই, তাহার তদ্বিষয়ে স্মরণ হয় না, ইহা সর্বদ্যমত। পূর্বানুভব ব্যতীতও সংস্কার জন্মিতে পারে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, স্মরণে পরে জাগরিত হইলে “আমি হস্তী দেখিয়াছিলাম,” “আমি পর্বত দেখিয়াছিলাম” ইত্যাদিরূপেই ঐ স্বপ্নদর্শনের নানস জ্ঞান জন্মে ; তদ্বারা বুঝা যায়, ঐ স্বপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষবিশেষ। উহা স্মৃতি হইলে আমি “হস্তী স্মরণ করিয়াছিলাম” ইত্যাদিরূপেই উহার জ্ঞান হইত। পরন্তু স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতি হইলে স্বপ্নস্থানে বিনর্ভবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মিথ্যা বিষয়ের সৃষ্টি ও উহার প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহাও বিচার্য্য। সে যাহাই হউক, ফলকথা, স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় যে, অলৌক নহে এবং সমস্ত স্বপ্নজ্ঞানই যে, পূর্বানুভূত-বাহ্যপদার্থবিষয়ক, ইহা ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিও সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ সমস্ত বাহ্য বিষয় সম্ভব না হইলেও অসম্ভব নহে। কারণ, অসম্ভব বা অলৌক পদার্থের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলি পূর্বানুভূত, ইহা স্বীকার্য্য হইলে তদ-দৃষ্টান্তে প্রমাণ ও প্রমেরকে অসম্ভব বা অলৌক বলা যায় না। কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়গুলিও অলৌক নহে। তাহা পূর্বানুভূত, তাহা অলৌক হইতে পারে না, ইহাই এখানে নর্থার মূল তাৎপর্য্য ॥৩৩॥

ভাষ্য। এক্ষণে সতি—

সূত্র। মিথ্যোপলব্ধির্নাশস্তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ স্বপ্নবিষয়াভি-
মানপ্রণাশবৎ প্রতিবোধে ॥৩৫॥৪৪৫॥

অনুবাদ। এইরূপ হইলেই অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রধানাশ্রিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়—যেমন জাগরণ হইলে স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের বিনাশ হয়।

ভাষ্য। স্থাণৌ পুরুষোহয়মিতি ব্যবসায়ো মিথ্যোপলব্ধিঃ—অতস্মিৎ-
স্তদ্বিত্তি জ্ঞানং। স্থাণৌ স্থাণুরিতি ব্যবসায়স্তত্ত্বজ্ঞানং। তত্ত্ব-জ্ঞানেন চ

৩। “বেদস্পীষ্ট ন স্বপ্নদিনঃ” (বেদান্তসূত্র, ২.২.২৯)। অপিচ স্মৃতিযোগে সম স্বপ্নদর্শনং উপলব্ধিস্ত জাগরিত-
জ্ঞানং, স্মৃত্যুপলব্ধোচ্চ প্রত্যক্ষমন্তরং অসম্ভবভূতং” ইত্যাদি শারদারকভাষ্য।

মিথ্যোপলব্ধিনিবর্ত্যতে,—নার্থঃ স্বাপ্নুপুরুষসামান্যগন্ধঃ । যথা প্রতি-
বোধে যা জ্ঞানবৃত্তিস্তয়া স্বপ্নবিষয়াভিমানো নিবর্ত্যতে,—নার্থো বিষয়-
সামান্যলক্ষণঃ । তথা মায়া-গন্ধর্ব্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকানাংপি যা বুদ্ধয়োহতস্মিং-
স্তদিত্যি ব্যবসায়ান্ত্রাপ্যনেনৈব কল্পেন মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ত্ব-জ্ঞানা-
ন্নার্থ-প্রতিষেধ ইতি ।

উপাদানবচ্চ মায়াদিষু মিথ্যাজ্ঞানং । প্রজ্ঞাপনীয়সরূপঞ্চ দ্রব্য-
মুপাদায় সাধনবান্ পরস্য মিথ্যাধ্যবসায়ং কৰোতি—সা মায়া । নীহার-
প্রভৃतीনাং নগর-রূপসন্নিবেশে দূরান্নগরবুদ্ধিরুৎপদ্যতে,—বিপর্য্যয়ে
তদভাবাৎ । সূর্য্যমরীচিষু ভৌমেনোগ্রাণা সংস্রষ্টেষু স্পন্দমানেষু দকবুদ্ধি-
র্ভবতি, সামান্যগ্রহণাৎ । অন্তিকস্থস্থ বিপর্য্যয়ে তদভাবাৎ । কচিৎ
কদাচিৎ কস্মচিচ্চ ভাবান্নানিগিতং মিথ্যাজ্ঞানং !

দৃষ্টঞ্চ বুদ্ধির্নৈতং মায়াপ্রয়োক্তুঃ পরস্ত চ, দূরান্তিকস্থযোগন্ধর্ব্বনগর-
মৃগতৃষ্ণিকাস্থ,—স্বপ্তপ্রতিবুদ্ধয়োশ্চ স্বপ্নবিষয়ে । তদেতৎ সর্ব্বস্তাভাবে
নিরুপাখ্যাতায়াং নিরাত্মকত্বে নোপপদ্যত ইতি ।

অনুবাদ । স্বাপ্নুতে “ইহা পুরুষ” এইরূপ নিশ্চয় মিথ্যাজ্ঞান (অর্থাৎ) তদভিন্ন
পদার্থে “তাহা” এইরূপ জ্ঞান । স্বাপ্নুতে ইহা “স্বাপ্নু”—এইরূপ নিশ্চয় তত্ত্বজ্ঞান ।
কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্ত্বক মিথ্যাজ্ঞান নিবর্ত্তিত হয়, স্বাপ্নু ও পুরুষসামান্যরূপ পদার্থ নিবর্ত্তিত
হয় না । যেমন জাগরণ হইলে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তৎকর্ত্ত্বক স্বপ্নে বিষয়ভ্রম
নিবর্ত্তিত হয়, বিষয়সামান্যরূপ পদার্থ নিবর্ত্তিত হয় না, অর্থাৎ জাগ্রৎ ব্যক্তির জ্ঞানের
দ্বারা স্বপ্নবিষয় পদার্থের অভাব বা অলোক হই দিষ্ট হয় না । তদ্রূপ মায়া, গন্ধর্ব্বনগর
ও মৃগতৃষ্ণিকার সম্বন্ধেও তদভিন্ন পদার্থে “তাহা” এইরূপ নিশ্চয়াত্মক যে সমস্ত বুদ্ধি
জন্মে, সেই সমস্ত স্থলেও এই প্রকারেই তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়,
পদার্থের অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভ্রমবিষয় পদার্থসমূহের অভাব হয় না ।

পরন্তু মায়া প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাজ্ঞান উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিগিতবিশেষজ্ঞা ।
যথা—“সাধনবান্” অর্থাৎ মায়া প্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মায়িক ব্যক্তি “প্রজ্ঞাপনীয়
সরূপ” অর্থাৎ যাহা দেখাইবে, তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের মিথ্যা
অধ্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জন্মায়,—তাহা মায়া । নীহার প্রভৃতির নগররূপে
সন্নিবেশ হইলে অর্থাৎ আকাশে হিম বা মেঘাদি গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সন্নিবিষ্ট হইলেই

দূর হইতে নগরবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেহেতু “বিপর্য্যয়ে” অর্থাৎ আকাশে নৌহারাতির নগররূপে সন্নিবেশ না হইলে সেই নগরবুদ্ধি হয় না। সূর্য্যাকিরণ ভৌম উন্মাদ কৰ্ণক সংস্পর্শ হইয়া স্পন্দনবিশিষ্ট হইলেই সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষবশতঃ (তাহাতে) জলবুদ্ধি জন্মে। যে হেতু নিকটস্থ ব্যক্তির “বিপর্য্যয়”প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাব-বশতঃ সেই জলভ্রম হয় না। (ফলিতার্থ) কোন স্থানে, কোন কালে, কোন ব্যক্তি-বিশেষেরই “ভাব” অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় ভ্রমজ্ঞান নির্নিমিত্তক নহে অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজ্ঞ।

পরন্তু মায়াপ্রয়োগকারী ব্যক্তি এবং অপর অর্থাৎ মায়ানভিজ্ঞ দ্রষ্টা ব্যক্তির বুদ্ধির ভেদ দেখা যায়। দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকা বিষয়ে এবং স্তম্ভ ও প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নবিষয়ে বুদ্ধির ভেদ দেখা যায়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিদৈত, সকল পদার্থের অভাব হইলে (অর্থাৎ) নিরূপাখ্যাতা বা নিঃস্বরূপতা হইলে উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অলৌকিক হইলে সকলেরই একরূপই বুদ্ধি জন্মিবে, বিভিন্নরূপ বুদ্ধি জন্মিতে পারে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ভ্রমজ্ঞানের বিপরীত যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান স্বীকার করিলে তদ্বারাও পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলির অলৌকিক প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তখন বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলি নাই, উহা থাকিলে কখনই ভ্রমজ্ঞান হইত না; সুতরাং উহা অলৌকিক। মহর্ষি এ জন্য পরে এই শব্দের দ্বারা সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন জাগরণ হইলে স্বপ্ন বিষয়ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্রই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলৌকিক প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, স্থাগুতে পুরুষবুদ্ধি, পুরুষভিন্ন পদার্থে পুরুষবুদ্ধি, সুতরাং উহা মিথ্যা উপলব্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। এবং স্থাগুতে স্থাগুবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান। ঐ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই পূর্ব্বজাত স্থাগুতে পুরুষবুদ্ধিরূপ ভ্রমজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু স্থাগু ও পুরুষরূপ পদার্থদামান্য অর্থাৎ সামান্যতঃ সমস্ত স্থাগু ও সমস্ত পুরুষ পদার্থের নিবৃত্তি বা অভাব হয় না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলৌকিক প্রতিপন্ন হয় না। যেমন জাগরণ হইলে তখন যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তজ্জন্য স্বপ্নকালীন বিষয়ভ্রমেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ স্বপ্নের বিষয়-সামান্যের নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ তদ্বারা স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়ের অলৌকিক প্রতিপন্ন হয় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই শব্দোক্ত দৃষ্টান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে এই শব্দের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত “মায়াগন্ধর্ব্বনগরমৃগতৃকিকাদা” (৩২শ) এই শব্দোক্ত দৃষ্টান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তদ্রূপ অর্থাৎ স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকাস্থলেও যে সমস্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই

নিবৃত্তি হয়, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সেই সমস্ত পদার্থের অভাব হয় না। অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থলে পরে তত্ত্বজ্ঞান হইলে তদ্বারা বিষয়ের অলৌকিক প্রতিপন্ন হয় না। তত্ত্বজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের বিরোধী নহে। সুতরাং উহা ভ্রমজ্ঞানেরই নিবর্তক হয়, বিষয়ের নিবর্তক হয় না। ভ্রমজ্ঞানের ঐ সমস্ত বিষয় সেই স্থানে বিদ্যমান না থাকাতাই ঐ জ্ঞান ভ্রম। কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় একেবারে অসৎ বা অলৌকিক নহে। অলৌকিক হইলে তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। কারণ, “অসৎখ্যাতি” স্বীকার করা যায় না। পরন্তু অলৌকিক হইলে তদ্বিষয়ে যথার্থ-জ্ঞান অসম্ভব। যথার্থজ্ঞান ব্যতীতও ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিষয়সমূহ যথার্থ জ্ঞানেরও বিষয় হওয়ায় উহা কোন মতেই অলৌকিক হইতে পারে না। অসৎখ্যাতিবাদীর কথা পরে পাওয়া যাইবে।

পূর্বোক্ত “মায়াগুরুনগর” ইত্যাদি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানকেও মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে যে, অসৎ বা অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না, ইহা সমর্গন করিতে ভাষ্যকার পরে নিজে বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, মায়া প্রভৃতি স্থলে যে মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম জন্মে, তাহা উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজ্ঞ। “উপাদান” শব্দের দ্বারা যে, এখানে নিমিত্তবিশেষই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহা তাঁহার উপসংহারে “নানিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানং” এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। নিমিত্তবিশেষ বা সামগ্রীবিশেষ অর্থেও “উপাদান” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাষ্যকারের যুক্তি এই যে, মায়া প্রভৃতি স্থলে যেমন নিমিত্তবিশেষজ্ঞাই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হইলেও উহাও কোন নিমিত্তবিশেষজ্ঞাই হইবে। কিন্তু সর্বত্র প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান স্থলে ভ্রমজনক ঐরূপ কোন নিমিত্তবিশেষ নাই। অতএব সর্বত্রই প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না।

ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে মায়া, গুরুনগর ও মরীচিকাস্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তবিশেষজ্ঞ, ইহা বুঝাইবার জ্ঞ প্রথমে “মায়া”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মায়িক ব্যক্তি দ্রষ্টাদিগকে যাহা দেখাইবে, তাহার সদৃশাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহাই মায়া। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ স্থলে মায়িক ব্যক্তি অপরের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, ঐ ভ্রমজ্ঞানকে তিনি “মায়া” বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐন্দ্রজালিক-ভ্রম-জ্ঞানবিশেষও যে, “মায়া” শব্দের দ্বারা পূর্বকালে কথিত হইয়াছে, ইহা “অভিজ্ঞানশকুন্তল” নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহাকবি কালিদাসের “স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও বুঝা যায়। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি অপরের ভ্রম উৎপাদন করিতে যে মন্ত্রাদির প্রয়োগ করে, উহাও যে, “মায়া” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও পরে ভাষ্যকারের “মায়াপ্রয়োকুঃ” এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। “মায়া” শব্দের দন্ত, দদ্যা, কাপট্য প্রভৃতি আরও বহু অর্থ আছে। শক্রজয়ের জ্ঞ রাজার আশ্রয়ণীয় শাস্ত্রোক্ত সপ্তবিধ উপায়ের মধ্যে “মায়া” ও ইন্দ্রজাল পৃথকরূপে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “মায়া” কাপট্যবিশেষ। উহাতে মন্ত্রতন্ত্রাদির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইন্দ্রজালে মন্ত্রতন্ত্রাদির আবশ্যকতা আছে। “বীর-

মিত্রোদয়” নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩০৪—৬ পৃষ্ঠায়) শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা ইহা বর্ণিত হইয়াছে। “দত্তাত্রেয়তন্ত্রে” মন্ত্রবিশেষসদ্য ইন্দ্রজালের সবিস্তর বর্ণন আছে। “ইন্দ্রজাল তন্ত্রে” ওষধিবিশেষসদ্য ইন্দ্রজালেরও বর্ণন হইয়াছে। কপটতা অর্থও “মায়ী” শব্দের প্রয়োগ আছে। এই অব্যয়ের প্রথম আক্ষিকের তৃতীয় স্তরের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—“পর-বধনেচ্ছা মায়ী”। এইরূপ শম্বরাসুরের “মায়ী”ও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এ জন্ত মায়ার একটা নাম “শাম্বরী”। শম্বরাসুর হিরণ্যকশিপুব আদেশে প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্ত মায়ী সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বালক প্রহ্লাদের দেহ রক্ষার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর সূদর্শন চক্রকর্তৃক শম্বরাসুরের সহস্র মায়ী এক একটী করিয়া খণ্ডিত হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে^১। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৫৫শ অধ্যায়েও শম্বরাসুরের মায়ীশতবিজ্ঞতা এবং মায়ীকে আশ্রয় করিয়া প্রহ্লাদের প্রতি অস্ত্র নিঃক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে^২। তদ্বারা ঐ মায়ী যে শম্বরাসুরের অস্ত্রবিশেষ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ শাস্ত্রাদিগ্রন্থে অনেক স্থলে মায়ার কার্য্যকেও মায়ী বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের বচনেও শম্বরাসুরের মায়ীসৃষ্ট অস্ত্রসহস্রকেই “মায়ীসহস্র” বলা হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু তদ্বারা অস্ত্রাদির অস্ত্রবিশেষই “মায়ী” শব্দের বাচ্য, ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। পরন্তু আসুরী মায়ার ত্রায়ী রাক্ষসী মায়ীও “মায়ী” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে মুগন্ধপদারী রাক্ষস মারীচকে “মায়ীমৃগ” বলা হইয়াছে^৩। কিন্তু মারীচের মায়ী ও উহার কার্য্য তাহার কোন অস্ত্রবিশেষ নহে। রামায়ণের মতে মারীচের মায়ী কি, তাহা “সর্বদর্শন-সংগ্রহে” মাধবাচার্য্যও কিছু বলেন নাই। এইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষও বেদাদি শাস্ত্রে “মায়ী” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। পূর্বাচার্য্যগণ সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—“অঘটনঘটন-

১। তত্ত্ব স সহস্রৈ মায়ীং প্রহ্লাদে শম্বরে, ৫৫শঃ। বিনাশমিচ্ছন্ চক্রক্ক্ষিঃ সর্বত্র সন্দর্শনি ॥

তেন মায়ীসহস্রঃ তৎ শম্বরস্তা শ্রীমনিঃ। বাহ্যস্ত রক্ষতা দেহেনৈকেকাশ্চন সৃজতঃ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ১৯শ অধ্যায়, ১৭২০ ॥

„সর্বদর্শনসংগ্রহে” রামায়ণদর্শনে মাধবাচার্য্য “তেন মায়ীসহস্রং” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রামায়ণের মত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টিসমর্থ পাদনার্থক অস্ত্রাদির অস্ত্রবিশেষই “মায়ী” শব্দের বাচ্য, ইহা উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ শম্বরাসুর যে অবাস্তব মায়ী স্বীকার করিয়াছেন, তাহা “মায়ী” শব্দের বাচ্য নহে। শ্রীভাস্যও বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উহার চতুর্থ পাদে “একৈকশ্চেন” এইরূপ পাঠই প্রকৃত। বঙ্গবাসী সংস্করণের বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ পাঠই মুদ্রিত হইয়াছে। আধুনিক শ্রীভাস্যদি কোন কোন পুস্তকে “একৈক্যাং-শেন” এইরূপ কর্ত্ত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। ত্রায়ীস্বত্রেও “একৈকশ্চেন” এইরূপ প্রয়োগ আছে। উহার অর্থাদি বিষয়ে আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে ১৬০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

২। স চ মায়ীং সমাপ্তিঃ দেবেভ্যঃ ময়দর্শনঃ। নুমুচেহস্তময়ং বর্ষং কার্ণবী বৈছায়সোহস্তমঃ ॥ ১০ম। ৫৫শ অঃ, ২১শ শ্লোক।

৩। মায়ীমৃগং দম্বিতয়েপ্সিতমম্বদাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দঃ ॥—১১শ স্কন্ধ, ৫ম অঃ, ৩৪শ শ্লোক।

পটায়নী ঈশ্বরী শক্তিস্মায়া”। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের মতে ঐ মায়া মিথ্যা বা অনির্বচনীয়। উহাই জগতের মিথ্যা সৃষ্টির মূল। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “শ্রায়কুসুমাজলি”র প্রথম স্তবকের শেষ-শ্লোকে শ্রায়মতানুসারে বলিয়াছেন যে, জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিই শাস্ত্রে পরমেশ্বরের “মায়া” বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা পরমেশ্বরের সৃষ্টাদিকার্য্যে তাঁহার সহকারি-শক্তি অর্থাৎ সহকারি-কারণ। পরমেশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়াই তদনুসারে সৃষ্টাদি কার্য্য করেন। ঐ অদৃষ্টসমষ্টি অতিদুর্ব্বোধ বলিয়া উহার নাম “মায়া” অর্থাৎ মায়ায় সদৃশ বলিয়াই উহাকে মায়া বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়া ছরতয়া” ইত্যাদি বহু শ্লোকে এবং শাস্ত্রে আরও বহু স্থলে যে, জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিই “মায়া” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা বহুবিবাদগ্রস্ত। উদয়নাচার্য্য কুসুমাজলির দ্বিতীয় স্তবকের শেষ শ্লোকেও বলিয়াছেন, “মায়াবশাং সংহরন্”। এবং পরমেশ্বর ইন্দ্রজ্ঞানের শ্রায় জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করতঃ ক্রীড়া করিতেছেন, ইহাও ঐ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা অনুসারে তাঁহার প্রযুক্ত “মায়া” শব্দের দ্বারা জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিই বুঝিতে হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় শ্লোকে “মায়াবৎ সমগ্রাদয়ঃ” এই চতুর্থ পাদে যে মায়াকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ঐন্দ্রজালিক বা বাজীকরের মায়া, ইহা তাঁহার নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত “মায়াগন্ধর্ক” ইত্যাদি শ্রুতানুসারে ভাষ্যকারও এখানে সেই মায়ারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাজীকর যে দ্রব্য দেখাইবে, তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রাদির সাহায্যে দৃষ্টাদিগের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, উহা যেমন মায়া, তদ্রূপ ঐ স্থলে তাহার প্রযোজ্য মন্ত্রাদিও তাহার “মায়া” বলিয়া কথিত হয়, ইহা পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে “মায়া”র ব্যাখ্যা করিয়া ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তবিশেষজ্ঞত্ব, ইহা বুঝাইয়াছেন। মায়া প্রয়োগ-কারীর মন্ত্রাদি সাধন এবং দ্রব্যবিশেষের গ্রহণ ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত। কারণ, উহা ব্যতীত ঐ ভ্রম উৎপন্ন করা যায় না। ভাষ্যকার পরে গন্ধর্ব্বনগর-ভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজ্ঞত্ব, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, নীহার প্রভৃতির নগররূপে সন্নিবেশ হইলেই দূর হইতে নগরবুদ্ধি জন্মে, নচেৎ ঐ নগরবুদ্ধি জন্মে না। অর্থাৎ আকাশে হিম বা মেঘ নগরাকারে সন্নিবিষ্ট হইলে দূরস্থ ব্যক্তি তাদৃশ হিমাদিকেই গন্ধর্ব্বনগর বলিয়া ভ্রম করে। ঐ স্থলে হিমাতির নগরাকারে সন্নিবেশ ও দৃষ্টার দূরত্ব তাই ভ্রমের নিমিত্ত। দ্রষ্টা আকাশস্থ ঐ হিমাতির নিকটস্থ হইলে তখন তাহার ঐ ভ্রম জন্মে না। ভাষ্যকার এখানে সামান্যতঃ নগরবুদ্ধি বলিলেও গন্ধর্ব্বনগরবুদ্ধিই তাঁহার বিবক্ষিত। কোন সময়ে আকাশমণ্ডলে উদ্ভিত অনিষ্টসূচক নগরকে গন্ধর্ব্বনগর ও “খপুর” বলা হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতার ৩৬শ অধ্যায়ে উহার বিবরণ আছে। গন্ধর্ব্বদিগের নগরও গন্ধর্ব্বনগর নামে কথিত হইয়াছে। মহাভারতের সভাপর্বে ১৭শ অধ্যায়ে উহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আকাশে ঐ গন্ধর্ব্ব-নগর বা অথ কোন নগরই বস্তুতঃ নাই। পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তবশতঃই আকাশে গন্ধর্ব্বনগর ভ্রম হইয়া থাকে। ভট্ট কুমারিল গন্ধর্ব্বনগর ভ্রমস্থলে মেঘ ও পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহাদিকে এবং মরীচিকায় জল-ভ্রম স্থলে পূর্ব্বানুভূত জলাদিকে নিমিত্ত বলিয়া ঐ সমস্ত বাহ্য বিষয়কেই ঐ সমস্ত ভ্রমের বিষয়

বলিয়াছেন'। ভাষ্যকার পরে মরীচিকায় জলভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজ্ঞ, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, সূর্য্যাকিরণসমূহ ভৌম উদ্যার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া স্পন্দনবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জলের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষবশতঃ দূরস্থ ব্যক্তির জলভ্রম হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মরুভূমিতে সূর্য্যাকিরণ পতিত হইলে উহা সেই মরুভূমি হইতে উদ্গত উৎকট উদ্যার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া চঞ্চল জলের ত্রায় স্পন্দিত হয়। ঐ সময়ে তাহাতে দূরস্থ যুগাদির জলের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষবশতঃ সেই সূর্য্যাকিরণেই জল বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু নিকটস্থ ব্যক্তির ঐ ভ্রম হয় না। সুতরাং দূরত্বও যে সেখানে ঐ ভ্রমের নিমিত্তবিশেষ, ইহা স্বীকার্য্য। এবং মরুভূমিতে পূর্ব্বোক্তরূপ সূর্য্যাকিরণও ঐ ভ্রমের নিমিত্তবিশেষ। কারণ, ঐরূপ সূর্য্যাকিরণ ব্যতীত যে কোন সূর্য্যাকিরণে দূর হইতেও জলভ্রম হয় না। অতএব মায়াদি স্থলে ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান যে, নিমিত্তবিশেষজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার শেষে সার যুক্তি প্রকাশ করিয়া ফলিতার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন স্থানে কোন কালে কোন ব্যক্তিবিশেষেরই যখন ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই উহা জন্মে না, তখন ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান নির্নিমিত্তক নহে, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ঐ সমস্ত নিমিত্তবিশেষের কোন অপেক্ষা না থাকিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহা স্বীকার করেন না। অতএব ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে ঐ সমস্ত নিমিত্তবিশেষের কারণত্ব স্বীকার করিতে তিনিও বাধ্য। তাহা হইলে নিমিত্তের অভাবে সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তির ঐ সমস্ত ভ্রম জন্মে না, ইহা তিনিও বলিতে পারেন। কিন্তু ঐ সমস্ত নিমিত্তের সত্তা অস্বীকার করিয়া সর্ব্বত্র সমস্ত বিষয়ের অসত্তা বা অলীকত্ববশতঃ সকল জ্ঞানেরই ভ্রমত্ব সমর্থন করিতে গেলে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল ব্যক্তিরই মায়াদিস্থলীয় সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান কেন জন্মে না, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। অতএব ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত নিমিত্তের সত্তা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে মায়াদি দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয়ের অসত্তা বা অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। কারণ, মায়াদি স্থলের ত্রায় সর্ব্বত্র সমস্ত ভ্রমেরই নিমিত্তবিশেষ তাঁহারও অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সমস্ত পদার্থই অসৎ বা অলীক, ইহা বলা যায় না। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রমও বলা যায় না। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ মত তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে শেষে তাঁহার চরমযুক্তি বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগকারী এবং মায়ানভিজ্ঞ দর্শক ব্যক্তির বুদ্ধির ভেদ দেখাও যায়। অর্থাৎ মায়াপ্রয়োগকারী ঐন্দ্রজালিক বা বাজীকর মায়াপ্রভাবে যে সমস্ত দ্রব্য দেখাইয়া থাকে, ঐ সমস্ত দ্রব্য অসত্য বলিয়াই তাহার জ্ঞান হয়। কিন্তু মায়ানভিজ্ঞ দর্শক উহা সত্য বলিয়াই তখন বুঝে। অর্থাৎ ঐ স্থলে ঐন্দ্রজালিকের

১। গন্ধর্ব্বনগরেহজাশি পুন্সদৃষ্টঃ গৃহাদি চ।

পূর্ব্বানুভূত-তোয়ঞ্চ রশ্মিতপ্তোদরং তথা ॥

যুগাতোদয় বিজ্ঞানে কারণেইন ধর্ম্মতঃ ॥—জ্যোতির্বাগিনী, “নির্গলদর্শনবাদ,” ১১০—১১।

নিজের দর্শন তৎকালেই বাধজ্ঞানবিশিষ্ট, দর্শকদিগের দর্শন তৎকালে বাধজ্ঞানশূন্য। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ উভয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান একরূপ নহে। এইরূপ দূরস্থ ব্যক্তির আকাশে যে, গন্ধর্জনগর ভ্রম হয়, এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, তাহা নিকটস্থ ব্যক্তির হয় না। নিকটস্থ ব্যক্তি উহা অসত্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞানও একরূপ নহে। কারণ, ঐ স্থলে দূরস্থ ব্যক্তির জ্ঞান হইতে নিকটস্থ ব্যক্তির জ্ঞান বিপরীত। এইরূপ সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নরূপ যে জ্ঞান জন্মে, ঐ ব্যক্তি জাগরিত হইলে তখন তাহার স্বপ্নের বিষয়সমূহে সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কারণ, স্বপ্নকালে যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, জাগরণের পরে উহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। অতএব ঐ ব্যক্তির বিভিন্নকালীন জ্ঞান একরূপ নহে। কারণ, উহা বিপরীত জ্ঞান। ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল পদার্থের অভাব হইলে অর্থাৎ সকল পদার্থই নিরূপাখ্য বা নিঃস্বরূপ হইলে পূর্বোক্ত বুদ্ধিভেদের উপপত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যদি সকল পদার্থই অলীক হয়, কোন পদার্থেরই স্বরূপ বা সত্তা না থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে কাহারই জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞান স্বীকার করিলেও সকল ব্যক্তিরই একরূপই জ্ঞান হইবে। কারণ, যাহা অলীক, তাহা সকলের পক্ষেই অলীক। তাহা কোন কালে কোন স্থানে কোন ব্যক্তি সত্য বলিয়া বুঝিবে এবং কোন ব্যক্তি তাহা অনন্ত বলিয়া বুঝিবে, ইহার কোন হেতু নাই। হেতু স্বীকার করিলে আর সকল পদার্থই অলীক বলা যাইবে না। হেতু স্বীকার করিয়া উহাকেও অলীক বলিলে ঐ হেতু কোন কার্য্যকারী হয় না। কারণ, যাহা গগনকুসুমবৎ অলীক, তাহা কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। কার্য্যকারী বলিয়া স্বীকার করিলেও সবলের পক্ষেই সমান কার্য্যকারী হইবে। ফলকথা, পূর্বপক্ষবাদের মতে পূর্বোক্ত মায়াদি স্থলে বুদ্ধিভেদের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার “সর্বস্বাভাবে” এই কথা বলিয়া ঐ “অভাবে” এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,— “নিরূপাখ্যতায়াং”। পরে উহারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,— “নিরাশ্রকত্বে”। সকল পদার্থের অভাব অর্থাৎ নিরূপাখ্যতা। “নিরূপাখ্যতা” শব্দের অর্থ “নিরাশ্রকত্ব” অর্থাৎ নিঃস্বরূপতা। সকল পদার্থই নিঃস্বরূপ, ইহা বলিলে সকল পদার্থই অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অলীক, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত সর্বস্বাভাববাদীই যে, এখানে তাঁহার অভিমত পূর্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটিকার পূর্বোক্ত “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি (৩১শ) পূর্বপক্ষসূত্রের অবতারণায় বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্বপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককারও পূর্বে বিশেষ বিচারপূর্বক বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তিনি যে, এখানে বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধ যে ভাবে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় না, তাঁহারা জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জ্ঞেয় স্বীকার করেন নাই। জ্ঞানই তাঁহাদিগের মতে জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থ নিরাশ্রক বা নিঃস্বরূপ নহে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৫॥

সূত্র । বুদ্ধৈশ্চবৎ নিমিত্তসম্ভাবোপলম্বাৎ ॥৩৬॥৪৪৬॥

অনুবাদ । এইরূপ বুদ্ধিরও অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের শ্রীম ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা আছে, যেহেতু (ভ্রমজ্ঞানের) নিমিত্ত ও সম্ভাব উপলব্ধি হয় ।

ভাষ্য । মিথ্যাবুদ্ধৈশ্চার্থবদপ্রতিষেধঃ । কস্মাৎ ? নিমিত্তোপলম্বাৎ সম্ভাবোপলম্বাচ্চ । উপলভ্যাতে হি মিথ্যাবুদ্ধিনিমিত্তং, মিথ্যাবুদ্ধিচ্চ প্রত্যাক্সমুৎপন্নং গৃহ্যতে, সংবেদ্যত্বাৎ । তস্মাৎ মিথ্যাবুদ্ধিরপ্যস্তীতি ।

অনুবাদ । ভ্রমজ্ঞানেরও “অর্থে”র শ্রীম অর্থাৎ উহার বিষয়ের শ্রীম প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ সত্তা আছে । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) নিমিত্তের উপলব্ধিবশতঃ এবং সম্ভাব উপলব্ধিবশতঃ । বিশদার্থ এই যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত উপলব্ধ হয় এবং ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়, কারণ, (ভ্রমজ্ঞানের) “সংবেদ্যত্ব” অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব আছে । অতএব ভ্রমজ্ঞানও আছে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বোক্ত (৩৩৩৪৩৫) তিন সূত্রের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিয়া, এখন ঐ ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা সমর্থন করিতে এবং তদ্বারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের শ্রীম ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা আছে । ভাষ্যকার মহর্ষির বিবক্ষারূপারে এখানে সূত্রোক্ত “বুদ্ধি” শব্দের দ্বারা মিথ্যা বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং “অপ্রতিষেধঃ” এই পদের অধ্যাহার করিয়া প্রথমে মহর্ষির সাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন । “প্রতিষেধ” বলিতে অভাব অর্থাৎ অসত্তা । সুতরাং “অপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা অসত্তার বিপরীত সত্তা বুঝা যায় । বার্তিককার উদ্যোতকের উদ্ধৃত সূত্রের শেষে “অপ্রতিষেধঃ” এই পদের উল্লেখ দেখা যায় । কিন্তু “শ্রীমসূচীনিবন্ধা”দি গ্রন্থে “বুদ্ধৈশ্চবৎ নিমিত্তসম্ভাবোপলম্বাৎ” এই পর্য্যন্তই সূত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে । মহর্ষি ভ্রমজ্ঞানের সত্তা সাধনের জন্ত হেতুবাক্য বলিয়াছেন “নিমিত্তসম্ভাবোপলম্বাৎ” । দ্বন্দ্ব সমাসের পরে প্রযুক্ত “উপলম্বাৎ” শব্দের “নিমিত্ত” শব্দ ও “সম্ভাব” শব্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায়—নিমিত্তের উপলব্ধি এবং সম্ভাবের উপলব্ধি । “সম্ভাব” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সত্তার অসাধারণ ধর্ম সত্তা । ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ হেতুবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্তের উপলব্ধি হয় এবং ঐ ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয় । কারণ, উহা সংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় । তাৎপর্য্য এই যে, ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রত্যেক আত্মাই মনের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করে । কারণ, ভ্রমজ্ঞানেরও মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহাও জ্ঞেয় । সর্বত্র ভ্রম বলিয়া উহার বোধ না হইলেও উহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অবশ্যই হয় ।

সুতরাং উহার সত্তার উপলব্ধি হওয়ায় উহারও অস্তিত্ব আছে। এবং উহার নিমিত্তের উপলব্ধি-প্রযুক্তও উহার সত্তা স্বীকার্য। কারণ, যাহার নিমিত্ত আছে, তাহা অসৎ হইতে পারে না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সাংগত্য দর্শন, বিশেষের অদর্শন এবং অবিদ্যমান কোন বিশেষের আরোপ, ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত। ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিলে উহার নিমিত্তও স্বীকার করিতেই হইবে। নিমিত্ত স্বীকার করিলে জ্ঞানের বিষয় পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত নিমিত্তও উপলব্ধির বিষয় হয়, এবং উহা ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না। অতএব যিনি ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন, তিনি উপলব্ধির বিষয় ঐ সমস্ত নিমিত্ত স্বীকার করিতেও বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর সকল বিষয়কেই অসৎ বলিতে পারেন না।

উদ্যোতকর এই ভাবে সূত্রকারের তাৎপর্য বর্ণন করিলেও তাৎপর্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, শূন্যবাদী যে মাধ্যমিক ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া বাহ্য পদার্থের অসত্তা সমর্থনপূর্বক পরে ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারাই জ্ঞানেরও অসত্তা সমর্থন করিয়া বিচারাসহস্রই পদার্থের তত্ত্ব বলিয়া ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার ঐ মত খণ্ডনের জন্যই পরে এই সূত্রটি বলা হইয়াছে। অবশ্য পূর্বোক্ত মত খণ্ডনের জন্য প্রথমে মহর্ষির এই সূত্রোক্ত যুক্তিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নাগার্জুন প্রভৃতি মাধ্যমিকের শূন্যবাদের বেক্রমে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাহ্য পদার্থ ও জ্ঞানের অত্যন্ত অসত্তাই ব্যবস্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদিগের মতে নাস্তিতাই শূন্যতা নহে। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব। আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে এখানে বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত যে “আনুপলব্ধিকে”র মতে “সর্বং নাস্তি” অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিছুরই সত্তা নাই; ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞায় ভ্রমজ্ঞানেরও বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু অসত্তাই ব্যবস্থিত, তাহারই উক্ত মত খণ্ডনের জন্য প্রথমে ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিয়া মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানেরও সত্তা সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্বও সূদৃঢ় হওয়ায় অবয়ববিষয়ে অভিমানকে মহর্ষি প্রথমে যে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, তাহার কোনরূপেই অনুপপত্তি নাই ৩৬।

**সূত্র । তত্ত্বপ্রধানভেদাচ্চ মিথ্যাবুদ্ধেদ্বৈবিধ্যোপ-
পত্তিঃ ॥৩৭॥৪৪৭॥**

অনুবাদ । পরন্তু “তত্ত্ব” ও “প্রধানে”র অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপের আশ্রয় ধর্ম্মী এবং উহাতে আরোপিত অপর পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপপত্তি হয় (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ধর্ম্মী অংশে যথার্থ, এবং আরোপ্য অংশে ভ্রম। অতএব উহা ঐরূপে দ্বিবিধ) ।

ভাষ্য। “তত্ত্বং” স্থাণুরিতি, “প্রধানং” পুরুষ ইতি। তত্ত্ব-প্রধানয়োঃলোপাদ্ভেদাৎ স্থাণৌ পুরুষ ইতি মিথ্যাবুদ্ধিরূপদ্যতে, সামান্যগ্রহণাৎ। এবং পতাকায়াং বলাকেতি, লোকে কপোত ইতি। নতু সমানে বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধীনাং সমাবেশঃ, সামান্যগ্রহণব্যবস্থানাৎ। যস্য তু নিরাত্মকং নিরুপাখ্যং সর্বং, তস্য সমাবেশঃ প্রসজ্যতে।

গন্ধাদৌ চ প্রমেয়ে গন্ধাদিবুদ্ধয়ো মিথ্যাভিমতাস্তত্ত্বপ্রধানয়োঃ সামান্যগ্রহণস্য চাভাবাস্তত্ত্ববুদ্ধয় এব ভবন্তি। তস্মাদযুক্তমেতৎ প্রমাণ-প্রমেয়বুদ্ধয়ো মিথ্যেতি।

অনুবাদ। স্থাণু ইহা “তত্ত্ব”, পুরুষ ইহা “প্রধান” (অর্থাৎ স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধিস্থলে ঐ ভ্রমের ধর্মী বা বিশেষ্য স্থাণু “তত্ত্ব” পদার্থ, এবং উহাতে আরোপিত পুরুষ “প্রধান” পদার্থ)। “তত্ত্ব” ও “প্রধান” পদার্থের “অলোপ” অর্থাৎ সত্তাপ্রযুক্ত ভেদবশতঃ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্ম স্থাণুতে “পুরুষ”, এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে। এইরূপ পতাকায় “বলাকা” এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে, লোকে “কপোত” এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে। কিন্তু “সমান” অর্থাৎ একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ (সম্মেলন) হয় না। যেহেতু “সামান্য গ্রহণে”র অর্থাৎ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা (নিয়ম) আছে। কিন্তু ষাঁহার মতে সমস্তই নিরাত্মক বা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বা অলীক, তাঁহার মতে (একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের) সমাবেশ প্রসক্ত হয় [অর্থাৎ তাঁহার মতে স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রমের স্থায় পূর্বেবাক্ত বলাকাভ্রম, কপোতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহা যখন জন্মে না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে তত্ত্বপদার্থ ও প্রধানপদার্থের সত্তা ও ভেদ স্বীকার করিয়া উহার কারণ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের নিয়ম স্বীকার্য্য]।

পরন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া অভিমত গন্ধাদি জ্ঞান, “তত্ত্ব” পদার্থ ও প্রধান পদার্থের এবং সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের অভাববশতঃ “তত্ত্ববুদ্ধি” অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই হয়। অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধি মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বেবাক্ত মত খণ্ডন করিতে সর্বশেষে এই স্থত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, “তত্ত্ব” পদার্থ ও “প্রধান” পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপপত্তি হয়। এখানে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় পদার্থের মধ্যে একটি “তত্ত্ব” ও অপরটি “প্রধান”। যেমন স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রম স্থলে স্থাণু “তত্ত্ব” ও পুরুষ “প্রধান”। ঐ স্থলে স্থাণু বস্তুতঃ পুরুষ নহে, কিন্তু

তত্ত্বতঃ উহা স্বাণুই, এ জন্ত উহার নাম “তত্ত্ব”। এবং ঐ স্থলে ঐ স্বাণুতে পুরুষেরই আরোপ হওয়ায় ঐ আরোপের প্রধান বিষয় বলিয়া পুরুষকেই “প্রধান” বলা যায়। স্বাণুতে পুরুষের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্তই ঐ ভ্রম জন্মে, নচেৎ উহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে ভ্রমের উৎপাদক বিষয়ের মধ্যে পুরুষই প্রধান, ইহা স্বীকার্য। ফলকথা, ভ্রমজ্ঞান স্থলে যে ধর্ম্মাতে অপর পদার্থের আরোপ বা ভ্রম হয়, সেই ধর্ম্মার নাম “তত্ত্ব” এবং সেই “আরোপ্য” পদার্থটির নাম “প্রধান”। “তত্ত্ব” ও “প্রধান” এই দুইটি যথাক্রমে ঐ উভয় পদার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা। এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। এইরূপ ভ্রমজ্ঞান ও যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানই প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এ জন্ত ভাষ্যকার পূর্বে অনেক স্থলে যথার্থ জ্ঞানকে “প্রধান” এই নামের দ্বারাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে তিনি মহর্ষির তাৎপর্যানুসারে ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপ্য পদার্থকেই সূত্রোক্ত “প্রধান” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্বারা উহা যে, আরোপ্য পদার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা, ইহাও বুঝা যায়। বৃত্তিকারও এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “তত্ত্বং ধর্ম্মিস্বরূপং, প্রধানমারোপ্যং।” বৃত্তিকারের মতে মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা বক্তব্য এই যে, সর্ব্বদম্মত ভ্রমজ্ঞানও যখন ধর্ম্মী অংশে যথার্থ জ্ঞান, তখন তৎদৃষ্টান্তে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থজ্ঞানই নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানও অংশবিশেষে যথার্থ বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে সূত্রোক্ত দ্বৈবিধ্য্য কিরূপ এবং কিরূপেই বা উহার উপপত্তি হয়, তাহা কিছু বাক্ত করেন নাই। ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে স্বাণুতে পুরুষবুদ্ধি প্রভৃতি ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকে নিমিত্ত বলিয়াছেন। এবং তত্ত্ব-প্রধানভেদও উহার নিমিত্ত হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহাও তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। মনে হয়, এই জন্তই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, সূত্রে “মিথ্যাবুদ্ধি” শব্দের দ্বারা মিথ্যাবুদ্ধি বা ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ পার্শ্বসূত্রে ভ্রমজ্ঞানের যে নিমিত্তের উপলব্ধি বলা হইয়াছে, ঐ নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহাই এই সূত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু মহর্ষির সূত্রপাঠের দ্বারা তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, জগতে যথার্থ জ্ঞানই নাই, সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, যে সমস্ত সর্ব্বদম্মত প্রসিদ্ধ ভ্রম, তাহাও তত্ত্বাংশে যথার্থ এবং প্রধানাংশেই ভ্রম, এই উভয় প্রকারই হয়। সুতরাং ঐরূপে ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ স্বাণুতে “ইহা পুরুষ” এবং শুক্তিতে “ইহা রজত” এইরূপে ভ্রমজ্ঞান জন্মিলে সেখানে অগ্রবর্ত্তী স্বাণু ও শুক্তিতে স্বাণু ও শুক্তিত্ব ধর্ম্মের জ্ঞান না হইলেও তদগত “ইদম্” ধর্ম্মের জ্ঞান হওয়ায় উহা ঐ অংশে যথার্থই হয়। কারণ, অগ্রবর্ত্তী সেই স্বাণু প্রভৃতি পদার্থে “ইদম্” ধর্ম্মের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। “ইহা পুরুষ নহে”, “ইহা রজত নহে” এইরূপে শেষে স্বাণুতে পুরুষের এবং শুক্তিতে রজতের বাধনিশ্চয় হইলেও “ইদম্” ধর্ম্মের বাধনিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের ইদমংশের অর্থাৎ “ইদম্” ধর্ম্মের আশ্রয় তত্ত্বাংশে উহা যে যথার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক-

সম্প্রদায়ও ঐ সমস্ত ভ্রমস্থলে ইদমংশের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন^১। পূর্বোক্ত যুক্তি ও মহর্ষির এই সূত্রানুসারেই কোন পূর্বাচারা নৈয়ায়িক-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, “ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্যন্তঃ প্রকারে চ বিপর্য্যয়ঃ।” অর্থাৎ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই ধর্ম্মা অংশে অর্থাৎ বিশেষ্য অংশে যথার্থ, কিন্তু “প্রকার” অর্থাৎ বিশেষণ অংশেই ভ্রম। মহামনীষী শূলপাণিও “শ্রাদ্ধবিবেক” গ্রন্থে শ্রাদ্ধে দানত্ব ও যাগত্ব, এই উভয় ধর্ম্মই আছে, উহা বিকল্প ধর্ম্ম নহে—ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে পূর্বোক্ত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে, যেমন নৈয়ায়িক নতে ভ্রমজ্ঞানে প্রমত্ত ও ভ্রমত্ব উভয়ই থাকে, উহা বিকল্প নহে, তদ্রূপ শ্রাদ্ধেও যাগত্ব ও দানত্ব বিকল্প নহে। টীকাকার মহানৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কাদিকার সেখানে পূর্বোক্ত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন^২ বস্তুতঃ নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে প্রমত্ত ও ভ্রমত্ব বিকল্প ধর্ম্ম নহে। একই জ্ঞানে অংশবিশেষে উহা থাকিতে পারে। ঐ ধর্ম্মদ্বয় জ্ঞানগত জাতি-বিশেষ না হওয়ায় তাঁহাদিগের মতে জাতিসংস্করেরও কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে সমস্ত ভ্রমই যে, কোন অংশে যথার্থ জ্ঞান, ইহাও বলা যায় না। কারণ, এমন ভ্রমও হইতে পারে এবং কদাচিৎ কাহারও হইয়াও থাকে, বাহ্য মর্মেই হইয়াও থাকে। যে ভ্রমে বিশেষ্য অংশে “ইদম্” ধর্ম্মের অথবা বিশেষ্যগত ঐক্য কোন ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না, কিন্তু অতীত ধর্ম্মপ্রকারেই সমস্ত বিশেষ্যের জ্ঞান হয়, সেই ভ্রমই সর্ব্বাংশে ভ্রম; উহা কোন অংশেই যথার্থ হইতে পারে না। নব্য নৈয়ায়িক-গণ ঐরূপ ভ্রমেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে সমস্ত দোষবিশেষজ্ঞত্ব ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত দোষবিশেষের বৈচিত্র্যবশতঃ ভ্রমজ্ঞানও যে বিচিত্র হইবে, সূত্রাং কোন স্থানে কাহারও যে সর্ব্বাংশে ভ্রমও হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রমস্থলে কোন বিশেষ্য অংশে “ইদম্” প্রভৃতি কোন বাস্তব ধর্ম্মের জ্ঞান হওয়ায় সেই সমস্ত ভ্রমকেই বিশেষ্য অংশে যথার্থ বলা হইয়াছে। মহর্ষিও এই সূত্রের দ্বারা ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ ভ্রমকেই “মিথ্যাবুদ্ধি” শব্দের দ্বারা গণ্য করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সমস্ত ভ্রমকেই এখানে গ্রহণ করেন নাই। তবে ভ্রমজ্ঞান স্থলে সর্ব্বত্রই পূর্বোক্ত “ভ্রম” ও “প্রধান” নামক পদার্থদ্বয় আবশ্যক। সূত্রাং ঐ উভয়ের সত্তা স্বীকার্য্য। “ভ্রম” ও “প্রধান” পদার্থের সত্তা ব্যতীত ঐ উভয়ের ভেদও সমর্থন করা যায় না। তাই ভাব্যকার বলিয়াছেন, “ভ্রমপ্রধানয়োঃলোপাদ্ভেদাৎ।” ‘লোপ’ শব্দের অর্থ অভাব বা অসত্তা। সূত্রাং “অলোপ” শব্দের দ্বারা সত্তা বুঝা যায়। মহর্ষি “ভ্রমপ্রধানভেদাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা ভ্রমজ্ঞান স্থলে ঐ পদার্থদ্বয়ের সত্তার আবশ্যকতা সূচনা করিয়া ইহাও সূচনা করিয়াছেন যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া সমস্ত পদার্থই যে অসৎ, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, ভ্রম ও প্রধান পদার্থের সত্তামূলক ভেদবশতঃই ভ্রমজ্ঞান

১। ইদমংশের সত্যত্ব সূত্রিগণ দণ্ডা দ্বারা প্রমাণিত।—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ—৩৪শ শ্লোক।

২। ভ্রমজ্ঞানস্থলে পদমতে প্রমাণত্ব-প্রমাণতা।—শ্রাদ্ধবিবেক। “পদমতে”—নৈয়ায়িকমতে। তদ্ব্যতীত হি ইদং রজতমিতি ভ্রমে ইদমংশে প্রমাণতা, বাধিতরজতমংশে প্রমাণতা যথা তৎ। “ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্যন্তঃ প্রকারে চ বিপর্য্যয়ঃ” ইতি তৎসিদ্ধান্তাৎ।—শ্রীকৃষ্ণ তর্কাদিকারসম্মত টীকা।

পূর্বোক্তরূপে দ্বিবিধ হয়। নচেৎ ঐরূপ ভ্রম জন্মিতেই পারে না। অলোক বিষয়েই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহা স্বীকার করিলে সর্বত্র সর্বাত্মেই সমান ভ্রম স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে “ইহা পুরুষ নহে”, “ইহা রজত নহে” ইত্যাদি প্রকারে বাধনিশ্চয়কালে “ইদম্” ধর্মেরও বাধনিশ্চয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সর্বানুভববিরুদ্ধ। কারণ, ঐ স্থানে বাধনিশ্চয়কালে “ইহা ইহা নহে” অর্থাৎ অগ্রবর্তী এই স্থাপুতে “ইদম্” ধর্মও নাই, ইহা তখন কেহই বুঝে না। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান যে বিশেষ্য অংশে বর্ণা, ইহা স্বীকার্য্য হইলে পূর্বোক্ত তত্ত্ব ও প্রধানের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার এই হত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষির গুঢ় যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, স্থাপুতে পুরুষের সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজন্ত পুরুষ বদিয়া ভ্রম জন্মে। এবং দূর হইতে স্বেতবর্ণ পতাকা দেখিলে তাহাতে “বলাকা”র সাদৃশ্য প্রত্যক্ষজন্ত “বলাকা” (বকপঙক্তি) বদিয়া ভ্রম জন্মে, এবং দূর হইতে শ্রীমবর্ণ কপোতাকার গোষ্ঠে দেখিলে তাহাতে কপোতের সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্ত কপোত বদিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ বা সম্মিলন হয় না। অর্থাৎ স্থাপুতে পুরুষভ্রমের স্থায় বলাকাভ্রম, কপোতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রম জন্মে না। ঐরূপ পতাকা প্রভৃতি কোন এক বিষয়েও পুরুষভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রম জন্মে না। কারণ, সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষের নিয়ম আছে। অর্থাৎ যে পদার্থে বাহার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সেই পদার্থেই তাহার ভ্রম জন্মে, ঐরূপ নিয়ম ফলাফলদ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্থাপুতে পুরুষেরই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হওয়ার পুরুষেরই ভ্রম জন্মে। তাহাতে বলাকা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের ভ্রম জন্মে না। কিন্তু বাহার মতে সমস্তই নিঃস্বরূপ অলোক, তাঁহার মতে একই পদার্থে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার মতে একই স্থাপুতে পুরুষভ্রম, বলাকাভ্রম, কপোতভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। কারণ, অলোক পদার্থে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পূর্বোক্তরূপ নিয়ম হইতে পারে না। ভ্রমাত্মক সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও সকল পদার্থেই সকল পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, অলোকত্বরূপে সকল পদার্থই সমান বা সাদৃশ্য। ফলাফল, অসৎ পদার্থে অসৎ পদার্থেরই ভ্রম (“অসৎখ্যাতি”) স্বীকার করিলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন স্থাপুতে পুরুষ-ভ্রমের স্থায় বলাকা প্রভৃতির ভ্রম হয় না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্বোক্ত “তত্ত্ব” পদার্থ ও “প্রধান” পদার্থের সত্তা ও ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যে পদার্থে বাহার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়, সেই পদার্থে তাহারই ভ্রম হয়, ঐরূপ নিয়ম বলা যায়। সুতরাং একই পদার্থে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের আপত্তি হয় না। ভাষ্যে “সমানে বিষয়ে” এই স্থলে “সমান” শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তুল্যতা বা সাদৃশ্য অর্থে “সামান্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। “সমান” শব্দের এক এবং তুল্য, এই দ্বিবিধ অর্থই কোষে বর্ণিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে “ন তু সমানে বিষয়ে” এই স্থলে “ওত্র সমানে বিষয়ে,” এবং পরে “তস্মৈ সমাবেশঃ,” এই স্থলে “তস্মৈ সমাবেশঃ” ঐরূপ পাঠ পরে কোন পুস্তকে মুদ্রিত দেখা যায়। এবং প্রাচীন মুদ্রিত অনেক পুস্তকেই “সামান্যগ্রহণা-

ব্যবস্থানাং” এইকপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত পাঠের মূল কি এবং অর্থসংগতি কিরূপে হইতে পারে, তাহা সুস্বীকৃত বিচার করিবেন। বার্তিকাদি গ্রন্থে এখানে ভাষ্যসন্দর্ভের কোন তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা নাই। তাৎপৰ্য্যটীকাকার পূৰ্বোক্ত ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যসন্দর্ভেরও কোন ব্যাখ্যা না করিয়া সেখানে লিখিয়াছেন,—“ভাষ্যং সুবোধং”।

কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানবাদকেই পূৰ্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে তাৎপৰ্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এই প্রকরণের প্রারম্ভে বিজ্ঞানবাদীকেই পূৰ্বপক্ষবাদী বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং উদ্যোতকরের ত্রায় তিনিও “ত্ৰায়হুচীনিবন্ধে” এই প্রকরণকে “বাহ্যগতজন্যনিরাকরণ-প্রকরণ” বলিয়াছেন। তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদকেই পূৰ্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য শূন্যবাদীর ত্রায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও স্বপ্ন, মায়, গন্ধৰ্বনগর ও মরীচিকা দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। শূন্যবাদের সমর্থক “মাধ্যমিককারিকা” এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থক “লঙ্কাবতাসূত্র”ও ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায়। শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এই প্রকরণে পূৰ্বোক্ত “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি (৩১৩২) পূৰ্বপক্ষসূত্রদ্বয়ের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা অবশ্যই করিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার পূৰ্বোক্ত ৩৫শ সূত্রের ভাষ্যশেষে “তদেতৎ সৰ্বস্বাভাবে” ইত্যাদি সন্দর্ভের ত্রায় এই প্রকরণের এই শেষ সূত্রের ভাষ্যও “যন্ত তু নিরাশ্রকং” ইত্যাদি যে সন্দর্ভ বলিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি পূৰ্বপ্রকরণে যে, “আনুপলব্ধিক”কে পূৰ্বপক্ষবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐহার মতে “সৰ্বং নাস্তি,” সেই সৰ্বাভাববাদীকেই তিনি এই প্রকরণেও পূৰ্বপক্ষবাদীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই অত্যাগত যুক্তির খণ্ডনপূৰ্বক উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ভাষ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত “যন্ত তু নিরাশ্রকং” ইত্যাদি সন্দর্ভেও প্রণিধান করা আবশ্যক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে সকল পদার্থই নিরাশ্রক বা অসৎ নহে। তাঁহারা অসৎত্যাতিবাদীও নহেন, কিন্তু আত্মত্যাতিবাদী। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ফল কথা, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার পূৰ্বোক্ত সৰ্বাভাববাদের খণ্ডন করিতেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বাহ্য পদার্থের অসত্তা খণ্ডনপূৰ্বক সত্তা সমর্থন করায় এবং পূৰ্বে অবয়বীর

১। যথা মায়াদি স্বপ্নো গন্ধৰ্বনগরং যথা।

তথোৎপাদিত্ত্বা স্থানং তথা ভঙ্গ উদাহৃতঃ ॥—মাধ্যমিক কারিকা, ৫৭।

“যে বা পুনঃস্থ মহামতে ভ্রমণা ব্রাহ্মণা বা নিঃস্বভাববদনালিতচক্রগন্ধৰ্বনগরানুৎপাদমায়ামরীচাদকং” ইত্যাদি লঙ্কাবতাসূত্র, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২। বেদান্তদৰ্শনের “নাস্ত্যব উপলক্ষঃ” (২.২.২৮) এই সূত্রের শারীরকভাষ্যে “যথাহি স্বপ্ন-মায়াদি-মরীচাদক-গন্ধৰ্বনগরাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহেনাথেন গ্রাহ্যঃ ইত্যাদি ভবন্তি।” ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

অস্তিত্ব সমর্থন করিতে বিজ্ঞানবাদীর কথিত অবয়বীর বাধক যুক্তিরও খণ্ডন করায় বিজ্ঞানবাদেরও মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। সুতরাং তিনি এখানে আর পৃথক্ ভাবে বিজ্ঞানবাদকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উহার খণ্ডন করেন নাই। মনে হয়, উদ্যোতকরের সময়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এখানে মহর্ষি গৌতমের সূত্রের দ্বারা বিজ্ঞানবাদেরই বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি এখানে ভাষ্যানুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। সূত্রীগণ ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া ইহার বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী যে, গন্ধাদি-প্রমেয়-বিষয়ে, গন্ধাদি-বুদ্ধিকেও মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানই হয়, উহা কখনই ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানস্থলে “তত্ত্ব” ও “প্রধান” এই পদার্থদ্বয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু গন্ধকে গন্ধ বলিয়া বুঝিলে সেখানে “তত্ত্ব” ও “প্রধান” এই পদার্থদ্বয় ঐ বুদ্ধির বিষয় হয় না। কারণ, ঐ স্থলে এক গন্ধকেই “তত্ত্ব” ও “প্রধান” বলা যায় না। যাহা “তত্ত্ব” পদার্থ, তাহাতে আরোপিত অপর পদার্থের নামই “প্রধান”। সুতরাং ঐ স্থলে গন্ধকে “প্রধান” বলা যায় না। পরন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে গন্ধের অসত্ত্বাবশতঃ উহা “তত্ত্ব” পদার্থও নহে। সুতরাং গন্ধকে গন্ধ বলিয়া বুঝিলে ঐ স্থলে “তত্ত্ব” ও “প্রধান” নামক বিভিন্ন পদার্থদ্বয় ঐ বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায় উহা ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কিন্তু উহা যথার্থ জ্ঞানই হয়। এবং গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে যে গন্ধাদি বুদ্ধি জন্মে, তাহা গন্ধাদির সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজন্মও নহে। সুতরাং উহা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। ফলকথা, স্থাপু প্রভৃতি পদার্থে পুরুষাদি পদার্থের ভ্রম স্থলে যেমন “তত্ত্ব” ও “প্রধান” পদার্থ এবং কারণরূপে সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ থাকে, গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিতে উহা না থাকায় ঐ সমস্ত প্রমেয় জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানের ঐ বিশেষ কারণ ঐ স্থলে নাই। পূর্বপক্ষবাদী ভ্রমজ্ঞান স্থলে “তত্ত্ব” ও “প্রধান” পদার্থের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলেও ভ্রমজ্ঞানের কোন বিশেষ কারণ স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, উহা অস্বীকার করিলে সর্বত্রই সকল পদার্থের ভ্রম হইতে পারে। স্থাপুতে পুরুষ ভ্রমের ত্রায় বলাকাদি ভ্রমও হইতে পারে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিও যে ভ্রমজ্ঞান হইবে, তাহার বিশেষ কারণ নাই। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, —“সামান্যগ্রহণশ্চ চাভাবাৎ।” ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত স্থাপু প্রভৃতিতে পুরুষাদি ভ্রম স্থলে সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষবিশেষ কারণ অর্থাৎ ভ্রমজনক “দোষ”। গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি বুদ্ধি স্থলে ঐ দোষ নাই, অতএব কোন দোষও নাই, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভাষ্যকারোক্ত “সামান্যগ্রহণ” শব্দটি ভ্রমজনক-দোষমাত্রের উপলক্ষণ। কারণ, সর্বত্রই যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ভ্রমের বিশেষ কারণ বা ভ্রমজনক দোষ, ইহা বলা যায় না। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ব্যতীতও অত্যাশ্চর্য্য অনেকরূপ দোষবশতঃও অনেকরূপ ভ্রম জন্মে। পিতৃদোষজন্ম পাণ্ডুর-বর্ণ শব্দে পীত-বুদ্ধি, দূরত্ব-দোষজন্ম চন্দ্র সূর্য্যে স্বল্প-পরিমাণ-বুদ্ধি প্রভৃতি বহু ভ্রম আছে, যাহা সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষজন্ম নহে। জ্ঞানের সাধারণ কারণ সত্ত্বে যে অতিরিক্ত কারণবিশেষজন্ম ভ্রম জন্মে, তাহাকেই “দোষ” বলা হইয়াছে। ঐ দোষ নানাবিধ। “পিতৃদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।”—(ভাষ্য-

পরিচ্ছেদ)। সুতরাং দোষবিশেষজ্ঞতা ভ্রমও নানাবিধ। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি জ্ঞানও যে, কোন দোষবিশেষজ্ঞতা, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পূর্বপক্ষবাদী সর্বত্র অনাদি বিচিত্র সংস্কারকেই ভ্রমজনক দোষ বলিলে ঐ সংস্কার ও উহার কারণের সম্ভা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বাহ্য অসৎ বা অশীল, তাহা কোন কার্য্যকারী হয় না। কার্য্যকারী হইলে তাহাকে সৎ পদার্থই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সকল পদার্থই অসৎ, ইহা বলা যাইবে না। কোন সৎ পদার্থ স্বীকার করিলেও উহার জ্ঞানকে বথার্থ জ্ঞানই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহাও বলা যাইবে না। পরন্তু যেখানে পরে কোন প্রমাণের দ্বারা বাধনিশ্চয় হয়, সেই স্থলেই পূর্বজাত জ্ঞানের ভ্রমই নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধির পরে কোন প্রমাণের দ্বারা “ইহা গন্ধাদি নহে” এইরূপ বাধনিশ্চয় হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমাত্মক বা ইচ্ছাপ্রযুক্ত বাধনিশ্চয়ের দ্বারা সার্বজনীন ঐ সমস্ত প্রমেয়জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু যথার্থ জ্ঞান একেবারে না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং তাহার ভ্রম-সংজ্ঞা ও ভ্রমত্বনিশ্চয়ও হইতে পারে না। ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধিই যে ভ্রম, ইহা অযুক্ত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ” এই শ্লোকের দ্বারা যে পূর্বপক্ষ কথিত হইয়াছে, তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না; উহা যুক্তিহীন, সুতরাং অযুক্ত।

উদ্যোতকর পূর্বোক্ত “স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর মতামুসারে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, উহা “চিত্ত” হইতে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধ বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয়ের সম্ভা নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদীর মতে প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান যে ভ্রম, এ বিষয়ে জ্ঞানত্বই হেতু, স্বপ্নজ্ঞান দৃষ্টান্ত। উদ্যোতকর পূর্বোক্ত “হেতুভাবাদিনিক্টিঃ” এই শ্লোকোক্ত যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টান্ত ও তন্মূলাক উক্ত মতের খণ্ডনপূর্বক শেষে বিশেষ বিচারের জন্য বিজ্ঞানবাদীর স্বপক্ষ-সাধক অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিষয়সমূহ চিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু উহা গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়—যেমন বেদনাদি। “বেদনা” শব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখ। “চিত্ত” শব্দের অর্থ বিজ্ঞান^১। যেমন সুখ দুঃখাদি জ্ঞেয় পদার্থ বিজ্ঞান হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ অজ্ঞাত বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। বিজ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয়ের সম্ভা নাই। উক্ত অনুমানের খণ্ডন করিতে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, সুখ

১। ন চিত্তব্যতিরিক্টিণো বিষয়া গ্রাহ্যাদ্বেদনাদিবদিতি। যথা বেদনাদি গ্রাহ্যং ন চিত্তব্যতিরিক্তং, তথা বিষয়া অপি। বেদনা স্বপ্নরূপে। চিত্তং বিজ্ঞানমিতি।—আত্মবাক্তিক।

২। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বিজ্ঞানেরই অপর নাম চিত্ত। চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি, এই চারিটি পর্যায় শব্দ অর্থাৎ সমানার্থক। “বিশ্লেষিতিকারিকা”র বৃত্তির প্রারম্ভে বসুগু লিখিয়াছেন,—“চিত্তং মনো বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তির্চৈত পর্যায়ঃ”।

ও দুঃখ গ্রাহ্য পদার্থ, জ্ঞান উহার গ্রহণ। সুতরাং গ্রাহ্যগ্রহণভাববশতঃ সুখ দুঃখ এবং উহার জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। গ্রাহ্য ও গ্রহণ যে অভিন্ন পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের যে গ্রহণরূপ ক্রিয়া, উহার কর্মকারক সুখ ও দুঃখ, এ জন্ত উহাকে গ্রাহ্য বলা হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়া ও উহার কর্মকারক অভিন্ন পদার্থ হয় না। কুত্ৰাপি ইহার সর্বসম্মত দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু চতুঃস্কন্ধ বা পঞ্চস্কন্ধাদি বাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিজ্ঞানকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ বিজ্ঞানের ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা জিজ্ঞাস্য। কারণ, বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ হইলে অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক আর কোন পদার্থের সত্তা না থাকিলে বিজ্ঞানভেদের বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কোন হেতু না থাকায় বিজ্ঞানভেদ কিরূপে হইবে? যদি বল, স্বপ্নের ভেদের ত্রায় ভাবনার ভেদ বশতঃই বিজ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবনার বিষয় ভাব্য পদার্থ ও উহার ভাবক পদার্থের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভাব্য ও ভাবক অভিন্ন পদার্থ হয় না। পরন্তু স্বপ্নাদি জ্ঞানের ত্রায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম বলিলে প্রধানজ্ঞান অর্থাৎ উহার বিপরীত যথার্থ জ্ঞান স্বীকার্য। কারণ, যে বিষয়ে প্রধান জ্ঞান একেবারেই অলোক, তদ্বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। ঐরূপ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। উহার সর্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু যিনি “চিত্ত” অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তা মানেন না, তাঁহার অপক্ষসাদন ও পরপক্ষ খণ্ডনও সম্ভব নহে। কারণ, তিনি তাঁহার চিন্তের দ্বারা অপরকে কিছু বুঝাইতে পারেন না। তাঁহার “চিত্ত” অর্থাৎ সেই জ্ঞানবিশেষ অপরে বুঝিতে পারে না—যেমন অপরের স্বপ্ন সেই ব্যক্তি না বলিলে অপর জানিতে পারে না। যদি বল, অপক্ষসাদন ও পরপক্ষ খণ্ডনকালে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই সমস্ত শব্দাকার চিন্তের দ্বারা অপরকে বুঝান হয়। শব্দাকার চিত্ত অপরের অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু তাহা বলিলে “শব্দাকার চিত্ত” এই বাক্য “আকার” পদার্থ কি, তাহা বক্তব্য। কোন প্রধান বস্তু অর্থাৎ সত্য পদার্থের সাদৃশ্য-বশতঃ ভক্তির পদার্থে তাহার যে জ্ঞান, উহাই আকার বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মতে শব্দ নামক বাহ্য বিষয়ের সত্তা না থাকায় তিনি “শব্দাকার চিত্ত” এই কথা বলিতে পারেন না। শব্দ সত্য পদার্থ হইলে এবং কোন বিজ্ঞানে উহার সাদৃশ্য থাকিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ বিজ্ঞানবিশেষকে “শব্দাকার চিত্ত” বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী তাহা বলিতে পারেন না। পরন্তু বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তাই না থাকিলে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ের সত্তা নাই, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থাতেও বিষয়ের সত্তা নাই। সুতরাং ইহা স্বপ্নাবস্থা ও ইহা জাগ্রদবস্থা, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে ও বলা যাইবে? উহা বুঝিবার কোন হেতু নাই। ঐ অবস্থাদ্বয়ের বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাদক কোন হেতু বলিতে গেলেই বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে।

উদ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার কোন ভেদ না থাকিলে ধর্মাদ্বৈত ব্যবস্থাও থাকে না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অগম্যাগমনে অধর্ম জন্মে না, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় অগম্যাগমনে অধর্মের উৎপত্তি না হউক? কারণ, জাগ্রদবস্থাও স্বপ্নাবস্থার ত্রায় বিষয়শূন্য। বিজ্ঞান-

বাদীর মতে তখনও ত বস্তুতঃ অগম্যাগমন বলিয়া কোন বাহ্য পদার্থ নাই। যদি বল, স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রার উপবাস এবং জাগ্রদবস্থায় নিদ্রার অনুপবাসপ্রযুক্ত ঐ অবস্থাদ্বয়ের ভেদ আছে এবং ঐ অবস্থাদ্বয় জ্ঞানের অস্পষ্টতা ও স্পষ্টতাবশতঃ উহার ভেদ বুঝা যায়। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, নিদ্রোপবাসে যে, চিত্তের বিকৃতির হেতু, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? এবং জ্ঞানের বিষয় ব্যতীত উহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহা বলা আবশ্যক। যদি বল, বিষয় না থাকিলেও ত বিজ্ঞানের ভেদ দেখা যায়। যেমন তুলা কশ্ম-বিপাকে উৎপন্ন প্রেতগণ পূর্ণপূর্ণ নদী দর্শন করে। কিন্তু সেখানে বস্তুতঃ নদীও নাই, পূর্ণও নাই। এইরূপ কোন কোন প্রেত সেই স্থলে সেই নদীকেই জলপূর্ণ দর্শন করে। কোন কোন প্রেত তাহাকেই রুধিরপূর্ণ দর্শন করে। অতএব বুঝা যায় যে, বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বিজ্ঞানই ঐরূপ বিভিন্নাকার হইয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ভেদ বাহ্য পদার্থের সত্তা অনাবশ্যক। উদ্যোতকর উক্ত কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, বাহ্য পদার্থ অশোক হইলে পূর্বোক্ত কথাও বলাই যায় না। কারণ, বিজ্ঞানই সেইরূপ উপপন্ন হয়, ইহা বলিলে “সেইরূপ” কি? এবং কেনই বা “সেইরূপ”? ইহা জিজ্ঞাস্য। যদি বল, রুধিরপূর্ণ নদী দর্শনকালে রুধিরাকারে বিজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে ঐ রুধির কি? তাহা বক্তব্য এবং জলাকার ও নদীকার বিজ্ঞান জন্মে, ইহা বলিলে ঐ জল ও নদী কি? তাহা বক্তব্য। রুধিরাদি বাহ্য বিষয়ের একবারেই সত্তা না থাকিলে রুধিরাকার ও জলাকার ইত্যাদি বাক্যই বলা যায় না। পরন্তু তাহা হইলে দেশাদি নিয়মও থাকে না। অর্থাৎ প্রেতগণ কোন স্থান-বিশেষেই পূর্ণপূর্ণ নদী দর্শন করে, স্থানান্তরে দর্শন করে না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায় ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, সর্বস্থানেই পূর্ণপূর্ণ নদী দর্শন অর্থাৎ তদাকার বিজ্ঞান জন্মিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু “বিশংখিকাকারিকা”র প্রথমে নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় কারিকার দ্বারা নিজই উক্ত সিদ্ধান্তে অত্র সম্প্রদায়ের পূর্বপক্ষ সমর্থনপূর্বক “দেশাদিনিয়মঃ সিদ্ধঃ” ইত্যাদি তৃতীয় কারিকার দ্বারা উহার যে উত্তর দিয়াছেন, উদ্যোতকর এখানে উহাই খণ্ডন করিতে পূর্বোক্তরূপ সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং পরে “কশ্মণো বাসনাচ্যত্র” ইত্যাদি সপ্তম কারিকার পূর্বোক্ত উদ্ধৃত করিয়া উহারও খণ্ডন করিয়াছেন। বসুবন্ধুর উক্ত কারিকাদ্বয় পূর্বে (১০৩ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্যোতকর বসুবন্ধুর সপ্তম কারিকার অত্র ভাবে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, আমরা কশ্ম ও উহার ফলের বিভিন্ন-শ্রয়তা স্বীকার করি না। কারণ, আনাদিগের মতে যে আত্মা কশ্মকর্তা, তাহাতেই উহার ফল জন্মে।

১। বিজ্ঞপ্তিমাত্রমৈব তদসদর্শভাবনাৎ।

যথা: তৈমিরিকস্তাসংকশচন্দ্রাদিদর্শনং ॥১॥

অনর্থ্য যদি বিজ্ঞপ্তিনিয়মো দেশকালয়োঃ।

সত্তানন্ত ১৮ সত্তা ন বৃত্তা কৃতক্রিয়া নচ ॥২॥ বিশংখিকাকারিকা।

মুদ্রিত পুস্তকে দ্বিতীয় কারিকার প্রথম ও তৃতীয় পাদে “যদি বিজ্ঞপ্তি নর্থা” এবং “সত্তানন্তানিয়মশ্চ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে কর্মবিশেষের পুত্রাদি বিষয়রূপ ফলের উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিষয় সং, এবং তজ্জন্ত প্রীতিবিশেষই ঐ সমস্ত কর্মের মুখ্য ফল। উহা কর্মকর্তা আত্মাতেই জন্মে। পূর্বে ফলপরীক্ষায় মহর্ষি নিজেই ঐরূপ সমাধান করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্যোতকের পরে এখানে চিত্ত বা জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বিষয়সমূহ যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন^১ এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের দশম সূত্রের বার্তিক পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের অনুপপত্তি সমর্থন করিতে আরও অনেক বিচার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়েও অনেক স্থলে বিচারপূর্বক অনেক বৌদ্ধমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তদ্বারা তিনি যে, তৎকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মরক্ষক মহাপ্রভাবশালী আচার্য্য ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি যে বসুবন্ধু ও দিগুনাগ প্রভৃতি কুতর্কিকগণের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্ত ‘শ্রায়বার্তিক’ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের দ্বারা ও ঐ স্থলে বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকের সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু মনীষী তাঁহার “শ্রায়বার্তিকে”র টীকা করিয়া এবং নানা স্থানে বিচার করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক তৎকালীন বৌদ্ধসম্প্রদায়কে দুর্বল করিয়াছিলেন। তাই পরবর্তী ধর্মকীর্তি, শাস্তুরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ উদ্যোতকের যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কমলশীল “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”য় বহু স্থানে উদ্যোতকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কালবশে উদ্যোতকের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হওয়ায় তখন উদ্যোতকের “শ্রায়বার্তিকে”র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও তাঁহার মত-সমর্থন সর্বত্র হয় নাই। অনেক পরে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ত্রিলোচন গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া উদ্যোতকের “শ্রায়বার্তিকে”র উদ্ধার করেন (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র “শ্রায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকা” প্রণয়ন করিয়া উদ্যোতকের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতের সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি শ্রায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যবার্তিক-ব্যাখ্যায় বিচারপূর্বক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া, তাঁহার “তত্ত্বসমীক্ষা” নামক গ্রন্থে যে পূর্বে তিনি উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন, ইহা শেষে লিখিয়াছেন এবং এখানেও বিজ্ঞানবাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহার “শ্রায়কণিকা” নামক গ্রন্থে পূর্বে তিনি বিস্তৃত বিচার দ্বারা উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও শেষে লিখিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকাতেও (কৈবল্যপাদ, ১৪—২০) বিচারপূর্বক বিজ্ঞানবাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া, তাঁহার “শ্রায়কণিকা” গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অনুসরণীয়, ইহা লিখিয়াছেন। সর্বশেষে তাঁহার ভামতী টীকাতেও তিনি পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের বিশদ বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, উদ্যোতকের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের নানা গ্রন্থে ঐ সমস্ত বিচার বুঝিতে হইবে। এখানে ঐ সমস্ত বিচারের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে সার মর্ম প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক।

১। মদীয়াচ্চিহ্নাদর্থান্তরং বিষয়াঃ সামান্তবিশেষবদ্বাং, সম্ভানান্তরচিত্তবৎ। প্রমাণগম্যত্বাং কার্য্যত্বাদনিত্যত্বাং, ধর্মপূর্বকহাচ্ছেতি।—শ্রায়বার্তিক।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, ক্রিয়া ও কারকের কোন ভেদ নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন,—“ভূতির্যেযাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে”। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি, তাহাই ক্রিয়া এবং তাহাই কারক। যোগদর্শনের বাসভাষ্যেও উক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে^১। তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞানের প্রকাশক অত্র কোন পদার্থও নাই। কারণ, প্রকাশ্য, প্রকাশক ও প্রকাশ ক্রিয়া অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞান ভিন্ন বুদ্ধির দ্বারা অনুভাব্য বা বোধ্য অত্র পদার্থও নাই। এবং সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের যে অপর অনুভব, যদ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারে—তাহাও নাই। গ্রাহ ও গ্রাহকের অর্থাৎ প্রকাশ্য ও প্রকাশকের পৃথক সত্তা না থাকায় ঐ বুদ্ধি স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, উহা স্বতঃপ্রকাশ^২। উক্ত সিদ্ধান্তের উপরেই বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানবাদ স্থাপনই করা যায় না। তাই উদ্যোতকর প্রথমে উহাই অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—“নহি কৰ্ম্ম চ ক্রিয়া চ একং ভবতীতি।” অর্থাৎ কৰ্ম্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হয় না। সুতরাং গ্রহণ ক্রিয়া ও উহার কৰ্ম্মকারক গ্রাহ বিষয় অভিন্ন পদার্থ হইতেই পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া এখানে পরে ইহাও লিখিয়াছেন যে, উদ্যোতকরের ঐ কথার দ্বারা “সহোপলন্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি^৩ কারিকায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সাধনে যে হেতু কথিত হইয়াছে, তাহাও পরাস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, কৰ্ম্ম ও ক্রিয়া যখন একই পদার্থ হইতেই পারে না, তখন বিজ্ঞান ও উহার কৰ্ম্মকারক জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ স্বীকার্য্য হওয়ায় বিজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিকে ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং “সহোপলন্ত” বলিতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এক বা অভিন্ন উপলব্ধিই বিবক্ষিত হইলে ঐ হেতুই অসিদ্ধ। আর যদি জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধিই “সহোপলন্ত” এই যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্যোতকর কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর উক্ত হেতুর কোন উল্লেখ করেন নাই। শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ঐ হেতুরও উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র “জ্ঞানকণিকা”, যোগদর্শন-ভাষ্যের টীকা ও “ভামতী” প্রভৃতি গ্রন্থে “সহোপলন্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকা উদ্ধৃত করিয়া বিশদ বিচারপূর্বক উক্ত হেতুর খণ্ডন করিয়াছেন। ‘দর্শনদর্শনসংগ্রহে’ মাধবাচার্য্য এবং আরও অনেক গ্রন্থকার বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কারিকাটি কাহার রচিত, ইহা তাঁহারা কেহই বলেন নাই।

১। শ্ৰীকবিন্দিনো যদভবনং, সৈব ক্রিয়া, তদেব চ কারকমিত্যুপগমঃ ।—যোগদর্শনভাষ্য ১৪।২০।

২। নাস্তোঃ অনুভাবো বুদ্ধাহন্তি তস্তানানুভবোহপঃ ।

গ্রাহগ্রাহকবৈধূর্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ॥

৩। সহোপলন্তনিয়মাদভেদো নীলতঙ্কিযোঃ ।

ভেদশ্চ জ্ঞানবিজ্ঞানৈদুঃখতেন্দ্রবিবাহয়ে ॥

পূর্বোক্ত “সহোপলন্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি কারিকার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, নীল জ্ঞান স্থলে নীল ও তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার ভেদ নাই। নীলাকার জ্ঞানবিশেষই নীল। এইরূপ সর্বত্রই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা সমস্তই সেই জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। জ্ঞান হইতে বিষয়ের পৃথক্ সম্ভা নাই। জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় অসৎ। ইহার হেতু বলা হইয়াছে,— “সহোপলন্তনিয়মাৎ।” এখানে “সহ” শব্দের অর্থ কি, ইহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানের সহিতই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, ইহাই উক্ত হেতুর অর্থ হইলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে ‘সহ’ শব্দার্থ সাহিত্যের উপপত্তি হয় না। ভিন্ন পদার্থেই সাহিত্য সম্ভব হয় ও বলা যায়। সুতরাং ঐ হেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদেরই সাধক হওয়ার উহা বিরুদ্ধ। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য তদন্ত শুভশুপ্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যানসারে উক্ত হেতুকে বিরুদ্ধ বলিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য্যটীকায় পূর্বোক্ত যথাক্রম অর্থে উক্ত দোষই বলিয়াছেন। কিন্তু “তত্ত্বসংগ্রহে” শাস্ত্ররক্ষিত “সহ” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া যে ভাবে পূর্বোক্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে নীল জ্ঞানের উপলব্ধি ও নীলোপলব্ধি একই পদার্থ। ঐ একোপলব্ধিই “সহোপলন্ত”। সর্বত্রই জ্ঞানের উপলব্ধিই বিষয়ের উপলব্ধি। জ্ঞানের উপলব্ধি ভিন্ন বিষয়ের পৃথক্ উপলব্ধি নাই, ইহাই “সহোপলন্তনিয়ম।” উহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে ভেদ নাই, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ যেমন একই চন্দ্রকে দ্বিচন্দ্র বলিয়া দর্শন করে, অর্থাৎ ঐ স্থলে যেমন চন্দ্র এক হইলেও তাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও ভেদ দর্শন হয়। ফলকথা, পূর্বোক্ত “সহোপলন্তনিয়ম” শব্দে “সহ” শব্দের অর্থ এক বা অভিন্ন—উহার অর্থ সাহিত্য নহে। “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”র কমলশীল তদন্ত শুভশুপ্তের কথিত সমস্ত দোষের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিতে শেষে পূর্বোক্ত “সহোপলন্তে”র উক্তরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এবং তৎপূর্বে তিনি শাস্ত্ররক্ষিতের “যৎসংবেদন-মেব স্তাদ্বেশ সংবেদনং ধ্রুবং”—এই বাক্যোক্ত হেতুরও পূর্বোক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,— “ঈদৃশ এবাচার্য্যায়ৈ ‘সহোপলন্তনিয়মা’দিত্যাদৌ প্রয়োগে হেত্বর্থাহতিপ্রেরিতঃ।” এখানে “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা কোন্ আচার্য্য তাঁহার বুদ্ধিস্থ, তিনি তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বহু বিজ্ঞ কোন পণ্ডিত বলেন যে, আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি “প্রমাণবিনিশ্চয়” নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিব্বতীয় ভাষায় উহার

১। যৎসংবেদনমেব স্তাদ্বেশ সংবেদনং ধ্রুবং। তদ্বাদবিত্তিরিক্তং তৎ ততো বা ন বিভিষ্যতে ॥

যথা নীলধিয়ঃ স্বাক্ষা দ্বিতীয়ো বা যথোড় পঃ : নীলধীবেদনধেদং নীলাকারস্ত বেদনাৎ ॥

—“তত্ত্বসংগ্রহ”, ৫৬৭ পৃষ্ঠা।

২। ন হুত্রৈকেনৈবোপলন্ত একোপলন্ত ইত্যয়মর্থোহতিপ্রেরিতঃ। কিং তর্হি? জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ পরস্পরমেক এবোপলন্তো ন পৃথগিতি। ন এবহি জ্ঞানোপলন্তঃ স এব জ্ঞেয়স্ত, ন এব জ্ঞেয়স্ত স এব জ্ঞানস্তিতি যাবৎ। —তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

অনুবাদ আছে। তদ্বারা এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে “সহোপলন্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি এবং “নাট্যো-
হনুভাব্যো বুদ্ধ্যাহন্তি” ইত্যাদি এবং “অবিভাগোহপি বুদ্ধ্যাত্মা” ইত্যাদি কারিকা ধর্মকীর্তিরই রচিত,
ইহা বুঝা গিয়াছে।

আমরা কিন্তু “তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা”র বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের উক্তির দ্বারাও ইহা বুঝিতে
পারি। কারণ, কমলশীল প্রথমে “সহোপলন্তনিয়মাৎ” এই হেতুবাক্যে তাঁহার ব্যাখ্যাত হেতুর্থই
আচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া, পরে উহাতে অন্তের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আচার্য্য ধর্মকীর্তি
তাঁহার গ্রন্থে ঐ স্থলে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধির ভেদ সমর্থনপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব-
পক্ষ প্রকাশ করায় তদ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হেতুবাক্যে “সহ” শব্দের দ্বারা এককাল অর্থই
তাঁহার বিবক্ষিত—অভেদ অর্থ নহে। অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিই তাঁহার
অভিমত “সহোপলন্ত”; নচেৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের কাল-ভেদ সমর্থন করিয়া তিনি ঐ স্থলে পূর্ব-
পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের এককালই “সহোপলন্ত” শব্দের দ্বারা তাঁহার
বিবক্ষিত না হইলে ঐ স্থলে ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবকাশই থাকে না। কমলশীল এই আশঙ্কার
সমাধান করিতে বলিয়াছেন যে, কালভেদ বস্তুভেদের ব্যাপ্য। অর্থাৎ কালভেদ থাকিলেই
বস্তুভেদ থাকে। সুতরাং ধর্মকীর্তি যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিকেই “সহোপলন্ত”
বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধির কালভেদ হইলে সম্ভব হয় না। কারণ, বিভিন্ন-
কালীন উপলব্ধি অবশ্যই বিভিন্নই হইবে, উহা এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। ধর্মকীর্তি উক্ত-
রূপ তাৎপর্য্যেই ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, উহার খণ্ডন দ্বারা তাঁহার কথিত হেতু
“সহোপলন্তে”র অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন উপলব্ধিরই সমর্থন করিয়াছেন। কমলশীল
এইরূপে ধর্মকীর্তির উক্তি বিশেষের সহিত তাঁহার পূর্বোক্ত কথার বিরোধ ভঞ্জন করায় উক্ত
কারিকা ধর্মকীর্তিরই রচিত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। সুতরাং কমলশীল পূর্বে “ঈদৃশ
এবাচার্য্যোয়ে ‘সহোপলন্তনিয়মা’দিবাদৌ প্রয়োগে হেতুর্থোহভিপ্রেতঃ” এই বাক্যে “আচার্য্য”
শব্দের দ্বারা ধর্মকীর্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ পরে তাঁহার “নমু চাচার্য্যধর্ম-
কীর্তিনা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া ধর্মকীর্তির ঐরূপ
তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। সুধীগণ এখানে কমলশীলের উক্ত সন্দর্ভে
প্রণিধান করিবেন। পরন্তু এই প্রসঙ্গে এখানে ইহা বক্তব্য যে, “সহোপলন্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি
কারিকা ধর্মকীর্তিরই রচিত হইলে উদ্ভোতকর যে, তাঁহার পূর্ববর্তী, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি।
কারণ, উদ্ভোতকর ঐ কারিকা বা উহার দ্বারা কথিত ঐ হেতুর উল্লেখপূর্বক কোন বিচারই
করেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে উক্ত হেতুর বিচারপূর্বক খণ্ডনও নিতান্ত কর্তব্য।

১। নমু চাচার্য্যধর্মকীর্তিনা “বিষয়স্ত জ্ঞানহেতুতয়োপলব্ধিঃ প্রাপ্তপলন্তঃ পশ্চাৎ সংবেদনশ্রুতি চে”দিতোবং পূর্ব-
পক্ষমাদর্শনতা এককালার্থঃ সহশব্দোহত্র দর্শিতো ন ভূভেদার্থঃ—এককালেহি বিবক্ষিতে কালভেদোপদর্শনং পরন্তু যুক্তং
ন ভূভেদে সতীতি চেন্ন, কালভেদস্ত বস্তুভেদেন বাধ্যত্বং কালভেদোপদর্শনমুপলন্তে নানাতপ্রতিপাদনার্থমেব সুতরাং যুক্তং,
ব্যাপ্যস্ত ব্যাপক্যাব্যভিচারায়।—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহা করিলেও উদ্যোতকর কেন তাহা করেন নাই, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। উদ্যোতকর বস্তুবন্ধু ও দিঙনাগের কারিকা ও মতের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে, ধর্মকীর্তির কোন উক্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং উদ্যোতকর ও ধর্মকীর্তি সমসাময়িক, তাঁহারা উভয়েই উভয়ের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, এই মতে আমাদের বিশ্বাস নাই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (৩৮৩৯ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

সে যাহা হউক, মূলকথা, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ সর্বত্র জ্ঞানের উপলব্ধিকেই বিষয়ের উপলব্ধি বলিয়াছেন। উহাই তাঁহাদিগের কথিত “সহোপলন্তনিয়ম”। উহার দ্বারা তাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উহা স্বীকার করেন নাই। বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য ভদন্ত শুভগুপ্ত উক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাঁহার অনেক কথাই গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞান ও বিষয়ের যে একই উপলব্ধি, ইহা অসিদ্ধ। অন্ততঃ উহা সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। কারণ, উহা উভয় পক্ষের নিশ্চিত হেতু নহে। সুতরাং উহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ নিশ্চয় করা যায় না। এইরূপ উক্ত হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র রক্ষিত “তত্ত্বসংগ্রহে” প্রতিবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে পূর্বোক্ত “সহোপলন্তনিয়মে”র সমর্থনপূর্বক উহা যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদসাধক হইতে পারে,—ঐ হেতু যে, অসিদ্ধ বা ব্যভিচারী নহে, ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে আরও নানা যুক্তির দ্বারা ও ভট্ট কুমারিলের প্রতিবাদের উল্লেখপূর্বক তাহারও খণ্ডন করিয়া নিজসম্মত বিজ্ঞানবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য কমলশীলও উক্ত মতের প্রতিবাদী ভদন্ত শুভগুপ্ত প্রভৃতির সমস্ত কথার উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদের রহস্য বুঝিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। কেবল প্রতিবাদিগণের প্রতিবাদ পাঠ করিলে উভয় মতের সমালোচনা করাও যায় না। স্থূল কথায় ঐরূপ গভীর বিষয়ের প্রকাশ ও নিরাস করাও যায় না। পরন্তু বিজ্ঞানবাদের সমর্থক বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় কোন কোন অংশে মতভেদও হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য বস্তুবন্ধুর “ত্রিংশিকাবিজ্ঞাপ্তিকারিকা” এবং উহার ভাষ্য বুঝিতে পারিলে বস্তুবন্ধুর ব্যাখ্যাত বিজ্ঞানবাদ বুঝা যাইবে। পরন্তু বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদ্যোতকর প্রভৃতির প্রতিবাদও প্রণিধানপূর্বক বুঝিতে হইবে। মীমাংসাভাষ্যে শবর স্বামীও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক পরে বৌদ্ধমহাযানসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয়সময়ে ভট্ট কুমারিল “শ্লোকবার্ত্তিকে” “নিরাবহনবাদ” ও “শূন্যবাদ” প্রকরণে অতিসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জগৎ তিনি বৌদ্ধগুরু

নিকটেও অধ্যয়ন স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাও শুনা যায়। মীমাংসারচাৰ্য্য প্রভাকরও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। শালিকনাথের “প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে তাহা ব্যক্ত আছে। পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের কার্য্য বিজ্ঞজনবিদিত। পরে শাস্ত্ররক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাবে আবার ভারতে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইলে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এবং সর্বশেষে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্ত শেষে উদয়নাচার্য্য “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থে যেরূপ পরিপূর্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহা পদে পদে চিন্তাকর্ষক ও সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ। প্রাচীনগণ ঐ গ্রন্থকে “বৌদ্ধাধিকার” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। এখন অনেকে বলেন, উহার নাম “বৌদ্ধধিক্কার”—“বৌদ্ধাধিকার” নহে। উদয়নাচার্য্যের ঐ অপূৰ্ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তদানীন্তন অবস্থাও বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধমতের খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থের বিশেষ অনুশীলনও অত্যাশ্রুক। ফলকথা, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে বৈদিক ধর্ম্মরক্ষক মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের বহু বহু আচার্য্য নানা স্থানে বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া নিজ সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও বৌদ্ধপ্রভাববিধ্বংসী বাৎশ্যায়ন ও উদ্ভ্যোতকর প্রভৃতি বহু আচার্য্যের যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহা বৌদ্ধযুগেও ভারতে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উজ্জ্বল চিত্র ও বিজয়পতাকা। ঐ সমস্ত প্রাচ্য চিত্রে একেবারেই দৃষ্টিপাত না করিয়া অভিনব কল্পিত প্রতীচ্যচিত্র দর্শনে মুগ্ধ হওয়া ঘোর অবিচার। সেই অবিচারের ফলেই শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে ভারতে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তিনি তাঁহাদিগকে উপবীত প্রদান করেন, ইত্যাদি প্রকার নস্তুব্যও এখন শুনা যায়। কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ বস্তুব্য এই যে, বাৎশ্যায়নের পূর্বেও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়ের সময় হইতেই শেষ পর্য্যন্ত ভারতে সর্বশাস্ত্রনিষ্ঠাত তপস্বী কত ব্রাহ্মণ যে বৈদিকবর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্ত প্রাণপণে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সময়ে নানা স্থানে তাঁহাদিগেরও কিরূপ প্রভাব ছিল এবং তাঁহারা নানা শাস্ত্রে কত অপূৰ্ণ গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে কত শিষ্য প্রশিষ্য ও তাঁহাদিগের মতবিধ্বাসী কত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্থানবিশেষে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় কত ব্রাহ্মণ যে নিজ সম্পত্তি শাস্ত্রগ্রন্থ মন্তকে করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষার জন্ত পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে? প্রতীচ্য দিব্যচক্ষুর দ্বারা ত ঐ সমস্ত দেখা যাইবে না। একদেশদর্শী হইয়া প্রত্নতত্ত্বের নির্ণয় করিতে গেলেও প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয় হইবে না। এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনার স্থান নাই।

পূর্বোক্ত “বিজ্ঞানবাদ” খণ্ডনে প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থূলভাবে মূলকথাগুলি প্রণিধানপূর্বক বুঝিতে হইবে। প্রথম কথা—জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় যে বস্তুতঃ অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই। জ্ঞেয় হইলেই তাহা জ্ঞানপদার্থ এবং জ্ঞানের উপলব্ধিই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি,—

জ্ঞেয় বিষয়ের কোন পৃথক উপলব্ধি হয় না, সুতরাং জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের পৃথক সত্তা নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের পৃথক উপলব্ধিই হইয়া থাকে। জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নকারেই জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকাশ হয়। পরন্তু জ্ঞানক্রিয়ার কর্মকারকই জ্ঞেয় বিষয়। সুতরাং উহা হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, ক্রিয়া ও তাহার কর্মকারক কখনই এক পদার্থ হয় না। যেমন ছেদনক্রিয়া ও ছেদ্য দ্রব্য এক পদার্থ নহে। পরন্তু জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা ব্যতীত জ্ঞানেরও সত্তা থাকে না। কারণ, নির্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞেয় বিষয়গুলি বস্তুতঃ জ্ঞানেরই আকারবিশেষ; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপে উহার সত্তা আছে, ইহা বলিলে বাহ্য স্বরূপে উহার সত্তা নাই অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ নাই, উহা অলীক, ইহাই বলা হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানাকার পদার্থ অর্থাৎ অন্তঃজ্ঞেয় বস্তু বাহ্যবৎ প্রকাশিত হয়, এই কথা বলা যায় না। কারণ, বাহ্য পদার্থ বক্ষ্যাপুত্রের গ্রায় অলীক হইলে উহা উপমান হইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন “বক্ষ্যাপুত্রের গ্রায় প্রকাশিত হয়” এইরূপ কথা বলা যায় না, তদ্রূপ “বহির্কর্ত্ত প্রকাশিত হয়” এই কথাও বলা যায় না। বিজ্ঞানবাদী বাহ্য পদার্থের সত্তা মানে না, উহা বাহ্যত্বরূপে অলীক বলেন, কিন্তু অন্তঃজ্ঞেয় বস্তু বহির্কর্ত্ত প্রকাশিত হয়, এই কথাও বলেন; সুতরাং তাঁহার ঐরূপ উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য নাই। শারীরিকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই কথা বলিয়াছেন। পরন্তু জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা ব্যতীত তাহার বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যতীতও জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিজ্ঞানবাদী অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যতীত সেই সেই বিষয়ে সংস্কারের বৈচিত্র্যও হইতে পারে না। প্রতিক্ষেপে বিজ্ঞানেরই সেই সেই আকারে উৎপত্তি হয় এবং উহাই বিজ্ঞানের পরিণাম, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঐরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোন কারণ বলা যায় না। যে বিজ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হইবে, তাহা ঐ সময়ে অপর বিজ্ঞানের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরন্তু আলয়বিজ্ঞানসন্তানকে আত্মা বলিলেও উহাতে কালান্তরে কোন বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, যে বিজ্ঞান পূর্বে সেই বিষয়ের অনুভব করিয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় তাহার অনুভূত বিষয় অপর বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। আলয়বিজ্ঞানসন্তানকে স্থায়ী পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে “সর্বৎ ক্ষণিকং” এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। সুতরাং উহাও প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে (প্রথম খণ্ড, ১৭৩—৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের সত্তাই না থাকিলে সর্বত্র জ্ঞানেরই জ্ঞান জন্মিতেছে, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানের পরে “আমি জ্ঞানকে জানিলাম” এইরূপ জ্ঞান কেন জন্মে না? ইহা বলিতে হইবে। সর্বত্রই কল্পিত বাহ্য পদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তঃজ্ঞেয় বস্তুই বাহ্যবৎ প্রকাশিত হয়, ইহা বলিলে সেই সমস্ত বাহ্য পদার্থের কাল্পনিক বা ব্যবহারিক সত্তাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে সেই সমস্ত বাহ্য পদার্থকে পারমার্থিক বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলা যায় না। কাল্পনিক ও পারমার্থিক পদার্থের অভেদ সম্ভব নহে। অসৎ ও সৎপদার্থেরও অভেদ সম্ভব নহে। পরন্তু বিজ্ঞানবাদী

স্বপ্নাদিজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞানস্বরূপের দ্বারা জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞানকে ও ভ্রম বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞান স্বপ্নাদি জ্ঞানের তুল্য নহে। পরন্তু স্বপ্নাদি জ্ঞান ভ্রম হইলেও উহাও একেবারে অসদ্বিষয়কও নহে। সুতরাং তদদৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞানকে অসদ্বিষয়ক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু সর্বাবস্থায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম হইলে জগতে যথার্থজ্ঞান থাকে না। উহা না থাকিলেও ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না। কারণ, যথার্থ-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই পূর্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমই নিশ্চয় করা যায়। নচেৎ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা মুখে বলিলে কেহ তাহা গ্রহণ করে না। যথার্থজ্ঞান একেবারেই না থাকিলে প্রমাণেরও সত্তা থাকে না। কারণ, যথার্থ অনুভূতির সাধনকেই প্রমাণ বলে। সেই প্রমাণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গেলে বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যায়। বিজ্ঞানবাদী অপরের সমস্ত প্রমাণ-পদার্থ গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত অনুমানের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, উহার প্রামাণ্য নাই। কারণ, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না। বাহ্য পদার্থের যখন জ্ঞান হইতে পৃথকরূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কোন অনুমানের দ্বারাই তাহার অসত্তা সিদ্ধ করা যায় না। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও “নাভাব উপলক্ষেঃ” (২:২১২৮) এই সূত্রের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন এবং পরে “বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ” এই সূত্রের দ্বারা জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষসমূহ যে, স্বপ্নাদির তুল্য নহে—এই কথা বলিয়া বিজ্ঞানবাদীর অনুমানের দৃষ্টান্তও খণ্ডন করিয়াছেন। যোগদর্শনের কৈবল্যপাদের শেষে এবং উহার ব্যাসভাষ্যেও বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন হইয়াছে। পরন্তু দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থে যে বাহ্য ও স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা বিজ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে না। সুতরাং উহা বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ, ইহাও বলা যায় না। বিজ্ঞানে বাহ্য নাই, তাহা বিজ্ঞানের আকার বা বিজ্ঞানরূপ হইতে পারে না। পরন্তু যে দ্রব্য চক্ষুঃসংযোগের পরে তাহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা স্পর্শক হইলে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষকাল পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব না থাকায় উহাতে স্থূলত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং “সর্পিং স্পর্শকং” এই সিদ্ধান্তও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। পরন্তু বিজ্ঞানবাদী যে বাহ্যশক্তিতে জ্ঞানাকার রজতেরই ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ঐ বাহ্যশক্তিও ত তাঁহার মতে বস্তুতঃ জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নহে। উহাও জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। তাহা হইলে বস্তুতঃ একটা জ্ঞান-পদার্থেই অপর জ্ঞানপদার্থের ভ্রম হওয়ায় তাহাতে বস্তুতঃ কোন বাহ্য সম্বন্ধ না থাকায় বাহ্যবৎ প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহাও বিচার্য। পরন্তু তাহা হইলে সর্বত্র বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ সংপদার্থই অপর জ্ঞানস্বরূপ সংপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, ইহাই স্বীকার্য। বিজ্ঞানবাদী কিন্তু তাহা বলেন না। তিনি বাহ্যপ্রতীতির অপলাপ করিতে না পারিয়া কল্পিত বাহ্য পদার্থেই জ্ঞানের আরোপ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্পিত বাহ্যশক্তি জ্ঞান হইতে ভিন্ন-রূপে অসৎ। উহাতেই রজতাকার জ্ঞান বা জ্ঞানাকার রজতের ভ্রম হওয়ায় সেই রজতের বাহ্যবৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যরূপে বাহ্য যদি একেবারেই অসৎ বা অলীকই হয়, তাহা হইলে বাহ্যবৎ প্রকাশ হয়, ইহা বলা যায় না। বাহ্যবৎ প্রকাশ বলিতে গেলেই বাহ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার্য হওয়ায় বিজ্ঞানবাদীর নিজের বাণেই তাঁহার নিজের বিনাশ তখনই হইবে। পরন্তু ভ্রমের বাহ্য অধিষ্ঠান,

অর্থাৎ যে পদার্থে অপর পদার্থের ভ্রম হয়, সেই পদার্থের সহিত সেই অপর পদার্থ অর্থাৎ আরোপ্য পদার্থটির সাদৃশ্য ব্যতীত সাদৃশ্যমূলক ঐ ভ্রম হইতে পারে না। তাই শুদ্ধিতে রজতভ্রমের গ্রায় মনুষ্যাদি-ভ্রম জন্মে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদের মতে কল্পিত বাহ্য শক্তি যাহা অসৎ, তাহাই রজতাকার জ্ঞানরূপ সংপদার্থের ভ্রমের অধিষ্ঠান হইলে অসৎ ও সংপদার্থের কোন সাদৃশ্য সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ ভ্রম হইতে পারে না। কল্পিত বা অসৎ বাহ্য শক্তির সহিতও রজতাকার জ্ঞানের কোনরূপে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, ইহা বলিলে কল্পিত সমস্ত বিষয়ের সহিতই উহার কোনরূপ সাদৃশ্য স্বীকার্য হওয়ায় শুদ্ধিতে রজতভ্রমের গ্রায় মনুষ্যাদি-ভ্রমও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, জ্ঞানাকার মনুষ্যাদিরও ঐ কল্পিত বাহ্য শক্তিতে ভ্রম কেন হইবে না? ইহাতে বিজ্ঞানবাদের কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান নিয়ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াকারেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ঐক্যপই পরিণাম স্বভাব-সিদ্ধ। অর্থাৎ সর্ববিষয়াকারেই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানের স্বভাবানুসারে শুদ্ধিতে ঐ স্থলে রজতাকার জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে উহাতে অজ্ঞাকার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হয়। সর্বাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা বলিলে বিজ্ঞানবাদের মতে উক্তরূপ ভ্রমে বিজ্ঞানের স্বভাব বা শক্তিবিশেষই নিয়ামক, সাদৃশ্যাদি আর কিছুই নিয়ামক নহে, ইহাই স্বীকার্য। কিন্তু তাহা হইলে ঐ স্বভাবের স্বতন্ত্র সত্তা ও উহার নিয়ামক কিছু আছে কি না, ইহা বক্তব্য। বিজ্ঞানের স্বভাবও যদি অপর বিজ্ঞানরূপই হয়, তাহা হইলে সেই বিজ্ঞানেরও স্বভাববিশেষ স্বীকার করিয়া উহার নিয়ামক বলিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত বিজ্ঞানের অনন্ত স্বভাব বা শক্তি কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানবাদী কল্পনাশক্তিবলে ব্যর্থ বিচার করিলেও বস্তুতঃ উহা তাঁহার কল্পনা মাত্র, উহা বিচারসহ নহে।

বেদবিশ্বাসী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় কিন্তু ঐক্য কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞেয় বিষয় বা জগৎপ্রপঞ্চ সংসৃত নহে, অসংসৃত নহে, সং অথবা অসং বলিয়া উহার নির্কচন বা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং উহা অনির্কচনীয়। অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সনাতন ব্রহ্মে ঐ অনির্কচনীয় জগতের ভ্রম হইতেছে। ঐ ভ্রমের নাম “অনির্কচনীয়খ্যাতি”। শুদ্ধিতে যে রজতের ভ্রম হইতেছে, উহাও “অনির্কচনীয়খ্যাতি”। ঐ স্থলে বাহ্য শক্তি অসৎ নহে; উহা ব্যবহারিক সত্য। উহাতে অনির্কচনীয় রজতের উৎপত্তি ও ভ্রম হইতেছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যদি নিজ মত সমর্থন করিতে যাইয়া শেষে উক্ত অদ্বৈত মতেরই নিকটবর্তী হন, তাহা হইলে কিন্তু অদ্বৈতমতেরই জয় হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত, বেদকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত মত সমর্থিত। তাই উহা “বেদনয়” অর্থাৎ বৈদিক মত বলিয়া কথিত হয়। বেদ ও সনাতন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অপেক্ষায় বগী। সুতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিচার করিতে করিতে শেষে আত্মরক্ষার জন্ত অদ্বৈত মতেরই নিকটবর্তী হইলে তখন অদ্বৈত মতের জয় অবশ্যজ্ঞাবী। কারণ, বলবানেরই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তখন বিজ্ঞানবাদের নিজ মত ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার বৌদ্ধত্বও থাকিবে না। তখন তিনি “ইতো লুপ্তস্ততো নষ্ট” হইবেন। আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্তরূপ তাৎপর্য্যই প্রথম

কল্পে বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন।^১ পরেই আবার বলিয়াছেন যে, অথবা “মতিকর্দম” অর্থাৎ বুদ্ধির মালিগা পরিত্যাগ করিয়া নীলাদি বাহ্য বিষয়ের পারমার্থিকত্ব বা সত্যতায় অর্থাৎ আমাদের সন্মত দ্বৈতমতে অবস্থান কর। তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধির মালিগাবশতঃ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করুন। তাহাতেও আমাদের ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির মালিগা নিবৃত্তি হইলে তিনি আর এই বিশ্বের নিন্দা করিতে পারিবেন না। ইহাকে ক্ষণভঙ্গুরও বলিতে পারিবেন না। অনিন্দ্য ঈদৃশ বিশ্বকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য্য বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিলেও পরে বিশ্বের সত্যতা বা দ্বৈতমতে অবস্থান করিতেই বলিয়াছেন এবং তাহাতে বুদ্ধির মালিগা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি এখানে অদ্বৈতমতেরই সর্বাপেক্ষা বলবত্তা বলিয়া উক্ত মতে তাঁহার অনুরাগ সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার পূর্বাধিকার গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলেও ইহার বিপরীতই বুঝা যায়। এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (১২৫—২৯ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য। ফলকথা, উক্ত অদ্বৈতমতের স্থান থাকিলেও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের কোন স্থানই নাই, অর্থাৎ উহা দাঁড়াইতেই পারে না, ইহাই উদয়নের চরম বক্তব্য। তাই শেষে বলিয়াছেন,—“তথাগতমতস্ত তু কোহবকাশঃ।” পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদী সর্বত্র কল্পিত বাহ্য পদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তর্জ্ঞেয় বস্তুরই ভ্রম স্বীকার করেন। জ্ঞানরূপ আত্মাই তাঁহার মতে অন্তর্জ্ঞেয়। সুতরাং সর্বত্র আত্মখ্যাতিই তাঁহার স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে “ইহা নীল” এইরূপ জ্ঞান না হইয়া “আমি নীল” এইরূপই জ্ঞান হইত এবং “ইহা রক্ত” এইরূপ জ্ঞান না হইয়া “আমি রক্ত” এইরূপ জ্ঞানই হইত। কারণ, সর্বত্র অন্তর্জ্ঞেয় জ্ঞানেরই ভ্রম হইলে তাহাতে অবশ্য জ্ঞানরূপ আত্মারও সর্বত্র “অহং” এই আকারে প্রকাশ হইবেই। কিন্তু তাহা যখন হয় না, অর্থাৎ আমি রক্ত, আমি নীল, আমি ঘট, ইত্যাদিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি যখন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীও স্বীকার করেন না, তখন পূর্বোক্ত “আত্মখ্যাতি” কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। এখন এখানে ঐ “আত্মখ্যাতি” বিরূপ, তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাতে প্রথমে “অন্তথাখ্যাতি” ও “অসংখ্যাতি” প্রভৃতিও বুঝা আবশ্যক।

অনেকে বলিয়াছেন যে, “খ্যাতি” শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। বস্তুতঃ “খ্যাতি” শব্দের অর্থ জ্ঞান মাত্র। পূর্বোক্ত ৩৪শ সূত্রের বার্তিকে উদ্যোতকরও জ্ঞান অর্থেই “খ্যাতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুমিতিদীপ্তির টীকার শেষে গদাধর ভট্টাচার্য্য “অসংখ্যাতি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেও লিখিয়াছেন,—“খ্যাতিজ্ঞানং।” যোগদর্শনে “তৎপরং পুরুষখ্যাতে গণবৈতৃষ্ণ্যং” (১১৬) এবং “বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ” (২১২) এই সূত্রে যথার্থজ্ঞান অর্থেই

১। প্রবিশ বা অনির্কর্চনায়খ্যাতিবুদ্ধিং, তিষ্ঠ বা মতিকর্দমমপহায় নীলাদীনাং পারমার্থিকত্বে তস্যাং—

ন গ্রাহভেদমবধূয় ধিয়োহস্তি বৃত্তিস্তদ্বাদনে বলিনি বেদনয়ে জয়শ্রীঃ।

নো চেদনিন্দ্যমিদমীদৃশমেব বিখ্যং তথ্যং, তথাগতমতস্ত তু কোহবকাশঃ।—আত্মতত্ত্ববিবেক।

“খ্যাতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তবে “আত্মখ্যাতি” প্রভৃতি নামে যে “খ্যাতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ ভ্রমজ্ঞান। এই ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিক-সমাজে নানারূপ সূক্ষ্ম বিচারের ফলে সম্প্রদায়ভেদে নানা মতভেদ হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত মতভেদই সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন মত স্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়াছিল। তাই নানা গ্রন্থে আমরা ঐ সমস্ত মতভেদের সমালোচনাপূর্বক খণ্ডন-মণ্ডন দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটা মতই এখন প্রসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় উহাকে “খ্যাতিপঞ্চক” বলিয়াছেন^১। যথা,—(১) আত্মখ্যাতি, (২) অসংখ্যাতি, (৩) অখ্যাতি, (৪) অজ্ঞাখ্যাতি ও (৫) অনির্কচনীয়খ্যাতি। তন্মধ্যে শেষোক্ত “অনির্কচনীয়খ্যাতি”ই তাঁহাদিগের সম্মত। তাঁহাদিগের মতে শুদ্ধিতে রজতভ্রমস্থলে অজ্ঞান-বশতঃ সেই শুদ্ধিতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি হয়। মিথ্যা বলিতে অনির্কচনীয়। অর্থাৎ ঐ রজতকে সং ও বলা যায় না, অসং ও বলা যায় না; সং বা অসং বলিয়া উহার নির্কচন করা যায় না; সুতরাং উহা অনির্কচনীয় বা মিথ্যা। উক্ত স্থলে সেই অনির্কচনীয় রজতেরই ভ্রম হয়। উহারই নাম “অনির্কচনখ্যাতি” বা “অনির্কচনীয়খ্যাতি”। এইরূপ সর্বত্রই তাঁহাদিগের মতে ভ্রমস্থলে অনির্কচনীয় বিষয়েরই উৎপত্তি ও ভ্রম হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সর্বত্র ভ্রমের নাম “অনির্কচনীয়খ্যাতি”। তাঁহাদিগের মূল যুক্তি এই যে, শুদ্ধিতে রজতভ্রম ও রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি স্থলে রজত ও সর্প প্রভৃতি সে স্থানে একেবারে অসং হইলে উহার ভ্রম হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধি স্বীকৃত প্রত্যক্ষ জন্মে না। শুদ্ধিতে রজতভ্রম প্রভৃতি প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম। সুতরাং উহাতে রজতাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধি অবশ্যই আবশ্যক। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ঐ স্থলে রজতাদি মিথ্যা বিষয়ের উৎপত্তি হয়। তাহার সহিতই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিভ্রম এইরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ঐ স্থলে রজতাদিজ্ঞানকেই সম্বন্ধি বলিয়া স্বীকার করিয়া, ঐ সমস্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপাদন করিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধিকে তাঁহারা “জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি” বলিয়াছেন। উহা অলৌকিক সম্বন্ধিবিশেষ। তজ্জন্ত পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষই জন্মে। সুতরাং উহাতে চক্ষুঃসংযোগাদি লৌকিক সম্বন্ধি অনাবশ্যক এবং তজ্জন্ত ঐ ভ্রমস্থলে সেই স্থানে মিথ্যা বিষয়ের সৃষ্টি কল্পনাও অনাবশ্যক। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় জ্ঞানরূপ অলৌকিক সম্বন্ধি স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উহা স্বীকার করিলে পরস্পরাদি স্থানে বহ্যাদির অমুমিতি হইতে পারে না। কারণ, ঐ সমস্ত অমুমিতির পূর্বে সাধ্য বহ্যাদিজ্ঞান যখন থাকিবেই, তখন ঐ জ্ঞানরূপ সম্বন্ধিভ্রম পরস্পরাদিতে বহ্যাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষই জন্মিবে। কারণ, একই বিষয়ে অমুমিতির সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষের সামগ্রী বলবতী। এইরূপ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, ইহা নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। সুতরাং যাহা স্বীকার করিলে অমুমিতির উচ্ছেদ হয়, তাহা স্বীকার করা যায় না। এতদ্বত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই

১। আত্ম-খ্যাতিঃ অসংখ্যাতিঃ অখ্যাতিঃ অজ্ঞাখ্যাতিঃ অনির্কচনীয়খ্যাতিঃ।

তথাহিনির্কচনখ্যাতিঃ ইতি তৎ খ্যাতিপঞ্চকং।

যে, জ্ঞানমাত্রই যে, অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের জনক অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহা আমরা বলি না। কারণ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। কিন্তু যে জ্ঞানবিশেষের পরে প্রত্যক্ষজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে, অথচ তৎপূর্বে ঐ প্রত্যক্ষজনক লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকে না, তাহা সম্ভবও হয় না, সেখানেই আমরা সেই পূর্বজাত জ্ঞানবিশেষকে প্রত্যক্ষজনক অলৌকিক একপ্রকার সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করি। পর্তুতাদি স্থানে বহুদির অহুমিতি স্থলে পূর্বে বহুদি সাধ্যজ্ঞান থাকিলেও উহা ঐ সন্নিকর্ষ হইবে না। কারণ, উহার পরে ঐ স্থলে প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং ঐ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী না থাকায় অহুমিতির কোন বাধা নাই। অবশ্য অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আরও নানা যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া “অনির্ধ্বচনীয়াখ্যাতি”-পক্ষই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। শারীরকভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় “অন্তথাখ্যাতি” ও “আত্মখ্যাতি” প্রভৃতি পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতসমূহের উল্লেখপূর্বক “অনির্ধ্বচনীয়াখ্যাতি”-পক্ষই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। সেখানে “ভামতী” টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত মতভেদের বিশদ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়া অত্রাণ্ড মতের খণ্ডনপূর্বক আচার্য্য শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পরে আচার্য্য শঙ্করের সম্প্রদায়রক্ষক বিদ্যারণ্য মুনিও “বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ” পুস্তকে ঐ সমস্ত মতের বিশদ সমালোচনা করিয়া শঙ্করের মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত মতের বিশেষ বিচারাদি জানিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। শ্রীমদ্বাচস্পতির বেদান্তাচার্য্য মহামনোষী বেক্টনাথের “শ্রীমদ্বাচস্পতি” গ্রন্থেও ঐ সমস্ত মতের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিচার পাওয়া যায়।

কিন্তু “শ্রীমদগীর্জা”কার মহামনোষী জয়ন্ত ভট্ট পূর্বোক্ত “অনির্ধ্বচনীয়াখ্যাতি”কে গ্রহণই করেন নাই। তিনি (১) বিপরীতখ্যাতি, (২) অসংখ্যাতি, (৩) আত্মখ্যাতি ও (৪) অখ্যাতি, এই চতুর্বিধ খ্যাতিরই উল্লেখ করিয়া^১ বিস্তৃত বিচারপূর্বক শেষোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া, প্রথমোক্ত বিপরীতখ্যাতিকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উহাই শ্রীমদ্বাচস্পতির সিদ্ধান্ত। উহারই প্রসিদ্ধ নাম “অন্তথাখ্যাতি”। জয়ন্ত ভট্টের পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় “তত্ত্বচিন্তা-মণি”র “অন্তথাখ্যাতিবাদ” নামক প্রকরণে বিস্তৃত বিচার দ্বারা গুরু প্রভাকরের “অখ্যাতিবাদ” খণ্ডন করিয়া, ঐ অন্তথাখ্যাতিবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন ; বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে শ্রীমদ্বাচস্পতির সম্প্রদায়ের সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রথমেই ঐ “অন্তথাখ্যাতিবাদ”ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে একই বাক্যের দ্বারা “অন্তথাখ্যাতি” ও “আত্মখ্যাতি” এই মতদ্বয়ই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও প্রণিধান

১। তথাহি ভাস্করাচার্য্য প্রমুখং দ্রষ্টব্যম্ভবতি।

চতুঃপ্রকারা বিপরীতরূপপদোক্তা নানানি ॥

বিপরীতখ্যাতিঃ অসংখ্যাতিঃ আত্মখ্যাতিঃ অখ্যাতিঃ।—শ্রীমদগীর্জা, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

করা আবশ্যক^১। অগ্ৰথাখ্যাতিবাদী ত্রায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, শুক্তিতে রজত-
ভ্রম স্থলে শুক্তি ও রজত, এই উভয়ই সংপদার্থ। শুক্তি সেখানেই বিদ্যমান থাকে। রজত
অগ্ৰত বিদ্যমান থাকে। শুক্তিতে অগ্ৰত বিদ্যমান সেই রজতেরই ভ্রম হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে
শুক্তি শুক্তিরূপে প্রতিভাত না হইয়া “অগ্ৰথা” অর্থাৎ রজতপ্রকারে বা রজতরূপে প্রতিভাত হয়।
তাই ঐ ভ্রমজ্ঞানকে “অগ্ৰথাখ্যাতি” বলা হয়। ঐ স্থলে শুক্তিতে রজতের যে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ
জন্মে, উহা একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ। সাদৃশ্যাদি জ্ঞানবশতঃ ঐ স্থলে প্রথমে পূর্বানুভূত
রজতের স্মরণাত্মক যে জ্ঞান জন্মে, উহাই ঐ প্রত্যক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিবর্ষ। ঐ সন্নিবর্ষের
নামই জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাপ্তি। উহা স্বীকার না করিলে কুত্রাপি ঐরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপত্তি
হয় না। কারণ, ভ্রমপ্রত্যক্ষ স্থলে সর্বত্রই সেই অগ্ৰ বিষয়টী সেখানে বিদ্যমান না থাকায় সেই
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সন্নিবর্ষ সম্ভব হয় না। ঐ স্থলে রজতের উপাদান-কারণাদি
না থাকায় মিথ্যা রজতের উৎপত্তিও হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় যে মিথ্যা
অজ্ঞানকে ঐ স্থলে রজতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, উহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রজতের সজাতীয় দ্রব্য-
পদার্থ না হওয়ায় রজতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরন্তু ঐরূপ অজ্ঞান বিষয়ে কোন
প্রমাণও নাই, ইহাই ত্রায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের চরম বক্তব্য। যোগদর্শনেও বিপর্যায় নামক চিত্ত-
বৃত্তি স্বীকারে পূর্বোক্তরূপ অগ্ৰথাখ্যাতিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। যোগবর্ত্তিকে (১.৮) বিজ্ঞানভিক্ষুও
ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। মীমাংসার্চাধ্য ভট্ট কুমারিলও অগ্ৰথাখ্যাতিবাদী।

মীমাংসার্চাধ্য গুরুপ্রভাকর কিন্তু একেবারে ভ্রমজ্ঞানই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি অভিনব
কল্পনাবলে সন্নিবর্ষ করিয়াছিলেন যে, জগতে “খ্যাতি” অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান নাই। সমস্ত জ্ঞানই
যথার্থ। সুতরাং তিনি “অখ্যাতি”বাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। “খ্যাতি” অর্থাৎ ভ্রমের অভাবই
“অখ্যাতি”। প্রভাকরের কথা এই যে, শুক্তি দেখিলে কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের যে “ইদং রজতং”
এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা একটী বিশিষ্ট জ্ঞান নহে—উহা জ্ঞানদ্বয়। ঐ স্থলে “ইদং” বলিয়া অর্থাৎ
ইদংরূপে সেই সম্মুখীন শুক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। পরে উহাতে রজতের সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষজ্ঞান
পূর্বদৃষ্ট রজতবিষয়ক সংস্কার উদ্ভূত হওয়ায় সেই রজতের স্মরণাত্মক জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ উক্ত
স্থলে “ইদং” বলিয়া শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরে পূর্বদৃষ্ট রজতবিশেষের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে।
ঐ জ্ঞানদ্বয়ই যথার্থ। সুতরাং ঐ স্থলে ভ্রমজ্ঞান জন্মে না। অবশ্য “ইদং” পদার্থকেই রজত বলিয়া
প্রত্যক্ষ হইলে ঐরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে
ঐরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মেই না। এইরূপ সর্বত্রই ঐরূপ স্থলে উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে।
সুতরাং জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই। এই মতে গুরুতর অনুপপত্তি এই যে, শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝিয়াই

১। তং কেচিদগ্ৰথাগ্ৰধর্মাদ্যস ইতি বদন্তি।—শারীরক ভাষ্য।

অগ্ৰথাখ্যাতিবাদিনোমতনামহ—“তং কেচি”দিত। কেচিদগ্ৰথাখ্যাতিবাদিনোংগ্ৰত শুক্ত্যানিব্যধর্মশ্চ স্বাবয়বধর্মশ্চ
দেশান্তরস্থরূপ্যাদেয়াদ্যস ইতি বদন্তি। অগ্ৰথাখ্যাতিবাদিনস্ত বাহুশুভ্যাদৌ বুদ্ধিরূপাণ্যনো ধর্মশ্চ রজতশ্চাধ্যাস আন্তরস্ত
রজতস্ত বহির্কল্পব্যাগ ইতি বদন্ত্যত্যাঃ।—ঃ প্রভা টীকা।

অনেক সময়ে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তি রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার ঐরূপ বিশিষ্ট বোধই না জন্মে, তাহা হইলে তাহার ঐ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরূপ বিভিন্ন দুইটি জ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তি ত শুক্তিকে রজত বলিয়া বুঝে না। সুতরাং সেই দ্রব্যকে রজত বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? এতদ্ব্যতীত প্রভাকর বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে যে কাহারও রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, ইহা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সেখানে কোন একটা বিশিষ্ট জ্ঞান ঐ প্রবৃত্তির কারণ নহে। কিন্তু ইদং পদার্থ শুক্তি ও পূর্কদৃষ্ট সেই রজতের ভেদের অজ্ঞানই ঐ প্রবৃত্তির কারণ। উক্ত স্থলে ইদং পদার্থ ও রজতের যে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। পরন্তু অখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও উক্ত স্থলে প্রথমে ইদং পদার্থের প্রত্যক্ষ ও পরে রজতরূপে রজতের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বয় স্বীকারই করেন। নচেৎ তাঁহাদিগের মতে উক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। তাঁহারা জ্ঞানবিশেষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াই ঐরূপ স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবার ঐ জ্ঞানদ্বয়জ্ঞান একটা বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ ভ্রম স্বীকার অনাবশ্যক। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও উক্ত স্থলে ঐরূপ জ্ঞানদ্বয় এবং শুক্তি ও রজতের ভেদের অজ্ঞান, ইহা যখন স্বীকৃত, তখন উহার দ্বারাই উক্ত স্থলে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রভাকরের শিষ্য মহামনীষী শালিকনাথ তাঁহার “প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে বিশদরূপে প্রভাকরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রভাকরের মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই।^১ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতেও সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয়, উহাও ভ্রম নহে। কারণ, শুক্তিতে রজতের বহু অংশ বিদ্যমান থাকায় উহা রজতের সদৃশ। তাই কোন সময়ে শুক্ত্যাংশের জ্ঞান না হইয়া শুক্তিগত রজতাংশের জ্ঞান হইলেই তজ্জ্ঞান সেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং পরে ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া ব্যবহার হয়। শ্রীভাষ্যে “জিজ্ঞাসাধিকরণে”ই রামানুজ বহু বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার বোধায়ন মুনিই প্রথমতঃ উক্ত মতের সমর্থক হইলে প্রভাকরের পূর্বোক্ত কল্পনাকে তাঁহারই অভিনব কল্পনা বলা যায় না। তবে প্রভাকরের উক্ত মত ও যুক্তির বিশিষ্টতা আছে। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও নহেন। শুক্তিতে রজতাংশ স্বীকারও করেন নাই। তিনি নৈয়ায়িকের ত্রায় আশ্রয় বহুত্ব ও বাস্তব কত্বাদি স্বীকার করিয়া দ্বৈতবাদী। তাঁহার সমর্থিত অখ্যাতিবাদে অধ্যাস বা ভ্রম অসিদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এবং রামানুজের সমর্থিত সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়াও তাঁহারা অধ্যাস সিদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের সেই সমস্ত বিচার সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় না।

প্রভাকরের “অখ্যাতিবাদ” খণ্ডনে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও স্তুবিস্তৃত বহু বিচার করিয়াছেন।

১। যথার্থং সর্বমেবেহ বিজ্ঞানমিতং সিদ্ধয়ে। প্রভাকরশ্লোকোক্তাঃ সমীচীনঃ প্রকথ্যতে।—ইত্যাদি প্রকরণপঞ্চিকা, “নয়নীধী” নামক চতুর্থ প্রকরণ স্তম্ভিকা।

তঁাহাদিগের চরম কথা এই যে, শুক্তি দেখিলে যে, “ইহা রজতং” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা কখনই জ্ঞানদ্বয় হইতে পারে না—উহা একটা বিশিষ্ট জ্ঞান। কারণ, উক্ত স্থলে শুক্তিতে ইহা রজত, এইরূপে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে অর্থাৎ শুক্তিকেই রজত বলিয়া না বুঝিলে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, সর্বত্রই বিশিষ্ট জ্ঞানজন্ম ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছাজন্ম প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যেমন সত্য রজতকে রজত বলিয়া বুঝিলেই তজ্জন্ম ইচ্ছাবশতঃ ঐ রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে ঐ বিশিষ্ট জ্ঞানই ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া, ঐ প্রবৃত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ শুক্তিতেও “ইহা রজত” এইরূপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলেই উহা ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া সেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হয়, ইহাই স্বীকার্য। সেখানে শুক্তি ও রজতের ভেদ-জ্ঞানের অভাবকে ঐ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিলে অভিনব কল্পনা হয়। পরন্তু ঐ স্থলে শুক্তি ও রজতের ভেদ সত্ত্বেও ঐ ভেদজ্ঞান কেন জন্মে না? উহার বাধক কি? ইহা বলিতে গেলে যদি কোন দোষবিশেষই উহার বাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দোষ-বিশেষ ঐ স্থলে “ইহা রজত” এইরূপ একটা ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞানই কেন উৎপন্ন করিবে না? ইহা বলা আবশ্যক। বিশিষ্ট জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলেও উহা অনাবশ্যক বলিয়া উৎপন্ন হয় না, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, সামগ্রী থাকিলে তাহার কার্য্য অবশ্যই জন্মিবে। পরন্তু ঐ স্থলে যখন শুক্তি ও রজতের ভেদজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ সেই সন্মুখীন পদার্থ রজত নহে, কিন্তু শুক্তি, ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন “আমি ইহাকে রজত বলিয়াই বুঝিয়াছিলাম”,—এইরূপই সেই পূর্বজাত বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে। সুতরাং তদ্বারা অবশ্যই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার পূর্বজাত সেই জ্ঞান শুক্তিতেই রজতবিষয়ক একটা বিশিষ্ট জ্ঞান। উহা পূর্বোক্তরূপ জ্ঞানদ্বয় নহে। কারণ, তাহা হইলে “আমি পূর্বে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, পরে রজতকে স্মরণ করিয়াছিলাম” এইরূপেই ঐ জ্ঞানদ্বয়ের মানস প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ফলকথা, বাধনিশ্চয়ের পরে পূর্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমস্থ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না। প্রত্যাকরের পূর্বোক্ত অখ্যাতিবাদ যে, কোন-রূপেই উপপন্ন হয় না, ইহা মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ও তঁাহার পরে মহানৈয়ায়িক গজেশ উপাধ্যায় উপাদেয় বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সর্বশূন্যতাবাদী বা সর্বাসত্ত্ববাদী প্রাচীন নাস্তিকসম্প্রদায়বিশেষের মতে সমস্ত পদার্থই অসৎ। তঁাহাদিগের মতে সর্বত্র অসত্তের উপরেই অসত্তের আরোপ হইতেছে। সুতরাং তঁাহারা সর্বত্র সর্বাত্মশেই অসত্তের ভ্রম স্বীকার করায় “অসৎখ্যাতি”বাদী। তঁাহারা গগন-কুসুমাদি অলীক পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসত্তের ভ্রমই “অসৎখ্যাতি”। মধ্বাচার্য্যের মতেও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি ভ্রমস্থলে রজতাদি অসৎ। কিন্তু তঁাহার মতে ঐ ভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্য সৎ। অর্থাৎ তঁাহার মতে ভ্রমস্থলে সৎ পদার্থেই অসৎ পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি সহপরক্ত অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি সর্বশূন্যতাবাদীর জ্ঞায় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। নাস্তিকশিরোমণি চার্বাকের

মতে সকল পদার্থই অসৎ নহে। সুতরাং তিনিও সর্বশূন্যতাবাদীর ন্যায় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। তবে তাঁহার মতে ঈশ্বর প্রভৃতি যে সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থ অসৎ, তাহারও জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত স্থলেই অসৎখ্যাতিবাদী। আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে অসৎ-বিষয়ক শব্দ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। যোগদর্শনেও “শব্দজ্ঞানানুপাতো বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ” (১।১৯) এই সূত্রের দ্বারা উহা কথিত হইয়াছে। গগন-কুসুমাদি অলৌকিক বিষয়েও শব্দজ্ঞান ভট্ট কুমারিলেরও সম্মত; ইহা তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকের “অতান্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করেতি হি” (২।৬) এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অলৌকিক বিষয়ে শব্দজ্ঞানও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কুত্ৰাপি কোন অংশেই কোনরূপেই অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন নাই, ইহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। “ব্যাপ্তিপঞ্চক-দীপ্তি”র টীকার শেষে নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও লিখিয়াছেন,—“সদুপরাগেণাপ্যসতঃ সংসর্গমর্যাদয়া ভানন্তানঙ্গীকারাৎ।” কিন্তু সর্বশেষে তিনি নিজের “পীতঃ শঙ্খো নাস্তি” এই বাক্যজন্ত শব্দবোধে সম্বন্ধাংশে অসৎখ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন কি না, ইহা নব্যনৈয়ায়িকগণ বিচার করিবেন। সাংখ্যসূত্রকারও “নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ” (৫।৫২) এই সূত্রের দ্বারা অসৎখ্যাতি অস্বীকার করিয়াছেন এবং “নাশ্বথাখ্যাতিঃ শ্ববচো ব্যাঘাতাৎ” (৫।৫৫) এই সূত্র দ্বারা অশ্বথাখ্যাতিও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে “সদসৎখ্যাতির্কীধাবাধাৎ” (৫।৫৬) এই সূত্রদ্বারা “সদসৎখ্যাতি” সমর্থন করিয়াছেন।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে অনেকে অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ শূন্যবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উক্ত মতে সকল পদার্থ অসৎ বলিয়াই ব্যবস্থিত নহে। কিন্তু (১) সৎ ও নহে, (২) অসৎ ও নহে, (৩) সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকারও নহে, (৪) সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন কোন প্রকারও নহে। “সর্বদর্শনসংগ্রহে” মাদবাচার্য্যও উক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যকেই “তত্ত্ব” বলিয়াছেন^১। উক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় “সমাধিরাজসূত্রে” স্পষ্টভাষায় উক্ত হইয়াছে,—“অস্তীতি নাস্তীতি উভেহপি মিথ্যা”। অর্থাৎ পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয়ই মিথ্যা। “মাধ্যমিককারিকা”র দেখা যায়,—“আত্মনোহস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ।” (তৃতীয় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বও কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না, নাস্তিত্বও কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উক্ত মতে নাস্তিত্বই শূন্যতা নহে। অতএব উক্ত মতে সকল পদার্থই অসৎ বলিয়া নির্দ্ধারিত না হওয়ায় শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে কিরূপে অসৎখ্যাতিবাদী বলা যায়? পরন্তু উক্ত মতে পূর্বোক্ত চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যই পারমার্থিক সত্য। সৎ বলিয়া লৌকিক বুদ্ধির বিষয় পদার্থ কাল্পনিক সত্য। উহাকে “সাংবৃত” সত্যও বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থ ও উহার প্রতিবাদগ্রন্থে অনেক স্থলে “সংব্রতি” ও “সাংবৃত” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা বা কল্পনাকেই “সংব্রতি” বলা হইয়াছে। সুতরাং কাল্পনিক সত্যকেই “সাংবৃত” সত্য

১। অতঃপূর্বঃ সদসদ্ব্যবস্থানুভবান্বকচতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যমেব।—“সর্বদর্শনসংগ্রহে” বৌদ্ধদর্শন।

বলা হইয়াছে। শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সত্য* স্বীকার করায় তাঁহারা বিবর্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের ত্রায় অনির্বাচ্যবাদী, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিবর্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের ত্রায় ভ্রমের মূল অধিষ্ঠান কোন নিত্য পদার্থ স্বীকার না করায় উক্ত মত বেদান্তের অদ্বৈতমতের কোন অংশে সদৃশ হইলেও উহা অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ এবং উক্ত মতে জগদ্ভ্রমের মূল অধিষ্ঠান কোন সনাতন সত্য পদার্থ স্বীকৃত না হওয়ায় উহা কোন সময়ে প্রবল হইলেও পরে অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐতিহাসিক সনাতন ব্রহ্মকে জগদ্ভ্রমের মূল অধিষ্ঠানরূপে অবলম্বন করিয়াই শ্রোত অদ্বৈতবাদের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সমস্ত মূল মতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সকলের মতেই “সর্বং ক্ষণিকং।” কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র বলিয়া সমস্ত বিজ্ঞানকেই অনিত্য বলিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর ঐশ্বর্য ও যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের নিত্যতা ও চিদানন্দরূপতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়ের স্বীকৃত তত্ত্ব “শূন্য”ই শঙ্করের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন,—“চতুষ্কোটি-বিনির্গুণং শূন্যমিত্যভিধীয়তে।” কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম “সৎ” বলিয়াই নির্ধারিত। সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত চতুষ্কোটি-বিনির্গুণ কোন তত্ত্ব নহেন। তিনি ক্ষণিকও নহেন। তিনি সত্যতঃ সৎস্বরূপে বিদ্যমান। তিনি মাধ্যমিকের মিথ্যাবুদ্ধির অগোচর সনাতন সত্য। নাগার্জ্জুনের সময় হইতেই শূন্যবাদের পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা ও বিশেষ সমর্থন হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন কালে সকল পদার্থের নাস্তিত্বই এক প্রকার শূন্যবাদ বা শূন্যতাবাদ নামে কথিত হইত, ইহা আমরা ভাষ্যকার বাংলায়নের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাংলায়ন সকল পদার্থের নাস্তিত্ববাদী। নাস্তিকবিশেষকেই “অনুপলব্ধিক” বলিয়া তাঁহার মতের নিরাস করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যাত পূর্বোক্তরূপ শূন্যবাদের কোন আলোচনা বাংলায়নভাষ্যে পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না, তাহা অবশ্য চিন্তনীয়। সে যাহা হউক, মূল কথা, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি শূন্যবাদীকে আমরা অসংখ্যাতিবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় আত্মব্যাতিবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদিগের কথা এই যে, জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েরই সত্তা কেহ সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, জ্ঞানে আরোহণ না করিলে কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না। সুতরাং বুঝা যায় যে, জ্ঞানই বস্তুতঃ জ্ঞেয়।

১। যে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধিমানঃ ধর্ম্মদেশনা।

লৌকিকসংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ ॥—মাধ্যমিক কারিকা।

সংবৃত্তিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং স্মৃতং।

বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃত্তিরূপাৎ ॥—শান্তিঃদেবকৃত “বোধিচর্য্যাবতার”।

অন্তর্জ্ঞেয় ঐ জ্ঞানই বাহ্য আকারে প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ উহা বাহ্য পদার্থ নহে। কল্পিত বাহ্য পদার্থেই অন্তর্জ্ঞেয় পদার্থের ভ্রম হইতেছে। অন্তর্জ্ঞেয় ঐ জ্ঞান বা বুদ্ধিই আত্মা। সুতরাং সর্বত্র কল্পিত বাহ্য পদার্থে বস্তুতঃ আত্মারই ভ্রম হয়। সুতরাং ঐ ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলা হইয়াছে। যেমন গুপ্তিতে রজতভ্রম স্থলে গুপ্তি কল্পিত বাহ্য পদার্থ। উহাতে আন্তর অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞেয় রজতেরই ভ্রম হয়। কারণ, ঐ রজত, জ্ঞানেরই আকারবিশেষ অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহা আত্মা বা আত্মধর্ম। সুতরাং উহা আন্তর বা অন্তর্জ্ঞেয় বস্তু। উহা বাহ্য না হইলেও বাহ্যবৎ প্রকাশিত হওয়ায় উহাও বাহ্য পদার্থ বলিয়া কল্পিত ও কথিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্বত্র অন্তর্জ্ঞেয় বিজ্ঞানেরই জ্ঞান হওয়ায় তদ্ভিন্ন কোন জ্ঞেয় নাই। ফলকথা, সর্বত্রই অন্তর্জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ বিজ্ঞানেরই বস্তুতঃ ভ্রম হওয়ায় উহা “আত্মখ্যাতি” বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মতে কোন জ্ঞানই যথার্থ না হওয়ায় প্রমাণেরও সম্ভা নাই। সুতরাং প্রমাণ প্রমের ভাবও কাল্পনিক, উহা বাস্তব নহে। কিন্তু বিজ্ঞানের সম্ভা স্বীকার্য। কারণ, উহা স্বতঃপ্রকাশ। অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃই অনাদিকাল হইতে অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে। ঐ সমস্ত বিজ্ঞান প্রত্যেকেই ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী। কারণ, “সর্বং ক্ষণিকং।” পূর্বজাত বিজ্ঞান পরক্ষণেই অপর বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া বিনষ্ট হয়। ঐরূপে অনাদিকাল হইতে বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিতেছে। তন্মধ্যে “অহং মম” অর্থাৎ আমি বা আমার ইত্যাকার বিজ্ঞানসত্তানের নাম আলয়-বিজ্ঞান—উহাই আত্মা। তদ্ভিন্ন সমস্ত বিজ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। যেমন নীল, পীত ও ষটপটাদ্যাকার বিজ্ঞান। পূর্বোক্ত আলয়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। উহাই সমস্ত বিজ্ঞান ও কল্পিত সর্ববর্ষের মূল স্থান। তাই উহার নাম আলয়বিজ্ঞান। উহাই বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু ঐ বিজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানের “বিপাক”, “মনন” এবং “বিষয়বিজ্ঞপ্তি” নামে ত্রিবিধ পরিণাম বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথম আলয়বিজ্ঞানকে “বিপাকপরিণাম” বলিয়াছেন। এই সমস্ত কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বিজ্ঞানবাদের প্রকাশক লঙ্কাবতারসূত্রেও “আলয়বিজ্ঞান” ও “প্রবৃত্তিবিজ্ঞানে”র উল্লেখ এবং

১। যদন্তর্জ্ঞেয়রূপস্ত বহির্বদনভাসতে। সোহর্থো বিজ্ঞানরূপস্য তৎপ্রত্যক্ষতয়াপি চ ॥

—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকায় (৫৮২ পৃষ্ঠায়) কমলশীলের উদ্ধৃত দিগ্‌নাগবচন।

২। তৎ স্তাদালয়বিজ্ঞানং যদভবেদহম্পদং। তৎ স্তাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং গর্রালাদিকমুল্লিপেৎ ॥

৩। “ওদাত্তরজলস্থানীয়াদালয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপদাতে”।—লঙ্কাবতারসূত্র।

৪। বিজ্ঞানাতীতি বিজ্ঞানং।—ত্রিংশকাবিজ্ঞপ্তিকারিকার ভাষা।

৫। বিপাকো মননাখ্যাস্ত বিজ্ঞপ্তির্বিষয়স্ত চ। তত্রালয়াগাং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ববীজকং ॥২॥—বসুবন্ধুকৃত ত্রিংশকাবিজ্ঞপ্তিকারিকা। “আলয়াগা”মিত্যালয়বিজ্ঞানসংজ্ঞকং যদবিজ্ঞানং স বিপাকপরিণামঃ। তত্র সর্বসাক্ষেপিক-ধর্মবীজস্থানত্বাৎ আলয়ঃ। আলয়ঃ স্থানমিতি পর্যায়াঃ। অথবা আলীয়েন্তে উপনিবধাশ্চেন্মিন্ সর্বধর্মঃ কার্যভাবেন” ইত্যাদি।—স্থিরমতিকৃত ভাষা।

ঐ সম্বন্ধে বহু ছুজের তত্ত্বের উপদেশ দেখা যায়। তদ্বারা বিজ্ঞানবাদই ব্যক্ত হইয়াছে^১। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বুঝিতে হইলে ঐ সমস্ত গ্রন্থও অবশ্য পাঠ্য। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের অধিকার ও বুদ্ধি অনুসারেই তাঁহাদিগকে বিভিন্নরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে বোঁগাচার, বিজ্ঞানবাদই তাঁহার অভিমত তত্ত্ব বুঝিয়া, উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে প্রচার করেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে মাধ্যমিক, শূন্যবাদই তাঁহার অভিমত তত্ত্ব বুঝিয়া উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে প্রচার করেন^২। বুদ্ধদেব যে, কোন কোন শিষ্যের অধিকার ও অভিপ্রায়ানুসারেই তাঁহাদিগের নিকটে রূপাদি বিষয়ের সত্তাও বলিয়াছিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বস্তুবদ্ধও বলিয়া গিয়াছেন^৩। এবং বুদ্ধদেব শিষ্যগণের অধিকার ও রুচি অনুসারে বিভিন্নরূপ “দেশনা” অর্থাৎ উপদেশ করিলেও অদ্বিতীয় শূন্যই তত্ত্ব, এই উপদেশই অভিন্ন অর্থাৎ উহাই তাঁহার চরম উপদেশ। সুতরাং উহাই তাঁহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত, ইহা মাধ্যমিকসম্প্রদায় বলিয়া গিয়াছেন^৪। মৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, বুদ্ধদেবের উপদেশানুসারেই জ্ঞান ভিন্ন বাহ্য বিষয়ের সত্তা তাঁহার অভিমত বুঝিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মৌত্রান্তিক বুঝিয়াছিলেন—বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা সর্বত্রই অনুমেয়। বৈভাষিক বুঝিয়াছিলেন, বাহ্য পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হয়। তাই তিনি উহার প্রত্যক্ষ সমর্থনের জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করায় উহারা উভয়েই “সর্বাস্তিবাদী” বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

পূর্বোক্ত সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও বিজ্ঞানবাদীর গ্রাম আত্মখ্যাতিবাদী। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও বাহ্যশক্তি প্রভৃতি দ্রব্যে আরোপ্য রজতাদি, জ্ঞানাকারই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভ্রমস্থলে শক্তি প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞানাকার রজতাদিরই “খ্যাতি” বা ভ্রম হইয়া থাকে। শক্তি প্রভৃতিই ঐ ভ্রমের অধিষ্ঠান। কিন্তু বিশেষ এই যে, ঐ বাহ্য শক্তি প্রভৃতি তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন সংপদার্থ। তাঁহারাও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া সর্বাস্তিবাদই বুদ্ধদেবের অভিমত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ই হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁহারাই গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পরে ভারতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন। প্রথমে তাঁহাদিগেরই বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। ভাষ্যকার বাংলায়ন ঐ সময়েই তাঁহাদিগের প্রবল প্রতি-

১। অথ খলু ভগবান্ তত্ত্বাং বেলায়াং ইমা গাথা অভাবত—

দৃশ্যং ন বিদ্যাতে চৈত্ত্বং চিত্তং দৃশ্যং অনুভূতে।

দেহভোগপ্রতিষ্ঠানমালয়ং খ্যায়তে নৃণাং ॥—ইত্যাদি, জ্ঞানবজ্রসূত্র, ৩৯ পৃষ্ঠা ও “এবমেনং মহামাঃ, প্রবৃন্তি-
বিজ্ঞানানি আলয়বিজ্ঞানজাতিলক্ষণাচ্ছানি স্বঃ।” ইত্যাদি ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। তত্রার্শশূন্যং বিজ্ঞানং সোঁগাচারঃ সমাপ্নিতঃ। তত্রাপাত্যবমিহন্তি যে মাধ্যমিকবাদিনঃ ॥—মীমাংসা-
শ্লোকবার্তিক, নিরালম্বনবাদ ১৪।

৩। রূপাদ্যায়তনান্তিঃ তদ্বিনেয়জনং প্রতি। অভিপ্রায়বণাচ্ছত্বপদাঙ্কসংহবং ॥৬॥—“বিশ্রুতিকাকারিকা”।

৪। দেশনা বোঁকনাখানাঃ সম্বাশয়শাস্ত্রাণা। ভিন্নানি দেশনান্ভিন্না শূন্যতান্ভিন্নাশাস্ত্রাণা ॥—“বোঁবিচি-
বৈবরণ”।

ধৰ্ম্মী হইয়া গোঁতমসূত্ৰেৰ ভাষা ৰচনা কৰেন, ইহা তাঁহাৰ অনেক বিচাৰেৰ দ্বাৰা বুঝিতে পাৰা যায় ; যথাস্থানে তাহা বলিয়াছি। পূৰ্ব্বোক্ত সৰ্বাস্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্ৰদায় ক্ৰমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা মতভেদেৰ সৃষ্টি কৰিয়াছিলেন। কিন্তু পৰে বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্ৰদায়েৰ বিশেষ অভ্যুদয়ে বৌদ্ধমহাযানসম্প্ৰদায়েৰ অভ্যুদয় হইলে পূৰ্ব্বোক্ত হীনযান বৌদ্ধসম্প্ৰদায় নানা স্থানে নানাকৰূপে বিচাৰ ও নিজমত প্ৰচাৰ দ্বাৰা অনেক দিন ধাবৎ সম্প্ৰদায় ৰক্ষা কৰিলেও ক্ৰমশঃ মহাযান-সম্প্ৰদায়েৰ পৰিপোষক অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, স্থিৰমতি, ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তি, শাস্ত্ৰৰক্ষিত ও কমলশীল প্ৰভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচাৰ্য্যগণেৰ অসাধাৰণ পাণ্ডিত্যাদি প্ৰভাবে সময়ে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেৰই অত্যন্ত প্ৰচাৰ ও প্ৰভাব বৃদ্ধি হয়। সৰ্বাস্তিবাদী সম্প্ৰদায়েৰ অনেক গ্ৰন্থও ক্ৰমশঃ বিলুপ্ত হয়। হীনযান বৌদ্ধসম্প্ৰদায়েৰ অষ্টাদশ সম্প্ৰদায়েৰ মध्ये স্থবিৰবাদী সম্প্ৰদায়েৰ মতেৰই এখন সংবাদ পাওয়া যায়। “সাংমিতীয়”সম্প্ৰদায়েৰ গ্ৰন্থাদি বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহাদিগেৰ মতেৰ মূলদি জানিবাৰ এখন উপায় দেখা যায় না। ঐ সম্প্ৰদায়েৰ অবলম্বিত ধৰ্ম্ম অনেক অংশে বৈদিক ধৰ্ম্মেৰ তুল্য ছিল, এবং তাঁহাৰা আত্মাৰও অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰিতেন, ইহা জানিতে পাৰা যায়। “ত্ৰায়বাৰ্ত্তিকে” উদ্যোতকৰ যে, “সৰ্বাভিসময়সূত্ৰ” নামক বৌদ্ধগ্ৰন্থেৰ উক্তি উদ্ধৃত কৰিয়া আত্মাৰ অস্তিত্ব বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া সমৰ্থন কৰিয়াছেন, উহা ঐ “সাংমিতীয়”সম্প্ৰদায়েৰ অবলম্বিত কোন প্ৰাচীন গ্ৰন্থও হইতে পাৰে (তৃতীয় খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য)। উদ্যোতকৰ তৃতীয় অধ্যায়েৰ প্ৰাৰম্ভে অন্ধকাৰ পদাৰ্থেৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যায় এবং পূৰ্বে পৰমাণুৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যায় বৈভাষিকসম্প্ৰদায়বিশেষেৰ যে মত-বিশেষেৰ উল্লেখ কৰিয়াছেন, উহাৰও মূলগ্ৰন্থ পাওয়া যায় না।

পৰিশেষে বক্তব্য এই যে, পূৰ্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ প্ৰভৃতি মত যে, গোঁতম বুদ্ধেৰ আবিৰ্ভাবেৰ পৰেই প্ৰকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, সূত্ৰাং ত্ৰায়দৰ্শনেও পূৰ্ব্বোক্ত সূত্ৰগুলি পৰেই সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা আমৰা বুঝিতে পাৰি না। কাৰণ, বেদান্তসূত্ৰ, যোগসূত্ৰ ও যোগসূত্ৰেৰ ব্যাসভাষ্যে যে বিজ্ঞানবাদেৰ উল্লেখ ও খণ্ডন হইয়াছে, উহা গোঁতম বুদ্ধেৰ বহু পূৰ্বেই প্ৰকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, ইহা আমৰা বিশ্বাস কৰি। পৰন্তু দেবগণেৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ভগবান্ বিষ্ণুৰ শৰীৰ হইতে উৎপন্ন হইয়া মায়ামোহ, অসুৰগণেৰ প্ৰতি যে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ কৰিয়াছিলেন, ইহা আমৰা বিষ্ণুপুৰাণেও দেখিতে পাই। তাহাতে পূৰ্ব্বোক্ত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেৰ স্পষ্ট উপদেশ আছে। পৰন্তু বেদেও অনেক নাস্তিকমতেৰ সূচনা আছে এবং গোঁতম বুদ্ধেৰ পূৰ্বেও যে ভাৰতে বৌদ্ধমতেৰ প্ৰকাশ ছিল, ইহাও আমৰা পূৰ্বে প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছি (তৃতীয় খণ্ড, ৫৪ ও ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে অপৰেৰ মত বলিয়াই যে নাস্তিকমতবিশেষেৰ উল্লেখ আছে, ইহাও (চতুৰ্থ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠায়) প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছি। সুবালোপনিষদেৰ ১১শ, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ খণ্ডেৰ শেষভাগে “ন সন্নাঙ্গ সদস্য” ইত্যাদি ঋতিবাক্য এবং ঋগ্বেদেৰ নাসদীয় সূক্তে “নাসদাসীন্নো সদাসীৎ” (১০ম মঃ, ৮ম অঃ, ১১শ অঃ, ১২৯শ) এই সূক্ত অবলম্বনে উহাৰ কল্পিত অপব্যখ্যাৰ দ্বাৰাও অনেক

১। বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ। বৃক্ষঃ মে বচঃ সমাগবৃধেৰেবমুদীৰিতং ॥ জগদেতদনাধাৰং ত্ৰাস্তি-জ্ঞানার্থতৎপৰং। রাগাদিহৃষ্টমত্যাৰ্থং ভ্ৰামাতে ভবসঙ্ঘটে ॥—বিষ্ণু পুৰাণ, ৩য় অংশ, ১৮শ অঃ, ১৩১৭।

নাস্তিক নানারূপ শূন্যবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও মনে হয়। সুপ্রাচীন কালেও বেদবিরোধী নাস্তিকের অস্তিত্ব ছিল। মন্বাদি সংহিতাতেও তাহাদিগের উল্লেখ ও নিন্দা দেখা যায় এবং নাস্তিক-শাস্ত্র ও উহার পাঠেরও নিন্দা দেখা যায়। বিরোধী সম্প্রদায় যে অপর সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত শাস্ত্র-প্রমাণের ব্যাখ্যাস্তর করিয়াও নিজমত সমর্থন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, ইহা অতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতম অবয়ববিষয়ে অভিমানকে রাগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়া, ঐ অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনের জন্তই পূর্বোক্ত যে সমস্ত সূত্র বলিয়াছেন, তদ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদই যে এই প্রকরণে পূর্বপক্ষরূপে তাঁহার বুদ্ধিস্ত, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র কোন কারণে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাহা যে বুঝা যায় না, ইহা পূর্বে যথাস্থানে বলিয়াছি। মহর্ষি সুপ্রাচীন সর্বাভাববাদেরই পূর্বপক্ষরূপে সমর্থনপূর্বক খণ্ডন করায় তদ্বারা ফলতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদেরও মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। পরন্তু পূর্বোক্ত “বুদ্ধ্যা বিবেচনাস্তু ভাবানাং” ইত্যাদি (২৬শ) সূত্রে পূর্বপক্ষ সমর্থনের জন্ত যে যুক্তি কথিত হইয়াছে, উহা লক্ষাবতার-সূত্রে “বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কথিত হইলেও তদ্বারা ঐ সূত্রটী বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্তই কথিত এবং লক্ষাবতারসূত্রের উক্ত শ্লোকানুসারেই পরে রচিত, ইহাও নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, ভাষ্যকারোক্ত সর্বাভাববাদী আনুপলব্ধিকও নিজমত সমর্থনে প্রথমে উক্ত যুক্তি বলিতে পারেন। পরে বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্তও “লক্ষাবতারসূত্রে” ঐ যুক্তি গৃহীত হইয়াছে, ইহাও ত বুঝা যাইতে পারে। তৎপূর্বে যে, আর কেহই ঐরূপ যুক্তির উদ্ভাবন করিতে পারেন না, ইহার কি প্রমাণ আছে? আর পূর্বোক্ত গ্রন্থসূত্রে পাঠ আছে,—“বুদ্ধ্যা বিবেচনাস্তু ভাবানাং যথানুপলব্ধিকিঃ।” লক্ষাবতারসূত্রে ঐ শ্লোক পাঠ আছে,—“বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধারণ্যতে।” সুতরাং পরে কেহ যে ঐ শ্লোক হইতে “বুদ্ধ্যা” এই শব্দটী গ্রহণ করিয়া ঐ ভাবে গ্রন্থদর্শনে ঐ সূত্রটী রচনা করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? এস্ততঃ ঐ সমস্ত মতের মধ্যে কোন্ মত ও কোন্ যুক্তি সর্বাগ্রে কাহার উদ্ভাবিত, কোন্ শব্দটী সর্বাগ্রে কাহার প্রযুক্ত, ইহা এখন কোনরূপ বিচারের দ্বারাই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। সুপ্রাচীন কাল হইতেই নানা মতের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। কালবশে ঐ সমস্ত মতই নানা সম্প্রদায়ে নানা আকারে একরূপ ও বিভিন্নরূপ দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। পরবর্তী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমশঃ শাখাভেদে কত প্রকার মতভেদের যে সৃষ্টি ও সংহার হইয়া গিয়াছে, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপায়ই নাই। সুতরাং সমস্ত মতের পরিপূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস না থাকায় এখন ঐ সমস্ত বিষয়ে কাহারও কল্পনামাত্রমূলক কোন মন্তব্য গ্রহণ করা যায় না ॥৩৭॥

ভাষ্য । “দোষনিমিত্তানাং তদ্ব-জ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তি”রিত্যুক্তং ।
অথ কথং তদ্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি ?

অনুবাদ । দোষনিমিত্ত-(শরীরাদি প্রামেয়)সমূহের তদ্বজ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের
নিবৃত্তি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন) কিরূপে তদ্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ?

সূত্র । সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ ॥৩৮॥৪৪৮॥

অনুবাদ । (উত্তর) সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ (তদ্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়) ।

ভাষ্য । স তু প্রত্যাহতশ্চেन्द्रিয়েভ্যো মনসো ধারকেন প্রযত্নেন
ধার্যমাণস্তাত্মনা সংযোগস্তদ্ববুভুৎসাবিশিষ্টঃ । সতি হি তস্মিন্নিন্দ্রিয়ার্থেষু
বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যন্তে । তদভ্যাসবশাত্তদ্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে ।

অনুবাদ । সেই “সমাধিবিশেষ” কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রত্যাহত (এবং)
ধারণক প্রযত্নের দ্বারা ধার্যমাণ অর্থাৎ জংপুণ্ডরীকাদি কোন স্থানে স্থিরীকৃত মনের
আত্মার সহিত তদ্বজিজ্ঞাসাবিশিষ্ট সংযোগ । সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-
সমূহ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না । সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ তদ্ব-
বুদ্ধি অর্থাৎ তদ্ব-সাক্ষাৎকার জন্মে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই আঙ্কিকের প্রথমোক্ত “তদ্বজ্ঞানোৎপত্তি প্রকরণে” শেযোক্ত তৃতীয় সূত্রে
যে, অবয়ববিধিতে অভিমানকে দোষনিমিত্ত বলিয়াছেন, তাহা পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে
বিরুদ্ধ মত খণ্ডন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন । অবয়বী ও অস্তিত্ব দোষনিমিত্ত পদার্থের
সত্তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে । কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, মহর্ষি এই আঙ্কিকের প্রথম সূত্রে
যে তদ্বজ্ঞানকে অহঙ্কারের নিবর্তক বলিয়া যুক্তির কারণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, ঐ তদ্ব-জ্ঞান
কিরূপে উৎপন্ন হয় ? শাস্ত্র দ্বারা তদ্ব-শ্রবণ করিয়া, পরে মহর্ষি কথিত যুক্তিসমূহের দ্বারা মনন
করিলেও ঐ মননরূপ যে, পরোক্ষতদ্ব-জ্ঞান, তাহা ত কাহারই অহঙ্কার নিবৃত্তি করে না । উহার
দ্বারা কাহারই ত সেই সমস্ত তদ্ব দৃঢ় সংস্কার জন্মে না । মননের পরেও আবার পূর্ববৎ সমস্ত মিথ্যা-
জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সহস্র বার শ্রবণ ও মনন করিলেও দিঙ্‌মুঢ় ব্যক্তির দিগন্ত্রম নিবৃত্ত
হয় না, ইহা অনেকের পরীক্ষিত সত্য । তাই সাংখ্যাসূত্রকারও সাংখ্যমতানুসারে বহু মননের
উপদেশ করিয়াও বলিয়াছেন,—“যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মুঢ়বদপরোক্ষাদৃতে” (১।৫৯) । সুতরাং
তদ্ব বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান বা চরন তদ্ব-সাক্ষাৎকার ব্যতীত অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা
স্বীকার্য্য । কিন্তু ঐ তদ্ব সাক্ষাৎকাররূপ তদ্বজ্ঞান কি উপায়ে উৎপন্ন হইবে ? উহার ত কোন উপায়
নাই । সুতরাং উহা হইতেই পারে না । তাই মহর্ষি শেষে এখানে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়া, প্রথমে
পূর্বোক্ত প্রশ্নের সর্বসম্মত উত্তর বলিয়াছেন,—“সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ” । ভাষ্যকার প্রভৃতিও

এখানে মহর্ষির প্রথমোক্ত “দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ” এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশপূর্বক তত্ত্বত্বের মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রোক্ত সমাধিবিশেষ ও উহার অভ্যাসাদি যোগশাস্ত্রেই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, উহা যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান। উহা মহর্ষি গোতমের প্রকাশিত এই শাস্ত্রের প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য নহে। কিন্তু শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্ত্রানুসারে নিদিধ্যাসন যে, অবশ্য কর্তব্য, চরম নিদিধ্যাসন সমাধিবিশেষের অভ্যাস ব্যতীত যে, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না, ইহা মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, উহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। মহর্ষি এখানে এই প্রকরণের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ও পূর্বপক্ষ নিরাসপূর্বক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল তাঁহার এই ত্রায়-শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির চরম কারণ বলেন নাই।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “সমাধিবিশেষ”র সংক্ষেপে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহৃত এবং ধারক প্রযত্নের দ্বারা ধার্যমাণ মনের আত্মার সহিত সংযোগই “সমাধিবিশেষ।” তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মনকে ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকাদি কোন স্থানবিশেষে প্রযত্নবিশেষ দ্বারা ধারণ করিলে অর্থাৎ সেই স্থানে মনকে স্থির করিয়া রাখিলে তখন ঐ মন ও আত্মার যে বিশিষ্ট সংযোগ জন্মে, তাহাই সমাধিবিশেষ। যে প্রযত্নের দ্বারা ঐ ধারণ হয়, উহাকে ধারক প্রযত্ন বলে। উহা যোগাভ্যাসসাধ্য ও যোগী গুরুর নিকটে শিক্ষণীয়। সুষুপ্তিকালেও মন ও আত্মার ঐরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, কিন্তু তাহা ত সমাধি-বিশেষ নহে। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ সংযোগকে “তত্ত্ববুদ্ভুৎসাবিশিষ্ট” বলিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসাবশতঃ যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনপ্রযুক্ত মন ও আত্মার যে পূর্বোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাকেই সূত্রোক্ত “সমাধিবিশেষ” বলিয়াছেন। সুষুপ্তিকালীন আত্মমনঃসংযোগ ঐরূপ নহে। কারণ, উহার মূলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তৎপ্রযুক্ত কোন সাধন নাই। পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইলে তখন আর গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। কারণ, ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ ব্যতীত গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু সমাধিস্থ যোগী ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া স্থানবিশেষেই স্থির করিয়া রাখায় তাঁহার পক্ষে তখন আর ভ্রাণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের সহিতই মনের সংযোগ সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপ সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃই তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মে। তাৎপর্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রযত্নের উৎপাদনই তাহার অভ্যাস। দীর্ঘকাল সাদরে নিরন্তর সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাস করিলেই তৎপ্রযুক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মে। বস্তুতঃ কাহারও অল্পদিন অভ্যাসে অথবা মধ্যে ত্যাগ করিয়া অথবা শ্রদ্ধাশূন্য বা সদিগ্ধ হইয়া অভ্যাসে উহা দৃঢ়ভূমি হয় না। দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর অভ্যাস করিলেই ঐ অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়। যোগদর্শনেও ইহা কথিত হইয়াছে। দৃঢ়ভূমি অভ্যাস ব্যতীতও উহা কার্যসাধক হয় না। মুদ্রিত তাৎপর্যটীকায় “সমাধিতত্ত্বাভ্যাসঃ”—এইরূপ সূত্রপাঠের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু

বাচস্পতি মিশ্র “শ্রীমদজীবনকল্পে” “সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ” এইরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্ততঃ এইরূপই সূত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার সমাধি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চরম নির্বিকল্পক সমাধিই এই সূত্রে “বিশেষ” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, বুঝা যায়। কারণ, উহাই চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকারের চরম উপায়। উহার অভ্যাস ব্যতীত চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মিতে পারে না। উহার জন্ম প্রথমে অনেক যোগাদির অনুষ্ঠান কর্তব্য। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৮॥

ভাষ্য। যদুক্তং—“সতি হি তস্মিন্মিত্তিয়ার্থেষু বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যন্তে” ইত্যেতৎ—

সূত্র। নার্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ ॥৩৯॥৪৪৯॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) যে উক্ত হইয়াছে—“সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহবিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় না”—ইহা নহে অর্থাৎ উহা বলা যায় না ;—যেহেতু, অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়-বিশেষের প্রবলতা আছে।

ভাষ্য। অনিচ্ছতোহপি বুদ্ধ্যুৎপত্তে নৈতদ্যুক্তং। কস্মাৎ? অর্থ-বিশেষপ্রাবল্যাৎ। অবুভূৎসমানস্তাপি বুদ্ধ্যুৎপত্তির্দৃষ্টা, যথা স্তনয়িত্বশব্দপ্রভৃতিষু। তত্র সমাধিবিশেষো নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায় ইহা যুক্ত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বিশেষের প্রবলতা আছে। (তাৎপর্য) জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয়, যেমন মেঘের শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে। তাহা হইলে সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সমাধি-বিশেষ হইতেই পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক বিষয়বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞান জন্মে। অতএব সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মে না, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার পূর্বসূত্রভাষ্যে ঐ কথা বলিয়া, পরে ঐ কথার উল্লেখপূর্বক এই পূর্বপক্ষসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “ইত্যেতৎ” এই বাক্যের সহিত সূত্রের প্রথমস্থ “নঞ” শব্দের যোগই তাঁহার অভিপ্রেত। ভাষ্যকার “অনিচ্ছতোহপি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহারই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহার জ্ঞানেচ্ছা নাই, তাহারও বিষয়বিশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায়। যেমন সহসা মেঘের শব্দ হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও লোকে উহা শ্রবণ করে। এইরূপ আরও অনেক “অর্থবিশেষ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বিষয় আছে, যদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। সুতরাং পূর্বস্বত্রোক্ত সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না অর্থাৎ উহা নানাবিষয়-জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবন্ধ হইয়া উৎপন্নই হইতে পারে না। গন্ধাদি পঞ্চ বিষয়কে মহর্ষি তাঁহার পূর্বকথিত দ্বাদশবিধ প্রেমের মধ্যে “অর্থ” বলিয়াছেন। উহাকে “ইন্দ্রিয়ার্থ”ও বলা হইয়াছে (প্রথম পণ্ড, ১৮০—৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উহার মধ্যে এমন অনেক অর্থবিশেষ আছে, যাহা পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতে প্রবল। সুতরাং সমাধিস্থ বা সমাধির জন্ত প্রযত্নবান্ ব্যক্তির ঐ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং উহা সমাধির অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক হওয়ায় উহা কখনও কাহারই হইতে পারে না। অতএব পূর্বস্বত্রে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের যে উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব বলিয়া অযুক্ত, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর বক্তব্য ॥৩৯॥

সূত্র । ক্ষুদাদিভিঃ প্রবর্তনাচ্ ॥৪০॥৪৫০॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) ক্ষুধা প্রভৃতির দ্বারা (জ্ঞানের) প্রবর্তন-(উৎপত্তি) বশতঃও (সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না) ।

ভাষ্য । ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং শীতোষ্ণাভ্যাং ব্যাধিভিশ্চানিচ্ছতোহপি বুদ্ধয়ঃ প্রবর্তন্তে । তস্মাদৈকাগ্র্যানুপপত্তিরিতি ।

অনুবাদ । ক্ষুধা ও পিপাসাবশতঃ, শীত ও উষ্ণবশতঃ এবং নানা ব্যাধিবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশূন্য ব্যক্তিরও নানা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব একাগ্রতার উপপত্তি হয় না ।

টিপ্পনী । পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি আবার এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন যে, ক্ষুধা প্রভৃতির দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়াও পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার স্বত্রোক্ত আদি শব্দের দ্বারা পিপাসা এবং শীত উষ্ণ ও নানা ব্যাধি গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ক্ষুধাদিবশতঃ বিষয়বিশেষে ইচ্ছা না থাকিলেও যখন নানা জ্ঞান অবশ্যই জন্মে, সুতরাং চিন্তের একাগ্রতা কোনরূপেই সম্ভব নহে। চিন্তের একাগ্রতা বা বিষয়বিশেষে স্থিরতা সম্ভব না হইলে সবিকল্পক সমাধিও হইতে পারে না। সুতরাং নির্বিকল্পক সমাধির আশাই নাই। যোগদর্শনেও “ব্যাধিস্ত্যান” (১৩০) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যোগের অনেক অন্তরায় কথিত হইয়াছে এবং ঐ ব্যাধি প্রভৃতিকে “চিন্তবিক্ষেপ” বলা হইয়াছে। ফলকথা, ইচ্ছা না থাকিলেও নানা কারণবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়া চিন্তের একাগ্রতা সম্ভব না হওয়ায় পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না। সুতরাং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের কোন উপায় না থাকায় অহঙ্কারের নিবৃত্তি ও মোক্ষ অসম্ভব, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর মূল তাৎপর্য্য ॥৪০॥

ভাষ্য । অস্তেতৎ সমাধিঃ বিহায় ব্যাখ্যানং ব্যাখ্যাননিমিত্তং সমাধি-
প্রত্যনীকঞ্চ, সতি ত্বেতস্মিন্—

অনুবাদ । (উত্তর) সমাধি ত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যান এবং ব্যাখ্যানের নিমিত্ত সমাধির
“প্রত্যনীক” অর্থাৎ বিরোধী, ইহা থাকুক, কিন্তু ইহা থাকিলেও—

সূত্র । পূর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ ॥৪১॥৪৫১॥

অনুবাদ । (উত্তর) “পূর্বকৃত” অর্থাৎ পূর্বজন্মসঞ্চিত প্রকৃষ্ট ধর্মজন্ম
“ফলানুবন্ধ”-(যোগাভ্যাসসামর্থ্য) বশতঃ সেই সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হয় ।

ভাষ্য । পূর্বকৃতো জন্মান্তরোপচিতস্তত্ত্বজ্ঞানহেতুর্ধর্মপ্রবিবেকঃ ।
ফলানুবন্ধো যোগাভ্যাসসামর্থ্যঃ । নিষ্ফলে হ্যভ্যাসে নাভ্যাসমাদ্রিয়েরন্ ।
দৃষ্টং হি লৌকিকেষু কর্মস্বভ্যাসসামর্থ্যঃ ।

অনুবাদ । “পূর্বকৃত” বলিতে জন্মান্তরে সঞ্চিত, তত্ত্বজ্ঞানহেতু ধর্মপ্রবিবেক
অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্ম । “ফলানুবন্ধ” বলিতে যোগাভ্যাসে সামর্থ্য । [অর্থাৎ
এই সূত্রে “পূর্বকৃত ফলানুবন্ধ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে,—জন্মান্তরসঞ্চিত প্রকৃষ্ট
সংস্কারজন্ম যোগাভ্যাসসামর্থ্য । অভ্যাস নিষ্ফলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর
করিত না । লৌকিক কর্মসমূহেও অভ্যাসের সামর্থ্য দৃষ্টই হয় ।

টিপ্পনী । পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, “পূর্বকৃত
ফলানুবন্ধ”বশতঃ সেই সমাধিবিশেষ জন্মে । বার্তিককার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বজন্মে
অভ্যাস যে সমাধিবিশেষ, তাহার ফল যে ধর্ম, তজ্জন্ম পুনর্বীর সমাধিবিশেষ জন্মে । তাৎপর্যাটীকাকার
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বজন্মকৃত যে সমাধি, তাহার ফল যে সংস্কার, তাহার “অনুবন্ধ” অর্থাৎ
স্থিরতাবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে । মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও শরীরসৃষ্টি পূর্বজন্মকৃত কর্ম-
ফলজন্ম, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে “পূর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ” (২৬০) এই সূত্র
বলিয়াছেন । সেখানে ভাষ্যকার পূর্বশরীরে কৃত কর্মকে “পূর্বকৃত” শব্দের দ্বারা এবং তজ্জন্ম
ধর্মাদ্বারা “ফল” শব্দের দ্বারা এবং ঐ ফলের আত্মাতে অবস্থানই “অনুবন্ধ” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা
করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । তদনুসারে এখানেও মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা
পূর্বকৃত সমাধির ফল যে ধর্মবিশেষ, তাহার অনুবন্ধ অর্থাৎ আত্মাতে অবস্থানবশতঃ ইহজন্মে
সমাধিবিশেষ জন্মে—এইরূপ সরল ভাবে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করা যায় । বার্তিককার ঐরূপ ভাবেই
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার সূত্রোক্ত “ফল” শব্দের দ্বারা সংস্কার এবং “অনুবন্ধ”
শব্দের দ্বারা স্থিরতা বা স্থায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অর্থাৎ তাঁহার মতে

পূর্বজন্মকৃত সমাধি ইহজন্মে না থাকিলেও তজ্জন্ম সংস্কাররূপ যে ফল, তাহা ইহজন্মেও আত্মাতে অনুবন্ধ থাকে। উহার স্থায়িত্ববশতঃ তজ্জন্ম ইহজন্মে সমাধিবিষেব জন্মে, ইহাই সূত্রার্থ। তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়া, পরে তাঁহার নিজের বুদ্ধি অনুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বকৃত যে ঈশ্বরের আরাধনারূপ কৰ্ম, তাহার ফল যে ধৰ্ম্মবিশেষ, তাহার সম্বন্ধবিশেষ-জন্ম ইহজন্মে সমাধিবিষেব জন্মে। বৃত্তিকার তাঁহার নিজের এই ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্ম এখানে শেষে যোগদর্শনের “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২।৪৫) এবং “ততঃ প্রত্যক্চেতনাধি-গমোহ্যপান্তরায়াভাবশ্চ” (১।২৯) এই সূত্রদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরপ্রণিধান-বশতঃ বিষয়ের প্রতিকূল ভাবে চিন্তের স্থিতি এবং যোগের অন্তরাগের অভাব হয়। সূত্রত্রাং সমাধি-বিশেষের উৎপত্তি ইহিয়া থাকে। পূর্বোক্ত যোগসূত্রানুসারে বৃত্তিকারের এই সরল ব্যাখ্যা সুসংগত হয়, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাষ্যকার এখানে অত্র ভাবে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে সূত্রোক্ত “পূর্বকৃত” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—জন্মান্তরে সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের হেতু ধৰ্ম্মপ্রবিবেক। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ “প্রবিবেক” শব্দের ব্যুৎপত্তিবিশেষের দ্বারা উহার অর্থ বলিয়াছেন—প্রকৃষ্ট। প্রকৃষ্ট ধৰ্ম্মই ধৰ্ম্ম-প্রবিবেক। উহা আত্মধৰ্ম্ম সংস্কারবিশেষ। উহা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু। কারণ, মুমুক্শুর প্রবন্ধ-সমূহ মিলিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে না থাকায় তাহা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত “ফলানুবন্ধ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, যোগাভ্যাস-সামর্থ্য। তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার মতে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, “পূর্বকৃত” অর্থাৎ পূর্বজন্মে সঞ্চিত যে প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধৰ্ম্ম, তজ্জন্ম “ফলানুবন্ধ” অর্থাৎ যোগাভ্যাসসামর্থ্যবশতঃ সমাধি-বিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি ত্যাগ করিয়া ব্যুত্থান অর্থাৎ নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ সমাধির অনুৎপত্তি বা ভঙ্গ অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং ঐ ব্যুত্থানের কারণ সমাধিবিরোধী অনেক আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা থাকিলেও অধিকারিবিশেষের পূর্ব-জন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ ধৰ্ম্মবিশেষ-জনিত যোগাভ্যাস-সামর্থ্যবশতঃ সমাধিবিষেব জন্মে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষের ফলে অনেক যোগীর তীব্র সংবেগ(বৈরাগ্য)বশতঃ ইহ-জন্মে শীঘ্রই যোগাভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মে। তজ্জন্ম তাঁহাদিগের অতি শীঘ্রই সমাধিলাভ ও উহার ফল ইহিয়া থাকে। যোগদর্শনেও “তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ” (১।২১) এই সূত্রের দ্বারা উহা কথিত হইয়াছে। সংবেগ বা বৈরাগ্যের মূহুতা, মধ্যতা ও তীব্রতা যে, পূর্বজন্মসঞ্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, ইহা যোগভাষ্যের টীকায় ঐ স্থলে ত্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও লিখিয়াছেন। পূর্বোক্ত অদৃষ্টমান সংস্কার কল্পনা কেন করিব? উহার প্রয়োজন কি? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অভ্যাস নিষ্ফলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর

১। প্রবিবিচ্যতে বিশিষ্যতেহেনেনতি প্রবিবেকঃ। ধৰ্ম্মচান্দৌ প্রবিবেকচেতি ধৰ্ম্মপ্রবিবেকঃ, প্রকৃষ্টঃ সংস্কারঃ, স তু আত্মধৰ্ম্ম ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

করিত না। লৌকিক কর্মেও অভ্যাস-সামর্থ্য দেখা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, লৌকিক কর্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন তাহাতেও ক্রমে সামর্থ্য জন্মে, এবং অধিকারিবিশেষের অধিকতর সামর্থ্য জন্মে, ইহা দেখা যাইতেছে, তখন অনৌকিক কর্মেও অভ্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকালে তাহাতেও বিশেষ সামর্থ্য অবশ্যই জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অভ্যাসের কোন ফল না থাকিলে অর্থাৎ উহা ক্রমশঃ উহাতে সামর্থ্য না জন্মাইলে কেহই উহা করিতে পারে না অর্থাৎ সুকলেই উহা ত্যাগ করে। কিন্তু যখন সূচিরকাল হইতে বহু বহু যোগী সূকর্টিন যোগাভ্যাসও করিতেছেন, তখন উহা নিষ্ফল নহে। উহা ক্রমশঃ ঐ কার্য্যে সামর্থ্য জন্মায়। তাহার ফলে নির্বিকল্পক সমাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যোগাভ্যাসে ঐ যে সামর্থ্য, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবিশেষের সাহায্যেই জন্মিয়া থাকে। এক জন্মের সাধনায় উহা কাহারই হয় না। অনেক জন্মের বহু বহু অস্থায়ী প্রযত্নবিশেষ মিলিত হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে থাকে না। সূতরাং উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মাইতেও পারে না। কিন্তু তজ্জনিত স্থায়ী অনেক সংস্কার-বিশেষ বহুনা করিলে ঐ সমস্ত সংস্কার কোন জন্মে মিলিত হইয়া অধিকারিবিশেষের তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধি-বিশেষের অভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মাইয়া তাঁহার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সম্পাদক হয়। সূতরাং ঐ সংস্কার অবশ্য স্বীকার্য্য। উহা আত্মগত প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম ॥৪১॥

ভাষ্য। প্রত্যনৌকপরিহারার্থক—

অনুবাদ। “প্রত্যনৌক” অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ-লাভের বিরোধী বা অন্তরায়ের পরিহারের উদ্দেশ্যেও—

সূত্র। অরণ্যগুহাপুলিনাদিসু যোগাভ্যাসোপদেশঃ ॥

॥৪২॥৪৫২॥

অনুবাদ। অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে।

ভাষ্য। যোগাভ্যাসজনিতো ধর্ম্মো জন্মান্তরেহপ্যনুবর্ততে। প্রচয়-কাষ্ঠাগতে তত্ত্ব-জ্ঞানহেতৌ ধর্ম্মে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ সমাধিনার্থবিশেষ-প্রাবল্যাভিভবঃ,— “নাহমেতদশ্রৌষং নাহমেতদজ্ঞাসিষমশ্রুত্ব মে মনোহু” দিত্যাহ লৌকিক ইতি।

অনুবাদ। যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম জন্মান্তরেও অনুরক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের

১। প্রচয়কাষ্ঠা প্রচয়াবধির্ভূতঃ পরমপঃ প্রচয়ো নাস্তি। তৎসহকারিশালিতয়া প্রবৃত্তায়াং সমাধিভাবনায়াং, সমিধপ্রযত্নঃ সমাধিভাবনা তস্তামিতার্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

হেতু ধর্ম “প্রচয়কাষ্ঠা” অর্থাৎ যাহার পর আর “প্রচয়” বা বৃদ্ধি নাই, সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে “সমাধিভাবনা” (সমাধিবিশয়ক প্রযত্ন) প্রকৃষ্ট হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। “সমাধি” অর্থাৎ চিন্তের একাগ্রতাকর্ষক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের অভিভব দৃষ্টও হয়। (কারণ) “আমি ইহা শুনি নাই, আমি ইহা জানি নাই, আমার মন অত্র বিষয়ে ছিল,” ইহা লৌকিক ব্যক্তি বলে।

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি পরে আবার এই সূত্রের দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, সমাধির অন্তরায় পরিহারের জন্ত শাস্ত্রে অরণ্য, পর্বত-গুহা ও নদীপুদিনাদি নির্জন ও নির্বোধ স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে স্থানের গুণে অনেক অন্তরায় ঘটে না। সুতরাং চিন্তের একাগ্রতা সম্ভব হওয়ায় পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হইতে পারে। ভাষ্যকার এই সরলার্থ সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বলিয়া তাহা করেন নাই। কিন্তু মহর্ষির পূর্বসূত্রোক্ত উত্তরের সমর্থনের জন্ত তাহার সযুক্তিক সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত করিতে পরে এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, যোগাভ্যাসজনিত যে ধর্ম, তাহা জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পূর্বপূর্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসজনিত যে ধর্ম, তাহা পরজন্মেও থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের হেতু ঐ ধর্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তখন উহার সাহায্যে কোন জন্মে সমাধিবিশয়ক ভাবনা অর্থাৎ প্রযত্ন প্রকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তখন তত্ত্ব-শাস্ত্রাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ সহসা নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া, উহা সমাধিবিশেষের অন্তরায়ও হইতে পারে না। কারণ, বিষয়বিশেষে একাগ্রতারূপ যে সমাধি, তাহা, উৎপন্ন হইলে অর্থবিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করে। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে লৌকিক বিষয়েও ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ত বলিয়াছেন যে, বিষয়বিশেষে চিন্তের একাগ্রতারূপ সমাধিকর্ষক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের যে অভিভব হয়, ইহা দৃষ্টও হয়। কারণ, কোন লৌকিক ব্যক্তি কোন বিষয়বিশেষে একাগ্রচিন্ত হইয়া যখন উহারই চিন্তা করে, তখন অপরের কোন কথা শুনিতে পায় না। প্রবল অত্র বিষয়েও তাহার তখন কোন জ্ঞান জন্মে না। পরে তাহাকে উত্তর না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়া থাকে যে, “আমি ত ইহা কিছু শুনি নাই, ইহা কিছু জানি নাই, আমার মন অত্রই ছিল।” তাহা হইলে বিষয়বিশেষে তাহার চিন্তের একাগ্রতা যে, তৎকালে অত্র বিষয়ের প্রবলতাকে অভিভূত করিয়াছিল, অর্থাৎ অত্র বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে যোগীরও বিষয়বিশেষে চিন্তের একাগ্রতারূপ সমাধি জন্মিলে তখন উহাও অত্র বিষয়ের প্রাবল্যকে অভিভূত করে, অর্থাৎ অত্র বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং কারণ সত্ত্বেও বিষয়ান্তরে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্য। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা স্থানবিশেষে চিন্তের একাগ্রতা যে সম্ভব, ইহাই প্রকাশ করায় ভাষ্যকার এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত ঐ যুক্তিরও সমর্থন করিয়া পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বপক্ষ-

বাদী যে অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি অনিবার্য্য বলিয়া কাহারও সমাধি-বিশেষ জন্মিতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, পূর্বপূর্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসজনিত ধর্মের সাহায্যে এবং স্থানবিশেষের সাহায্যে যোগীর অভীষ্ট বিষয়ে চিন্তের একাগ্রতাক্রম সমাধি অবশ্যই জন্মে, এবং উহা সমস্ত বিষয়বিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতীবন্ধক হওয়ায় তখন সেই সমস্ত বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। অতএব ক্রমে নির্বিকল্পক সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ঐ তত্ত্বসাক্ষাৎকার-জ্ঞান যে সংস্কার, উহারই নাম “তত্ত্বজ্ঞানবিন্দু”। উহাই অনাদিকালের মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কারকে বিনষ্ট করে। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, “তজ্জঃ সংস্কারোহন্তসংস্কারপ্রতিবন্ধী” (১।৫০)। সংসারনিদান অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইলে আর সংসার হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষ অবশ্যসম্ভাবী, উহা অসম্ভব নহে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য।

মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা যে দেশবিশেষে যোগাভ্যাসের উপদেশ বলিয়াছেন, তদ্বারা যোগাভ্যাসে ঐ সমস্ত দেশনিয়ম অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানেই যে যোগাভ্যাস কর্তব্য, অত্র কর্তব্য নহে, ইহা বিবক্ষিত নহে। কিন্তু যে স্থানে চিন্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্তব্য, ইহাই বিবক্ষিত। কারণ, যোগাভ্যাসের দিগ্দেশকালনিয়ম নাই। যে দিকে, যে স্থানে ও যে কালে চিন্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্তব্য। কারণ, একাগ্রতা লাভের সাহায্যের জন্মই শাস্ত্রে যোগাভ্যাসের দেশাদির উল্লেখ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের “যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ” (৪।১।১৭) এই সূত্রের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই সুব্যক্ত করা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রকারও বলিয়াছেন,—“ন স্থান-নিয়মশ্চিন্তাপ্রসাদাৎ” (৬।৩১)। অবশ্য উপনিষদেও “সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে” ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ২।১০) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যোগাভ্যাসের স্থানবিশেষের উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারাও যে স্থানে চিন্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই যোগাভ্যাস কর্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। উক্ত বেদান্তসূত্রানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উহার ভাষ্যে উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া উক্তরূপই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। “শ্রায়বার্ত্তিক” ও “তাৎপর্য্যটিকা”য় এই সূত্রের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয়, এই জন্মই কেহ কেহ ইহা ভাষ্যকারেরই উক্তি বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু বৃত্তিকার ইহা মহর্ষির সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের “শ্রায়সূচীনিবন্ধ” ও “শ্রায়সূত্রোদ্ধারে”ও ইহা সূত্রমধ্যে গৃহীত হইয়াছে ॥৪২॥

ভাষ্য। যদ্যর্থবিশেষপ্রাবল্যাদনিচ্ছতোহপি বুদ্ধ্যুৎপত্তিরনুজ্ঞায়তে—

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যদি অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ জ্ঞানেচ্ছাশূণ্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার কর, (তাহা হইলে)—

সূত্র। অপবর্গেহিৈপ্যেবংপ্রসঙ্গঃ ॥৪৩॥৪৫৩॥

অমুবাদ। মুক্তি হইলেও এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয়।

ভাষ্য । মুক্তশ্রাপি বাহ্যার্থ-সামর্থ্যাদবুদ্ধয় উৎপদ্যেরন্থিতি ।

অনুবাদ । মুক্ত পুরুষেরও বাহ্য পদার্থের সামর্থ্যবশতঃ জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হউক ?

টিপ্পনী । জ্ঞানোচ্ছা না থাকিলেও অর্থবিশেষের প্রবলতাবশতঃ সেই অর্থবিশেষে জ্ঞান জন্মে, ইহা স্বীকার করিয়াই মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিয়াছেন । তাই পূর্বপক্ষবাদী অথবা অন্য কোন উদাসীন ব্যক্তি এখানে আপত্তি করিতে পারেন যে, তাহা হইলে মুক্তি হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হউক ? অর্থাৎ যদি জ্ঞানের ইচ্ছা না থাকিলেও কোন কোন বাহ্য বিষয়ের প্রবলতাবশতঃ সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও সময়বিশেষে সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হউক ? তাৎপর্য্য এই যে, সহসা মেঘগর্জ্জন হইলে সেই শব্দবিশেষের প্রবলতাবশতঃ মুক্ত পুরুষও উহা শ্রবণ করিবেন না কেন ? এইরূপ অন্ত্যাত্ম বাহ্য বিষয়-বিশেষেও অন্তের দ্বারা তাঁহারও জ্ঞান জন্মিবে না কেন ? মহর্ষি এই পূর্বপক্ষস্বত্বের দ্বারা উক্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, পরবর্তী দুই সূত্রের দ্বারা ভ্রান্তিমূলক উক্ত আপত্তিরও এখানে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন । ভাষ্যকার উক্ত আপত্তির হেতু প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—“বাহ্যার্থসামর্থ্যাৎ ।” অর্থাৎ আপত্তিকারীর কথা এই যে, বাহ্য পদার্থের তদ্বিশেষে জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ্য আছে । অর্থাৎ বাহ্য পদার্থবিশেষের এমনই মহিমা আছে, যে জন্ত উহা ইন্দ্রিয়াদিকে অপেক্ষা না করিয়াও তদ্বিশেষে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ । এইরূপ ভ্রমমূলক আপত্তিই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ॥৪৩॥

সূত্র । .ন নিষ্পন্নাবশ্যস্তাবিত্বাৎ ॥৪৪॥৪৫৪॥

অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয় না । কারণ, “নিষ্পন্নো” অর্থাৎ কৰ্ম্মবশতঃ উৎপন্ন শরীরেই (জ্ঞানোৎপত্তির) অবশ্য-স্তাবিতা আছে ।

ভাষ্য । কৰ্ম্মবশান্নিষ্পন্নো শরীরে চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ে নিমিত্তভাবাদবশ্যস্তাবী বুদ্ধীনামুৎপাদঃ । ন চ প্রবলোহপি সন্ বাহ্যোহর্থ আত্মনো বুদ্ধ্যুৎপাদে সমর্থো ভবতি । তন্মৈত্রিয়েণ সংযোগাদবুদ্ধ্যুৎপাদে সামর্থ্যং দৃষ্টমিতি ।

অনুবাদ । কৰ্ম্মবশতঃ উৎপন্ন চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় শরীরে নিমিত্তের সত্তাবশতঃ জ্ঞানসমূহের উৎপাদ অবশ্যস্তাবী । [অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত থাকায় অবশ্য জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার

করি] কিন্তু (শরীর না থাকিলে) বাহ্য পদার্থ প্রবল হইলেও আত্মার জ্ঞানোৎপত্তিতে সমর্থ হয় না। (কারণ) সেই বাহ্য বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগপ্রযুক্তই জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ্য দৃষ্ট হয় ।

টিপ্পননী । পূর্বোক্ত ভ্রান্তিমূলক আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, উক্ত আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, প্রাক্তন কৰ্ম্মবশতঃ যে শরীর “নিষ্পন্ন” বা উৎপন্ন হয়, উহা থাকিলেই সেই শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানোৎপত্তির অবশ্যস্তাবিতা আছে । অর্থাৎ শরীর থাকিলেই জ্ঞানের নিমিত্ত থাকায় বাহ্য বিষয়-বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছা না থাকিলেও কোন সময়ে অবশ্য জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার করিয়াছি । শরীরাদি কারণ না থাকিলেও কেবল বাহ্য বিষয়বিশেষের মহিমায় তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, ইহা ত স্বীকার করি নাই । কারণ, তাহা অসম্ভব । সমস্ত কারণ না থাকিলে কোন কার্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না । ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রোক্ত “নিষ্পন্ন” শব্দের দ্বারা প্রাক্তন কৰ্ম্মবশতঃ নিষ্পন্ন শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন । শরীর থাকিলেই তাহাতে ইন্দ্রিয় থাকে । কারণ, শরীর—চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় । মহর্ষিও “চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরঃ” (১।১।১১) এই সূত্রের দ্বারা শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন । তদনুসারেই ভাষ্যকার পরে “চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ে” এই ব্যাক্যের দ্বারা শরীরের ঐ স্বরূপের উল্লেখ করিয়া, শরীর থাকিলেই যে, বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত-কারণ থাকে, নচেৎ উহা থাকে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন । তাই পরেই বলিয়াছেন, “নিমিত্তভাবাৎ” । ভাষ্যকার পরে উক্ত যুক্তি সূচ্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বাহ্য বিষয় প্রবল হইলেও কেবল উহাই তদ্বিষয়ে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না । কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার সংযোগ হইলেই তৎপ্রযুক্ত উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয় । সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ শরীর না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ বা সম্বন্ধবিশেষ সম্ভব না হওয়ায় কারণের অভাবে কোন বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না । কিন্তু পূর্বোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই তদাশ্রিত কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে ইচ্ছা না থাকিলেও সময়বিশেষে প্রত্যক্ষ অবশ্যস্তাবী, ইহা স্বীকার্য্য । সূত্র সপ্তমীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের অভিमत । “নিষ্পন্ন” অর্থাৎ প্রাক্তন কৰ্ম্মনিষ্পন্ন শরীরে আত্মার বাহ্য বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপত্তির অবশ্যস্তাবিত্বই ভাষ্যকারের মতে সূত্রকার মহর্ষির বিবক্ষিত । কিন্তু বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের মতে এই সূত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই মহর্ষির অভিमत । বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “নিষ্পন্ন” অর্থাৎ শরীরাদির জ্ঞানাদি কার্য্যে “অবশ্যস্তাবিত্ব” অর্থাৎ কারণত্ব আছে । অর্থাৎ শরীরাদি না থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদি কার্য্য জন্মিতে পারে না । “অবশ্যস্তাবিত্ব” শব্দের দ্বারা জ্ঞানাদি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বে অবশ্যবিদ্যমানত্ব বুঝিলে উহার দ্বারা কারণত্বই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে এবং সূত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই যে, প্রথমে বুদ্ধির বিষয় হয়, ইহাও স্বীকার্য্য । কিন্তু সূত্রোক্ত “অবশ্যস্তাবিত্ব” শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে বৃত্তিকারের ঐ ব্যাখ্যা সংগত হয় না । মনে হয়, ভাষ্যকার ঐ প্রসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ॥৪৪॥

সূত্র । তদভাবশ্চাপবর্গে ॥ ৪৫॥৪৫৫ ॥

অনুবাদ । কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব (অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন শরীরাদি নিমিত্ত-কারণ না থাকায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না) ।

ভাষ্য । তত্ত্ব বুদ্ধিনিমিত্তাশ্রয়শ্চ শরীরেন্দ্রিয়শ্চ ধর্ম্যাধর্ম্যাভাবাদভাবোহপ-
বর্গে । তত্র যদুক্ত “অপবর্গেহপ্যেবংপ্রসজ্জ” ইতি তদযুক্তং । তস্মাৎ
সর্বদুঃখবিমোক্ষোহপবর্গঃ । যস্মাৎ সর্বদুঃখবীজং সর্বদুঃখায়তন-
কাপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তস্মাৎ সর্বেষাং দুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গঃ । ন নিব্বীজং
নিরায়তনঞ্চ দুঃখমুৎপদ্যতে ইতি ।

অনুবাদ । অপবর্গে অর্থাৎ মুক্তিকালে ধর্ম ও অধর্মের অভাব প্রযুক্ত জ্ঞানের
নিমিত্ত ও আশ্রয় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব । তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে,
“অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়”, তাহা অযুক্ত । অতএব সর্বদুঃখনিবৃত্তিই
মোক্ষ । (তাৎপর্য) যেহেতু অপবর্গ হইলে সমস্ত দুঃখের বীজ (ধর্ম্যাধর্ম্য) এবং
সমস্ত দুঃখের আয়তন (শরীর) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্য
উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত দুঃখ কর্তৃক বিমুক্তি অপবর্গ । (কারণ) নিব্বীজ ও
নিরায়তন দুঃখ উৎপন্ন হয় না । [অর্থাৎ দুঃখের বীজ ধর্ম্যাধর্ম্য ও দুঃখের আয়তন
শরীর না থাকিলে কখনই কোনরূপ দুঃখ জন্মিতে পারে না] ।

টিপ্পনী । পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে মহর্ষি পূর্বসূত্রে যাহা বলিয়াছেন, তদ্বারা ঐ আপত্তির
খণ্ডন হইবে কেন ? ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিবার জগুই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে,
মুক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয় । অর্থাৎ তখন হইতে আর কখনও মুক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ
না হওয়ায় নিমিত্ত-কারণের অভাবে, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতেই পারে না । জ্ঞান জ্ঞানমাত্রাই শরীর
অন্ততম নিমিত্ত-কারণ । কারণ, শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে । এবং ইন্দ্রিয়-
জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানে ইন্দ্রিয় অসাধারণ নিমিত্তকারণ । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত আপত্তিকারীর পক্ষে
বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানই আপত্তির বিষয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে সূত্রোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা
শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ শরীর ও ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত-
কারণরূপ আশ্রয় বলিয়াছেন । “আশ্রয়” বলিতে এখানে সহায় । শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ সহায়ের
সাহায্যেই আত্মাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে । সুতরাং আত্মা ঐ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রয় হইলেও
শরীর এবং ইন্দ্রিয়কে উহার সহায়রূপ আশ্রয় বলা যায় । ভাষ্যকার পূর্বেও অনেক স্থানে সহায়
বা উপকারক অর্থে “আশ্রয়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । উদ্যোতকরও সেখানে ঐরূপ ব্যাখ্যা

করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । অবশ্য শরীরের অভাব বলিলেই ইন্দ্রিয়ের অভাবও বুঝা যায় । কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ শরীরান্বিত । শরীর না থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না । তাই ভাষ্যকার পূর্বসূত্রে “নিষ্পন্ন” শব্দের দ্বারা কেবল শরীরকেই গ্রহণ করিয়া, উহাকে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, ইহাও বলিয়াছেন । কিন্তু এখানে মহর্ষি, সূত্রে “তদভাব” শব্দের দ্বারা মুক্তিকালে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে প্রয়োজকের উল্লেখ করায় ভাষ্যকার “তৎ” শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ, শরীরাতাবপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াভাবই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে সাক্ষাৎ প্রয়োজক । মহর্ষি সাক্ষাৎ প্রয়োজকের উল্লেখ না করিয়া পরম্পরায় প্রয়োজকের উল্লেখ করিলে তাঁহার বক্তব্যের নূনতা হয় । ভাষ্যে “শরীরেইন্দ্রিয়শ্চ” এই স্থলে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত । মুক্তি হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় কেন থাকে না ? অর্থাৎ চিরকালের জ্ঞাত উহার অত্যন্তাভাবের প্রয়োজক কি ? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবাৎ ।” অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মজ্ঞাত যে ধর্ম্মাধর্ম্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক, তাহা মুক্তি হইলে থাকে না, আর কখনও উহা উৎপন্নও হয় না । সুতরাং ঐ নিমিত্ত-কারণের অভাবে মুক্ত পুরুষের কখনও শরীর ও ইন্দ্রিয় জন্মে না । অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবই তখন মুক্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাবের প্রয়োজক । “শ্রীমৎসূত্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এই সূত্রে “চ” শব্দের দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্মাভাব গ্রহণ করিয়াছেন । মূলকথা, পূর্বোক্ত “অপবর্গেহ্যপোবৎপ্রসঙ্গঃ” এই সূত্রোক্ত আপত্তি অযুক্ত । ভাষ্যকার পরে এখানে উহা বলিয়া মহর্ষির মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ।

মহর্ষি যে মুক্তি অনুসারে প্রথম অধ্যায়ে “তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ” (১।২২) এই সূত্রের দ্বারা মুক্তির স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা এখানে এই সূত্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে । ভাষ্যকার তাহা সুব্যক্ত করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, অতএব সর্ব্বদুঃখবিমুক্তি অপবর্গ । অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখের বীজ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং সর্ব্বদুঃখের আয়তন শরীর যখন মুক্তি হইলে একেবারে উচ্ছিন্ন হয়,—কারণ, তৎসাক্ষাৎকার ও ভোগের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং আর কখনও উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর কখনই শরীরপরিগ্রহ হইতেই পারে না,—তখন তাঁহার সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অবশ্যই হইবে । কারণ, বীজ ও আয়তন ব্যতীত দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে না ।

এখানে মহর্ষি গৌতমের এই সূত্রের দ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মুক্তি হইলে যে, শরীরাদির অভাবে কোন জ্ঞানই থাকে না, ইহা মহর্ষি গৌতমের মত বলিয়া অবশ্য বুঝা যায় । কিন্তু যাহারা মহর্ষি গৌতমের মতেও মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি সমর্থন করেন, তাঁহারা মহর্ষির এই সূত্রকে উহার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না । কারণ, তাঁহারা বলেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা মুক্ত পুরুষের শরীরাদি না থাকায় বাহ্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের আপত্তিই খণ্ডন করিয়াছেন । আত্মাতে যে নিত্যসুখ চিরবিদ্যমান আছে, সংসারকালে প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহার অনুভূতি হয় না । কিন্তু মুক্তিকালে প্রতিবন্ধক না থাকায় উহার অনুভূতি হইয়া থাকে । তাহাতে তখন শরীরাদি অনাবশ্যক । মহর্ষি পূর্বে এবং এখানেও মুক্তিতে ঐ নিত্যসুখের

অনুভূতির নিষেধ না করায় উহা তাঁহার অসম্মত বলিয়া বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত মতের সমর্থক শ্রীবেদান্তাচার্য্য বেকটনাথ “শ্রায়পরিণুক্তি” গ্রন্থে তাঁহার নিজ মত সমর্থন করিতে শেষে লিখিয়াছেন,—“এতেন ‘তস্মাৎ সর্বদ্বংধবিমোক্ষোহপবর্গ’ ইতি চতুর্থাধ্যায়বাক্যমপি নিবৃত্তং, তত্রাপ্যানন্দনিষেধাভাবাৎ।” (কালী চৌখায়া সিরিজ, ১৭ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে মুক্ত পুরুষের নিত্যানন্দানুভূতির নিষেধ না করিলেও প্রথম অধ্যায়ে যে বিশেষ বিচার-পূর্বক উহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। মহামনীষী বেকটনাথ যে, তাহা দেখেন নাই, ইহা বলা যায় না। সুতরাং তিনি যে ঐ স্থলে পূর্বোক্ত ভাষ্যকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। উক্ত স্থলে “তদভাবশ্চাপবর্গে ইতি চতুর্থাধ্যায়মুদ্রমপি নিবৃত্তং” ইহাই প্রকৃত পাঠ, মুদ্রিত ঐ পাঠ বিকৃত, ইহাই মনে হয়। গৌতম মতে মুক্তিতে নিত্যস্থানানুভূতি হয় কি না, এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (৩৪২—৫৫ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম এখানে পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তি অনুসারেই উহার খণ্ডন করিতে এই সূত্রে “অপবর্গ” শব্দের দ্বারা নির্বাণ মুক্তিকেই গ্রহণ করিয়া, তাহাতেই শরীরাদির অভাব বলিয়াছেন। তদ্বারা জীবনুত্তি যে, তাঁহার সম্মত নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, তিনি শ্রায়দর্শনের “দ্বংধজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা জীবনুত্তিও সূচনা করিয়াছেন। উহা বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধ। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। তবে জীবনুত্ত পুরুষের অবিদ্যার লেশ থাকে কি না, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শরীরকভাষ্যে উহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও সংস্কারবশতঃ কিছুকাল অর্থাৎ শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত উহা অনুবর্ত্তন করে। সেখানে “রত্নপ্রভা”টীকাকার উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যার আবরণশক্তি নামক অংশকেই নষ্ট করে। কিন্তু তখন অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নামক অংশ থাকে। অবিদ্যার ঐ বিক্ষেপক অংশ বা লেশই অবিদ্যার লেশ। শঙ্করাচার্য্যের মতসমর্থক চিৎসুখ মুনিও “তত্ত্ব-প্রদীপিকা”র সর্বশেষে বিশেষ বিচারপূর্বক জীবনুত্তির সমর্থন করিতে জীবনুত্তের যে অবিদ্যার লেশ থাকে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার গুরু জ্ঞান-সিদ্ধিকার “শ্রায়সুধা”গ্রন্থে এক অবিদ্যারই নানা আকার বর্ণন করিয়া, তন্মধ্যে আকারবিশেষকেই অবিদ্যার লেশ বলিয়াছেন। চিৎসুখ মুনি শেষে স্বেতাস্বতর উপনিষদের “ভূয়শ্চাস্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ”, এই শ্রুতিবাক্যে “ভূয়স্” শব্দ ও “অন্ত” শব্দদ্বারা নির্বাণমুক্তিকালে পুনর্বার অবিদ্যার নিবৃত্তি কথিত হওয়ায় উহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী জীবনুত্তের যে প্রথমে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না, অবিদ্যার লেশ বা কোন আকার থাকে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি এবং পূর্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে প্রারম্ভ কর্তব্য যে, ভোগমাত্রানাশ,—জীবনুত্ত ব্যক্তিদিগেরও প্রারম্ভ কর্তব্য

ভোগের জন্তই শরীরাদি থাকে, এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত শ্রৌত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে (তৃতীয় স্কন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৭ ও ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের “কিরাতহৃণাকুপুলিন্দপুষ্কসাঃ” ইত্যাদি (১৮শ) শ্লোক এবং তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের “যন্মানাধেয়শ্রবণানুকীৰ্ত্তনাৎ” ইত্যাদি (ষষ্ঠ) শ্লোকের তৃতীয় পাদে “ঋদোহপি সদাঃ সর্বনাশ কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ও শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্তিও প্রারব্ধ কৰ্ম নষ্ট করে। কারণ, উক্ত “ঋদোহপি সদাঃ সর্বনাশ কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালও তখন যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। “ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু” গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, চণ্ডালাদির দুর্জাতি অর্থাৎ নীচ-জাতিই তাহাদিগের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ। ঐ নীচজাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহাদিগের প্রারব্ধ কৰ্মই। উহা বিনষ্ট না হইলে তাহাদিগের ঐ নীচ জাতির বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতাও হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বাক্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালের যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা কথিত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তি, তাহাদিগের নীচজাতিজনক প্রারব্ধ কৰ্মও বিনষ্ট করে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত মতে “নাতুভুং ক্ষীয়তে কৰ্ম” ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধ হয় কি না, ইহা বিচার্য্য। শ্রীভাষ্যে (৪।১।১৩) রানানুজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপূর্বক বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বচনের প্রামাণ্য তাহাদিগেরও সম্মত, ইহা স্বীকার্য্য। অনেক অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত বচনটী দেখিতে পাইয়াছি*। কিন্তু উক্ত বচনের শেষোক্ত বচনে “কায়বাহেন শুধ্যতি” এই কথা কেন বলা হইয়াছে, তাহাও বিচার করা আবশ্যক। তত্ত্ব-জ্ঞানী জীবমুক্ত ব্যক্তিই কায়বাহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া শীঘ্র সমস্ত প্রারব্ধ কৰ্ম ভোগ করেন, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। কায়বাহ নিৰ্ম্মাণে সকলের সামর্থ্যও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও প্রারব্ধ কৰ্ম ক্ষয় হইলে কায়বাহ নিৰ্ম্মাণের প্রয়োজনও নাই। যোগী ও জ্ঞানীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাশ প্রারব্ধ কৰ্মক্ষয়ের জন্ত কায়বাহ নিৰ্ম্মাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা অনাবশ্যক। কারণ, ভগবদ্ভক্তিই ভক্তের প্রারব্ধকৰ্মক্ষয় করে, ইহা বলিলে ঐ ভগবদ্ভক্তের দেহাদিস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা বলা আবশ্যক। কারণ, প্রারব্ধ কৰ্ম থাকা পর্য্যন্তই দেহস্থিতি বা জীবন থাকে। উহা না থাকিলে

১। দুর্জাতিদের সর্বনাশযোগ্যত্বের কারণ মতঃ।

দুর্জাতারম্ভকং পাপং যৎ স্তাৎ প্রারব্ধমেব তৎ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

২। নাতুভুং ক্ষীয়তে কৰ্ম ব্রহ্মকোটিশতৈরপি।

অগ্ৰমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভং ॥

* শ্রীতীর্থসহায়েন কায়বাহেন শুধ্যতি ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ১২৬শ অঃ, ৭১শ শ্লোক।

জীবনই থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও উহাই কথিত হইয়াছে^১। সূতরাং তাঁহার তখন সমস্ত প্রারব্ধ কর্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্যে পরে যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ত নিতান্ত আর্ত ভক্তের জ্ঞাতিগণের মধ্যে স্নহদগ্গণ তাঁহার পুণ্যরূপ প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন এবং শত্রুগণ পাপরূপ প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন কেন? ইহাও বিচার করা আবশ্যক। তিনি বেদান্তদর্শনের “বিশেষণ দর্শয়তি” (৪।৩।১৬) এই সূত্রের ভাষ্যে আর্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করার পূর্বে লিখিয়াছেন,—“বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে” (পূর্ববর্তী ৩৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং পূর্বে “তস্ত স্নহদ-দৃষ্টতে বিধুত্বং তস্ত প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ স্নহদমুপযন্ত্যপ্রিয়া দৃষ্টতমিতি” এবং “তস্ত পুত্রা দায়মুপযন্তি স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং” এই শ্রুতিবাক্যকে তাঁহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রারব্ধ কর্মের সম্বন্ধেও যে উক্ত শ্রুতির দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহা অন্য সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তিও যে প্রারব্ধ কর্মের নাশক হয়, এই সিদ্ধান্তও উক্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়। কারণ, ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে সেই আর্ত ভক্তেরও সমস্ত প্রারব্ধ কর্মক্ষয় হইলে অত্রে তাহা কিরূপে ভোগ করিবে? বাহ্য অন্ততঃ অত্রেও অবশ্য ভোগ্য, তাহার সত্তা ও ভোগমাত্রানাতাই অবশ্য স্বীকার্য্য। সূতরাং বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শেষে “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি বচনানুসারেই ভক্ত-বিশেষের প্রারব্ধ কর্মেরও ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। স্নহগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের ঐ সমস্ত সন্দর্ভ দেখিয়া ইহার বিচার করিবেন।

পরন্তু এই প্রসঙ্গে এখন এখানে ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বোক্ত “ঋদোহপি সদ্যঃ সর্বনায় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারব্ধকর্মক্ষয় হয়, ইহা বলিলেও তাঁহাদিগের যে, ইহ জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব জাতিপ্রাপ্তি ও ব্রাহ্মণকর্তব্য বাগানুষ্ঠানে অধিকার হয়, ইহা কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টীকাকার পূজাপাদ শ্রীধর স্বামী উক্ত স্থলে লিখিয়াছেন,—“অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে।” তাঁহার টীকার টীকাকার রাধারমণদাস গোস্বামী উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অনেন ‘কল্পত’ ইতি ক্রিয়াপদেন”। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে “কল্পতে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির তৎকালে পূজ্যতামাত্রই লক্ষিত হইয়াছে। “রূপ” ধাতুর অর্থ এখানে সামর্থ্য। সামর্থ্যবাচক “রূপ” ধাতুর প্রয়োগবশতঃই “সর্বনায়” এই স্থলে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণকর্তব্য সোমাদিবাগই ঐ স্থলে “সবন” শব্দের অর্থ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার দ্বারা তাহার ব্রাহ্মণবৎ পূজ্যতা বা প্রশংসাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি-

১। দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ স্বারম্ভকঃ প্রাতি সন্মাক্ত এব সাত্মঃ”। ইত্যাদি—(তৃতীয় স্কন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৮শ শ্লোক)। ননু কথং তর্হি দেহস্ত প্রবৃত্তিনিবৃত্তির্জীবনং বা তত্রাহ দেহোহপিতি।—স্বামিটীকা। ননু তর্হি তস্ত দেহঃ কথং জীবন্তত্রাহ দেহোহপিতি।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তিবৃত্ত টীকা।

প্রাপ্তি কথিত হয় নাই। রাধারমণদাস গোস্বামী সেখানে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যেমন অল্পপনিত ব্রাহ্মণের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ পাপ না থাকায় যোগ্যতা থাকিলেও উহাতে তাহার উপনয়ন বা সাবিত্রীহ্নের অপেক্ষা আছে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদিরও ব্রাহ্মণ-কর্তব্য যাগানুষ্ঠানে জন্মান্তরের অপেক্ষা আছে। ফলকথা, উক্ত বাক্যে “কল্পতে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতামাত্রই কথিত হইয়াছে। ঐ ক্রিয়াপদের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতিপ্রাপ্তি হয় না। তবে ইহজন্মেই তাহাদিগের ব্রাহ্মণবৎ যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা জন্মে, ইহাই প্রকাশ করিতেই উক্ত বাক্যে বলা হইয়াছে “সদ্যঃ”। “ক্রমসন্দর্ভে” শ্রীজীব গোস্বামীও উক্ত স্থলে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদির ইহজন্মে ব্রাহ্মণকর্তব্য যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতামাত্রই জন্মে। কিন্তু তাঁহারা পরজন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অধিকারী হন। শ্রীবিষ্মনাথ চক্রবর্তীও ঐ স্থলে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালাদিকে সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের শ্রায় পূজ্যই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলেন নাই। টীকাকার বীররাঘবাচার্য্য কিন্তু তৃতীয় স্কন্ধের “যস্তাবতারগুণকর্ম্ম” ইত্যাদি (৯ম অঃ ১৫) পূর্বোক্ত শ্লোকের সহিত সমন্বয় করিয়া উক্ত স্থলে বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের নাম স্মরণাদির দ্বারা পাপীদিগেরও কৃতার্থতাপ্রতিপাদক ঐ সমস্ত বচন অস্তিম কালে স্মরণ বিষয়েই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অস্তিমকালে শ্রীভগবানের স্মরণাদি করিলে চণ্ডালাদি পাপিগণও শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের শ্রায় কৃতার্থ হন, ইহাই তাৎপর্য্য। এই ব্যাখ্যায় অনেক বিবাদের নিবৃত্তি হয় বটে। কিন্তু বীর রাঘব পরমবৈষ্ণব হইয়াও ঐরূপ অভিনব ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন কেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। সে যাহা হউক, মূলকথা, গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চণ্ডালাদিরও নীচজাতিজনক প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় স্বীকার করিলেও ইহজন্মেই তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্বজাতিপ্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই, ইহা মনে রাখা আবশ্যক এবং পরম ভক্ত হইলেও যখন ইহজন্মে তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন নাই, তখন বৈষ্ণবদীক্ষা প্রাপ্ত হইলে তদ্বারা তখনই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে, ইহা যে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না, ইহাও বুঝা আবশ্যক। “হরিভক্তিবিলাসে”র টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবদীক্ষার প্রশংসাবাদ। “হরিভক্তিবিলাসে”র সপ্তদশ বিলাসের পুরস্চরণপ্রকরণ দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। বৈষ্ণব দীক্ষার দ্বারা তখনই

১। “সদ্যঃ সবনায় কল্পতে” ইতি, “সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিতাক্ষরম্বয়ং। বন্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি”, ইতিবৎ তত্র যোগ্যতায় লঙ্কারস্তো ভবতীত্যর্থঃ। তদনন্তরজন্মশ্চেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তত্রাধিকারী স্তাদিতি ভাবঃ। —শ্রীজীবগোস্বামিকৃত “ক্রমসন্দর্ভ”।

২। স্বাদেঃপি খণচোঃপি সদ্যন্তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি, সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জ্ঞাতারম্ভকপাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ ইত্যাদি।—বিষ্মনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

৩। এবম্বিধানি নামস্মরণাদিনা পাপিনামপি কৃতার্থতাপ্রতিপাদকানি বচনানি অস্তিমস্মরণবিষয়ানি স্তম্ভানি। তথাচোক্তং পুঃস্তাৎ—“যস্তাবতারগুণকর্ম্মনির্ভদ্বনানি নামানি যেহস্মবিগমে বিবশা গৃণন্তি” ইতি বীররাঘবাচার্য্যকৃত “ভাগবতচন্দ্রচল্লিকা”।

সকল মানবেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে পুরুষচরণে বর্ণভেদে ব্যাধস্তা সংগত হয় না, ইহা সেখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। এ বিষয়ে এখানে আর অধিক আলোচনার স্থান নাই। মূলকথা এই যে, এই সূত্রে “অপবর্গ” শব্দের দ্বারা নির্বাণ মুক্তি গৃহীত হইলেও জীবন্মুক্তিও মহর্ষি গাতমের সম্ভব। উক্ত বিষয়ে প্রমাণাদি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে (৩১—৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৪৫॥

**সূত্র । তদর্থং যম-নিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারো যোগাচ্চা-
ধ্যাত্ম-বিদ্যুপায়ৈঃ ॥৪৬॥৪৫৬॥**

অনুবাদ । সেই অপবর্গ লাভের নিমিত্ত “যম” ও “নিয়মের”র দ্বারা এবং যোগ-শাস্ত্র হইতে (জ্ঞাতব্য) অধ্যাত্মবিধি ও উপায়সমূহের দ্বারা আত্ম-সংস্কার কর্তব্য।

ভাষ্য । তস্তাপবর্গস্তাধিগমায় যম-নিয়মাভ্যামাত্ম-সংস্কারঃ । যমঃ সমানমাশ্রমিণাং ধর্ম্মসাধনং । নিয়মস্ত বিশিষ্টং । আত্ম-সংস্কারঃ পুনরধর্ম্ম-হানং ধর্ম্মোপচয়শ্চ । যোগশাস্ত্রাচ্চাধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ । স পুনস্তপঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধারণা ধ্যানমিতি । ইন্দ্রিয়বিষয়েষু প্রসংখ্যানাভ্যাসো রাগদ্বेषপ্রহারার্থঃ । উপায়স্ত যোগাচারবিধানমিতি ।

অনুবাদ । সেই “অপবর্গ” লাভের নিমিত্ত যম ও নিয়মের দ্বারা আত্মসংস্কার (কর্তব্য) । আশ্রমীদিগের অর্থাৎ চতুরাশ্রমীরই সমান ধর্ম্ম-সাধন “যম” । “নিয়ম” কিন্তু বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধন (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশেষরূপে বিহিত ধর্ম্ম-সাধন) “আত্মসংস্কার” কিন্তু অধর্ম্মের ত্যাগ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি । এবং যোগশাস্ত্র হইতে “অধ্যাত্মবিধি” জ্ঞাতব্য । সেই অধ্যাত্মবিধি কিন্তু তপস্তা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান । ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে (রূপরসাদি বিষয়ে) “প্রসংখ্যানে”র অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস রাগদ্বেষ-ক্ষয়ার্থ । “উপায়” কিন্তু যোগাচারবিধান অর্থাৎ মুমুক্শু যোগীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত আচারের অনুষ্ঠান ।

টিপ্পনী । কেবল পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষের অভ্যাসই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া অপবর্গ লাভের কারণ হয় না, উহার জন্ত প্রথমে আরও অনেক কর্তব্য আছে, সেই সমস্ত ব্যতীত প্রথমে কাহারও ঐ সমাধিবিশেষ হইতেও পারে না । তাই পরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, তদর্থং “যম” ও “নিয়ম” দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য । তাৎপর্য্যটীকাকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল সমাধিবিশেষই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন নহে ; কিন্তু উহার জন্ত যম ও নিয়ম দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য । তিনি এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকেই গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয় । কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্বসূত্রের শেষে “অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ

থাকায় ভাষ্যকার ও বার্তিককার “তৎ” শব্দের দ্বারা অপবৰ্গকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“তত্ত্বাপবৰ্গস্তাধিগম্য”। অর্থাৎ সেই অপবৰ্গের লাভের জন্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া পরে বলিয়াছেন, “তদর্থং সমাধ্যর্থমিতি বা”। অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বে “সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ” (৩৮শ) এই সূত্রে যে সমাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে “পূর্বকৃত-ফলানুবন্ধাত্তৎপত্তিঃ” (৪১শ) এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সমাধিবিশেষই এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিস্থ, ইহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ এই সূত্রোক্ত যম ও নিয়ম দ্বারা যে, আত্ম-সংস্কার, তাহা পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় অপবৰ্গ লাভেরই সহায় হওয়ায় এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা অপবৰ্গকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন বাধক না থাকায় অব্যবহিত পূর্বোক্ত অপবৰ্গই এখানে “তৎ” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ও বার্তিককার “তৎ” শব্দের দ্বারা অপবৰ্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মহর্ষি এই সূত্রে যে “যম” ও “নিয়ম” বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা সমান অর্থাৎ সাধারণ ধর্মসাধন, তাহাকে “যম” বলিয়াছেন এবং চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা বিশিষ্ট ধর্মসাধন, তাহাকে “নিয়ম” বলিয়াছেন। পরে অধর্মের ত্যাগ ও ধর্মের বৃদ্ধিকে সূত্রোক্ত “আত্ম-সংস্কার” বলিয়াছেন। কোন প্রাচীন সম্প্রদায় এই সূত্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণকে “যম” এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মের আচরণকে “নিয়ম” বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারও ঐক্যপই মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ সর্বশ্রমীরই সাধারণ ধর্মসাধন, উহা সমান ভাবে সকলেরই আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠান বিশিষ্ট ধর্মসাধন। উহা সকলের পক্ষে একরূপও নহে। সুতরাং সমান ভাবে সকলেরই কর্তব্য নহে। পরন্তু নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করিলে যে অধর্ম জন্মে, উহার অনাচরণে উহার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহা জন্মিতে পারে না এবং আশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে তজ্জন্ত ক্রমশঃ ধর্মের বৃদ্ধি হয়। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “আত্ম-সংস্কার”। কারণ, অধর্ম ত্যাগ ও ধর্ম বৃদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। নচেৎ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতেই পারে না। সুতরাং আত্মার অপবৰ্গ লাভে যোগ্যতাই হয় না। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্রোক্ত “আত্ম-সংস্কার” শব্দের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মার অপবৰ্গ লাভে যোগ্যতা।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই “যম” ও “নিয়ম” শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। কোষকার অমর সিংহ প্রভৃতি যাবজ্জীবন অবশ্যকর্তব্য কর্মকে “যম” এবং আগন্তুক কোন নিমিত্তবিশেষ-প্রযুক্ত কর্তব্য অনিত্য (উপবাস ও স্নানাদি) কর্মকে “নিয়ম” বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাসংহিতার

“যমান্ সেবেত সততং” ইত্যাদি শ্লোকের^১ বাখ্যায় মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের কথাযুগ্মে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণই ঐ শ্লোকে “যম” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত এবং আশ্রমবিহিত ভিন্ন ভিন্ন কর্মই “নিয়ম” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, “যম” ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের সেবা করিলে পতিত হয়, এই মনুজ্ঞ সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ করিতে সেখানে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম করিলে মহাপাতকজন্তু পাতিতাবণতঃ আশ্রমবিহিত অগ্রাশ্রম কর্মে তাহার অধিকারই থাকে না। সুতরাং অনধিকারিকৃত ঐ সমস্ত কর্ম বার্থ হয়। অতএব “যম” ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি কর্মে রত থাকিয়া নিয়মের সেবা কর্তব্য নহে। কিন্তু টীকাকার কুল্লুক ভট্ট ঐ শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ও দয়া প্রভৃতি “যম” এবং স্নান, মৌন ও উপবাস প্রভৃতি “নিয়ম”কেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুনিগণই যখন “যম” ও “নিয়ম”র স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন উক্ত মনুবচনেও “যম” ও “নিয়ম” শব্দের সেই অর্থই গ্রাহ্য। তিনি ইহা সমর্থন করিতে শেষে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ “যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা”র শেষে ব্রহ্মচর্য্য ও দয়া প্রভৃতিকে “যম” ও “নিয়ম” বলা হইয়াছে। “গৌতমীয়তন্ত্রে”ও অহিংসা প্রভৃতি দশ “যম” ও তপস্তাদি দশ “নিয়মে”র উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে দেবপূজন এবং সিদ্ধাস্ত-শ্রবণও “নিয়মে”র মধ্যে কথিত হইয়াছে (“তন্ত্রদার” গ্রন্থে যোগপ্রক্রিয়া দৃষ্টব্য)। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেও উদ্ধবের প্রশ্নান্তরে শ্রীভগবদ্বাক্যে দ্বাদশ “যম” ও “নিয়মে”র উল্লেখ দেখা যায়^২। তন্মধ্যে ঈশ্বরের অর্চনাও “নিয়মে”র মধ্যে কথিত হইয়াছে। যোগদর্শনে অহিংসাদি পঞ্চ “যম” এবং শৌচাদি পঞ্চ “নিয়ম” যোগাঙ্গের মধ্যে কথিত হইয়াছে^৩, ঈশ্বরপ্রণিধানও সেই নিয়মের অন্তর্গত। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে “যম” শব্দের বাখ্যায় ভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের মতে এখানে “যম” শব্দের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ বুঝিলেও তদ্বারা যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমও পাওয়া যায়। কারণ, উহাও ফলতঃ হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ। এবং এই সূত্রে “নিয়ম” শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন

১। যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।

যমান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্—মনুসংহিতা, ৪।২০৪।

প্রতিষেধরূপা যমাঃ। ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ, সুরা ন পোয়া ইত্যাদয়ঃ। অনুষ্টেয়রূপা নিয়মাঃ। “বেদমেব জপেন্নিত্য”-মিত্যাদয়ঃ।—মেধাতিথিভাষ্য। যমনিয়মবিবেকচ্চ মুনিভিরেব কৃতঃ। তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্দানং সত্যমকল্কতা—ইত্যাদি কুল্লুক ভট্টকৃত টীকা।

২। অহিংসা সত্যমন্তেয়মসঙ্গো হ্রীঃসঞ্চয়ঃ। আশ্রিত্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং হৈর্ষ্যং ক্ষমা ভয়ং।

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং।

এতে যমাঃ সনিয়মা উত্তরোদ্ভাদশ স্মৃতাঃ। পুংসামুপাসিতান্তাত যথাকালং দ্রুহন্তি হি।

—১১শ স্কন্ধ, ১২শ অঃ, ৩০।৩১।৩২।

৩। অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-পরিগ্রহা যমাঃ।

শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।—যোগদর্শন, ২।৩০।৩২।

আশ্রমবিহিত কৰ্ম বুঝিলেও তদ্বারা শৌচাদি পঞ্চ “নিয়ম”ও পাওয়া যায়। কারণ, ঐ সমস্তও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের পক্ষে বিশিষ্ট ধর্মসাধন। ঈশ্বরের উপাসনাও আশ্রমবিহিত কৰ্ম এবং উহা সৰ্ব্বাশ্রমীরই কর্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মের উপদেশ করিয়া বলা হইয়াছে, “সৰ্ব্বেষাং মহুপাসনং” (১১শ স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৪২শ শ্লোক)। অর্থাৎ ভগবদুপাসনা সৰ্ব্বাশ্রমীরই কর্তব্য। পরন্তু দ্বিজাতিগণের নিত্যকর্তব্য যে গায়ত্রীর উপাসনা, তাহাও পরমেশ্বরেরই উপাসনা এবং নিত্যকর্তব্য। প্রণব জপ ও উহার অর্থভাবনাও পরমেশ্বরেরই উপাসনা। সুতরাং আশ্রমবিহিত কৰ্মরূপ “নিয়মে”র মধ্যে ঈশ্বরোপাসনাও নিত্যকৰ্ম বলিয়া বিধিবোধিত হওয়ায় মুমুক্শু উহার দ্বারাও আত্মসংস্কার করিবেন, ইহাও মহর্ষি গোতম এই সূত্র দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং মহর্ষি গোতমের মতে যে, মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও তাঁহার মতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। আর যে মহর্ষি “সমাধিবেশোভাসাৎ” এই (৩৮শ) সূত্রদ্বারা সমাধিবেশের অভ্যাসকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়াছেন, তিনি যে এই সূত্রে যোগাজ্ঞ “যম” ও “নিয়ম” দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য বদোন নাই, ইহাও বলা যায় না। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত যমনিয়মাদি অষ্টবিধ যোগাজ্ঞের অনুষ্ঠানজন্ত চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়’, ইহা বলিয়া ঐ অষ্টবিধ যোগাজ্ঞানুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্যতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং বিশেষ করিয়া “নিয়মে”র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধির সাধক বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও মুমুক্শুর সমাধিসিদ্ধির জন্ত ঈশ্বরপ্রণিধান যে সকলের পক্ষেই অত্যাৱশ্যক নহে, অত্র উপায়েও উহা হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

হৃতিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে “যম” ও “নিয়ম” শব্দের দ্বারা যোগদর্শনোক্ত যোগাজ্ঞ পঞ্চ যম ও পঞ্চ নিয়মকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগাজ্ঞ যম ও নিয়ম দ্বারা মুমুক্শুর আত্মসংস্কার অর্থাৎ অপবর্গলাভে যোগ্যতা জন্মে, ইহাই প্রথম মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা বলিয়াছেন। নচেৎ অপবর্গলাভে যোগ্যতাই জন্মে না। সুতরাং শৌচাদি পঞ্চ “নিয়মে”র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে মুমুক্শুর পক্ষে অত্যাৱশ্যক, ইহা স্বীকার্য। যোগদর্শনেও সাধনপাদের প্রারম্ভে “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”—এই প্রথম সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে। তাহার পরে যোগের অষ্টাঙ্গ বর্ণনায় দ্বিতীয় যোগাজ্ঞ নিয়মের মধ্যে (৩২শ সূত্রে) ঈশ্বরপ্রণিধানের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার পরে “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২১৪৫) এই সূত্রের দ্বারা নিয়মের অন্তর্গত ঐ ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল বলা হইয়াছে সমাধিসিদ্ধি। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব সাধনপাদে উক্ত তিন সূত্রেই ঈশ্বরে সৰ্ব্বকর্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সমাধিপাদে “ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২৩শ) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রণিধানাভুক্তি-বিশেষাদাবজ্জিত ঈশ্বরস্তমমুগ্ধাতি অভিধানমাত্রেণ।” টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা

করিয়াছেন যে, মানসিক, বাচিক অথবা কার্যিক ভক্তিবিশেষপ্রযুক্ত আবির্ভূত অর্থাৎ অতিমুখী-
কৃত হইয়া “এই যোগীর এই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক,” এইরূপ “অভিধান” অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের দ্বারাই
ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগ
বলিয়া, উহার উপায় বলিতে প্রথমে “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ,” (১।১২) এই সূত্রের দ্বারা
অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে উপায় বলা হইয়াছে। পরে “ঈশ্বরপ্রণিধানাং” এই সূত্রের দ্বারা কল্লাস্তরে
উহারই উপায়ান্তর বলা হইয়াছে। ঐ সূত্রে “বা” শব্দের অর্থ বিকল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার
ভোজরাজ ঐ সূত্রোক্ত উপায়কে সুগম উপায়ান্তর বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ সূত্রের দ্বারা অভ্যাসে
অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে মহর্ষি পতঞ্জলি সুগম উপায়ান্তরই
বলিয়াছেন, ইহা আমরা ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কারণ, তাহাতেও
প্রথমে যোগদর্শনের আশ্রয় “অভ্যাসেন চ কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে” (৬।৩৫) এই বাক্যের দ্বারা
অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে মনোনিগ্রহরূপ যোগের উপায় বলিয়া, পরে ভক্তিযোগ অধ্যায়ে “অভ্যাসেহপ্য-
সমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থমপি কস্মাণি কুর্স্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥” (১২।১০) এই
শ্লোকের দ্বারা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষকেই উপায় বলা হইয়াছে।
যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেবও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকানুসারেই “ঈশ্বরপ্রণিধানাং” এই
সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ভক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের পরেই “অথৈত-
দপ্যাশক্তোহসি কৰ্ত্ত্বুং মদযোগমাশ্রিতঃ। সৰ্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্বান্ ॥” (১২।১১) এই
শ্লোকে পূর্বোক্ত ঈশ্বরার্থ কর্মযোগে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে সৰ্বকর্মফলত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে।
সুতরাং পূর্বশ্লোকে যে, ঈশ্বরপ্রীতিরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঈশ্বরার্থ কর্মযোগের কৰ্ত্তব্যতাই
উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ঐরূপ কর্মযোগও ভক্তিযোগবিশেষ, উহার দ্বারা ঈশ্বর প্রীত
হইয়া সেই ভক্তের ‘অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। পূর্বোক্ত যোগভাষ্যসন্দর্ভের বাচস্পতি মিশ্রের
ব্যাখ্যার দ্বারাও ঐরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। কিন্তু যোগবর্ত্তিকে বিজ্ঞান ভিক্ষু পূর্বোক্ত “ঈশ্বর-
প্রণিধানাং” এই সূত্রোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধানকে ঈশ্বর বিষয়ে একাগ্রতারূপ ভাবনাবিশেষ বলিয়া-
ছেন। তিনি উহার পরবর্ত্তী “তজ্জপস্তদর্থভাবনং” (১।২৮) এই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া
বলিয়াছেন যে, প্রণববাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাবিশেষই যে, পূর্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা পরে ঐ সূত্রের;
দ্বারা কথিত হইয়াছে। তিনি ঐরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে প্রেমলক্ষণ ভক্তিবিশেষ বলিয়া, পরে ভাষ্যকার
ব্যাসদেবের “প্রণিধানাভক্তিবিশেষাৎ” এই উক্তির উপপাদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ভগবদ্-
গীতার “অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব,” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে প্রণিধান করিলে বিজ্ঞান
ভিক্ষুর ঐ ব্যাখ্যা অভিনব কল্পিত বলিয়াই মনে হয় এবং ভাষ্যকার ব্যাসদেব যোগদর্শনের সাধনপাদে
সর্বত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের একরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সমাধিপাদে পূর্বোক্ত “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা”
এই সূত্রের ভাষ্যে “প্রণিধানাভক্তিবিশেষাৎ” এইরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, তাহারও পূর্বোক্ত-
রূপ কারণ বুঝা যায়। পূর্বোক্ত ভগবদ্বাক্যানুসারেই যোগসূত্রের তাৎপর্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা
করিতে হইবে।

এখানে স্মরণ করা আবশ্যিক যে, যোগদর্শনে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে “যম” বলা হইয়াছে, এবং শৌচ, সন্তোষ, তপস্বী, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই পাঁচটিকে “নিয়ম” বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরে সর্বকর্ম্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা ভাষ্যকার ব্যাসদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগদর্শনে উহা ক্রিয়াযোগ বলিয়াও কথিত হইয়াছে এবং সমাধিসিদ্ধি উহার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সমাধিসিদ্ধির জন্ত যোগিমাাত্রেরই উহা নিতান্ত কর্তব্য। উহা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সমাধিসিদ্ধির উপায়ান্তররূপে কথিত হয় নাই। “সমাধিসিদ্ধি-রীশ্বরপ্রণিধানাৎ” এই শ্লোকে বিকল্পার্থ “বা” শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যিক। ভগবদ্গীতাতেও ভক্তিযোগের বর্ণনায়—“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং” ইত্যাদি শ্লোকের পরেই “যৎ করোসি যদান্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্বসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥”—(৯২৭) এই শ্লোকের দ্বারা পরমেশ্বরে সর্বকর্ম্মার্পণের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। মুমুক্শুমাাত্রেরই উহা কর্তব্য। কারণ, উহা ব্যতীত মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হয় না। সুতরাং যোগদর্শনোক্ত পূর্বোক্ত “নিয়মে”র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধান মুমুক্শু যোগীর পক্ষে বহিঃস্ব সাধন হইলেও উহাও যে অত্যাবশ্যিক, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও জীবের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, এবং মুমুক্শুর পক্ষে শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্ত্রানুসারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের কর্তব্যতা বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি গৌতম যে এই শ্লোকের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানেরও কর্তব্যতা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত “পূর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তৎপত্তিঃ” এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অগ্রাহ্য নহে। ঐ ব্যাখ্যানুসারে ঐ শ্লোকের দ্বারা পূর্বজন্মকৃত ঈশ্বরারাধনার ফলে যে সমাধি-বিশেষের উৎপত্তি হয়, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে পূর্বজন্মেও যে, ঈশ্বরের আরাধনা মুক্তিলাভে আবশ্যিক, ইহাও মহর্ষি গৌতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের মতে যে মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা বিচুতেই বলা যায় না। গৌতম মতে মুক্তিলাভে যে ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যিক, এ বিষয়ে পূর্বে (১৮—২৪ পৃষ্ঠায়) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি এই শ্লোকে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যোগশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য যে, অধ্যাত্মবিধি ও উপায়-সমূহ, তদ্বারাও মুমুক্শুর আত্ম-সংস্কার কর্তব্য। অর্থাৎ কেবল “যম” ও “নিয়মই” মুমুক্শুর সাধন নহে ; যোগশাস্ত্রে আরও অনেক সাধন কথিত হইয়াছে। উহা যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য। সুতরাং যোগশাস্ত্র হইতেই ঐ সমস্ত জানিয়া গুরুপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠানাদি করিয়া তদ্বারাও আত্মসংস্কার করিতে হইবে। শ্লোকে “যোগ” শব্দের দ্বারা যোগশাস্ত্রই লক্ষিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রভৃতিও এখানে “যোগ” শব্দের দ্বারা যোগশাস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” (২।১।৩) এই শ্লোকেও যোগশাস্ত্র অর্থেই “যোগ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সূচিরকাল হইতেই এই যোগশাস্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই যোগের পুরাতন বক্তা। উপনিষদেও যোগের উল্লেখ আছে^১। তদনুসারে স্মৃতিপুরাণাদি নানা শাস্ত্রে

১। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৭। ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শরীরং।—শ্বেতাশ্বতর, ২।৮।

তৎযোগমিতি মন্তুস্তে হিরান্মিত্তিষ্মদারণ্যং।—কঠ, ২।৩।১১। বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ বৃৎস্ব।—কঠ, ২।৩।১৮।

যোগের বর্ণন ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য নিজসংহিতায় যোগের অনেক উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পরে মহর্ষি পতঞ্জলি সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া যোগদর্শনের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গোতম এই সূত্রে “যোগ” শব্দের দ্বারা সুপ্রাচীন যোগশাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়া, উহা হইতে অধ্যাত্মবিধি ও অত্যাগ্ৰ উপায় পরিজ্ঞাত হইয়া তদ্বারাও যুগ্মকুর আত্মসংস্কার কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে “অধ্যাত্মবিধি” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—আত্মসাক্ষাৎকারের বিধায়ক “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বিধিবাক্য। এবং “যোগাৎ” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ বলিয়াছেন প্রতিপাদ্যত্ব। কিন্তু উক্ত বিধিবাক্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। যোগের উপায়সমূহ অবশ্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যোগশাস্ত্র হইতে “অধ্যাত্মবিধি” জানিতে হইবে। সেই অধ্যাত্ম-বিধি বলিতে তপস্তা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা। এই সমস্ত যোগশাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত “তপস্তা” পাপক্ষয় সম্পাদন করিয়া চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে এবং তপোবিশেষের ফলে অগ্নিাদি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি জন্মে (যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৪৫শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ সমস্ত সিদ্ধি সমাধিতে উপসর্গ বলিয়া কথিত হইলেও সময়বিশেষে উহা বিঘ্ন নিরাকরণ করিয়া সমাধিলাভের সাহায্যও করে। এইরূপ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ধারণা ও ধ্যান সমাধিলাভে নিতান্ত আবশ্যক। তন্মধ্যে “ধারণা”ও ধ্যানের সমষ্টির অন্তরঙ্গ সাধন। প্রাণবায়ুর সংবনবিশেষই “প্রাণায়াম”। ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম “প্রত্যাহার”। কোন একই স্থানে চিত্তের বন্ধন বা ধারণাই “ধাবণা”। ঐ ধারণাই ধারাবাহিক অর্থাৎ বিরামশূন্য বা জ্ঞানান্তরের সহিত অসংস্রষ্ট হইলে তখন উহাকে “ধ্যান” বলে। ঐ ধ্যানই পরিপক্ব হইয়া শেষে ধোয়াকারে পরিণত হয়। তখন চিত্তবৃত্তি থাকিলেও না থাকার মত ভাসমান হয়। সেই অবস্থাই সমাধি^১। উহা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত নামে দ্বিবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধোয়বিষয়ক চিত্তবৃত্তিও নিকৃদ্ধ হয়। উহারই অপর নাম নির্বিকল্পক সমাধি; উহাই চরম সমাধি। পূর্বোক্ত প্রাণায়ামাদি সমস্তই যোগশাস্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য এবং সঙ্গুর নিকটে শিক্ষণীয়। উহা লিখিয়া বুঝান যায় না এবং কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাও বুঝা যায় না ও অভ্যাস করা যায় না। নিজের অধিকার বিচার ও শাস্ত্রবিহিত সদাচার ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে উহার অভ্যাস করিতে যাওয়া ব্যর্থ, পরন্তু বিপজ্জনক। মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিলেই সকলেই যোগী হইতে পারে না। কাহাকেও সামান্য অর্থ দিয়াও যোগী হওয়া যায় না। যোগী হইতে অনেক জন্মের বহু সাধন আবশ্যক। অনেক জন্মের বহু সাধনা ব্যতীত কেহই সিদ্ধ হইতে পারেন না। এ পর্য্যন্ত এক জন্মের সাধনায় কেহই সিদ্ধ হন নাই, ইহা অতিনিশ্চিত। শ্রীঃগবান্ নিজেও বলিয়া গিয়াছেন,—“অনেক-

১. তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্ত থরূপানুকূল ইবেল্লিমাণাং প্রত্যাহারঃ ॥—যোগদর্শন, সাধনপাদ—৪২।৫৪॥

দেশবদ্ধ-চিত্তস্ত ধারণা ॥ তত্র, প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানং ॥

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥—বিভূতিপাদ—১।২।৩

জন্মসংসিদ্ধন্ততো যাতি পরাং গতিং ॥”—(গীতা, ৬।৪৫)। পরে আবারও বলিয়াছেন,—“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।” ৭।১৫।

পূর্বোক্ত “দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সংকল্পকৃতাঃ” এই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই প্রথম কর্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে এখানে পরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ে তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস রাগদ্বেষ ক্ষয়ার্থ, ইহা বলিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তিও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ সমাধি লাভের গুরু অন্তরায়। সুতরাং উহার ক্ষয় ব্যতীত সমাধি লাভ ও মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হয় না। সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্তির জন্ত প্রথমে তদ্বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস করিবে এবং সুকর বলিয়াও উহাই প্রথম কর্তব্য। ভাষ্যকার সর্বশেষে সূত্রোক্ত “উপায়ে”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,— “উপায়স্ত যোগাচারবিধানমিতি।” তাৎপর্যাটীকাকার ঐ “যোগাচার” শব্দের দ্বারা যতিধর্মোক্ত একাকিতা, আহারবিশেষ এবং একত্র অনবস্থান প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ঐ সমস্তও ক্রমশঃ তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তি নির্বাহ করিয়া অপবর্গের সাধন হয়, ইহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগীর একাকিতা এবং আহার-বিশেষ ও নিয়ত বাসস্থানের অভাব প্রভৃতিও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায় বা সাধন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বর্ণনায় “একাকৌ যতচিত্তান্মা” ইত্যাদি (১০ম) এবং “নাত্যন্ত্রতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্চতঃ” (১৬শ) ইত্যাদি এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে “বিবিক্ত-সেবী লঘুশী” ইত্যাদি বচনের দ্বারা ঐ সমস্ত সাধনও উপদিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি-যোগের বর্ণনায় ১৯শ শ্লোকে ভক্তিযোগীকেও বলা হইয়াছে,—“অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ”। তত্ত্ব সাধক বা যোগীর নিয়ত কোন একই স্থানে বাসও তাঁহার সাধনার অনেক অন্তরায় জন্মায়। তাহাতে চিত্তের একাগ্রতার ব্যাঘাত হয়। তাই মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্তনও আবশ্যক। তাহা হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্ভব হওয়ায় “স্থিরমতি” হওয়া যায়। অনিকেতত্ব অর্থাৎ নিয়তবাসস্থানশূন্যতা স্থৈর্য্যের সহায় হয় বলিয়াই উক্ত শ্লোকে “অনিকেত” বলিয়া, পরেই “স্থিরমতি” বলা হইয়াছে। ঋষিগণও এ জন্ত নানা সময়ে নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সাধনা করিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। নিয়ত কোন এক স্থানে বাস না করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মমধ্যেও কথিত হইয়াছে। ফলকথা, তাৎপর্যাটীকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোগাচার” শব্দের দ্বারা যতিধর্ম্মোক্ত পূর্বোক্ত একাকিত্ব প্রভৃতিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার “যোগাচার” শব্দের পরে “বিধান” শব্দের প্রয়োগ করায় যোগাভ্যাসকালে যোগীর কর্তব্য সমস্ত আচারের অন্তর্ধানই উহার দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। সে বাহা হউক, মহর্ষি যে, সূত্রশেষে “উপায়” শব্দের দ্বারা যোগীর আশ্রয়ণীয় যোগশাস্ত্রোক্ত অত্রান্ত সমস্ত সাধনই গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৪৬।

সূত্র । জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ ॥

॥৪৭॥৪৫৭॥

অনুবাদ । সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত “জ্ঞান” অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন আত্ম-
বিদ্যারূপ এই শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং সেই বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত
“সংবাদ” কর্তব্য ।

ভাষ্য । “তদর্থ”মিতি প্রকৃতং । জায়তেহেনেনিতি “জ্ঞান”-
মাত্মবিদ্যাশাস্ত্রং । তস্য গ্রহণমধ্যয়নধারণে । অভ্যাসঃ সততক্রিয়া-
ধ্যয়নশ্রবণ-চিন্তনানি । “তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদ” ইতি প্রজ্ঞাপরি-
পাকার্থং । পরিপাকস্তু সংশয়চ্ছেদনমবিজ্ঞাতার্থবোধোহধ্যবসিতাভ্যনুজ্ঞান-
মিতি । সময়াবাদঃ সংবাদঃ ।

অনুবাদ । “তদর্থ” এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে এই সূত্রে ঐ
পদটির অনুবৃ্ত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত । “ইহার দ্বারা জানা যায়” এই অর্থে “জ্ঞান”
বলিতে আত্মবিদ্যারূপ শাস্ত্র অর্থাৎ মহর্ষি গোতমের প্রকাশিত এই “আত্মস্বীকৃতি”
শাস্ত্র । তাহার “গ্রহণ” অধ্যয়ন ও ধারণা । “অভ্যাস” বলিতে সতত ক্রিয়া—
অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তন । এবং “তদ্বিদ্য”দিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য—ইহা প্রজ্ঞা
অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে । “পরিপাক” কিন্তু সংশয়-
চ্ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান, এবং “অধ্যবসিত” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত
তত্ত্বের (তর্কের দ্বারা) অভ্যনুজ্ঞান । সমীপে অর্থাৎ “তদ্বিদ্য”দিগের নিকটে যাইয়া
“বাদ” সংবাদ ।

টিপ্পনী । অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারাই তত্ত্বসাক্ষাৎকার
করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আর এই ত্রায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? মহর্ষি এত-
দূতরে শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্ত এই ত্রায়শাস্ত্রের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং
“তদ্বিদ্য”দিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য । পূর্বসূত্র হইতে “তদর্থ” এই পদের অনুবৃ্ত্তি মহর্ষির অভি-
প্রেত । ভাষ্যকার প্রথমে উহা বলিয়া, পরে স্বত্বার্থ ব্যাখ্যা করিতে সূত্রোক্ত “জ্ঞান” শব্দের অর্থ
বলিয়াছেন, আত্মবিদ্যারূপ শাস্ত্র । যদ্বারা তত্ত্ব জানা যায়, এই অর্থে জ্ঞাতার উক্তর করণবাচ্য
“অনট্” প্রত্যয়নিপ্পন্ন “জ্ঞান” শব্দের দ্বারা শাস্ত্রও বুঝা যায় । তাহা হইলে মহর্ষি এই সূত্রে “জ্ঞান”
শব্দের দ্বারা তাঁহার প্রকাশিত এই ত্রায়বিদ্যা বা ত্রায়শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায় । এই
ত্রায়বিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা, ভগবান্ মনুও উহাকে আত্মবিদ্যা

বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৯—৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐ আত্মবিদ্যারূপ ত্ৰায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণাকে ভাষ্যকার উহার “গ্রহণ” বলিয়াছেন। এবং উহার সতত ক্রিয়াকে উহার “অভ্যাস” বলিয়াছেন। পরে ঐ সমস্ত ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তন। অর্থাৎ ঐ আত্মবিদ্যারূপ ত্ৰায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্যাস বলিতে সতত অধ্যয়ন এবং সতত শ্রবণ ও চিন্তন। অপবর্গনাভের জ্ঞাত উহা কর্তব্য। সুতরাং মুমুক্শুর পক্ষে এই ত্ৰায়শাস্ত্রও আবশ্যক, ইহা ব্যর্থ নহে। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যোগশাস্ত্রানুসারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা ই তত্ত্বসাক্ষাৎকার কর্তব্য ইহিলেও তৎপূর্বে শাস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বের শ্রবণ করিয়া, যুক্তির দ্বারা উহার মনন কর্তব্য, ইহা “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিই উপদেশ করিয়াছেন। নচেৎ প্রথমেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। শ্রুতিও তাহা বলেন নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে শ্রবণের পাবে যে মনন মুমুক্শুর অবশ্য কর্তব্য, তাহার জ্ঞাত এই ত্ৰায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্যাস অবশ্য কর্তব্য। কারণ, এই ত্ৰায়শাস্ত্রে ঐ মননের সাধন বহু যুক্তি বা অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্বারা মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এবং পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত যুক্তির অনুশীলন করিলে ঐ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক হয়। অতএব উহার জ্ঞাত প্রথমে মুমুক্শুর এই ত্ৰায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ ও চিন্তন সতত কর্তব্য। মহর্ষি পরে আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা “তদ্বিদ্যা” অর্থাৎ এই ত্ৰায়বিদ্যাবিজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষ, তাঁহাদিগের সহিত সংবাদও কর্তব্য। সুতরাং তজ্জ্ঞাতও এই ত্ৰায়বিদ্যা আবশ্যক, ইহা ব্যর্থ নহে। “তদ্বিদ্যা”দিগের সহিত সংবাদের প্রয়োজন বা ফল কি? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উহা “প্রজ্ঞাপরিপাকার্হ”। “প্রজ্ঞা” অর্থাৎ মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকের জ্ঞাত উহা কর্তব্য। পরে ঐ “পরিপাক” বলিয়াছেন,—সংশয় ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের বোধ, এবং প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত পদার্থের তর্কের দ্বারা অভ্যন্তজ্ঞা। অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য পদার্থ, ইহা যুক্তির দ্বারা মনন করিলেও আবার কোন কারণে ঐ বিষয়ে সংশয় জন্মিলে তখন ত্ৰায়শাস্ত্রজ্ঞ গুরু প্রভৃতির নিকটে যাইয়া “বাদ” বিচার করিলে ঐ সংশয় নিবৃত্তি হয়। যাহা অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে বুঝা হয় নাই, সামান্য জ্ঞান জন্মিলেও যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে নাই, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। এবং যাহা “অধ্যবসিত” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঐ প্রমাণের সহকারী তর্ক-বিশেষ দ্বারা ঐ প্রমাণকে সবল বুঝিলে ঐ নিশ্চয় দৃঢ় হয়। তর্ক, সংশয়বিষয় পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটীর নিষেধের দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করে, ইহা ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, পূর্বোক্ত তদ্বিদ্যা-দিগের সহিত সংবাদ করিলে যে, পূর্বোক্ত সংশয় নিবৃত্তি প্রভৃতি হয়, উহাই প্রজ্ঞার পরিপাক। তাই ঐ সমস্ত হইলে তখন সেই মননরূপ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান পরিপক হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে। সুত্ৰোক্ত “সংবাদ” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“সময়াবাদঃ সংবাদঃ।” অনেক পুস্তকেই “সমায় বাদঃ সংবাদঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ঐ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না। “সময়াবাদঃ সংবাদঃ”—এই পাঠও কোন পুস্তকে দেখা যায় এবং

প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। “সময়া” শব্দ সমীপার্থক অব্যয়। “সময়া” অর্থাৎ নিকটে যাইয়া যে “বাদ,” তাহাই এই সূত্রোক্ত “সংবাদ”—ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ সূত্রোক্ত “সংবাদ” শব্দের অন্তর্গত “সং” শব্দের অর্থ এখানে সমীপ। সমীপে যাইয়া বাদই “সংবাদ”। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জগ্গই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সময়াবাদঃ সংবাদঃ।” পরবর্তী সূত্রের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায় ॥৪৭॥

ভাষ্য। “তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদ” ইত্যবিভক্তার্থং বচনং বিভজ্যতে—

অনুবাদ। “এবং তদ্বিদ্যাদিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য” এই অবিভক্তার্থ বাক্য বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ পরবর্তী সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত ঐ অস্ফুটার্থ বাক্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

সূত্র। তং শিষ্য-গুরু-সত্রঙ্গচারি-বিশিষ্টশ্রেয়ো-
হর্থিভিরনস্মৃতিভিরভ্যুপেয়াৎ ॥৪৮॥৪৫৮॥

অনুবাদ। অসূয়াশূন্য শিষ্য, গুরু, সত্রঙ্গচারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ী এবং বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্বোক্ত শিষ্যাদি ভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ শ্রেয়োর্থীদিগের সহিত অর্থাৎ মুক্তিরূপ শ্রেয়ঃপদার্থে শ্রদ্ধাবান্ বা মুমুক্শু পূর্বোক্ত শিষ্যাদির সহিত সেই “সংবাদ” অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে। [অর্থাৎ অসূয়াশূন্য পূর্বোক্ত শিষ্যাদির সহিত “বাদ” বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবে।]

ভাষ্য। এতন্নিগদেনৈব নীতার্থমিতি।

অনুবাদ। “নিগদ” অর্থাৎ সূত্রবাক্যদ্বারাই এই সূত্র “নীতার্থ” (অবগতার্থ)। অর্থাৎ সূত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থ বোধ হওয়ায় ইহার ব্যাখ্যা অনাশ্রক।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বসূত্রে শেষে বলিয়াছেন,—“তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ।” কিন্তু উহার অর্থ “বিভক্ত” (বিশেষরূপে ব্যক্ত) হয় নাই অর্থাৎ “তদ্বিদ্যা” কিরূপ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য, তাহা বলা হয় নাই এবং তাঁহাদিগের সহিত কোথায় কি ভাবে ঐ সংবাদ করিতে হইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। ফলকথা, পূর্বসূত্রে শেযোক্ত ঐ অংশের বিভাগ বা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যার জগ্গই মহর্ষি পরে এই সূত্রটী বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের উক্তরূপ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াই এই সূত্রের অবতরণা করিয়াছেন। কিন্তু পরে সূত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থবোধ হয়, ইহা বলিয়া উহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “মায়া-গন্ধর্ব-নগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদা” (৩২শ)

স্বত্রেও অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই; তবে সেখানে উহা কেন করেন নাই, তাহাও কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাহা বলা আবশ্যক। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার পরে আবশ্যক বোধে এখানে তাহা ঐ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ এখানে পরে তাঁহার “এতন্নিগদেনৈব নীতার্থমিতি”—এই কথা বলার প্রয়োজন কি? তিনি ত আর কোন স্বত্রে ঐরূপ কথা বলেন নাই। আমরা কিন্তু মন্দবুদ্ধিবশতঃ মহর্ষির এই স্ববাক্যকে একধারে স্পষ্টার্থ বলিয়া বুঝি না। উহার ক্রিয়াপদ ও কর্মপদের অর্থসংগতি স্বেবোধ বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

যাহা হউক, মূলকথা, মহর্ষি এই স্বত্রে দ্বারা অস্বাশু শিষ্য, গুরু, সহাধ্যায়ী এবং ঐ শিষ্যাদি ভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্ব বিশিষ্ট শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুক্তিবিশয়ে প্রক্কাবান্ বা মুক্তিকামী ব্যক্তিই তাঁহার পূর্বস্বত্রে কথিত “তদ্বিদ্যং”, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। এবং পূর্বস্বত্রে “সহ” শব্দ যোগে “তদ্বিদ্যং” এই তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করায় এই স্বত্রে উহারই বিশেষ্য প্রকাশ করিতেই এই স্বত্রেও তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। এবং “অনস্মৃতিঃ” এই পদের দ্বারা ঐ শিষ্যাদির বিশেষণ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শিষ্য প্রভৃতি অস্ম্যাবিশিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের সহিত সংবাদ করিতে যাইবে না। কারণ, তাহাতে উহাদিগের জিগীষা উপস্থিত হইলে নিজেরও জিগীষা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আর ঐ স্থলে “বাদ”বিচার হইবে না। কারণ, জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে বিচার হয়, তাহাকেই “বাদ” বলে। স্বত্রে “তং” শব্দের দ্বারা পূর্বস্বত্রে শেষোক্ত “সংবাদ”ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্বত্রোক্ত “অভ্যাপেয়াৎ” এই ক্রিয়াপদে লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তং তদ্বিদ্যং।” কিন্তু এই ব্যাখ্যায় স্বত্রোক্ত তৃতীয়ান্ত পদের অর্থসংগতি এবং “তং” এই স্থলে একবচন প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বুঝা যায় না। তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—“তদনেন গুরাদিভির্বাদং কৃত্বা তত্ত্বনির্ণয় উক্তঃ।” অর্থাৎ এই স্বত্রে দ্বারা শিষ্য, গুরু প্রভৃতির সহিত এবং গুরুও শিষ্য প্রভৃতির সহিত “বাদ”বিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিবেন, ইহাই উক্ত হইয়াছে। নিজের তত্ত্বনির্ণয় দৃঢ় করিবার জন্তও জিগীষাশূন্য হইয়া তদ্বিশয়ে “বাদ” বিচার করিবেন এবং অভিমানশূন্য হইয়া গুরুও শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং শিষ্যও সহাধ্যায়ী প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত “বাদ”বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবেন। তাই মহর্ষি, স্বত্রশেষে বলিয়াছেন,—“অভ্যাপেয়াৎ”। তাৎপর্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অভ্যাপেয়াদভিমুখমুপেত্য জানীয়াৎগুরাদিভিঃ সহৈত্যর্থঃ।” অর্থাৎ অভি-
মুখে উপস্থিত হইয়া গুরু প্রভৃতির সহিত পূর্বস্বত্রোক্ত “সংবাদ” জানিবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় গুরু প্রভৃতির সহিত “সংবাদ” করিবে, এই বিবক্ষিত অর্থ ব্যক্ত হয় না। স্বত্রে “তং (সংবাদং) অভ্যাপেয়াৎ” এইরূপ যোজনাই স্বত্রকারের অভিमत, ইহা পরবর্তী স্বত্রে ভাষ্যারম্ভে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ব্যক্ত আছে। আমরা দিগের মনে হয়, স্বত্রে “অভ্যাপেয়াৎ” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। গতার্থ ধাতুর প্রাপ্তি অর্গও প্রসিদ্ধ আছে। তাহা হইলে স্বত্রার্গ বুঝা যায় যে, অস্বাশু শিষ্যাদির অভিমুখে উপস্থিত

হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সেই “সংবাদ” (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ “বাদ”বিচার) প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উহা অবলম্বন করিবে । তাহা হইলে ঐরূপ শিষ্যাদির সহিত “বাদ” বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিবে, এই তাৎপর্যার্থই উহার দ্বারা প্রকটিত হয় । আরও মনে হয়, এই সূত্রে মহর্ষির “অভ্যুপেয়াৎ” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা তাঁহার পূর্বসূত্রোক্ত “সংবাদ” শব্দের অর্থ যে সমীপে উপস্থিত হইয়া “বাদ”, ইহাও বিভক্ত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি এই সূত্রে ঐরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন । তদনুসারেই ভাষ্যকার পূর্বসূত্র-ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন,—“সময়াবাদঃ সংবাদঃ ।” কেবল তত্ত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে জিগীবাশূচ্য হইয়া যে বিচার বা “কথা” হয়, তাহার নাম “বাদ” (প্রথম খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । গুরু, শিষ্যের সহিতও “বাদ” বিচার করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিবেন । শিষ্য নিকটে উপস্থিত না থাকিলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের অত্যাবশ্যকতাবশতঃ তিনিই সাগ্রহে শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইবেন । সাধনা ও উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মহিমান্বিত প্রকৃত গুরুর ঐরূপ নিরভিমানতা, সারল্য ও সদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া অব্যাহত থাকে । ঋষিগণ ও ভারতের প্রাচীন গুরুগণ নিজের শিষ্যকে তাঁহার সাধনা ও তত্ত্বনির্ণয়ের প্রধান সহায় মনে করিতেন । মহর্ষি গোতমও এই সূত্রে শিষ্যের ঐ প্রাধান্য সূচনা করিতে গুরুর পূর্বেই শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । সুধী পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন । ৪৮৥

ভাষ্য । যদি চ মন্যেত—পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরশ্চেতি ।

অনুবাদ । যদিও মনে কর, পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অপরের (পূর্বসূত্রোক্ত শিষ্য ও গুরু প্রভৃতির) প্রতিকূল অর্থাৎ তজ্জন্ম তাঁহাদিগের সহিত বাদবিচারও উচিত নহে, (এ জন্ম মহর্ষি পরবর্তী সূত্র বলিয়াছেন) ।

সূত্র । প্রতিপক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমর্থিত্বে ॥

॥৪৯॥৪৫৯॥

অনুবাদ । অথবা অর্থিত্ব (কামনা) অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে “প্রয়োজনার্থ” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নির্ণয়রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম প্রতিপক্ষহীন ভাবে অর্থাৎ নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া, সেই “সংবাদ” অভিমুখে উপস্থিত হইয়া প্রাপ্ত হইবে ।

ভাষ্য । “তমভ্যুপেয়া”দ্বিতী বর্ততে । পরতঃ প্রজ্ঞামুপাদিসমান-স্তত্ত্ব-বুভুৎসাপ্রকাশনেন স্বপক্ষমনবস্থাপয়ন্ স্বদর্শনং পরিশোধয়েদিতি । অন্যান্যপ্রত্যনীকানি চ প্রাবাহুকানাং দর্শনানি^১ ।

১ । যদিচ মন্যেত “পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকূলঃ পরশ্চেতি”—গুরুদেবগুরু বাদোৎপত্তি ইতি,—তত্রৈব সূত্র-মুপতিষ্ঠতে ।—তাৎপর্যটীকা ।

২ । গুরুদিকৃতাদ্বিচারাত্মক পূর্বপক্ষোচ্ছেদেন সিদ্ধস্তাব্যবস্থাপনলক্ষণাৎ স্বদর্শনং পরিশোধয়েৎ । “অন্যান্য-প্রত্যনীকানি চ প্রাবাহুকানাং দর্শনানি” অযুক্তপরিভাষ্যেণ যুক্তপরিগ্রহণেন চ পরিশোধয়েদিতি সম্বধ্যতে ।—তাৎপর্যটীকা ।

অনুবাদ। “তমভ্যুপেয়াৎ” ইহা বর্তমান আছে অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে ঐ পদদ্বয় অথবা “তং” ইত্যাদি সমস্ত সূত্রবাক্যেরই এই সূত্রে অনুবৃত্তি অভিপ্রেত। (তাৎপর্য্য) অপর (গুরুবাদি) হইতে “প্রজ্ঞা” (তত্ত্বজ্ঞান) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া—তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশের দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন। এবং “প্রাবাত্তুক”দিগের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিক-দিগের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহকে পরিশোধিত করিবেন।

টিপ্পনী। কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্বসূত্রে শিষ্যাদির সহিত যে, বাদবিচার কর্তব্য বলা হইয়াছে, তাহাও মুমুক্শুর পক্ষে উচিত নহে। কারণ, বাদবিচারেও পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ আবশ্যক। অর্থাৎ একজন বাদী হইয়া নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন; অপরে প্রতিবাদী হইয়া উহার খণ্ডন করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিবেন। বাদীর যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ। প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। সুতরাং ঐ পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ উভয়ের পক্ষেই প্রতিকূল। সুতরাং উহা করিতে গেলে উভয়েরই রাগদ্বেষাদি উপস্থিত হইতে পারে। অনেক সময়ে তাহা হইয়াও থাকে। বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষাশূন্য হইয়া বিচারের আরম্ভ করিলেও পরে জিগীষার প্রভাবে জল্প ও বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা অনেক স্থলে দেখা যায়। অতএব যিনি মুমুক্শু, তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বিচারই করিবেন না। মহর্ষি এ জন্ম পরে আবার এই সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যে প্রথমে “যদিদং মত্রেত” এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে “যদি চ” ইত্যাদি ভাষ্যপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত পাঠ বুঝা যায়। ভাষ্যকার “যদি” শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও যাহাদিগের রাগদ্বেষমূলক জিগীষা উপস্থিত হয়, তাহারা ত মুমুক্শুই নহে, তাহারা বাদবিচারে অধিকারীও নহে। কিন্তু যাহারা শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুমুক্শু, যাহারা বহুসাপনসম্পন্ন, সুতরাং অসূয়া-শূন্য, তাহারা তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তাঁহাদিগের রাগদ্বেষমূলক জিগীষা জন্মে না। পূর্বসূত্রে ঐরূপ ব্যক্তির সহিতই বাদবিচার কর্তব্য বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ, উহা অপরের প্রতিকূল হইতেই পারে না। তবে যদি কেহ কোন স্থলে ঐরূপ আশঙ্কা করেন, তজ্জন্মই মহর্ষি পক্ষান্তরে এই সূত্রের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন যে, অথবা প্রতিপক্ষহীন ধরূপে হয়, সেইরূপে অর্থাৎ অপরের প্রতিপক্ষ যে নিজের পক্ষ, তাহার সংস্থাপন না করিয়াই অভিমুখে যাইয়া সেই “সংবাদ” প্রাপ্ত হইবে। পূর্বসূত্র হইতে “তং অভ্যুপেয়াৎ” এই বাক্যের অনুবৃত্তি এই সূত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত। সূত্রে “প্রতিপক্ষহীনং” এই পদটী ক্রিয়ার বিশেষণ-পদ। “প্রতিপক্ষহীনং যথা স্ত্রীতথা তমভ্যুপেয়াৎ” এইরূপ ব্যাখ্যাই মহর্ষির অভিমত। সূত্রে “অপি বা” এই শব্দটী পক্ষান্তরদ্যোতক। পক্ষান্তর সূচনা করিতেও ঋষিবাক্যে অন্তর্ভুক্ত

“অপি বা” এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে “বা” শব্দকে নিশ্চয়্যার্থক বলিয়াছেন। কিন্তু “অপি” শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রোক্ত উপদেশের তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, মুমুক্শু পূর্ব-সূত্রোক্ত গুরুপ্রভৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশপূর্বক নিজের পক্ষস্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহও পরিশোধিত করিবেন। তাৎপর্য-টীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুমুক্শু গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া ‘আমি শরীরাদি পদার্থ হইতে আত্মার ভেদ বুঝিতে ইচ্ছা করি’ ইহা বলিয়া নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু নিজের কোন পক্ষ স্থাপন করিবেন না। তখন ঐ গুরু প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে পূর্বপক্ষ প্রকাশ ও উহার খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন পর্যন্ত যে বিচার করিবেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, উহার দ্বারা নিজের দর্শন অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে পূর্বজাত জ্ঞান-বিশেষকে পরিশোধিত করিবেন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ যে সমস্ত দর্শন আছে, তাহাও তন্মধ্যে অযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া ও যুক্ত গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত করিবেন। অর্থাৎ কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক অপরের বিচার শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাস্ত তত্ত্ব বুঝিয়া লইলে সেখানে অপরের প্রতিকূল কিছুই না থাকায় জিগীষার কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে না। যদিও গুরু প্রভৃতিরূপত সেই বিচার সেখানে “বাদ” হইতে পারে না। কারণ, উভয় পক্ষের সংস্থাপন না হইলে “বাদ” হয় না। তথাপি সেই বিচারেও কাহারও জিগীষা না না থাকায় এবং বাদের ত্রায় উহাও তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদন করায় উহা বাদকার্য্যকারী বলিয়া বাদতুল্য। তাই উহাকেও গোণ অর্থে পূর্বসূত্রোক্ত “সংবাদ” বলা হইয়াছে।

ভাষ্যে স্বদর্শন শব্দের দ্বারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পূর্বজাত জ্ঞানবিশেষই বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাঁহার পূর্বজাত জ্ঞান কোন অংশে ভ্রম হইলে তাহা বুঝিয়া, পরজাত জ্ঞানে যে যথার্থতা বোধ হয়, তাহাই ঐ জ্ঞানের পরিশোধন। গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে পুনর্বার জ্ঞাত তত্ত্ব বিষয়ে বিচার শ্রবণ করিলে নিজের সেই জ্ঞানের পরিশোধন হয় এবং উহা সূদৃঢ় তত্ত্বনির্ণয় উপপন্ন করে। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের যে সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শন, তন্মধ্যে যাহা অযুক্ত, তাহার ত্যাগ ও যাহা যুক্ত, তাহার গ্রহণই উহার পরিশোধন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত “দর্শন” শব্দ মতবিশেষ বা সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। “দর্শন” শব্দ যে, জ্ঞানবিশেষের ত্রায় দার্শনিক মত-বিশেষ এবং সেই মতপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরস্পর বিরুদ্ধ দার্শনিক মতগুলি “প্রবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে, এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি (তৃতীয় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যোগদর্শনভাষ্যেও সাংখ্য ও যোগাদিকে “প্রবাদ” বলা

হইয়াছে। যাহারা কোনও মতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া পরমত খণ্ডনপূর্বক সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা “প্রাবাহক” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের “দর্শন” অর্থাৎ মতসমূহের মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ মুমুকুর নিজের অধিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই সমস্ত মতেরও পরিশোধন করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। তাই ভাষ্যকার বিশেষণপদ বলিয়াছেন—“অত্রোত্তপ্রত্যনীকানি।” উহার ব্যাখ্যা “পরস্পর-বিরুদ্ধানি” ॥৪২॥

তত্ত্বজ্ঞানবিসৃদ্ধি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৫॥

ভাষ্য। স্বপক্ষরাগেণ চৈকে ন্যায়মতিবর্তন্তে, তত্র—

অনুবাদ। কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া বর্তমান হন, অর্থাৎ তাঁহারা ন্যায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীয় বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপস্থিত হন, সেই স্থলে—

সূত্র। তত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্প-বিতণ্ডে,
বীজ-প্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ ॥৫০॥৪৩০॥

অনুবাদ। বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরের সংরক্ষণের নিমিত্ত কণ্টক-শাখার দ্বারা আবরণের ন্যায় তত্ত্ব-নিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য।

ভাষ্য। অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানানামপ্রহীণদোষাণাং তদর্থং ঘটমানানা-
মেতদিত্তি।

অনুবাদ। “অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান” অর্থাৎ যাহাদিগের মননাদির দ্বারা সুদৃঢ় তত্ত্বনিশ্চয় জন্মে নাই এবং “অপ্রহীণদোষ” অর্থাৎ যাহাদিগের রাগদ্বेषাদি দোষ প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত “ঘটমান” অর্থাৎ সেই তত্ত্বনিশ্চয়াদির জন্য যাহারা প্রযত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সূত্র কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য পূর্বোক্ত শিষ্য প্রভৃতির সহিত “বাদ”-বিচার কর্তব্য হইলেও “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র প্রয়োজন কি? মহর্ষি প্রথম সূত্রে “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র তত্ত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেয়সলাভের প্রযোজক কিরূপে বলিয়াছেন? মোক্ষসাধন তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য উহার ত কোন আবশ্যকতাই বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি পরে আবার এই প্রকরণ আরম্ভ করিয়া প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তত্ত্বনিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য। তাই শেষোক্ত এই প্রকরণ “তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ” নামে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার

মহর্ষির এই সূত্রোক্ত উপদেশের মূল কারণ ব্যক্ত করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ অর্থাৎ যে কোনরূপে নিজপক্ষ সমর্থনোদ্দেশ্যে ত্রায়কে অতিক্রম করিয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার নাস্তিক্যবশতঃ ত্রায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীয় মতের সমর্থন করিয়া আস্তিকের তত্ত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। সেই স্থলেই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তত্ত্ব-নিশ্চয় সংরক্ষণার্থ জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য বলিয়াছেন। মহর্ষি শেষে ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরের সংরক্ষণের জন্ত কণ্টক-শাখার দ্বারা আবরণ করে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তখন গো মহিষাদি পশুগণ উহা বিনষ্ট করিতে পারে এবং অনেক সময়ে তাহা করিয়া থাকে। এ জন্ত ঐ সময়ে উহার রক্ষাভিলাষী ব্যক্তি কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা উহার আবরণ করিয়া থাকে। তাহা করিলে তখন গোমহিষাদি পশু উহা বিনষ্ট করিতে যায় না। বিনষ্ট করিতে গেলেও সেই শাখাস্থ কণ্টকের দ্বারা আহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুতরাং ঐ অঙ্কুরের সংরক্ষণ হয়। ক্রমে উহা হইতে ধাত্বাদি বৃক্ষের সৃষ্টি হয় এবং উহা পরিপক্ব হইয়া স্নদৃঢ় হয়। অতএব ঐ কণ্টকশাখা অগ্রাহ্য হইলেও যেমন অঙ্কুরের রক্ষার্থ কোন স্থলে উহাও গ্রাহ্য এবং নিতাস্ত আবশ্যক, তদ্রূপ জল্প ও বিতণ্ডা অতএব অগ্রাহ্য হইলেও তদাস্ত নাস্তিকগণ হইতে অঙ্কুরসদৃশ তত্ত্বনিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থলে কণ্টক-শাখার সদৃশ জল্প ও বিতণ্ডা গ্রাহ্য ও নিতাস্ত আবশ্যক। উহা গ্রহণ করিলে নাস্তিকগণ পরাজয়-ভয়ে আর নিজপক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রবৃত্ত হইলেও নানা নিগ্রহরূপ কণ্টকের দ্বারা ব্যথিত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে। সুতরাং আর নাস্তিক-সংসর্গের সম্ভাবনা না থাকায় শাস্ত্র হইতে শ্রুত তত্ত্বের মননের কোন বাধা হইবে না, সেই মননরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রামাণ্যশঙ্কাও জন্মিবে না। সুতরাং ক্রমে উহা পরিপক্ব হইবে। পরে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা সেই শ্রুত ও যুক্তির দ্বারা মত অর্থাৎ যথার্থরূপে অনুমত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ হইবে। ফলকথা, মুমুক্শু ব্যক্তি সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বারা তাঁহার শ্রুত ও মত তত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার করিবেন। কারণ, শ্রুতিতে শ্রবণ ও মননের পরে নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয় সেই তত্ত্বেরই প্রথমে শ্রবণ ও মনন আবশ্যক। কিন্তু প্রথমে শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মনন আরম্ভ করিলে বা তৎপূর্বেই যদি নাস্তিকগণ কৃতর্কদ্বারা বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থনপূর্বক তাঁহার সেই অঙ্কুরসদৃশ শ্রবণরূপ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ সেই জ্ঞানের ভ্রমস্থ শঙ্কা উৎপন্ন করে, তাহা হইলে তাঁহার আর তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আশাই থাকে না। কারণ, “সংশয়াত্মা বিনশ্চতি”। সুতরাং তখন তাঁহার সেই শ্রবণরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিত্ত নাস্তিকের সহিত জল্প ও বিতণ্ডাও কর্তব্য। পূর্বোৎপন্ন তত্ত্বনিশ্চয়ে ভ্রমতত্ত্বনিশ্চয় বা সংশয়ের অনুৎপত্তিই তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণ। মহর্ষি-সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তে প্রণিধান করিলে তাঁহার পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যই আমরা বুঝিতে পারি।

কিন্তু ভাষ্যকার পরে “অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানানাং” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাহা-

দিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই এবং রাগদ্বेषাদি দোষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় নাই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাদির জ্ঞাত প্রযত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই এই সূত্র কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তিগণই প্রয়োজন হইলে স্থলবিশেষে জল্প ও বিতণ্ডা করিবেন, ইহাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগের কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, যাহারা শাস্ত্র হইতেও তত্ত্ব শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদিগের তত্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণ কিরূপে বলা যায়, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। অবশ্য ভাবী অনুরের সংরক্ষণের জ্ঞায় ভাবী তত্ত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণও বলা যাইতে পারে। এবং ভাবী তত্ত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিই উহার সংরক্ষণ বলা যায়। কিন্তু তজ্জ্ঞান যিনি জল্প ও বিতণ্ডা করিতে সমর্থ, যাহাকে মহর্ষি উহা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব শ্রবণও করেন নাই, তিনি একেবারে অশাস্ত্রজ্ঞ, ইহা ত কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব এখানে “অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা যাহাদিগের কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, এইরূপ অর্থই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু যাহারা শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, পরে এই শ্রায়শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্বক তদনুসারে মননের আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সেই মনন ও “তদ্বিদ্যা”দিগের সহিত সংবাদ সম্পন্ন হয় নাই, তাঁহাদিগকেই ঐ অবস্থায় ভাষ্যকার “অনুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান” বলিয়াছেন বুঝা যায়। অর্থাৎ ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির এই শ্রায়শাস্ত্রনাথ্য সম্পূর্ণ মননরূপ তত্ত্বজ্ঞানকেই “তত্ত্ব-জ্ঞান” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যক্তিগণের ঐ সময়ে রাগদ্বেষাদি দোষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের জল্প ও বিতণ্ডায় প্রবৃত্তি হইতে পারে। এবং তাঁহাদিগের শ্রায়শাস্ত্রের অধ্যয়নাদি-জ্ঞাত জল্প ও বিতণ্ডার তত্ত্বজ্ঞান ও তদ্বিদ্যায় দক্ষতাও জন্মিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা স্থলবিশেষে জল্প ও বিতণ্ডা করিয়া তত্ত্বনিশ্চয় রক্ষা করিতে পারেন ও করিবেন। কিন্তু যাহারা মননরূপ সাধনা সমাপ্ত করিয়া নিদিধ্যাসনের সুদৃঢ় অভয় আসনে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের জল্প ও বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদিগের উহাতে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাঁহারা ক্রমে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকারলাভে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা নির্জ্ঞান স্থানেই সাধনায় নিরত থাকেন। তাঁহারা কোন নাস্তিক-সংসর্গ করেন না। তাঁহাদিগের জন-সংসর্গও রতি নাই—“অরতির্জ্ঞান-সংসদি।” (গীতা)। সুতরাং মহর্ষি তাঁহাদিগের জ্ঞাত এই সূত্র বলেন নাই। কিন্তু প্রথমে তাঁহাদিগেরও সময়ে “বাদ”ও অত্যাশঙ্ক্য হইলে “জল্প” ও “বিতণ্ডা” এই “কথা”ত্রয় কর্তব্য। পূর্বোক্ত কথাত্রয়-ব্যবস্থা যে আগমসিদ্ধ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সহিত জল্প ও বিতণ্ডার নিষেধ থাকিলেও অশিষ্ট নাস্তিকদিগের দর্পভঙ্গের জ্ঞাত কদাচিৎ উহাও যে কর্তব্য, ইহা আচার্য্য রামানুজের মতানুসারে শ্রীবেষ্ণব বেক্টনাথও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন^১ ॥৫০॥

১। আগমসিদ্ধা চেয়ং কথাত্রয়ব্যবস্থা। “বাদজল্পবিতণ্ডাভি”রিত্যাদিবাচনাৎ। ভগবদ্গীতাভাষোহপি “বাদঃ প্রবদতামহ”মিত্যত্র জল্পবিতণ্ডাদি কুর্কৃতাং তত্ত্বনির্ণয়ায় প্রবৃত্তো বাদো যঃ সোহহমিতি ব্যাখ্যানাৎ কথাত্রয়ং দর্শিতং। এতেন “বিপ্রং নির্জ্ঞাত বাদতঃ,” “ন বিগৃহ্য কথাং কুর্থা”দিত্যাদিভির্জ্ঞানবিতণ্ডায়োনিষেধোহপি শিষ্টবিষয় ইতি দর্শিতং। কদাচিদ্বাহুকুদৃষ্টদর্পভঙ্গায় তয়োরাপি কার্য্যত্বাৎ।—“শ্রায়পরিণুক্তি”, দ্বিতীয় আঙ্কিক, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

ভাষ্য । বিদ্যানির্বেদাদিভিশ্চ পরেণাবজ্ঞায়মানস্ত—

অমুবাদ । এবং বিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা-বিষয়ে নির্বেদপ্রভৃতিবশতঃ অপর কর্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তির—

সূত্র । তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনং ॥৫১॥৪৬১॥*

অমুবাদ । বিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ বিজিগীষাবশতঃ সেই জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন কর্তব্য ।

ভাষ্য । “বিগৃহ্যেতি” বিজিগীষয়া, ন তত্ত্ব-বুভুৎসয়েতি । তদেতদ্-বিদ্যাপরিপালনার্থং, ন লাভ-পূজা-খ্যাতিত্যাগমিতি ।

ইতি বাৎস্তায়নীয়ৈ শ্রায়ভাষ্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অমুবাদ । “বিগৃহ্য” এই পদের দ্বারা বিজিগীষাবশতঃ, তত্ত্বজিজ্ঞাসাবশতঃ নহে, ইহা বুঝা যায় । সেই ইহা অর্থাৎ জিগীষাবশতঃ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন, “বিদ্যা” অর্থাৎ আত্মবিদ্যার পরিরক্ষণের নিমিত্ত —লাভ, পূজা ও খ্যাতির নিমিত্ত নহে, অর্থাৎ কোন লাভাদি উদ্দেশ্যে উহা কর্তব্য নহে ।

বাৎস্তায়ন-প্রণীত শ্রায়ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী । ভাষ্যকার মহর্ষির এই শেষোক্ত সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে যে সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, কেবল যে, ভাষ্যকারের পূর্বকথিত ব্যক্তিদিগেরই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য, তাহা নহে; কিন্তু বিদ্যানির্বেদ প্রভৃতি কারণবশতঃ অপর কর্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তিরও বিগ্রহ করিয়া সেই জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন কর্তব্য । ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে । “বিদ্যা” শব্দের দ্বারা এখানে সন্নিধ্য বা আত্মবিদ্যারূপ আত্মজ্ঞানিক বিদ্যাই ভাষ্যকারের অভিমত বুঝা যায় । ঐ বিদ্যা বিষয়ে যে বিরক্তি, তাহাই “বিদ্যানির্বেদ” । যাহারা ঐ বিদ্যায় বিরক্ত, কিন্তু নাস্তিক-বিদ্যাদিতে অনুরক্ত, তাহারা সেই বিদ্যা-বিরক্তিবশতঃ অথবা লাভ

* ন কেবলং তদর্থং ঘটমানানাং জল্পবিতণ্ডা, অপিতু “বিদ্যানির্বেদাদিভিশ্চ পরেণাবজ্ঞায়মানস্ত”—“তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনং”মিতি সূত্রং । যন্ত স্বদর্শনবিলসিতমিথ্যাজ্ঞানাবলপদ্বির্বিদকৃতয়া সন্নিধ্যাবৈরাগ্যা বা লাভপূজাখ্যাতিত্যাগমিতয়া কুহেতুভিরীশ্বর্যাণাং জনাধারাণাং পুরতো বেদব্রাহ্মণ-পরলোকাদিদূষণপ্রবৃত্তন্তং প্রতি বাদী সমীচীনদূষণমপ্রতিভয়াহ-পশ্যন্ত জল্পবিতণ্ডে অবতারাং বিগৃহ্য জল্পবিতণ্ডাভ্যাং তত্ত্বকথনং করোতি বিদ্যাপরিপালনায় । সা ভূদীশ্বর্যাণাং মতি-বিভ্রমেণ তচ্চরিতমমুর্বাণীনাং প্রজানাং ধর্মবিপ্লব ইতি । ইদমপি প্রয়োজনং জল্পবিতণ্ডয়োঃ । ন তু লাভ-খ্যাতিাদি দৃষ্টং । নহি পরহিতপ্রবৃত্তঃ পরমকারণিকো মুনির্দুঃখার্থঃ পরপাঃস্বলাপায়মুপদিগতি ।—তাৎপর্যাটীকা ।

পূজাদি প্রাপ্তির উৎকর্ষ ইচ্ছা প্রভৃতি অথ কোন কারণবশতঃ বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাসী আন্তিকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং নানা স্থানে নানাক্রমে নাস্তিক-মতের প্রচার করেন। পূর্বকালে ভারতে অনেক স্থানে অনেক বার নাস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্যে ঐরূপ হইয়াছে এবং এখনও অনেক স্থানে বেদাদি শাস্ত্রবিশ্বাসী বর্ণাশ্রমধর্মরক্ষপাতী ব্রাহ্মদিগের অবজ্ঞা ও নিন্দার সহিত নাস্তিক মতের বক্তৃতা হইতেছে। পূর্বোক্ত ঐরূপ স্থলে নাস্তিক কর্তৃক অবজ্ঞায়মান আন্তিকেরও বিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ বিজয়েচ্ছাবশতঃ জন্ম ও বিতণ্ডার দ্বারা তৎকথন কর্তব্য, ইহাই ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া পূর্বোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং শেষে উহা যে আত্ম-বিদ্যার পরিরক্ষণের জন্তই মহর্ষি কর্তব্য বলিয়াছেন—লাভ, পূজা ও খ্যাতির জন্ত কর্তব্য বলেন নাই, ইহাও বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার ইহার তাৎপর্য্য সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অর্থাৎ নাস্তিক নিজের দর্শনোৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানের গর্বে ছার্কিনীতাবশতঃ অথবা সদ্ধিদ্যাবৈরাগ্যবশতঃ লাভ, পূজা ও খ্যাতির ইচ্ছায় জনসমাজের আশ্রয় রাজাদিগের নিকটে অসৎ হেতু বা কুতর্কের দ্বারা বেদ, ব্রাহ্মণ ও পরলোকাদি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তখন নিজের অপ্রতিভাবশতঃ তাহার মতের সমীচীন খণ্ডন বা প্রকৃত উত্তরের স্ফূর্তি না হইলে জন্ম ও বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া, বিগ্রহ করিয়া আত্ম-বিদ্যার রক্ষার দ্বারা ধর্মরক্ষক আন্তিক, আত্মবিদ্যার রক্ষার্থ জন্ম ও বিতণ্ডার দ্বারা তৎকথন করেন। কারণ, রাজাদিগের মতিবিভ্রমবশতঃ তাঁহাদিগের চরিতানুবর্তী প্রজাবর্গের ধর্মবিপ্লব না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাও জন্মবিতণ্ডার প্রয়োজন। কিন্তু কোন লাভ, পূজা ও খ্যাতি প্রভৃতি দৃষ্টফল উহার প্রয়োজন নহে। মহর্ষি ঐরূপ কোন দৃষ্টফলের জন্ত কোন স্থগেই জন্ম ও বিতণ্ডার কর্তব্যতার উপদেশ করেন নাই। কারণ, পরহিতপ্রবৃত্ত পরমকারুণিক মুনি (গোতম) দৃষ্টফললাভার্থ ঐরূপ পরহুঃখজনক উপায়ের উপদেশ করিতে পারেন না। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন কালেও নাস্তিকসম্প্রদায়ের কুতর্কের প্রভাবে অনেক রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির মতিবিভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। ঐরূপ স্থলে নাস্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়া ধর্মবিপ্লব নিবারণের জন্ত ভারতের বর্ণাশ্রমধর্মরক্ষক বহু আচার্য্য তাহাদিগের মতের খণ্ডন ও আন্তিক মতের সমর্থনপূর্বক প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতের আত্মবিদ্যার রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা নাস্তিকমত খণ্ডনে প্রকৃত উত্তরের স্ফূর্তিবশতঃ কোন অসৎ উত্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। স্থলবিশেষে কেহ কেহ তাহাও আশ্রয় করিয়া নাস্তিকসম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই অত্র পণ্ডিতগণের দ্বারা কোন লাভ, পূজা ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে কুত্রাপি জন্ম ও বিতণ্ডা করেন নাই। কারণ, মহর্ষি গোতম তাহা করিতে উপদেশ করেন নাই। তিনি যেরূপ স্থলে ও যেরূপ উদ্দেশ্যে এখানে ছইটী সূত্রের দ্বারা “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”র কর্তব্যতার উপদেশ করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষে “ছল” ও “জাতি”র স্বরূপ বর্ণন করিয়া পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আন্তিকে নানাক্রমে “জাতি” বিভাগ ও লক্ষণাধি বলিয়াছেন, তাহা অধ্যয়নপূর্বক

প্রনিধান করিয়া বুঝিলে তাঁহাকে কুতর্কের শিক্ষক বলিয়া নিন্দা করা যায় না এবং কোনরূপ লাভ, পূজা বা খ্যাতির জন্তই এই জ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন যে, তাঁহার অনভিমত, তাহাও বুঝা যায়।

সূত্রে “বিগৃহ” শব্দের দ্বারা বিজিগীষাবশতঃই জন্ম ও বিতণ্ডা কর্তব্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, বিজিগীষু ব্যক্তিই অপরের সহিত বিগ্রহ করে। সুতরাং বাদ, জন্ম ও বিতণ্ডার মধ্যে জিগীষা-শূন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসার পক্ষেই বাদ বিচার কর্তব্য এবং জিগীষুর পক্ষেই জন্ম ও বিতণ্ডা কর্তব্য, এই সিদ্ধান্তও এই সূত্রে মহর্ষি “বিগৃহ” এই পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। “বাদ” “জন্ম” ও “বিতণ্ডা” এই ত্রিবিধ বিচারের নাম কথা। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রারম্ভে ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন। সেখানে ঐ ত্রিবিধ কথার লক্ষণাদিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে (১৯শাঃ ২৩শ) দুই সূত্রে মহর্ষি নিজেও “কথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ “কথা” শব্দটী “বাদ” “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”র বোধক পারিভাষিক শব্দ। মহর্ষি বাল্মীকিও গৌতমোক্ত ঐ পারিভাষিক “কথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তিনি গৌতমের এই সূত্রের জ্ঞান সেখানে “কথা” শব্দের পূর্বে “বিগৃহ” এই শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন^১। কিন্তু মহর্ষি গৌতম এই সূত্রে স্বম্বাক্ষর “কথা” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “কথন” শব্দের প্রয়োগ করায় উহার দ্বারা বচনরূপ কথনই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্বোক্ত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“তত্ত্বকথনং কথোতি” অর্থাৎ প্রতিবাদী আন্তিক, জন্ম ও বিতণ্ডার দ্বারা নাস্তিকের মত খণ্ডন করিয়া, পরে রাজাদির নিকটে প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; ইহাই তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

এখানে “তাভ্যাং বিগৃহ কথনং” ইহা ভাষ্যকারেরই বাক্য, উহা মহর্ষি গৌতমের সূত্র নহে, এইরূপ মতও কেহ কেহ সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহা সূত্র বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করায় এবং “জ্ঞানসূচনিবন্ধে”ও উহা সূত্রমধ্যে গ্রহণ করায় এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই সূত্রের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করায় উহা সূত্র বলিয়াই গ্রাহ্য। পরন্তু মহর্ষি এখানে পৃথক্ প্রকরণের দ্বারাই শেবোক্ত ঐ সিদ্ধান্তের প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে “তাভ্যাং বিগৃহ কথনং” এই বাক্যটি তাঁহার এই প্রকরণের দ্বিতীয় সূত্র, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, এক সূত্রের দ্বারা প্রকরণ হয় না। “জ্ঞানসূত্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য এই সূত্রের শেষে “তত্ত্বস্ত বাদদায়নাৎ” এইরূপ আর একটি সূত্রের উল্লেখপূর্বক উহার কএক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যন্ত আর কেহই ঐরূপ সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; আর কোন পুস্তকেই ঐরূপ সূত্র দেখাও যায় না। উহা মহর্ষি গৌতমের সূত্র বলিয়া কোন মতে স্বীকার করাও যায় না (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ২০শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥

এই আঙ্গিকে প্রথমে তিন সূত্রে (১) তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি-প্রকরণ। পরে ১৪ সূত্রে (২) অবয়বাবয়ব-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ সূত্রে (৩) নিরবয়ব-প্রকরণ। তাহার পরে ১২সূত্রে (৪) বাহ্যার্থভদ্রনিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ১২সূত্রে (৫) তত্ত্ব-জ্ঞানবিসৃদ্ধি-প্রকরণ। তাহার পরে ২সূত্রে (৬) তত্ত্ব-জ্ঞানপরিপালন-প্রকরণ।

৬ প্রকরণ ও ৫১ সূত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্গিক সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষ্য । সাধর্ম্য্য-বৈধর্ম্য্যভ্যাং প্রত্যবস্থানন্ত বিকল্পাজ্জাতিবহুত্বমিতি
সংক্ষেপেণোক্তং, তদ্বিস্তরেণ বিভজ্যতে । তাঃ খল্বিমা জাতয়ঃ স্থাপনা-
হেতৌ প্রযুক্তে চতুর্বিংশতিঃ প্রতিষেধহেতবঃ—

অনুবাদ । সাধর্ম্য্য ও বৈধর্ম্য্যমাত্র দ্বারা প্রত্যবস্থানের (প্রতিষেধের)
“বিকল্প” অর্থাৎ নানা প্রকারতাবশতঃ জাতির বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে,
তাহা সবিস্তর বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে ।

স্থাপনার হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ জিগীষু কোন বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন
করিলে প্রতিষেধের হেতু অর্থাৎ বাদীর সেই পক্ষপ্রতিষেধের জন্য জিগীষু প্রতিবাদি-
কর্তৃক প্রযুক্ত প্রতিষেধক বাক্য বা উত্তর, সেই এই সমস্ত (পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত)
চতুর্বিংশতিপ্রকার জাতি—

সূত্র । সাধর্ম্য্য-বৈধর্ম্য্যোৎকর্ষ্যাপকর্ষ-বর্ণ্যাবর্ণ্য-
বিকল্প-সাধ্য-প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তি-
সংশয়-প্রকরণাহেত্বর্থাপত্যবিশেষোপপত্ত্যুল্লঙ্ঘ্যনুপ-
লঙ্ঘ্যানিত্য-নিত্যকার্য্যসমাঃ ॥১॥ ৪৬২॥ *

অনুবাদ । (১) সাধর্ম্য্যসম, (২) বৈধর্ম্য্যসম, (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম,
(৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম, (৭) বিকল্পসম, (৮) সাধ্যসম, (৯) প্রাপ্তিসম, (১০)
অপ্রাপ্তিসম, (১১) প্রসঙ্গসম, (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম, (১৩) অনুৎপত্তিসম,

* মুদ্রিত “শ্রায়দর্শন”, “শ্রায়বার্ত্তিক”, “শ্রায়মুট্টানিবন্ধ”, “শ্রায়মঞ্জরী” ও “তর্কিকরক্ষা” প্রভৃতি পুস্তকে এই
সূত্রের শেষে “নিত্যানিত্যকার্য্যসমাঃ” এইরূপ পাঠ দেখা যায় এবং “তর্কিকরক্ষা” ভিন্ন হস্তাংশ পুস্তকে “প্রকরণাহেত্বর্থ্য
এইরূপ পাঠ দেখা যায় । কিন্তু মহর্ষি পরে ১৮শ সূত্রে “অহেতুসম” নামক প্রতিষেধেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং
শেষে ৩২শ সূত্রে “অনিত্যসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়া, তাহার পরে ৩৫শ সূত্রে “নিত্যসম” নামক প্রতিষেধের
লক্ষণ বলিয়াছেন । সুতরাং এই সূত্রেও “অনিত্য” শব্দের পরেই তিনি “নিত্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ
নাই । এখানে মহর্ষির শেষোক্ত ঐ সমস্ত সূত্রানুসারেই সূত্রপাঠ নির্ণয়পূর্ব্বক গৃহীত হইল ।

(১৪) সংশয়সম, (১৫) প্রকরণসম, (১৬) অহেতুসম, (১৭) অর্থাপত্তিসম, (১৮) অবিশেষসম, (১৯) উপপত্তিসম, (২০) উপলক্ষিসম, (২১) অমূলপলক্ষিসম, (২২) অনিত্যসম, (২৩) নিত্যসম ও (২৪) কাৰ্য্যসম, অৰ্থাৎ উক্ত “সাধৰ্ম্ম্যসম” প্রভৃতি নামে পূৰ্ব্বোক্ত সেই জাতি বা প্রতিষেধ চতুৰ্বিংশতি প্রকার।

ভাষ্য। সাধৰ্ম্ম্যেণ প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ সাধৰ্ম্ম্যসমঃ। অবিশেষঃ তত্র তত্রোদাহৰিষ্যামঃ। এবং বৈধৰ্ম্ম্যসম-প্রভৃতিয়োহপি নিৰ্ব্বক্তব্যঃ।

অমুবাদ। স্থাপনার হেতু হইতে “অবিশিষ্যমাণ” অৰ্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু হইতে নিৰ্ব্বিশেষ বা উহার তুল্য বলিয়া প্রতিবাদীর অভিमत, সাধৰ্ম্ম্যমাত্র দ্বারা “প্রত্যবস্থান” (প্রতিষেধ) “সাধৰ্ম্ম্যসম”, অৰ্থাৎ জিগীষু প্রতিবাদী কেবল কোন একটা সাধৰ্ম্ম্য দ্বারাই বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিলেই তাহার সেই প্রতিষেধক বাক্য বা উক্ত “সাধৰ্ম্ম্যসম” নামক “প্রতিষেধ” (জাতি)। সেই সেই উদাহরণে অবিশেষ প্রদৰ্শন করিব (অৰ্থাৎ অবিশেষ না থাকিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেক্রমে বাদীর হেতু হইতে তাহার প্রতিষেধ বা হেতুর অবিশেষ বলেন, তাহা যথাস্থানে “সাধৰ্ম্ম্যসম” নামক প্রতিষেধের সমস্ত উদাহরণে প্রদৰ্শন করিব) এইরূপে “বৈধৰ্ম্ম্যসম” প্রভৃতিও “নিৰ্ব্বক্তব্য” অৰ্থাৎ “বৈধৰ্ম্ম্যসম” প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি প্রকার প্রতিষেধেরও লক্ষণ বক্তব্য।

টিপ্পনী। মহৰ্ষি গৌতম ত্ৰায়দৰ্শনের সৰ্ব্ব প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষে যে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র উদ্দেশ্য করিয়াছেন,—পরে যথাক্রমে দুই সূত্রে দ্বারা ঐ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সামান্য লক্ষণ স্থচনা করিয়া, শেষ সূত্রে দ্বারা ঐ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” যে বহু, ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র পূৰ্ব্বোক্ত বহুত্ব প্রতিপাদনের জন্য উহার বিভাগাদি কৰ্ত্তব্য। অৰ্থাৎ ঐ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” কতপ্রকার এবং ঐ উহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও লক্ষণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। নচেৎ ঐ পদার্থদ্বয়ের সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয় না। তাই মহৰ্ষি গৌতমের এই পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ। এই অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে জাতির বিভাগ অৰ্থাৎ চতুৰ্বিংশতি প্রকার জাতির বিশেষ বিশেষ নাম কীৰ্ত্তন এবং উহাদিগের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আঙ্কিকে নিগ্রহস্থানের বিভাগপূৰ্ব্বক লক্ষণ বলা হইয়াছে। সুতরাং “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র বিভাগ এবং বিশেষ লক্ষণ ও “জাতি”র

১। সাধৰ্ম্ম্যবৈধৰ্ম্ম্যজাঃ প্রত্যবস্থানঃ জাতিঃ। বিপ্রতিপত্তিঃপ্রতিপত্তিঃ নিগ্রহস্থানঃ। তদ্বিকল্পাজাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বঃ।—১ম অঃ, ২য় আঃ, ১৮।১৯।২০।

পরীক্ষা এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। এই পঞ্চম অধ্যায় অতি দুর্লভ। বহু পারিভাষিক শব্দ এবং জ্ঞানশাস্ত্রোক্ত পঞ্চাবয়ব ও হেতুভাষ্যাদি-তত্ত্বে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে এই পঞ্চম অধ্যায় বুঝা যায় না। এবং ঐ সমস্ত তত্ত্বে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় ইহা বুঝানও যায় না। বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একাধিচিন্তে অনেকবার পাঠ না করিলেও ইহা বুঝা যাইবে না। জ্ঞানসুত্রবৃত্তিকার মহামনীষী বিশ্বনাথও এই পঞ্চম অধ্যায়কে “অতিগহন” বলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথের চরণাঙ্কিত আমরাও এখানে দুর্গমতরণ শব্দ-চরণে নমস্কার করিয়া বিশ্বনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি।

“নত্বা শব্দচরণং দীনস্ত দুর্গমে তরণং।

সম্প্রতি নিরূপয়ামঃ পঞ্চমমধ্যায়মতিগহনং।”

এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকারের প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের সর্বশেষ সূত্রে সাধর্ম্য্য ও বৈধর্ম্য্যমাত্রপ্রযুক্ত যে “প্রত্যবস্থান” অর্থাৎ প্রতিষেধ, তাহার “বিকল্প” অর্থাৎ বিবিধ প্রকার থাকায় পূর্কোক্ত জাতি বহু, ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। সেখানে উহার বিস্তার অর্থাৎ সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অবশিষ্ট কর্তব্যবশতঃ তিনি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্কোক্ত জাতির বিভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই সূত্রের দ্বারা “সাধর্ম্য্যসম” ও “বৈধর্ম্য্যসম” প্রভৃতি নামে পূর্কোক্ত “জাতি” নামক প্রতিষেধ যে, চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই প্রথমে বলিয়াছেন। পরে যথাক্রমে ঐ চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণ বলিয়া, উহাদিগের পরীক্ষাও করিয়াছেন।

এখানে অবশ্যই প্রশ্ন হয় যে, প্রথম অধ্যায়ের শেষে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সামান্য লক্ষণের পরেই ত ঐ উভয়ের বিভাগাদি করা উচিত ছিল। মহর্ষি তাহা না করিয়া সর্বশেষে এই পৃথক অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়া “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন কেন? আর সর্বশেষে এই নিরূপণে সংগতিই বা কি? এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” বহু। সুতরাং উহার সবিশেষ নিরূপণ বহু সময়সাধ্য। পূর্কে যথাস্থানে তাহা করিত গেলে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের সমস্ত কথা পূর্কেই বলিলে প্রাথমিকপরীক্ষায় বহু বিলম্ব হইয়া যায়। শিষ্যগণেরও প্রমেয়-তত্ত্বজিজ্ঞাসাই বলবতী হইয়াছে। কারণ, প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানই মুমুকুর প্রধান আবশ্যক। সংশয়াদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান উহার অঙ্গ অর্থাৎ নির্বাহক। তাই মহর্ষি আবশ্যক-বশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয় ও প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয় পরীক্ষা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা বুঝিয়াই তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয়। কারণ, জিজ্ঞাসা না বুঝিয়া অজিজ্ঞাসিত বিষয়ে উপদেশ করিতে গেলে জিজ্ঞাসুর অবধান নষ্ট হয়। সুতরাং মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত দ্বাদশ প্রমেয়ের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াই সর্বশেষে এই অধ্যায়ে তাঁহার অবশিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ফল কথা, মহর্ষি প্রমেয় পরীক্ষার দ্বারা শিষ্যগণের বিরোধী জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া পরে “অবসর”-সংগতিবশতঃ এই অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং উহা অসংগত হয় নাই। (“অবসর”-সংগতির লক্ষণাদি দ্বিতীয় খণ্ডে ২০২—৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ইতঃপূর্কেই চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে “জন্ম” ও “বিতণ্ডার” পরীক্ষাও

হইয়াছে। “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” ঐ “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”র অঙ্গ। সুতরাং “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”র পরীক্ষার পরে উহার অঙ্গ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সবিশেষ নিরূপণও অত্যাৱশ্যক বলিয়া এখানে ঐ নিরূপণে আবাস্তরসংগতিও আছে। বস্তুতঃ প্রমাণাদি অনেক পদার্থের পরীক্ষার পূর্বে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র অতি দুর্বোধ সমস্ত তত্ত্ব সম্যক বুঝাও যায় না। তাই প্রকৃত বক্তা মহর্ষি গৌতম পূর্বে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। প্রথম অধ্যায়ের শেষে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সামান্য লক্ষণ বলিয়া সর্বশেষে ঐ জাতি ও নিগ্রহস্থান যে বহু, সুতরাং তদ্বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে—এইমাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র বহুত্ব বিষয়ে সামান্য জ্ঞান জন্মিলে, পরে তদ্বিষয়ে শিবাগণের বিশেষ জিজ্ঞাসাও জন্মিলে, ইহাও মহর্ষির দেখানে ঐ শেষ সূত্রের উদ্দেশ্য।

এই সূত্রে “সাধর্ম্য” হইতে “কার্য্য” পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি শব্দের দ্বন্দ্বসমাসের পরে যে “সম” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা পূর্বোক্ত “সাধর্ম্য” প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের সহিতই সম্বন্ধ হওয়ায় “সাধর্ম্য-সম” ও “বৈধর্ম্যসম” প্রভৃতি চতুর্বিংশতি নাম বুঝা যায়। মহর্ষি পরবর্তী সূত্রে পুংলিঙ্গ “সম” শব্দেরই প্রয়োগ করায় এই সূত্রেও তিনি পুংলিঙ্গ “সম” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। তদনুসারেই ভাষ্যকার “সাধর্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্যসম” ইত্যাদি নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে “জাতি”র সামান্য লক্ষণসূত্র-ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত যে “প্রত্যবস্থান”কে “প্রতিষেধ” বলিয়াছেন, ঐ প্রতিষেধকে বিশেষ্য করিয়াই এখানে সূত্রানুসারে “সাধর্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্যসম” প্রভৃতি পুংলিঙ্গ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, “প্রতিষেধ” শব্দটি পুংলিঙ্গ। তাৎপর্য্যটীকা-কার বাচস্পতি মিশ্র, “শ্রাৱমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এইরূপই সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে তাঁহার নিজমতে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম অধ্যায়ের সর্বশেষে মহর্ষি “তদ্বিকল্পঃ” ইত্যাদি সূত্রে পুংলিঙ্গ “বিকল্প” শব্দের প্রয়োগ করায় তদনুসারেই এখানে “সাধর্ম্যসম” ইত্যাদি পুংলিঙ্গ নামেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সেই “বিকল্প”ই “সাধর্ম্যসম” প্রভৃতি নামে চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। পরবর্তী সূত্রেও পূর্বোক্ত বিকল্পই বিশেষ্যরূপে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ। “বিকল্প” শব্দের অর্থ এখানে বিবিধ প্রকার। কিন্তু পূর্বোক্ত জাতিবৈধি বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিলে “সাধর্ম্যসমা” ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ নামেরও প্রয়োগ হয়। কারণ, “জাতি” শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। পরবর্তী আচার্য্যগণও প্রায় সর্বত্র ঐরূপ স্ত্রীলিঙ্গ নামের ব্যবহারই করিয়াছেন। আমরাও অনেক স্থলেই ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ নামেরই ব্যবহার করিব।

সুচিরকাল হইতেই “জন্ম”ধাতুনিষ্পন্ন “জাতি” শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে। তন্মধ্যে জন্ম অর্থই সুপ্রসিদ্ধ। “জাত্যা ব্রাহ্মণঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে জন্মই “জাতি” শব্দের অর্থ।

১। জাতিঃ সামান্যজন্মনোঃ।—অমরকোষ, নানার্থবর্গ। জাতিজাতীকলে ধাত্বাং চুল্লীকম্পিনয়োরপি” ইতি বিষ্ণুঃ। জাতিঃ স্ত্রী গোত্রজন্মনোঃ। অশ্বস্তিকামলকোশ সামান্যজন্ম-সারপি। জাতীকলে চ মালত্যাং ইতি মেদিনী। অমরকোষের ভানুজি দীক্ষিতকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

“জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ” ইত্যাদি^১ ঋষিবচনেও “জন্মন” শব্দের দ্বারা ঐ জাতিই কথিত হইয়াছে। যোগদর্শনে “সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ” (২।১৩) ইত্যাদি অনেক সূত্রেও জন্মবিশেষ অর্থেই “জাতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ মনুষ্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব, ষটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি বহু সামান্য ধর্ম্য ও গ্রামাদিশাস্ত্রে “জাতি” নামে কথিত হইয়াছে। বৈশেষিকসূত্রে উহা “সামান্য” নামে কথিত হইয়াছে। গ্রামদর্শনেও “ন ঘট্যভাবসামান্যনিত্যত্বাৎ” (২।২।১৪) ইত্যাদি সূত্রে “সামান্য” শব্দের দ্বারা ঐ জাতির উল্লেখ ও উহার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে অনেক সূত্রে “জাতি” শব্দের দ্বারা ঐ নিত্য জাতির উল্লেখ হইয়াছে। সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদায় ঐ জাতির আশ্রয় ব্যক্তি হইতে পৃথক্ জাতি পদার্থ অস্বীকার করিলেও মীমাংসক-সম্প্রদায় উহা স্বীকার করিয়াছেন। মীমাংসাকাব্য গুরু প্রভাকর গ্রাম-বৈশেষিক-সম্মত “সম্ভা” প্রভৃতি কতিপয় জাতি অস্বীকার করিলেও ব্যক্তিভিন্ন অনেক জাতি পদার্থ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। “প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে “জাতিনির্ণয়” নামক তৃতীয় প্রকরণে মহামনীষী শালিকনাথ বিচারপূর্বক জাতি বিষয়ে প্রভাকরের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, মনুষ্যত্ব ও গোত্ব প্রভৃতি বহু সামান্য ধর্ম্য ও গ্রামাদি শাস্ত্রে পারিভাষিক “জাতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিন্তু গ্রামদর্শনের সর্বপ্রথম সূত্রে যে, পারিভাষিক “জাতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ “জন্ম” ও “বিত্তগুণ” প্রতিবাদীর অসদ্বৃত্তরবিশেষ। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে “সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাত্মাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ” এই সূত্রের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রসঙ্গবিশেষকে “জাতি” বলিয়া, পরে ঐ “প্রসঙ্গ”কেই সূত্রোক্ত “প্রত্যবস্থান” বলিয়াছেন এবং পরে “উপালম্ব” ও “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাকে “উপালম্ব” ও “প্রতিষেধ” বলে, তাহাকেই “প্রত্যবস্থান” বলে, ইহাই সেখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য। যদ্বারা প্রতিবাদী বাদীর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ বাদীর পক্ষ খণ্ডনার্থ প্রবৃত্ত হন, এই অর্থে ঐ “প্রত্যবস্থান” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রতিবাদীর পরপক্ষখণ্ডনার্থ উত্তর। রুত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রত্যবস্থানং দুষণাভিধানং” এবং অশ্বত্ব “উপালম্ব” শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“উপালম্বঃ পরপক্ষদুষণম্।” যদ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডন করেন, এই অর্থে “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারাও পূর্বোক্ত “প্রত্যবস্থান” বা “উপালম্ব” বুঝা যায়। সুতরাং ভাষ্যকার শেষে ঐ স্থলে উক্ত অর্থেই মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত জাতিকে “প্রতিষেধ” বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনের জন্ত কোন হেত্বভাসের উল্লেখ করিলে অথবা মহর্ষি গৌতমের পূর্বোক্ত কোন প্রকার “ছল” করিলে, তাহাও ত তাঁহার “প্রত্যবস্থান” বা “প্রতিষেধ”। সুতরাং প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধমাত্রই জাতি, ইহা বলা যায় না। তাই মহর্ষি জাতির ঐ লক্ষণ-সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—“সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাত্মাম্”। অর্থাৎ দ্বিগীষু

১। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্বিভজ উচ্যতে। বিদ্যায়া যতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ।—অজিনসংহিতা, ১৪০ শ্লোক।

প্রতিবাদী কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যমাত্র অবলম্বন করিয়া তদ্বারা যে প্রত্যাবস্থান করেন, তাহাই “জাতি”। হেত্বাভাসের উল্লেখ বা “ছল” কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত প্রত্যাবস্থান না হওয়ায় উহা “জাতি”র উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতিই সর্বত্র যে কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় উহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে অস্তান্ত কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৪২০—২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে পরে এখানে এই সূত্রোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির সামান্য পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজ পক্ষস্থাপনে হেতু প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে এই সমস্ত জাতি, প্রতিষেধের হেতু। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তিনি প্রথম অধ্যায়ে জাতির সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যায় জাতিকে যে “প্রতিষেধ” বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রতিষেধক বাক্য, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। যদ্বারা প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে “প্রতিষেধ” শব্দের প্রয়োগ হইলে উহার দ্বারা প্রতিষেধক বাক্য বুঝা যায়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত সমস্ত জাতি বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের প্রতিষেধক হয় না; উহা অসহজতর বলিয়া বাদীর পক্ষপ্রতিষেধে সমর্থই নহে। তথাপি প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ-বুদ্ধিবশতঃ তদ্বদ্বৈত উহার প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার উহাকে প্রতিষেধ-হেতু বলিয়াছেন। বার্তিক-কারও এখানে প্রতিষেধে অসমর্থ হেতুকে জাতি বলিয়া ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন^১। অর্থাৎ প্রতিবাদীর মতে ঐ সমস্ত জাতি বাদীর পক্ষ-প্রতিষেধের হেতু। প্রতিবাদী ইহা মনে করিয়াই ঐ সমস্ত “জাতি”র প্রয়োগ করায় উহাকে প্রতিষেধের হেতু বলা হইয়াছে। প্রতিবাদীর নিজপক্ষ সাধনে প্রযুক্ত হেতু বা হেত্বাভাস “জাতি” নহে। সুতরাং ভাষ্যকার প্রভৃতি এখানে তাহা বলিতে পারেন না। ফলকথা, বাদীর পক্ষদূষণে অসমর্থ যে অসহজতরবিশেষ, তাহাই জাতি। উদ্যোতকরের মতে উহাই জাতির সামান্যলক্ষণ। জয়ন্ত ভট্টও উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া স্বব্যাবাতক উত্তরই জাতি, ইহা বলিয়াছেন। “ভার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ জাতির সামান্য লক্ষণ বিষয়ে উক্ত মতদ্বয়ই প্রকাশ করিয়াছেন^২। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতদ্বয়ানুসারেই উক্ত দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। “তর্কসংগ্রহ”দীপিকার টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্ট এবং পূর্ববর্তী মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থকার স্বব্যাবাতক উত্তরকেই “জাতি” বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জাতিই স্বব্যাবাতক উত্তর, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সহজতর ও “ছল” নামক অসহজতরগুলি জাতির গ্রায় স্বব্যাবাতক উত্তর নহে। সুতরাং স্বব্যাবাতক উত্তরই জাতি, এইরূপ

১। তত্র জাতির্নাম স্থাপনাহেতৌ প্রযুক্তো যঃ প্রতিষেধাসমর্থো হেতুঃ।—তায়বার্তিক। প্রতিষেধবুদ্ধ্যা প্রযুক্ত ইতি শেষঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

২। তত্র ভাবদ্বয়বার্তিকং লক্ষণমাহ,—

প্রযুক্তে স্থাপনাহেতৌ দুষণাশক্তমুত্তরম্।

জাতিমাহরথাশ্চে তু স্বব্যাবাতকমুত্তরম্ ॥৩॥—ভার্কিকরক্ষা।

লক্ষণ বলিলে উহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। স্বাভাবিক উত্তর, এই অর্থে মহর্ষি গৌতমোক্ত এই “জাতি” শব্দটি পারিভাষিক। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে জাতির সামান্যলক্ষণ-স্বত্বের ভাষ্যের শেষে ঐ পারিভাষিক “জাতি” শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, “জায়মানোহর্থো জাতিঃ”। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তাঁহার তাৎপর্য বুঝা যায় যে, যাহা কেবল জন্মে, কিন্তু নিজেই নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় পরে ব্যাহত হইয়া যায় অর্থাৎ স্থায়ী হইতে পারে না, তাহাই ঐ “জাতি” শব্দের অর্থ। কিন্তু উহা “জাতি” শব্দের ব্যুৎপত্তি মাত্র, উহার দ্বারা উক্ত জাতির লক্ষণ কথিত হয় নাই। তাৎপর্যটীকাকারও সেখানে ইহাই বলিয়াছেন।

সুবিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার “শ্রায়বিন্দু” গ্রন্থের সর্বশেষে বলিয়াছেন, “দুষণাভাসান্ত জাতয়ঃ”^১। অর্থাৎ যে সমস্ত উত্তর বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের দুষণ বা দুষক নহে, কিন্তু তত্ত্বল্য বলিয়া “দুষণাভাস” নামে কথিত হয়, সেই সমস্ত উত্তরকে “জাতি” বলে। ধর্ম্মকীর্ত্তি পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বাদীর পক্ষ অসত্য দোষের উদ্ভাবন করেন, সেই সমস্ত বাক্যই জাত্যুত্তর। যদ্বারা ঐ অসত্য দোষ উদ্ভাবিত হয়, এই অর্থে ঐ স্থলে প্রতিবাদীর সেই সমস্ত বাক্যকেই তিনি “উদ্ভাবন” বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ “জাতি” শব্দ সাদৃশ্য-বোধক। বাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী উহার খণ্ডনার্থ প্রকৃত উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যে অসহুত্তর করেন, তাহা প্রকৃত উত্তরের স্থানে প্রযুক্ত হওয়ায় উত্তরের সদৃশ, তাই উহার নাম “জাতি” বা জাত্যুত্তর। প্রকৃত উত্তরের স্থানে প্রয়োগই উহাতে উত্তরের সাদৃশ্য। সুতরাং ঐ সাদৃশ্যবিশিষ্ট উত্তরকে ঐ তাৎপর্য্যে জাত্যুত্তর বলা হয়। অবশ্য “জাতি” শব্দের সাদৃশ্য অর্থও নিশ্চয়মাণ বলা যায় না। কোষকার অমর সিংহের নানার্থবর্ণে “জাতিঃ সামান্যজন্মনোঃ” এই বাক্যে “সামান্য” শব্দের দ্বারা সমানতা বুঝিলে সাদৃশ্য অর্থও তাঁহার অভিमत বুঝা যায়। “নাট্যৈতৎপ্রতিবিরোধো জাতিপদ্বাৎ” এই (১১৫৪) সাংখ্যসূত্রে “জাতি” শব্দের এক পক্ষে সাদৃশ্য অর্থেরও ব্যাখ্যা আছে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “জাতিঃ সামান্যমেকরূপত্বং”। সুতরাং “জাতি” শব্দের সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রকৃত উত্তর নহে, কিন্তু উত্তরের সদৃশ, এই তাৎপর্য্যেও “জাত্যুত্তর” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। এবং ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা যে, তাঁহার নিজেরই বলিত নহে, উহা পরম্পরাপ্রাপ্ত ব্যাখ্যা, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেও উহা জাতি বা জাত্যুত্তরের সামান্য লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, মহর্ষি গৌতমোক্ত “ছল” নামক অসহুত্তরও অসত্য দোষের উদ্ভাবক এবং উত্তরসদৃশ, কিন্তু তাহা “জাতি” নহে। তবে জাত্যুত্তর স্থলে প্রতিবাদী যেক্রপ সাম্য বা সাদৃশ্যের অভিমান করেন, তাহাই “জাতি” শব্দের দ্বারা গ্রহণ

১। দুষণাভাসান্ত জাতয়ঃ। অতুতদোষোদ্ভাবনানি জাত্যুত্তরাণি।—শ্রায়বিন্দু। দুষণবদাভাসন্তে ইতি দুষণাভাসাঃ। কে তে? জাতয়ঃ। জাতিশব্দঃ সাদৃশ্যবচনঃ। উত্তরসদৃশানি জাত্যুত্তরাণি। তদেবোত্তর-সাদৃশ্যসুত্তরস্থানপ্রযুক্তত্বেন দর্শয়িতুম্। ই “অতুত”শ্চ অসত্য দোষশ্চ উদ্ভাবনানি। উদ্ভাবাত এতদুত্তরোদ্ভাবনানি বচনানি, তানি জাত্যুত্তরাণি। জাতি সাদৃশ্যেনোত্তরাণি জাত্যুত্তরাণি।—ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যকৃত টীকা।

কৰিলে সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট উত্তৰই “জাতি” বা “জাত্যন্তৰ” ইহা বলা যাইতে পারে। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

এখন এখানে মহৰ্ষি পূৰ্বোক্ত “জাতি”ৰ সবিশেষ নিৰূপণেৰ প্ৰয়োজন কি ? ইহা বুঝা আবশ্যক। বার্তিককাৰ উদ্যোতকৰ ইহা বিশেষ কৰিয়া বুঝাইবাব জন্ত এখানে প্ৰথমে পূৰ্বপক্ষ সমৰ্থন কৰিয়াছেন যে, বাদী নিজ বাক্যে “ছল”, “জাতি” ও নিগ্রহস্থানেৰ পৰিবৰ্জন কৰিবেন, অৰ্থাৎ বাদী নিজে উহাৰ প্ৰয়োগ কৰিবেন না, ইহা পূৰ্বে কথিত হইয়াছে। সুতৰাং মহৰ্ষিৰ এখানে জাতিৰ সবিশেষ নিৰূপণ অনাবশ্যক। বাদ্য, জাতিৰ সামান্যজ্ঞানপ্ৰযুক্তই উহাৰ পৰিবৰ্জন সম্ভব হওয়ায় তাহাতে উহাৰ বিশেষ জ্ঞানেৰ আবশ্যকতা নাই। পরন্তু “জাতি” অসম্ভৱ। সুতৰাং এই মোক্ষশাস্ত্ৰে উহাৰ সবিশেষ নিৰূপণ উচিতও নহে। এতদ্বত্বে উদ্যোতকৰ প্ৰথমে বলিয়াছেন যে, জাতিৰ সবিশেষ নিৰূপণেৰ প্ৰয়োজন পূৰ্বেই ভাষ্যকাৰ “স্বয়ংক সুকরঃ প্ৰয়োগঃ” এই বাক্যেৰ দ্বাৰা বলিয়াছেন। এখানে স্বয়ংকৰা আবশ্যক যে, ভাষ্যকাৰ ত্ৰায়দৰ্শনেৰ প্ৰথম সূত্ৰ-ভাষ্যশেষে “ছল”, “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”ৰ পৰিজ্ঞানেৰ প্ৰয়োজন বুঝাইতে ঐগুলিৰ স্বকীয় বাক্যে পৰিবৰ্জন ও প্ৰতিবাদীৰ বাক্যে পৰ্যায়যোগ কৰ্ত্তব্য, ইহা বলিয়াছেন এবং জাতিৰ পৰিজ্ঞান থাকিলে প্ৰতিবাদীৰ প্ৰযুক্ত “জাতি”ৰ সহজে সমাধান কৰা যায় এবং স্বয়ং জাতিপ্ৰয়োগও সুকৰ হয়, ইহাও শেষে “স্বয়ংক সুকরঃ প্ৰয়োগঃ” এই বাক্যেৰ দ্বাৰা বলিয়াছেন (প্ৰথম খণ্ড—৬৬ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য)। বার্তিককাৰ উদ্যোতকৰ ঐ স্থলে প্ৰথমে ভাষ্যকাৰেৰ পূৰ্বাপৰ উক্তিৰ বিৰোধ সমৰ্থন কৰিয়া, উহাৰ সমাধান কৰিতে ভাষ্যকাৰেৰ শেষোক্ত বাক্যেৰ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন যে, প্ৰতিবাদী কোন “জাতি”ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে জাতিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাদীই তাহা জাত্যন্তৰ বুলিয়া প্ৰতিপক্ষ কৰিতে সমৰ্থ হন। তাৎপৰ্য্য এই যে, বাদী তাঁহাৰ নিজবাক্যে কোন “জাতি”ৰ প্ৰয়োগ কৰিবেন না, ভাষ্যকাৰেৰ এই পূৰ্বোক্ত কথা সত্য। কিন্তু প্ৰতিবাদী যখন বাদীকে নিরস্ত কৰিবাব জন্ত কোন “জাতি”ৰ প্ৰয়োগ কৰিবেন, তখন তিনি অবশ্যই সভ্যগণকে বলিবেন যে, ইনি জাতিৰ প্ৰয়োগ কৰিতেছেন। তখন সভ্যগণ ঐ বাদীকে প্ৰশ্ন কৰিতে পাবেন যে, কেন ? ইহাৰ এই উত্তৰ যে জাত্যন্তৰ, ইহা কিৰূপে বুঝিব ? এবং চতুৰ্বিংশতি প্ৰকাৰ জাতিৰ মধ্যে ইহা কোন প্ৰকাৰ ? তখন সেই বাদী সভ্যগণকে তাহা বুঝাইবেন। জাতি বিষয়ে তাঁহাৰ বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই তিনি তাহা বুঝাইতে পাবেন ; নচেৎ তাহা পাবেন না। ভাষ্যকাৰ এই তাৎপৰ্য্যই পৰে বলিয়াছেন, “স্বয়ংক সুকরঃ প্ৰয়োগঃ” ; সুতৰাং ঐ স্থলে ভাষ্যকাৰেৰ পূৰ্বাপৰ উক্তিৰ কোন বিৰোধ নাই। বাদী যে নিজবাক্যে জাতিৰ প্ৰয়োগ কৰিবেন না, এই পূৰ্বোক্ত সিদ্ধান্ত অব্যাহতই আছে। ফল কথা, বাদীৰও “জাতি”ৰ বিশেষ জ্ঞান অত্যাৱশ্যক। সুতৰাং এই আছিল মহৰ্ষিৰ “জাতি”ৰ সবিশেষ নিৰূপণ ব্যৰ্থ নহে।

উদ্যোতকৰ পৰে বলিয়াছেন যে, অথবা সাধু সাধন নিৰাকৰণেৰ জন্ত সময়বিশেষে বাদীৰও “জাতি” প্ৰয়োগ কৰ্ত্তব্য হয়। সুতৰাং তাঁহাৰও জাতিৰ সবিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদী অসাধু সাধন প্ৰয়োগ কৰিলেও তখনই ঐ সাধনেৰ অসাধুত্ব বা দোষেৰ ক্ষুতি না হওয়ায় বাদী

যদি ঐ সাধনকে সাধু বলিয়াই বুঝেন এবং যদি তাঁহার লাভ, পূজা বা খ্যাতির কামনা থাকে, তাহা হইলে তখন প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্ত তিনিও “জাতি”র প্রয়োগ করিবেন। নচেৎ তিনি নীরব হইলে তাঁহার ঐকান্তিক পরাজয় হয়। তদপেক্ষায় তাঁহার পরাজয় বিষয়ে সভাগণের সন্দেহও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সদ্ধিদিব্যবিশেষী নাস্তিক, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে উপস্থিত হইলে তখন যদি শীঘ্র উহার নিরাসক হেতুর স্ফুৰ্ত্তি না হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টাদিগের সম্মুখে ঐ নাস্তিকের নিকটে ঐকান্তিক পরাজয় অপেক্ষায় তদ্বিষয়ে তাহাদিগের সন্দেহও হউক, অথবা আমার কথঞ্চিৎ পরাজয় হউক, এই বুদ্ধিতে প্রতিবাদীর চক্ষুতে পূর্ননিষ্ক্ষেপের ছায়া বাদীও জাতি প্রয়োগ করিবেন। তদ্বারা প্রতিবাদী নিরস্ত হইলে সমাজে শাস্ত্রতত্ত্ব অবস্থাপিত থাকিবে। অতথা সমাজ অসংপথে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ আন্তরিক্যে প্রতিবাদী নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত না করিয়া নীরব থাকিলে সমাজরক্ষক রাজার মতিভ্রম হইবে। সুতরাং প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব অনিবার্য্য হইবে। অতএব নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত করিবার জন্ত সময়বিশেষে “জল্প” ও “বিতণ্ডা”ও আবশ্যক হইলে তাহাতে “ছল”ও জাতির প্রয়োগও কর্তব্য। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই পূর্বোক্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে (২১৭-১৮ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য। কেহ বলিতে পারেন যে, যদি সময়বিশেষে যে কোনরূপে প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নখাঘাত বা চপেটাঘাতাদির দ্বারাও তাহা সহজে করা যাইতে পারে। মহর্ষি তাহা কেন উপদেশ করেন নাই? এতদ্বত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথার কোনই উত্তর না দিয়া, নখাঘাতাদির দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে গেলে তিনি প্রতিবাদী নাস্তিকের কথার উত্তর জানেন না, তাই তিনি তাঁহার যুক্তিখণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাই সকলে বুঝিবে। সুতরাং ঐ স্থলে লোকে প্রতিবাদী নাস্তিকেরই জয় বুঝিবে। তাহা হইলে সেখানে আস্তিকের ঐ বিচার ব্যর্থ হইবে এবং অনর্থের কারণও হইবে। কিন্তু বাদী আস্তিক যদি “জাতি”নামক অসহজত্বের দ্বারাও প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরস্ত করেন, তাহা হইলে সকলে বাদীর নিঃসংশয় পরাজয় বুঝিবে না। অনেকে তাঁহার নিঃসংশয় জয়ও বুঝিবে। সুতরাং তদ্বারাও নাস্তিকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং মহর্ষি স্থলবিশেষে নাস্তিককে নিরস্ত করিবার জন্ত “জল্প”, “বিতণ্ডা” ও উহার অঙ্গ “ছল” ও “জাতি”রও উপদেশ করিয়াছেন। তিনি নাস্তিক নিরাসের জন্ত নখাঘাতাদির উপদেশ করেন নাই। শাস্ত্রকার মহর্ষি কখনও ঐরূপ অসহজপদেশ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে “তদ্ধাবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডা” ইত্যাদি (৫০শ) সূত্রের দ্বারা তাঁহার উপদিষ্ট “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র উদ্দেশ্য নিজেই প্রকাশপূর্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন; তাঁহার তাৎপর্য্য ও যুক্তি সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লাভ, পূজা ও খ্যাতির জন্ত যে জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য নহে, কিন্তু সময়বিশেষে প্রয়োজন হইলে তদ্বনিশ্চয় ও সদ্ধিদিব্য রক্ষার্থই উহা কর্তব্য, ইহা ভাষ্যকার প্রভৃতি চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে বলিয়াছেন। বার্তিককার এখানে যে বাদীর লাভ, পূজা ও খ্যাতিকামনার উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ স্থলে তাৎপর্য্য-টীকাকার ঐ লাভাদিকে বাদীর স্থলবিশেষে আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াই উপপাদন করিয়াছেন।

“শ্রায়দর্শন”কার জয়ন্ত ভট্টও উহা আনুমানিক ফল বলিয়াছেন। অর্থাৎ জন্ম, বিতণ্ডা ও তাহাতে অসম্ভবরূপ জাতির প্রয়োগের তত্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণই উদ্দেশ্য। সুতরাং তজ্জগৎই উহা কর্তব্য। তাহাতে লাভাদি-কামীর আনুমানিক লাভাদি ফলও হইয়া থাকে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যে উহা কর্তব্য নহে। মূলকথা, মহর্ষি নিজেই পূর্বে “জন্ম” ও “বিতণ্ডা”র প্রয়োজন সমর্থন করিয়া এই যোক্ষশাস্ত্রেও যে, অসম্ভবরূপ “জাতি”র সবিশেষ নিরূপণ যুক্ত ও আবশ্যিক, ইহাও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। “শ্রায়দর্শন”কার জয়ন্ত ভট্টও মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত ঐ সূত্রের বিশদ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া তদ্বারাই বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সমন্বয়বিশেষে নাস্তিক-নিরাসের জন্য মুমুক্শুও যে, “জাতি” প্রয়োগ কর্তব্য, ইহাও তিনি বুঝাইয়াছেন এবং সম্ভব করিতে অসমর্থ হইলেই অসম্ভবরূপ দ্বারা এই নাস্তিক-নিরাস কর্তব্য, কিন্তু নথাবাদিদের দ্বারা উহা কর্তব্য নহে, এ বিষয়েও তিনি পূর্বোক্ত যুক্তির সম্যক সমর্থন করিয়াছেন (শ্রায়দর্শন, ৬২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এখন বুঝা আবশ্যিক এই যে, মহর্ষি “সাধর্ম্যসম” ইত্যাদি নামে যে “সম” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি? এবং উহার দ্বারা “জাতি” স্থলে কাহার বিরূপ সমত্ব বা সাম্য মহর্ষির অভিপ্রেত? ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, পরে মহর্ষির প্রথমোক্ত “সাধর্ম্যসম” নামক প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে, তখন প্রতিবাদী যদি কোন একটা সাধর্ম্যমাত্রের দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন এবং তাঁহার ঐ প্রত্যবস্থান পূর্বোক্ত বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপনের হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ তুল্য হয়, তাহা হইলে ঐ “প্রত্যবস্থান”ই “সাধর্ম্যসম” নামক প্রতিষেধ অর্থাৎ “সাধর্ম্যসমা” জাতি। “বৈধর্ম্যসম” প্রভৃতিরও পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। স্থাপনার হেতু হইতে অবিশেষ বিরূপ, তাহা ভাষ্যকার পরে জাতির সেই সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে “অবিশিষ্যমাণং স্থাপনা-হেতুতঃ” এই কথা বলিয়া “সাধর্ম্যসম” প্রভৃতি স্থলে যে তাঁহার মতে বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ উত্তরবাদী (প্রতিবাদী) “জাতি” প্রয়োগ করিয়া বাদীকে বলেন যে, তোমার কথিত সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যও যেকোন, আমার কথিত সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যও তজ্জগৎই; কারণ, তোমার কথিত সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যই সাধ্যসাধক হইবে, আমার কথিত সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য সাধ্যসাধক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিজ পক্ষ সমর্থনে বিশেষ হেতুর অভাবই সাম্য। উহা সাধর্ম্যাদিপ্রযুক্তই হয়, এ জন্য “সাধর্ম্যোণ সমঃ” ইত্যাদি বিগ্রহে “সাধর্ম্যসম” প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইয়াছে এবং উত্তরবাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধকেই ঐ তাৎপর্যে “সাধর্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্যসম” প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। পরবর্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকারের মতে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাবই “সম” শব্দার্থ বা সাম্য। “শ্রায়দর্শন”কার জয়ন্ত ভট্টও এইরূপই বলিয়াছেন। বার্তিককার উদ্যোতকরও পরে “বিশেষহেতুভাবো বা সমার্থঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা

ভাষ্যকারের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, “সমীকরণার্থে প্রয়োগঃ সমঃ”। শৈবাচার্য্য ভাস্করজ্ঞও “শ্রায়সারে” বলিয়াছেন, “প্রযুক্তে হেতৌ সমীকরণাভিপ্রায়েণ প্রসঙ্গে জাতিঃ”। অর্থাৎ বাদী নিজ পক্ষের হেতু প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ বা হেতুকে নিজের পক্ষ বা হেতুর সহিত সমান করিবার উদ্দেশ্যেই “জাতি” প্রয়োগ করেন। যদিও তাহাতে বাদীর পক্ষ সমীকৃত হয় না, কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, প্রতিবাদী ঐ উদ্দেশ্যেই “জাতি” প্রয়োগ করেন; এই জন্তই প্রতিবাদীর সেই জাত্যন্তর “সাধর্ম্যাসম” প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের সহিত প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন বা জাত্যন্তরের বাস্তব সাম্য নাই। কিন্তু প্রতিবাদী ঐ সাম্যের অভিমান করেন বলিয়া আভিমানিক সাম্য আছে। বস্তুতঃ উভয় পক্ষে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যই সম অর্থাৎ তুল্য। তাই উদ্যোতকর পরে লিখিয়াছেন, “সাধর্ম্যমেব সমং বৈধর্ম্যমেব সমমিতি সমার্থঃ” ইত্যাদি। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “সাধর্ম্যমেব সমং যস্মিন্ প্রয়োগে ইতি শেষঃ”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর যে প্রয়োগে সাধর্ম্যই সম বা তুল্য, তাহাই “সাধর্ম্যাসম”। এইরূপ “বৈধর্ম্যমেব সমং যত্র প্রয়োগে” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে “বৈধর্ম্যাসম” প্রভৃতি শব্দও “সাধর্ম্যাসম” শব্দের শ্রায় বহুব্রীহি সমান, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বার্তিককারের তাৎপর্য্য, ব্যাখ্যা করিতে শেষে লিখিয়াছেন, “অথবা সাধর্ম্যমেব সমং যত্র স সাধর্ম্যাসমঃ”। কিন্তু তিনি প্রথমে নিজে স্বত্বার্থ ব্যাখ্যায় তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রয়োগ বা “জাতি” নামক অসদ্ব্তরই সাধর্ম্যাদি-প্রযুক্ত “সম” অর্থাৎ তুল্য এবং বাদীর প্রয়োগ বা নিজ পক্ষ স্থাপনের সহিত (ভাষ্যকারোক্ত) বিশেষ হেতুর অভাবই ঐ জাত্যন্তরের সমত্ব বা তুল্যতা, ইহাই বুঝা যায়।

কেহ কেহ বাদী ও প্রতিবাদীর (জাতিবাদীর) তুল্যতাই পূর্বোক্ত “সম”শব্দার্থ, ইহা বলিয়াছিলেন। উদ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জাতি অসদ্ব্তর, সূত্রাং জাতিবাদী প্রতিবাদী সর্বত্র অসদ্বাদীই হইয়া থাকেন। কিন্তু বাদী ঐরূপ নহেন। কারণ, তিনি সদ্বাদীও হইয়া থাকেন। তিনি সৎ হেতুর দ্বারা সৎপক্ষেরও স্থাপন করেন। সূত্রাং জাত্যন্তর স্থলে সাধর্ম্যাদিপ্রযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যে তুল্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। বাদী নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে সর্বত্রই সর্বপ্রকার “জাতি”র প্রয়োগ হইতে পারে, ইহাও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। উদ্যোতকর এখানে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, কোন বাদী যেখানে কোন বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত নিজ পক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে “উৎকর্ষসমা”, “অপকর্ষসমা”, “বর্ণ্যসমা”, “অবর্ণ্যসমা” ও “বিকল্পসমা” জাতির প্রয়োগ হইতে পারে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্যের মতে স্বব্যবাহতক উত্তরই জাতি, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহার মতে প্রতিবাদীর যে উত্তর বাদীর সাধনের শ্রায় নিজেরও ব্যাবাহতক হয়, (কারণ, তুল্যভাবে ঐ উত্তরকেও ঐরূপ অত্র জাত্যন্তর দ্বারা খণ্ডন করা যায়) সেই

১। অত্র চ সাধর্ম্যাদীনাম্ কার্য্যাস্তানাম্ হৃন্দে তৈঃ সমা ইত্যর্থঃ সাধর্ম্যসমাদয়শ্চতুর্বিংশতি জাতয় ইত্যর্থঃ।—বিশ্বনাথবৃত্তি

ৱাই “জাতি”। সূতৰাং বাদীৰ সাধন ও প্ৰতিবাদীৰ জাত্যন্তৰে যে, পূৰ্বোক্তৰূপ সাম্য, উহাই “সাধৰ্ম্ম্যসম” প্ৰভৃতি শব্দ “সম” শব্দৰ অৰ্থ। প্ৰতিবাদীৰ সেই সমস্ত জাত্যন্তৰ সাধৰ্ম্ম্যাদি প্ৰযুক্তই বাদীৰ সাধনেৰ “সম” হওগৈ “সাধৰ্ম্ম্যসম” প্ৰভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। অৰ্থাৎ তঁহাৰ মতে প্ৰতিবাদী কোন জাত্যন্তৰ কহিলে সৰ্বত্ৰ তু্যভাবে স্ত্ৰ জাত্যন্তৰেৰ দ্বাৰাও প্ৰতিবাদীৰ ঐ উত্তৰেৰ খণ্ডন কৰা যায়, এ জন্ত বাদীৰ সাধনেৰ ত্ৰায় প্ৰতিবাদীৰ উত্তৰও জাত্যন্তৰ ব্যাপ্ত হওয়ায় উহাই জাত্যন্তৰ স্থলে বাদীৰ সাধন ও প্ৰতিবাদীৰ উত্তৰেৰ সাম্য। “তাৰ্কিকৰক্ষা”কাৰ বৰদৰাজ শেষে উদয়নাচাৰ্য্যেৰ উক্তৰূপ মতেৰ বৰ্ণন কৰিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে সেখানে বাৰ্ত্তিক-কাৰ উদ্ভ্যাতকৰ ও তাৎপৰ্য্যটীকাকাৰ বাচস্পতি মিশ্ৰেৰ মত-ব্যাখ্যায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তঁহাৰ অনেক কথা এখন ঐ ভাবে বাৰ্ত্তিক ও তাৎপৰ্য্যটীকায় দেখিতে পাই না।

পূৰ্বোক্ত চতুৰ্ব্বিংশতি জাতিৰ বিশেষ লক্ষণ ও উদাহৰণাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকসম্প্ৰদায়েৰ বহু পূৰ্বাচাৰ্য্য বহু বিচাৰ কৰিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্যেৰ “প্ৰবোধ-সিদ্ধি” আছে উক্ত বিষয়ে সুবিস্তৃত স্ত্ৰ বিচাৰ তঁহাৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা ও চিন্তাশক্তিৰ পৰিচায়ক। ঐ গ্ৰন্থ “বোধসিদ্ধি” ও “ত্ৰায়গ বিশিষ্ট” এবং কেবল “পৰিশিষ্ট” নামেও কথিত হইয়াছে। “তাৰ্কিক-ৰক্ষা”কাৰ বৰদৰাজ উহাকে কেবল “পৰিশিষ্ট” নামেও উল্লেখ কৰিয়াছেন এবং তিনি ঐ গ্ৰন্থদ্বয়স্বৰূপেই জাতিতত্ত্বেৰ বিশদ ব্যাখ্যা কৰিয়া গিয়াছেন। পূৰ্বোক্ত জাতিতত্ত্ব এবং তদ্বিষয়ে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্যেৰ অপূৰ্ব চৰ্চ্চা বুঝিতে হইলে প্ৰথমে বৰদৰাজেৰ “তাৰ্কিকৰক্ষা” অবশ্য পাঠ্য। মহা-নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় “তত্ত্বচিন্তামণি” আছে পূৰ্বোক্ত জাতিতত্ত্বেৰ সবিশেষ নিৰূপণ কৰেন নাই। কিন্তু তঁহাৰ পুত্ৰ মহানৈয়ায়িক বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় “অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ” নামে ত্ৰায়তত্ত্বেৰ টীকা কৰিয়া, তাহাতে পূৰ্বোক্ত জাতিতত্ত্বেৰও সবিশেষ নিৰূপণ কৰিয়া গিয়াছেন এবং তিনি উদয়নাচাৰ্য্যেৰ “প্ৰবোধসিদ্ধি” গ্ৰন্থেৰও টীকা কৰিয়া, উক্ত বিষয়ে উদয়নেৰ মতেৰও ব্যাখ্যা কৰিয়া গিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়েৰ পূৰ্বে মহানৈয়ায়িক ভয়ন্ত ভট্টও ত্ৰায়মঞ্জৰী আছে মহৰ্গি গৌতমেৰ স্ত্ৰেৰ ব্যাখ্যা কৰিয়া জাতিৰ সবিশেষ নিৰূপণ কৰিয়া গিয়াছেন। তঁহাৰ অনেক পৰে মৈথিল মহামনীষী শঙ্কৰ মিশ্ৰ “বাদিবিমোদ” নামে অপূৰ্ব গ্ৰন্থ নিৰ্ম্মাণ কৰিয়া ত্ৰায়দৰ্শনোক্ত বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাৰ শাস্ত্ৰসমূহ প্ৰবৃত্তিক্ৰমে বিশদভাবে প্ৰদৰ্শনপূৰ্বক ত্ৰায়দৰ্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্ৰহস্থানেৰ লক্ষণাদি যথাক্ৰমে প্ৰকাশ কৰিয়া গিয়াছেন। শঙ্কৰ মিশ্ৰেৰ অনেক পৰে বাঙ্গালী নবানৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননও ত্ৰায়তত্ত্বেৰ নতি রচনা কৰিয়া, পূৰ্বোক্ত “জাতি” ও “নিগ্ৰহস্থানে”ৰ ব্যাখ্যা কৰিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনিও যে ত্ৰায়দৰ্শনেৰ ভাষ্যবাৰ্ত্তিকাদি সমস্ত প্ৰাচীন গ্ৰন্থ এবং উদয়নাচাৰ্য্যেৰ “প্ৰবোধসিদ্ধি” ও শঙ্কৰ মিশ্ৰেৰ “বাদিবিমোদ” প্ৰভৃতি গ্ৰন্থেৰও বিশেষৰূপ অনুশীলন কৰিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পাৰা যায়। শঙ্কৰ মিশ্ৰেৰ ত্ৰায় বিশ্বনাথও অনেক স্থলে জাতি ও নিগ্ৰহস্থানেৰ ব্যাখ্যায় উদয়নাচাৰ্য্যেৰ মত গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আৰও বহু গ্ৰন্থকাৰেৰ বিবিধ বিচাৰেৰ ফলে পূৰ্বোক্ত “জাতি”ৰ প্ৰকাৰ-ভেদ ও উদাহৰণাদি বিষয়ে প্ৰাচীন কাল হইতেই নানা মতভেদ হইয়াছে। সেই সমস্ত মতভেদেৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিজ্ঞান ও প্ৰকাশ এখন সম্ভব নহে। সংক্ষেপেও

তাঁহা প্রকাশ করা যায় না। মহামনীষী শঙ্কর মিশ্রও উক্ত জাতি বিষয়ে বহুসময় মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য মতানুসারে উহার বিস্তার বর্ণন করেন নাই, ইহা তিনি নিজেও শেষে বলিয়া গিয়াছেন^১।

বাংলায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের ত্রায় প্রাচীন কালে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণও গোতমের সূত্রানুসারে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদনুসারে শৈব নৈয়ায়িক ভাস্কর্য্যজও তাঁহার “ত্রায়সার”গ্রন্থের অনুমান পরিচ্ছদে গোতমের সূত্রের উল্লেখ করিয়া জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। “ত্রায়সার”র অষ্টাদশ টীকাকার সকলেই উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরিও “ষড়্দর্শনসমুচ্চয়” গ্রন্থে নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের “বসুভূক্তি”কার জৈন মহামনীষী মণিভদ্র সূরি বিশদভাবে ত্রায়দর্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং টীকাকার জৈন মহাদার্শনিক গুণরত্ন সূরি ঐ জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও নিজ মতানুসারে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ও বরদরাজ প্রভৃতি, বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের ব্যাখ্যাবিশেষেরও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহা বক্ত হইবে। এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই ত্রায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গোতমের ত্রায়দর্শনোক্ত সমস্ত পদার্থেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের নানা গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অষ্টমত বেদান্তাচার্য্য শ্রীহর্ষ মিশ্রের ‘খণ্ডনখণ্ডানা’ পাঠ করিলে পদে পদে তাঁহার মহানৈয়ায়িকত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় এবং গোতমোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানে পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশিষ্টাষ্টমতবাদী শ্রীবেদান্তাচার্য্য মহামনীষী বেকটনাথ “ত্রায়পরিণুক্তি” গ্রন্থে তাঁহার ত্রায়দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থের অনুমানাধ্যায়ে ত্রায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষরূপ ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা উক্ত বিষয়ে অনেক নূতন কথাও বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতিকে (১) “প্রতিপ্রমাণসমা” ও (২) “প্রতিতর্কসমা” এই নামদ্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়া তাঁহার যুক্তি অনুসারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহ্যভাষ্যে তাঁহার ঐ সমস্ত কথা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বিশেষ জিজ্ঞাসু সূরী তাঁহার ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রাচীন সংবাদ জানিতে পারিবেন।

বেকটনাথ “ত্রায়পরিণুক্তি” গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে যে “তত্ত্বরত্নাকর” ও “প্রজ্ঞাপরিজ্ঞান” নামে গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি যে বিষ্ণু মিশ্রের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থকারও যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান বিষয়ে বহু চর্চা ও বিচার করিয়াছিলেন, তাহা বেকটনাথের ঐ গ্রন্থ

১। বহুনাং সম্মতঃ পস্থা জাতীনামেষ দর্শিতঃ।

একদেশমন্তোনাসাং প্রপঞ্চো নৈব বর্ণিতঃ ॥—বাদিবিনোদ।

পাঠে বুঝিতে পারা যায়। কোন সম্প্রদায় গোতমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতি স্বীকার করিয়া চতুর্দশ জাতির সমর্থন করিয়াছিলেন। বেকটনাথের উক্ত “প্রজ্ঞাপরিজ্ঞান” গ্রন্থের বচনেও উক্ত মতের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। বেকটনাথ উক্ত বচনের অগ্ররূপ তাৎপর্য্য বলনা করিলেও উক্ত মত যে প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা আমরা উদ্যোতকের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। কারণ, পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শতাব্দির বার্ত্তিকে উদ্যোতকর উক্ত মতের উল্লেখ-পূর্ব্বক গোতমোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে কোন জাতিই যে নামভেদে পুনরুক্ত হয় নাই, অর্থ-ভেদ ও প্রয়োগভেদবশতঃ সমস্ত জাতিরই যে ভেদ আছে, ইহা সমর্থন করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদের কথা এই যে, প্রয়োগের ভেদবশতঃ জাতির ভেদ স্বীকার করিলে উহার অনন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উহা চতুর্বিংশতি প্রকারও বলা যায় না। এতদ্বারা উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, চতুর্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ করা হয় নাই। কিন্তু উদাহরণের ভেদবশতঃ এক প্রকার জাতিও অনেক প্রকারও হয়। যেমন একই “প্রকরণসমা” জাতি চতুর্বিধ হয়। পরন্তু যদি প্রয়োগভেদে ও উদাহরণ-ভেদে জাতির ভেদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে চতুর্দশ জাতিও ত বলা যায় না। তবে যদি কোন অংশে ভেদ থাকিলেও কোন অংশে ভেদও আছে বলিয়া চতুর্দশ জাতি বলা যায়, তাহা হইলে চতুর্গ শব্দোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি চতুর্বিধ জাতি যে ঐ শব্দোক্ত “বিকল্পসমা” জাতি হইত ভিন্ন নহে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, “বিকল্পসমা” জাতি হইতে “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির কোন অংশে ভেদও আছে; যথাস্থানে ইহা বুঝা যাইবে। উদ্যোতকরের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষই গোতমের জাতিবিভাগ অগ্রাহ্য করিয়া, চতুর্দশ প্রকার জাতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোতমোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি দশপ্রকার জাতির পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত জাতিরও অগ্র জাতি হইতে কোন অংশে ভেদ আছে বলিয়া মহর্ষি গোতম চতুর্বিংশতি প্রকার জাতি বলিয়াছেন। কিন্তু চতুর্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ তাঁহার বিবক্ষিত নহে। “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ জাতি অনন্তপ্রকার, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, একপ্রকার জাতির সহিত অন্য প্রকার জাতিরও সংকর হইতে পারে। সুতরাং ঐরূপ সংকীর্ণ জাতি অসংখ্যপ্রকার হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু অসংকীর্ণ জাতি অর্থাৎ যে জাতির সহিত অন্য জাতির সংকর বা নিয়ত সম্বন্ধ নাই, সেই সমস্ত জাতি চতুর্বিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষি গোতমের বিবক্ষিত। ষড়্ দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার

১। প্রজ্ঞাপরিজ্ঞানপুস্তক—“আনন্তোহপি চ জাতীনাম্ জাতয়ন্ত চতুর্দশ। উক্তান্তদপৃথগ্ভূতা বর্ণ্যাবর্ণ্যসমাদয়ঃ”।
—ইত্যাদি শাস্ত্রপরিবৃদ্ধি।

২। সত্যপ্যানস্তো জাতীনামসংকীর্ণোদাহরণবিবক্ষয়া চতুর্বিংশতিপ্রকারত্বমুপবর্ণিৎ, নতু তৎসংখ্যানিয়মঃ কৃত ইতি —শাস্ত্রমঞ্জরী।

গুণরত্ন স্মৃতিও ইহাই বলিয়াছেন'। “তত্ত্বরত্নাকর” গ্রন্থকারও বলিয়াছেন যে, চতুর্বিংশতি জাতির উল্লেখ কতকগুলি জাতির প্রদর্শনের জন্য। কারণ, মহর্ষি গৌতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে “অন্যদন্ত্যাত্মং” ইত্যাদি (২য় আ০, ৩১শ) সূত্রের দ্বারা অন্যপ্রকার জাতিরও সূচনা করিয়া গিয়াছেন। সূত্রাত্ম তাঁহার মতেও জাতি অনন্তপ্রকার।

পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির উদাহরণ প্রদর্শন না করিলে পূর্বোক্ত কোন কথাই বুঝা যায় না। উদাহরণ ব্যতীত কেবল মহর্ষি গৌতমের অতি দুর্কোষ কতিপয় সূত্রাবলম্বনে তাঁহার প্রদর্শিত জাতিতত্ত্বের অন্ধকারময় গুহায় প্রবেশও করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বাংস্যায়ন প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির বলে পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির উদাহরণ প্রদর্শনদ্বারা উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে আমরাও এখন পাঠকগণের বক্ষ্যমাণ জাতিতত্ত্ববোধের সহায়তার জন্য আবশ্যক বোধে এখানেই সংক্ষেপে পূর্বোক্ত “সাধর্ম্যসমা” প্রভৃতি চতুর্বিংশতি জাতির লক্ষণ ও উদাহরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

১। সাধর্ম্যসমা—(দ্বিতীয় সূত্রে)

সমান ধর্মকে সাধর্ম্য বলে। কোন বাদী কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ হেতু বা হেতুভাসের দ্বারা কোন ধর্ম্মোতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন একটা বিপরীত সাধর্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মোতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “সাধর্ম্যসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—“আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বং লোষ্টবৎ।” অর্থাৎ আত্মা সক্রিয়,—সেহেতু তাহাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। যে সকল পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে, সে সমস্ত পদার্থ ই সক্রিয়,—যেমন লোষ্ট। লোষ্ট্রে ক্রিয়ার কারণ গুণ সংযোগবিশেষ আছে,—এইরূপ আত্মাতেও ক্রিয়ার কারণ গুণ, প্রযত্ন বা অদৃষ্ট আছে। অতএব আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়। বাদী এইরূপে আত্মাতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্ত্ব) বশতঃ আত্মা সক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্য বিভূত্ববশতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয় হউক? আত্মাও আকাশের ন্যায় বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং আকাশ নিষ্ক্রিয়, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। সূত্রাত্ম আত্মাতে নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্য বিভূত্ব থাকায় আত্মা নিষ্ক্রিয় কেন হইবে না? আত্মা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর ভাষ্যকারের মতে “সাধর্ম্যসমা” জাতি। যদিও উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর

১। তদনুসৃত্তাবনবিষয়বিকল্পভেদেন জাতীনামানন্তেহপাসংকীর্ণোদাহরণবিবক্ষয়া চতুর্বিংশতি জাতিভেদা এতে প্রদর্শিতাঃ।—গুণঃস্বকৃত টীকা।

২। উক্তঞ্চ “তত্ত্বরত্নাকরে” অমুখ্যং জাতীনামানন্তাচ্চতুর্বিংশতিরসৌ প্রদর্শনার্থা। “অন্যদন্ত্যাত্মা” দিত্যাদিনা যাত্যন্তরসূচনাদিতি।—স্বায়মুগ্ধসিদ্ধি।

অভিন্নত বিভূত্ব হেতু আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সাধকই হয় ; কারণ, বিভূত্ব প্রমাণতাই নিষ্ক্রিয় হওয়ার বিভূত্ব ধর্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ; সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ হেতু দৃষ্ট নহে, কিন্তু বাদীর হেতুই দৃষ্ট। তথাপি উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর দোষ প্রদর্শন না করিয়া, ঐরূপ উত্তর করায় তাঁহার উক্তি-দোষপ্রযুক্ত ঐ উত্তরও সছত্তর নহে, ভাষ্যকারের মতে উহাও জাত্যন্তর। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

অথবা কোন বাদী বলিলেন, “শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্ঘটবৎ”। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা কার্য্য অর্থাৎ কারণজ্ঞাত। কারণজ্ঞাত পদার্থমাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট। শব্দও ঘটের ত্রায় কারণজ্ঞাত ; সুতরাং অনিত্য। বাদী এইরূপে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্য্যত্ব আছে, তদ্রূপ আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। কারণ, শব্দও আকাশের ত্রায় অমূর্ত্ত পদার্থ। সুতরাং শব্দও আকাশের ত্রায় নিত্য হউক ? অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হইবে, কিন্তু নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এখানে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “সাধর্ম্ম্যসমা” জাতি। আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব হেতুর দ্বারা বাদীর পূর্ব্বোক্ত হেতুতে “সৎপ্রতিপক্ষ” দোষের উদ্ভাবন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা অসহ্তর। কারণ, বাদীর প্রযুক্ত হেতু কার্য্যত্ব, তাঁহার সাধ্য ধর্ম্ম অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কারণ, যে যে পদার্থে কার্য্যত্ব বা কারণজ্ঞাতত্ব আছে, সে সমস্তই অনিত্য। কিন্তু প্রতিবাদীর অভিন্নত অমূর্ত্তত্ব হেতু নিত্যত্বের ব্যতিচারী। কারণ, অমূর্ত্ত পদার্থ মাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ ব্যতিচারী হেতু বাদীর সৎ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ায় উক্ত স্থলে প্রকৃত সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হইতে পারে না। বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুদ্বয় তুল্যবল না হইলে সেখানে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হয় না। তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। বৈধর্ম্ম্যসমা—(দ্বিতীয় সূত্রে)

বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে বৈধর্ম্ম্য বলে। অর্থাৎ যে পদার্থে যে ধর্ম্ম থাকে না, তাহা ঐ পদার্থের বৈধর্ম্ম্য। কোন বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু বা হেতুভাসের দ্বারা কোন ধর্ম্মাতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর দৃষ্টান্তপদার্থের কোন একটি বৈধর্ম্ম্য মাত্র দ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মাতে তাঁহার সেই সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “বৈধর্ম্ম্যসমা” জাতি। যেমন পূর্ব্ববৎ কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুশ্চণবস্ত্বাৎ লোষ্টবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ শূণ্য-বিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু আত্মা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ অর্থাৎ বিভূ। ঐ অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্ম লোষ্টে না থাকায় উহা লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য। সুতরাং আত্মাতে সক্রিয় লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য থাকায় আত্মা সক্রিয় হইতে পারে না। কারণ, সক্রিয় পদার্থের বৈধর্ম্ম্য থাকিলে তাহাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব স্বীকার্য্য।

অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয় হউক ? আত্মা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্যমাত্র দ্বারা আত্মাতে বাদীর সাধা ধর্ম্য সক্রিয়ত্বের অভাব নিষ্ক্রিয়ত্বের আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার ঐ উত্তর ভাষ্যকারের মতে “বৈধর্ম্যাসমা” জাতি। পূর্বোক্ত সাধর্ম্যাসমা জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বিভূত ধর্ম্যকে আকাশের সাধর্ম্যরূপে গ্রহণ করিয়া, সেই সাধর্ম্যদ্বারাই উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই “বৈধর্ম্যাসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী ঐ বিভূত ধর্ম্যকে বাদীর দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্ম্যরূপে গ্রহণ করিয়া, সেই বৈধর্ম্য দ্বারাই উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বিশেষ। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ভাষ্যকারের মতে ইহাও সহজ নহে, ইহাও জাত্যন্তর।

অথবা কোন বাদী পূর্ববৎ “শব্দোহনিত্যঃ কার্যাদ্ভাবটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব আছে, তদুপ উহার বৈধর্ম্য অমূর্তত্বও আছে। কারণ, শব্দ ঘটের ত্রায় মূর্ত পদার্থ নহে, কিন্তু অমূর্ত। সুতরাং যে অমূর্তত্ব ঘটে না থাকায় উহা ঘটের বৈধর্ম্য, তাহা শব্দে থাকায় শব্দ ঘটের ত্রায় অনিত্য হইতে পারে না। সুতরাং শব্দ নিত্য হউক ? শব্দ অনিত্য ঘটের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অনিত্য হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “বৈধর্ম্যাসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসহজ। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিমত হেতু অমূর্তত্ব অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য হইলেও উহা নিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈধর্ম্য নহে। কারণ, অমূর্ত পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর অভিমত ঐ ব্যভিচারী বা চুষ্ট হেতু বাদীর গৃহীত নির্দোষ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ায় প্রতিবাদী ঐ হেতুর দ্বারা বাদীর হেতুতে সংপ্রতিপক্ষ দোষ বলিতে পারেন না। তৃতীয় সূত্র দৃষ্টব্য।

৩। উৎকর্ষসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

বাদী কোন ধর্ম্যতে কোন হেতু বা হেতুভাসের দ্বারা তাঁহার সাধা ধর্ম্যের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুর দ্বারাই বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্যতে অবিদ্যমান কোন ধর্ম্যের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যাবস্থান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “উৎকর্ষসমা” জাতি। “উৎকর্ষ” বলিতে এখানে অবিদ্যমান ধর্ম্যের আরোপ। যেমন কোন বাদী পূর্ববৎ “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবৎ লোষ্টবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিলে যদি প্রতিবাদী বলেন যে, তাহা হইলে তোমার ঐ হেতু প্রযুক্ত আত্মা লোষ্টের ত্রায় স্পর্শবিশিষ্টও হউক ? যদি ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে বলিয়া আত্মা লোষ্টের ত্রায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে স্পর্শবিশিষ্টও কেন হইবে না ? আর যদি আত্মা লোষ্টের ত্রায় স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোষ্টের ত্রায় সক্রিয়ও হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত সাধা ধর্ম্য—তাঁহার দৃষ্টান্ত পদার্থের সর্বাংশই সমানধর্ম্য না হইলে উহা দৃষ্টান্ত বলা যায় না।

সুতরাং বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট্রে যে স্পর্শবস্তু ধর্ম আছে, তাহাও বাদীর সাধাধর্মী আত্মাতে থাকা আবশ্যক। কিন্তু আত্মাতে যে স্পর্শবস্তু ধর্ম বিদ্যমান নাই, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। প্রতিবাদী বাদীর উক্ত হেতুর দ্বারাই আত্মাতে ঐ অবিদ্যমান ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার ঐ উত্তর “উৎকর্ষসমা” জাতি। এইরূপ কোন বাদী পূর্ববৎ “শব্দেহনিত্যঃ কার্যাত্মাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে শব্দ ঘটের ত্রায় রূপবিশিষ্টও হউক? কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহা রূপবিশিষ্ট। যদি কার্যাত্মবশতঃ শব্দ ঘটের ত্রায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে ঘটের ত্রায় রূপবিশিষ্টও কেন হইবে না? বস্তুতঃ রূপবত্তা যে শব্দে নাই, উহা শব্দে অবিদ্যমান ধর্ম, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর ঐ হেতুর দ্বারাই শব্দে ঐ অবিদ্যমান ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার ঐ উত্তর “উৎকর্ষসমা” জাতি। ইহাও অসহ্যতর। কারণ, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তগত সমস্ত ধর্মই বাদীর গৃহীত সাধাধর্মী বা পক্ষে থাকে না, তাহা থাকা আবশ্যকও নহে। এবং কোন ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাও প্রতিবাদী সেই অবিদ্যমান ধর্মের আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু কার্যাত্ম রূপের ব্যভিচারী। কারণ, কার্য বা জন্য পদার্থদ্বয়েই রূপ নাই। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের ন্যায় রূপবত্তা দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতু রূপের ব্যাপ্য নহে। পক্ষম ও বর্ষ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪। অপকর্ষসমা—(চতুর্থ স্তম্ভে)

“অপকর্ষ” বলিতে এখানে বিদ্যমান ধর্মের অপলাপ বা উহার অভাবের আপত্তি। বাদী কোন ধর্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধা ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার গৃহীত ধর্মীতে বিদ্যমান ধর্মের অভাবের আপত্তি করিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধ বা উত্তরের নাম “অপকর্ষসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবদ্ভাৎ, লোষ্ট্রবৎ”—এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আপনার কথিত দৃষ্টান্ত যে লোষ্ট্র, তাহা অবিভূ অর্থাৎ সন্দব্যাপী পদার্থ নহে, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। সুতরাং আত্মাও ঐ লোষ্ট্রের ত্রায় অবিভূ হউক? ক্রিয়ার কারণগুণবত্তাবশতঃ আত্মা লোষ্ট্রের ত্রায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু লোষ্ট্রের ত্রায় পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। বস্তুতঃ আত্মাতে যে বিভূত্ব ধর্মই বিদ্যমান আছে, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবাদী আত্মাতে ঐ বিদ্যমান ধর্মের অভাবের (অবিভূত্বের) আপত্তি প্রকাশ করায়, তাঁহার উক্ত উত্তরের নাম “অপকর্ষসমা” জাতি। এইরূপ কোন বাদী “শব্দেহনিত্যঃ কার্যাত্মাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দ যদি কার্যাত্মবশতঃ ঘটের ত্রায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে উহা ঘটের ত্রায় শ্রবণেন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষের অবিসম্বাদ হউক? বস্তুতঃ ঘট শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বই বিদ্যমান ধর্ম। প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারাই শব্দে ঐ বিদ্যমান ধর্মের অভাবের আপত্তি

প্রকাশ করার তাঁহার ঐ উত্তর “অপকর্ষণমা” জাতি । পূর্বোক্ত বৃত্তিতে ইহাও অসম্ভব । পক্ষম ও বর্ষ স্ত্র জটব্য ।

৫ । বর্ণ্যসমা—(চতুর্থ স্ত্রে)

যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নিশ্চিত নহে, কিন্তু সন্দিক্ত, বাদী সেই পদার্থকে তাঁহার সাধ্যধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন । সুতরাং “বর্ণ্য” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সন্দিক্তসাধ্যক । উহা “পক্ষ” নামেও কথিত হইয়াছে । এবং যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নিশ্চিতই আছে, তদ্বিষয়ে কাহারই বিবাদ নাই, সেই পদার্থকে সপক্ষ বলে । এইরূপ পদার্থই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে । যেমন পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে আত্মাই সক্রিয়ত্বরূপে বর্ণ্য, সুতরাং আত্মাই পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত লোষ্ট্র সপক্ষ । এবং “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে শব্দই অনিত্যত্বরূপে বর্ণ্য, সুতরাং পক্ষ । দৃষ্টান্ত ঘটে সপক্ষ । কোন বাদী কোন হেতু এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন পক্ষে তাঁহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত সেই দৃষ্টান্তে বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিক্তসাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “বর্ণ্যসমা” জাতি । যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াতেতুগুণবত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে লোষ্ট্রও আত্মার ত্রায় বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিক্তসাধ্যক হউক ? এইরূপ কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ কার্গাত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঘটও শব্দের ত্রায় বর্ণ্য অর্থাৎ সন্দিক্তসাধ্যক হউক ? প্রতিবাদীর কথা এই যে, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সমানধর্মী হওয়া আবশ্যক । সুতরাং বাদীর পক্ষপদার্থের ধর্ম যে সন্দিক্তসাধ্যকত্ব, তাহা দৃষ্টান্ত পদার্থেও স্বীকার্য । পরন্তু বাদীর গৃহীত যে হেতু তাঁহার গৃহীত পক্ষপদার্থে আছে, সেই হেতুই তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্তপদার্থেও আছে । সুতরাং বাদীর সেই হেতুবশতঃ তাঁহার গৃহীত সেই দৃষ্টান্তপদার্থও তাঁহার গৃহীত পক্ষপদার্থের ত্রায় সন্দিক্তসাধ্যক কেন হইবে না ? কিন্তু তাহা হইলে আর উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । কারণ, সন্দিক্তসাধ্যক পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না । উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “বর্ণ্যসমা” জাতি । কিন্তু পূর্বোক্ত বৃত্তিতে ইহাও অসম্ভব । পক্ষম ও বর্ষ স্ত্র জটব্য ।

৬ । অবর্ণ্যসমা—(চতুর্থ স্ত্রে)

পূর্বোক্ত “বর্ণ্য”র বিপরীত “অবর্ণ্য” । সুতরাং “অবর্ণ্যসমা” জাতিকে পূর্বোক্ত “বর্ণ্যসমা” বিপরীত বলা যায় । অর্থাৎ তাহা সন্দিক্তসাধ্যক (বর্ণ্য) নহে, কিন্তু নিশ্চিতসাধ্যক, তাহা “অবর্ণ্য” । নিশ্চিতসাধ্যকত্বই “অবর্ণ্যত্ব” । উহা বাদীর গৃহীত পক্ষ থাকে না, দৃষ্টান্তে থাকে । কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত “অবর্ণ্যত্ব”র অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম “অবর্ণ্যসমা” জাতি । যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আত্মাও লোষ্ট্রের ত্রায় নিশ্চিতসাধ্যক হউক ? কারণ, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত

সমানধর্মী ইৎরা আবশ্যক। পরন্তু বাদীর গৃহীত যে হেতু দৃষ্টান্ত লোষ্ট্রে আছে, ঐ হেতুই তাহার গৃহীত পক্ষ আত্মাতেও আছে। সুতরাং ঐ হেতুবশতঃ ঐ পক্ষ আত্মাও ঐ দৃষ্টান্ত লোষ্ট্রের ন্যায় নিশ্চিতসাধ্যক কেন হইবে না? তাহা হইলে আর উহা পক্ষ হয় না। কারণ, যাহা সন্দেহ-সাধ্যক, তাহাই পক্ষ হয়। এইরূপ “শকোহ্নিত্যঃ কার্যত্বং ঘটবৎ,” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেও প্রতিবাদী যদি পূর্ববৎ বাদীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত “অবর্ণ্যমা” অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরও “অবর্ণ্যমা” জ্ঞাতি হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসম্ভব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৭। বিকল্পসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

বাদীর কথিত হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পদার্থে অন্য কোন ধর্মের বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত সেই হেতু পদার্থে অন্য কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুতে তাঁহার সাধা ধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে “বিকল্পসমা” জ্ঞাতি। যেমন কোন বাদী পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন কোন জব্য গুরু, যেমন লোষ্ট্র, এবং কোন জব্য লঘু, যেমন বায়ু, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন জব্য সক্রিয়, যেমন লোষ্ট্র এবং কোন জব্য নিষ্ক্রিয়, যেমন আত্মা, ইহা কেন হইবে না? ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইবেই যে সে জব্য সক্রিয় হইবে, নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। তাহা হইলে ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট বলিয়া লোষ্ট্রের ন্যায় বায়ু প্রভৃতিও গুরু কেন হয় না? সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট জব্যমাত্রই যে, একরূপই নহে, ইহা স্বীকার্য। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “বিকল্পসমা” জ্ঞাতি। “বিকল্প” শব্দের অর্থ বিবিধ প্রকার বা বৈচিত্র্য, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যভিচার। উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তপদার্থ লোষ্ট্রে তাঁহার হেতু ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা আছে। কিন্তু তাহাতে লঘুত্বধর্ম নাই। সুতরাং বাদীর ঐ হেতু ঐ স্থলে লঘুত্বধর্মের ব্যভিচারী। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ঐ লঘুত্বধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা বাদীর ঐ হেতুতে তাঁহার সাধা ধর্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারের সর্থনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসম্ভব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৮। সাধ্যসমা—(চতুর্থ সূত্রে)

“সাধ্য” শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যধর্মী। যে পদার্থ যেক্রমে পূর্বসিদ্ধ নহে, সেই পদার্থই সেইরূপে হেতু প্রভৃতি আয়ব প্রয়োগ করিয়া বাদী সাধন করেন। সুতরাং ঐ অর্থে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মীও বুঝা যায়। যেমন পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্যধর্মী। “শকোহ্নিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দ

সাধ্যধর্মী। কিন্তু যাহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়, তাহা পূর্বসিদ্ধিই থাকায় সাধ্য নহে। যেমন উক্ত স্থলে লোষ্ট্র সক্রিয়ত্বরূপে পূর্বসিদ্ধিই আছে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে পূর্বসিদ্ধিই আছে। লোষ্ট্র যে সক্রিয় এবং ঘট যে অনিত্য, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত। সুতরাং হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া উহা সাধন করা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই দৃষ্টান্তপদার্থেও সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তর “সাধ্যসমা” জ্ঞাতি। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, “যেমন লোষ্ট্র, সেইরূপ আত্মা” ইহা বলিলে লোষ্ট্রও আত্মার ত্রায় সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক? অর্থাৎ লোষ্ট্র যে সক্রিয়, এ বিষয়ে হেতু কি? তাহাও বলা আবশ্যক। এইরূপ “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, “যেমন ঘট, তদ্রূপ শব্দ” ইহা বলিলে ঘটও শব্দের ন্যায় সাধ্য হউক? অর্থাৎ ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে হেতু কি? তাহাও বলা আবশ্যক। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সমানধর্মী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার পক্ষের ন্যায় ঐরূপে সাধ্য হইলে উহা দৃষ্টান্তই হয় না। কারণ, সাধ্য পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্তাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর ঐ অনুমান হইতে পারে না। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “সাধ্যসমা” জ্ঞাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু প্রযুক্তই বাদীর পক্ষ, হেতু এবং দৃষ্টান্ত যাহা পূর্বসিদ্ধি, তাহাতেও সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে তাঁহার ঐ উত্তর “সাধ্যসমা” জ্ঞাতি। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসম্ভব। কারণ, ব্যাপ্তিশূন্য কেবল কোন সাধ্যার্থ দ্বারা কোন সাধ্যাসিদ্ধি বা আপত্তি হইতে পারে না। বাদীর পক্ষের কোন সাধ্যার্থমাত্র ঐ পক্ষের ন্যায় তাঁহার দৃষ্টান্তের সাধ্যত্বের সাধক হেতু হয় না। পরন্তু অনুমানের পক্ষগত সমস্ত ধর্মই দৃষ্টান্তে থাকে না। তাহা হইলে ঐ পক্ষ ও দৃষ্টান্ত অভিন্ন পদার্থই হওয়ার কুত্রাপি দৃষ্টান্ত সিদ্ধি হয় না। সর্বত্রই উক্ত যুক্তিতে দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইলে অনুমান মাত্রেরই উচ্ছেদ হয়। সুতরাং প্রতিবাদী নিজেরও কোন অনুমান প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় অসম্ভব। পক্ষম ও ঘট স্তত্র দ্রষ্টব্য

৯। প্রাপ্তিসমা—(সপ্তম স্কন্ধে)

“প্রাপ্তি” শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু ও সাধ্য ধর্মের প্রাপ্তিবশতঃ সাম্য সমর্থন করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম “প্রাপ্তিসমা” জ্ঞাতি। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু কি এই সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার সাধক হয় অথবা প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সাধক হয়। যদি বল, সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার সাধক হয়, তাহা হইলে ঐ হেতুর সহিত ঐ সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় ঐ হেতুর ন্যায় ঐ সাধ্যধর্মও যে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, উভয় পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে সেই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি ঐ হেতু ও সাধ্যধর্ম,

এই উভয় পদার্থই একত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ উভয়ের অবিশেষবশতঃ কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে ? ঐ সাধ্য ধর্মও ঐ হেতুর সাধক কেন হয় না ? কারণ, তাহাও ত ঐ হেতুর সহিত সম্বন্ধ । প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তিপক্ষ গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে প্রতিকূল তর্ক দ্বারা বাদীর হেতুর সাধকত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তর ভাষ্যকারের মতে “প্রাপ্তিসমা” জাতি । এইরূপ বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্যের কারণ বলিলে প্রতিবাদী যদি পূর্ববৎ বলেন যে, ঐ পদার্থ যদি ঐ কার্যকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার জনক হয়, তাহা হইলে ঐ কার্যও পূর্বে বিদ্যমান পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য । নচেৎ উহার সহিত ঐ কারণের প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইতে পারে না । কিন্তু যদি ঐ কার্য ঐ কারণের দ্বারা পূর্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আর ঐ পদার্থকে ঐ কার্যের জনক বলা যায় না । সুতরাং উহা কারণই হয় না । প্রতিবাদী এইরূপে প্রতিকূল তর্কের দ্বারা বাদীর কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তরও পূর্ববৎ “প্রাপ্তিসমা” জাতি হইবে । কিন্তু ইহাও অসম্ভব । কারণ, যাহা বস্তুতঃ বাদীর সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু, তাহা ঐ সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াও উহার সাধক হইতে পারে । ঐ হেতু ও সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে ঐ উভয়ের অবিশেষ হয় না । হেতু ও সাধ্যধর্মের যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে হেতুর দ্বারা সাধ্য ধর্মেরও সর্বত্র পূর্বসত্তা স্বীকার্য্য হয়, সেইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক এবং তাহা সর্বত্র সম্ভবও হয় না । এইরূপ যাহা বস্তুতঃ কারণ বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ, তাহাও কার্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও ঐ কার্যের জনক হয় । ঐ উভয়ের কার্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধ অংশই আছে । কিন্তু যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কারণের দ্বারা সেই কার্যেরও পূর্বসত্তা স্বীকার্য্য হয়, সেরূপ সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক । অষ্টম সূত্র দ্রষ্টব্য ।

১০ । অপ্রাপ্তিসমা—(সপ্তম সূত্রে)

বাদীর কথিত হেতু তাঁহার সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সাধক হয় এবং তাঁহার কথিত কারণও সেই কার্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার জনক হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুর সাধকত্ব এবং কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে, প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “অপ্রাপ্তিসমা” জাতি । যেমন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, প্রদীপ যেমন তাহার প্রকাশ পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার প্রকাশক হইতে পারে না, তদ্রূপ হেতুও তাহার সাধ্য পদার্থকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহার সাধক হইতে পারে না । কারণ, তাহা হইলে ঐ হেতু সেই সাধ্যধর্মের অভাবেরও সাধক হইতে পারে । তাহা হইলে আর উহার দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম সিদ্ধ হইতে পারে না । এইরূপ বহিঃ যেমন দাহ পদার্থকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার দাহ জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ কারণও কার্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জন্মাইতে পারে না । সুতরাং হেতু সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত না হইলে তাহা উহার সাধকই হয় না এবং কারণও কার্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহার কারণই হয় না । প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “অপ্রাপ্তিসমা” জাতি । পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসম্ভব । অষ্টম সূত্র দ্রষ্টব্য ।

১১। প্রসঙ্গসমা—(নবম সূত্রে)

প্রতিবাদী বাদীর কথিত দৃষ্টান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্ত-সিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করিলে, তাঁহার সেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে “প্রসঙ্গসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, লোষ্ট্র যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় ঐ দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। এইরূপ “শব্দোহনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় ঐ দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “প্রসঙ্গসমা” জাতি। উদয়নাচার্যের মতে প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই পদার্থত্রয়েই পূর্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, বাদী তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন, এবং বাদী তাহাতে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাতেও আবার প্রমাণ প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণ-পরম্পরা প্রশ্ন করিয়া যদি অনবস্থা-ভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “প্রসঙ্গসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, যেমন কেহ কোন দৃশ্য পদার্থ দেখিবার জন্য প্রদীপ গ্রহণ করিলে, সেই প্রদীপ দর্শনের জন্য আবার অন্য প্রদীপ গ্রহণ করে না, কারণ, অন্য প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ দেখা যায়; সুতরাং সেখানে প্রদীপ দর্শনের জন্য অন্য প্রদীপ গ্রহণ ব্যর্থ,—এইরূপ বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে আর প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। এইরূপ বাদীর হেতু এবং পক্ষও প্রমাণসিদ্ধ থাকায় তদ্বিষয়েও আর প্রমাণ প্রশ্ন আবশ্যক হয় না। কোন স্থলে আবশ্যক হইলেও সর্বত্রই প্রমাণপরম্পরা প্রদর্শন আবশ্যক হয় না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অনুমানেও তাঁহার বক্তব্য দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া দৃষ্টান্তাদির অসিদ্ধি বলা যাইবে; পূর্বোক্তরূপে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবনও করা যাইবে। সুতরাং তাঁহার পূর্বোক্তরূপ উত্তর স্বাভাবিক হওয়ায় উহা যে অসম্ভব, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য। দশম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা—(নবম সূত্রে)

যে পদার্থে বাদীর সাধ্যাধর্ম্য নাই, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টান্ত বা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী যদি ঐ প্রতিদৃষ্টান্তে বাদীর কথিত হেতুর সত্তা সমর্থন করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধ্যাধর্ম্য বা পক্ষ তাঁহার সাধ্যাধর্ম্যের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাষ্যকারের মতে “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতু-গুণবত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তারূপ যে হেতু, তাহা ত আকাশেও আছে। কারণ, বৃক্ষের সহিত বায়ুর সংযোগ বৃক্ষের ক্রিয়ার কারণ গুণ। ঐ বায়ুর সংযোগ আকাশেও আছে। সুতরাং আত্মা আকাশের গ্রাস নিষ্ক্রিয় হউক? ক্রিয়ার

কারণ গুণবস্তাবশতঃ আত্মা যদি লোষ্টের ত্রায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে ঐ হেতুবশতঃ আত্মা আকাশের ত্রায় নিষ্ক্রিয় হইবে না কেন ? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতি। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত আকাশরূপ দৃষ্টান্তই প্রতিদৃষ্টান্ত। উহাতে বাদীর কথিত হেতুর সত্তা সমর্থনপূর্ব্বক তদ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্মা আত্মাতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের অভাব নিষ্ক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধ অথবা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। এইরূপ কোন বাদী “শকোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্য্যত্ববশতঃ শব্দ যদি ঘটের ত্রায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের ত্রায় নিত্যও হউক ? কারণ, আকাশেও কার্য্যত্ব হেতু আছে। কূপ খনন করিলে তন্মধ্যে আকাশও জন্মে। সুতরাং আকাশও কার্য্য বা জন্তু পদার্থ। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তরও “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসহজতর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্তে বস্তুতঃ নাই। সুতরাং প্রকৃত হেতুশূন্য কেবল ঐ প্রতিদৃষ্টান্ত উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর সাধ্যসাধক হয় না। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী যদি হেতু সাধ্যসাধন মতে, কিন্তু দৃষ্টান্তই সাধ্যসাধন, ইহা মনে করিয়া, কেবল প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারাই বাদীর সাধ্য ধর্ম্মাতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই উত্তরের নাম “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসহজতর। একাদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৩। অনুৎপত্তিসমা—(দ্বাদশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্য অনিত্যত্ব ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি অনুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া, বাদীর ঐ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার সেই উত্তর “অনুৎপত্তিসমা” জাতি। উৎপত্তির পূর্বে উহার যে অভাব থাকে, তাহাই এখানে অনুৎপত্তি। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—“শকোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ” অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নের অনন্তর উৎপন্ন হয়, যেমন ঘট। এখানে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে ত ঐ হেতু নাই। সুতরাং তখন শব্দ অনিত্যত্ব-সাধক হেতু না থাকায় সেই শব্দ নিত্য হউক ? নিত্য হইলে আর উহাতে উৎপত্তি-ধর্ম্ম নাই, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং বাদীর কথিত ঐ হেতু (প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি) শব্দে অসিদ্ধ হওয়ায় উহা শব্দ অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “অনুৎপত্তিসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসহজতর। কারণ, শব্দের উৎপত্তি হইলেই তাহার সত্তা সিদ্ধ হয়। তখন ইহাতেই উহা শব্দ। তৎপূর্বে উহার সত্তাই নাই। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে অনুৎপন্ন শব্দে বাদীর ঐ হেতু নাই, অতএব তখন ঐ শব্দ নিত্য, এই কথা বলাই যায় না। পরন্তু প্রতিবাদী ঐ কথা বলিয়া শব্দের উৎপত্তি স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং শব্দের অমিত্যত্বও তাঁহার স্বীকৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৪। সংশয়সমা—(চতুর্দশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়া, সেই পদার্থে বাদীর সেই সাধ্যধর্ম বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর “সংশয়সমা” জাতি। যেমন কোন বাদী বলিলেন, “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজ্ঞাত্বাৎ ঘটবৎ”। এখানে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্য ঘটের সাধ্যা প্রযত্নজ্ঞাত্ব শব্দে আছে বলিয়া শব্দে যদি অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? ঐরূপ সংশয়েরও ত কারণ আছে? কারণ, শব্দ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তদ্রূপ ঘট এবং তদগত ঘট জাতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঘট জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ ঘট জাতি নিত্য, ইহা বাদীও স্বীকার করেন। সুতরাং নিত্য ঘট জাতি এবং অনিত্য ঘটের সাধ্যা বা সমান ধর্ম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা শব্দে বিদ্যমান থাকায় উহার জ্ঞানজ্ঞাত্ব শব্দ কি ঘট জাতির ত্রায় নিত্য? অথবা ঘটের ত্রায় অনিত্য? এইরূপ সংশয় অবশ্যই হইবে। কারণ, সমানধর্মজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের কারণ। সুতরাং কারণ থাকায় উক্তরূপ সংশয় অবশ্যস্তাবী। সংশয়ের কারণ থাকিলেও যদি সংশয় না হয়, তাহা হইলে বাদীর অভিযত নিশ্চয়ের কারণ থাকিলেও নিশ্চয় হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “সংশয়সমা” জাতি। উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিয়া বাদীর হেতুতে সংপ্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, বিশেষ ধর্ম-নিশ্চয় হইলে সমানধর্মজ্ঞান সংশয়ের কারণ হয় না, ইহা স্বীকার্য। নচেৎ সমানধর্মজ্ঞান স্থলে সর্বত্র সর্বদাই সংশয় জন্মিবে। কোন দিনই ঐ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দে বাদীর কথিত হেতু প্রযত্নজ্ঞাত্ব সিদ্ধ থাকায় তদ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়বশতঃ তাহাতে উক্তরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ, বিশেষ ধর্মনিশ্চয় সংশয়ের প্রতিবন্ধক, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। পঞ্চদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রকরণসমা—(ষোড়শ সূত্রে)

যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নাম “প্রকরণ”। বাদীর যাহা পক্ষ, প্রতিবাদীর তাহা প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, বাদীর তাহা প্রতিপক্ষ। বাদী প্রথমে কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্মরূপ পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উভয় পদার্থের সাধ্যা বা বৈধর্ম্যরূপ অস্ত্র হেতুর দ্বারা বাদীর সেই সাধ্যধর্মের অভাবরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন, এবং উভয়েই সেই হেতুদ্বয়কে তুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াই নিজ সাধ্যানির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপরের সাধ্যধর্মকে বাধিত বলিয়া প্রতিবেদ করেন, তাহা হইলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সেই উভয়েই “প্রকরণসমা” জাতি। যেমন প্রথমে কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজ্ঞাত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রযত্নজ্ঞাত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন

করিলে পরে প্রতিবাদী “শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রাবণত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে বাদীর সাধ্যধর্ম্য অনিত্যত্বের অভাব নিত্যত্বের সংস্থাপনপূর্বক যদি বলেন যে, শব্দের গ্রাণ তদগত শব্দত্ব নামক জাতিও “শ্রাবণ” অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উহা নিত্য পদার্থ, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। সুতরাং ঐ শব্দত্ব জাতিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রাবণত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্বই সিদ্ধ আছে। অতএব আর উহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনিত্যত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, শব্দ যে অনিত্যত্ব বাধিত অর্থাৎ অনিত্যত্ব নাই, ইহা নিশ্চিতই আছে। উক্ত স্থলে পরে বাদীও প্রতিবাদীর গ্রাণ যদি বলেন যে, শব্দ যে প্রযত্নজন্য এবং প্রযত্নজন্যত্ব হেতু যে অনিত্যত্বের সাধক, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। কারণ, প্রতিবাদী উহার খণ্ডন বা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং ঐ প্রযত্নজন্যত্ব হেতুর দ্বারা পূর্বে শব্দে অনিত্যত্বই সিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারা উহাতে নিত্যত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, শব্দ যে নিত্যত্ব বাধিত, অর্থাৎ নিত্যত্ব নাই, ইহা পূর্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই উত্তর “প্রকরণসমা” জাতি ; কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই নিজ হেতুর অধিক বলশালিত্ব প্রতিপন্ন না করায় অপরের হেতুর সহিত নিজ হেতুর তুল্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কেহই নিজ হেতুর দ্বারা অপর পক্ষের বাধ নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আভিমানিক বাধ নির্ণয় প্রকৃত বাধনির্ণয় নহে। সপ্তদশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৬। অহেতুসমা—(অষ্টাদশ সূত্রে)

বাদী কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্যের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু এই সাধ্যধর্ম্যের পূর্বে থাকিয়া উহার সাধন হয় না। কারণ, তখন এই সাধ্যধর্ম্য না থাকায় কাহার সাধন হইবে ? এবং এই হেতু এই সাধ্যধর্ম্যের পরে থাকিয়াও উহার সাধন হয় না। কারণ, পূর্বে হেতু না থাকিলে ইহা কাহার সাধ্য হইবে ? যাহা সাধ্যধর্ম্যের পূর্বে নাই, তাহা সাধন হইতে পারে না। এবং এই হেতু যুগপৎ অর্থাৎ এই সাধ্যধর্ম্যের সহিত একই সময়ে বিদ্যমান থাকিয়াও উহার সাধন হয় না। কারণ, উভয় পদার্থই সমকালে বিদ্যমান থাকিলে কে কাহার সাধন অথবা সাধ্য হইবে ? উভয়েই উভয়ের সাধ্য ও সাধন কেন হয় না ? সুতরাং এই হেতু যখন পূর্বোক্ত কালক্রমেই সাধ্য সাধন হইতে পারে না, তখন উহা হেতুই হয় না, উহা অহেতু। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম “অহেতুসমা” জাতি। এবং বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্যের কারণ বলিলে, প্রতিবাদী যদি পূর্বোক্তরূপে কোন কালেই উহা সেই কার্যের কারণ হইতে পারে না, সুতরাং উহা কারণই নহে, ইহা সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরও “অহেতুসমা” জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি এবং কারণ দ্বারা কার্যোৎপত্তি প্রতিবাদীরও স্বীকার্য। নচেৎ তিনিও কোন পক্ষ স্থাপন এবং কোন কার্যে কোন পদার্থকে কারণ বলিতে পারেন না। সর্বত্রই তাঁহার গ্রাণ উক্তরূপ প্রতিবেদ করিলে তাঁহাকে নীরবই থাকিতে হইবে। ১৯শ ও ২০শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৭। অর্থাপত্তি-সমা—(একবিংশ স্কো)

কেহ কোন বাক্যবিশেষ বলিলে, ঐ বাক্যের অর্থতঃ যে অনুক্ত অর্থবিশেষের যথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি এবং সেই বোধের যাহা কারণ, তাহাকে বলে অর্থাপত্তিপ্ৰমাণ। মহর্ষি গোতমের মতে উহা অনুমান-প্ৰমাণেরই অন্তর্গত, অতিরিক্ত কোন প্ৰমাণ নহে। যেমন কেহ যদি বলেন যে, দেবদত্ত জীবিত আছেন, কিন্তু গৃহে নাই। তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্ত বাহিরে আছেন, ইহা বুঝা যায়। কারণ, দেবদত্তের বাহিরে সস্তা ব্যতীত তাঁহার জীবিতত্ব ও গৃহে অসম্ভার উপপত্তি হয় না। কিন্তু উক্ত বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্তের পুত্র গৃহে আছেন, ইহা বুঝা যায় না। কেহ ঐরূপ বুঝিলে তাহা প্রকৃত অর্থাপত্তি নহে, এবং ঐরূপ বোধের যাহা সাধন, তাহাও অর্থাপত্তি-প্ৰমাণ নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্ত্যভাস। কোন বাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ অর্থাপত্ত্যভাসের দ্বারা বাদীর বাক্যের অনভিমত তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া, বিপরীত পক্ষের অর্থতঃ বাদীর সাধ্য ধর্ম্মোতে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের সমর্থনপূর্ব্বক বাদীর অনুমানে বাধ-দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “অর্থাপত্তি-সমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযুক্তজ্ঞত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্তজ্ঞত্ব-প্রযুক্ত শব্দ ঘটের জ্ঞান অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে বুঝিলাম, নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতা-প্রযুক্ত শব্দ আকাশের জ্ঞান নিত্য। কারণ, আপনাতঃ ঐ বাক্যের অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়। সুতরাং আপনি শব্দের নিত্যত্ব স্বীকারই করায় শব্দে অনিত্যত্ব যে বাধিত অর্থতঃ অনিত্যত্ব নাই, ইহা স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং আপনি কোন হেতুর দ্বারাই শব্দে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “অর্থাপত্তিসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসঙ্গত। কারণ, বাদী উক্ত বাক্য বলিলে তাহার অর্থতঃ প্রতিবাদীর কথিত ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। পরন্তু প্রতিবাদী ঐরূপ বলিলে বাদীও প্রতিবাদীর বাক্যের অর্থতঃ তাঁহার বিপরীত পক্ষ বুঝা যায়, ইহা বলিতে পারেন। কারণ, বাদীর কথিতরূপ অর্থাপত্তি উভয় পক্ষেই তুল্য। পরন্তু প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা তাঁহার পক্ষ সিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিবেন, সেই বাক্যের অর্থতঃ তাঁহার পক্ষ অসিদ্ধ, ইহাও বুঝা যায় বলিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? সুতরাং তাঁহার ঐরূপ উত্তর স্বব্যবাহতক বলিয়াও উহা অসঙ্গত। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদী “শব্দ অনিত্য” এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ ভিন্ন সমস্তই নিত্য। এবং বাদী “শব্দ অনুমানপ্রযুক্ত অনিত্য”, ইহা বলিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য। কারণ, অর্থাপত্তির দ্বারা ঐরূপ বুঝা যায়। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃতই হওয়ায় উহাতে অনিত্যত্ব বাধিত, ইহা বাদীর স্বীকার্য্য। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরও “অর্থাপত্তিসমা” জাতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসঙ্গত। ২২শ স্কো দ্রষ্টব্য।

১৮। অবিশেষ-সমা—(ত্রয়োবিংশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে কোন দৃষ্টান্তের সাধার্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধার্ম্য সত্তা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম “অবিশেষ-সমা” জ্ঞাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রবলজ্ঞাত্বাৎ ষট্‌বৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ষট্‌ ও শব্দে প্রবলজ্ঞাত্বরূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া যদি শব্দ ও ষটের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি এক ধর্ম থাকায় সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক? তাহা কেন হইবে না? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “অবিশেষ-সমা” জ্ঞাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী যদি সকল পদার্থের একত্বরূপ অবিশেষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুমানের পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তাদির ভেদ না থাকায় তিনি উক্ত অনুমানই করিতে পারেন না। আর যদি তিনি সকল পদার্থের একধর্মবত্তা বা একজাতীয়ত্বরূপ অবিশেষই স্বীকার করেন, তাহা হইলে পদার্থের নিত্যানিত্য বিভাগ থাকে না। অর্থাৎ সকল পদার্থই নিত্য অথবা সকল পদার্থই অনিত্য, ইহার এক পক্ষই স্বীকার্য। সকল পদার্থই নিত্য, ইহা স্বীকার করিলে শব্দের নিত্যত্বও স্বীকৃত হওয়ায় আর তাহাতে অনিত্যত্ব সাধন করা যায় না। সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা স্বীকার করিলে বিশেষতঃ শব্দে অনিত্যত্বের সাধন ব্যর্থ হয়। উক্ত স্থলে এইরূপে বাদীর অনুমানে নানা দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের যে অবিশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সাধক কোন হেতু নাই। সত্তা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ঐরূপ অবিশেষের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধার্ম্য নহে। সুতরাং তদ্বারা সকল পদার্থের একত্ব বা একজাতীয়ত্ব প্রভৃতি কোন অবিশেষ দিষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু প্রতিবাদী সকল পদার্থেই অবিশেষের অনুমান করিতে গেলে দৃষ্টান্তের অভাবে তাঁহার ঐ অনুমান হইতে পারে না। কারণ, সকল পদার্থ সাধ্যধর্ম্মা বা পক্ষ হইলে উহার অন্তর্গত কোন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পরন্তু প্রতিবাদী যদি উহার অন্তর্গত ষটাদি কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই সকল পদার্থে অনিত্যত্বরূপ অবিশেষই সাধন করেন, তাহা হইলে শব্দের অনিত্যত্ব তাঁহার স্বীকৃতই হওয়ায় তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারেন না। সুতরাং তাহার উক্তরূপ উত্তর ব্যর্থ এবং স্বব্যবহৃতক হওয়ায় উহা অসম্ভব। ২৪শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৯। উপপত্তিসমা—(পঞ্চবিংশ সূত্রে)

বাদীর পক্ষ এবং প্রতিবাদীর পক্ষ, এই উভয় পক্ষে হেতুর সত্তাই এখানে “উপপত্তি” শব্দের দ্বারা অভিযত। বাদী প্রথমে তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু প্রদর্শন করিয়া, নিজ পক্ষের আপত্তি প্রকাশ করিয়া দোষোদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “উপপত্তিসমা” জ্ঞাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ

প্রযত্নজ্ঞানং ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রযত্নজ্ঞান হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্যত্বের সাধক প্রযত্নজ্ঞান হেতু আছে, তদ্রূপ নিত্যত্বের সাধক স্পর্শশূন্যত্বকণ হেতুও আছে। সুতরাং ঐ স্পর্শশূন্যতা-প্রযুক্ত গগনের জ্ঞান শব্দ নিত্যও হউক? উভয় পক্ষেই যখন হেতু আছে, তখন শব্দে অনিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না, ইহা কখনই বলা যায় না। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে “উপপত্তিসমা” জাতি। পূর্বোক্ত “সাধর্ম্যসমা” ও “প্রকরণসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনোদ্দেশ্যে তাঁহার হেতুকে দৃষ্ট বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই “উপপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্বীকার করিয়াই তদদৃষ্টান্তে অত্র হেতুর দ্বারা নিজ পক্ষেরও সমর্থন করেন। তদ্বারা পরে প্রতিবাদীর পক্ষের অসিদ্ধি সমর্থনই তাঁহার উদ্দেশ্য। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী মনে করেন যে, শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য হইলে বাদী আর উদ্ভাও অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, প্রতিবাদী যখন বাদীর কথিত প্রযত্নজ্ঞান হেতুকে শব্দে অনিত্যত্বের সাধক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকারই করিয়াছেন। শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে তাহাতে আর নিত্যত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, উহা একাধারে থাকে না। পরন্তু প্রতিবাদী যে স্পর্শশূন্যত্বক শব্দে নিত্যত্বের সাধক হেতু বলিয়াছেন, তাহাও নিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, রূপরসাদি অনিত্য গুণ এবং গমনাদি ক্রিয়াতেও স্পর্শশূন্যতা আছে। কিন্তু তাহাতে নিত্যত্ব না থাকায় স্পর্শশূন্যতা নিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম নহে; উহা নিত্যত্বের ব্যভিচারী। অর্থাৎ স্পর্শশূন্য পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং শব্দে নিত্যসাধক হেতুও আছে, ইহাও প্রতিবাদী বলিতে পারেন না। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে “উপপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী তাঁহার নিজ পক্ষের সাধক কোন হেতু বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু আমার পক্ষেও অবশ্য কোন হেতু বা প্রমাণ আছে, ইহা সমর্থন করেন। অর্থাৎ আমার পক্ষও সমগ্রমাণ, যেহেতু উহা বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষের অন্তর্গত একতর পক্ষ—যেমন বাদীর পক্ষ, ইত্যাদি প্রকারে বাদীর পক্ষকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমানদ্বারা প্রতিবাদী নিজপক্ষের সমগ্রমাণত্ব সাধনপূর্বক বাদীর অনুমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অসম্ভব। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর পক্ষকে সমগ্রমাণ বলিয়া স্বীকারই করায় তিনি আর কোনরূপেই বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিতে পারেন না।

২৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২০। উপলব্ধিসমা—(সপ্তবিংশ সূত্রে)

বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও কোন পদার্থে তাঁহার সাধ্য ধর্মের উপলব্ধি হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সমর্থন করিলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম “উপলব্ধিসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজ্ঞানং ঘটবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতি-

বাদী যদি বলেন যে, প্রবল বায়ুর আঘাতে বৃক্ষের শাখাভঙ্গ্য যে শব্দ জন্মে, তাহা ত কাহারও প্রযত্নজ্ঞাত নহে। সুতরাং তাহাতে বাদীর কথিত হেতু প্রত্নজ্ঞাত নাই। কিন্তু তথাপি তাহাতে বাদীর সাধ্য ধর্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয়। সুতরাং প্রত্নজ্ঞাত, শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “উপলব্ধিসমা” জ্ঞাতি। কিন্তু ইহাও অসহজ। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে প্রযত্নজ্ঞাতকে হেতু বলিয়া শব্দ যে কারণজ্ঞাত, ইহাই বলিয়াছেন। শব্দমাত্রই প্রযত্নরূপ কারণজ্ঞাত, ইহা তিনি বলেন নাই। বৃক্ষের শাখাভঙ্গ্য শব্দও অজ্ঞ কারণজ্ঞাত। সুতরাং তাহাও অনিত্য। ঐ শব্দ প্রযত্নজ্ঞাত না হইলেও প্রযত্নজ্ঞাত হেতু শব্দের অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ত পদার্থ প্রযত্নজ্ঞাত, সে সমস্তই অনিত্য, এইরূপ নিয়মে কুত্রাপি ব্যতিরিক্ত নাই। সুতরাং উক্ত নিয়ম বা ব্যাপ্তি অনুসারেই বাদী শব্দে অনিত্যত্বের সাধন করিতে প্রযত্নজ্ঞাতকে হেতু বলিতে পারেন। পরন্তু শব্দমাত্রই প্রযত্নজ্ঞাত না থাকিলেও বর্ণাত্মক শব্দে উহা আছে। বাদী তাহাতেই ঐ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিয়াছেন। সুতরাং বাদীর ঐ হেতু তাঁহার পক্ষে অংশতঃ অসিদ্ধও নহে। ২৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদী তাঁহার বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্দ প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর অবধারণবিশেষে তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া, বাদীর অনুমানে বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম “উপলব্ধিসমা” জ্ঞাতি। যেমন কোন বাদী “পর্কতো বহিমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল পর্কতেই বহি আছে? অথবা পর্কতে কেবল বহিই আছে? কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। কারণ, পর্কত ভিন্ন পদার্থেও বহি আছে এবং পর্কতে বহিভিন্ন পদার্থও আছে। এইরূপ বাদী ঐ স্থলে “ধূমাৎ” এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্কতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্কত-মাত্রই ধূম আছে? কিন্তু ইহার কোন পক্ষই বলা যায় না। প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে পূর্বোক্তরূপে তাঁহার অবধারণ-তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া সকল পক্ষেরই খণ্ডন করিলে তাঁহার ঐ উত্তর “উপলব্ধিসমা” জ্ঞাতি। কিন্তু ইহাও অসহজ। কারণ, বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে ঐরূপ কোন অবধারণ তাৎপর্য্য নাই। তাহা হইলে তিনি “পর্কত এব বহিমান্” ইত্যাদি প্রকার বাক্যই বলিতেন। বাদীর তাৎপর্য্যানুসারে তাঁহার ঐ অনুমানে কোন দোষ নাই। পরন্তু প্রতিবাদী উক্তরূপ বাদীর অবভিমত তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে তাঁহার বাক্যও উক্তরূপে তাৎপর্য্যকল্পনা করিয়া সকল পক্ষেরই খণ্ডন করা যায়। যথাস্থানে ইহা ব্যক্ত হইবে।

২১। অনুপলব্ধিসমা—(উনত্রিংশ সূত্রে)

উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি। যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহার সম্ভা স্বীকার্য্য। উপলব্ধি না হইলে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত তাহার সম্ভা স্বীকার্য্য। বাদী অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত কোন পদার্থের

অসম্ভা সমর্থন করিলে প্রতিবাদী যদি সেই অনুপলক্ষিতও অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত সেই পদার্থের সত্তা সমর্থন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “অনুপলক্ষিসমা” জাতি। যেমন শব্দনিত্যতা-বাদী মীমাংসক প্রথমে শব্দের নিত্যত্ব পক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও তাহার উপলক্ষি (শ্রবণ) হউক ? কারণ, আপনার মতে তখনও ত শব্দ বিদ্যমান আছে। এতদ্বত্তরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, হাঁ, তখনও শব্দ বিদ্যমান আছে ও চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু বিদ্যমান থাকিলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে মেঘাচ্ছন্ন দিনে অথবা রাত্রিতে সূর্য্যদেব বিদ্যমান থাকিলেও তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? যদি বলেন যে, তখন মেঘাদি আবরণবশতঃই তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণ আছে বলিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এতদ্বত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, সূর্য্যদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপ্রতি-বন্ধক মেঘাদি আবরণের উপলক্ষি হওয়ায় উহা স্বীকার্য্য। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণেরই ত উপলক্ষি হয় না। সুতরাং অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত উহা নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। তখন বাদী মীমাংসক ইহার সঙ্গত করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণের অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত যদি তাহার অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই অনুপলক্ষিতও অনুপলক্ষিত-প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হইবে। কারণ, সেই অনুপলক্ষিতও ত উপলক্ষি হয় না। অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত উহার অভাব সিদ্ধ হইলে উহার উপলক্ষিই সিদ্ধ হইবে। কারণ, অনুপলক্ষিত অভাব উপলক্ষি-স্বরূপ। আবরণের উপলক্ষি সিদ্ধ হইলে তৎপ্রযুক্ত আবরণের সত্তাই স্বীকার্য্য। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা ত আর বলা যাইবে না। এইরূপ উচ্চারণের পূর্বে অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও মীমাংসক যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের যে অনুপলক্ষি বলিতেছেন; সেই অনুপলক্ষিতও ত উপলক্ষি হয় না। সুতরাং অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত সেই অনুপলক্ষিত অভাব যে উপলক্ষি, তাহা সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বে শব্দের সত্তাই সিদ্ধ হয়। মীমাংসকের উক্তরূপ উত্তর “অনুপলক্ষিসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসঙ্গত। কারণ, উপলক্ষিত অভাবই অনুপলক্ষি। সুতরাং উহা অভাব বা অসৎ বলিয়া উপলক্ষিত যোগ্য পদার্থই নহে। কারণ, যে পদার্থে অস্তিত্ব বা সত্তা আছে, তাহারই উপলক্ষি হয়। যাহা অভাব বা অসৎ, তাহাতে সত্তা না থাকায় তাহার উপলক্ষি হইতেই পারে না। যিনি অনুপলক্ষিত উপলক্ষি হয় না বলিবেন, তিনি উহা সমর্থন করিতে এই কথাই বলিবেন। নচেৎ অনুপলক্ষিত উপলক্ষি কেন হয় না ? এ বিষয়ে তিনি আর কোন যুক্তি বলিতে পারেন না। কিন্তু যদি অভাবাত্মক বলিয়া অনুপলক্ষি উপলক্ষিত যোগ্যই নহে, ইহাই তিনি বলেন, তাহা হইলে অনুপলক্ষিতপ্রযুক্ত ঐ অনুপলক্ষিত অভাব (উপলক্ষি) সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহা উপলক্ষিত যোগ্য পদার্থ, তাহারই অনুপলক্ষিত দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ উচ্চারণের পূর্বে শব্দের এবং তাহার কোন আবরণের যে অনুপলক্ষি, তাহারও উপলক্ষিই হইয়া থাকে। আমি শব্দ এবং উহার কোন আবরণের উপলক্ষি বলিতেছি না, এইরূপে ঐ অনুপলক্ষি মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অর্থাৎ মনের দ্বারা

উপলব্ধির গ্রায় উহার অভাব যে অনুপলব্ধি, তাহারও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে শব্দ এবং উহার আবরণের অনুপলব্ধির উপলব্ধি হওয়ায় উহার অনুপলব্ধিই অসিদ্ধ। অতএব মীমাংসকের উক্ত উত্তর অমূলক। ৩০শ ও ৩১শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২২। অনিত্যসমা—(দ্বাবিংশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধর্ম্য অথবা কোন বৈধর্ম্য গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “অনিত্যসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজন্তুত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দ ও ঘটের সাধর্ম্য প্রযত্নজন্তুত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ যদি ঘটের গ্রায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থ ই ঘটের গ্রায় অনিত্য হউক? কারণ, ঘটের সহিত সকল পদার্থেরই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্য আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “অনিত্যসমা” জাতি। পূর্বোক্ত “অবিশেষসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিই প্রকাশ করেন। কিন্তু “অনিত্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে বিশেষ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিপক্ষেও (সাধাধর্মশূন্য বলিয়া নিশ্চিত নিত্য পদার্থেও) সপক্ষত্বের (অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মবস্তুর) আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি সমর্থনে যে সত্তাদি হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বাদীর দৃষ্টান্তের সাধর্ম্যমাত্র, উহা অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য নহে। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রতিবাদী যেমন বাদীর বাক্যকে অসিদ্ধ বলিতেছেন, তদ্রূপ তাঁহার নিজের বাক্যও অসিদ্ধ, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য হয়। কারণ, বাদীর বাক্য যেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত, তদ্রূপ প্রতিবাদীর প্রতিষেধবাক্যও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত। অতএব বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর বাক্যের ঐরূপ সাধর্ম্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত বাদীর বাক্যের গ্রায় প্রতিবাদীর বাক্যও অসিদ্ধ কেন হইবে না? সুতরাং ব্যাপ্তিশূন্য কেবল কোন সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের সিদ্ধি হয় না, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ যে ধর্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য ধর্মের সাধন অর্গাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত হয়, তাহাই প্রকৃত হেতু। উহা দৃষ্টান্তের সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য, এই উভয় প্রকার হয়। পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্নজন্তুত্ব হেতু ঘটরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত সাধর্ম্য হেতু। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদীর অভিমত সত্তাদি হেতু উক্ত স্থলে অনিত্যত্বের সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায় না। ৩৩শ ও ৩৪শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২৩। নিত্যসমা—(পঞ্চত্রিংশ সূত্রে)

বাদী কোন পদার্থে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐ অনিত্যত্ব নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, উভয় পক্ষেই সেই পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম “নিত্যসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের যে অনিত্যত্ব, তাহা কি নিত্য, অথবা অনিত্য? যদি উহা নিত্য হয়, তাহা হইলে উহা সর্বকালেই শব্দে বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে শব্দও সর্বকালেই বিদ্যমান আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, শব্দ সর্বকালে বিদ্যমান না থাকিলে তাহাতে সর্বকালেই অনিত্যত্ব বিদ্যমান আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্মী বিদ্যমান না থাকিলে তাহাতে কোন ধর্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু শব্দ সর্বকালেই বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার্য্য হইলে তাহাতে নিত্যত্বের আপত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং বাদী তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করিতে পারেন না। আর যদি বাদীর স্বীকৃত শব্দের অনিত্যত্ব অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও শব্দের নিত্যত্বাপত্তি অনিবার্য্য। কারণ, ঐ অনিত্যত্ব অনিত্য হইলে কোন কালে উহা শব্দে থাকে না, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যে সময়ে উহা শব্দে থাকে না, সেই সময়ে শব্দ অনিত্যত্বশূন্য হওয়ায় নিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। তখন শব্দ নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে, ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, অনিত্যত্বের অভাবই নিত্যত্ব। সুতরাং অনিত্যত্ব না থাকিলে তখন নিত্যত্বই স্বীকার্য্য। শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হইলে বাদী আর তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “নিত্যসমা” জাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে আরও বহু স্থলে বহু প্রকারে এই “নিত্যসমা” জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু ইহাও অসহুস্তর। কারণ, শব্দে অনিত্যত্ব সর্বদাই বিদ্যমান আছে, এই পক্ষ গ্রহণ করিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হয়। সুতরাং প্রতিবাদী শব্দে নিত্যত্বাপত্তি সমর্থনে যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হওয়ায় নিত্যত্বের বাধকই হয়। যাহা বাধক, তাহা কখনই স'ধক হইতে পারে না। ফলকথা, শব্দে সর্বদা অনিত্যত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া, তদ্বারা তাহাতে নিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করা যায় না। আর শব্দে অনিত্যত্ব অনিত্য, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ, শব্দের উৎপত্তির পূর্বকালে এবং ধ্বংসকালে শব্দের সত্তাই না থাকায় তখন তাহাতে অনিত্যত্ব নাই অর্থাৎ নিত্যত্বই আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্মীর সত্তা ব্যতীত তাহাতে কোন ধর্মের সত্তা সমর্থন করা যায় না। পরন্তু শব্দে কোন কালে নিত্যত্বও আছে এবং কোন কালে অনিত্যত্বও আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম। অতএব পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করা যায় না। ৩৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২৪। কার্য্যসমা—(সপ্তত্রিংশ সূত্রে)

বাদীর অভিমত হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া অনভিমত হেতুর আরোপ করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “কার্য্যসমা” জাতি। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে বাদীর পক্ষ, হেতু অথবা দৃষ্টান্তের মধ্যে যে কোন পদার্থকে অসিদ্ধ বলিয়া নিজে তাহার কোন সাধকের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিলে সেই উত্তর “কার্য্যসমা” জাতি। যেমন কোন বাদী “শব্দেহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি শ্রায়বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে যে “প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব” হেতু বলা হইয়াছে, উহা কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি অথবা প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি? প্রযত্নের কার্য্যত অনেক প্রকার দেখা যায়। কোন স্থলে প্রযত্নের অনন্তর তজ্জন্ম অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তিই হয় এবং কোন স্থলে প্রযত্নের অনন্তর বিদ্যমান পদার্থের অভিব্যক্তিই হয়। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তিই হয় অথবা অভিব্যক্তি হয়? কিন্তু প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে, উৎপত্তিই হয়, ইহা অসিদ্ধ। কারণ, বাদী কোন হেতুর দ্বারা উহা সাধন করেন নাই। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই তাঁহার অভিমত হেতু বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে বাদীর ঐ হেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, ভূগর্ভে জলাদি বহু পদার্থ বিদ্যমান আছে, এবং নানা স্থানে আরও অনেক নিত্য পদার্থও আছে, সেই সমস্ত পদার্থের প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং চিরবিদ্যমান বা নিত্য পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হওয়ার বিষয়তা সম্বন্ধে ঐ হেতু তাহাতেও আছে, কিন্তু তাহাতে বাদীর অভিমত সাধ্যধর্ম্ম অনিত্যত্ব না থাকায় ঐ হেতু তাহার ঐ সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারী। ফলকথা, বক্তার প্রযত্নজন্ম বিদ্যমান বর্ণাত্মক শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিই হয়, অবিদ্যমান ঐ শব্দের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্বীকার্য্য হইলে আর উহাতে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “কার্য্যসমা” জাতি। কিন্তু ইহাও অসহুস্তর। কারণ, যে পদার্থের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকে, প্রযত্নজন্ম সেই আবরণাদির অপসারণ হইলে সেই পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের যে কোন আবরণাদি আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্ন হেতু বলা যায় না। সুতরাং শব্দের উৎপত্তিতেই প্রযত্ন হেতু, ইহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বক্তার প্রযত্নজন্ম বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। উক্ত যুক্তি অল্পসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিই বাদীর অভিমত সিদ্ধ হেতু। সুতরাং বাদীর অভিমত ঐ হেতু অসিদ্ধও নহে, ব্যভিচারীও নহে। প্রতিবাদী ইহা স্বীকার না করিলে প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করাই তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বাদীর অনভিমত হেতুকে হেতু বলিয়া, তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত পূর্ব্বোক্ত হেতু দৃষ্ট হইতে পারে না। ৩৮শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রের দ্বারা “সাধ্যস্যসম” প্রভৃতি চতুর্বিংশতি প্রকার প্রতিষেধের

(জাতির) উদ্দেশ্য করিয়া, পরে দ্বিতীয় সূত্র হইতে ৩৮শ সূত্র পর্য্যন্ত যথাক্রমে ঐ সমস্ত জাতির লক্ষণ বলিয়া, ঐ সমস্ত জাতি যে অসহস্তর, ইহাও সর্বত্র পৃথক সূত্রের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। উহাই জাতির পরীক্ষা। মহর্ষির উদ্দেশ্য এই যে, যে কারণেই হউক, জিগীষু প্রতিবাদিগণ পূর্বোক্ত নানা প্রকারে অসহস্তর করিলে, বাদী সহস্তর দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। সুতরাং সর্বত্র জাতান্তর স্থলে বাদীর বক্তব্য সহস্তর মহর্ষি পৃথক সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী পূর্বোক্ত কোন প্রকার জাতান্তর করিলে বাদী যদি সহস্তর দ্বারা উহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রতিবাদীর জ্ঞান জাতান্তরই করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার উভয়েই নিগৃহীত হইবেন। তাঁহাদিগের সেই বার্থ বিচার-বাক্যের নাম “কথাভাস”। মহর্ষি জাতি নিরূপণের পরে ৩৯শ সূত্র হইতে ৫৫শ সূত্রের দ্বারা সেই “কথাভাস” প্রদর্শন করিয়া, এই প্রথম আত্মিক সমাপ্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বুঝাইবে।

এখন এখানে পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জাতির সাতটি অঙ্গ বৃত্তিতে হইবে ও মনে রাখিতে হইবে। যথা—(১) লক্ষ্য, (২) লক্ষণ, (৩) উত্থান, (৪) পাতন, (৫) অবসর, (৬) ফল, (৭) মূল। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত “সাধুসাম্য” প্রভৃতি চতুর্বিংশতি প্রকার জাতিই লক্ষ্য। মহর্ষি ঐ সমস্ত লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া যথাক্রমে উহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত সপ্তাঙ্গের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গ মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্গ “উত্থান”। যেরূপ জ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত জাতির উৎপত্তি হয়, তাহাই উত্থান অর্থাৎ জাতির উৎপত্তি-বীজ। চতুর্থ অঙ্গ “পাতন”। পাতন বলিতে কোন প্রকার হেতুভাসে নিপাতন। অর্থাৎ প্রতিবাদী জাতান্তর করিয়া বাদীর কথিত হেতুকে যে, কোন প্রকার হেতুভাস বা দৃষ্ট হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহাই “পাতন”। পঞ্চম অঙ্গ “অবসর”। “অবসর” বলিতে প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের অবসর। যে সময়ে যে কারণে প্রতিবাদী জাতান্তর করিতে বাধ্য হন, তাহাই উহার অবসর। যে সময়ে প্রতিবাদী সভাকোভাদিবশতঃ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বক্তব্য বিষয়ে অবধান করিতে পারেন না, তখন সেই অনবধানতারূপ প্রমাদবশতঃ এবং কোন স্থলে সহস্তরের প্রতিভা অর্থাৎ স্ফূর্তি না হওয়ায় প্রতিবাদী পরাজয় ভয়ে একেবারে নীরব না থাকিয়া জাতান্তর করিতে বাধ্য হন। সুতরাং প্রমাদ ও প্রতিভাহানি সর্বপ্রকার জাতির পঞ্চম অঙ্গ “অবসর” বলিয়া কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্গ “ফল”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের ফল। জাতান্তর করিয়া বাদী অথবা মধ্যস্থগণের যেরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করা প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য থাকে, সেই ভ্রান্তিই তাঁহার জাতি প্রয়োগের ফল। সপ্তম অঙ্গ “মূল”। মূল বলিতে এখানে প্রতিবাদীর জাতান্তরের দৃষ্টান্ত মূল। অর্থাৎ যদ্বারা প্রতিবাদীর হেতু বা জাতান্তরের দৃষ্টান্ত নির্ণয় হয়। ঐ মূল দ্বিবিধ, সাধারণ ও অসাধারণ। তন্মধ্যে স্বাব্যাহতকত্বই সর্বপ্রকার জাতির সাধারণ দৃষ্টান্ত মূল। কারণ, প্রতিবাদী কোন প্রকার জাতান্তর করিলে তুল্যভাবে তাঁহারই কথাষসারে তাঁহার ঐ উত্তরও ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং সর্বপ্রকার জাতিই স্বাব্যাহতক বলিয়া অসহস্তর। স্বাব্যাহতকত্ববশতঃ সর্বপ্রকার জাতিরই দৃষ্টান্ত স্বীকার্য হওয়ায় স্বাব্যাহতকত্বই উহার সাধারণ

মূল। অসাধারণ ছষ্টম মূল ত্রিবিধ—(১) যুক্তান্বিত, (২) অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার, এবং (৩) অবিসম্বন্ধিত। ব্যাপ্তি প্রভৃতি যাহা হেতুর যুক্ত অঙ্গ, তাহা জাতিবাদীর অভিমত হেতুতে না থাকিলে অথবা জাতিবাদী কোন অযুক্ত অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত জাতান্তর করিলে অথবা তাঁহার ঐ উক্তর প্রকৃত বিষয়ে সম্বন্ধ না হইয়া, অন্য বিষয়ে বর্তমান হইলে তদ্বারাও তাহার জাতান্তরের ছষ্টম নির্ণয় হয়। তবে সর্বত্র সর্বপ্রকার জাতিতে তুল্যভাবে উহা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত যুক্তান্বিত প্রভৃতি অসাধারণ ছষ্টম মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহর্ষি যে জাতির অসম্বন্ধিত বুঝাইতে যে সূত্র বলিয়াছেন, সেই সূত্র দ্বারা সেই জাতির ছষ্টমের মূল (সপ্তম অঙ্গ) সূচনা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ জাতির পূর্বোক্ত সপ্তম ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই। পরবর্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত সপ্তমের এবং মহর্ষি-কথিত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির আরও অনেক প্রকার ভেদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্র ও ভাষ্যাদিতে ঐ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না হওয়ায় ঐ সমস্ত অতি গূঢ়, তাই তিনি বিশদরূপে উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও শেষে “লক্ষ্যং লক্ষণমুখিতিঃ স্থিতিপদং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন। উদয়নের ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। “তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাজ জাতির পূর্বোক্ত সপ্তমের বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও বাহ্য্য ভয়ে সমস্ত অঙ্গের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, “উত্থান”, “পাতন”, “ফল” ও “মূল”, এই চারিটি অঙ্গ “প্রবোধসিদ্ধি” নামক “পরিশিষ্টে” বিস্তৃত আছে; অতএব ঐ গ্রন্থে পরিশ্রমশালী হইবে। অর্থাৎ উদয়নাচার্য্যের ঐ গ্রন্থে বিশেষ পরিশ্রম করিলেই উক্ত বিষয়ে সমস্ত তত্ত্ব জানা যাইবে। ফলকথা, সর্বত্রই সমস্ত জাতির সাতটি অঙ্গ বুঝা আবশ্যক। পরে আমরা যথাস্থানে ইহা প্রকাশ করিব। কিন্তু বাহ্য্যভয়ে সর্বত্রই সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। আমরাও এই পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বরদরাজের শ্রায় এখানে বলিতেছি,—“বয়ং বিস্তরভীরবঃ” ॥ ১ ॥

১। লক্ষ্যং লক্ষণমুখানং পাতনাবসরো ফলং। মূলমিত্তম্ভমেতাসাং তত্রোক্তে লক্ষ্যলক্ষণে ॥

প্রমাদঃ প্রতিভাহানিরাসানবসরঃ স্মৃতঃ। মূলভং পরিশিষ্টেহতদ্বয়ং বিস্তরভীরবঃ ॥

“অন্ত”উত্থানবোজং, কুত্র চিচ্ছবোভাসে নিপাতনং, প্রয়োগফলং দোষমূলকোতি চতুষ্ঠয়ং “প্রবোধসিদ্ধি”নামনি “পরিশিষ্টে” বিস্তৃতমিতি তৎপরিশ্রমশালিত্ববিবর্তনং। তত্র হেবমুক্তং—

“লক্ষ্যং লক্ষণমুখিতিঃ স্থিতিপদং মূলং ফলং পাতনং

জাতীনাং সবিশেষমেতদধিলং প্রবাস্তমুক্তং রহ” ইতি।

বয়স্ত সংগ্রহাধিকারিণো বিস্তরাদভীত্যা ন ব্যাকৃতবস্ত ইতি ॥ ৩১ ॥—তর্কিকরক্ষা।

(১) “লক্ষ্যং” সামান্যবিশেষজাতিস্বরূপং। (২) “লক্ষণং” তদসাধারণো ধর্মঃ। (৩) “উখিতিঃ”স্তম্ভজাতীনা-
মুখানহেতুঃ। (৪) “স্থিতিপদং” জাতিপ্রয়োগাবসরঃ। (৫) “মূলং” সাধারণসাধারণছষ্টমূলং। (৬) “ফলং”
জাতিপ্রয়োজনং বাদিনস্তদা ভ্রান্তিরিত্তি যাবৎ। (৭) “পাতনং” জাতান্তরেণ বাদিসাধনে আপাদ্যমসিদ্ধাদি
দূষণং। “সবিশেষং” জাতাবান্তরভেদসহিতং “রহঃ” সূত্রভাষ্যাদিসু সাকলোনানন্তিব্যক্ত্যদতিগূঢ়ং।—জ্ঞান-
পূর্ণকৃত “লক্ষ্যপিকা” টীকা।

ভাষ্য । লক্ষণস্তু—

অনুবাদ । লক্ষণ কিস্তু—

সূত্র । সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যামুপসংহারে তদ্ধর্ম-
বিপর্যয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-সমৌ ॥ ২ ॥ ৪৬৩ ॥*

অনুবাদ । সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা “উপসংহার” করিলে অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্যের সংস্থাপন করিলে, সেই সাধ্যধর্ম্যের ধর্মের অর্থাৎ বাদীর সাধনীয় ধর্মের অভাবের উপপত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্ম্যে তাঁহার সাধ্যধর্মের অভাব সমর্থনোদ্দেশ্যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান । (১) “সাধর্ম্যসম” ও (২) “বৈধর্ম্যসম” প্রতিষেধ ।

বিরূতি । সমান ধর্মের নাম “সাধর্ম্য” এবং বিরুদ্ধ ধর্মের নাম “বৈধর্ম্য” । বাদীর গৃহীত হেতু তাঁহার পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই উভয়েই থাকিলে উহাকে ঐ পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সমানধর্ম বা “সাধর্ম্য” বলা যায় এবং উহার বিপরীত ধর্ম হইলে তাহাকে “বৈধর্ম্য” বলা যায় । সূত্রে “উপসংহার” শব্দের অর্থ সংস্থাপন বা সমর্থন । বাদী যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, সেই পদার্থকে বলে সাধ্যধর্ম্য । এবং সেই ধর্মকে বলে সাধ্যধর্ম । যেমন “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সেখানে অনিত্যত্বরূপে শব্দই সাধ্যধর্ম্য এবং শব্দে অনিত্যত্ব ধর্মই সাধ্যধর্ম । সূত্রে “তদ্ধর্ম” শব্দের দ্বারা বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্যের ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম বা সংস্থাপনীয় ধর্মই বিবক্ষিত । “বিপর্যয়” শব্দের অর্থ অভাব । “উপপত্তি” শব্দের অর্থ এখানে উপপাদন । ধর্মী বিভক্তির অর্থ “তাদর্গ্য” বা নিমিত্ততা । সূত্রের প্রথমোক্ত “সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং” এই পদের পুনরাবর্তি এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষোক্ত জাতির সামান্ত্র-লক্ষণসূত্র হইতে “প্রত্যবস্থানং” এই

* “ত” দ্বিতীয়া সাধাপরামর্শঃ । উপসংহারকর্মতয়া প্রকৃতত্বাৎ । “উপপত্তে” রিতি তাদর্থ্যে বধী । “সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং” মিত্যাবর্তনীয়ং । সামান্ত্রলক্ষণসূত্রাৎ প্রত্যবস্থানপরমমুর্ভনীয়ং । লক্ষ্যলক্ষণপদান্যং বথাসংখ্যেন সম্বন্ধঃ ।—তর্কিকরক্ষা । কথমপ্রস্তুতস্ত “তচ্” শব্দেন পরামর্শ ইত্যত্রাহ—“উপসংহারকর্মতয়ে”তি । উপসংহারঃ সমর্থনং, তৎকর্মতয়া সমর্থনীয়ত্বেন । “সামান্ত্রলক্ষণসূত্রাৎ” “সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং” প্রত্যবস্থানং জাতি” রিত্যস্মাৎ । “তর্কিকরক্ষার” উক্ত সন্দর্ভের জ্ঞানপূর্ণকৃত টীকা । “উপসংহারে” সাধ্যস্তোপসংহারণে বাদিনা কুতে তদ্ধর্মস্ত সাধ্যরূপধর্মস্ত যো বিপর্যয়ো ব্যতিরেকস্ত সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং কেবলাভ্যাং ব্যাপ্তাকপেক্ষাভ্যাং যদুপপাদনং, ততো হেতোঃ সাধর্ম্যবৈধর্ম্যসমাবুচ্যতে । তদ্ব্যমর্থঃ—বাদিনা অথয়েন ব্যতিরেকেণ বা সাধ্যো সাধিতে প্রতিবাদিনঃ সাধর্ম্য-নাত্রপ্রবৃত্তহেতুনা তদ্ব্যবাপাদনং সাধর্ম্যসমঃ । বৈধর্ম্যমাত্রপ্রবৃত্তহেতুনা তদ্ব্যবাপাদনং বৈধর্ম্যসমঃ ।—বিশ্বনাথবৃত্তি ।

পদের অনুরক্তি এই সূত্রে মহর্ষির অভিमत। তাহা হইলে “সাধর্ম্ম্যাবৈধর্ম্ম্যাত্মায়ুপসংহারে তদ্ধর্ম্ম-
বিপর্যায়োপপত্তেঃ সাধর্ম্ম্যাবৈধর্ম্ম্যাত্মাং প্রত্যবস্থানং সাধর্ম্ম্যাবৈধর্ম্ম্যামমৌ” এইরূপ সূত্রবাক্যের দ্বারা
সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, কোন বাদী কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম্যের সংস্থাপন করিলে ঐ ধর্ম্ম্যতে
সেই সাধ্যধর্ম্ম্যের অভাব সমর্থন করিবার জন্ত ঐরূপ কোন সাধর্ম্ম্য দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান
বা প্রতিষেধ, তাহাকে বলে “সাধর্ম্ম্যাসম”। এইরূপ বাদী কোন বৈধর্ম্ম্য দ্বারা সাধ্যধর্ম্ম্যের সংস্থাপন
করিলেও পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সাধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর যে “প্রত্যবস্থান,” তাহাও “সাধর্ম্ম্যাসম।”
এবং বাদী কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম্যের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন
বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্ম্যের অভাবের উপপাদনার্থ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ করেন, তাহা
হইলে ঐ প্রতিষেধকে বলে “বৈধর্ম্ম্যাসম”।

ভাষ্য। সাধর্ম্ম্যোপসংহারে সাধ্যধর্ম্ম্যবিপর্যায়োপপত্তেঃ সাধর্ম্ম্যো-
নৈব প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ সাধর্ম্ম্যাসমঃ প্রতিষেধঃ।

নিদর্শনং—‘ক্রিয়াবানাত্মা,—দ্রব্যস্য ক্রিয়াহেতুগুণযোগাৎ। দ্রব্যং
লোফটঃ ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তঃ ক্রিয়াবান্,—তথা চাত্মা, তস্মাৎ ক্রিয়াবা’-
নিতি। এবমুপসংহাতে পরঃ সাধর্ম্ম্যোণৈব প্রত্যবতিষ্ঠতে,—‘নিষ্ক্রিয়
আত্মা, বিভুনো দ্রব্যস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ, বিভূ চাকাশঃ নিষ্ক্রিয়ঞ্চ, তথা চাত্মা,
তস্মান্নিষ্ক্রিয় ইতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধর্ম্ম্যাৎ ক্রিয়াবতা
ভবিতব্যং, ন পুনরক্রিয়সাধর্ম্ম্যান্নিষ্ক্রিয়েণেতি। বিশেষহেতুত্বাবাৎ,
সাধর্ম্ম্যাসমঃ প্রতিষেধো ভবতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্য দ্বারা উপসংহার করিলে অর্থাৎ কোন বাদী সাধর্ম্ম্য হেতু ও
সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার সাধ্যের সংস্থাপন করিলে সাধ্যধর্ম্ম্যের অভাবের উপপাদনের
নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর গৃহীত সেই পক্ষ বা ধর্ম্ম্যতে তাঁহার সংস্থাপনীয় ধর্ম্ম্যের অভাব
সমর্থনোদ্দেশ্যে (প্রতিবাদিকর্ত্ত্বক) স্থাপনার হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ বাদীর
নিজপক্ষ স্থাপনে প্রযুক্ত সাধর্ম্ম্য হেতু হইতে বিশেষশূন্য সাধর্ম্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান,
“সাধর্ম্ম্যাসম” প্রতিষেধ।

উদাহরণ, যথা—(বাদী) আত্মা সক্রিয়। যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার
কারণ গুণবত্তা আছে। দ্রব্য লোফট, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, সক্রিয়, আত্মাও
তদ্রূপ, অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ ও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত্মা সক্রিয়।

১। অস্তি স্বাক্ষরনঃ ক্রিয়াহেতুগুণঃ প্রগতোহদষ্টঃ বা, লোষ্ট্রস্তাপি ক্রিয়াহেতুগুণঃ স্পর্শবদবেগবদব্যাসংযোগ ইতি।
—ভাৎপর্ধ্যটীকা।

এইরূপে উপসংহত হইলে অর্থাৎ বাদিকর্তৃক আত্মাতে সক্রিয়ত্ব সংস্থাপিত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী সাধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন (যথা) — আত্মা নিষ্ক্রিয়। যেহেতু বিভূ দ্রব্যের নিষ্ক্রিয়ত্ব আছে। যেমন আকাশ বিভূ ও নিষ্ক্রিয়। আত্মাও তদ্রূপ, অর্থাৎ বিভূ দ্রব্য, অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় দ্রব্যের (লোফের) সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের (আকাশের) সাধর্ম্য-প্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ “সাধর্ম্যসম” প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে প্রথমটির নাম “সাধর্ম্যসমা” এবং দ্বিতীয়টির নাম “বৈধর্ম্যসমা”। জাতি বিশেষ্য হইলে “সাধর্ম্যসমা” ও “বৈধর্ম্যসমা” এইরূপ জ্যোতিষ নামের প্রয়োগ হয় এবং “প্রতিষেধ” বিশেষ্য হইলে “সাধর্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্যসম” এইরূপ পুংলিঙ্গ নামের প্রয়োগ হয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। মহর্ষি এই সূত্রে “সাধর্ম্যবৈধর্ম্যসমে” এইরূপ জ্যোতিষ দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ না করিয়া, “সাধর্ম্যবৈধর্ম্যসমো” এইরূপ পুংলিঙ্গ দ্বিবচনান্ত প্রয়োগ করায় প্রতিষেধই তাঁহার বুদ্ধিস্থ বিশেষ্য, ইহা বুঝা যায়। তাই বার্তিককার সূত্রের শেষে “প্রতিষেধো” এই পদের পূরণ করিয়া “সাধর্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্যসম” নামক দুইটি প্রতিষেধই মহর্ষির এই সূত্রোক্ত লক্ষণের লক্ষ্য, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতি “প্রতিষেধ” নামেও কথিত হইয়াছে। মহর্ষির এই সূত্রে এবং পরবর্তী অন্ত্যস্ত সূত্রে পুংলিঙ্গ “সম” শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও তাহা বুঝা যায়। বাদী তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী উহার প্রতিষেধ বা খণ্ডনের জন্ত যে উত্তর করেন, সেই প্রতিষেধক বাক্যরূপ উত্তরকেই এখানে ঐ অর্থে প্রতিবাদীর “প্রতিষেধ” বলা হইয়াছে। উহাকে “প্রত্যবস্থান” এবং “উপালম্ব”ও বলা হইয়াছে। বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন সাধর্ম্য দ্বারাই ঐ “প্রত্যবস্থান” বা প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রতিষেধের নাম “সাধর্ম্যসম”। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রথম সূত্র-ভাষ্যেই “সাধর্ম্যসম” নামক প্রতিষেধের এই সামান্য স্বরূপ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদী কোন সাধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি ঐরূপ কোন সাধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার “সাধর্ম্যসম”। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন সাধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার “বৈধর্ম্যসম” হইবে। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি ঐরূপ কোন বৈধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে দ্বিতীয় প্রকার “বৈধর্ম্যসম”। মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে “সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাত্মাশূপ-সংহারে” এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, ইহার দ্বারা পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ “সাধর্ম্যসম” ও দ্বিবিধ

“বৈধর্ম্যসম” নামক প্রতিবেদকের লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। প্রতিবাদী কেন ঐরূপ প্রত্যবস্থান করেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“তদ্ব্যবস্থাপ-পত্তেঃ”। বাদীর সাধ্য ধর্মই এখানে “তদ্ব্যবস্থাপ-পত্তেঃ”। বাদীর সাধনীয় অর্থাৎ সংস্থাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী এবং তাহাতে সংস্থাপনীয় ধর্ম, এই উভয়ই “সাধ্য” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে এবং “ধর্ম” শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকিলে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা ধর্মীরাপ সাধ্যই বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সাধ্যধর্মবিশিষ্টোপপত্তেঃ”। বাদীর সাধনীয় অর্থাৎ সংস্থাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী এবং তাহাতে সংস্থাপনীয় ধর্ম, এই উভয়ই “সাধ্য” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে এবং “ধর্ম” শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকিলে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা ধর্মীরাপ সাধ্যই বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৬৪—৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে মহর্ষির ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্মীতে তাঁহার সাধনীয় বা সংস্থাপনীয় ধর্মের অভাব সমর্থনোদ্দেশ্যেই ঐরূপ প্রত্যবস্থান করেন। বাদীর হেতুতে সংপ্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবনই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “সাধ্যসম” নামক প্রতিবেদকের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে “নিদর্শনং” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। “নিদর্শন” শব্দের অর্থ উদাহরণ।

ভাষ্যকার ঐ উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে কোন বাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ শ্রায়ব্যাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—কোন বাদী আত্মাতে সক্রিয়ত্ব ধর্মের উপসংহার অর্থাৎ সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা সক্রিয়। (হেতু) যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে। (উদাহরণ) দ্রব্য পদার্থ লোষ্ট্র, ক্রিয়ার কারণ গুণ-বিশিষ্ট—সক্রিয়। (উপনয়) আত্মাও তদ্রূপ, অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থ। (নিগমন) অতএব আত্মা সক্রিয়। বাদীর কথা এই যে, যে সমস্ত দ্রব্য পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে, সেই সমস্তই সক্রিয়। যেমন কোন স্থানে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে স্পর্শ ও বেগবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগজন্য ঐ লোষ্ট্রে ক্রিয়া জন্মে। সুতরাং ঐ সংযোগবিশেষ ঐ লোষ্ট্রে ক্রিয়ার কারণ গুণ। এইরূপ আত্মাতে যে প্রবৃত্ত ও ধর্মীধর্মরূপ অদৃষ্ট আছে, উহাও ক্রিয়ার কারণ গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা লোষ্ট্রের শ্রায় আত্মাতেও বিদ্যমান থাকায় উহা লোষ্ট্র ও আত্মার সাধর্ম্য বা সমান ধর্ম। সুতরাং উহার দ্বারা লোষ্ট্র দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্ব অনুমান করা যায়। ঐ অনুমানে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা, সাধর্ম্য হেতু। “লোষ্ট্র, সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত বা অম্বর দৃষ্টান্ত। কারণ, উক্ত স্থলে যে যে দ্রব্য ক্রিয়ার কারণ-গুণবিশিষ্ট, সেই সমস্ত দ্রব্যই সক্রিয়, যেমন লোষ্ট্র, এইরূপে উক্ত হেতুতে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া, বাদী ঐরূপ অনুমান করেন। ঐ ব্যাপ্তিকে অম্বরব্যাপ্তি বলে। বাদী উক্তরূপ সাধর্ম্য দ্বারা অর্থাৎ লোষ্ট্র ও আত্মার সমান ধর্ম ক্রিয়ার কারণগুণবত্তারূপ হেতুর দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্বরূপ সাধ্যধর্মের উপসংহার (সংস্থাপন) করিলে, প্রতিবাদী তখন আত্মাতে ঐ সক্রিয়ত্ব

১। বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের ক্রিয়ার কারণ গুণসমূহের বর্ণন করিয়াছেন। তদনুসারে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—“গুরুত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রবৃত্ত-ধর্মীধর্ম-সংযোগবিশেষাঃ ক্রিয়া-হেতবঃ”।—প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠা।

ধর্মের বিপর্যয় (নিষ্ক্রিয়ত্ব) সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা নিষ্ক্রিয়। (হেতু) কারণ, বিভূত্ববোর নিষ্ক্রিয়ত্ব আছে অর্থাৎ আত্মাতে বিভূত্ব আছে। (উদাহরণ) যেমন আকাশ বিভূ ও নিষ্ক্রিয়। (উপনয়) আত্মাও তদ্রূপ অর্থাৎ বিভূত্বব। (নিগমন) অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়।

প্রতিবাদীর কথা এই যে, আত্মাতে যেমন সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্য আছে, তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্যও আছে। কারণ, আত্মাও আকাশের ত্রায় বিভূ। সুতরাং বিভূত্ব ঐ উভয়ের সাধর্ম্য। কিন্তু বিভূ মাত্রই নিষ্ক্রিয়। সুতরাং “আত্মা নিষ্ক্রিয়ো বিভূত্বাৎ, আকাশবৎ” এইরূপে অনুমান দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলে উহাতে সক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্য প্রযুক্ত আত্মা সক্রিয়ই হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় আকাশের সাধর্ম্য প্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। একতর পক্ষের নিশ্চায়ক হেতুই এখানে “বিশেষ হেতু” শব্দের অর্থ। যদিও জাতি প্রয়োগ স্থলে এক পক্ষে বিশেষ হেতু থাকে, কিন্তু জাতিবাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই বিশেষ হেতু নাই বলিয়া উভয় পক্ষে সাম্য প্রদর্শন করেন। উহা বাস্তব সাম্য নহে, কিন্তু উহাকে বলে, প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য। অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐরূপ সাম্যের অভিমান করিয়া উহা প্রদর্শনের জন্তই ঐরূপ উত্তর করেন। প্রতিবাদী যে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই ভাষ্যকারের মতে জাতি প্রয়োগ স্থলে উভয় পক্ষে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য এবং উহাই “সাধর্ম্যাসম” প্রভৃতি নামে “সম” শব্দের অর্থ। তাই ভাষ্যকার পরে এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“বিশেষত্বভাবাৎ সাধর্ম্যাসমঃ প্রতিষেধো ভবতি”। এবং পূর্বে “সাধর্ম্যাসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিতে “অবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতুতঃ” এই বাক্যের দ্বারা ঐরূপ সাম্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বে ইহা কথিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত উদাহরণে বাদী আত্মা ও লোষ্টের সাধর্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্ব ধর্মের উপসংহার করায়, এবং প্রতিবাদীও আত্মা ও আকাশের সাধর্ম্য (বিভূত্ব) দ্বারাই ঐরূপ প্রত্যাবস্থান করায়, প্রতিবাদীর ঐ উত্তরভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “সাধর্ম্যাসম”। কিন্তু প্রতিবাদী যে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের অনুমান করিয়াছেন, ঐ বিভূত্ব ধর্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য। কারণ, বিভূত্ব দ্রব্যমাত্রই নিষ্ক্রিয়, ইহা বাদীরও স্বীকার্য। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতু হুঁই না হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর সহজতরই হইবে, উহা অসহজতর না হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে “সাধর্ম্যাসম” নামক জাতান্তর কিরূপে বলিয়াছেন? ইহা বিচার্য। বার্তিককার উদ্যোতকর পূর্বোক্ত কারণে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ উপেক্ষা করিয়া অত্র উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী “শকোহনিত্যঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য প্রযুক্ত শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম্য প্রযুক্ত শব্দ নিত্য হউক? কারণ, আকাশের ত্রায় শব্দও অমূর্ত পদার্থ। সুতরাং অমূর্তত্ব অর্থাৎ অপরি-

১। অত্র চ সাধনমাতাসমুত্তরঞ্চ ন জাতিঃ, বিভূত্বত্বক্রিয়ত্বেন স্বভাবতঃ প্রতিবন্ধ্যং তেনৈতদুপেক্ষা বার্তিককার উদাহরণান্তরমাহ :—তাৎপর্যটীকা।

চ্ছিন্নত্ব আকাশ ও শব্দের সাধর্ম্য। তাহা হইলে “শব্দো নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ আকাশবৎ” এইরূপে অনুমান করিয়া, ঐ অমূর্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার “সাধর্ম্যসম”। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অমূর্তত্ব হেতু নিত্যত্বের ব্যাপ্য নহে। কারণ, অনিত্য গুণ ও ক্রিয়াতেও অমূর্তত্ব আছে। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতু ব্যভিচারী বলিয়া দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর অসহজ। সুতরাং উহা “জাতি” হইতে পারে, ইহাই উদ্যোতকের তাৎপর্য। জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ, শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপ উদাহরণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নাস্তিকবাদী দৃষ্ট হেতুর প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে শীঘ্র নিরস্ত করিয়া বিতাড়িত করিবার জন্ত স্থলবিশেষে যে নির্দোষ হেতুর দ্বারাও “জাতি” প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন এবং এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। “তর্কসংগ্রহদীপিকা”র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও পূর্বোক্ত “সাধর্ম্যসম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণকে পূর্বোক্ত কারণে উপেক্ষা করিলেও পরবর্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে স্থলবিশেষে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সৎ হেতুর দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থানকেও এক প্রকার “সাধর্ম্যসম” জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে মহামনোষী মৈথিল শঙ্কর মিশ্র “সাধর্ম্যসমা” জাতিকে “সদ্বিষয়া”, “অসদ্বিষয়া” এবং “অসহজিকা” এই তিন প্রকার বলিয়া উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণস্থলে অসহজিকা “সাধর্ম্যসমা” বলা যায়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে যদিও প্রতিবাদীর গৃহীত বিভূত্ব হেতু তাঁহার সাধ্য ধর্ম নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য, সুতরাং উহা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সাধনে সৎহেতু, ঐ হেতুতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ঐ স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উক্তিতে দোষ আছে, উহা ঐ স্থলে তাঁহার সহজিক নহে, এ জন্ত তাঁহার ঐরূপ উত্তরও সহজিক বলা যায় না; উহাও জাতান্তর। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ঐ স্থলে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তাকে হেতু করিয়া, তদ্বারা লোষ্ট্র দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ যে গুণ (প্রযত্ন ও অদৃষ্ট) আছে, তাহা অজ্ঞত ক্রিয়া উৎপন্ন করে। আত্মাতে বিভূত্ববশতঃ ক্রিয়া জন্মিতে

১। মুমুক্শুঃ প্রতি চ শাস্ত্রারম্ভাদক্রমেন তদপেক্ষয়া সাধনাভাসবিষয় এব জাতিপ্রয়োগঃ। অতএব চ ভাষ্যকৃতা প্রথমং সাধনাভাস এব জাত্যুদাহরণং দর্শিতম্।—আশ্বমজ্জরী, ৬২১ পৃষ্ঠা।

২। তত্র প্রথমং সাধর্ম্যসমা যথা, সা চৈবং প্রবর্ততে। “শব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাদ্ভবত্ব”দ্বিতীয়া স্থাপনায় যদি খট-সাধর্ম্যাৎ কৃতকত্বাদয়মনিত্যো হস্ত আকাশসাধর্ম্যাৎ অনৈয়ম্যনিত্য এব কিং ন স্যাদিত্য। ইয়ঞ্চ সধর্ম্যয়া, স্থাপনায়ঃ সম্যক-ত্বাৎ। অথাসদ্বিষয়া, “শব্দো নিত্যঃ আবর্ণহাৎ শব্দবৎ”, ইত্যত্র অসমীচীনায়ঃ স্থাপনায়ঃ অনিত্যসাধর্ম্যাননিত্য এব কিং ন স্যাদিত্য। “অসহজিকা” তৃতীয়া,—“নিত্যঃ শব্দঃ আবর্ণহা”দ্বিতীয়া প্রযুক্তে আবর্ণহাভিন্নিত্যসাধর্ম্যাদ্যদি নিত্যন্তদা কৃতকত্বাদনিত্যসাধর্ম্যাননিত্য এব কিং ন স্যাদিত্য। উক্তিমাভ্রমত্র দুবাং, নতু সাধনমপি। যদ্যপ্যাসহজিকায়ঃ মসদ্বিষয়ত্বপ্রোবাৎ, তথাপ্যুক্তিদোষাদপি জাতিঃ সম্ভবত্যাঃ প্রদর্শনার্থং প্রকারত্রয়াভিধানমকরোৎ।—শঙ্কর মিশ্রকৃত “বাদিবিনোদ”।

পারে না। বিভূষ ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের অভাবও কার্যের অন্ততম কারণ। সুতরাং ঐ কারণের অভাবে আত্মাতে ক্রিয়া জন্মে না। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণ থাকিলেই যে সেই সমস্ত পদার্থ সক্রিয়, ইহা বলা যায় না। ক্রিয়ার কারণ গুণবস্তা সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে, ব্যভিচারী। বাদী ঐ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রথমে এই সমস্ত কথাই বলা উচিত। অর্থাৎ বাদীর ঐ হেতুতে ব্যভিচার দোষের সমর্থন করিয়া, উহা যে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধক হয় না, ইহা বলাই প্রথমে তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু তিনি উহা না বলিয়া, ঐ স্থলে বিভূষ হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিয়া প্রত্যবস্থান করায় তাঁহার ঐ উক্তি দৃষ্ট, উহা সঙ্গতি নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তরও ঐ জ্ঞাত জাত্যন্তরের মধ্যে গণ্য। উক্ত স্থলে উহা অসঙ্গতিক “সাধর্ম্যাসম”। শব্দের মিশ্র শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদিও “অসঙ্গতিক” সাধর্ম্যাসমাও অবশ্যই অদ্বিধা হইবে, কারণ, ঐ স্থলে বাদীর স্থাপনা সমোচীন নহে অর্থাৎ বাদীর হেতু নির্দোষ নহে, কিন্তু তথাপি উক্তিদোষ-প্রযুক্তও যে, জাতি সম্ভব হয়, ইহা প্রদর্শনের জ্ঞাত উক্তরূপ প্রকারত্ব কথিত হইয়াছে। উদঘনাচার্যের অন্তান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অথ বৈধর্ম্যাসমঃ,—ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তো লোফটঃ পরিচ্ছিন্নো দৃফটঃ, ন চ তথাত্মা, তস্মান্ন লোফটবৎ ক্রিয়াবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধর্ম্যাত্ম ক্রিয়াবতা ভবিতব্যং, ন পুনঃ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্যাদক্রিয়ে-
ণেতি। বিশেষহেতুভাবাদ্বৈধর্ম্যাসমঃ।

অনুবাদ। অনন্তর “বৈধর্ম্যাসম” (প্রদর্শিত হইতেছে)—ক্রিয়ার কারণ গুণ-বিশিষ্ট লোফট পরিচ্ছিন্ন দেখা যায়, কিন্তু আত্মা তদ্রূপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে। অতএব আত্মা লোফটের ন্যায় সক্রিয় নহে। সক্রিয় পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় পদার্থের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) “বৈধর্ম্যাসম” প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে “সাধর্ম্যাসম” নামক প্রতিষেধের (জাতির) একপ্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় “বৈধর্ম্যাসম” নামক প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্বোক্ত স্থলে বৈধর্ম্য দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বাদী কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্য দ্বারা ই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে “বৈধর্ম্যাসম” প্রতিষেধ। প্রত্যবস্থানের ঐরূপ ভেদবশতঃই “সাধর্ম্যাসম” ও “বৈধর্ম্যাসম” নামক প্রতিষেধের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবস্তাৎ, লোফটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, আত্মাতে

লোষ্টের সাধর্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবস্তু) দ্বারা সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট যে লোষ্ট, তাহা ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু আত্মা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ, সুতরাং আত্মাতে লোষ্টের বৈধর্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্ব থাকায় আত্মা লোষ্টের ত্রায় সক্রিয় হইতে পারে না। পরন্তু লোষ্টের বৈধর্ম্য ঐ অপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুর দ্বারা (আত্মা নিষ্ক্রিয়োঃপরিচ্ছিন্নত্বাৎ এইরূপে) আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। সক্রিয় পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইলে উহার বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্বারা সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় করা যায়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী এইরূপে সক্রিয় লোষ্টের বৈধর্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্বক হেতু করিয়া, তদ্বারাই ঐরূপ প্রত্যবস্থান করায় উহা “বৈধর্ম্যসম” নামক প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলেও বিশেষ হেতুর অভাবই উভয় প্রয়োগে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য। তাই পরে উহাই ব্যক্ত করিতে তিনি বলিয়াছেন,—“বিশেষহেতুভাবাবৈধর্ম্যসমঃ”। এখানেও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণে প্রতিবাদী অপরিচ্ছিন্নত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে ঐ হেতু দৃষ্ট নহে। উহা নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য। কারণ, অপরিচ্ছিন্ন পদার্থমাত্রই নিষ্ক্রিয়। সুতরাং উদ্যোতকের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর জাতি হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত “শব্দোহনিতাঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই “বৈধর্ম্যসম” প্রতিবেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণেও অসঙ্গতিক। “বৈধর্ম্যসমা” বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। “তর্কসংগ্রহনোপিকা”র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্য। বৈধর্ম্যেণ চোপসংহারো নিষ্ক্রিয় আত্মা, বিভূত্বাৎ, ক্রিয়াবদ্-
দ্রব্যমবিভু দৃষ্টিং, যথা লোষ্টঃ, ন চ তথাত্মা, তস্মান্নিষ্ক্রিয় ইতি। বৈধর্ম্যেণ
প্রত্যবস্থানং—নিষ্ক্রিয়ং দ্রব্যমাকাশং ক্রিয়াহেতুগুণরহিতং দৃষ্টিং, ন চ তথাত্মা,
তস্মান্ন নিষ্ক্রিয় ইতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্যান্নিষ্ক্রিয়েণ
ভবিতব্যং ন পুনরক্রিয়বৈধর্ম্যাৎ ক্রিয়াবতেতি। বিশেষহেতুভাবাদ্-
বৈধর্ম্যসমঃ।

অনুবাদ। বৈধর্ম্য দ্বারা উপসংহার অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপন, যথা - আত্মা
নিষ্ক্রিয়, যেহেতু বিভূত্ব আছে, সক্রিয় দ্রব্য অবিভু দেখা যায়, যেমন লোষ্ট। কিন্তু
আত্মা তদ্রূপ অর্থাৎ অবিভু দ্রব্য নহে, অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়। বৈধর্ম্য দ্বারা
প্রত্যবস্থান যথা—নিষ্ক্রিয় দ্রব্য আকাশ ক্রিয়ার কারণ গুণশূন্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা
তদ্রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণশূন্য নহে, অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয় নহে। সক্রিয়
দ্রব্যের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত

সক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) “বৈধর্ম্যসম” প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পন। বাদী কোন সাধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা প্রথম প্রকার “বৈধর্ম্যসম”। এবং বাদী কোন বৈধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্য দ্বারা প্রত্যাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা দ্বিতীয় প্রকার “বৈধর্ম্যসম”। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “বৈধর্ম্যসম”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় প্রকার “বৈধর্ম্যসম”র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বাদীর বৈধর্ম্য দ্বারা উপসংহার প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—(প্রতিজ্ঞা) আত্মা নিষ্ক্রিয়। (হেতু) যেহেতু বিভূত্ব আছে। (উদাহরণ) সক্রিয় জব্য অবিভূ দেখা যায়, যেমন লোষ্ট্র। (উপনয়) কিন্তু আত্মা অবিভূ জব্য নহে। (নিগমন) অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়। এখানে আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব সাধনে বাদী যে বিভূত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বৈধর্ম্যহেতু। কারণ, যে যে জব্য নিষ্ক্রিয় নহে অর্থাৎ সক্রিয়, সেই সমস্ত জব্য বিভূ নহে, যেমন লোষ্ট্র, এইরূপে বাদী ঐ স্থলে যে লোষ্ট্রকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা বৈধর্ম্যাদৃষ্টান্ত। বিভূত্ব হেতু ঐ লোষ্ট্রে না থাকায় উহা লোষ্ট্রের বৈধর্ম্য। সুতরাং উক্ত স্থলে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে বাদীর যে নিষ্ক্রিয়ত্বের উপসংহার, উহা বৈধর্ম্য দ্বারা উপসংহার। তাই বাদী পরে আত্মা অবিভূ জব্য নহে, এই কথা বলিয়া উক্ত স্থলে বৈধর্ম্যোপনয় বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈধর্ম্যহেতু প্রভৃতির লক্ষণাদি প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২৫৪—৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর বৈধর্ম্য দ্বারা প্রত্যাবস্থান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিষ্ক্রিয় জব্য যে আকাশ, তাহা ক্রিয়ার কারণ গুণশূন্য, কিন্তু আত্মা তদ্রূপ নহে; অর্থাৎ আত্মা ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। সুতরাং আত্মা নিষ্ক্রিয় নহে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি আত্মাতে বাদীর সাধর্ম্য নিষ্ক্রিয়ত্বের অভাব (সক্রিয়ত্ব) সমর্থন করিবার জন্ত বলেন যে, নিষ্ক্রিয় জব্য আকাশে ক্রিয়ার কারণ কোন গুণ নাই। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। সুতরাং আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না? অর্থাৎ আত্মাতে যে বিভূত্ব আছে, উহা সক্রিয় লোষ্ট্রে না থাকায় উহা যেমন ঐ লোষ্ট্রের বৈধর্ম্য, তদ্রূপ আত্মাতে যে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে, উহা নিষ্ক্রিয় আকাশে না থাকায় উহা আকাশের বৈধর্ম্য। তাহা হইলে আত্মাতে যেমন সক্রিয় জব্যের বৈধর্ম্য আছে, তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় জব্যেরও বৈধর্ম্য আছে। তাহা হইলে যদি সক্রিয় জব্যের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় জব্যের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্বারা আত্মা সক্রিয় জব্যের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়ই হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জব্যের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় করা যায়। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যাবস্থান বা উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার “বৈধর্ম্যসম”। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট্রের বৈধর্ম্য বিভূত্বকে হেতু করিয়া, তদ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্বের উপসংহার (সংস্থাপন) করিলে প্রতিবাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ

ক্ৰিয়াহেতুগুণবদ্ভাং, লোষ্ট্ৰবৎ” এইৰূপ প্ৰয়োগ কৰিয়া, আকাশেৰ বৈধৰ্ম্যা যে ক্ৰিয়াৰ কাৰণ গুণবদ্ভাং, তদ্বাৰা আত্মাতে লোষ্ট্ৰেৰ ত্ৰায় সক্ৰিয়ত্বেৰ সমৰ্থন কৰিয়াছেন। এখানে প্ৰতিবাদীৰ ঐ হেতু সক্ৰিয়ত্বেৰ ব্যাপ্য নহে। সুতৰাং তাঁহাৰ ঐ উত্তৰ যে জাত্যন্তৰ, ইহা নিৰ্ব্বিবাদ। পূৰ্ব্ববৎ উক্ত স্থলেও প্ৰতিবাদী যে বিশেষ হেতুৰ অভাব বলেন, উহাই উত্তম প্ৰয়োগে ভাষ্যকাৰেৰ মতে সাম্য। তাই তিনি এখানেও শেষে পূৰ্ব্ববৎ বলিয়াছেন,— “বিশেষহেতুভাবাবৈধৰ্ম্যাসমঃ”।

ভাষ্য। অথ সাধৰ্ম্যাসমঃ, ক্ৰিয়াবান্ লোষ্ট্ৰঃ ক্ৰিয়াহেতুগুণযুক্তো দৃষ্টঃ, তথা চাত্মা, তস্মাৎ ক্ৰিয়াবানিতি। ন চাস্তি বিশেষহেতুঃ—ক্ৰিয়াবদ্বৈধৰ্ম্যামিক্ৰিয়ো ন পুনঃ ক্ৰিয়াবৎসাধৰ্ম্যাত্ ক্ৰিয়াবানিতি। বিশেষ-হেতুভাবাৎ সাধৰ্ম্যাসমঃ।

অনুবাদ। অনন্তৰ “সাধৰ্ম্যাসম” অৰ্থাৎ দ্বিতীয় প্ৰকাৰ “সাধৰ্ম্যাসম” (প্ৰদৰ্শিত হইতেছে)। সক্ৰিয় লোষ্ট্ৰ ক্ৰিয়াৰ কাৰণ গুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, আত্মাও তদ্রূপ অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াৰ কাৰণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত্মা সক্ৰিয়। সক্ৰিয় দ্ৰব্যেৰ বৈধৰ্ম্য-প্ৰযুক্ত আত্মা নিষ্ক্ৰিয় হইবে, কিন্তু সক্ৰিয় দ্ৰব্যেৰ সাধৰ্ম্যপ্ৰযুক্ত আত্মা সক্ৰিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুৰ অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে) “সাধৰ্ম্যাসম” প্ৰতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। ভাষ্যকাৰ সৰ্ব্বপ্ৰথমে প্ৰথম প্ৰকাৰ “সাধৰ্ম্যাসমে”ৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়া, পৰে দ্বিবিধ “বৈধৰ্ম্যাসমে”ৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। সৰ্ব্বশেষে এখানে অবশিষ্ট দ্বিতীয় প্ৰকাৰ “সাধৰ্ম্যাসমে”ৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। কাৰণ, বাদী তাঁহাৰ গৃহীত দৃষ্টান্তেৰ কোন বৈধৰ্ম্য দ্বাৰা নিজ পক্ষ স্থাপন কৰিলে, প্ৰতিবাদী যদি উহাৰ বিপৰীত কোন সাধৰ্ম্য দ্বাৰাই প্ৰত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে—দ্বিতীয় প্ৰকাৰ “সাধৰ্ম্যাসম”। সুতৰাং উহাৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিতে হইলে কোন বাদীৰ বৈধৰ্ম্য দ্বাৰা নিজ পক্ষ স্থাপন প্ৰদৰ্শন কৰা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকাৰ দ্বিবিধ বৈধৰ্ম্যাসমেৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে দ্বিতীয় প্ৰকাৰ সাধৰ্ম্যাসমেৰ উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। তাহাতে ভাষ্যকাৰেৰ আৰ পৃথক্ কৰিয়া বৈধৰ্ম্য দ্বাৰা উপসংহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা আবশ্যক না হওয়ায় গ্ৰন্থ লাঘব হইয়াছে। পূৰ্ব্বোক্ত স্থলে বাদী লোষ্ট্ৰেৰ বৈধৰ্ম্য বিভূত্ব হেতুৰ দ্বাৰা আত্মাতে নিষ্ক্ৰিয়ত্বেৰ সংস্থাপন কৰিলে প্ৰতিবাদী যদি বলেন যে, সক্ৰিয় লোষ্ট্ৰ ক্ৰিয়াৰ কাৰণ গুণবিশিষ্ট, আত্মাও ক্ৰিয়াৰ কাৰণ গুণবিশিষ্ট। সুতৰাং আত্মাও লোষ্ট্ৰেৰ ত্ৰায় সক্ৰিয়। সক্ৰিয় লোষ্ট্ৰেৰ বৈধৰ্ম্য- (বিভূত্ব) বশতঃ আত্মা যদি নিষ্ক্ৰিয় হয়, তাহা হইলে ঐ সক্ৰিয় লোষ্ট্ৰেৰ সাধৰ্ম্য- (ক্ৰিয়াৰ কাৰণ গুণবদ্ভাং) প্ৰযুক্ত আত্মা সক্ৰিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্বাৰা উহাৰ একতৰ পক্ষের

নিশ্চয় করা যায়। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার “সাধর্ম্যাসম”। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধর্ম্য বিভূত্ব দ্বারা আত্মাতে নিক্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী ঐ লোষ্টের সাধর্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা) দ্বারাই আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। প্রতিবাদীর গৃহীত ঐ হেতু সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর যে জাত্যন্তর, ইহা নির্বিসাদ। পূর্ববৎ উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় প্রয়োগে ভাষ্যকারের মতে সাম্য। তাই ভাষ্যকার এখানেও সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“বিশেষ-হেতুত্বাৎ সাধর্ম্যাসমঃ”।

ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ দ্বারা এখানে আমরা বুঝিলাম যে, পূর্বোক্ত “সাধর্ম্যাসমা” ও “বৈধর্ম্যাসমা” জাতি প্রত্যেকই পূর্বোক্তরূপে দ্বিবিধ এবং উহার মধ্যে কোন কোন জাতি সদ্বিষয়া, অসদ্বিষয়া এবং অসহজিকা, এই প্রকারত্রেয় ত্রিবিধ। পরন্তু কোন বাদী যদি কোন সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য, এই উভয় দ্বারাই নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদী যদি সেখানে কোন সাধর্ম্য দ্বারা অথবা বৈধর্ম্য দ্বারা অথবা ঐ উভয় দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর অত্র প্রকার “সাধর্ম্যাসমা” ও “বৈধর্ম্যাসমা” জাতি হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐরূপ স্থলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরও সহজতর হইতে পারে না। উক্ত লক্ষণানুসারে উহাও জাত্যন্তর। “তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু বরদরাজ ইহাও শেষে বলিয়াছেন যে, অনুমানের ত্রায় প্রতিবাদী যদি প্রত্যক্ষাদির দ্বারাও ঐরূপ প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাও সেখানে উক্ত জাত্যন্তর হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে সেখানে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরও সহজতর নহে এবং উহা “ছল”ও নহে। সুতরাং উহাও জাত্যন্তর বলিয়াই স্বীকার্য। বাদী অনুমান দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া প্রত্যবস্থান করিলেও যে তাহা পূর্বোক্ত জাত্যন্তর হইবে, ইহা “বাদিবিবাদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন এবং তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উক্ত কারণেই “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত “সাধর্ম্যাসম” ও “বৈধর্ম্যাসম” প্রতিবেদনকে “প্রতিধর্ম্যসম” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে “তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, ‘যাহাতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি বৃত্ত অঙ্গ স্বীকৃত নহে, এমন প্রতিপ্রমাণ দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “প্রতিধর্ম্যসম”। বাদীর বিপরীত দাক্ষের সাধকরূপে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিকূল যে কোন প্রমাণই প্রতিপ্রমাণ। মহর্ষি গোতমের সূত্রোক্ত “সাধর্ম্যাসম” ও “বৈধর্ম্যাসম” নামক

১। অনভূপেতযুক্তজ্ঞাৎ প্রমাণাৎ প্রতিরোধতঃ। প্রত্যবস্থানমাচ্যুঃ প্রতিধর্ম্যসমং বুধ্যঃ। ২।

সাধর্ম্যবৈধর্ম্যসমৌ তদভেদদাবাব সূত্রিতৌ। অবান্তরভিদাঃ সন্তি সর্বত্রোতি প্রসিদ্ধয়ে। ৩।

তৌ চৈব স্বতন্ত্রাভিমতৌ প্রত্যক্ষাদেঃ প্রমাণতঃ। এতদ্বিধঃ-প্রসঙ্গঃ স্মারকজ্ঞাতিভেদে ন সূত্রিতঃ। ৪।

—“তর্কিকরক্ষা”, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিষেধদ্বয় উক্ত “প্রতিধর্মসমে”রই প্রকারবিশেষ। তাহা হইলে মহর্ষি উক্ত “প্রতিধর্মসমে”র উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এতদ্ব্যতীত বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সমস্ত জাতিতেই বহুপ্রকার ভেদ আছে, ইহা প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি প্রথমে উক্ত প্রকারভেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্বোক্ত প্রতিষেধদ্বয় উক্ত লক্ষণাক্রান্ত “প্রতিধর্মসমে”র প্রকারভেদ না হইয়া, স্বতন্ত্র প্রতিষেধই তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ প্রত্যাবস্থানও যে জাতান্তর, ইহা তাঁহার কোন সূত্রের দ্বারাও উক্ত হয় না। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যাবস্থানও যে জাতান্তর, ইহা স্বীকার্য। যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, “ক” “খ” প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের যখন পুনঃ শ্রবণ হয়, তখন সেই এই “ক”, সেই এই “খ” ইত্যাদিরূপে ঐ সমস্ত শব্দের প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তদ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত সেই সমস্ত শব্দেরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে, সেই সমস্ত শব্দের ধ্বংস হয় নাই। সুতরাং শব্দ যদি অনুমানপ্রমাণপ্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য হউক? অনুমানপ্রযুক্ত শব্দ কি অনিত্য হইবে, কিন্তু উক্তরূপ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংসক যদি উক্ত স্থলে তাঁহার নিজমতানুসারে উপমানপ্রমাণ এবং শব্দের নিত্যত্ববোধক শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাও শব্দের নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়া পূর্ববৎ প্রত্যাবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাও শব্দানিত্যবাদী মহর্ষি গোতমের মতে জাতান্তরই হইবে। অতএব বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত “প্রতিধর্মসম” নামক প্রতিষেধ এবং তাহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অভিমত। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পূর্বোক্তরূপ প্রত্যাবস্থানও স্থলবিশেষে তাঁহার কথিত “সাধর্ম্যাসম” এবং স্থলবিশেষে “বৈধর্ম্যাসম” প্রতিষেধ হইতে পারে। অতএব এখানে তিনি “প্রতিধর্মসম” নামে লক্ষ্য নির্দেশ না করিলেও এবং উহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ না বলিলেও উহাই এখানে তাঁহার অভিমত লক্ষ্য ও লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিপ্রমাণের দ্বারা বাদীর সাধ্য ধর্ম্মাভে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাঁহার সেই প্রতিপ্রমাণবিষয়ক জ্ঞানই উক্ত জাতির (৩) “উত্থান” অর্থাৎ উৎপত্তিবীজ। কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত উক্ত জাতির উদ্ভবই হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া, উহাতে সংপ্রতিপক্ষের আরোপ করায় সংপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাসে নিপাতনই উক্ত স্থলে (৪) “পাতন”। প্রতিবাদীর প্রমাণ অথবা প্রতিভাহানি উক্ত জাতির (৫) অবসর। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বাদী অথবা মধ্যস্থগণের সংপ্রতিপক্ষত্ব লাভিই উক্ত জাতির (৬) ফল। উক্ত জাতির সপ্তম অঙ্গ (৭) “মূল” অর্থাৎ উহার চরিত্রের মূল। পরবর্তী তৃতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি নিজেই তাহা সূচনা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে ॥ ২ ॥

অনুবাদ । এই উভয়ের অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত “সাধর্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্যসম” নামক প্রতিষেধকের উত্তর—

সূত্র । গোত্বাদ্গোসিদ্ধিবত্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩॥৪৬৪॥

অনুবাদ । গোত্বপ্রযুক্ত গোর সিদ্ধির ন্যায় সেই সাধ্য ধর্মের সিদ্ধি হয় ।

বিরূতি । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত জাতিত্বের উত্তর বলিয়াছেন । অর্থাৎ প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর যে অসম্ভব, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত জাতিত্বের অসম্ভবত্বনির্ণয়রূপ পরীক্ষাই এই সূত্রের উদ্দেশ্য । মহর্ষির সেই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, যে কোন সাধর্ম্ম বা যে কোন বৈধর্ম্ম দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধ হয় না । কিন্তু যে সাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্ম সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, তদ্বারাই সেই সাধ্য ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় । যেমন গোমাত্রে যে গোত্ব নামে একটি জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমাত্রের সাধর্ম্ম এবং অশ্বাদির বৈধর্ম্ম । ঐ গোত্বনামক জাতিবিশেষকে হেতু করিয়া, তদ্বারা “ইহা গো” এইরূপে গোর সিদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতি হয় । কারণ, ঐ গোত্বজাতি গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম । কিন্তু পশুত্বাদি ধর্ম্ম গো পদার্থের সাধর্ম্ম হইলেও তদ্বারা গো পদার্থের সিদ্ধি হয় না । কারণ, গোভিন্ন পদার্থেও পশুত্বাদি ধর্ম্ম থাকায় উহা গোপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে । এইরূপ কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ কার্যত্বাৎ, ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া, কার্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে শব্দে অনিত্যত্বের সিদ্ধি বা অনুমিতি হয় । কারণ, কার্যত্ব হেতু অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট । যে যে পদার্থে কার্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিমত্ব আছে, সেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য, ইহা নির্ব্বিবাদ । কিন্তু প্রতিবাদী ঐ স্থলে “শব্দো নিত্যঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ গগনবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়া অমূর্ত্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে গগনের ন্যায় নিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে শব্দে নিত্যত্বসিদ্ধি হয় না । কারণ, অমূর্ত্তত্ব, শব্দ ও গগনের সাধর্ম্ম হইলেও উহা নিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে । কারণ, অনেক অনিত্য পদার্থেও অমূর্ত্তত্ব আছে । অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেই তাহা নিত্য, ইহা বলা যায় না । সুতরাং প্রতিবাদী ঐ স্থলে সংপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঐরূপ অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না । কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুল্যবল হইলেই সেখানেই সংপ্রতিপক্ষ হইয়া থাকে । একের হেতু নির্দোষ, অপরের হেতু বাভিচারাদি দোষযুক্ত বা বাভিচারাদি-শঙ্কাগ্রস্ত, এমন স্থলে সংপ্রতিপক্ষ হয় না । অতএব প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর উক্ত স্থলে কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না, উহা অসম্ভব । উহার নাম “সাধর্ম্ম্যসমা” জাতি । এইরূপ উক্ত যুক্তিতে “বৈধর্ম্ম্যসমা” জাতিও অসম্ভব ।

ভাষ্য । সাধর্ম্যমাত্রে বৈধর্ম্যমাত্রে চ' সাধ্যসাধনে প্রতিজ্ঞায়মানে
 স্ফাদব্যবস্থা । সা তু ধর্মবিশেষে নোপপদ্যতে । গোসাধর্ম্যাদ্গোত্বাজ্জাতি-
 বিশেষাদ্গোঃ সিধ্যতি, ন তু সান্নাদিসম্বন্ধাৎ । অশ্বাদিবৈধর্ম্যাদ্গোত্বা-
 দৈব গোঃ সিধ্যতি, ন গুণাদিভেদাৎ । তচ্চৈতৎ কৃতব্যাত্থানমবয়ব-
 প্রকরণে । প্রমাণানামভিসম্বন্ধাচ্চৈকার্যকারিত্বং সমানং বাক্যে, ইতি ।
 হেত্বাভাসাশ্রয়া খল্লিয়মব্যবস্থেতি ।

অনুবাদ । সাধর্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্যমাত্র সাধ্যসাধন বলিয়া প্রতিজ্ঞায়মান হইলে
 অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী তাঁহাদিগের সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যকে
 সাধ্যধর্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলে অব্যবস্থা হয় । কিন্তু ধর্মবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধর্মের
 ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন ধর্ম সাধ্যধর্মের সাধনরূপে প্রতিজ্ঞায়মান হইলে সেই অব্যবস্থা
 উপপন্ন হয় না । (যথা) গোর সাধর্ম্য গোত্বনামক জাতিবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ
 হয়, কিন্তু সান্নাদির (গলকম্বলাদির) সম্বন্ধপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না । (এবং)
 অশ্বাদির বৈধর্ম্য গোত্বপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়, “গুণাদিভেদ” অর্থাৎ রূপাদি
 গুণবিশেষ এবং গমনাদি ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না । সেই ইহা অবয়ব-
 প্রকরণে “কৃতব্যাত্থান” হইয়াছে (অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব ব্যাত্থার শেষে
 যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাত্থা করা হইয়াছে) । বাক্যে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি
 পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যে সর্বপ্রমাণের অভিসম্বন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিত্ব অর্থাৎ
 প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধিরূপ একপ্রয়োজনসম্পাদকত্ব সমান । (অর্থাৎ নির্দোষ প্রতিজ্ঞাদি
 বাক্যে সমস্ত প্রমাণেরই সম্বন্ধ থাকায় সেখানে সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া সমান-
 ভাবে সেই সাধ্যধর্মের যথার্থ নিশ্চয় সম্পন্ন করে) এই অব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্বোক্ত
 প্রতিবাদীর কথিত অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিতই অর্থাৎ হেত্বাভাস বা দুষ্ক হেতুর
 দ্বারা সাধ্যধর্মের সংস্থাপন হইলেই তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপ অব্যবস্থা হয় ।

টিপ্পনী । পূর্বন্ব্যক্তোক্ত “জাতি”ব্ধের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, অব্যবস্থার সমর্থন করিয়া,
 বাদীর হেতুকে সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া আরোপ করেন, ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির ন্ব্যক্তোক্ত যুক্তি

১ । এখানে “সাধর্ম্যমাত্রেন বৈধর্ম্যমাত্রেন চ” এইরূপ পাঠই প্রচলিত সকল পুস্তকে দেখা যায় । কিন্তু পরে
 ভাষ্যকারের “ধর্মবিশেষে” এই সপ্তম, স্ত পাঠে লক্ষ্য করিলে প্রথমেও সপ্তমাস্ত পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয় । “স্বাধ-
 মঞ্জরী”কার ভয়ত্ত ভট্টও ভাষ্যকারের ব্যাপ্যামুসারেই এই পুস্তকের তাৎপর্য ব্যাপ্য কবিত্তে এখানে লিপিব্যচন,—“যদি
 সাধর্ম্যমাত্র বৈধর্ম্যমাত্র বা সাধ্যসাধন প্রতিজ্ঞায়েত, স্ফাদিয়মব্যবস্থা ।” ইত্যরা ভাষ্যকারেরও উক্তরূপ পাঠই
 প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় ।

অনুসারে ঐ অব্যবস্থার খণ্ডন করিয়াই এই সূত্রোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “ব্যবস্থা” শব্দের অর্থ নিয়ম। সুতরাং “অব্যবস্থা” বলিলে বুঝা যায় অনিয়ম। বাদী “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি ত্রায়-বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্বোক্তরূপ জাত্যন্তর করেন, তাহা হইলে তিনি বলেন যে, শব্দ যে অনিত্যই হইবে, নিত্য হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হয় না। কারণ, যদি অনিত্য শব্দের সাধর্ম্য কার্যত্বাদিপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে গগনের সাধর্ম্য অনুর্ত্বাদিপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যও হইতে পারে। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ই জন্মে। অতএব বাদীর কথিত ঐ হেতু সংপ্রতিপক্ষ হওয়ায় উহা তাঁহার সাধাসাধক হয় না। কারণ, সংপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় পক্ষের সংশয়ই জন্মে; কোন পক্ষেরই অনুমিতি জন্মে না (প্রথম খণ্ড, ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষাকার উক্ত জাতিদ্বয় স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য অব্যবস্থার খণ্ডন করিতে মহর্ষির এই সূত্রানুসারে বলিয়াছেন যে, সাধর্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্যমাত্রই সাধাধর্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলেই উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। ভাষাকার এখানে “মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাপ্তির বাবচ্ছেদ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী যদি সাধাধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য গ্রহণ করিয়াই নিজ পক্ষের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানেই কোন পক্ষের নিশ্চয় না হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। কারণ, ঐরূপ সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য সাধাধর্মের ব্যাপ্তিচারী হওয়ায় উহা হেত্বাভাস। সুতরাং উহা কোন পক্ষেরই সাধক না হওয়ায় উক্তরূপ অব্যবস্থা হইবে। তাই ভাষাকার সর্বশেষে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিত। অর্থাৎ হেত্বাভাসই উক্তরূপ অব্যবস্থার আশ্রয় বা প্রযোজক। কিন্তু বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ প্রকৃত হেতুদ্বারা সাধাধর্মের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানে যে পক্ষে প্রকৃত হেতু কথিত হয়, সেই পক্ষই নিশ্চিত হওয়ায় আর পূর্বোক্তরূপ অব্যবস্থা হইতে পারে না। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,—“স তু ধর্মবিশেষেনোপপদ্যতে”। ফলকথা, সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ হেতুর দ্বারাই সাধাধর্ম সিদ্ধ হয়। কেবল কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য দ্বারা সাধাধর্ম সিদ্ধ হয় না। মহর্ষি এই সূত্রে “গোত্বাদ-গোসিদ্ধিবৎ” এই দৃষ্টান্তবাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়া, পূর্বসূত্রোক্ত জাতিদ্বয় যে অসহজতর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদী তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগ করিলে, তাঁহার অভিমত ঐ হেতুতে হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা না থাকায় যুক্তাজহীনত্ববশতঃ তাঁহার ঐ হেতু তাঁহার সাধাসাধক বা প্রকৃত হেতুই হয় না। এবং কোন স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যকে হেতু প্রয়োগ করিয়াও বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাজহীনত্ববশতঃ উহা তাঁহার সাধাসাধক বা প্রকৃত হেতুই হয় না। সুতরাং উক্ত উভয় স্থলেই প্রতিবাদী সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না। সুতরাং যুক্তাজহীনত্ববশতঃ পূর্বোক্ত জাতিদ্বয় দৃষ্ট বা অসহজতর। মহর্ষি এই

স্বত্বের দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত জাতিত্বের অসাধারণ দৃষ্টত্বমূল (যুক্তাঙ্গহীনত্ব) সূচনা করিয়া, উহার দৃষ্টত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং তদ্বারা উহার সাধারণ দৃষ্টত্বমূল যে স্ববাবাতকত্ব, তাহাও সূচিত হইয়াছে। কারণ, প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থলে কেবল কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধাধর্ম্যোক্তে তাঁহার সাধাধর্ম্যের অভাবের আপত্তি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ঐ উত্তরেও অদুষকত্বের আপত্তি সমর্থন করা যায়। কারণ, উক্ত স্থলে যে সমস্ত উত্তর বা বাক্য বাদীর বাক্যের অদুষক, তাহাতে যে প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম আছে, তাহা প্রতিবাদীর ঐ উত্তরবাক্যেও আছে। সুতরাং সেই প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কোন সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অত্যাগত অদুষক বাক্যের ত্রায় প্রতিবাদীর ঐ উত্তরবাক্যেও অদুষক হউক? তাহা কেন হইবে না? সুতরাং তুল্য ভাবে প্রতিবাদীর উহা স্বীকার্য্য হওয়ায় তাঁহার ঐ উত্তর স্ববাবাতকত্ববশতঃ অসম্ভব। কারণ, প্রতিবাদীর ঐ দুষক বাক্য বা উত্তর যদি অদুষক বলিয়া সন্দিগ্ধও হয়, তাহা হইলে আর তিনি উহার দ্বারা বাদীর বাক্যের দৃষ্টত্ব সমর্থন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার নিজের কথানুসারেই তাঁহার ঐ উত্তর নিজের বাবাতক হওয়ায় উহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। মূলকথা, পূর্বোক্ত জাতিত্বের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সংপ্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা ঐক্যত সংপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে। কিন্তু ততুল্য বলিয়া উক্ত জাতিত্বকে বলা হইয়াছে,—“সংপ্রতিপক্ষদেশনাত্মক”। উদ্যোতকরও পরে এই প্রকরণকে “সংপ্রতিপক্ষদেশনাত্মক-প্রকরণ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বস্বত্রের “বার্তিক” পূর্বোক্ত সাধর্ম্যসম্মা জাতির উদাহরণ বলিয়া, উহাকে বলিয়াছেন,—“অনৈকাস্তিকদেশনাত্মক”। ব্যভিচারী হেতুকেই “অনৈকাস্তিক” বলে। কিন্তু পূর্বোক্ত জাতিত্বের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে অনৈকাস্তিক বলেন না। সুতরাং উদ্যোতকরের ঐ কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহা চিন্তনীয়। তাৎপর্য্যটীকায় ঐ কথার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যতিক্রম বিধানতঃ উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বার্তিকে ঐ “অনৈকাস্তিক” শব্দের অর্থও সংপ্রতিপক্ষ। যাহা একান্ততঃ সাধাসাধক হয় না অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী, কাহারই সাধাসাধক না হইয়া, উভয়ের সাধ্য বিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হয়, এই অর্থেই বার্তিককার উক্ত স্থলে যৌগিক “অনৈকাস্তিক” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং উহার দ্বারাও সংপ্রতিপক্ষ বুঝা যায় এবং তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার পরে মহর্ষির স্বত্রোক্ত দৃষ্টান্তবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, গোত্ব-নামক জাতিবিশেষরূপ যে গোর সাধর্ম্য, তৎপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয়। কিন্তু সান্নাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। এবং গোত্বরূপ যে অশ্বাদির বৈধর্ম্য, তৎপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়। গুণবিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষপ্রযুক্ত গো সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, গোত্বনামক জাতিবিশেষ যেমন সমস্ত গোর সাধর্ম্য, তদ্রূপ সান্নাদি সম্বন্ধও সমস্ত গোর সাধর্ম্য, এবং গোত্ব নামক জাতিবিশেষ যেমন অশ্বাদিতে না থাকায় অশ্বাদির বৈধর্ম্য, তদ্রূপ অনেক গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষও অশ্বাদির বৈধর্ম্য আছে। কিন্তু তন্মধ্যে গোত্বনামক জাতিবিশেষপ্রযুক্তই অর্থাৎ ঐ হেতুর দ্বারাই “ইহা গো” এই-

রূপে গোর সিদ্ধি বা অহুমিতি হয়। সান্নাদি সম্বন্ধ এবং গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষগ্রন্থক্ট ঐরূপে গোর অহুমিতি হয় না। কারণ, গোত্বনামক জাতিবিশেষ গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য এবং অস্বাদির বৈধর্ম্য। সান্নাদি সম্বন্ধ প্রভৃতি ঐরূপ সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য নহে। এখানে ভাষাকারোক্ত সান্নাদির সম্বন্ধ কি? সান্না শব্দেরই বা অর্থ কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি অনেক পূর্বাচার্য্যের উক্তি^১ দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহাদিগের মতে গোর অবয়বসমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগরূপ যে সংস্থান বা আকৃতি, তাহাই “সান্নাদি” শব্দের অর্থ। তাহা হইলে উহা সমবায় সম্বন্ধে গোর অবয়বসমূহেই বিদ্যমান থাকে। তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গোব্যক্তিও বিদ্যমান থাকায় সান্নাদির সহিত গোর সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু “সান্নাদি” শব্দের উক্ত অর্থে আর কোন প্রমাণ নাই। কোষকার অমর সিংহ বৈশ্ববর্ণে বলিয়াছেন,—“সান্না তু গলকঞ্চলঃ”। অর্থাৎ গোর গলবিশেষ যে লম্বমান চর্ম্মবিশেষ থাকে, যাহার নাম গলকঞ্চল, তাহাই “সান্না” শব্দের অর্থ। “সান্না” শব্দের এই অর্থই প্রসিদ্ধ। “তর্কভাষা”গ্রন্থে গোর লক্ষণ প্রকাশের জন্ত কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন,—“গোঃ সান্নাবৎ”। গোর গলকঞ্চলরূপ অবয়বই “সান্না” হইলে উহাতে গোনাংক অবয়বো সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে এবং তাহাতে “সান্না” নামক অবয়ব সমবেতত্ব সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। সান্নাদি শব্দের পূর্বোক্ত অর্থেও উহা সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধ গোপদার্থেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ সান্নাদিও গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্যই হয়। কারণ, উহা গোভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই। নবাতৈয়্যায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও “যত্র সান্নাদিঃ সা গোঃ” এইরূপ বলিয়া সান্নাদি হেতুর দ্বারা তাৎপর্য্যসম্বন্ধে গোর অহুমিতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন^২। সুতরাং এখানে ভাষাকারের “নতু সান্নাদিসম্বন্ধাৎ” এইরূপ উক্তি কিরূপে সংগত হয়? ইহা গুরুতর চিন্তনীয়। বার্তিককার উদ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি কেহই ভাষাকারের ঐ উক্তি গ্রহণ করেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা চিন্তা করিয়া ভাষাকারের ঐ উক্তি সংগত করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, ভাষাকারের “সান্নাদি” এই বাক্য “অতদ্ব্যুৎপত্তিসংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি সমান। সুতরাং উহার দ্বারা গোপদার্থের ব্যাপ্তিশূত্র শৃঙ্গাদিই গৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, “অতদ্ব্যুৎপত্তিসংবিজ্ঞান” ও “অতদ্ব্যুৎপত্তিসংবিজ্ঞান” নামে বহুব্রীহি সমান দ্বিবিধ। বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পদের অর্থ প্রাধান্যরূপে বোধবিষয় না হওয়ায় উহাকে বহুব্রীহি সমাসের “অতদ্ব্যুৎপত্তি” বলা হইয়াছে। “অতদ্ব্যুৎপত্তি” শব্দের অর্থ অপ্রধান। কিন্তু যেখানে বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত কোন পদের অর্থও ঐ সমাসের দ্বারা প্রাধান্যতঃ বুঝা যায়, সেই স্থলে ঐ সমাসের নাম “অতদ্ব্যুৎপত্তিসংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি। যেমন “লম্বকর্ণমানয়” এই বাক্যে “লম্বকর্ণ” এই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত

১। সান্নাদিসংস্থানভিষক্তগোহবদেব প্রতীতে:।—কিরণাবলী, (এসিয়াটিক) ১৫২ পৃষ্ঠা। “সান্নাদিলক্ষণ-বিলক্ষণাকৃত্যপি” ইত্যাদি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ২৩৩ কারিকা বাখ্যা।

২। অতএব গোত্বাদ্যগ্রহদশায়াং যত্র সান্নাদিঃ সা গৌরীতি তাৎপর্য্যান গোব্যাপকত্বগ্রহে সান্নাদিনা তাৎপর্য্যান গোত্বাদ্যোক্তান গোভ্যতিরেক্য সান্নাদিভ্যতিরেকঃ সিধ্যতি।—ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণদীপ্তি।

৩। “সান্নাদী” অতদ্ব্যুৎপত্তিসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। তেন ব্যক্তিরূপঃ শৃঙ্গাদয়ো গৃহ্যন্তে।—তাৎপর্য্যটীকা।

কর্ণ পদার্থেরও প্রধানতঃ বোধ হয়। কারণ, তাহার কর্ণ লক্ষ্যমান, সেই ব্যক্তিকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে কর্ণ সহিত সেই ব্যক্তির আনয়নই বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত স্থলে “লক্ষকর্ণ” এই বাক্য “তদ্গুণসংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি সমাস। কিন্তু “দৃষ্টসাগরমানস” এই বাক্যের দ্বারা যে ব্যক্তি সাগর দেখিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে সাগর সহিত সেই ব্যক্তির আনয়ন বুঝা যায় না। সুতরাং “দৃষ্টসাগর” এই বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা প্রধানতঃ সাগরের বোধ না হওয়ায় উহা “অতদ্গুণসংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি সমাস। এইরূপ ভাষ্যকারোক্ত “সান্নাদি” এই বাক্য “অতদ্গুণসংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি সমাস হইলে উহার দ্বারা “সান্না আদির্থেবাং” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে প্রধানতঃ শৃঙ্গাদিরই বোধ হয়। সেই শৃঙ্গাদি গোর সাধর্ম্য্য হইলেও গোত্র জাতির ছায়া গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য্য নহে। কারণ, উহা গোর ছায়া মহিষাদিতেও থাকে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, —“নতু সান্নাদিসম্বন্ধাৎ”। ফলকথা, ভাষ্যকারের কথিত ঐ “সান্নাদি” শব্দের প্রতিপাদ্য শৃঙ্গাদি। সুতরাং তাহার ঐ উক্তির অসংগতি নাই। কিন্তু শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত সমাধানে চিস্তনীয় এই যে, শৃঙ্গাদিই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইলে তিনি “শৃঙ্গাদি” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “সান্নাদি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এবং পূর্বেও “দৃষ্টসাগর” এই বহুব্রীহি সমাসে “সাগর” শব্দ প্রয়োগের যেরূপ প্রয়োজন আছে, “সান্নাদি” এই বহুব্রীহি সমাসে “সান্না” শব্দ প্রয়োগের সেইরূপ প্রয়োজন কি আছে? অবশ্য গোত্রের কোন পশ্বাদিতে সান্না সম্বন্ধের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের ঐ উক্তির দ্বারা মনে হয়, তিনি যেন গোর ছায়া অথবা কোন পশুরও গলকস্থল দেখিয়াছিলেন। তবে তাহা “সান্না” শব্দের বাচ্য বলিয়া সর্বসম্মত নহে, ইহা মনে করিয়া “সান্না” শব্দের পরে “আদি” শব্দের প্রয়োগ করিয়া, তদ্বারা শৃঙ্গাদিই গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ইহাও মনে হয় যে, ভাষ্যকার “সান্নাদিসম্বন্ধ” বলিয়া সান্নাদি অবয়বের সহিত গোর সমবায় সম্বন্ধই এখানে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, “নতু সান্নাদিসম্বন্ধাৎ”। অর্থাৎ সমবেতত্ব সম্বন্ধে সান্না গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য্য হইলেও ঐ সান্না ও গোর যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহা গোর ছায়া সান্নাতেও থাকে। কিন্তু সান্না গো নহে। কারণ, অবয়ব হইতে অবয়বী ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং সান্নাতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গো না থাকায় সান্নার যে সমবায় সম্বন্ধ (যাহা গো এবং সান্না, এই উভয়েই থাকে), তাহার দ্বারা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোর অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ, সান্না প্রভৃতি অবয়বের যে সমবায় নামক সম্বন্ধ, তাহা ঐ সমস্ত অবয়বেও থাকায় উহা গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য্য নহে। রঘুনাথ শিরোমণি “যত্র সান্নাদিঃ সা গোঁঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোর অনুমানে সম্বন্ধবিশেষে সান্নাদিকেই হেতু বলিয়াছেন। তিনি ত “সান্নাদি” শব্দের পরে সম্বন্ধ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার “সান্নাদি” শব্দের পরে “সম্বন্ধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? “সান্নাদি” শব্দের দ্বারা গোপদার্থের ব্যাপ্তিশূন্য বা ব্যভিচারী শৃঙ্গাদিই তাহার বিবক্ষিত হইলে পরে আর “সম্বন্ধ” শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন কি আছে? এবং ঐ সম্বন্ধই বা কি? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। সুধীগণ এখানে ভাষ্যকারের উক্ত সম্বন্ধে মনোযোগ করিয়া, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। পরন্তু এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “গোত্র”

শব্দের দ্বারা গোত্রের সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়া, গোত্র নামক জাতিবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার স্পষ্ট প্রকাশের জন্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “গোত্রাজ্জাতিবিশেষাৎ।”

আপত্তি হইতে পারে যে, গোত্র জাতির প্রত্যক্ষ করিলে তখন সেই গোব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় গোত্রহেতুর দ্বারা প্রত্যক্ষ গোর অনুমিতি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যা সংগত নহে। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, গোত্র জাতির প্রত্যক্ষ করিয়াও অনুমানের ইচ্ছা হইলে ঐ হেতুর দ্বারা “অয়ং গোঃ” এইরূপে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গোরও স্বার্থানুমান হইতে পারে। ঐরূপ স্বার্থানুমানে সিদ্ধ সাধন দোষ নহে। মহর্ষি এই সূত্রে উক্তরূপ স্বার্থানুমানই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইচ্ছাপ্রযুক্ত স্বার্থানুমানে সিদ্ধ সাধন দোষ নহে এবং সিদ্ধসাধন হেতুভাসও নহে, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও অন্ততঃ বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষপরিকপিতমপ্যর্থানুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ।” অর্থাৎ যাহারা অনুমানরসিক, তাঁহারা ইচ্ছাবশতঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থেরও অনুমান করেন। কোন সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সিদ্ধসাধন দোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে এখানে সূত্রোক্ত “গোসিদ্ধি” শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—গোব্যবহারসিদ্ধি। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে গোত্র হেতুর দ্বারা “অয়ং গোশব্দবাচ্যো গোত্রাৎ” এইরূপে প্রত্যক্ষ গোব্যক্তিতে গোশব্দবাচ্যত্বের অনুমিতিই এই সূত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত। গোশব্দবাচ্যত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষের আশঙ্কা নাই, ইহাই তাঁহাদিগের তাৎপর্য। “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ উক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রপাঠের দ্বারা সরলভাবে ঐরূপ অর্থ কোনরূপেই বুঝা যায় না। উক্ত ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত গোশব্দের গোব্যবহার অর্থাৎ গোশব্দবাচ্যত্বে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ঐরূপ লক্ষণার প্রকৃত গ্রাহক এখানে নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, উহাতে অকুচিবশতঃ নিজমতে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত “গোত্র” শব্দের অর্থ সান্নাদি। অর্থাৎ সান্নাদি হেতুর দ্বারাই সমবায় সম্বন্ধে গোত্র জাতির অথবা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গোব্যক্তিরই অনুমিতি, এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু বৃত্তিকারের ঐ ব্যাখ্যাও আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, “গোত্র” শব্দের দ্বারা সান্নাদি অর্থ বুঝা যায় না। যাহা গো ভিন্ন পদার্থে সমবেত নহে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাহা গোত্র, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে গোত্র শব্দের দ্বারা সান্নাদি বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত সান্নাদি কোন মতেই গোপদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। গোভিন্ন পদার্থ যাহাতে সমবেত নহে এবং গো পদার্থ যাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা গোত্র, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও গোত্র শব্দের দ্বারা সান্নাদি অবগব বুঝা যায় না। কারণ, “গোত্র” শব্দের ঐরূপ অর্থে কোন প্রমাণ নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের সন্দর্ভের দ্বারাও সরল ভাবে ঐরূপ অর্থ বুঝা যায় না। সুধীগণ এই সমস্ত কথারও বিচার করিবেন।

মহর্ষির এই সূত্রানুসারে ভাষ্যকারের উক্ত সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিবার জন্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অবগবপ্রকরণে পূর্বেই উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত

হইয়াছে। কোথায় কিরূপে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এখানে স্বরণ করাইবার জন্ত ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত প্রধান যুক্তির সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তায়বাক্যে সর্বপ্রমাণের সম্বন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিত্ব সমান। অর্থাৎ প্রকৃত বিত্ত্ব তায়বাক্যের প্রয়োগ করিলে সেখানে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ের মূলে যথাক্রমে শব্দপ্রমাণ, অনুমানপ্রমাণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং উপমানপ্রমাণের সম্বন্ধ থাকায় সেখানে ঐ সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া সাধ্যনিশ্চয়রূপ এক প্রয়োজন সম্পন্ন করে। সুতরাং সেখানে ঐ সমস্ত অবয়বও সমানভাবে সাধ্যনিশ্চয় সম্পাদন করায় প্রকৃত সাধ্যবিধয়ে কোন সংশয় জন্মে না। কিন্তু হেতুভাসের দ্বারা সাধ্যপদের সংস্থাপন করিলে সেখানে প্রকৃত তায়ের দ্বারা উহার সংস্থাপন না হওয়ায় যথার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। তাই ভাষ্যকার এখানে সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থা হেতুভাসাশ্রিত। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে “নিগমন” শব্দের ভাষ্যে প্রকৃত তায়বাক্যে যে সর্বপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে এবং তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন। এবং সেখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণের পরিণতি থাকিলে জাতি ও নিগ্রহস্থানের বহুত্ব সম্ভবই হয় না। কারণ, জাতিবাদী কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে তাঁহার সাধ্যধর্ম ও হেতু পদার্থের সাধ্যসাধন ভাবের ব্যবস্থাপন না করিয়াই অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রায়শঃ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন। কিন্তু সাধ্যধর্ম ও হেতু পদার্থের সাধ্যসাধনভাব ব্যবস্থিত হইলে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্মবিশেষকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল কোন সাধ্যার্থ্য অথবা বৈধর্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে অবয়বপ্রকরণে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারাও এখানে তাঁহার কথিত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে (প্রথম খণ্ড, ২৮৬—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে ভাষ্য “কৃতব্যবস্থানং” এই স্থলে “কৃতব্যবস্থানং” এইরূপ পাঠান্তরও অনেক পুস্তকে আছে। “ব্যবস্থান” শব্দের দ্বারা ব্যবস্থা বা নিয়ম বুঝা যায়। সুতরাং অবয়বপ্রকরণে হেতু ও উদাহরণের স্বরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্মবিশেষই হেতু হয়, কেবল কোন সাধ্যার্থ্য বা বৈধর্ম্যমাত্র হেতু হয় না, এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত পাঠের তাৎপর্য বুঝা যায়। কিন্তু ঐরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত “প্রমাণানামতিসম্বন্ধাৎ” ইত্যাদি পাঠের সুসংগতি ভাল বুঝা যায় না। সুধীগণ ইহাও প্রণিধানপূর্বক বিচার করিবেন ॥ ৩ ॥

সংপ্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

**সূত্র । সাধ্য-দৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম্যবিকম্পাদ্রভয়-সাধ্যত্বা-
চোৎকর্ষাপকর্ষ-বর্ণ্যাবর্ণ-বিকম্প-সাধ্যসমাঃ ॥৪॥৪৬৫॥**

অনুবাদ । সাধ্যধর্ম্য ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্যবিকল্প অর্থাৎ ধর্ম্যের বিবিধ-
প্রযুক্ত (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম ও (৭)

বিকল্পসম হয় এবং উভয়ের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত (৮) সাধ্যসম হয়।

বিবৃতি। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপে “উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ষড়্বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে “সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্মবিকল্পাৎ” এই বাক্যের দ্বারা “উৎকর্ষসম” প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের এবং পরে “উভয়সাধ্যত্বাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা শেষোক্ত “সাধ্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সূত্রে প্রথমোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যধর্মী। বাদী বা প্রতিবাদী যে ধর্মকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সংস্থাপন করেন, সেই ধর্মীও সেই ধর্মরূপে “সাধ্য” বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রায়সূত্রে অনেক স্থলে উক্তরূপ অর্থও “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যিক। তদনুসারেই ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্মী ও সাধ্যধর্ম, এইরূপে সাধ্য দ্বিবিধ। যেমন আত্মাকে সক্রিয় বলিয়া সংস্থাপন করিলে ঐ স্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্য-ধর্মী এবং তাহাতে সক্রিয়ত্ব সাধ্যধর্ম। এবং শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিলে ঐ স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দ সাধ্যধর্মী এবং তাহাতে অনিত্যত্ব সাধ্য ধর্ম। নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে আত্মা ও শব্দকে “পক্ষ” বলিয়া, উহাতে অনুমেয় সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্মকেই সাধ্য বলিয়াছেন। তাঁহা-দিগের মতে অনুমেয় ধর্মের নামই সাধ্য। কিন্তু তাঁহাদিগের মতেও এই সূত্রের প্রথমোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ পক্ষ। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে কোন ধর্মের সাধন বা অনুমান করা হয়, এই অর্থে এই সূত্রে “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহার দ্বারা বুঝা যায় পক্ষ। পূর্বোক্ত সাধ্যধর্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মের বিবল আছে। “বিকল্প” বলিতে এখানে কোন স্থানে সত্তা ও কোন স্থানে অসত্তা প্রভৃতি নানাপ্রকারভাৱে বৈচিত্র্য। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাহা সাধ্যধর্মী বা পক্ষে নাই এবং সাধ্যধর্মী বা পক্ষে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাহা দৃষ্টান্ত পদার্থে নাই। যেমন সক্রিয়ত্বরূপে আত্মা সাধ্যধর্মী এবং লোষ্ট্র দৃষ্টান্ত হইলে ঐ স্থানে লোষ্ট্রের ধর্ম স্পর্শবত্তা আত্মাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম বিভূত্ব লোষ্ট্রে নাই। এবং লোষ্ট্রের ধর্ম নিশ্চিতসাধ্যবত্ত্ব (অবর্ণ্যত্ব) আত্মাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম সন্ধিসাধ্যবত্ত্ব (বর্ণ্যত্ব) লোষ্ট্রে নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত পদার্থেও অস্তিত্ব নানা ধর্মের পূর্বোক্তরূপ বিকল্প আছে। যেমন উক্ত স্থলে লোষ্ট্রে গুরুত্ব আছে, লঘুত্ব নাই এবং লোষ্ট্রের শ্রায় সক্রিয় বায়ুতে লঘুত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষ পদার্থ এবং তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্বোক্তরূপ ধর্মবিকল্পকে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসদ্বস্তববিশেষ, তাহা (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বর্ণ্যসম, (৬) অবর্ণ্যসম ও (৭) বিকল্পসম নামক প্রতিষেধ (জাতি) হয়। প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত ধর্মবিকল্প-জ্ঞানই উৎকর্ষসম প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্থানের বীজ। তাই সূত্রে “সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম-বিকল্পাৎ” এই বাক্যের দ্বারা উক্ত ধর্মবিকল্পকেই “উৎকর্ষসম” প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের প্রযোজক বলিয়া উহাদিগের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে।

এইরূপ বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষ এবং তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে এই উভয়ের সাধ্যত্বকে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অসদ্ব্ত্তরবিশেষ, তাহার নাম (৮) “সাধ্যসম”। অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্মী সাধ্য পদার্থ হইলেও বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ সাধ্য নহে। কারণ, যে পদার্থ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিদ্ধ আছে, যাহা ঐরূপে বাদীর ন্যায় প্রতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহাই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্মা সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হইলেও লোষ্ট্র সক্রিয়ত্বরূপে নিদ্ধ পদার্থ। লোষ্ট্র যে সক্রিয়, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধ্যধর্মীর ন্যায় তাঁহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থেও সাধ্যত্বের আরোপ করিয়া, দৃষ্টান্তাসিদ্ধি প্রভৃতি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম “সাধ্যসম”। সূত্রোক্ত উভয় সাধ্যত্ব জ্ঞানই ইহার উত্থানের বীজ। তাই সূত্রে উভয় সাধ্যত্বকেই উহার প্রয়োজক বলিয়া শেযোক্ত “সাধ্যসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। পরে ভাষা-ব্যাখ্যায় এই সূত্রোক্ত ষড়্বিধ প্রতিষেধ বা জাতির স্বরূপ ও উদাহরণ ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। দৃষ্টান্তধর্মঃ সাধ্যে সমাসঞ্জয়ত উৎকর্ষসমঃ। যদি ক্রিয়াহেতুগুণযোগাল্লোচ্যবৎ ক্রিয়াবানাত্মা, লোচ্যবদেব স্পর্শবানপি প্রাপ্নোতি। অথ ন স্পর্শবান্, লোচ্যবৎ ক্রিয়াবানপি ন প্রাপ্নোতি। বিপর্য্যয়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্তের ধর্মকে সাধ্যধর্মীতে সমাসজনকারী অর্থাৎ আপাদনকারী প্রতিবাদীর (৩) “উৎকর্ষসম” প্রতিষেধ হয়। (যথা পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন) ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তাপ্রযুক্ত আত্মা যদি লোচ্যের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে লোচ্যের ন্যায়ই স্পর্শবিশিষ্টও প্রাপ্ত হয়। আর যদি আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোচ্যের ন্যায় সক্রিয়ও প্রাপ্ত হয় না। (অর্থাৎ আত্মা লোচ্যের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট না হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না) অথবা বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে স্পর্শবত্তার অভাবে বিশেষ হেতু বক্তব্য।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই সূত্রোক্ত ষড়্বিধ জাতির লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে প্রথমে “উৎকর্ষসমে”র লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে যে ধর্ম বিদ্যমান নাই, তাহাতে সেই ধর্মের আরোপকে “উৎকর্ষ” বলে। বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তস্থ যে ধর্ম, তাঁহার সাধ্যধর্মীতে বস্ত্ততঃ বিদ্যমান নাই, সেই ধর্মবিশেষকে সাধ্যধর্মীতে সমাসজন করিয়া প্রতিবাদী দোষোদ্ভাবন করিলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম উৎকর্ষসম। “সমাসজন” বলিতে আপাদন বা আপত্তিপ্রকাশ। যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্তাপ্ লোচ্যবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে সেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই তাঁহার সাধ্যধর্মী, লোষ্ট্র দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত লোষ্ট্রে স্পর্শবত্তা আছে, কিন্তু আত্মাতে উহা নাই। আত্মা স্পর্শশূন্য দ্রব্য। কিন্তু প্রতিবাদী যদি ঐ স্থানে বাদীর দৃষ্টান্তস্থ স্পর্শবত্তা ধর্মকে

বাদীর সাধ্যধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া বলেন যে, আত্মা যদি লোষ্টের ত্রায় ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ লোষ্টের ত্রায় স্পর্শবিশিষ্টও হইবে। অ'র যদি আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না। অথবা আত্মাতে স্পর্শবস্তুর বিপর্যয় যে স্পর্শশূন্যতা আছে, তদ্বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলা হয় নাই। সুতরাং আত্মা লোষ্টের ত্রায় ক্রিয়াবিশিষ্ট, কিন্তু স্পর্শবিশিষ্ট নহে, তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু না থাকায় আত্মা যে লোষ্টের ত্রায় স্পর্শবিশিষ্ট, ইহাও স্বীকার্য। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট, ইহা বানীও স্বীকার করিতে না পারায় আত্মা সক্রিয় নহে, ইহাই তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং তিনি আর আত্মা সক্রিয়, এইরূপ অনুমান করিতে পারিবেন না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্ভাবনই ঐ স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী উক্ত স্থলে আত্মাতে অবিদ্যমান স্পর্শবস্তুর ধর্মের যে আরোপ করেন, উহার নাম উৎকর্ষ। ঐ উৎকর্ষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী উভয় পক্ষে সাম্যের অভিমান করায় “উৎকর্ষণ সমঃ” এই অর্থে উক্তরূপ উত্তরের নাম “উৎকর্ষনম”।

বার্তিককার উদ্যোতকর প্রভৃতি পূর্বোক্ত উৎকর্ষনমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী “শব্দোহনিতাঃ কার্যত্বাদবটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্যত্ববশতঃ যদি ঘটের ত্রায় শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দও ঘটের ত্রায় রূপ-বিশিষ্ট হউক ? কারণ, কার্যত্ববিশিষ্ট ঘটে অনিত্যত্বের ত্রায় রূপবস্তাও আছে। কার্যত্ববশতঃ শব্দ ঘটের ত্রায় অনিত্য হইবে, কিন্তু রূপবিশিষ্ট হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্তস্থ যে রূপবস্তা তাঁহার সাধ্যধর্মী শব্দে বস্তুতঃ নাই, তাহা শব্দে আরোপ করায় তাঁহার উক্তরূপ উত্তর “উৎকর্ষনম” নামক প্রতিষেধ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী শব্দে রূপের অভাব স্বীকার করিলেও তিনি উহার বিরোধী হেতু অর্থাৎ ঐ রূপাভাবের অভাব যে রূপ, তাহার সাধক হেতু (কার্যত্ব) প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে ঘটের ত্রায় রূপবস্তা সিদ্ধ হইলে উক্ত হেতু বিশেষবিরুদ্ধ হইবে। কারণ, বাদী শব্দে রূপশূন্যতা সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও রূপবস্তার সাধক হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও তাহার অভাবের সাধক হেতু প্রয়োগ করিলে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হয়। ফল কথা, উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষবিরুদ্ধত্বই প্রতিবাদীর আরোপ্য এবং বাদী অথবা মধ্যস্থগণের উক্ত হেতুতে বিশেষবিরুদ্ধত্ব ভ্রমই উক্ত জাত্যান্তরের ফল। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে এইরূপ বলিয়াছেন। তাই উক্ত জাতি “বিশেষবিরুদ্ধ-হেতুদেশনাভাসা” এই নামে কথিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থেই সাধ্যধর্ম অথবা হেতু, এই উভয় দ্বারাই অবিদ্যমান ধর্মের আপত্তি প্রকাশ করিলে “উৎকর্ষনমা” জাতি হইবে। তাই বৃত্তিকার ঐ ভাবেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উৎকর্ষনমা জাতি সর্বত্রই অসং হেতুর দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বত্রই ইহা অসংস্কৃতই হইবে, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত “সাধ্যন্যাসমা” জাতির ত্রায় ইহা

কখনও “অসহজিকা” হইতে পারে না। ইহা প্ৰমাণিত করা আবশ্যক। “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র ইহা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন^১।

ভাষ্য। সাধ্যো ধৰ্ম্মাভাবং দৃষ্টান্তাৎ প্ৰসজ্জয়তোহপকৰ্ষসমঃ।
লোকেঃ খনু ক্ৰিয়াবানবিভূদৃষ্টঃ, কামমাত্ৰাহপি ক্ৰিয়াবানবিভূরস্ত,
বিপর্যয়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্তপ্ৰযুক্ত অৰ্থাৎ বাদীৰ কথিত দৃষ্টান্ত দ্বাৰাই সাধ্যধৰ্ম্মাভাৱে ধৰ্ম্মাভাবপ্ৰসজ্জনকাৰী অৰ্থাৎ বাদীৰ সাধ্যধৰ্ম্মাভাৱে বিচ্যুত ধৰ্ম্মৰ অভাৱৰ আপত্তি প্ৰকাশকাৰী প্ৰতিবাদীৰ (৪) “অপকৰ্ষসম” প্ৰতিষেধ হয়। (যেমন পূৰ্বোক্ত স্থলেই প্ৰতিবাদী যদি বলেন) লোকে সক্ৰিয়, কিন্তু অবিভূ দৃষ্ট হয়, সূত্ৰাং আত্মাও সক্ৰিয় হইয়া অবিভূ হউক? অথবা বিপর্যয়ে অৰ্থাৎ আত্মাতে অবিভূত্বৰ অভাব বিভূত্ব বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য।

টীপ্পনো। বিদ্যমান ধৰ্ম্মৰ অপলাপকে “অপকৰ্ষ” বুলে। অপকৰ্ষপ্ৰযুক্তসম, এই অৰ্থে অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদী অপকৰ্ষপ্ৰযুক্ত উভয় পক্ষে সাম্যৰ অভিমান কৰায় “অপকৰ্ষসম” এই নামেৰে প্ৰয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকাৰ ইহাৰ লক্ষণ বলিয়াছেন যে, প্ৰতিবাদী যদি বাদীৰ কথিত দৃষ্টান্ত দ্বাৰাই বাদীৰ সাধ্যধৰ্ম্মাভাৱে বিদ্যমান কোন ধৰ্ম্মৰ অভাৱৰ আপত্তি প্ৰকাশ কৰেন, তাহা হইলে তাঁহাৰ সেই উত্তৰেৰে নাম “অপকৰ্ষসম”। যেমন পূৰ্বোক্ত স্থলেই প্ৰতিবাদী যদি বলেন যে, লোকে সক্ৰিয়, কিন্তু অবিভূ অৰ্থাৎ সৰ্বব্যাপী নহে। সূত্ৰাং আত্মা যদি লোকেৰে ত্ৰায় সক্ৰিয় হয়, তাহা হইলে লোকেৰে ত্ৰায়ই অবিভূ হউক। অথবা আত্মাতে যে অবিভূত্বৰ বিপর্যয় (বিভূত্ব) আছে, তদ্বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য। কিন্তু আত্মা যে লোকেৰে ত্ৰায় সক্ৰিয় হইবে, কিন্তু অবিভূ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু না থাকায় আত্মাতে লোকেৰে ত্ৰায় অবিভূত্বও স্বীকাৰ্য্য। প্ৰতিবাদী এইৰূপে আত্মাতে বিদ্যমান ধৰ্ম্ম যে বিভূত্ব, তাহাৰ অভাৱে (অবিভূত্ব) আপত্তি প্ৰকাশ কৰিলে তাঁহাৰ ঐ উত্তৰ “অপকৰ্ষসম” নামক প্ৰতিষেধ হইবে। প্ৰতিবাদীৰ অভিপ্ৰায় এই যে, আত্মাতে লোকেৰে ত্ৰায় সক্ৰিয়ত্ব স্বীকাৰ কৰিলে অবিভূত্বও স্বীকাৰ কৰিতে হয়। কাৰণ, সক্ৰিয় পদাৰ্থমাত্ৰই অবিভূ। সূত্ৰাং অবিভূত্ব সক্ৰিয়ত্বৰ ব্যাপক। কিন্তু আত্মাতে অবিভূত্ব নাই, বাদীও উহা স্বীকাৰ কৰেন না। সূত্ৰাং ব্যাপকধৰ্ম্মৰ অভাববশতঃ ব্যাপ্যধৰ্ম্মৰ অভাব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মাতে সক্ৰিয়ত্বৰ অভাবই স্বীকাৰ কৰিতে হইবে। তাহা হইলে বাদী আৰু আত্মাতে সক্ৰিয়ত্বৰ অনুমান কৰিতে পাৰিবেন না। উক্ত স্থলে এইৰূপে বাদীৰ অনুমানে বাধ অথবা সংপ্ৰতিপক্ষ দোষেৰে উদ্ভাবনই প্ৰতিবাদীৰ উদ্দেশ্য।

বার্ত্তিককার উদ্যোতকর তাঁহার পূর্বোক্ত “শব্দোহনিতাঃ কার্যাত্মাঃ ঘটবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ-
স্থলেই “অপকর্ষনম্”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, শব্দ
ঘটের ত্রায় অনিত্য হইলে শব্দের ত্রায় ঘটও রূপশূন্য হউক ? কার্যাত্মবশতঃ শব্দ ঘটের সদৃশ পদার্থ
হইলে শব্দের ত্রায় ঘটও রূপশূন্য কেন হইবে না ? কার্যাত্মবশতঃ শব্দ ঘটের ত্রায় অনিত্য হইবে,
কিন্তু ঘট শব্দের ত্রায় রূপশূন্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী
বাদীর দৃষ্টান্তে (ঘটে) বিদ্যমান ধর্ম যে রূপ, তাহার অভাবের আপত্তি প্রকাশ করায়, ঐ উক্তর
“অপকর্ষনম্” নামক প্রতিষেধ, ইহাই উদ্যোতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার
বাদীর সাধ্যধর্ম্মোক্তে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি স্থলেই “অপকর্ষনম্” বলিয়াছেন। বৃত্তিকার
বিশ্বনাথও বার্ত্তিককারের উক্ত উদাহরণ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে
বাদীর দৃষ্টান্তে ঘটে রূপশূন্যতার আপাদন অর্থান্তর। “অর্থান্তর” নিগ্রহস্থানবিশেষ,—উহা
“জাতি” নহে। বৃত্তিকারের মতে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থে ব্যাপ্তিকে
অপেক্ষা না করিয়া, বাদীর হেতু অথবা সাধ্যধর্ম্মের সহিত একত্র বিদ্যমান কোন ধর্ম্মের অভাবের
দ্বারা প্রতিবাদী ঐ হেতু অথবা সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি করিলে, সেখানে তাঁহার সেই উক্তরের
নাম “অপকর্ষনমা” জাতি। যেমন “শব্দোহনিতাঃ কার্যাত্মাঃ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগস্থলে
প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ যে ঘটধর্ম্ম কার্যাত্ম, তৎপ্রযুক্ত শব্দ যদি অনিত্য
হয়, তাহা হইলে ঐ কার্যাত্ম ও অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ ঘটধর্ম্ম যে রূপবস্তা, তাহা শব্দে না থাকায়
ঐ রূপবস্তার অভাবপ্রযুক্ত শব্দে কার্যাত্ম ও অনিত্যত্বের অভাবও সিদ্ধ হউক ? অনিত্যত্বের
সমানাধিকরণ কার্যাত্ম হেতুর দ্বারা ঘটে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে কার্যাত্ম ও অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ
রূপবস্তার অভাবের দ্বারা ঘটে কার্যাত্ম ও অনিত্যত্বের অভাবও কেন সিদ্ধ হইবে না ? কিন্তু শব্দে
কার্যাত্ম হেতুর অভাব সিদ্ধ হইলে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষবশতঃ বাদীর উক্ত অনুমান হইতে পারে না
এবং শব্দে অনিত্যত্ব সাধোর অভাব সিদ্ধ হইলে পক্ষে সাধ্যধর্ম্ম বাধিত হওয়ায় উক্ত অনুমান হইতে
পারে না। এইরূপে প্রথম পক্ষে হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন এবং দ্বিতীয়
পক্ষে বাধদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উক্ত “অপকর্ষনমা” জাতি
“অসিদ্ধিদেশনাভাসা” এবং “বাধদেশনাভাসা” এই নামে কথিত হইয়াছে।

ভাষ্য। খ্যাপনীয়ো বর্ণ্যো বিপর্য্যাদবর্ণ্যঃ। তাবেতৌ সাধ্য-দৃষ্টান্ত-
ধর্ম্মৌ বিপর্য্যস্ততো বর্ণ্যাবর্ণ্যসমৌ ভবতঃ।

অনুবাদ। খ্যাপনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বাদীর সংস্থাপনীয় সাধ্যধর্ম্মকে
“বর্ণ্য” বলে, বিপর্য্যবশতঃ “অবর্ণ্য” অর্থাৎ পূর্বোক্ত “বর্ণ্য”র বিপরীত দৃষ্টান্ত
পদার্থকে “অবর্ণ্য” বলে। সাধ্যধর্ম্ম ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সেই এই ধর্ম্মদ্বয়কে
(বর্ণ্যত্ব ও অবর্ণ্যত্বকে) বিপর্য্যাসকারী অর্থাৎ বিপরীত ভাবে আরোপকারী প্রতিবাদীর
(৫) বর্ণ্যসম ও (৬) অবর্ণ্যসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ অবর্ণ্য দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণ্যত্বের

আৰোপ কৰিয়া উত্তৰ কৰিলে “বৰ্ণ্যসম” এবং বৰ্ণ্য সাধ্যধৰ্ম্মোতে অবৰ্ণ্যত্বের আৰোপ কৰিয়া উত্তৰ কৰিলে “অবৰ্ণ্যসম” নামক প্রতিষেধ হয়।

টিপ্পনী। বাদীৰ বাহা বৰ্ণনীয় অৰ্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্তাদিৰ দ্বাৰা খ্যাপনীয় বা সংস্থাপনীয়, তাহাকে “বৰ্ণ্য” বলা যায়। যেমন বাদী আত্মাকে সক্রিয় বলিয়া খ্যাপন বা সংস্থাপন কৰিলে, সেখানে সক্রিয়ত্বৰূপে আত্মাই বৰ্ণ্য। এবং শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন কৰিলে সেখানে অনিত্যত্বৰূপে শব্দই বৰ্ণ্য। উক্ত স্থলে আত্মাতে সক্রিয়ত্ব এবং শব্দে অনিত্যত্ব প্রতিবাদী স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা সিদ্ধ না হওয়ায় সন্দিগ্ধ পদার্থ। তাই উক্ত স্থলে আত্মা ও শব্দ সন্দিগ্ধসাধ্যক পদার্থ। সুতরাং সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বই “বৰ্ণ্যত্ব”, ইহাই ফলিতার্থ হয়। তাহা হইলে উহার বিপরীত ধৰ্ম্ম নিশ্চিতসাধ্যকত্বই “অবৰ্ণ্যত্ব”, ইহা বুঝা যায়। বাদীৰ গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধৰ্ম্ম নিশ্চিতই থাকে। উহা সেখানে সন্দিগ্ধ হইলে সেই পদার্থ দৃষ্টান্তই হয় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ বাদীৰ সাধ্যধৰ্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া পূৰ্ব্বসিদ্ধ থাকায় উহার বৰ্ণন বা স্থাপন কৰিতে হয় না। ফলকথা, নিশ্চিতসাধ্যকত্বই “অবৰ্ণ্যত্ব”, উহা দৃষ্টান্তগত ধৰ্ম্ম। সূত্রে “বৰ্ণ্য” ও “অবৰ্ণ্য” শব্দেৰ দ্বাৰা পূৰ্ব্বোক্তৰূপ বৰ্ণ্যত্ব ও অবৰ্ণ্যত্ব ধৰ্ম্মই বিবক্ষিত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষ্যকারেৰ কথার দ্বাৰাও তাহাই বুঝা যায়। কারণ, ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, সাধ্যধৰ্ম্ম ও দৃষ্টান্ত পদার্থেৰ পূৰ্ব্বোক্ত ধৰ্ম্মদ্বয়কে যিনি বিপরীত ভাবে আৰোপ করেন, তাঁহার ঐ উত্তৰ যথাক্রমে “বৰ্ণ্যসম” ও “অবৰ্ণ্যসম” হয়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীৰ কথিত “অবৰ্ণ্য” পদার্থে অৰ্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে বৰ্ণ্যত্ব অৰ্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আৰোপ কৰিয়া উত্তৰ কৰিলে, উহা হইবে “বৰ্ণ্যসম” এবং বাদীৰ সাধ্যধৰ্ম্ম বাহা বাদীৰ বৰ্ণ্য পদার্থ, তাহাতে অবৰ্ণ্যত্ব অৰ্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বের আৰোপ কৰিয়া উত্তৰ কৰিলে, উহা হইবে অবৰ্ণ্যসম। যেমন ভাষ্যকারেৰ পূৰ্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আত্মা লোষ্টেৰ ত্ৰায় সক্রিয়, ইহা বলিলে ঐ লোষ্টেও আত্মাৰ ত্ৰায় বৰ্ণ্য অৰ্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক হউক ? কারণ, সাধ্যধৰ্ম্ম বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ সমানধৰ্ম্ম হওয়া আবশ্যক। বাহা দৃষ্টান্ত, তাহাতে সাধ্যধৰ্ম্ম বা পক্ষেৰ ধৰ্ম্ম (বৰ্ণ্যত্ব) না থাকিলে, তাহা ঐ পক্ষেৰ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং লোষ্টেও আত্মাৰ ত্ৰায় সন্দিগ্ধসাধ্যক পদার্থ, ইহা স্বীকাৰ্য্য। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার দৃষ্টান্ত লোষ্টেকেও আত্মাৰ ত্ৰায় সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া স্বীকার কৰিতে বাধ্য হইলে, উহা দৃষ্টান্তই হয় না। সুতরাং বাদীৰ উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ হয় এবং তাহা হইলে বাদীৰ উক্ত হেতু সপক্ষে অৰ্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট কোন পদার্থে না থাকায় কেবল পক্ষমাত্রই হওয়ায় “অসাধারণ” নামক হেত্বাভাস হয়। পূৰ্ব্বোক্তৰূপে বাদীৰ অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি এবং অসাধারণ নামক হেত্বাভাসেৰ উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীৰ উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচাৰ্য্য প্রভৃতি উক্ত “বৰ্ণ্যসম” প্রতিষেধকে বলিয়াছেন,—“অসাধারণদেশনাভাস”।

এইরূপ পূৰ্ব্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বিপরীত ভাবে বলেন যে, আত্মা লোষ্টেৰ ত্ৰায় সক্রিয়, ইহা বলিলে ঐ আত্মাও লোষ্টেৰ ত্ৰায় অবৰ্ণ্য অৰ্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক হউক ? কারণ, আত্মা লোষ্টেৰ

সমানধর্মী না হইলে লোষ্ট্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পরন্তু আত্মা লোষ্ট্রের ত্রায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু লোষ্ট্রের ত্রায় অবর্ণ্য অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “অবর্ণ্যসম” নামক প্রতিষেধ বা “অবর্ণ্যসমা” জাতি। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট্র নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ। অর্থাৎ সক্রিয়ত্বরূপ সাধ্যধর্ম উহাতে নিশ্চিত আছে বলিয়াই বাদী উহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ উহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার গৃহীত হেতু নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্থস্থ বলিয়াই তাঁহার সাধ্যধর্মের সাধক হয়, ইহা তাঁহার স্বীকার্য। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সাধ্যধর্মী বা পক্ষ যে আত্মা, তাহা নিশ্চিতসাধ্যক না হইলে নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্থস্থ ঐ হেতু আত্মাতে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। কারণ, যাদৃশ হেতু দৃষ্টান্তে থাকিয়া সাধ্যসাধক হয়, তাদৃশ হেতু পক্ষে না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদী ঐ স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণের জন্য তাঁহার সাধ্যধর্মী বা পক্ষ আত্মাকেও শেষে লোষ্ট্রের ত্রায় নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে, উহা উক্ত অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, সন্ধিগ্ধসাধ্যক পদার্থই উক্তরূপ অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত অনুমানে আশ্রয়ানিদ্ধি দোষ অনিবার্য। এইরূপে উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি বা আশ্রয়ানিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত “অবর্ণ্যসমা” জাতিকে বলিয়াছেন,— “অসিদ্ধিদেহনাভাসা”। বাদীর সমস্ত অনুমানেই জিগীষু প্রতিবাদী উক্তরূপে “বর্ণ্যসমা” ও “অবর্ণ্যসমা” জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই ভাষ্যকার ঐ জাতিদ্বয়ের কোন উদাহরণবিশেষ প্রদর্শন করেন নাই।

ভাস্য। সাধনধর্মযুক্তো দৃষ্টান্তে ধর্ম্মান্তরবিকল্পঃ সাধ্যধর্ম্মবিকল্পঃ প্রসঙ্গয়তো বিকল্পসমঃ। ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তঃ কিস্কিদ্গুরু, যথা লোষ্ট্রঃ, কিস্কিল্লঘু, যথা বায়ুঃ। এবং ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তঃ কিস্কিৎ ক্রিয়াবৎ স্রাৎ, যথা লোষ্ট্রঃ, কিস্কিদক্রিয়ং স্রাদ্যথা আত্মা। বিশেষো বা বাচ্য ইতি।

অনুবাদ। সাধনরূপ ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তে অন্য ধর্ম্মের বিকল্প-প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের বিকল্প প্রসঙ্গনকারী অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারের আপত্তিপ্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৭) “বিকল্পসম” প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্বেবক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন)—ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট্র, কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু। এইরূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য সক্রিয় হউক—যেমন লোষ্ট্র, কোন দ্রব্য নিষ্ক্রিয় হউক, যেমন আত্মা। অথবা বিশেষ বক্তব্য, অর্থাৎ লোষ্ট্রের ত্রায় আত্মাও যে সক্রিয়ই হইবে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য, কিন্তু তাহা নাই।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার “বিকল্পসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধনরূপ ধর্মযুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুরূপ যে ধর্ম, সেই ধর্মবিশিষ্ট বাদীর দৃষ্টান্তে অল্প কোন একটি ধর্মের বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর হেতুতে সেই অল্প ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতে বাদীর সাধ্যধর্মের বিকল্প প্রসঙ্গন অর্থাৎ ব্যভিচারের আপাদন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার ঐ উক্তের নাম “বিকল্পসম”। যেমন কোন বাদী বলিলেন,—“আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ।” উক্ত স্থলে ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা বাদীর সাধনরূপ ধর্ম অর্থাৎ হেতু। বাদীর দৃষ্টান্ত লোষ্ট্রে ঐ ধর্ম আছে, কিন্তু লঘুত্ব ধর্ম নাই। সুতরাং বাদীর দৃষ্টান্তে তাঁহার হেতু লঘুত্বধর্মের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ঐ ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করিলে, তাঁহার ঐ উক্ত “বিকল্পসম” নামক প্রতিষেধ হইবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন কোন দ্রব্য (লোষ্ট্র) গুরু, কোন দ্রব্য (বায়ু) লঘু, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন দ্রব্য (লোষ্ট্র) সক্রিয়, কোন দ্রব্য (আত্মা) নিষ্ক্রিয় হউক? ক্রিয়ার কারণ-গুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্মা যে সক্রিয়ই হইবে, নিষ্ক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন লোষ্ট্র গুরু, বায়ু লঘু, ঐরূপ দ্রব্যমাত্রই গুরু বা লঘু, ঐরূপ কোন এক প্রকারই নহে, উহাতে গুরুত্ব ও লঘুত্ব, এই “বিকল্প” অর্থাৎ বিরুদ্ধ প্রকার আছে, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট্র প্রভৃতি সক্রিয় হইলেও আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ঐরূপ দ্রব্যের সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারও আছে, ইহাও ত বলিতে পারি। তাহা হইলে আত্মাতে যে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে, তাহা ঐ আত্মাতেই বাদীর সাধ্যধর্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় ঐ হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উক্ত “বিকল্পসম” প্রতিষেধ। বার্তিককার তাঁহার পূর্বোক্ত “শব্দোহনিত্য উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ ঘটবৎ” এই প্রয়োগস্থলেই উক্ত “বিকল্পসম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, উৎপত্তিধর্মক হইলেও যেমন শব্দ বিভাগজন্ম, কিন্তু ঘট বিভাগজন্ম নহে, তদ্রূপ উৎপত্তিধর্মক হইলেও শব্দ নিত্য, কিন্তু ঘটাদি অনিত্য, ইহাও ত হইতে পারে। অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক পদার্থের মধ্যে যেমন বিভাগজন্ম এবং অবিভাগজন্ম, এই বিরুদ্ধ প্রকার আছে, তদ্রূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারভেদও থাকিতে পারে। তাহা হইলে শব্দে অনিত্যত্ব না থাকায় উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতু ঐ শব্দেই অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারী হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উক্ত “বিকল্পসম” নামক প্রতিষেধ বা “বিকল্পসমা” জাতি। “বিকল্প”-প্রযুক্ত সম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্বোক্তরূপ বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই উভয় পক্ষে সাম্যের অভিমান করেন, এ অল্প উহা “বিকল্পসম” এই নামে কথিত হইয়াছে। “বিকল্প” শব্দের অর্থ এখানে বিরুদ্ধ প্রকার, উহার দ্বারা ব্যভিচারই বিবক্ষিত। কারণ, পূর্বোক্তরূপে বাদীর হেতুতে তাঁহার সাধ্য ধর্মের ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত “বিকল্পসমা” জাতিকে বলিয়াছেন,—“অনৈকান্তিকদেশনাভাসা”। “অনৈকান্তিক”

শব্দের অর্থ এখানে “সব্যভিচার” নামক হেতুভাঙ্গ বা দৃষ্ট হেতু (প্রথম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের স্বল্প বিচারানুসারে “ভাট্টিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, (১) বাদীর হেতুরূপ ধর্ম অথবা যে কোন ধর্মের ব্যভিচার, অথবা (২) অথবা যে কোন ধর্ম বাদীর সাধ্য ধর্মের ব্যভিচার, (৩) অথবা যে কোন ধর্ম তত্ত্বিন্ন যে কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতেও তাঁহার সাধ্যধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উক্তর “বিকল্পসমা” জাতি হইবে। প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ যে কোন ব্যভিচার জ্ঞানই উক্ত জাতির উত্থানের হেতু। তন্মধ্যে বাদীর হেতুতে অথবা কোন ধর্মের ব্যভিচার আবার ত্রিবিধ। (১) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তে ব্যভিচার, (২) বাদী পদার্থদ্বয় পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে, সেই পক্ষদ্বয়ে ব্যভিচার এবং (৩) বাদী পদার্থদ্বয় দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিলে, সেই দৃষ্টান্তদ্বয়ে ব্যভিচার। সুত্রে “সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ” এই বাক্যের দ্বারা সাধ্যদ্বয় অর্থাৎ পক্ষদ্বয় এবং দৃষ্টান্তদ্বয়ও এক পক্ষে বৃত্তিতে হইবে। বরদরাজ শেষে স্বত্রার্থ ব্যাখ্যায় ঐ কথাও বলিয়াছেন এবং তিনি উক্ত মতানুসারে পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার ত্রিবিধ ব্যভিচার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া সর্বপ্রকার “বিকল্পসমা” জাতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। “বাদিবিবাদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিলেও তিনি উহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী “শঙ্কোহনিত্যঃ কার্যাত্মাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঐ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্যাত্ম হেতু গুরুত্ব ধর্মের ব্যভিচারী, ঐ গুরুত্ব ধর্মও অনিত্যত্ব ধর্মের ব্যভিচারী এবং ঐ অনিত্যত্ব ধর্ম মূর্ত্তত্ব ধর্মের ব্যভিচারী। এইরূপে ধর্মমাত্রই যখন তদ্ভিন্ন ধর্মের ব্যভিচারী, তখন কার্যাত্মরূপ ধর্মও অর্গাৎ বাদীর হেতুও অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে? কারণ, কার্যাত্ম এবং অনিত্যত্বও ধর্ম। ধর্মমাত্রই তদ্ভিন্ন ধর্মের ব্যভিচারী হইলে কার্যাত্মরূপ ধর্মও অনিত্যত্বরূপ ধর্মের ব্যভিচারী কেন হইবে না? তদ্বিশেষে কোন বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর হেতু কার্যাত্ম ধর্ম তাঁহার সাধ্যধর্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করিলে উক্ত স্থলে তাঁহার ঐ উক্তর “বিকল্পসমা” জাতি।

ভাষ্য। হেত্বাদ্যবয়বসামর্থ্যযোগী ধর্মঃ সাধ্যঃ। তং দৃষ্টান্তে প্রসঙ্গয়তঃ সাধ্যসমঃ। যদি যথা লোফ্টস্তথাত্মা, প্রাপ্তস্তহি যথাত্মা তথা লোফ্ট ইতি। সাধ্যশ্চায়মাত্মা ক্রিয়াবানিতি, কামং লোফ্টৌহপি সাধ্যঃ? অথ নৈবং? ন তর্হি যথা লোফ্টস্তথাত্মা।

১। ধর্মশ্রেণীকল্প কেদাপি ধর্মের ব্যভিচারতঃ।

হেতোশ্চ ব্যভিচারোক্তে বিকল্পসমজাতিতঃ।—ভাট্টিকরক্ষা।

অনুবাদ। হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ্যযুক্ত ধর্ম সাধ্য, দৃষ্টান্ত পদার্থে সেই সাধ্যকে প্রসঙ্গনকারীর অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্তও সাধ্য হউক? এইরূপ আপত্তি-প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৮) “সাধ্যসম” প্রতিবেদন হয়। (যেমন পূর্বেবক্তৃতা স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন যে) যদি যেমন লোফ্ট, তদ্রূপ আত্মা হয়, তাহা হইলে যেমন আত্মা, তদ্রূপ লোফ্ট প্রাপ্ত হয়। (তাৎপর্য্য) এই আত্মা সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য, স্মৃতরাং লোফ্টও সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য হউক? আর যদি এইরূপ না হয় অর্থাৎ লোফ্টও আত্মার ন্যায় সাধ্য না হয়, তাহা হইলে যেমন লোফ্ট, তদ্রূপ আত্মা হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত “উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ষড়্বিধ প্রতিষেধের মধ্যে শেষোক্ত ষষ্ঠ “সাধ্যসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিবার জন্য প্রথমে উক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যে, হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ্যবিশিষ্ট যে ধর্ম (পদার্থ), তাহাই “সাধ্য”। ভাষ্যকার তায়দর্শনের ভাষ্যরস্তুে “সামর্থ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়া, সেখানে ঐ “সামর্থ্য” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, ফলের সহিত সম্বন্ধ। এবং পরে উপনয়নসূত্রের (১।১।৩৮) ভাষ্যেও ভাষ্যকার যে “সামর্থ্য” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যাতেও শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (প্রথম ৩৩, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। স্মৃতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত “সামর্থ্য” শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, বাদী হেতু ও উদাহরণাদি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করেন, অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করাই বাদীর উদ্দেশ্য হওয়ায় ঐ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফলসম্বন্ধ যে পদার্থে থাকে, সেই পদার্থই এখানে “সাধ্য” শব্দের অর্থ। যেমন কোন বাদী “আত্মা সক্রিয়ঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগপূর্বক হেতু ও উদাহরণাদি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সংস্থাপন করিলে, সেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই বাদীর “সাধ্য” বা সাধ্যধর্ম্ম। কারণ, উক্ত স্থলে হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ ব্যতীত বাদী সক্রিয়ত্বরূপে আত্মার সংস্থাপন করিতে পারেন না এবং সক্রিয়ত্বরূপে আত্মার সিদ্ধি বা অস্বাভাবিকতা বাদীর ঐ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফল। স্মৃতরাং উক্ত স্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই ঐ সমস্ত অবয়বের ফলসম্বন্ধরূপ “সামর্থ্য”বিশিষ্ট। ফলকথা, হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থ যেক্রমে সংস্থাপিত হয়, সেই পদার্থই সেইরূপে সাধ্য, ইহাই এখানে “সাধ্য” শব্দের অর্থ। বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ সেইরূপে সিদ্ধিই থাকায় উহা সাধ্য নহে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই দৃষ্টান্ত পদার্থকে উক্তরূপ সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর ঐ উত্তরের নাম “সাধ্যসম” প্রতিবেদন। বাদীর সমস্ত অনুমান প্রয়োগেই জিগীষু প্রতিবাদী ঐরূপ উত্তর করিতে পারেন। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি যেমন লোফ্ট, তদ্রূপ আত্মা, ইহা

হয়, তাহা হইলে যেমন আত্মা, তদ্রূপ লোষ্ট্র, ইহাও হউক ? অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা লোষ্ট্রও সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক ? কারণ, আত্মা হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য, লোষ্ট্র উহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু লোষ্ট্রও ঐরূপে সাধ্য না হইলে তদদৃষ্টান্তে আত্মাও ঐরূপে সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম্য পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং লোষ্ট্রও আত্মার ত্রায় উক্তরূপে সাধ্যত্ব ধর্ম্য না থাকিলে উহা দৃষ্টান্ত বলা যায় না। ভাষ্য-কারের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ সাধ্য পদার্থেরই আরোপ করেন, ইহাই বুঝা যায়। উক্ত স্থলে বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লোষ্ট্র আত্মার ত্রায় সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য না হইলে উহা উক্ত স্থলে দৃষ্টান্তই হইতে পারে না, সুতরাং দৃষ্টান্তের অভাবে বাদীর উক্তরূপে অনুমান বা সাধ্যাসিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই প্রতিবাদীর চরম বক্তব্য। পূর্বোক্ত “বর্ণ্যসমা” জাতি স্থলেও বাদীর দৃষ্টান্তে সন্ধিগ্ধসাধ্যত্ব-রূপ বর্ণ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদী দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত “সাধ্যসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থকে তাঁহার সাধ্যধর্ম্যের ত্রায় হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলেন যে, লোষ্ট্র যে সক্রিয়, ইহাতে হেতু কি ? উহাও আত্মার ত্রায় হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সক্রিয়ত্ব-রূপে সাধন করিতে হইবে, নচেৎ উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত “বর্ণ্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ বলেন না। সুতরাং উহা হইতে এই “সাধ্যসমা” জাতির উক্তরূপ বিশেষ আছে। উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়*।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের মতানুসারে “তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ উক্ত “সাধ্যসমা” প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমানে তাঁহার পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতু প্রযুক্তই সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম “সাধ্যসমা”*। অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার দৃষ্টান্ত পদার্থে যে, তোমার সাধ্যধর্ম্য আছে, তাহাতেও তোমার উক্ত হেতুই

১। ঘটো বা অনিত্য ইত্যত্র কো হেতুরন্যপি সাধ্যত্বং জ্ঞাপয়িতব্য ইতি সাধ্যত্বংপ্রত্যবস্থানং সাধ্যসমাঃ।—
ত্রায়বার্তিক। হেতুদ্বাবয়বযোগিহপ্রসঙ্গনং সাধ্যসমাঃ। অতএব “উভয়সাধ্যত্বা”দ্বিতী সাধ্যত্বং হেতুসাহ সাধ্যসমন্ত
স্বত্রকারঃ। ভাষ্যকারোহপি “হেতুদ্বাবয়বসামর্থ্যযোগী”তি ব্রহ্মণস্তংপ্রসঙ্গনং সাধ্যসমাঃ মন্ততে। তদেতদ্বার্তিককুদাহ—
“ঘটো বা অনিত্য ইত্যত্র কো হেতুরিতি”—তাৎপর্যটীকা।

উভয়োরপি সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ সাধ্যত্বাপাদনেন প্রত্যবস্থানং সাধ্যসমাঃ প্রতিষেধঃ। যদি সপা ঘটুত্থা শব্দঃ, প্রাপ্তং
তর্হি যথা শব্দস্তথা ঘট ইতি। শব্দচানিত্যতয়া সাধ্য ইতি ঘটোহপি সাধ্য এব প্রাপ্তত্বথাহি ন তেন তুল্যো ভবেদिति।—
ত্রায়মঞ্জরী।

২। দৃষ্টান্ত-হেতুপক্ষাণং সিদ্ধানামপি সাধ্যত্বং।

সাধ্যত্বাপাদনং তস্মাল্লিঙ্গাৎ সাধ্যসমো ভবেৎ ॥১৬॥

প্রমাণান্তরসিদ্ধানামেব পক্ষহেতুদৃষ্টান্তানাং সাধ্যধর্ম্যস্তেব তত এব লিঙ্গাৎ সাধ্যত্বাপাদনং সাধ্যসমাঃ। ‘তস্মা-’
দ্বিতী বর্ণ্যসমতো ভেদং দর্শয়তি।—তর্কিকরক্ষা।

সাধকরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার ঐ হেতু তোমার পক্ষেও তোমার ঐ সাধ্যধর্মের সাধক হইতে পারে না। সুতরাং তোমার ঐ দৃষ্টান্তও ঐ হেতুর দ্বারাই তোমার সাধ্যধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে, পূর্বের উহা সিদ্ধ না থাকায় উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এবং তোমার ঐ পক্ষ এবং হেতুও পূর্বসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ উভয়ও তোমার উক্ত হেতুর দ্বারাই সাধ্য হইতেছে। কারণ, তোমার সাধ্যধর্মের ত্রায় তোমার ঐ পক্ষ বা ধর্মীও উক্ত অনুমানে বিশেষরূপে বিষয় হইবে এবং তোমার উক্ত হেতুও তাহাতে উক্ত পক্ষের বিশেষণরূপে বিষয় হইবে। (উদয়নাচার্য্যের মতে হেতুবিশিষ্ট পক্ষেই সাধ্যধর্মের অনুমান হয়। উহারই নাম লিঙ্গোপধান মত)। সুতরাং উক্ত হেতু ও পক্ষের সিদ্ধির জন্তও উক্ত হেতুই প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমান স্থলে সর্বত্র সাধ্যধর্মের ত্রায় হেতু এবং পক্ষও সাধ্য, উহাও সিদ্ধ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্বসিদ্ধ না হইলে কোন পদার্থ হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে হেতুসিদ্ধি ও পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়সিদ্ধি এবং দৃষ্টান্তসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত “বর্ণ্যসমা” জাতিস্থলে প্রতিবাদী বাদীর সেই হেতু প্রযুক্ত উক্তরূপে বাদীর দৃষ্টান্তে এবং তাঁহার সেই হেতু ও পক্ষে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন না। সুতরাং “বর্ণ্যসমা” জাতি হইতে এই “সাধ্যসমা” জাতির ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্তই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি “সাধ্যসমা” জাতির উক্তরূপই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “বাদিবিবাদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির সূত্রে “উভয়সাধ্যত্বাৎ” এই যে বাক্যের দ্বারা উক্ত “সাধ্যসমে”র স্বরূপ সূচিত হইয়াছে, উহাতে “উভয়” শব্দের দ্বারা সূত্রের প্রথমোক্ত সাধ্যধর্মী অর্থাৎ পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত, এই উভয়ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ তাঁহার ব্যাখ্যাত মতানুসারে উক্ত “উভয়সাধ্যত্বাচ্চ” এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমানে সাধ্যধর্মই সাধ্য, এবং হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত সিদ্ধই থাকে। সুতরাং অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ই থাকে। ঐ উভয়ই সূত্রে “উভয়” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ। এবং “চ” শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত ধর্মবিকল্পের সমুচ্চয়ই মহর্ষির অভিमत। পূর্বোক্ত সিদ্ধ ও সাধ্য, এই উভয়ের সিদ্ধসাধ্যত্বই এখানে মহর্ষির অভিमत ধর্মবিকল্প। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ের সাধ্যত্ব প্রযুক্ত এবং ঐ উভয়ের সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব, এই ধর্মবিকল্প প্রযুক্ত “সাধ্যসমা” প্রতিবেদ হয়। ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর সাধ্যধর্মের ত্রায় হেতু প্রভৃতি সিদ্ধ পদার্থেও বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্ত সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে সেখানে “সাধ্যসমা” প্রতিবেদ হইবে, ইহাই সূত্রে “উভয়সাধ্যত্বাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই “সাধ্যসমা” জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সূত্রোক্ত “উভয়” শব্দের দ্বারা বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়া, শেষে লিখিয়াছেন, “তদ্বর্ণ্যো হেতাদিঃ”। সূত্রে কিন্তু “উভয়” শব্দের পরে “ধর্ম” শব্দের প্রয়োগ নাই। বৃত্তিকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অনুমান প্রয়োগ দ্বারা সাধ্য পদার্থই তাঁহার অনুমানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বাদীর পক্ষ এবং (উদয়নাচার্য্যের মতে)

হেতুও অনুমানের বিষয় হওয়ার ঐ উভয়ও সাধ্য স্বীকার্য এবং হেতু পদার্থে উক্তরূপ সাধ্য স্বীকার্য হইলে সেই হেতু বিশিষ্ট দৃষ্টান্তও সাধ্য, ইহা স্বীকার্য। উক্তরূপে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্তেও সাধ্য বা সাধ্যতুল্যতার আপত্তি প্রকাশ করিলে, সেখানে ঐ উক্তর “সাধ্যসম” জাতি হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর ঐ পক্ষ প্রভৃতি পূর্বসিদ্ধ পদার্থ হইলে, উহা তাঁহার অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, পূর্বসিদ্ধ পদার্থে বাদীর অনুমান-প্রয়োগ-সাধ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পক্ষ প্রভৃতি পদার্থও যে বাদীর সাধ্যধর্মের ত্রায় পূর্বসিদ্ধ নহে, কিন্তু সাধ্য, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাদীর উক্ত অনুমানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়সিদ্ধি প্রভৃতি দোষ অনিবার্য। কারণ, যাহা পূর্বসিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহা পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, ইহা বাদীও স্বীকার করেন। বৃত্তিকার প্রভৃতির মতে সূত্রে “সাধ্যসম” এই নামে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্য স্বীকার্যই বিবক্ষিত। পূর্বোক্তরূপ সাধ্য প্রযুক্ত সম, এই অর্থেই “সাধ্যসম” নামের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। এতেষামুক্তরং—

অনুবাদ। এই সমস্ত প্রতিষেধের অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত “উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ষড়্বিধ প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যা দুপসংহার-সিদ্ধিবৈধর্ম্যা-
দপ্রতিষেধঃ ॥৫॥৪৬৩॥

অনুবাদ। কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপসংহারের সিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ “যথা গো, তথা গবয়” ইত্যাদি উপমানবাক্য সর্বসিদ্ধ থাকায় বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। অলভ্যঃ সিদ্ধস্য নিহুবঃ। সিদ্ধঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যা-
দুপমানং যথা গোস্তথা গবয় ইতি। তত্র ন লভ্যো গোগবয়য়োর্ধর্ম-
বিকল্পশ্চোদয়িতুং। এবং সাধকে ধর্ম্যে দৃষ্টান্তাদিসামর্থ্যযুক্তে ন লভ্যঃ
সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম্যবিকল্পবৈধর্ম্যাৎ প্রতিষেধো বক্তুমিতি।

অনুবাদ। সিদ্ধ পদার্থের নিহুব অর্থাৎ অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নহে। যথা—
কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ উপমানবাক্য সিদ্ধ আছে।
সেই স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্ম্যবিকল্প অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্য আশঙ্কা করিবার নিমিত্ত
লভ্য নহে। (অর্থাৎ উক্তরূপ উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে গবয়ও গোর ত্রায়
সামান্য ধর্ম্যবিশিষ্ট হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, গো
এবং গবয়ের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যপ্রযুক্তই “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ উপসংহার সিদ্ধ

হয়) এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থ্যবিশিষ্ট সাধক ধর্ম অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট প্রকৃত হেতু প্রযুক্ত হইলে সাধ্যধর্মো ও দৃষ্টান্তের ধর্মবিকল্পরূপ বৈধর্ম্য-প্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্ত লভ্য হয় না (অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের ধর্মবিকল্পরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ করেন, তাহা হইতে পারে না । কারণ, বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য থাকিলেও অনেক বৈধর্ম্যও স্বীকার্য) ।

টিপ্পনো । পূর্বসূত্রের দ্বারা “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি যে ষড়্বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, উহার পরীক্ষা করা অর্থাৎ ঐ সমস্ত জাতি যে অসম্ভব, তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা আবশ্যক । তাই মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত ষড়্বিধ জাতির খণ্ডনে যুক্তি বলিয়াছেন এবং পরবর্তী সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “বর্ণ্যসমা”, “অবর্ণ্যসমা” ও “সাধ্যসমা” জাতির খণ্ডনে অপর যুক্তিবিশেষও বলিয়াছেন । তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য, বরদরাজ, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই কথাই বলিয়াছেন । কিন্তু “শ্রাদ্ধমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, ‘এই সূত্র দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিষেধের উত্তর কথিত হইয়াছে এবং পরবর্তী সূত্রদ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত ষষ্ঠ “সাধ্যসমে”র উত্তর কথিত হইয়াছে । পরে ইহা বুঝা যাইবে ।

বরদরাজ প্রভৃতির মতে এই সূত্রে “কিঞ্চিৎসাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম বা অনুমের ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্যই বিবক্ষিত । সুতরাং শেষোক্ত “বৈধর্ম্য” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত বিপরীত ধর্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য যে কোন ধর্মই বিবক্ষিত বুঝা যায় । শ্রাদ্ধসূত্রে নানা অর্থে “উপসংহার” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রে “উপসংহার” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়— প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন । তদনুসারে এই সূত্রেও “উপসংহার” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মের উপসংহারও বুঝা যায় । বরদরাজ ঐরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন^১ । কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে “উপসংহার” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মই গ্রহণ করিয়াছেন^২ । অনুমানের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যাহা উপসংহৃত অর্থাৎ নিশ্চিত হয়, এই অর্থে “উপসংহার” শব্দের দ্বারা প্রকৃত সাধ্যধর্মও বুঝা যাইতে পারে । তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধর্ম্য বা প্রকৃত হেতু, তৎপ্রযুক্তই প্রকৃত সাধ্যধর্মের সিদ্ধি হয় অথবা তাহার উপসংহার অর্থাৎ সংস্থাপন সিদ্ধ হয়, অতএব বৈধর্ম্য অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন ধর্ম-

১ । “কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাদ্”বাণ্ডাৎ সাধ্যোপসংহারে সিদ্ধে “বৈধর্ম্য”নবাণ্ডাৎ কুতশ্চিদ্ধর্ম্যং প্রতিষেধো ন ভবতীত্যর্থঃ ।”—তর্কিকরক্ষা ।

২ । “কিঞ্চিৎসাধর্ম্যং” সাধর্ম্যবিশেষাৎ ব্যাপ্তিসংহিতাৎ, “উপসংহার-সিদ্ধেঃ” সাধাসিদ্ধেঃ, বৈধর্ম্যাদেতদ্বিপরীতাৎ ব্যাপ্তিনিরপেক্ষাৎ সাধর্ম্যমাত্রাৎ ভবতা কৃতঃ প্রতিষেধো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । অতথা প্রমেয়ত্বরূপাসাধকসাধর্ম্যং তদ্বর্ণনমপালম্যক্ সাদৃশ্যমিতি ভাবঃ ।—বিশ্বনাথবৃত্তি ।

প্রযুক্ত প্রতিবেদন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে প্রতিবেদন করেন, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার অভিमत কোন হেতুই ঐ সমস্ত স্থলে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে, কিন্তু ব্যাপ্তিশূন্য বিপরীত ধর্ম্ম। ঐরূপ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত কিছুই সিদ্ধ হয় না। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“বৈধর্ম্ম্যাদপ্রতিবেদঃ”।

কিন্তু এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, প্রথমোক্ত “সাধ্যধর্ম্মসমা” ও “বৈধর্ম্ম্যসমা” জাতির খণ্ডনের জন্য মহর্ষি পূর্বে “গোত্বাদগোসিদ্ধিবস্তৎসিদ্ধিঃ” এই তৃতীয় সূত্রের দ্বারা যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই আবার এই সূত্রের দ্বারা অত্র ভাবে বলা অনাবশ্যক; পরন্তু পূর্বসূত্রোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির খণ্ডনের অন্তর্কূল অপর বিশেষ যুক্তিও এখানে বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার অত্র ভাবে এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, সিদ্ধ পদার্থের নিহব অর্থাৎ অপলাপ বা নিষেধ লভ্য নহে। অর্থাৎ সর্বসিদ্ধ পদার্থের নিষেধ একেবারেই অসম্ভব, উহা অলৌক। ভাষ্যকার এই ভাব ব্যক্ত করিতেই “অশকাঃ” এইরূপ বাক্য না বলিয়া, “অলভাঃ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা অলৌক, তাহা নিষেধের জন্য লভ্যই হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির সূত্রানুসারে উদাহরণ দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিৎসাধ্যধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ উপমানবাক্য সিদ্ধ আছে অর্থাৎ উহা সর্বসিদ্ধ। উক্ত স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্ম্মবিকল্প আপাদন করিবার নিমিত্ত লভ্য নহে। অর্থাৎ উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেখানে গবয়ে গোর সমস্ত ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, কিঞ্চিৎসাধ্যধর্ম্ম্য প্রযুক্তই “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গবয়ে গোর সমস্ত ধর্ম্ম থাকে না, উহা অসম্ভব। বার্ত্তিককার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, “যথা গো, তথা গবয়,” এইরূপ বাক্য বলিলে গোর সমস্ত ধর্ম্মই গবয়ে আছে, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বক্তার তাহাই বক্তব্য হইলে, উক্ত বাক্যে “যথা” ও “তথা” শব্দের প্রয়োগ হইত না, কিন্তু “গোপদার্থই গবয়” এইরূপই প্রয়োগ হইত। ফল কথা, ভাষ্যকার এই সূত্রের “কিঞ্চিৎসাধ্যধর্ম্ম্যাহুপসংহারসিদ্ধেঃ” এই অংশকে পূর্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তসূচক বলিয়া সূত্রোক্ত “উপসংহার” শব্দের দ্বারা “যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ উপমানবাক্যই এখানে মহর্ষির অভিमत দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে মহর্ষির মূল বক্তব্য সমর্থন করিতে পরে সূত্রের শেষোক্ত অংশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থ্য্যবিশিষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টান্তাদির দ্বারা যাহা সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, এমন সাধক ধর্ম্ম (হেতু) প্রযুক্ত হইলে, সেখানে বাদীর সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিবেদন বলিবার নিমিত্ত লভ্য নহে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্ম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত যে প্রতিবেদন করেন, তাহা করা যায় না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থ সর্বোৎকর্ষই সাধ্যধর্ম্মীর সমানধর্ম্মী হয় না। যেমন “যথা গো, তথা গবয়” এই উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে, সেখানে গোপদার্থে গবয়ের সমস্ত ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না, ওরূপ অনুমান স্থলে বাদীর সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহার দৃষ্টান্তগত সমস্ত ধর্ম্মের আপত্তি প্রকাশ

করা যায় না। কারণ, ঐ দৃষ্টান্ত পদার্থে যে ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বিদ্যমান থাকে, তদ্বারা সাধ্যধর্মীতে সেই ব্যাপক ধর্মই সিদ্ধ হয় ; তদ্বিত্তি ধর্ম সিদ্ধ হয় না। বার্তিককার মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, “শব্দোহনিত্যঃ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঘটের সমস্ত ধর্মই শব্দে আছে, ইহা বলা হয় না। কিন্তু যে পদার্থ যাহার সাধক অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম, সেই পদার্থই তাহার সাধন হয়। উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মী বা পক্ষ সেই সাধন বা প্রকৃত হেতুর উপসংহার করা হয়। উক্ত স্থলে উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতুর উপসংহার করিলে, তখন উক্ত অনুমানের দ্বারা শব্দে ঘটের ধর্ম অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয়—রূপাদি সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঐ হেতু রূপাদি সমস্ত পদার্থের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট নহে। ফলকথা, প্রতিবাদী হেতু পদার্থের স্বরূপ না বুঝিয়াই পূর্বোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ করেন, ইহাই বার্তিককারের মতে মহর্ষির মূল বক্তব্য। তাই বার্তিককার এখানে প্রথমেই বলিয়াছেন,—“ন হেতুর্থাপরিজ্ঞানাদিতি সূত্রার্থঃ”। মূল কথা, পূর্বসূত্রোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি ষড়্বিধ জাতিই অসম্ভব। কারণ, ঐ সমস্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষকে তাঁহার দৃষ্টান্তের সর্বাংশে সমানধর্মী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার সাধ্য বা আপাদ্য ধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন ধর্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুই প্রকৃত হেতু। উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মী বা পক্ষ উক্তরূপ প্রকৃত হেতুরই উপসংহার হয়। সুতরাং তাহার ফলে সাধ্যধর্মীতে সেই হেতুর ব্যাপক সাধ্যধর্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে উপনয়সূত্রে যদ্বারা সাধ্যধর্মীতে প্রকৃত হেতুর উপসংহার হয়, এই অর্থে উপনয়বাক্যকেও “উপসংহার” বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৭২—৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার এই সূত্রে “উপসংহার” শব্দের দ্বারা উপমানবাক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাকে সিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐ তাৎপর্য বুঝা যায়। পূর্বোক্ত উপমানবাক্যেও “তথা” শব্দের দ্বারা সমান ধর্মের উপসংহার হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপমান পরীক্ষায় “তথোপসংহারঃ” (২।১।৪৮) ইত্যাদি সূত্রে মহর্ষি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং উক্তরূপ তাৎপর্য (যদ্বারা সমান ধর্মের উপসংহার হয়, এই অর্থে) এই সূত্রে “উপসংহার” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত উপমানবাক্যও বুঝা বাইতে পারে ॥ ৫ ॥

সূত্র । সাধ্যাতিদেশাচ্চ দৃষ্টান্তোপপত্তেঃ ॥৬॥৪৬৭॥

অনুবাদ । এবং সাধ্যধর্মীর অতিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় প্রতিবেদন হয় না।

ভাষ্য । যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যাং, তেনাবিপরীতো-
হর্থোহতিদিশ্যতে প্রজ্ঞাপনর্থঃ । এবং সাধ্যাতিদেশাদৃষ্টান্ত উপপদ্য-
মানে সাধ্যত্বমুপপন্নমিতি ।

অনুবাদ । যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে,
অর্থাৎ যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই সম্মত প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, সেই (দৃষ্টান্ত)
পদার্থদ্বারা প্রজ্ঞাপনর্থ অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার জন্য অবিপরীত পদার্থ (সাধ্যধর্মী)
অতিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অবিপরীত ভাবে সাধ্যধর্মী বা পক্ষ
সেই দৃষ্টান্তগত ধর্ম কথিত বা সমর্থিত হয় । এইরূপ সাধ্যাতিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টান্ত
উপপদ্যমান হওয়ায় (তাহাতে) সাধ্যত্ব উপপন্ন হয় না ।

টিপ্পনী । জয়ন্ত ভট্টের মতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “সাধ্যসম” নামক প্রতিষেধেরই উত্তর
কথিত হইয়াছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি । বস্তুতঃ পূর্বোক্ত “সাধ্যসম” প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী
বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে যে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, এই সূত্রের দ্বারা সেই সাধ্যত্বের খণ্ডন-
পূর্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরলভাবে বুঝা
যায় । কিন্তু ইহার দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই নিশ্চিত সাধ্যধর্ম-
বিশিষ্ট এবং বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষ উহার বিপরীত অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক, ইহাও সমর্থিত হওয়ায়
ফলতঃ এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “বর্ণ্যসমা” ও “অবর্ণ্যসমা” জাতিরও খণ্ডন হইয়াছে, ইহাও
স্বীকার্য্য । কারণ, বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে, প্রতিবাদী তাহাতে
বর্ণ্যত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষ
সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে তাহাতে অবর্ণ্যত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্বেরও আপত্তি সমর্থন
করিতে পারেন না । এই জন্যই বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে বলিয়াছেন যে, এই সূত্র দ্বারা
মহর্ষি “বর্ণ্যসমা”, “অবর্ণ্যসমা” ও “সাধ্যসমা” জাতির খণ্ডনার্থ অপর যুক্তিবিশেষ বলিয়াছেন ।

সূত্রশেষে পূর্বসূত্রের শেষোক্ত “অপ্রতিষেধঃ” এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে
হইবে । সূত্রের প্রথমোক্ত “সাধ্য” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সাধ্যধর্মী বা পক্ষ । ঐ সাধ্যধর্মী
বা পক্ষে দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিপরীতভাবে অর্থাৎ উহার তুল্যভাবে সাধ্যধর্মের সমর্থনই এখানে ভাষা-
কারের মতে “সাধ্যাতিদেশ” । তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে লৌকিক ও
পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে অর্থাৎ মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে “লৌকিকপরীক্ষকাণাং
যস্মিন্নর্থো বুদ্ধিসাম্যাং স দৃষ্টান্তঃ” (১।২৫) এই সূত্র দ্বারা বেরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন,
তদ্বারা উহার অবিপরীত পদার্থ অর্থাৎ উহার অবিপরীত ভাবে (তুল্যভাবে) সাধ্যধর্মী বা পক্ষ
অতিদৃষ্ট হয় । উক্তরূপ “সাধ্যাতিদেশ”প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় তাহাতে সাধ্যত্বের উপপত্তি
হয় না । অর্থাৎ যাহা দৃষ্টান্ত, তাহা কখনই সাধ্য হইতে পারে না । সুতরাং তাহাতে সাধ্যত্বের

আপত্তি করা যায় না। জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐক্যপ তাৎপর্য বুঝা যায়। ফলকথা, “লৌকিকপরীক্ষাকাণ্ডে বস্মিন্নর্থো বুদ্ধিসাম্যঃ” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সমস্ত প্রমাণসিদ্ধ পদার্থকেই দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২২০:২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অনুমান স্থলে বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থে তাঁহার সাধ্যধর্ম নিশ্চিত অর্থাৎ বাদীর ত্রায় প্রতিবাদীরও উহা স্বীকৃত, ইহা স্বীকার্য, নচেৎ উহা দৃষ্টান্তই হয় না। পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে বাদী লোষ্ট্র দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিপরীত ভাবে অর্থাৎ যথা লোষ্ট্র, তথা আত্মা, এই প্রকারে এবং “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট দৃষ্টান্ত দ্বারা “যথা ঘট, তথা শব্দ” এই প্রকারে তাঁহার সাধ্যধর্ম বা পক্ষ আত্মা ও শব্দকে অতিদেশ করেন অর্থাৎ উহাতে তাঁহার সাধ্যধর্ম সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্বের সমর্থন করেন। সিদ্ধ পদার্থের দ্বারাই অসিদ্ধ পদার্থের ঐক্যপ অতিদেশ হয়। অসিদ্ধ পদার্থের দ্বারা ঐক্যপ অতিদেশ হয় না, হইতেই পারে না। সুতরাং উক্তরূপ অতিদেশপ্রযুক্ত প্রতিপন্ন হয় যে, বাদীর ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিত-সাধ্যক বলিয়া সর্বসম্মত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে লোষ্ট্র যে সক্রিয়, এবং “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট যে অনিত্য, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। এবং উক্ত স্থলে বাদীর সাধ্যধর্ম বা পক্ষ যে আত্মা ও শব্দ, তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক, ইহাও প্রতিবাদীর স্বীকৃত। সুতরাং প্রতিবাদী আর উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তকে “বর্ণ্য” অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যক বলিয়া এবং হেতু প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধ্যধর্ম আত্মা ও শব্দ প্রভৃতিকে বাদীর দৃষ্টান্তের ত্রায় “অবর্ণ্য” অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়াও আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না। “তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজও এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন যে, যে পদার্থপ্রযুক্ত অত্র অর্থাৎ সাধ্যধর্মে সাধ্যধর্ম অতিদৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। সিদ্ধ পদার্থ দ্বারাই অসিদ্ধ পদার্থের অতিদেশ হইয়া থাকে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু পক্ষ সাধ্য পদার্থ, ইহা স্বীকার্য। কারণ, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই উভয় পদার্থই সিদ্ধ অথবা সাধ্য পদার্থ হইলে দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের দৃষ্টান্ত কথিত হয়, তাহার নাম দার্ষ্টান্তিক। যেমন পূর্বোক্ত “আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে আত্মা দার্ষ্টান্তিক, লোষ্ট্র উহার দৃষ্টান্ত। “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগে শব্দ দার্ষ্টান্তিক, ঘট উহার দৃষ্টান্ত। উক্ত স্থলে আত্মা সক্রিয়ত্বরূপে এবং শব্দ অনিত্যত্বরূপে সাধ্য পদার্থ, এ জন্ত উহা দার্ষ্টান্তিক। এবং লোষ্ট্র সক্রিয়ত্বরূপে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে

১। “লৌকিকপরীক্ষাকাণ্ডে বস্মিন্নর্থো বুদ্ধিসাম্যঃ” স দৃষ্টান্তঃ,—তেনাবিপরীততয়া শব্দোহতিদিশ্যতে,—যথা ঘটঃ প্রযত্নানন্তরীকঃ সন্নিত্যঃ এবং শব্দোহপীতি” ইত্যাদি।—শ্রীমদ্বারী।

২। যতঃ সাধ্যধর্মোহন্ত্রাতিদিশ্যতে স দৃষ্টান্তঃ। সিদ্ধেন চাতিদেশো ভবত্যসিদ্ধন্তেতি ত্রায়ং সিদ্ধো দৃষ্টান্তঃ। পক্ষস্ত সাধ্যোহস্বীকার্যঃ। উভয়োরপি সিদ্ধত্ব সাধ্যত্ব বা দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকতাব্যবহিত ইতি।—তार्কিকরক্ষা। যতো বস্মাদ্দৃষ্টান্তানন্তত্র সাধ্যধর্মিনি, অতিদিশ্যতে যথা ঘটস্তথা শব্দোহপীতি প্রতিপাদ্যতে। “উভয়োরপি সিদ্ধত্ব” ইত্যবর্ণ্যসম্বন্ধকল্পনং। “সাধ্যত্ব” নেতি বর্ণ্যসাধ্যসম্বন্ধকল্পনমিতি বিভাগঃ।—লঘুদীপিকা টীকা।

সিদ্ধ পদার্থ, একত্র উক্ত স্থলে উহা দৃষ্টান্ত। উক্ত স্থলে লোষ্ট ও ঘট ঐরূপে সিদ্ধ পদার্থ না হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না এবং আত্মা ও শব্দ ঐরূপে সাধ্য না হইয়া সিদ্ধ হইলে, উহা দার্ষ্টান্তিক হইতে পারে না। বরদরাজের ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ সাধ্যধর্ম এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যধর্ম বা পক্ষে ঐ সাধ্যধর্মের অতিদেশই সূত্রোক্ত “সাধ্যাতিদেশ”, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার উক্ত ব্যাখ্যানুসারেও তাঁহার পূর্বকথিত বাদীর হেতু পদার্থে সাধ্যত্বের খণ্ডন বুঝা যায় না এবং মহর্ষির এই সূত্র দ্বারাও তাহা বুঝা যায় না।

বৃত্তিকার বিখ্যাত কষ্টকল্পনা করিয়া, সূত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত” শব্দ দ্বারা দৃষ্টান্তের স্থায় পক্ষও ব্যাখ্যা করিয়া, দৃষ্টান্ত ও পক্ষ উভয়েই প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রশ্নাসের কোন প্রশ্নোজন বুঝা যায় না এবং উহা প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা বলিয়াও মনে হয় না। সে যাহা হউক, মূল কথা, পূর্বোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি ষড়্বিধ জাতিও যে অসম্ভব, ইহা স্বীকার্য। কারণ, প্রতিবাদী অনুমানের পক্ষ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির সর্বসিদ্ধ লক্ষণ এবং পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তির অপলাপ করিয়া নিজের কল্পিত ঐ সমস্ত যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত-রূপ ঐ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, বাদীর অনুমানে ঐ সমস্ত অসত্য দোষের উদ্ভাবন করিলে, তিনি বাদীর হেতু প্রভৃতি অথবা বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান প্রয়োগ করিবেন, তাহাতেও তুল্যভাবে ঐরূপ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করা যায়;—তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন না। সুতরাং তুল্যভাবে তাঁহার নিজের অনুমানও খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার ঐ সমস্ত উত্তরই স্বব্যাবাহিকত্ববশতঃ অসম্ভব, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য। পূর্বোক্তরূপে স্বব্যাবাহিকত্বই “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি ষড়্বিধ জাতির সাধারণ ছষ্টত্বমূল। যুক্তাদ্বয়ীনত্ব এবং অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার প্রভৃতি যথাসম্ভব অসাধারণ ছষ্টত্বমূল। মহর্ষি দুই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত “উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি ষড়্বিধ জাতির সপ্তম অঙ্গ ঐ “মূল” সূচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

উৎকর্ষসমাদিজাতিষট্‌কপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

সূত্র। প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যা-
ইবিশিষ্টত্বাদপ্রাপ্ত্যাসাধকত্বাচ্চ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিসমৌ ॥

৭॥৪৬৮॥

অনুবাদ। সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া হেতুর সাধকত্ব, অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধকত্ব, প্রাপ্তিপ্রযুক্ত (হেতু ও সাধ্যের) অবিশিষ্টত্ববশতঃ (৯) প্রাপ্তিসম এবং অপ্রাপ্তি-প্রযুক্ত (হেতুর) অসাধকত্ববশতঃ (১০) অপ্রাপ্তিসম প্রতিবেদ হয়। (অর্থাৎ বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) আছে, এই পক্ষে ঐ উভয়েরই বিত্তমানতা

স্বীকার্য। নচেৎ ঐ উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু তাহা হইলে ঐ উভয়ের বিদ্যমানতারূপ অবিশেষবশতঃ সাধ্যসাধকভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের “প্রাপ্তি” প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে “প্রাপ্তিসম”। এবং হেতু ও সাধ্যধর্মের “প্রাপ্তি” অর্থাৎ কোন সম্বন্ধ নাই—এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উক্ত পক্ষেও ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্মের সাধক হইতেই পারে না, তাহা হইলে অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর ঐ প্রত্যবস্থানকে বলে অপ্রাপ্তিসম।)

ভাস্য। হেতুঃ প্রাপ্য বা সাধ্যঃ সাध्येদপ্রাপ্য বা, ন তাবৎ প্রাপ্য, প্রাপ্ত্যামবিশিষ্টত্বাদসাধকঃ। দ্বয়োবিবদ্যমানয়োঃ প্রাপ্তৌ সত্যং কিং কশ্চ সাধকং সাধ্যং বা।

অপ্রাপ্য সাধকং ন ভবতি, নাপ্রাপ্তঃ প্রদীপঃ প্রকাশয়তীতি। প্রাপ্ত্যা প্রত্যবস্থানং প্রাপ্তিসমঃ। অপ্রাপ্ত্যা প্রত্যবস্থানমপ্রাপ্তিসমঃ।

অনুবাদ। হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধন করিবে। (কিন্তু) প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিতে পারে না। (কারণ) প্রাপ্তি থাকিলে অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ থাকিলে অবিশিষ্টতাবশতঃ (ঐ হেতু) সাধক হয় না। (তাৎপর্য) বিদ্যমান উভয় পদার্থেরই প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) থাকায় কে কাহার সাধক অথবা সাধ্য হইবে।

সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধক হয় না, (যেমন) অপ্রাপ্ত প্রদীপ প্রকাশ করে না অর্থাৎ প্রদীপ যে ঘটাদিদ্রব্যকে প্রকাশ করে, উহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ উহার সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (৯) প্রাপ্তিসম। অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১০) অপ্রাপ্তিসম।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা (৯) প্রাপ্তিসম ও (১০) অপ্রাপ্তিসম নামক প্রতিষেধ-দ্বয়ের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। একই স্থলে এই উভয় প্রতিষেধ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ “প্রাপ্তিসম” প্রতিষেধের প্রয়োগ হইলে, সেখানে অন্য পক্ষে “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধেরও প্রয়োগ হয়। এ জন্য এই উভয় প্রতিষেধকে বলা হইয়াছে—“যুগনদ্ধবাহী”। তাই মহর্ষি এক সূত্রেই উক্ত উভয় প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে “হেতোঃ” এই পদের পরে “সাধকত্বং” এই পদের অধ্যাহার করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়া হেতুর সাধকত্ব অথবা প্রাপ্ত না

হইয়া সাধকত্ব, ইহাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও সূত্রের ঐ প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিবে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া সাধন করিবে। সূত্রে “সাধ্য” শব্দের অর্থ এখানে সাধ্যধর্ম অর্থাৎ অনুমেয় ধর্ম। “প্রাপ্তি” শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। তাহা হইলে সূত্রের ঐ প্রথম অংশের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সাধ্যধর্ম সাধন করিবার জন্ত যে হেতুর প্রয়োগ করা হয়, ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্মের সহিত সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধ, ইহার কোন এক পক্ষই বলিতে হইবে। কারণ, উহা ভিন্ন তৃতীয় আর কোন পক্ষ নাই। কিন্তু বাদী কোন অনুমান প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার ঐ হেতু তোমার সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত হইয়া উহার সাধন করিতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুর সহিত সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিলে ঐ হেতুর দ্বারা ঐ সাধ্যধর্মও বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উভয় পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু যদি হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্মও পক্ষে বিদ্যমান আছে, ইহাই পূর্বেই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে উহার অনুমান ব্যর্থ। আর উহা পূর্বে নিশ্চিত না হইলেও হেতু ও সাধ্যধর্মের বিদ্যমানতা যখন স্বীকার্য, তখন ঐ বিদ্যমানতারূপ অবিশেষবশতঃ উহার মধ্যে কে কাহার সাধক বা সাধ্য হইবে? ঐ সাধ্যধর্মও ঐ হেতুর সাধক কেন হয় না? ফলকথা, অবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের সাধ্য-সাধক-ভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের “প্রাপ্তি” পক্ষ গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করিলে, তাহার নাম “প্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ। সূত্রে “প্রাপ্ত্যাহ-বিশিষ্টত্বাৎ” এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষি প্রথমে উহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। এইরূপ হেতু সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহা হইলে ত উহা সাধক হইতেই পারে না। কারণ, ঐ হেতুর সহিত যাহার কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার সাধক উহা কিরূপে হইবে? তাহা হইলে ঐ হেতু ঐ সাধ্যধর্মের দ্বারা উহার অভাবেরও সাধক হইতে পারে। তাহা স্বীকার করিলে আর উহাকে ঐ সাধ্যের সাধক বলা যাইবে না। প্রতিবাদী এইরূপ বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের “অপ্রাপ্তি” পক্ষে তৎপ্রযুক্ত উক্তরূপে প্রত্যবস্থান করিলে তাহার নাম “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ। সূত্রে “অপ্রাপ্ত্যাহ-সাধকত্বাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষি পরে ইহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন।

হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তিপক্ষে তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের বিদ্যমানতাই অবিশেষ, ইহা এখানে বার্তিককারও বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের “দ্বৈশোর্কিদিমানয়োঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও তাঁহারও উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। তাৎপর্যটীকাকারও উদ্যোতকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এখানে বলিয়াছেন যে, যাহা অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থ, তাহাই সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা হেতুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা হেতুর দ্বারা বিদ্যমান পদার্থ হওয়ায় সাধ্য হইতে পারে না। তাৎপর্যটীকাকার পরে নিজের ইহাও বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের সহিত যাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ হয়, তাহার সহিত সেই পদার্থের অভেদই হয়। যেমন সাগরপ্রাপ্ত গঙ্গার সহিত তখন সাগরের অভেদই হয়। সুতরাং হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গঙ্গা-সাগরের দ্বারা ঐ

উভয়ের অভেদই স্বীকার্য হওয়ায় কে কাহার সাধা ও সাধন হইবে ? অভিন্ন পদার্থের সাধাসাধন-জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু হেতু ও সাধোর প্রাপ্তি স্বীকার করিলে উহা গন্ধাসাগরের ত্ৰায় প্রাপ্তি নহে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের অভেদ হইতে পারে না। সাগরপ্রাপ্তি গন্ধারও সাগরের সহিত তত্ত্বতঃ অভেদ হয় না। ভেদ অবিনাশী পদার্থ। অতঃ জাতিবাদী বাদিনিয়মের জ্ঞাত ঐক্যও বলিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐক্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নাই। সূত্রে মহর্ষিও “প্রাপ্ত্যভেদাৎ” এইরূপ স্বাক্ষর বাক্য প্রয়োগ কেন করেন নাই ? ইহাও চিন্তা করিতে হইবে।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের মতামুসারে “তार्কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু জ্ঞান সাধ্যধর্মের জ্ঞাপক, সাধ্যধর্ম উহার জ্ঞাপ্য। কিন্তু ঐ উভয়ের সম্বন্ধ স্বীকার্য হইলে সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় বিষয়-বিষয়িত্ব সম্বন্ধই স্বীকার্য। অর্থাৎ হেতুজ্ঞানের সহিত সাধ্যধর্মের বিষয়তা সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে সেই হেতুজ্ঞানে হেতুর ত্ৰায় সাধ্যধর্মও বিষয় হওয়ায় উহাও হেতুর ত্ৰায় পূর্বজ্ঞাত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং পূর্বজ্ঞাতত্ব-বশতঃ ঐ উভয়েরই অবিশেষ হওয়ায় কে কাহার জ্ঞাপ্য ও জ্ঞাপক হইবে ? অর্থাৎ সাধ্যধর্ম পূর্বেই জ্ঞাত হইলেই উহা পরে হেতুজ্ঞানের জ্ঞাপ্য হইতে পারে না। সুতরাং হেতুজ্ঞানও উহার জ্ঞাপক হইতে পারে না। প্রতিবাদী হেতু ও সাধোর প্রাপ্তিপক্ষে উক্তরূপ দোষোদ্ভাবন করিলে “প্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ হয়। বরদরাজ “কৃতি” অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি এবং “জ্ঞাপ্তি” এই উভয় পক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ জাতির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, হেতু বা হেতুজ্ঞান, উহার কার্য অমুমিতিক্রম জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন করে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া উৎপন্ন করে। প্রথম পক্ষে অমুমিতিক্রম কার্যের সহিত উহার হেতু বা কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ ঐ কারণের ত্ৰায় তাহার কার্য অমুমিতিও পূর্বেই বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার্য। নচেৎ ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না। কিন্তু তাহা হইলে অমুমান বার্থ এবং ঐ হেতু সেই পূর্বসিদ্ধ অমুমানরূপ কার্যের কারণও হইতে পারে না। এইরূপে কৃতি পক্ষে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যাবস্থান “প্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ হয়, এবং উক্ত কারণ ও কার্যের কোন সম্বন্ধ নাই, এই পক্ষে পূর্ববৎ “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধও হয়। সুতরাং এই সূত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা কারক অর্থাৎ জনক হেতু এবং জ্ঞাপক হেতু, এই দ্বিবিধ হেতুই বিবক্ষিত এবং “সাধ্য” শব্দের দ্বারাও কার্য ও জ্ঞাপ্য, এই উভয়ই বিবক্ষিত, ইহা বুঝিতে হইবে। মহর্ষির পরবর্তী সূত্রের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। সেখানে বার্তিককারও ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতু যে হেতুই হয় না, ইহা সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুর অনিচ্ছা-দোষের উদ্ভাবনাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য বুঝা যায়। কিন্তু বরদরাজ বলিয়াছেন যে, উক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষণের অনিচ্ছাই প্রতিবাদীর

১। প্রাপ্য সাধ্য সাধয়তি হেতুশ্চেৎ প্রাপ্তিকর্মণঃ ।

সাধ্যস্ত পূর্ব সিদ্ধিঃ স্তাদিতি প্রাপ্তিসমোদয়ঃ ।

কৃতি-প্রাপ্তিসাধারণীয়া জাতিঃ । তত্ত্ব সাধ্য কার্য জ্ঞাপ্যক । তত্র কার্যমমুমিতিক্রমানং জ্ঞাপ্যমমুময়ঃ । হেতুশ্চ সিদ্ধঃ উক্তজ্ঞানং বা । প্রাপ্তিঃ সংযোগাদিবিষয়বিষয়িত্বাৎ । সিদ্ধিঃ সম্বন্ধ জ্ঞাতত্ব ইত্যাদি ।—তार्কিকরক্ষা ।

আরোপ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে হেতুতে বিশেষণাসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। বৃত্তিকার বিধানাথ প্রভৃতি নব্যগণ উক্ত জাতিদ্বয়কে বলিয়াছেন,—“প্রতিকূলতর্কদেশনাতাস”। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত জাতিদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়াই বাদীর প্রযুক্ত হেতুর অসাধকত্ব সমর্থন করেন। কিন্তু উহা প্রকৃত প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন নহে। তাই উক্ত জাতিদ্বয়কে বলা হইয়াছে,—“প্রতিকূলতর্কদেশনাতাস”। “দেশনা” শব্দের অর্থ এখানে উদ্ভাবন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বোক্ত “প্রাপ্তিসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের অপ্রাপ্তির পক্ষেও যখন পূর্বোক্ত দোষ প্রদর্শন করেন, তখন তিনি ঐ স্থলে “অপ্রাপ্তিসমা” জাতিরও অবশ্য প্রয়োগ করেন, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে আর মহর্ষি “অপ্রাপ্তিসমা” জাতির পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন কেন? উক্ত স্থলে “প্রাপ্তিসমা” অথবা “অপ্রাপ্তিসমা” নামে একই জাতি বলাই উচিত। এতদ্ব্যতীত উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, “প্রাপ্তিসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে সর্বত্র “অপ্রাপ্তিসমা” জাতির প্রয়োগ হইলেও উভয় পক্ষে দোষ প্রদর্শনে যে বিশেষ আছে, তৎপ্রযুক্ত ঐ জাতিদ্বয়ের ভেদবিবক্ষাবশতঃই মহর্ষি ঐরূপ জাতিদ্বয়ের পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, ইহার যে কোন এক পক্ষ-মাত্রে উক্তরূপ দোষ প্রদর্শন করিলেও সেখানেও ত তাঁহার জাত্যন্তরই হইবে। সুতরাং “প্রাপ্তিসমা” ও “অপ্রাপ্তিসমা” নামে পৃথক্ জাতির নির্দেশ কর্তব্য। উদ্যোতক পরে উক্ত জাতিদ্বয় উদাহরণের সাধ্যা অথবা বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির সামান্য লক্ষণাক্রান্তই হয় না, অতএব উহা জাতিই নহে, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তদ্ব্যতীত বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত “সাধ্যবৈধর্ম্যাত্ম্যং প্রত্যব-স্থানং জাতিঃ” (১২।১৮) এই সূত্রের অর্থ না বুঝিয়াই উক্ত পূর্বপক্ষের সমর্থন করা হয়। তাৎপর্যটীকাকার উদ্যোতকের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রে “সাধ্যা” শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সাধ্যাই বিবক্ষিত নহে, যে কোন পদার্থের সহিত সাধ্যাই বিবক্ষিত। উক্ত জাতিদ্বয়ও যে কোন সাধ্যধর্ম অথবা যে কোন হেতুর সহিত সাধ্যাপ্রযুক্ত হওয়ায় পূর্বোক্ত জাতির সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। ৭।

ভাষ্য। অনয়োক্তরং—

অনুবাদ। এই “প্রাপ্তিসম” ও “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। ঘটাদিনিষ্পত্তির্দর্শনাৎ পীড়নে চাভিচারঃ—

দপ্রতিষেধঃ ॥৮॥৪৬৯॥

অনুবাদ। ঘটাদি জব্যের উৎপত্তি দর্শনপ্রযুক্ত এক অভিচারজন্য পীড়ন হওয়ায় অর্থাৎ শত্রু মারণার্থ অভিচারক্রিয়া-জন্য দুরন্ত শত্রুরও পীড়ন হওয়ায় (পূর্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য । উভয়থা খল্বযুক্তঃ প্রতিষেধঃ । কর্তৃ-করণাধিকরণানি প্রাপ্য
মুদং ঘটাদিকার্য্য নিষ্পাদয়ন্তি । অভিচারাক্ষ পীড়নে সতি দৃষ্টমপ্রাপ্য
সাধকত্বমিতি ।

অমুবাদ । উভয় প্রকারেই প্রতিষেধ অযুক্ত অর্থাৎ পূর্বসূত্রে হেতু ও সাধ্য-
ধর্মের প্রাপ্তি পক্ষে এবং অপ্রাপ্তিপক্ষে যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত ।
(কারণ) কর্তা, করণ ও অধিকরণ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করে
এবং “অভিচার” অর্থাৎ শোনা দি বাগজ্ঞ (দূরস্থ শত্রুর) পীড়ন হওয়ায় (শত্রুকে)
প্রাপ্ত না হইয়াও সাধকত্ব অর্থাৎ ঐ অভিচারক্রিয়ার পীড়নজনকত্ব দৃষ্ট হয় ।

টীপনী । পূর্বসূত্রোক্ত “প্রাপ্তিসম” ও “অপ্রাপ্তিসম” নামক প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর বলিতে
অর্থাৎ অসম্ভবত্ব সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রতিষেধ
অযুক্ত । অর্থাৎ হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়াই সাধক হয় অথবা সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়,
এই উভয় পক্ষেই যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না । কেন বলা যায় না ? ইহা
বুঝাইতে মহর্ষি প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,—“ঘটাদিনিষ্পত্তির্দর্শনাৎ” । ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা হইতে যে ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, উহার কর্তা কুস্তকার এবং
করণ দণ্ডাদি এবং অধিকরণ ভূতাদি ঐ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়াই ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন করে ।
বার্ত্তিককার ইহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির কারণ দণ্ডাদি মৃৎপিণ্ডকে প্রাপ্ত হইলেও
ঘটাদির সহিত দণ্ডাদির অবিশেষ হয় না এবং উহাদিগের কার্য্যাকারণভাবের নিবৃত্তিও হয় না । যদি
বল, ঘটোৎপত্তি স্থলে মৃত্তিকা ত সাধ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির কার্য্য নহে, ঘটই সাধ্য । কিন্তু ঘটোৎপত্তির
পূর্বে ঐ ঘট বিদ্যমান না থাকায় উহার সহিত দণ্ডাদি কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না ।
সুতরাং অবিদ্যমান পদার্থের সাধন হইতে পারে না । এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে,
দণ্ডাদির দ্বারা মৃৎপিণ্ডকে ঘট করা হয় । অর্থাৎ মৃত্তিকার অবয়বসমূহ পূর্ব আকার ধ্বংসের
পরে অল্প আকার প্রাপ্ত হয় । সেই অল্প আকার হইতে ঘটের উৎপত্তি হয় । তাৎপর্য্য এই যে,
ঘটোৎপত্তি স্থলে বিদ্যমান মৃৎপিণ্ডেই উহার কর্তা প্রভৃতি সাধনের ব্যাপার হইয়া থাকে । সুতরাং
ঐ সমস্ত সাধনকে বিদ্যমান পদার্থের সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়া, বিদ্যমান মৃৎপিণ্ডের সহিত দণ্ডাদি
সাধনের প্রাপ্তি সম্বন্ধেও যে উহাদিগের অবিশেষ হয় না, এবং উহাদিগের কার্য্যাকারণ ভাবেরও নিবৃত্তি
হয় না, ইহাই সূত্রে প্রথমে উক্ত বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ মহর্ষি ঐ
দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির উৎপত্তি স্থলে উক্তরূপ কার্য্যাকারণ-ভাব
লোকসিদ্ধ, উহার অপলাপ করা যায় না । সুতরাং কার্য্য ও কারণের ত্রায় অমুমান স্থলে
সাধ্য ও সাধনের প্রাপ্তি পক্ষেও সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার্য্য । এইরূপ হেতু ও সাধ্যের অপ্রাপ্তি
পক্ষেও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না । মহর্ষি ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্তরূপে পরে
বলিয়াছেন,—“পীড়নে চাভিচারাত্” । তাৎপর্য্য এই যে, “শ্রোতেনাভিচারন্ যজ্ঞত” ইত্যাদি

বৈদিক বিধিবিধিকানুসারে শত্রু মারণার্থে শ্বেনাদি বাগরূপ “অভিচার”ক্রিয়া করিলে, উহা দূরস্থ শত্রুকে প্রাপ্ত না হইয়াও তাহার পীড়ন জনায়। অর্থাৎ ঐ স্থলে সেই শত্রুর সহিত ঐ অভিচার ক্রিয়ার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও উহা যে, ঐ শত্রুর পীড়নের কারণ হয়, ইহা বৈদসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত কার্য্য-কারণ ভাবের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং অনেক স্থলে যে কার্য্য ও কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কার্য্য-কারণ ভাব আছে, ইহাও উক্ত দৃষ্টান্তে স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তে অনুমান স্থলেও সাধ্য ও হেতুর প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও সাধ্য-সাধন ভাব আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। ফলকথা, কারণের দ্বারা অনুমানের সাধন অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের জ্ঞাপক হেতু ও কোন স্থলে সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কোন স্থলে সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও সাধক হয়, ইহা উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত “প্রাপ্তিসম” ও “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর প্রতিবাদী যদি উহা স্বীকার না করেন, অর্থাৎ তিনি যদি লোকসিদ্ধ ও বৈদসিদ্ধ কার্য্য-কারণ-ভাবের অপলাপ করিয়া, বাদীর হেতুতে পূর্বোক্তরূপে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ দুষণের জ্ঞাত যে প্রতিষেধক হেতুর প্রয়োগ করেন, ঐ হেতুও তাঁহার দ্বা পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াও দুষক হয় না এবং উহাকে প্রাপ্ত না হইয়াও দুষক হয় না, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ উত্তর স্বাব্যবাহতক হওয়ায় উহা যে অসহজতর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ববৎ স্বাব্যবাহতকত্বই উক্ত জাতিদ্বয়ের সাধারণ ছষ্টত্বমূল। অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার উহার অসাধারণ ছষ্টত্বমূল। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের যে প্রাপ্তিকে অর্থাৎ বেক্রপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে হেতুর অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অযুক্ত। কারণ, উহা সম্ভবও নহে, আবশ্যকও নহে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উক্ত জাতিদ্বয়ের ঐ অসাধারণ ছষ্টত্বমূল সূচনা করিয়া, উহার অসহজতরত্ব সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

**সূত্র। দৃষ্টান্তস্য কারণানপদেশাৎ প্রত্যবস্থানচ্চ
প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তসমো ॥৯॥৪৭০॥**

অনুবাদ। দৃষ্টান্তের “কারণে”র (প্রমাণের) অনুল্লেখবশতঃ প্রত্যবস্থান-প্রযুক্ত (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ হয় এবং প্রতিদৃষ্টান্তের দ্বারা প্রত্যবস্থান-প্রযুক্ত (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ হয়।

ভাষ্য। সাধনস্থাপি সাধনং বক্তব্যমিতি প্রসঙ্গেন প্রত্যবস্থানং প্রসঙ্গসমঃ। ক্রিয়াহেতুগুণযোগী ক্রিয়াবান্ লোক্য ইতি হেতুর্নাপ-
দিশ্যতে, নচ হেতুমন্তরেণ সিদ্ধিরন্তীতি।

প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রত্যবস্থানং প্রতিদৃষ্টান্তসমঃ। ক্রিয়াবানাত্মা ক্রিয়া-
হেতুগুণযোগালোক্যবদিত্যুক্তে প্রতিদৃষ্টান্ত উপাদীয়তে ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত-

মাকালং নিষ্ক্রিয়ং দৃষ্টমিতি । কঃ পুনরাকালস্ত ক্রিয়াহেতুগুণঃ ?
বায়ুনা সংযোগঃ সংস্কারাপেক্ষা বায়ুবনস্পতিসংযোগবদিতি ।

অনুবাদ । সাধনেরও সাধন বক্তব্য, এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিবশতঃ প্রত্যবস্থান (১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ । যথা—ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোক সক্রিয়, ইহাতে হেতু (প্রমাণ) কথিত হইতেছে না । কিন্তু হেতু ব্যতীত সিদ্ধি হয় না (অর্থাৎ লোক যে সক্রিয়, ইহাতেও প্রমাণ বক্তব্য, নচেৎ উহা সিদ্ধ হইতে পারে না) ।

প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যবস্থান (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসম প্রতিষেধ । যথা—আত্মা সক্রিয়, যেহেতু (আত্মাতে) ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা আছে, যথা লোক, ইহা (বাদী কর্তৃক) উক্ত হইলে (প্রতিবাদী কর্তৃক) প্রতিদৃষ্টান্ত গৃহীত হয়—(যথা) ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট আকাশ নিষ্ক্রিয় দৃষ্ট হয় । (প্রশ্ন) আকাশের ক্রিয়ার কারণগুণ কি ? (উত্তর) বায়ুর সহিত সংস্কারাপেক্ষ অর্থাৎ বায়ুর বেগজন্ত (আকাশের) সংযোগ, যেমন বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ক্রমানুসারে “প্রসঙ্গসম” ও “প্রতিদৃষ্টান্তসম” নামক প্রতিষেধদ্বয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন । সূত্রের শেষোক্ত “সম” শব্দের “প্রসঙ্গ” ও “প্রতিদৃষ্টান্ত” শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ “প্রসঙ্গসম” ও “প্রতিদৃষ্টান্তসম” এই নামদ্বয় বুঝা যায় । সূত্রে “কারণ” শব্দের অর্থ এখানে প্রমাণ । ঋষিগণ প্রমাণ অর্থেও “হেতু”, “কারণ” ও “সাধন” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন । “অপদেশ” শব্দের কখন অর্থ গ্রহণ করিলে “অনপদেশ” শব্দের দ্বারা অকখন বুঝা যায় । সূত্রোক্ত “প্রত্যবস্থান” শব্দের উভয় লক্ষণেই সম্বন্ধ মহর্ষির অভিপাত । তাহা হইলে সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত “প্রসঙ্গসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্তের প্রমাণ অগ্নিষ্ট (কথিত) হয় নাই অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ যে তাঁহার সাধ্যবিশিষ্ট, এ বিষয়েও প্রমাণ বক্তব্য, কিন্তু বাদী তাহা বলেন নাই, এই কথা বলিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহার নাম “প্রসঙ্গসম” প্রতিষেধ । সূত্রে মহর্ষি “দৃষ্টান্ত” শব্দের প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার প্রথমোক্ত “সাধন” শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায় । বাদীর কথিত দৃষ্টান্তও তাঁহার সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজনক হয় । সূত্রায় ঐ অর্থে দৃষ্টান্তকেও সাধন বলা যায় । ভাষ্যকারোক্ত দ্বিতীয় “সাধন” শব্দ এবং শেষোক্ত “হেতু” শব্দদ্বয়ের দ্বারা প্রমাণই বিবক্ষিত । অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া প্রতিবাদী যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই ভাষ্যকারের মতে “প্রসঙ্গসম” প্রতিষেধ । বাস্তবিকতার উদ্যোক্তকরেরও উহাই মত । তিনি তাঁহার পুরোক্ত “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেই উহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, শব্দ বটের দ্বারা অনিত্য, ইহা বলিলে ঐ দৃষ্টান্ত বট যে অনিত্য, এ বিষয়ে হেতু অর্থাৎ প্রমাণ কি ? প্রতিবাদী এইরূপ প্রশ্ন করিয়া

প্রত্যবস্থান করিলে উহা “প্রসঙ্গসম” প্রতিবেদ্য। ভাষ্যকারও তাঁহার পূর্বোক্ত স্থলেই উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট্র যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কথিত হয় নাই। কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তে লোষ্ট্র যে সক্রিয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় উহা অসিদ্ধ। এইরূপে বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিদোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত “সাধ্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্ম্যে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগসাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সূত্রোক্ত “প্রসঙ্গসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত-পদার্থগত সাধ্যধর্ম্যে প্রমাণমাত্রসাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্তরূপ বিশেষ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে ইহাই বলিয়াছেন।

কিন্তু পরবর্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই সূত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষও গ্রহণ করিয়া, ঐ দৃষ্টান্ত প্রকৃতি পদার্থত্রয়েই প্রতিবাদী যদি প্রমাণ প্রদ্বা করিয়া অনবস্থানভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেই উত্তরকে “প্রসঙ্গসম” প্রতিবেদ্য বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“অনবস্থানভাসপ্রসঙ্গঃ প্রসঙ্গসম ইতি”। তাঁহার মতে “প্রসঙ্গসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে অনবস্থানভাসের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই তিনি উক্ত জাতিকে বলিয়াছেন,—“অনবস্থানদেশনাভাসা”। বস্তুতঃ উহা প্রকৃত অনবস্থানদোষের উদ্ভাবন নহে, কিন্তু তত্ত্বল্য, তাই উহাকে “অনবস্থানদেশনাভাস” বলা হইয়াছে। “দেশনা” শব্দের অর্থ এখানে উল্লেখ বা উদ্ভাবন। “তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজ উক্ত মতানুসারেই উক্ত “প্রসঙ্গসমা” জাতির স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত, হেতু এবং তাঁহার অনুমানের আশ্রয় পক্ষ-পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপে প্রমাণ প্রদ্বা করেন এবং বাদী তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে আবার তাঁহার কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে অথবা বাদীর কথিত সেই প্রমাণ-পদার্থেই পূর্ববৎ প্রমাণ প্রদ্বা করেন,—এইরূপে ক্রমশঃ বাদীর কথিত দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণপরম্পরা প্রদ্বা পূর্বক যদি অনবস্থানভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তরকে বলে “প্রসঙ্গসমা” জাতি। বরদরাজ উক্ত মতানুসারে এখানে সূত্রোক্ত “কারণ” শব্দের

১। দৃষ্টান্ত “কারণ” প্রমাণঃ, তত্ত্বানপদেশাৎ প্রসঙ্গসমঃ। সাধ্যসমে হি দৃষ্টান্তে সাধ্যবৎ হেতুাবয়বং প্রসঙ্গমতি, পঞ্চাবয়বপ্রয়োগসাধ্যতাং দৃষ্টান্তগতত্বানিত্যত্বং প্রসঙ্গমতীত্যর্থঃ। প্রসঙ্গসমস্ত দৃষ্টান্তগতত্বানিত্যত্বং প্রমাণমাত্রসাধ্যতামিত্যপোনরুপ্তাং। ভাষ্য—“সাধনশ্রুতি”। দৃষ্টান্তগতত্বানিত্যত্বং সাধনং প্রমাণং বাচ্যমিতি। —তাৎপর্য্যটীকা।

২। সিদ্ধে দৃষ্টান্তহেতুদো সাধনপ্রদ্বাপূর্বকং।

অনবস্থানভাসবাচঃ “প্রসঙ্গসম”জাতিত্বা ১৬।

ইয়মপি কৃতিজ্ঞানসাধনগী জাতিঃ। তথাচ সাধনমুৎপাদকং জ্ঞাপকং বা, সিদ্ধিস্ত স্বরূপতো জ্ঞানতচ্চ। “দৃষ্টান্ত কারণানপদেশা”দ্বিতী সূত্রখণ্ডে দৃষ্টান্তপদং স্বরূপতো জ্ঞানতচ্চ সিদ্ধিমাত্রমূলকমতি। কারণং জ্ঞাপকং কারণং বা।—তর্কিকরক্ষা। “দৃষ্টান্তশ্রুতি” সিদ্ধানানপি পক্ষহেতুদৃষ্টান্তানানবস্থানভাসেতরা উৎপাদকজ্ঞাপকানতিধানং প্রত্যবস্থানং প্রসঙ্গসম ইতি সূত্রার্থঃ।—সম্বলীপিকা টীকা।

দ্বারাও জনক এবং জ্ঞাপক, এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়া, পূর্ববৎ উৎপত্তি ও জন্ম, এই উভয় পক্ষেই প্রসঙ্গসমা জাতির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্তিককার এখানে ঐরূপ কোন কথা বলেন নাই, সূত্রোক্ত “দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারাও হেতু ও পক্ষকেও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও পক্ষেও পূর্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রদান করিয়া, অনবস্থাপনের উদ্ভাবন করিলে, তাহাও ত কোন প্রকার জাত্যন্তরই হইবে। মহর্ষি তাহা না বলিলে তাঁহার বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। তাই পরবর্তী উদয়নাচার্য্য সূত্র বিচার করিয়া “প্রসঙ্গসমা” জাতিরই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রাচীন মতেও হেতু ও পক্ষ প্রমাণ প্রদান করিয়া অনবস্থাপনের উদ্ভাবন করিলে তাহাও জাত্যন্তর হইবে, তাহা উক্ত “প্রসঙ্গসমা” জাতি নহে—কিন্তু বক্ষ্যমাণ আকৃতিগণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জাতি, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। পরবর্তী ৩৭শ সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকারের ঐ কথা বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রে “দৃষ্টান্ত” শব্দের প্রয়োগ এবং পরবর্তী সূত্রোক্ত উক্তরের প্রতি মনোযোগ করিলে, মহর্ষি যে কেবল দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়া “প্রসঙ্গসমা” জাতির লক্ষণাদি বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সেইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

“প্রসঙ্গসমে”র পরে “প্রতিদৃষ্টান্তসম” কথিত হইয়াছে। যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম্য নাই, ইহা উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী উহার দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে “প্রতিদৃষ্টান্তসম” প্রতিবেদ। যেমন ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “ক্রিয়াবানাত্মা” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ-গুণবত্তা আকাশেও আছে, কিন্তু আকাশ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং আত্মা আকাশের ত্রায় নিষ্ক্রিয়ই কেন হইবে না? এখানে আকাশই প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত। উহাতেও ক্রিয়ার কারণগুণবত্তা হেতু আছে, কিন্তু বাদীর সাধ্যধর্ম্য সক্রিয়ত্ব নাই। সুতরাং বাণীর ঐ হেতু ব্যভিচারী, এই কথা বলিয়া, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে, উহা সহজতরই হয়, জাত্যন্তর হয় না। কিন্তু “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন করেন না। কিন্তু বাদীর কথিত হেতু কোন প্রতিদৃষ্টান্তে প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্ম বা পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত স্থলে বাদীর অনুমানে বাধ অথবা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি এই “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতিকে বলিয়াছেন—“বাধ-সংপ্রতিপক্ষাত্তরদেশনাভাসা”। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উক্ত জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন হেতু প্রয়োগ না করিয়া, কেবল কোন প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারাই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। সুতরাং মহর্ষির অর্থমোক্ত “সাধ্যধর্ম্মসমা” জাতি হইতে এই “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতির ভেদও বুঝা যায়। কারণ, “সাধ্যধর্ম্মসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী অন্য হেতুর প্রয়োগ করিয়াই তদ্বারা বাদীর সাধ্যধর্ম্ম বা পক্ষে তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন—এই বিশেষ আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পরে প্রসঙ্গপূর্বক

আকাশেও ক্রিয়ার কারণগুণের উল্লেখ করার তাঁহার মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ঐ হেতুর দ্বারা আকাশের দ্বারা আত্মাতে নিজস্বত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারাও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়^১। বার্তিক-কারও এখানে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণই গ্রহণ করিয়া, পরে বায়ুর সহিত আকাশের সংযোগ কোন কালেই আকাশে ক্রিয়া উৎপন্ন করে না, সুতরাং উহা আকাশে ক্রিয়ার কারণ হইতেই পারে না, এই পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তদন্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল বায়ু ও আকাশের সংযোগই আকাশে ক্রিয়ার কারণ বলিয়া কথিত হয় নাই। কিন্তু ঐ সংযোগের সদৃশ যে বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ, তাহা বৃক্ষে ক্রিয়া উৎপন্ন করে বলিয়া, উহা ক্রিয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার্য। বায়ু ও বৃক্ষের ঐ সংযোগ আকাশেও আছে। কিন্তু আকাশে পরমমহৎ পরিমাণরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই ক্রিয়া জন্মে না। তাহাতে ঐ সংযোগ যে আকাশে ক্রিয়ার কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, কারণ থাকিলেও অনেক স্থলে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য জন্মে না, এ জন্ত প্রতিবন্ধকের অভাবও সর্বত্র কার্যের কারণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বার্তিককার ঐরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকারের কথার দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বায়ুর সহিত আকাশের সংযোগকেই আকাশে ক্রিয়ার কারণগুণ বলিয়া সমর্থন করিয়াই ঐ হেতুবশতঃ আকাশরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মাতে নিজস্বত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত “সাধর্ম্যাসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু হইতে ভিন্ন হেতু গ্রহণ করেন এবং উহা বাদীর পক্ষ পদার্থে বস্তুতঃ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই “প্রতিদৃষ্টান্তসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুই গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থে উহা বিদ্যমান না থাকিলেও উহা সমর্থন করেন। গ্রায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের উদাহরণ ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই বুঝা যায় ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। অনয়োক্তরং—

অনুবাদ। এই “প্রসঙ্গসম” ও “প্রতিদৃষ্টান্তসম” নামক প্রতিষেধকের উত্তর—

সূত্র। প্রদীপোপাদান-প্রসঙ্গবিনিবৃত্তিবত্ত্বিনিবৃত্তিঃ ॥

॥১০॥৪৭১॥

অনুবাদ। প্রদীপগ্রহণ প্রসঙ্গের নিবৃত্তির দ্বারা সেই প্রমাণ কথনের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রদীপদর্শনে যেমন প্রদীপান্তর গ্রহণ অনাবশ্যক, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত পদার্থেও প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক।

১। ভাষ্য “প্রতিদৃষ্টান্ত উদাহরণে”। ক্রিয়াহেতুগুণরূপাকাশমক্রিয়া দৃষ্ট, তদ্বাদনে প্রতিদৃষ্টান্তে কস্মাৎ ক্রিয়াহেতুগুণযোগে নিষ্ক্রিয়ত্বমেব ন সাধর্ম্যত্বাৎ ইতি শেযঃ।—তাৎপর্যটীকা।

ভাষ্য । ইদং তাবদয়ং পৃষ্ঠে। বক্তুমর্হতি—অথ কে প্রদীপমুপাদদতে কিমর্থং বেতি । দিদৃক্ষমাণা দৃশ্যদর্শনার্থমিতি । অথ প্রদীপং দিদৃক্ষমাণাঃ প্রদীপান্তরং কস্মামুপাদদতে ? অন্তরেণাপি প্রদীপান্তরং দৃশ্যতে প্রদীপঃ, তত্র প্রদীপদর্শনার্থং প্রদীপোপাদানং নিরর্থকং । অথ দৃষ্টান্তঃ কিমর্থ-মুচ্যতে ইতি ? অপ্ৰজ্ঞাতস্য জ্ঞাপনার্থমিতি । অথ দৃষ্টান্তে কারণাপদেশঃ কিমর্থং দেশ্যতে ? যদি প্রজ্ঞাপনার্থং, প্রজ্ঞাতো দৃষ্টান্তঃ স খনু “লৌকিক-পরীক্ষকাণাং যন্মিন্নর্থো বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত” ইতি । তৎপ্রজ্ঞাপনার্থঃ কারণাপদেশো নিরর্থক ইতি প্রসঙ্গসমস্রোত্তরং ।

অনুবাদ । এই প্রতিবাদী অর্থাৎ পূর্বোক্ত জাত্যন্তরবাদী জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহা বলিবার নিমিত্ত যোগ্য, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমূহের বক্ষ্যমাণ উত্তর বলিতে তিনি বাধ্য । যথা—(প্রশ্ন) কাহার প্রদীপ গ্রহণ করে ? কি জগুই বা প্রদীপ গ্রহণ করে ? (উত্তর) দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ দৃশ্য দর্শনের জগু প্রদীপ গ্রহণ করে । (প্রশ্ন) আচ্ছা, প্রদীপ দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্য প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না ? (উত্তর) অন্য প্রদীপ ব্যতীতও প্রদীপ দেখা যায়, সেই স্থলে প্রদীপ দর্শনের জগু প্রদীপ গ্রহণ অনাবশ্যক । (প্রশ্ন) আচ্ছা, দৃষ্টান্ত কেন কথিত হয় ? (উত্তর) অপ্ৰজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞাপনের নিমিত্ত । আচ্ছা, দৃষ্টান্তে কারণ-কথন কেন আপত্তি করিতেছ ? যদি বল, (দৃষ্টান্তের) প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত, (উত্তর) সেই দৃষ্টান্ত “লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য আছে, তাহা দৃষ্টান্ত” এই লক্ষণবশতঃ প্রজ্ঞাতই আছে । তাহার প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত কারণ কখন অর্থাৎ উহাতে প্রমাণ প্রদর্শন নিরর্থক—ইহা “প্রসঙ্গসম” প্রতিষেধের উত্তর ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই সূত্র ও পরবর্তী সূত্র দ্বারা যথাক্রমে পূর্বসূত্রোক্ত “প্রসঙ্গসম” ও “প্রতি-দৃষ্টান্তসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত “প্রসঙ্গসম” প্রতিষেধের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, ঐ দৃষ্টান্তেও প্রমাণ কথিত হউক ? এইরূপ প্রশ্ন অর্থাৎ আপত্তি প্রকাশ করেন । তদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রদীপগ্রহণ-প্রসঙ্গের নিবৃত্তির জগু দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ-কথন-প্রসঙ্গের নিবৃত্তি । তাৎপর্য্য এই যে, যেমন প্রদীপ দেখিতে অন্য প্রদীপ গ্রহণ অনাবশ্যক হওয়ায় তজ্জগু কেহ অন্য প্রদীপ গ্রহণ করে না, স্তত্রায়ং সেখানে অন্য প্রদীপ গৃহীত হউক ? এইরূপ প্রশ্ন বা আপত্তিও হয় না, তদ্রূপ প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ-কথন অনাবশ্যক হওয়ায় কেহ তাহাতে প্রমাণ বলে না, এবং তাহাতে প্রমাণ কথিত হউক ? এইরূপ প্রশ্ন বা আপত্তিও হয় না । ভাষ্যকার প্রথমে

প্রপোজার ভাবে সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত বুঝাইয়া, তদ্বারা পরে মহর্ষির উত্তর সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্য-কারের তাৎপর্য্য এই যে, লোকে দৃষ্ট বস্তু দর্শনের জন্ত প্রদীপ গ্রহণ করিলেও ঐ প্রদীপ দর্শনের জন্ত অত্র প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না? এইরূপ প্রশ্ন করিলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রদীপ দর্শনে অত্র প্রদীপ অনাবশ্যক। কারণ, অত্র প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ দর্শন করা যায়। তাহা হইলে প্রতিবাদী দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করেন কেন? উহাতে প্রমাণ বলা আবশ্যক কেন? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? তিনি যদি বলেন যে, প্রজ্ঞাপনের জন্ত, অর্থাৎ বাদীর ঐ দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, তাঁহার সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত উহাতে প্রমাণ বলা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্ববৎ ইহাও বলা যায় না। কারণ, মহর্ষির “লৌকিকপরীক্ষণাৎ” ইত্যাদি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত-লক্ষণানুসারে দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রজ্ঞাতই থাকে। অর্থাৎ বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, তাঁহার সাধ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা প্রমাণসিদ্ধই থাকে, নচেৎ উহা দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। সুতরাং উহা প্রতিপাদনের জন্ত প্রমাণ কখন অনাবশ্যক। এইরূপ বাদীর কথিত হেতু এবং অমুমানের আশ্রয় পক্ষ-পদার্থও প্রমাণসিদ্ধই থাকায় তাহাতেও প্রমাণ-কখন অনাবশ্যক। আর প্রতিবাদী যদি প্রমাণসিদ্ধ পদার্থেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং বাদী তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে পূর্ব্ববৎ তাঁহার দৃষ্টান্তে অথবা হেতু ও পক্ষেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, ঐরূপে প্রমাণপরম্পরা প্রশ্নপূর্ব্বক অবস্থান্তরভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অমুমানে ও দৃষ্টান্তাদি পদার্থে প্রমাণ প্রশ্ন করা যায় এবং তাঁহার শ্রায় অবস্থান্তরভাসেরও উদ্ভাবন করা যায়। তাহা হইলে তাঁহার নিজের পূর্ব্বোক্ত ঐ উত্তর নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ার উহা স্বব্যাঘাতক হয়। সুতরাং উহা কোনরূপেই সহ্য হইতে পারে না। উহা তাঁহার নিজের কথানুসারেই ছষ্ট উত্তর—ইহা স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। উক্তরূপে স্বব্যাঘাতকত্বই তাঁহার ঐ উত্তরের সাধারণ দৃষ্টত্বমূল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। অথ প্রতিদৃষ্টান্তসমশ্রোভরং—

অনুবাদ। অনন্তর “প্রতিদৃষ্টান্তসম” প্রতিষেধের উত্তর (কথিত হইতেছে)।

সূত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-হেতুত্ব চ নাহেতুদৃষ্টান্তঃ ॥

॥১১॥৪৭২॥

অনুবাদ। প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাধকত্ব) থাকিলে দৃষ্টান্ত অহেতু (অসাধক) হয় না (অর্থাৎ প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত যদি তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের সাধক হয়, তাহা হইলে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাঁহার সাধ্য ধর্ম্মের অসাধক হয় না, উহাও সাধক বলিয়া স্বীকার্য্য)।

ভাষ্য। প্রতিদৃষ্টান্তঃ ক্রবতা ন বিশেষহেতুরপদিষ্ঠ্যতে, অনেন

প্ৰকাৰেণ প্ৰতিদৃষ্টান্তঃ সাধকো ন দৃষ্টান্ত ইতি । এবং প্ৰতিদৃষ্টান্ত-
হেতুত্বে নাহেতুদৃষ্টান্ত ইত্য়ুপপদ্যতে । স চ কথমহেতুৰ্ন স্মাৎ ? যদ্য-
প্ৰতিষিদ্ধঃ সাধকঃ স্মাদিতি ।

অনুবাদ । প্ৰতিদৃষ্টান্তবাদী কৰ্ত্ত্বক বিশেষ হেতু কথিত হইতেছে না, (যথা) —
এইপ্ৰকাৰে প্ৰতিদৃষ্টান্তই সাধক হইবে, দৃষ্টান্ত সাধক হইবে না । এইৰূপ স্থলে
প্ৰতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব (সাধকত্ব) থাকিলে অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদী উক্ত স্থলে তাঁহার
প্ৰতিদৃষ্টান্তের সাধকত্ব স্বীকাৰ কৰিলে দৃষ্টান্ত অহেতু নহে অৰ্থাৎ বাদীর
কথিত দৃষ্টান্ত পদাৰ্থও তাঁহার সাধ্যধৰ্ম্মের সাধক, ইহা উপপন্ন হয় অৰ্থাৎ
উহাও স্বীকাৰ্য্য । (প্ৰশ্ন) সেই দৃষ্টান্ত পদাৰ্থও কেন অহেতু হইবে না ? (উত্তৰ)
যদি অপ্ৰতিসিদ্ধ হইয়া সাধক হয় । অৰ্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত প্ৰতিবাদী কৰ্ত্ত্বক
প্ৰতিসিদ্ধ (খণ্ডিত) না হওয়ায় উহা অবশ্যই সাধক হইবে ।

টিপ্পনী । মহৰ্ষি পূৰ্ব্বসূত্ৰের দ্বাৰা “প্ৰসঙ্গমম” প্ৰতিষেধের উত্তৰ বলিয়া, এই সূত্ৰের দ্বাৰা
“প্ৰতিদৃষ্টান্তমম” প্ৰতিষেধের উত্তৰ বলিয়াছেন যে, প্ৰতিদৃষ্টান্ত হেতু হইলে কিন্তু দৃষ্টান্ত অহেতু
হয় না অৰ্থাৎ অসাধক হয় না । সূত্ৰে “হেতু” শব্দের অর্থ সাধক । ভাষ্যকাৰও পৰে “সাধক”
শব্দের প্ৰয়োগ কৰিয়া ঐ অর্থ ব্যক্ত কৰিয়া গিয়াছেন । ভাষ্যকাৰ মহৰ্ষি এই উত্তরের তাৎপৰ্য্য
ব্যক্ত কৰিয়াছেন যে, পূৰ্ব্বোক্ত “প্ৰতিদৃষ্টান্তমম” প্ৰতিষেধের প্ৰয়োগস্থলে প্ৰতিবাদী প্ৰতিদৃষ্টান্ত
বলিয়া কোন বিশেষ হেতু বলেন না, যদ্বাৰা তাঁহার প্ৰতিদৃষ্টান্তই সাধক, কিন্তু বাদীর দৃষ্টান্ত
সাধক নহে, ইহা স্বীকাৰ্য্য হয় । সুতরাং তাঁহার কথিত প্ৰতিদৃষ্টান্ত বস্তুতঃ সাধকই হয় না ।
তথাপি তিনি যদি উহা সাধক বলিয়াই স্বীকাৰ করেন, তাহা হইলে বাদীর দৃষ্টান্তও যে সাধক,
ইহাও তাঁহার স্বীকাৰ্য্য । কাৰণ, তিনি বাদীর দৃষ্টান্তকে খণ্ডন না কৰায় ঐ দৃষ্টান্তও যে সাধক,
ইহা স্বীকাৰ কৰিতে বাধ্য এবং তিনি বাদীর হেতুরও খণ্ডন না কৰায় তাহারও সাধকত্ব
স্বীকাৰ কৰিতে বাধ্য । তাহা হইলে তিনি আর প্ৰতিদৃষ্টান্ত দ্বাৰা কি কৰিবেন ? তিনি বাদীর
হেতুকেই হেতুরূপে গ্ৰহণ কৰিয়া, প্ৰতিদৃষ্টান্তদ্বাৰা বাদীর সাধ্যধৰ্ম্মীতে তাঁহার সাধ্যধৰ্ম্মের অভাব
সাধন কৰিয়া, বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্ভাবন কৰিতে পাবেন না । কাৰণ, ঐ হেতু তাঁহার
সাধ্যধৰ্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু—(বিশেষ হেতু) নহে । সুতরাং তাঁহার ঐ প্ৰতিদৃষ্টান্ত বাদীর
দৃষ্টান্ত হইতে অধিক বলশালী না হওয়ায় তিনি উহার দ্বাৰা বাদীর অনুমানে বাধদোষের
উদ্ভাবন কৰিতে পাবেন না এবং তুল্য বলশালীও না হওয়ায় সংপ্ৰতিপক্ষদোষেরও উদ্ভাবন
কৰিতে পাবেন না । বস্তুতঃ বাদী ও প্ৰতিবাদীর বিভিন্ন হেতুত্ব তুল্যবলশালী হইলেই সেখানেই
সংপ্ৰতিপক্ষ দোষ হয় । উক্ত স্থলে প্ৰতিবাদী কোন পৃথক্ হেতু প্ৰয়োগ করেন না । সুতরাং
সংপ্ৰতিপক্ষদোষের সম্ভাবনাই নাই । উদয়নাচাৰ্য্য প্ৰভৃতির মতে “প্ৰতিদৃষ্টান্তমম” জাতির প্ৰয়োগ
স্থলে প্ৰতিবাদী কোন হেতুরই উল্লেখ করেন না । কেবল দৃষ্টান্তকেই সাধ্যসিদ্ধির অঙ্গ মনে

করিয়া, প্রতিদৃষ্টান্তদ্বারা ই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। যেমন শব্দ ঘটের গ্রাম অনিত্য হইলে আকাশের গ্রাম নিত্য হউক? এইরূপে আকাশের গ্রাম শব্দের নিত্য সাধন করিয়া, শব্দে অনিত্যত্বের বাধ সমর্থন করেন। কিন্তু প্রতিবাদীর ঐ দৃষ্টান্ত হেতুশূন্য বলিয়া উহা সাধকই হয় না। প্রকৃত হেতু বাতীত কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। সূত্রে মহর্ষির “নাহেতুদৃষ্টান্তঃ” এই বাক্যের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। ফলকথা, বাদীর দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিবাদীর দৃষ্টান্তে অধিক বলশালিত্বই বাধদোষের প্রতি যুক্ত অঙ্গ বা প্রযোজক। প্রতিবাদী উহা অস্বীকার করিয়া ঐরূপে বাধদোষের উদ্ভাবন করায়, উক্ত স্থলে যুক্তাসহানি তাঁহার ঐ উক্তরের অসাধারণ ছষ্টত্বমূল। আর প্রতিবাদী যদি শেষে বলেন যে, আমার দৃষ্টান্তের গ্রাম তোমার দৃষ্টান্তও অসাধক। কারণ, তোমার পক্ষেও ত বিশেষ হেতু নাই। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত উক্তর স্বাব্যাবৃত্তক হওয়ায় উহা অসহুতর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য। কারণ, তিনি তাঁহার কথিত প্রতিদৃষ্টান্তকে অসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে আর উহার দ্বারা বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে পারেন না। উক্তরূপে স্বাব্যাবৃত্তকত্বই উক্ত জাতির সাধারণ ছষ্টত্বমূল।

প্রসঙ্গসম-প্রতিদৃষ্টান্তসম-জাতিদ্বয়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৪॥

সূত্র । প্রাপ্তপত্তেঃ কারণাভাবাদনুৎপত্তিসমঃ ॥১২॥৪৭৩॥

অনুবাদ। উৎপত্তির পূর্বের কারণের (হেতুর) অভাবপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) “অনুৎপত্তিসম” প্রতিষেধ।

ভাষ্য। “অনিত্যঃ শব্দঃ, প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটব”দিত্যুক্তে অপর আহ—প্রাপ্তপত্তেরনুৎপত্তে শব্দে প্রযত্নানন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকারণঃ নাস্তি, তদভাবান্নিত্যত্বং প্রাপ্তং, নিত্যস্ত চোৎপত্তিনাস্তি। অনুৎপত্ত্যা প্রত্যবস্থান-মনুৎপত্তিসমঃ।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে) প্রযত্নের অনন্তরভাবিত্ব অর্থাৎ প্রযত্ন-জগত্ব আছে, যেমন ঘট, ইহা (বাদী কর্তৃক) উক্ত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন,—উৎপত্তির পূর্বের অনুৎপন্ন শব্দে অনিত্যত্বের কারণ (অনুমাণক হেতু) প্রযত্নজগত্ব নাই। তাহার অভাববশতঃ (সেই শব্দে) নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন সেই শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি নাই। অনুৎপত্তি-প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) “অনুৎপত্তিসম”।

টিপ্পনী। মহৰ্ষি যথাক্ৰমে এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা (১৩) “অনুৎপত্তিসম” প্ৰতিষেধেৰ বৰ্ণন বুলিয়াইছে। সূত্ৰে “কাৰণ” শব্দেৰ অৰ্থ এখানে অনুমাপক হেতু, জনক হেতু নহে। “কাৰণাভাবাৎ” এই পদেৰ পৰে “প্ৰত্যবস্থানং” এই পদেৰ অধ্যাহাৰ সূত্ৰকাৰেৰ অভিমত বুঝা যায়। তাহা হইলে সূত্ৰাৰ্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাঁহাৰ নিজ মতানুসারে কোন জন্তু পদাৰ্থকে অনুমানেৰ আশ্ৰয় বা পক্ষৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়া, কোন হেতু দ্বাৰা তাহাতে তাঁহাৰ সাধ্যধৰ্ম্মেৰ সংস্থাপন কৰিলে, সেখানে প্ৰতিবাদী যদি বাদীৰ পক্ষ পদাৰ্থেৰ উৎপত্তিৰ পূৰ্বে তাহাতে বাদীৰ কথিত হেতু নাই, ইহা বুলিয়া প্ৰত্যবস্থান কৰেন, তাহা হইলে উহাৰ নাম (১৩) “অনুৎপত্তিসম” প্ৰতিষেধ। ভাষ্যকাৰ এখানে উদাহৰণ প্ৰদৰ্শনপূৰ্ব্বক উক্তৰূপে সূত্ৰাৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিতে বুলিয়াইছে যে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহাতে প্ৰযত্নেৰ অনন্তরভাবিত্ব অৰ্থাৎ প্ৰযত্নজন্তু আছে—যেন ঘট। কোন বাদী ঐৰূপ বলিলে প্ৰতিবাদী বলিলেন যে, শব্দেৰ উৎপত্তিৰ পূৰ্বে তাহাতে অনিত্যত্বেৰ কাৰণ অৰ্থাৎ সাধক হেতু না থাকায়, তখন সেই অনুৎপন্ন শব্দেৰ নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিত্য পদাৰ্থেৰ উৎপত্তি নাই। সুতৰাং তখন তাহাতে প্ৰযত্নজন্তু হেতু না থাকায় তদ্বাৰা শব্দমাত্ৰেৰ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। প্ৰতিবাদীৰ অভিপ্ৰায় এই যে, বাদী শব্দমাত্ৰেই প্ৰযত্নজন্তু হেতুৰ দ্বাৰা অনিত্যত্ব সাধন কৰিতেছেন। কিন্তু তিনি শব্দেৰ উৎপত্তি স্বীকাৰ কৰিলে, উৎপত্তিৰ পূৰ্বে অনুৎপন্ন শব্দে যে তাঁহাৰ কথিত হেতু প্ৰযত্নজন্তু নাই, ইহা তাঁহাৰ স্বীকাৰ্য্য। কাৰণ, তখনও তাহাতে প্ৰযত্নজন্তু থাকিলে তাহাকে আৰ অনুৎপন্ন বলা যায় না। কিন্তু সেই অনুৎপন্ন শব্দে বাদীৰ কথিত হেতু না থাকায় উহাৰ নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দেৰ মধ্যে অনুৎপন্ন শব্দ অনিত্য নহে এবং তাহাতে বাদীৰ কথিত ঐ হেতুও নাই, ইহা স্বীকাৰ্য্য হওয়ায় বাদীৰ ঐ অনুমানে অংশতঃ বাধ ও ভাগাসিদ্ধি অৰ্থাৎ অংশতঃ স্বৰূপাসিদ্ধিদোষ স্বীকাৰ্য্য। “বাৰ্ত্তিক”কাৰ ও জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকাৰোক্ত “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্ৰয়োগস্বৰূপেই বাদীৰ পক্ষ শব্দেৰ অনুৎপত্তি গ্ৰহণ কৰিয়াই এই সূত্ৰোক্ত “অনুৎপত্তিসম” প্ৰতিষেধেৰ উদাহৰণ বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্যেৰ সূক্ত বিচাৰানুসারে “ভাৰ্ত্তিকৰক্ষা”কাৰ বরদৰাজ এখানে বাদীৰ অনুমানেৰ অঙ্গ পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্ৰভৃতি যে কোন পদাৰ্থেৰ উৎপত্তিৰ পূৰ্বে হেতুৰ অভাব বুলিয়া, প্ৰতিবাদী বাদীৰ হেতুতে ভাগাসিদ্ধিদোষ প্ৰদৰ্শন কৰিলে “অনুৎপত্তিসম” প্ৰতিষেধ হইবে, ঐৰূপ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন এবং উহাৰ সমস্ত উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়া সৰ্ব্বত্ৰ বাদীৰ হেতুতে প্ৰতিবাদীৰ বক্তব্য ভাগাসিদ্ধিদোষই বুঝাইয়াছেন। অনুমানেৰ আশ্ৰয়ৰূপ

১। অনুৎপন্নে সাধনাঙ্গ হেতুবৃত্তেৰ ভাবতঃ।

ভাগাসিদ্ধিপ্ৰসঙ্গঃ শ্ৰীদনুৎপত্তিসমো মতঃ ৷১৮৷

সাধনাজানাঃ ধৰ্ম্মি-লিঙ্গ-সাধ্য-দৃষ্টান্ত-তদ্বজ্ঞানানামন্তমন্ত্ৰোৎপত্তেঃ পূৰ্বে হেতুবৃত্তেৰ ভাবাভাগাসিদ্ধা প্ৰত্যবস্থান-মনুৎপত্তিসমঃ।

ওচুস্তং “প্ৰাণুৎপত্তেঃ কাৰণাভাবানুৎপত্তিসম” ইতি। সাধনাজানামুৎপত্তেঃ প্ৰাক্ কাৰণত্ব হেতোরভাবাৎ প্ৰত্যবস্থানমনুৎপত্তিসম ইত্যর্থঃ।—ভাৰ্ত্তিকৰক্ষা।

পক্ষ পদার্থের কোন ভাগে অর্থাৎ কোন অংশে হেতু না থাকিলে তাহাকে “ভাগাসিদ্ধি” দোষ বলে। “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিখ্যাতও উক্ত মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার তাঁহার প্রদর্শিত উদাহরণে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি ও বাধদোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্তিককার পরে সূত্রোক্ত হেতু যে জ্ঞাপক হেতু, কারক অর্থাৎ জনক হেতু নহে, ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া অত্র আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে কেহ কেহ যে, এই “অনুৎপত্তিসমা” জাতিকে “অর্থাপত্তিসমা” জাতিই বলিতেন, ইহা বুঝাইয়া, উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে এই “অনুৎপত্তিসমা” জাতি কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির লক্ষণাক্রান্তই হয় না, এই পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তদন্তরে বলিয়াছেন যে, অনুৎপন্ন পদার্থমাত্রই অহেতু। যেমন অনুৎপন্ন সূত্রসমূহ বস্তুর কারণ হয় না, তদ্রূপ শব্দের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে অনুৎপন্ন বা অবিদ্যমান প্রযুক্তজাত তাহাতে অনিত্যত্বের সাধক হয় না। এইরূপে অনুৎপন্ন অহেতু পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহাও জাতির লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপে বার্তিককারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারাও “অর্থাপত্তিসমা” জাতি হইতে এই “অনুৎপত্তিসমা” জাতির ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, এই “অনুৎপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে অনুৎপন্ন অহেতু পদার্থের সহিত সাম্য প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয়। কিন্তু “অর্থাপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর বাক্যার্থের বিপরীত পদার্থের আরোপ করিয়া প্রতিষেধ হয়। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে। ভাষ্যকারও এখানে সর্ব্বশেষে “অনুৎপত্তিসম” নামের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া, পূর্বোক্ত ভেদ সূচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবাদী বাদীর গ্রহীত পক্ষের উৎপত্তির পূর্বকালীন অনুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রযুক্ত পূর্বোক্তরূপে প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম “অনুৎপত্তিসম”। “অর্থাপত্তিসম” প্রতিষেধ পূর্বোক্ত অনুৎপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান নহে, সুতরাং ইহা হইতে ভিন্ন ॥ ১২ ॥

ভাষ্য । অস্ত্রোত্তরং—

অনুবাদ । ইহার অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত “অনুৎপত্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র । তথাভাবাদুৎপন্নস্য কারণোপপত্তেন

কারণ-প্রতিষেধঃ ॥১৩॥৪৭৪॥

অনুবাদ । উৎপন্ন পদার্থের “তথাভাব”বশতঃ অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার স্বস্বরূপে সম্ভাবশতঃ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই পদার্থে বাদীর কথিত হেতুর সম্ভা থাকায় কারণের (হেতুর) প্রতিষেধ (অভাব) নাই।

ভাষ্য । তথাভাবাদুৎপন্নস্যেতি । উৎপন্নঃ খল্লয়ং শব্দ ইতি ভবতি । প্রাপ্তুৎপত্তেঃ শব্দ এব নাস্তি, উৎপন্নস্য শব্দভাবাৎ, শব্দস্য সতঃ প্রযত্না-

নন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে । কারণোপপত্তেরযুক্তোহয়ং দোষঃ
প্রাপ্তংপত্তেঃ কারণাভাবাদিতি ।

অনুবাদ । “তথাভাবাহুৎপন্নশ্চ”—ইহা অর্থাৎ সূত্রের প্রথমোক্ত ঐ বাক্য
(ব্যাখ্যাত হইতেছে) । ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অনুমানে বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ
উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহা হয় । (তাৎপর্য্য) উৎপত্তির পূর্বে শব্দই নাই, যেহেতু
উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দত্ব । সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া স্বস্বরূপে বিদ্যমান
শব্দের সম্বন্ধে অনিত্যত্বের কারণ (বাদীর কথিত অনিত্যত্বের সাধক হেতু) উপপন্ন
হয় অর্থাৎ তখন তাহাতে বাদীর কথিত প্রযত্নজগত্ব হেতু আছে । কারণের উপপত্তি-
বশতঃ অর্থাৎ শব্দে বাদীর কথিত ঐ হেতুর সত্তা থাকায় “উৎপত্তির পূর্বে কারণের
(হেতুর) অভাববশতঃ” এই দোষ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য
পূর্বেবাক্ত দোষ অযুক্ত ।

টিপ্পনী । পূর্বেবাক্ত “অনুৎপত্তিসম” নামক প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে
বলিয়াছেন,—“তথাভাবাহুৎপন্নশ্চ”, অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার “তথাভাব” অর্থাৎ
তদ্রূপতা হয় । ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার পূর্বেবাক্ত স্থলে উহার তাৎপর্য্য
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্দ উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহা হয় । অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে শব্দই থাকে
না,—কারণ, শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দভাব হয় । তাৎপর্য্য এই যে, শব্দের যে “তথাভাব”
অর্থাৎ শব্দভাব বা শব্দত্ব, তাহা শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহাতে সিদ্ধ হয় । উৎপত্তির পূর্বে উহা
 থাকিতে পারে না । কারণ, তখন শব্দই নাই । সুতরাং অনুৎপন্ন শব্দ বলিয়া কোন শব্দ নাই ।
শব্দ উৎপন্ন হইলেই তখন তাহার স্বস্বরূপে সত্তা সিদ্ধ হওয়ায় তখন তাহাতে অনিত্যত্বের কারণ
অর্থাৎ সাধক হেতু প্রযত্নজগত্ব আছে, সুতরাং অনিত্যত্বও আছে । তাহা হইলে আর বাদীর
পক্ষ শব্দের কোন অংশে তাঁহার হেতু না থাকায় তাহা নিত্য, ইহা বলিয়া বাদীর উক্ত অনুমানে
অংশতঃ বাধ ও অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ কোনরূপেই বলা যায় না । অর্থাৎ বাদী যে, শব্দমাত্র-
কেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রযত্নজগত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে অনিত্যত্ব সাধন করেন, সেই শব্দ-
মাত্রেরই তাঁহার ঐ হেতু আছে এবং নিত্যত্ব আছে । শব্দের মধ্যে অনুৎপন্ন নিত্য কোন প্রকার শব্দ
নাই । যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ্য ধর্ম্মের অভাব
বলিয়া উক্ত দোষ প্রদর্শন করা যায় না । বস্তুতঃ অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে হেতু না থাকিলে
স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ এবং সাধ্য ধর্ম্ম না থাকিলে বাধদোষ হয় । কিন্তু যাহা পক্ষের অন্তর্গতই নহে,
যাহা অলীক, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ্যধর্ম্মের অভাব থাকিতেই পারে না । আধার ব্যতীত
আধেয় হইতে পারে না । সুতরাং প্রতিবাদীর কথিত উক্ত দোষের সম্ভাবনাই নাই । আর
প্রতিবাদী ঐ সমস্ত যুক্তি অস্বীকার করিয়া, পূর্বেবাক্তরূপ দোষ বলিলে, তিনি যে অনুমানের দ্বারা
বাদীর ঐ হেতুর দৃষ্টত্ব সাধন করিবেন, সেই অনুমান বা তাহার সমর্থক অত্র কোন অনুমানে বাদীও

তাঁহার জ্ঞান উক্তরূপে স্বরূপাদিকি প্রভৃতি দোষ বলিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত উক্তর
স্বব্যাপাতক হওয়ায় উহা কোনরূপেই সূক্ষ্মর হইতে পারে না, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্ববৎ
স্বব্যাপাতকত্বই প্রতিবাদীর উক্ত উক্তরের সাধারণ দৃষ্টদৃষ্টমূল ॥ ১৩ ॥

অনুপপত্তিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সূত্র । সামান্যদৃষ্টান্তয়োঃ ইন্দ্রিয়কত্বে সমানে নিত্যানিত্যসাধর্ম্যাং সংশয়সমঃ ॥১৪॥৪৭৪॥

অনুবাদ । সামান্য ও দৃষ্টান্তের ঐন্দ্রিয়কত্ব সমান ধর্ম্ম হওয়ায় অর্থাৎ “শব্দো-
হনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে দৃষ্টান্ত ঘট অনিত্য এবং সেই ঘটস্থ সামান্য অর্থাৎ
ঘটস্থ জাতি নিত্য, কিন্তু ঐ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐ ঘটস্থসামান্যও
ঘট দৃষ্টান্তের সমান ধর্ম্ম হওয়ায় নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত
(সংশয় দ্বারা প্রত্যবস্থান) অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের
পূর্ব্বোক্ত সমান ধর্ম্ম জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক
প্রত্যবস্থান (১৪) সংশয়সম প্রতিষেধ ।

ভাষ্য । ‘অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদৃষ্টব’দিত্যুক্তে হেতো
সংশয়েন প্রত্যবতিষ্ঠতে—সতি প্রযত্নানন্তরীয়কত্বে অন্ত্যেবাস্ত্য নিত্যেন
সামান্যেন সাধর্ম্ম্যমৈন্দ্রিয়কত্বমস্তি চ ঘটেনানিত্যেন, অতো নিত্যানিত্য-
সাধর্ম্ম্যাদনিবৃত্তঃ সংশয় ইতি ।

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যে হেতু প্রযত্নজন্য—যেমন ঘট, এই বাক্য দ্বারা (বাদী
কর্ত্ত্বক) হেতু অর্থাৎ শব্দে অনিত্যনিশ্চায়ক প্রযত্নজন্য হেতু কথিত হইলে
(প্রতিবাদী) সংশয় দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলেন, (যথা—) প্রযত্নজন্য থাকিলে অর্থাৎ
শব্দে ঘটের জ্ঞান অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক প্রযত্নজন্য হেতু থাকিলেও এই শব্দের
নিত্য সামান্য অর্থাৎ ঘটস্থ জাতির সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ সাধর্ম্ম্য আছেই এবং
অনিত্য ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ সাধর্ম্ম্য আছে। অতএব নিত্য ও অনিত্য
পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের
সাধর্ম্ম্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ও
অবশ্য জন্মিবে ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রদ্বারা (১৭) “সংশয়সম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে “নিত্যানিত্যসাধর্ম্যাৎ” এই বাক্যের দ্বারা ঐ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ঐ বাক্যের পরে “সংশয়েন প্রত্যবস্থানং” এই বাক্যের অধাহার মহর্ষির অভিমত। তাই ভাষ্যকারও “সংশয়েন প্রত্যবতিষ্ঠতে” এই বাক্যের দ্বারা উহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রে “সামান্যদৃষ্টান্তয়োঃ” ইত্যাদি প্রথমোক্ত বাক্য উদাহরণ প্রদর্শনার্থ। অর্থাৎ উহার দ্বারা “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে মহর্ষি এই “সংশয়সম” প্রতিষেধের উদাহরণ সূচনা করিয়াছেন। তাই পরে লক্ষণ সূচনা করিতেও বলিয়াছেন,—“নিত্যানিত্য-সাধর্ম্যাৎ”। উক্ত স্থলে নিত্য ঘট জ্ঞাতি এবং অনিত্য ঘটদৃষ্টান্তের ইন্দ্రిয়গ্রাহ্যরূপ সাধর্ম্য বা সমানধর্ম্যই ঐ বাক্যের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত বাক্যে “নিত্য” শব্দের দ্বারা বিপক্ষ এবং “অনিত্য” শব্দের দ্বারা সপক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত এবং “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত^১। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদীর সাধ্যধর্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ের যে কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি তদ্বিষয়ে সংশয় সমর্থনপূর্বক প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (১৪) “সংশয়সম” প্রতিষেধ বা “সংশয়সমা” জাতি। যে পদার্থ বাদীর সাধ্যশূণ্য বলিয়া নিশ্চিতই আছে, তাহাকে বলে বিপক্ষ এবং যে পদার্থ বাদীর সাধ্যধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, তাহাকে বলে সপক্ষ। সুতরাং পূর্বোক্ত “শব্দোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে অনিত্যত্বশূণ্য অর্থাৎ নিত্য ঘট জ্ঞাতি বিপক্ষ এবং অনিত্যত্ববিশিষ্ট ঘট দৃষ্টান্ত সপক্ষ। তাই মহর্ষি উক্ত স্থলকেই গ্রহণ করিয়া সূত্রে “নিত্য” ও “অনিত্য” শব্দেই প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার প্রভৃতি উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অল্প স্থলেও বাদীর সপক্ষ ও বিপক্ষের সাধর্ম্য গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলে, দেখানেও ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রানুসারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজ্ঞাত্যৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্য প্রযত্নজ্ঞাত্যৎ আছে, তদ্রূপ উহাতে নিত্য ঘট জ্ঞাতি এবং অনিত্য-ঘটের সাধর্ম্য ইন্দ্రిয়গ্রাহ্যও আছে। কারণ, শব্দ যেমন ইন্দ্రిয়গ্রাহ্য, তদ্রূপ ঘট-জ্ঞাতিও এবং ঘটও ইন্দ্రిয়গ্রাহ্য। ঘট জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ ঘট জ্ঞাতি নিত্য, ইহা বাদীরও স্বীকৃত। সুতরাং নিত্য ঘট জ্ঞাতি এবং অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য যে ইন্দ্రిয়গ্রাহ্য, তাহা শব্দে বিদ্যমান থাকায়, উহার জ্ঞানজ্ঞ শব্দ কি ঘট জ্ঞাতির ত্রায় নিত্য, অথবা ঘটের ত্রায় অনিত্য, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? সমানধর্ম্যজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের কারণ। সুতরাং উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকায় ঐরূপ সংশয় অবশ্যস্বাভাবী। বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণজ্ঞ শব্দে অনিত্যত্ব নিশ্চয় হইবে, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের কারণ থাকিলেও ঐরূপ সংশয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর

১। অত্র “সমানে” ইত্যন্ত উদাহরণপ্রদর্শনপরঃ। নিত্যানিত্যশব্দৌ সপক্ষবিপক্ষাবুপলক্ষয়ন্তঃ, সাধর্ম্যপদঞ্চ সংশয়হেতুঃ। ততশ্চ সাধ্যতদভাবয়োঃ সংশয়কারণাতিতার্থঃ।—তাকিকরক্ষা।

এইরূপ উত্তর “সংশয়সমা” জাতি । প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, সংশয়ের কারণ না থাকিলেই সেখানে নিশ্চয়ের কারণজ্ঞাত নিশ্চয় জন্ম । উক্ত স্থলে উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকার বাদীর প্রযুক্ত ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব-নিশ্চয় জন্মিতে পারে না । উক্তরূপে নিশ্চয়ের প্রতিপক্ষ সংশয় সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুতে সংপ্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । “তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজ ও রত্নিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন । বস্তুতঃ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অত্র হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন না করায় উহা প্রকৃত সংপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে, কিন্তু তত্ত্বল্য । তাই এই জাতিকে বলা হইয়াছে,—“সংপ্রতিপক্ষদেশনাতাসা” ।

এইরূপ শব্দাদিগত শব্দত্ব প্রভৃতি অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর “সংশয়সমা” জাতি হইবে । রত্নিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহা বলিয়াছেন । মহর্ষির প্রথমোক্ত “সাধর্ম্যসমা” জাতি হইতে এই “সংশয়সমা” জাতির বিশেষ কি ? এতদ্বত্তরে উদ্ভ্যাতকর বলিয়াছেন, যে, কোন এক পদার্থের সাধর্ম্য্যপ্রযুক্তই “সাধর্ম্য্যসমা” জাতির প্রবৃ্ত্তি হইয়া থাকে । কিন্তু উভয় পদার্থের সাধর্ম্য্যপ্রযুক্তই এই “সংশয়সমা” জাতির প্রবৃ্ত্তি হয়, ইহাই বিশেষ । বস্তুতঃ মহর্ষিও এই সূত্রে “নিত্যানিত্যসাধর্ম্য্যং” এই বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ বিশেষই সূচনা করিয়া গিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য । অস্মোত্তরঃ—

অনুবাদ । ইহার অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত “সংশয়সমা” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র । সাধর্ম্য্যাং সংশয়ে ন সংশয়ো বৈধর্ম্য্যাদ্ভয়থা বা
সংশয়েহত্যন্তসংশয়প্রসঙ্গে নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ
সামান্যস্থা প্রতিষেধঃ ॥১৫॥৪৭৩॥

অনুবাদ । সাধর্ম্য্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ সমানধর্ম্য্য দর্শনজ্ঞাত সংশয় হইলেও বৈধর্ম্য্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ সংশয়ের নিবর্তক বিশেষ-ধর্ম্য্যনিশ্চয়বশতঃ সংশয় জন্মে না । উভয় প্রকারেই সংশয় হইলে অর্থাৎ সমান ধর্ম্য্যজ্ঞান ও বিশেষ ধর্ম্য্যনিশ্চয়, এই উভয় সত্ত্বে সংশয় জন্মিলে অত্যন্ত সংশয়প্রসঙ্গ অর্থাৎ সংশয়ের অনুচ্ছেদের আপত্তি হয় । “সামান্যে”র নিত্যত্বের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমানধর্ম্য্যরূপ সাধর্ম্য্যের সর্বদা সংশয়-প্রযোজকত্বের অস্বীকারবশতঃই (পূর্বসূত্রোক্ত) প্রতিষেধ হয় না ।

ভাষ্য । বিশেষ্যবৈধর্ম্য্যাদবধারণ্যমাণেহর্থো পুরুষ ইতি—ন স্থাণু-পুরুষ-সাধর্ম্য্যাং সংশয়োহবকাশঃ লভতে । এবং বৈধর্ম্য্যাদ্বিশেষ্যে—
প্রমত্তানন্তরীয়কত্বাদবধারণ্যমাণে শব্দস্থানিত্যত্বে নিত্যানিত্যসাধর্ম্য্যাং

সংশয়োহবকাশং ন লভতে । যদি বৈ লভেত, ততঃ স্থাপুরুষসাধর্ম্যাণু-
চ্ছেদাদত্যন্তং সংশয়ঃ স্যাম্ । গৃহমাণে চ বিশেষে নিত্যং সাধর্ম্যং
সংশয়হেতুরিতি নাভ্যুপগম্যতে । নহি গৃহমাণে পুরুষস্ত বিশেষে
স্থাপুরুষসাধর্ম্যং সংশয়হেতুর্ভবতি ।

অনুবাদ । বিশেষধর্মরূপ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত “পুরুষ” এইরূপে নিশ্চীয়মান পদার্থে
স্থাপু ও পুরুষের সমানধর্ম্যপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না অর্থাৎ পুরুষ বলিয়া
নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে ইহা কি স্থাপু ? অথবা পুরুষ ? এইরূপ সংশয়
জন্মিতেই পারে না ; এইরূপ বিশেষধর্মরূপ বৈধর্ম্য প্রযুক্তজন্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ
শব্দের অনিত্যত্বনিশ্চায়ক ঐ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চীয়মান হইলে নিত্য ও
অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না । যদি অবকাশ লাভ
করে, অর্থাৎ যদি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও সংশয় জন্মে, ইহা বল, তাহা হইলে
স্থাপু ও পুরুষের সমানধর্মের অনুচ্ছেদবশতঃ অত্যন্ত সংশয় অর্থাৎ সর্বদা সংশয়
হউক ? বিশেষধর্ম “গৃহমাণ” (নিশ্চীয়মান) হইলেও সমান ধর্ম সর্বদা সংশয়ের
প্রযোজক হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না । কারণ, পুরুষের বিশেষ ধর্ম নিশ্চীয়মান
হইলে স্থাপু ও পুরুষের সমান ধর্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই সূত্র দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “সংশয়সম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে সূত্রশেষে
বলিয়াছেন, “অপ্রতিষেধঃ” । অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না, উহা অযুক্ত । কেন উহা
অযুক্ত ? ইহা বুঝাইতে প্রথমে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,—“সাধর্ম্যাৎ সংশয়ে ন সংশয়ো
বৈধর্ম্যাৎ ।” অর্থাৎ সমানধর্মের দর্শনজন্ম সংশয় হইলেও বিশেষধর্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশয়
জন্মে না । বার্তিককার সূত্রোক্ত “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা সমানধর্মের দর্শন এবং “বৈধর্ম্য”
শব্দের দ্বারা বিশেষ ধর্মের দর্শনই গ্রহণ করিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐরূপ ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । কিন্তু তিনি সূত্রোক্ত “সংশয়ে” এই পদের পরে “আপাদ্যামানেহপি” এই বাক্যের
অধ্যাহার করিয়াছেন । তাঁহার মতে সমানধর্মের দর্শনজন্ম সংশয় আপত্তির বিষয় হইলেও বিশেষ
ধর্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশয় জন্মে না, ইহাই মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ । তাৎপর্যাটীকাকার উক্ত
বাক্যের তাৎপর্যার্থ বলিয়াছেন যে,^১ কেবল সমান ধর্মদর্শনমাত্রই সংশয়ের কারণ নহে,
কিন্তু বিশেষধর্মের অদর্শন সহিত সমান ধর্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ । সুতরাং যেখানে
বিশেষ ধর্মের দর্শন হইয়াছে, সেখানে পূর্বোক্তরূপ সমান ধর্মদর্শন না থাকায় সংশয়ের কারণই থাকে
না ; সুতরাং সংশয় জন্মিতে পারে না । বরদরাজ এখানেও পূর্বসূত্রের দ্বারা সূত্রোক্ত “সাধর্ম্য”

১ । ন সামান্তদর্শনমাত্রং সংশয়স্য কারণমপি তু বিশেষদর্শনসহিতং । বিশেষদর্শনে তু তত্রহিতং ন কারণমিতি
সূত্রার্থঃ ।—তাৎপর্যাটীকা ।

শব্দের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত এবং তদনুসারে সূত্রোক্ত “বৈধর্ম্য” শব্দের দ্বারাও নিশ্চয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত, ইহা বর্ণিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষধর্মরূপ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ ধর্ম হস্ত পদাদি যাহা স্থাগুতে না থাকায় স্থাগুর বৈধর্ম্য, তাহা দেখিয়া পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলে, তখন আর তাহাতে স্থাগু ও পুরুষের সমানধর্ম দর্শনজন্য পূর্বের স্থায় ইহা কি স্থাগু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় জন্মে না। এইরূপ শব্দে যে প্রযুক্তজ্ঞাত্ব প্রমাণসিদ্ধ বিশেষধর্ম আছে, যাহা নিত্য পদার্থের বৈধর্ম্য, তাহা যখন শব্দে নিশ্চিত হয়, তৎকালে ঐ শব্দে নিত্য ঘটজ্ঞাপ্তি এবং অনিত্য ঘট দৃষ্টান্তের সমানধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বের জ্ঞান হইলেও তজ্জ্ঞ আর উহাতে নিত্য, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয় জন্মে না। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে যে সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, তাহা কারণের অভাবে হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ প্রতিবেদ অযুক্ত।

প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উভয় প্রকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ সমান ধর্ম দর্শন ও বিশেষ ধর্ম দর্শন, এই উভয় থাকিলেও সেখানে সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয় জন্মে। এতদ্বত্তরে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“উভয়থা বা সংশয়েহত্যন্তসংশয়প্রসঙ্গঃ”। উক্ত বাক্যে “বা” শব্দের অর্থ অবধারণ। অর্থাৎ উক্ত পক্ষ গ্রহণ করিলে সর্বদাই সংশয়ের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তস্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্থাগু ও পুরুষের সমান ধর্মের উচ্ছেদ না হওয়ায় উহার দর্শনজন্য পরেও উহাতে সংশয় জন্মিবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে পুরুষের বিশেষধর্ম হস্তপদাদি দর্শন করিলেও স্থাগু ও পুরুষের যে সমান ধর্ম দেখিয়া পূর্বে সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা তখনও বিদ্যমান থাকায় উহা দেখিয়া তখনও আবার তাহাতে পূর্ববৎ ইহা কি স্থাগু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় কেন জন্মিবে না? উক্ত পক্ষে সেখানেও সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয়ের উচ্ছেদ কখনই হইতে পারে না। প্রতিবাদী শেষে যদি উহা স্বীকার করিয়াই বলেন যে, আমি সেখানেও সংশয় জন্মে, ইহা বলি, সমান ধর্ম দর্শন হইলে কখনই সংশয়ের উচ্ছেদ হয় না, উহা চিরকালই সংশয়ের জনক, ইহাই আমার বক্তব্য। এতদ্বত্তরে মহর্ষি সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“নিত্যস্থানভ্যুপগমাচ্চ সামান্তত্ব”। অর্থাৎ সমানধর্মরূপ যে “সামান্ত”, তাহার নিত্যত্ব অর্থাৎ সত্যত সংশয়প্রযোজকত্ব স্বীকারই করা যায় না। উক্ত বাক্যে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। ভাষ্যকার উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষ ধর্মের দর্শন বা নিশ্চয় হইলেও সমান ধর্ম সত্যত সংশয়ের প্রযোজক হয়, ইহা স্বীকারই করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষধর্ম হস্তপদাদি দেখিলে তখন তাহাতে বিদ্যমান স্থাগু ও পুরুষের সমানধর্ম সংশয়ের প্রযোজক হয় না। ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত “সামান্ত” শব্দের দ্বারাও পূর্বোক্ত সাধর্ম্য বা সমান ধর্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং “নিত্যত্ব” শব্দের দ্বারা নিত্য সংশয়হেতুত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমান ধর্ম দর্শন সংশয়ের কারণ হইলে ঐ সমানধর্ম ঐ সংশয়ের প্রযোজক হয়। সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত “হেতু” শব্দের অর্থ এখানে প্রযোজক, ইহাই বুঝিতে হয়। বার্তিককার প্রভৃতির মতানুসারে সূত্রোক্ত “সামান্ত” শব্দ ও উহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারোক্ত “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা সমান ধর্ম দর্শনই বিবক্ষিত বুঝিলে ভাষ্যকারোক্ত হেতু

শব্দের দ্বারা জনক অর্থও বুঝা যায়। সে বাহা ইউক, ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ শেযোক্ত বাক্যের কষ্ট-কল্পনা করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, মহর্ষি কণাদের শ্রায় মহর্ষি গোতমের মতেও ঘটত্বাদি “সামান্ত” বা জাতির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় “ন ঘটাবাসামান্তনিত্যত্বাৎ” (২।১৪) ইত্যাদি পূর্বপক্ষস্থলে ঐ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরে সেখানে সিদ্ধান্তস্থলে ঐ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়াও পূর্বপক্ষ খণ্ডন করেন নাই। সুতরাং তিনি এই স্থলে “সামান্ত” অর্থাৎ জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করি না, ইহা কখনই বলিতে পারেন না। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাখ্যাকারই এখানে কষ্টকল্পনা করিয়া মহর্ষির ঐ শেযোক্ত বাক্যের উক্তরূপই অর্থব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বাক্যের দ্বারা ঘটত্বাদি সামান্তের নিত্যত্বের অস্বীকারই যে সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য। মহর্ষি পূর্বস্থলে এবং এই স্থলে সমানধর্ম বক্তিতে “সাধর্ম্যা” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং পূর্বস্থলে ঘটত্বাদি জাতি অর্থেই “সামান্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি এই স্থলে পরে পূর্ববৎ “সাধর্ম্যা” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, “সামান্ত” শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন? এবং নিত্য সংশয়প্রযোজকত্বই তাঁহার বক্তব্য হইলে “নিত্যত্ব” শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন? “নিত্যত্ব” শব্দের দ্বারাই বা ঐরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায়? এই সমস্তও চিন্তা করা আবশ্যক। পরবর্তী কালে যে স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ অনেক নব্য নৈয়ামিক ঐ সমস্ত চিন্তা করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই, ইহাও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, বৃত্তিকার নিজে এখানে উক্ত বাক্যের পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, সর্বশেষে তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিত্যত্বের অনভ্যুপগম অর্থাৎ অস্বীকারের আপত্তি হয়। কারণ, ঐ সংস্কৃত জাতিতেও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সমান ধর্ম প্রযুক্ত নিত্যত্ব সংশয় হইতে পারে। অর্থাৎ যদি বিশেষ ধর্ম দর্শন হইলেও সমানধর্ম দর্শনজন্ত সর্বদাই সংশয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে ঘটত্বাদি জাতিকে নিত্য বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বকে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম বক্তিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও তিনি করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে ঐ ঘটত্বাদি জাতিরও নিত্যত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সমান ধর্ম প্রমেয়ত্ব বিদ্যমান আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহাতেও নিত্যত্ব সংশয় অবশ্যই জন্মিবে। তাহা হইলে আর তাহাতেও কখনই নিত্যত্ব নিশ্চয় জন্মে না, ইহা তাঁহার স্বীকার্য। “শ্রায়সূত্রবিবরণ”-কার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পরে এই নবীন ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই স্থলে মহর্ষির “নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ সামান্তত্ব” এই চরম উত্তরবাক্যের দ্বারা আমরা তাঁহার চরম বক্তব্য বুঝিতে পারি যে, পূর্বোক্ত স্থলে বিশেষধর্ম নিশ্চয় সত্ত্বেও শব্দ উক্তরূপ সংশয় স্বীকার করিয়া, প্রতিবাদী শব্দের অনিত্যত্ব অস্বীকার করিলে, বাদী তাঁহাকে বলিবেন যে, তাহা হইলে তুমি ত ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব স্বীকারও কর না, করিতে পার না। কারণ, ঘটত্বাদি জাতিতেও নিত্য আত্মা ও অনিত্য ঘটের সমান ধর্ম প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় তোমার

বুঝানুসারেই তাহাতেও উক্তরূপ সংশয় স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। সুতরাং ঘটাদি জাতিতেও নিত্যানিত্য-সংশয়বশতঃ উহার নিত্য স্বীকারও তুমি কর না, ইহা তোমাকে বলিতেই হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তুমি আর শব্দে উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিতে পার না। কারণ, তুমি ঘটাদি জাতিকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াই ঐ সংশয় সমর্থন করিয়াছ। কিন্তু ঐ ঘটাদি জাতির নিত্য অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলে তোমার ঐ উক্তর স্বাব্যবাহিক হওয়ায় উহা যে অসহজ, ইহা তোমারও স্বীকার্য। মহর্ষির উক্ত বাক্যের এইরূপই তাৎপর্য হইলে উহার সম্যক্ সার্থক্যও বুঝা যায়। পূর্বোক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যায় উক্ত বাক্যের বিশেষ প্রয়োজনও বুঝা যায় না। মূলকথা, শব্দে প্রযত্ন-জ্ঞাত্ব হেতুর নিশ্চয় হইলে শব্দের অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হইবে। কারণ, যাহা প্রযত্নজ্ঞাত্ব অর্থাৎ কাহারও প্রযত্ন ব্যতীত বাহার সম্ভাই সিদ্ধ হয় না, তাহা অনিত্য, ইহা সিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রযত্ন-জ্ঞাত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম এবং উহা শব্দের বিশেষধর্ম। ঐ বিশেষধর্মের নিশ্চয় হইলে তাহাতে অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হওয়ায় আর তাহাতে নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। প্রতিবাদী তখনও উহাতে সংশয় স্বীকার করিলে চিরকালই সর্বত্র সংশয় জন্মিবে। কুত্রাপি কোন সংশয়েরই উচ্ছেদ হইতে পারে না। প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিয়া তাহাই স্বীকার করিলে, তিনি যে সমস্ত অনুমানের দ্বারা বাদীর হেতুর দৃষ্ট স্বাধন করিবেন, তাহাতে ও তাঁহার সাধ্যাদি বিষয়ে প্রমের্যাদি সমান ধর্মজ্ঞানজ্ঞাত্ব সংশয় স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। তাহা হইলে, তাঁহার পূর্বোক্ত ঐ উক্তর স্বাব্যবাহিক হওয়ায় উহা যে অসহজ, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য। পূর্ববৎ স্বাব্যবাহিকতাই উক্ত জাতির সাধারণ দৃষ্টত্বমূল। যুক্তাজ্ঞানি অসাধারণ দৃষ্টত্বমূল। কারণ, বিশেষধর্মদর্শনের অভাববিশিষ্ট সমানধর্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ হওয়ায় বিশেষধর্ম দর্শনের অভাব ঐ কারণের যুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ অত্যাৱশ্যক বিশেষণ বা সহকারী। প্রতিবাদী উহা অস্বীকার করিয়া, কেবল সমানধর্ম দর্শনজন্যই সংশয় সমর্থনপূর্বক পূর্বোক্তরূপ উক্তর করায় যুক্তাজ্ঞানি-বশতঃও তাঁহার ঐ উক্তর দৃষ্ট হইয়াছে, উহা সহজ নহে ॥ ১৫ ॥

সংশয়সম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সূত্র । উভয়-সাধর্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসমঃ॥

॥১৬॥৪৭৭॥

অনুবাদ । উভয় পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত “প্রক্রিয়া”সিদ্ধি অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তির সিদ্ধিবশতঃ (প্রত্যবস্থান) (১৫) প্রকরণসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য । উভয়েন নিত্যেন চানিত্যেন চ সাধর্ম্যাৎ পক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ প্রবৃত্তিঃ প্রক্রিয়া—অনিত্যঃ শব্দঃ প্রবৃত্তানন্তরীয়কত্বাদঘটবদিত্যেকঃ পক্ষঃ

প্রবর্তয়তি । দ্বিতীয়শ্চ নিত্যসাধর্ম্যাৎ প্রতিপক্ষং প্রবর্তয়তি—নিত্যঃ শব্দঃ
 শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববদिति । এবঞ্চ সতি প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদिति হেতু-
 রনিত্যসাধর্ম্যেণোচ্যমানো ন প্রকরণমতিবর্ততে,—প্রকরণানতিরুক্তে নির্ণয়া-
 ন্নিবর্তনং, সমানক্লেতন্নিত্যসাধর্ম্যেণোচ্যমানে হেতৌ । তদিদং
 প্রকরণানতিরুক্ত্য প্রত্যবস্থানং প্রকরণসমঃ । সমানক্লেতদ্বৈধর্ম্যেহপি,
 উভয়বৈধর্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসম ইতি ।

অনুবাদ । উভয় পদার্থের সহিত (অর্থাৎ) নিত্য পদার্থের সহিত এবং
 অনিত্য পদার্থের সহিত সাধর্ম্যপ্রযুক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবর্তিরূপ “প্রক্রিয়া”
 (যথা) শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্নজন্ম, যেমন ঘট, এইরূপে এক ব্যক্তি (বাদী)
 পক্ষ অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব প্রবর্তন (স্থাপন) করিলেন । দ্বিতীয় ব্যক্তিও অর্থাৎ
 প্রতিবাদীও নিত্য পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব প্রবর্তন
 করিলেন—(যথা) শব্দ নিত্য, যেহেতু শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়জন্ম প্রত্যক্ষের বিষয়,
 যেমন শব্দত্ব । এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতু
 প্রয়োগ করায় অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উচ্যমান “প্রযত্নজন্মত্বাৎ” এই
 বাক্যোক্ত হেতু অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করিয়া
 বর্তমান হয় না অর্থাৎ উহা প্রতিবাদীর সাধ্য প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে (শব্দের
 নিত্যত্বকে) অতিক্রম করিতে পারে না । প্রকরণের অনতিবর্তনবশতঃ নির্ণয়ের
 অনুৎপত্তি হয় অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর হেতুর দ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্মের নির্ণয় জন্মে
 না । নিত্য পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উচ্যমান হেতুতেও ইহা সমান [অর্থাৎ পূর্ববৎ
 উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত শব্দের নিত্যত্বসাধক (শ্রাবণত্ব) হেতুও বাদীর পক্ষরূপ
 প্রকরণকে (শব্দের অনিত্যত্বকে) অতিক্রম করিতে না পারায় উহার দ্বারা তাঁহার
 সাধ্যধর্ম্য নিত্যত্বেরও নির্ণয় জন্মে না] প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ সেই এই
 প্রত্যবস্থানকে (১৫) প্রকরণসম বলে । এবং ইহা বৈধর্ম্যেও সমান, (অর্থাৎ) উভয়
 পদার্থের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধিবশতঃও প্রকরণসম প্রতিষেধ হয় ।

টিপ্পনী । এই সূত্রের দ্বারা “প্রকরণসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে ।
 পূর্ববৎ এই সূত্রেও “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার বা অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত । সূত্রে
 “উভয়” শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম্যবিশিষ্ট উভয় পদার্থই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত । বাদী ও প্রতিবাদীর
 পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্থাপনই এখানে ভাষ্যকারের মতে সূত্রোক্ত “প্রক্রিয়া” শব্দের
 অর্থ । অর্থাৎ প্রথমে বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, পরে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, ইহাকেই বলে

“প্রক্রিয়া”। বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধাধর্ম্য, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। উক্তরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নামই “প্রকরণ”। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ সাধাধর্ম্যদ্বয়, যাহা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু নির্ণীত হয় নাই, তাহাই ভাষ্যকারের মতে “প্রকরণ” শব্দের অর্থ এবং ঐ প্রকরণের স্থাপনই এই সূত্রে “প্রক্রিয়া” শব্দের অর্থ। প্রথম অধ্যায়ে “দ্বন্দ্বাৎ প্রকরণচিন্তা” (২১৭) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যায়ত্ত ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “প্রকরণ” শব্দের উক্ত অর্থই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে “প্রক্রিয়াতে সাধাভেদাধিক্রিয়াতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া “প্রকরণ” শব্দের ঐ অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যাতেও তিনি লিখিয়াছেন,—“প্রকরণস্ত প্রক্রিয়ামগন্ত সাধ্যান্ততি যাবৎ”। আধুনিক কোন ব্যাখ্যাকার ঐ স্থানে প্রকরণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সংশয় ; কিন্তু উহা নিস্প্রমাণ ও অসংগত। তार्কিকরক্ষাকার বরদরাজ এই সূত্রে “প্রক্রিয়া” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর সাধা ধর্ম্যই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষ-রূপ প্রকরণেরই নামান্তর প্রক্রিয়া। তাই তিনি এই “প্রকরণসম” প্রতিষেধকে “প্রক্রিয়া-সম” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত প্রকরণ অর্থে পূর্বকালে “প্রক্রিয়া” শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। পরবর্তী সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারোক্ত “প্রক্রিয়াসিদ্ধি”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—স্বসাধাসিদ্ধি। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের নিজের কথার দ্বারা তাঁহার মতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্থাপনই “প্রক্রিয়া” শব্দের অর্থ, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু এখানে প্রক্রিয়া ও প্রকরণ একই পদার্থ হইলে মহষি এই সূত্রে বিশেষ করিয়া প্রক্রিয়া শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? পরবর্তী সূত্রেই বা “প্রকরণ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যিক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই সূত্রে “প্রক্রিয়া” শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন—বিপরীত পক্ষের সাধন। তিনি বিপরীত পক্ষকেই প্রক্রিয়া বলেন নাই। কিন্তু কেবল কোন এক পক্ষেরই সাধন বা সংস্থাপনই প্রক্রিয়া নহে। যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের সংস্থাপনই এখানে সূত্রোক্ত “প্রক্রিয়া”। সূত্রে “উভয়সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা উভয় পদার্থের বৈধর্ম্যও বিবক্ষিত। অর্থাৎ উভয় পদার্থের সাধা ধর্ম্যের ত্রায় উভয় পদার্থের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া স্থলেও এই “প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ বুলিতে হইবে। ভাষ্যকারও শেষে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

ভাষ্যকার এখানে নিত্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শনপূর্বক “প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ দ্বারা সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা, কোন বাদী বলিলেন,—“শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ”। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নের অনন্তর-ভাবী অর্থাৎ প্রযত্নজ্ঞাত। যাহা যাহা প্রযত্নজ্ঞাত, সে সমস্তই অনিত্য, যেমন ঘট। এখানে শব্দ অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য প্রযত্নজ্ঞাত আছে বলিয়া তৎপ্রযুক্তই বাদী প্রথমে ঐ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বলিলেন,—“শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববৎ”। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, যে হেতু উহা শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন শব্দ জ্ঞাত। শব্দমাত্রে যে শব্দই নামে জাতি

আছে, তাহা নিত্য বলিয়াই এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ শব্দ-জ্ঞাপিতবিশিষ্ট শব্দেই প্রত্যক্ষ হওয়ায় শব্দ শব্দ ন্যায় ঐ শব্দ জ্ঞাপিতবিশিষ্ট শ্রবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। “শ্রবণেন গৃহ্যতে” অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই অর্থে “শ্রবণ” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন “শ্রাবণ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। শব্দে নিত্য শব্দ জ্ঞাপিতবিশিষ্ট শ্রাবণ আছে বলিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রতিবাদী উক্ত স্থলে “শ্রাবণত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া শব্দ জ্ঞাপিতবিশিষ্ট ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য। প্রতিবাদী পরে উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করিলেও বাদীর পূর্বোক্ত অনিত্যত্বসাধক হেতুর তাহাতে কি হইবে? ইহা বুঝাইতে ভাব্যকার পরেই বলিয়াছেন,—“এবঞ্চ সতি” ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতু প্রয়োগ করায় বাদীর প্রযুক্ত প্রবলত্বত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের ত্রায় প্রতিবাদীর নিত্যত্ব পক্ষকেও বাধিত করিতে পারে না। তাহাতে দোষ কি? তাই ভাব্যকার পরে বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ নিশ্চয়ের উৎপত্তি হয় না। ভাষ্যে “নির্ণয়ানির্কর্তনং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। কারণ, তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নির্ণয়ানিষ্পত্তিরিত্যর্থঃ”। “নির্কর্তন” শব্দের দ্বারা নিষ্পত্তি বা উৎপত্তি অর্থ বুঝা যায়। এইরূপ বাদী প্রথমে শব্দের অনিত্যত্বসাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করায় প্রতিবাদীর প্রযুক্ত উক্ত হেতুও প্রকরণকে অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদীর উক্ত পক্ষেরও নিশ্চয় জন্মে না, ইহা সমান। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে উভয় হেতুই কোন পক্ষকে বাধিত করিতে না পারায় উভয় পক্ষে সমানত্ববশতঃ কোন পক্ষের নির্ণয়েই সমর্থ হয় না। ভাব্যকার প্রথম অধ্যায়ে “প্রকরণসম” নামক হেতুভাসের লক্ষণ-স্বত্রের ব্যাখ্যা করিতেও লিখিয়াছেন,—“উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্তমানঃ প্রকরণসমে নির্ণয়ান ন প্রকল্পতে।” সেখানে পরেও বলিয়াছেন,—“সোহয়ং হেতুভাসো পক্ষো প্রবর্তয়নত্তরশ্চ নির্ণয়ান ন প্রকল্পতে” (প্রথম খণ্ড, ৩১৫—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাব্যকার এখানেও পূর্বোক্ত উদাহরণে নির্ণয়ের অন্তঃপত্তি সমর্থন করিয়া, উক্ত স্থলে এই স্বত্রোক্ত “প্রকরণসম” প্রতিষেধের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “প্রকরণসম” প্রতিষেধ। ভাব্যকারের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে স্থলে বাদী অথবা প্রতিবাদীর হেতু প্রবল হয়, সেখানে উহা প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে বাধিত করিয়া নিজপক্ষ নির্ণয়ে সমর্থ হওয়ায় প্রতিপক্ষবাদী নিরস্ত হন। সুতরাং তিনি সেখানে আর কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু উক্ত স্থলে উভয় হেতুই তুলা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় কোন হেতুই প্রতিপক্ষকে বাধিত করিতে না পারায় বাদী ও প্রতিবাদী কেহই নিরস্ত হন না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ পক্ষ নির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপর পক্ষকে বাধিত বলিয়া সমর্থন করেন। উক্ত স্থলে বাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থান “প্রকরণসম” প্রতিষেধ এবং প্রতিবাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থানও “প্রকরণসম” প্রতিষেধ। অর্থাৎ উক্ত স্থলে উভয়ের উত্তরই জাতান্তর। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয় পদার্থের সাধর্ম্য্যপ্রযুক্ত “প্রকরণসম”দ্বয়ই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উভয় পদার্থের বৈধর্ম্য্যপ্রযুক্তও “প্রকরণসম”দ্বয়

বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—কোন বাদী বলিলেন,—“শকোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ আকাশবৎ”। প্রতিবাদী বলিলেন,—“শকো নিত্যঃ স্পর্শ-
কত্বাৎ ঘটবৎ”। বাদী নিত্য আকাশের বৈধর্ম্ম্য কার্য্যত্বপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়া-
ছেন। উক্ত স্থলে নিত্য আকাশ বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত। প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতা-
প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঘট বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত। উক্ত উদাহরণেও
পূর্ব্ববৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থান “প্রকরণসম” প্রতিষেধ হইবে।
সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থল গ্রহণ করিয়া প্রকরণসমচতুষ্টয়ই বুঝিতে হইবে। উক্ত “প্রকরণসম”
প্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিপক্ষের বাধ প্রদর্শনই বাদী ও প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বস্তুতঃ
উক্ত স্থলে কোন পক্ষের বাধ নিশ্চয় না হইলেও বাদী ও প্রতিবাদী বিরুদ্ধ পক্ষের বাধনিশ্চয়ের
অভিমানবশতঃই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। তাই এই “প্রকরণসম” জাতিকে বলা হইয়াছে,—
“বাধদেশনাভাষা”। তাকিকরক্ষাকার বরদরাজ অত্র ভাবে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদী
ও প্রতিবাদী নিজের হেতুর সহিত অপরের হেতুর তুল্যতা স্বীকার করিয়াই বিরোধী প্রমাণের দ্বারা
অপরের হেতুর বাধিতত্বাভিমানবশতঃ যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাকে বলে “প্রক্রিয়াসম” বা
“প্রকরণসম” প্রতিষেধ। তাঁহার মতে এই সূত্রে “উভয়সাধর্ম্ম্য” শব্দের দ্বারা প্রতিপ্রমাণ অর্থাৎ
বিরোধী প্রমাণমাট্রই বিবক্ষিত। সুতরাং বাদী “শকোহনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী
যদি প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও শব্দে অনিত্যত্বের বাধ সমর্থন করেন, তাহা হইলেও
সেখানে “প্রকরণসম” প্রতিষেধ হইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কিন্তু বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী
কোন প্রমাণান্তরের অধিকবলত্বের আরোপ করিয়া অর্থাৎ সেই প্রমাণান্তর বস্তুতঃ অধিকবলশালী
না হইলেও তাহাকে অধিকবলশালী বলিয়া তদ্বারা অপর পক্ষের বাধসমর্থন দ্বারা প্রত্যবস্থান
করিলে তাহাকে বলে “প্রকরণসম” প্রতিষেধ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, আমার
হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পূর্ব্বই সিদ্ধ হওয়ায় শব্দে নিত্যত্বের বাধনিশ্চয়বশতঃ তোমার
দুর্ব্বল হেতুর দ্বারা আর শব্দে কখনই নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রতিবাদী বলেন
যে, আমার প্রবল হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধই থাকায় তাহাতে অনিত্যত্বের বাধনিশ্চয়বশতঃ
তোমার ঐ দুর্ব্বল হেতুর দ্বারা কখনই শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ অত্র
কোন প্রমাণের দ্বারা বাধনিশ্চয় সমর্থন করিয়া, বাদী ও প্রতিবাদী উক্তরূপে প্রত্যবস্থান
করিলেও তাহাও “প্রকরণসম” প্রতিষেধ হইবে, ইহা বৃত্তিকারেরও সম্মত বুঝা যায়।
“প্রকরণসম” অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষ নামক হেতুভাসের প্রয়োগ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত-
রূপে প্রতিপক্ষের বাধনিশ্চয় সমর্থন করেন না। কিন্তু উভয় পক্ষের সংশয়ই সমর্থন করেন।

১। তুল্যত্বমভ্যাগেত্যেব পরহেতোঃ স্বহেতুনা।

বাধেন প্রত্যবস্থানঃ প্রক্রিয়াসম উদ্যতে ২০৥

২। দুঃসংগতানধিকবলেন প্রতিপ্রমাণেন পরবায়হেতোর্ব্বাধাভিমানেন প্রত্যবস্থানঃ প্রকরণসম জাতিঃ।—তাকিকরক্ষা :

সুতরাং উহা হইতে এই “প্রকরণসমা” জাতির ভেদ আছে। পরবর্তী সূত্রে ইহা পরিস্ফুট হইবে। পূৰ্বোক্ত “সাধৰ্ম্ম্যসমা” ও “সংশয়সমা” জাতিও এই “প্রকরণসমা” জাতির ত্ৰায় সাধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা উভয় পদার্থের সাধৰ্ম্ম্যপ্রযুক্ত হওয়ায় ভেদ আছে। অর্থাৎ এই “প্রকরণসমা” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন করেন। “সাধৰ্ম্ম্যসমা” ও “সংশয়সমা” জাতিস্থলে ঐরূপ হয় না। উদ্যোতকর এখানে উক্তরূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ ভেদ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, “প্রকরণসমা” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ নিশ্চয়ের দ্বারা আমি অপরের পক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রবৃত্ত হই। কিন্তু “সাধৰ্ম্ম্যসমা” ও “সংশয়সমা” জাতি স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধনের সহিত সাম্যমাত্রের আপত্তি প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন করেন। কিন্তু নিজপক্ষ নিশ্চয়ের দ্বারা খণ্ডন করেন না, ইহাই বিশেষ। “প্রকরণসমা” জাতি স্থলেও যে সাম্যের আপাদন হইয়া থাকে, তাহা উভয়ের হেতুর সাম্য নহে। কিন্তু উভয়ের দুষণের সাম্য। সেই জগুই “প্রকরণসমা” নাম বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। অস্মোত্তরং—

অমুবাদ। এই “প্রকরণসমে”র উত্তর—

সূত্র। প্রতিপক্ষাৎ প্রকরণসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানুপ-
পত্তিঃ প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ ॥১৭॥৪৭৮॥

অমুবাদ। “প্রতিপক্ষ”প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সাধনপ্রযুক্ত প্রকরণের (সাধ্য পদার্থের) সিদ্ধি হওয়ায় প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ নিজপক্ষের নিশ্চয় দ্বারা পরকীয় সাধনের প্রতিষেধ হইতে পারে না,যেহেতু প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। উভয়সাধৰ্ম্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিং ক্রবতা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়া-
সিদ্ধিরুক্তা ভবতি। বদ্যুভয়সাধৰ্ম্ম্যাৎ, তত্র একতরঃ প্রতিপক্ষ—ইত্যেবং
সত্যুপপন্নঃ প্রতিপক্ষো ভবতি। প্রতিপক্ষোপপত্তেরনুপপন্নঃ
প্রতিষেধঃ। যদি প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতিষেধো নোপপদ্যতে, অথ
প্রতিষেধোপপত্তিঃ প্রতিপক্ষো নোপপদ্যতে। প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতি-
ষেধোপপত্তিঃ চেতি বিপ্রতিষিদ্ধিমিতি।

তত্ত্বানবধারণাক্ষ প্রক্রিয়াসিদ্ধির্বিপর্য্যয়ে প্রকরণাবসানাৎ।
তত্ত্বাবধারণে হবদিতং প্রকরণং ভবতীতি।

অনুবাদ । উভয় পদার্থের সাধর্ম্য প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি যিনি বলিতেছেন, তৎ-
কর্তৃক প্রতিপক্ষ-সাধনপ্রযুক্তও প্রক্রিয়াসিদ্ধি উক্ত হইতেছে । (তাৎপর্য্য)
যদি উভয় পদার্থের সাধর্ম্য থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের
সাধন হয় । এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিপক্ষেরও সাধন থাকিলে প্রতিপক্ষও
উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় । প্রতিপক্ষের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না ।
(তাৎপর্য্য) যদি প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না,
আর যদি প্রতিষেধের উপপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয় না ।
প্রতিপক্ষের উপপত্তি এবং প্রতিষেধের উপপত্তি, ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ ঐ উভয়
পরস্পর বিরুদ্ধ ।

তত্ত্বের অনবধারণপ্রযুক্তও প্রক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, যেহেতু বিপর্য্যয় হইলে
প্রকরণের অবসান (নিশ্চয়) হয় । (তাৎপর্য্য) যেহেতু তত্ত্বের অবধারণ হইলে
প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক পক্ষ অবসিত (নিশ্চিত) হয় ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “প্রকরণসম” নামক প্রতিষেধের উত্তর
বলিয়াছেন । সূত্রে প্রথমোক্ত “প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধন অর্থাৎ প্রতিপক্ষসাধক
বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুই বিবক্ষিত । কারণ, উহাই বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণের
(সাধ্যধর্ম্মের) সাধকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে । সুতরাং তৎপ্রযুক্তই প্রকরণসিদ্ধি বলা যায় ।
মহর্ষির সূত্রানুসারে ভাষ্যকারও এখানে প্রথমে প্রতিপক্ষের সাধনকেই “প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা
প্রকাশ করিয়াছেন । প্রাচীন কালে প্রতিপক্ষের সাধক হেতু এবং প্রতিপক্ষবাদী পুরুষেও “প্রতিপক্ষ”
শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের সাধনের খণ্ডন অর্থেও মহর্ষি-সূত্রে “প্রতিপক্ষ” শব্দের
প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু ঐ সমস্তই লাক্ষণিক প্রয়োগ (প্রথম খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা ত্রুটী) ।
সূত্রের শেষোক্ত “প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর সাধ্যধর্ম্মই বিবক্ষিত । বাদীর
যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্ম, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর
প্রতিপক্ষ । তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত উভয়
সাধর্ম্মপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুর দ্বারাও প্রকরণসিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয়
হইলে পূর্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না । কেন উপপন্ন হয় না ? তাই মহর্ষি শেষে বলিয়াছেন,—
“প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ” । অর্থাৎ যেহেতু তাহা হইলে প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা স্বীকার্য্য ।
তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদীর সাধন বাদীর সাধনের সমান হইলেও তিনি যদি তাঁহার
ঐ সাধনের দ্বারা তাঁহার নিজের সাধ্যনিশ্চয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর সাধনের দ্বারাও
তাঁহার সাধ্যের নিশ্চয় হয়, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য্য । কারণ, উভয় পদার্থের সাধর্ম্মপ্রযুক্ত প্রক্রিয়া-
সিদ্ধি বলিলে প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্তও যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যসিদ্ধি হয়, ইহা কথিতই
হয় । সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই কেবল নিজসাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করিয়া

তদ্বারা পরকীয় সাধনের প্রতিবেদন করিতে পারেন না। তাৎপর্যটীকাকারও এখানে এই ভাবে সূত্র ও ভাষ্যের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাঁহার প্রথমোক্ত বাক্যের তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি উভয় পদার্থের সাধন্য থাকে, তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হইবে। এখানেও “প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধনই কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত “শব্দোহনিতাঃ” ইত্যাদি বাদীর প্রয়োগে এবং পরে “শব্দো নিতাঃ” ইত্যাদি প্রতিবাদীর প্রয়োগে যথাক্রমে অনিত্য ঘটের সাধন্যপ্রযুক্ত এবং নিত্য শব্দের সাধন্যপ্রযুক্ত যে প্রক্রিয়াসিদ্ধি কথিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সাধন্যদ্বয়ই (প্রযুক্তত্ব ও আবণ্ড) সাধন বা হেতু। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধনও আছে। নচেৎ উভয় পদার্থের সাধন্য বলা যায় না। উভয় পদার্থের সাধন্য, ইহা বলিলে সেই সাধন্যও উভয় এবং তন্মধ্যে একতর বা অন্যতর প্রতিপক্ষের সাধন, ইহা স্বীকৃতই হয়। তাহাতে প্রকৃত স্থলে ক্ষতি কি? তাই ভাষ্যকার মহর্ষির শেখোক্ত বাক্যানুসারে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুও থাকায় প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা স্বীকার্য। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষের নিশ্চয়বশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধের উপপত্তি হইলে প্রতিপক্ষের নিশ্চয় হয় না, এবং প্রতিপক্ষের নিশ্চয় হইলেও প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, ঐ উভয় বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা একত্র সম্ভবই হয় না। তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুকেও শব্দে অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তিনি আর সেখানে নিজের হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব নিশ্চয় করিতে পারেন না। আর যদি তিনি নিজ হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব নিশ্চয় করেন, তাহা হইলে আর বাদীর হেতুকে শব্দে অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা একাধারে থাকে না। এইরূপ বাদীর পক্ষও বুঝিতে হইবে। ফলকথা, প্রতিপক্ষ এবং উহার অভাব, এই উভয়ের নিশ্চয় কখনই একত্র সম্ভব নহে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত ঐ উভয়ের ব্যাঘাত বা বিরোধ সূচনা করিয়া, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উত্তরই যে স্বাভাবিক, সুতরাং অনন্তর, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ববৎ উক্ত উত্তরের সাধারণ চূষ্টত্বমূল স্বাব্যবাহিকত্ব এই সূত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ হেতুর দ্বারা নিজ নিজ সাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করায় তাঁহাদিগের

১। এবং ব্যবস্থিতে সূত্রভাষ্যে যোজয়িতব্যে। “প্রতিপক্ষাৎ” প্রতিপক্ষসাধনাৎ প্রকরণস্ত প্রক্রিয়মাণস্ত সাধ্যাস্তেতি বাবৎ সিদ্ধেঃ সমানাৎ স্বসাধন্যৎ প্রতিবেদনস্ত প্রতিবাদিসাধনস্ত স্বসাধন্যসিদ্ধিধানেণ পরকীয়সাধন-প্রতিবেদনানুপপত্তিঃ। কস্মৎ প্রতিষেধানুপপত্তিরিত্যত উক্তঃ “প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ”। ফলতঃ পরকীয়সাধনস্ত সমানাৎ স্বসাধন্যৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিঃ স্বসাধন্যসিদ্ধিঃ প্রবর্তা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধিবস্তা ভবতি প্রতিবাদিনা। -২- তাৎপর্যটীকা।

উভয় হেতুই যে তুল্যবল, ইহা তাঁহারা স্বীকারই করেন। সুতরাং উক্ত স্থলে তাঁহারা কেহই অপর পক্ষের বাধা নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আভিমানিক বাধানির্ণয় প্রকৃত বাধানির্ণয় নহে। কারণ, যে পর্য্যন্ত কেহ নিজ পক্ষের হেতুর অধিকবলশালিত্ব প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অপর পক্ষের বাধানির্ণয় করিতে পারেন না। উভয় হেতুর মধ্যে একতরের অধিকবলশালিত্বই ঐক্লপ স্থলে বাধানির্ণয়ে যুক্তিসিদ্ধ অঙ্গ। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই ঐ যুক্তি অঙ্গ অস্বীকার করিয়া, অপর পক্ষের বাধা নির্ণয় করায় তাঁহাদিগের উভয়ের উত্তরই যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃও অসঙ্গত। যুক্তাঙ্গহীনত্ব উক্ত উত্তরের সাধারণ দৃষ্টদৃশ্য। এই সূত্রের দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, “প্রকরণসম” অর্থাৎ “সংপ্রতিপক্ষ” নামক হেত্বাভাস স্থলেও ত বাদী ও প্রতিবাদী পূর্ববৎ বিভিন্ন হেতুর দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সংস্থাপন করেন। সুতরাং তাহাও এই “প্রকরণসম” নামক জাত্যুত্তরই হওয়ায় বাদবিচারে তাহার উদ্ভাবন করা উচিত নহে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বের অনবধারণ অর্থাৎ অনিশ্চয়প্রযুক্তও প্রক্রিয়াসিদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন স্থলে প্রতিবাদী তত্ত্বের অনবধারণ বা অনিশ্চয় সম্পাদন করিবার জ্ঞাতঃ অর্থাৎ উভয় পক্ষের সংশয় সমর্থনোদ্দেশ্যেও অত্র হেতুর দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের সংস্থাপন করেন। কারণ, বিপর্যায় হইলে অর্থাৎ বাদীর হেতুর দ্বারা তত্ত্বের অবধারণ হইলে প্রকরণ অর্থাৎ বাদীর পক্ষ নির্ণীতই হইয়া যায়। তত্ত্বের অনবধারণের বিপর্যায় অর্থাৎ অভাব তত্ত্বের অবধারণ। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত “বিপর্যয়ে” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন— “তত্ত্বাবধারণে”। ফলকথা, ভাষ্যকার “তত্ত্বাবধারণাচ্চ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পরে এখানে “প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, এই “প্রকরণসম” জাতি হইতে উহার ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ “প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাসের প্রয়োগস্থলে যাহাতে বাদীর পক্ষের নির্ণয় না হয়—কিন্তু তত্ত্বের অনির্ণয় বা উভয় পক্ষের সংশয়ই স্পষ্ট হয়, ইহাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। সেই জ্ঞাতঃই সেখানে প্রতিবাদী তুল্যবলশালী অত্র হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষেরও সংস্থাপন করেন। কিন্তু এই “প্রকরণসম” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উদ্দেশ্য অত্ররূপ। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গৃহ্য তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে,^১ নিজস্বাধ্য নিশ্চয়ের দ্বারা অপরের সাধ্যকে বাধিত করিব, এই বুদ্ধিবশতঃই প্রতিবাদী হেতু প্রয়োগ করিলে, সেখানে “প্রকরণসম” নামক জাত্যুত্তর হয়। আর যেখানে বাদীর হেতুর তুল্যবলশালী অত্র হেতু বিদ্যমান থাকায় সংপ্রতিপক্ষতাবশতঃ বাদীর হেতুকে অনিশ্চায়ক করিব অর্থাৎ বাদীর ঐ হেতু তাঁহার

১। নথ্যেৎ প্রকরণসমঃস্থয়ো হেত্বাভাসো নোদভাবনীয়ঃ প্রতিবাদিনা, জাত্যুত্তরপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ “তত্ত্বানব-
ধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসিদ্ধিঃ”। স্বসাধ্যানির্ণয়েন পরসাধনবিষট্টনবুদ্ধা প্রতিবাদিনা সাধনং প্রযজ্যমানং প্রকরণসমাজাত্যুত্তরং
ভবতি। সংপ্রতিপক্ষতয়া বাদিনঃ সাধনমনিশ্চায়কং করোম্যিতি বুদ্ধা প্রতিপক্ষসাধনং প্রযুজ্যমানো ন জাতিবাদী,
সহস্রবাদিত্বাৎ। সংপ্রতিপক্ষতয়া হেতুদোষস্ত অনৈকান্তিকবজ্রপাদিত্বাৎ। “তত্ত্বানবধারণা”দিত্যনেন
প্রকরণসমোদাহরণং দর্শিতং :—তাৎপর্য্যটীকা।

সাধ্যের নিশ্চায়ক হয় না, পরন্তু সংশয়েরই প্রয়োজক হয়, ইহা সমর্থন করিব—এই বুদ্ধিবশতঃ প্রতিবাদী প্রতিপক্ষের সাধন বা হেতু প্রয়োগ করেন, সেখানে উহাকে বলে “সংপ্রতিপক্ষ” নামক হেতুভাসের উদ্ভাবন। উহা সদ্ভূত, স্মৃতরাং উহা করিলে তাহা জাত্যন্তর হয় না। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের হেতুই দৃষ্ট হয়। স্মৃতরাং সংপ্রতিপক্ষতা হেতু দোষ। অতএব তৎ নির্ণয়ার্থ বাদবিচারেও উহার উদ্ভাবন কর্তব্য। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী যদি ঐরূপ স্থলেও নিজসাধ্য নির্ণয়ের অভিমান করিয়া, তদ্বারা অপর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহাদিগের উভয়ের উত্তরই স্বব্যাপাতক হওয়ায় জাত্যন্তর হইবে। উহারই নাম “প্রকরণসম” জাতি ॥১৭॥

প্রকরণসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

সূত্র । ত্রৈকাল্যাসিক্কেহেতোরহেতুসমঃ ॥১৮॥৪৭৯॥

অনুবাদ । হেতুর ত্রৈকাল্যাসিক্কে প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) “অহেতুসম” প্রতিষেধ ।

ভাষ্য । হেতুঃ সাধনং, তৎ সাধ্যাৎ পূর্ব্বং পশ্চাৎ সহ বা ভবেৎ । যদি পূর্ব্বং সাধনমসতি সাধ্যে কস্ম সাধনং । অথ পশ্চাৎ, অসতি সাধনে কস্মেদং সাধ্যং । অথ যুগপৎ সাধ্যসাধনে, দ্বয়োর্বিদ্যমানয়োঃ কিং কস্ম সাধনং কিং কস্ম সাধ্যমিতি হেতুরহেতুনা ন বিশিষ্যতে । অহেতুনা সাধর্ম্ম্যাৎ প্রত্যবস্থানমহেতুসমঃ ।

অনুবাদ । হেতু বলিতে সাধন, তাহা সাধ্যের পূর্ব্ব, পশ্চাৎ অথবা সহিত অর্থাৎ সেই সাধ্যের সহিত একই সময়ে থাকিতে পারে। (কিন্তু) যদি পূর্ব্ব সাধন থাকে, (তখন) সাধ্য না থাকায় কাহার সাধন হইবে? আর যদি পশ্চাৎ সাধন থাকে, তাহা হইলে (পূর্ব্ব) সাধন না থাকায় ইহা কাহার সাধ্য হইবে? আর যদি সাধ্য ও সাধন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে থাকে, তাহা হইলে বিদ্যমান উভয় পদার্থের মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কালত্রয়েই হেতুর সিদ্ধি হইতে পারে না) এ জন্ম হেতু অর্থাৎ যাহা হেতু বলিয়া কথিত হয়, তাহা অহেতুর সহিত বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ অহেতুর সহিত তাহার কোন বিশেষ না থাকায় তাহা অহেতুর তুল্য। অহেতুর সহিত সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমাঙ্কসারে এই সূত্রের দ্বারা “অহেতুসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্ববৎ এই সূত্রেও “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত বৃত্তিতে হইবে। অর্থাৎ হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে (১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য। সূত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা এখানে জনক ও জ্ঞাপক, এই উভয় হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, জনক হেতুকে গ্রহণ করিয়াও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে। পরবর্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকারও উহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত “সাধন” শব্দের দ্বারা কার্য্যের জনক হেতু ও জ্ঞাপক হেতু, এই উভয় এবং “সাধ্য” শব্দের দ্বারাও কার্য্য ও জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রতিবাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য এখানে হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা হেতু বলিয়া কথিত হইবে, তাহা সাধ্যের পূর্বকালে অথবা পরকালে অথবা সমকালে অর্থাৎ সাধ্যের সহিত একই সময়ে জন্মিতে পারে বা থাকিতে পারে। কারণ, উহা ভিন্ন আর কোন কাল নাই; কিন্তু উহার কোন কালেই হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, হেতু যদি সাধ্যের পূর্বেই জন্মে বা থাকে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে তখন ঐ সাধ্য না থাকায় ঐ হেতু কাহার সাধন হইবে? যাহা তখন নাই, তাহার সাধন বলা যায় না। আর যদি ঐ হেতু ঐ সাধ্যের পরকালেই জন্মে বা থাকে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ঐ সাধ্যের পূর্বে ঐ হেতু না থাকায় উহা কাহার সাধ্য হইবে? হেতুর পূর্বকালবর্তী পদার্থ উহার সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, সমানকালীন না হইলে সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধ হইতে পারে না। সমানকালীনত্ব ঐ সম্বন্ধের অঙ্গ। সুতরাং যদি ঐ সাধ্য ও হেতু যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে জন্মে বা থাকে, ইহাই বলা যায়, তাহা হইলে ঐ উভয় পদার্থই সমকালে বিদ্যমান থাকায় উহার মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ উভয়ের সাধ্য-সাধন-ভাব নির্ণয় করা যায় না। কারণ, উভয়ই উভয়ের সাধ্য ও সাধন বলা যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত কালত্রয়েই যখন হেতুর সিদ্ধি হয় না, তখন ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ যাহা হেতু বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য অহেতুর সহিত তুল্য হওয়ার উহা হেতুই হয় না। কারণ, বাদী যে সমস্ত পদার্থকে তাঁহার সাধ্যের সাধন বা হেতু বলেন না, সেই সমস্ত পদার্থের সহিত তাঁহার কথিত হেতুর কোন বিশেষ নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর কথিত হেতুতে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিয়া, অহেতুর সহিত উহার সাধন্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে (১৬) “অহেতু-সম” প্রতিষেধ। উক্ত প্রতিষেধ স্থলে পূর্বোক্তরূপে অতিকূল তর্কের দ্বারা হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিয়া উহার হেতুত্ব বা সাধ্য-সাধন-ভাবই প্রতিবাদীর দৃষ্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়! অর্থাৎ সর্বত্র কার্য্যকারণভাব ও জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব বা প্রমাণ-প্রমেয়ভাব খণ্ডন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি নিজেই উক্ত জাতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদীর বক্তব্য বুঝাইয়াছেন এবং পরে সেখানে উহার খণ্ডনও করিয়াছেন। তাই “তর্কিকরক্ষা”কার বরদ্বাজও উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—“সেয়ং জাতিঃ সূত্রকাটেরেব প্রমাণপন্নীক্ষায়া-মুদাহর্তেব ‘প্রত্যক্ষাদীনামপ্রমাণাং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধে’রিতি” ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য । অস্মোত্তরং—

অনুবাদ । এই “অহেতুসম” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র । ন হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধৈস্ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিঃ ॥

॥১৯॥৪৮০॥

অনুবাদ । ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই, যেহেতু হেতুদ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্যের উৎপত্তি ও প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের জ্ঞান হয় ।

ভাষ্য । ন ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিঃ । কস্মাৎ ? হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেঃ । নির্বর্তনীয়া নিবর্ত্তির্বিজ্ঞেয়স্য বিজ্ঞানমুভয়ং কারণতো দৃশ্যতে । সোহয়ং মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণমিতি । যত্ত্বু খলুভ্যং—অসতি সাধ্যে কস্য সাধনমিতি—যত্ত্বু নির্বর্ত্ত্যতে যচ্চ বিজ্ঞাপ্যতে তস্মেতি ।

অনুবাদ । ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু, হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় । বিশদার্থ এই যে, উৎপাদ্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান, এই উভয়ই “কারণ” দ্বারা অর্থাৎ জনক দ্বারা এবং প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হয় । সেই ইহা মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ । যাহা কিন্তু উক্ত হইয়াছে—(প্রশ্ন) সাধ্য না থাকিলে কাহার সাধন হইবে ? (উত্তর) যাহাই উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার সাধন হইবে [অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্বকালে থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইয়া থাকে এবং যাহা বিজ্ঞাপিত বা বোধিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপক পদার্থ যে কোন কালে থাকিয়া উহার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ হইয়া থাকে ।]

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বসূত্রোক্ত “অহেতুসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নাই । অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত “অহেতুসম” প্রতিষেধের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, বাদীর হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করেন, বস্তুতঃ তাহা নাই । কেন নাই, তাই বলিয়াছেন,—“হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেঃ” । এখানে “হেতু” শব্দের দ্বারা জনক হেতু অর্থাৎ কার্যের কারণ এবং জ্ঞাপক হেতু অর্থাৎ প্রমাণ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে । সূত্রায়ং “সাধ্য” শব্দের দ্বারাও কারণসাধ্য কার্য্য এবং প্রমাণসাধ্য অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞেয় পদার্থ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে । সূত্রায়ং ‘সিদ্ধি’ শব্দের দ্বারাও কার্য্য পক্ষে উৎপত্তি এবং বিজ্ঞেয় পক্ষার্থ পক্ষে বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকারও মহর্ষির উক্ত বাক্যের ঐরূপই ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যে “কারণ” শব্দের দ্বারাও কার্য্য পক্ষে জনক এবং বিজ্ঞেয় পক্ষে বিজ্ঞাপক প্রমাণই গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই ইহা মহান্ প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ। অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি এবং প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়জ্ঞান বহু স্থলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্ত উদাহরণ দ্বারা সর্বত্রই ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য হওয়ায় হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হইতেই পারে না। তবে হেতু যদি সাধোর পূর্বেই থাকে, তাহা হইলে তখন সাধ্য না থাকায় উহা কাহার সাধন হইবে? এই যাহা প্রতিবাদী বলিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তদন্তরে বলিয়াছেন যে, যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহারই সাধন হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্বকালে বিদ্যমান থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইতে পারে। পূর্বে ঐ কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলেও উহার জনক পদার্থকে পূর্বেও উহার সাধন বা কারণ বলা যায়। অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির পূর্বেও বুদ্ধিস্থ সেই কার্য্যকে গ্রহণ করিয়াও উহার পূর্ববর্তী জনক পদার্থে কারণত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে ও হইতে পারে। এবং যে প্রমাণ দ্বারা উহার প্রমেয়বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, সেই প্রমাণ কোন স্থলে সেই প্রমেয় বিষয়ের পূর্বকালে এবং কোন স্থলে পরকালে এবং কোন স্থলে সমকালেও বিদ্যমান থাকিয়া, উহার বিজ্ঞাপক বা প্রমাণ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের পূর্বোক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি খণ্ডন করিতে “ত্রৈকাল্যপ্রতিষেধঃ” ইত্যাদি (১।১৫) শ্লোকের দ্বারা উহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বে সেখানে উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পূর্বোক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, হেতু যে সাধোর পূর্বকালাদি কোন কালেই থাকিয়া হেতু হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিতে প্রতিবাদী যে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন করেন, তাহার মূল বা অঙ্গীভূত ব্যাপ্তি নাই। তিনি কোন হেতুতেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ তর্ক প্রদর্শন করেন নাই এবং করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার প্রদর্শিত ঐ তর্কের অঙ্গ ব্যাপ্তি না থাকায় উহা যুক্তাজহীন হওয়ায় উহার দ্বারা তিনি হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি সমর্থন করিতে পারেন না, সুতরাং তদ্বারা সর্বত্র হেতুর হেতুত্ব বা সাধ্যসাধন-ভাবে খণ্ডন করিতেও পারেন না। বস্তুতঃ প্রতিবাদীর উক্ত তর্ক যুক্তাজহীন হওয়ায় উহা প্রতিকূল তর্কই নহে, কিন্তু প্রতিকূল তর্কভাষ্য। তাই এই “অহেতুসমা” জাতিকে বলা হইয়াছে—“প্রতিকূলতর্কদেশনাত্মা”। মহর্ষি এই শ্লোকের দ্বারা উক্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদীর আশ্রিত পূর্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের যুক্তাজহীনত্ব সূচনা করিয়া, উহা যে, প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের অসাধারণ দৃষ্টান্তের মূল, ইহা সূচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সাধ্য ও সাধন সমানকালীন না হইলে ঐ উত্তরের সম্বন্ধ সম্ভব নহে, ইহা বলিয়া প্রতিবাদী ঐ উত্তরের সমান-কালীনত্বকে ঐ উত্তরের সম্বন্ধের অঙ্গ বলিয়া স্বীকারপূর্বক ঐরূপ উত্তর করায় অযুক্ত অঙ্গের স্বীকারও তাঁহার ঐ উত্তরের দৃষ্টান্তের মূল, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধের পক্ষে ঐ উত্তরের সমানকালীনত্ব অনাবশ্যক, সুতরাং উহা অঙ্গ নহে ॥১৯॥

সূত্র। প্রতিষেধানুপপত্তেঃ প্রতিষেদ্ধব্যপ্রতি- ষেধঃ ॥২০॥৪৮১॥

অনুবাদ। “প্রতিষেধে”র (প্রতিষেধক হেতুর) অনুপপত্তিবশতঃও অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার প্রতিষেধক ঐ হেতুও অসিদ্ধ হওয়ায় (তাঁহার) প্রতিষেদ্ধব্য বিষয়ের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। পূর্বাং পশ্চাদ্য়ুগপত্তা “প্রতিষেধ” ইতি নোপপদ্যতে। প্রতিষেধানুপপত্তেঃ স্থাপনাহেতুঃ সিদ্ধ ইতি।

অনুবাদ। “প্রতিষেধ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক হেতু (ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি) পূর্বকালে, পরকালে অথবা যুগপৎ থাকে, ইহা উপপন্ন হয় না। “প্রতিষেধে”র অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে তাঁহার কথিত প্রতিষেধক হেতুও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ অসিদ্ধ হওয়ায় স্থাপনার হেতু অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক হেতু সিদ্ধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “অহেতুসম” প্রতিষেধ যে স্বব্যাবাহিক, ইহা সমর্থন করিয়া, উহার ছষ্টত্বের সাধারণ মূলও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ববৎ স্বব্যাবাহিকত্বই সেই সাধারণ মূল। যুক্তানুহানি ও অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার অনাধারণ মূল। পূর্বসূত্রের দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্বারা প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে এই সূত্রে প্রথমোক্ত “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিষেধক হেতুই বিবক্ষিত। সূত্রানুসারে ভাষ্যকারও প্রতিষেধক হেতু অর্থেই “প্রতিষেধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর হেতুত্বের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ উহার অভাব সাধন করিতে হেতু বলিয়াছেন— “ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি”। সুতরাং উহাই তাঁহার গৃহীত প্রতিষেধক হেতু। কিন্তু যদি ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর প্রযুক্ত হেতুর অসিদ্ধি হয়, উহার হেতুত্বই না থাকে, তাহা হইলে প্রতিবাদীর ঐ হেতুও অসিদ্ধ হইবে, উহাও হেতু হইতে পারে না। কারণ, প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক হেতুও ত উহার সাধ্য প্রতিষেধের পূর্বকালে অথবা পরকালে অথবা যুগপৎ থাকিয়া প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না—ইহা তাঁহারই কথিত যুক্তিবশতঃ স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। সুতরাং তাঁহার কথিত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার ঐ প্রতিষেধক হেতুও অসিদ্ধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা তাঁহার প্রতিষেধ্য বিষয়ের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। অর্থাৎ উহার দ্বারা বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক হেতুর হেতুত্ব বাহা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য, তাহার প্রতিষেধ হয় না। সুতরাং উহার হেতুত্বই সিদ্ধ থাকায় ঐ হেতু সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির এই চরম বক্তব্যই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ফলকথা, প্রতিবাদী যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ উত্তর করেন, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ তাঁহার নিজের ঐ হেতুও অসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য

হওয়ায় পরে বাদীর হেতুকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই তিনি বাধ্য হইবেন। সুতরাং তাঁহার ঐ উত্তর স্বাব্যবাহিক হওয়ায় কোনরূপেই উহা সহজ হইতে পারে না, উহা অসহজ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংশয় পরীক্ষার পরে প্রমাণসামান্ত পরীক্ষায় মহর্ষি ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বার্তিককার ও তাৎপর্যটীকাকার প্রভৃতি সেখানেই মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই তাৎপর্যটীকাকার এখানে পূর্বোক্ত “অহেতুসম” প্রতিষেধের কোন ব্যাখ্যা দি না করিয়া লিখিয়াছেন,—“সূত্রভাষ্যবার্তিকানি প্রমাণসামান্তপরীক্ষাব্যাখ্যানেন ব্যাখ্যাতানি” ২৩ ॥

অহেতুসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

সূত্র । অর্থাপত্তিতঃ প্রতিপক্ষসিদ্ধেরথাপত্তিসমঃ ॥

॥২১ ॥৪৮২॥

অনুবাদ। অর্থাপত্তি দ্বারা প্রতিপক্ষের (বিরুদ্ধ পক্ষের) সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৭) অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। ‘অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদঘটব’দিত্তি স্থাপিতে পক্ষে অর্থাপত্ত্যা প্রতিপক্ষং সাধয়তোহর্থাপত্তিসমঃ। যদি প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদনিত্যসাধর্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যর্থাদাপদ্যতে নিত্যসাধর্ম্যান্নিত্য ইতি। অস্তি চাস্য নিত্যেন সাধর্ম্যমস্পর্শত্বমিতি।

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্নজন্য, যেমন ঘট—এইরূপে পক্ষ স্থাপিত হইলে অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ অর্থাপত্ত্যভাসের দ্বারা প্রতিপক্ষ-সাধনকারী প্রতিবাদীর (১৭) অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ হয়। যথা—যদি প্রযত্নজন্যস্বরূপ অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা কথিত হয়; তাহা হইলে নিত্য পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বাদীর পূর্বোক্ত ঐ বাক্যের দ্বারা অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়) এই শব্দের নিত্য পদার্থের সহিত স্পর্শ-শূণ্যতারূপ সাধর্ম্যও আছে।

টীপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা ক্রমানুসারে “অর্থাপত্তিসম” প্রতিষেধের বক্ষণ কথিত হইয়াছে। পূর্ববৎ এই সূত্রেও “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। কোন বক্তা কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ যে অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি, এবং উহার সাধন বা করণকে বলে অর্থাপত্তিপ্রমাণ। মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে উহা একটি অতিরিক্ত প্রমাণ। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে উহা অনুমানপ্রমাণের অন্তর্গত। যেহেতু কোন বক্তা “জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই”, এই বাক্য বলিলে, ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়

যে, দেবদত্ত বাহিরে আছেন। কারণ, জীবিত ব্যক্তি গৃহ না থাকিলে অত্ৰ তাহার সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তাহার জীবিতত্ব ও গৃহ অসত্তার উপপত্তি হয় না। সুতরাং উক্ত স্থলে যে ব্যক্তিতে অত্ৰ বিদ্যমানতা নাই, তাহাতে জীবিতত্ব ও গৃহ অসত্তা নাই, এইরূপে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট (জীবিতত্ব সহিত গৃহে অসত্তা) হেতুর দ্বারা দেবদত্ত বাহিরে আছেন, ইহা অসম্ভবানুমান সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত বক্তা, বাক্যের দ্বারা উহা না বলিলেও তিনি যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহার অর্থতঃ ঐ অনুক্ত অর্থের যথার্থ বোধ জন্মিয়া থাকে। এ জন্ত উহা অর্থাপত্তি নামে কথিত হইয়াছে এবং বদ্বারা পূর্বোক্ত স্থলে অর্থতঃ আপত্তি অর্থাৎ যথার্থবোধ জন্মে, এই অর্থে অর্থাপত্তি প্রমাণেও “অর্থাপত্তি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। গোতম মতে উহা প্রমাণাস্তর না হইলেও প্রমাণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আস্থিকের প্রারম্ভে মহর্ষি উক্ত বিষয়ে নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে বক্তার কথিত কোন পদার্থে তাহার অনুক্ত অর্থের ব্যাপ্তি নাই, সেখানে অর্থাপত্তির দ্বারা সেই অর্থের যথার্থবোধ জন্মে না। সেখানে কেহ সেই অনুক্ত অর্থ বুঝিলে, তাহার সেই ভ্রমাত্মক বোধের করণ প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে,—উহাকে বলে “অর্থাপত্ত্যভাস”। এই সূত্রে “অর্থাপত্তি” শব্দের দ্বারা ঐ অর্থাপত্ত্যভাসই গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদী ঐ অর্থাপত্ত্যভাসের দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া প্রত্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে “অর্থাপত্তিসম” প্রতিষেধ^১। ভাষ্যকার উদাহরণ দ্বারা ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদবটবৎ” ইত্যাদি ত্ৰায়বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত অর্থাপত্তি নহে, কিন্তু অর্থাপত্ত্যভাস, তদ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব পক্ষের সাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উক্ত “অর্থাপত্তিসম” প্রতিষেধ হইবে। যেমন প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থলে বলেন যে, অনিত্য পদার্থের (ঘটের) সাধন্য প্রযত্নজ্ঞাতত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা বলিলে ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় যে, নিত্য পদার্থের সাধন্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য। আকাশাদি অনেক নিত্য পদার্থের সহিত শব্দের স্পর্শশূন্যতারূপ সাধন্যও আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, ইহা সিদ্ধ হইলে বাদী উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। উক্তরূপে বাদীর অসম্ভবানে বাধ অথবা পরে সংপ্রতিপক্ষ-দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত “সাধন্যাসমা” প্রভৃতি কোন কোন জাতির প্রয়োগস্থলেও প্রতিবাদী এইরূপ প্রত্যবস্থান করেন। কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বর্ণন করেন না। অর্থাৎ বাদীর বাক্য দ্বারাই অর্থতঃ ঐরূপ বুঝা যায়, ইহা বলেন না। কিন্তু এই “অর্থাপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর যাহা তাৎপর্য্য বিষয় নহে, এমন অর্থও তাঁহার তাৎপর্য্যবিষয় বলিয়া বঙ্গনা করিয়া, উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করেন। সুতরাং ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি। তাৎপর্য্য-টীকাকারও এখানে লিখিয়াছেন,—“ন সাধন্যাসমাদৌ বাদ্যভিপ্রায়বর্ণনমিত্যতো ভেদঃ”।

১। উক্ত বপরাঁতাক্ষপশ্চিমাধিকারঃ,—তত্ত্বদাতাসো লক্ষ্যতে। অর্থাপত্ত্যভাসাং প্রতিপক্ষসিদ্ধিমতিবায় প্রত্যবস্থানমর্থপত্তিসম ইত্যর্থঃ।—তর্কিকরঙ্গ।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যাধুনাগরে তর্কিকরক্ষাকার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিধি হইলে উহার দ্বারা শেষের নিষেধ বুঝা যায়, এইরূপ ভ্রমই এই “অর্থাপত্তিসম্মা” জাতির উৎপত্তির হেতু। অর্থাৎ এইরূপ ভ্রমবশতঃই প্রতিবাদী উক্তরূপ অসদ্বস্তর করেন। যেমন কোন বাদী শব্দ অনিত্য, এই বাক্য বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অত্র সমস্তই নিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থও নিত্য হওয়ার দৃষ্টান্ত সাধঃশূন্য হয়। তাহা হইলে বিরোধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্যাঃপ্রযুক্ত অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে নিত্য পদার্থের সাধর্ম্যাঃপ্রযুক্ত নিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে বাদীর অনুমানে সংপ্রতিপক্ষদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনুমানপ্রযুক্ত অনিত্য, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। তাহা হইলে বাদীর অভিমত অনুমানে বাধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী কার্যত্ব হেতুকে অনিত্যত্বের সাধক বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অত্র পদার্থ সাধক নহে, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। এইরূপ কোন বাদী কার্যত্ব হেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী নহে, ইহা বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অত্র সমস্তই ব্যভিচারী, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। পূর্বোক্ত সমস্ত স্থলেই প্রতিবাদীর ঐরূপ উত্তর “অর্থাপত্তিসম্মা” জাতি। প্রতিবাদী ঐরূপে বাদীর অনুমানে সমস্ত দোষেরই উদ্ভাবন করিতে পারেন। তাই উক্ত জাতিকে বলা হইয়াছে,—“সর্বদোষদেশনাভাঙ্গা”। “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ সমস্ত উত্তরও সম্ভব নহে। উহাও জাত্যান্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে ॥২১॥

ভাষ্য। অশ্রোতরং—

অনুবাদ। এই “অর্থাপত্তিসম্মা” প্রতিবেদের উত্তর —

সূত্র। অনুক্তস্বার্থাপত্তেঃ পক্ষহানৈরূপপত্তিরনুত্ত্বা-
দনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ ॥২২॥৪৮৩॥

অনুবাদ। অনুক্ত পদার্থের অর্থাপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদিকর্তৃক অনুক্ত যে কোন পদার্থেরও অর্থতঃ বোধ স্বীকার করিলে তৎপ্রযুক্ত পক্ষহানির উপপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুঝা যায়, যেহেতু (তাহাতেও) অনুক্তই আছে এবং অর্থাপত্তির অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহার “অনৈকান্তিকত্ব” অর্থাৎ উভয় পক্ষে তুল্যবশতঃ পক্ষহানির উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অনুপপাদ্য সামর্থ্যমনুত্তমর্থাদাপদ্যতে ইতি ক্রবতঃ

পক্ষহানৈরুপপত্তিরনুভূত্বাৎ' । অনিত্যপক্ষস্ত সিদ্ধাবর্থাদাপন্নং
নিত্যপক্ষস্ত হানিরিতি ।

অনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ । উভয়পক্ষসমা চেয়মর্থাপত্তিঃ ।
যদি নিত্যসাধর্ম্যাদম্পর্শত্বাদাকাশবচ্চ নিত্যঃ শব্দোহর্থাদাপন্নমনিত্য-
সাধর্ম্যাত্ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদনিত্য ইতি । ন চেয়ং বিপর্যয়মাত্রা-
দেকান্তেনার্থাপত্তিঃ । ন খলু বৈ ঘনস্ত গ্রাবণঃ পতনমিত্যর্থাদাপ-
দ্যতে দ্রবাণামপাং পতনাবাব ইতি ।

অনুবাদ । সামর্থ্য উপপাদন না করিয়া অর্থাৎ বাদীর বাক্যে যে ঐরূপ অনুক্ত
অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, যদ্বারা উহা বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়, তাহা
প্রতিপাদন না করিয়া “অনুক্ত” অর্থাৎ যে কোন অনুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়,
ইহা যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সেই প্রতিবাদীর নিজ
পক্ষের অভাবেরও অর্থতঃ বোধ হয় । কারণ, (তাহাতেও) অনুক্তই আছে ।
(তাৎপর্য) অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের অভাব, ইহাও অর্থতঃ
বুঝা যায় ।

এং অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ববশতঃ [পক্ষহানির উপপত্তি হয়] (তাৎপর্য)
এই অর্থাপত্তি অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেকোন অর্থাপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন,
তাহা উভয় পক্ষে তুল্যই । (কারণ) যদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্য স্পর্শশূন্যতা-
প্রযুক্ত এবং আকাশের ন্যায় শব্দ নিত্য, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের
সাধর্ম্য প্রযুক্তত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায় । বিপর্যয়মাত্র-
বশতঃ ইহা একান্ততঃ অর্থাপত্তিও নহে । যেহেতু “ঘন প্রস্তরের পতন হয়” ইহা
বলিলে দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায় না ।

টিপ্পনী । পূর্বস্বত্রোক্ত অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই স্বত্র দ্বারা প্রথমে
বদ্বিয়াছেন যে, যে কোন অনুক্ত অর্থের অর্থাপত্তি অর্থাৎ অর্থতঃ বোধ হইলে তৎপ্রযুক্ত পক্ষ-
হানির উপপত্তি হয় । ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সামর্থ্য উপপাদন না

১। যদি পুনঃপুনঃসামর্থ্যমনুস্তমপি গম্যেত, ততঃস্থানিত্যত্বাপাদনে শব্দস্তোচ্যমানেনহমুচ্যমানমনিত্যত্বং
প্রত্যোত্তব্যং । তথাচ ভবদতিমতস্ত নিত্যত্বস্ত ব্যাবৃতিঃ । তদ্বিদমাহ—“অনিত্যপক্ষস্তানুস্ত সিদ্ধ বর্থাদাপন্নং নিত্য-
পক্ষস্ত হানিরিতি । বিপর্যয়েণাপি প্রত্যবস্থানিসম্ভবাদনৈকান্তিকত্বমাহ—“উভয়পক্ষসমা চেয়মিতি । ব্যভিচারোচ্চ-
নৈকান্তিকত্বমাহ—“ন চেয়ং বিপর্যয়মাত্রা”দিতি । নহি ভোজননিষেধাদেবাভোজনবিপরীতং সর্বত্র কল্প্যতে
ঘনত্বং হি গ্রাবণঃ পতনানুকূলকরত্বাতিশয়দৃষ্ট্যর্থঃ, ন ত্বিতরেণাং পতনং বারয়তি । বার্ত্তিকং স্তবোধঃ ।—তাৎপর্যটীকা ।

করিয়া যে কোন অমুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে অমুক্ত অর্গের বঙ্গনা ব্যতীত সেই বাক্যার্থের উপপত্তিই হয় না, সেই অমুক্ত অর্থই সেই বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। সুতরাং সেই অমুক্ত অর্থের কল্পনাতেই সেই বাক্যের সামর্থ্য আছে। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে তাঁহার অমুক্ত অর্থের কল্পনার মূল সামর্থ্য প্রতিপাদন না করিয়া অর্থাৎ বাদীর কথিত পদার্থে তাঁহার অমুক্ত অর্গের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিয়া যে কোন অমুক্ত অর্থ অর্থতঃ বুঝা যায় ইহা বলিলে তাঁহার পক্ষহানি অর্থাৎ নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুঝা যাইবে। কেন বুঝা যাইবে? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“অমুক্তত্বাৎ”। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের হানিও অমুক্ত অর্থ। উদ্যোতক লিখিয়াছেন,—“কিং কারণং? সামর্থ্যমামুক্তত্বাৎ”। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে যে ঐরূপ অমুক্ত অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, তাহা উপপাদন করেন নাই। কিন্তু সূত্র ও ভাষ্য দ্বারা মহর্ষির ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যানুসারে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে অমুক্ত অর্থের বোধে বাদীর বাক্যের সামর্থ্য বুঝা যায় না, অর্থাৎ যে অর্থের কল্পনা না করিলেও বাদীর বাক্যার্থের কোন অমুক্তপত্তি নাই, সেই অমুক্ত অর্থও যদি প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহা বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্দ নিত্য, এই বাক্য প্রয়োগ করিলেই উহার দ্বারা অর্থতঃ শব্দ অনিত্য, ইহাও বুঝা যাইবে। কারণ, উহাও ত তাঁহার অমুক্ত অর্থ। তিনি উহা স্বীকার করিলে তাঁহার পক্ষহানিই স্বীকৃত হইবে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যই শেষে বলিয়াছেন যে, অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের হানি, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে শব্দের নিত্যত্ববাদী প্রতিবাদী শব্দ নিত্য, এই কথা বলিলে তাঁহার অমুক্ত অর্থ যে অনিত্য পক্ষ অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব, তাহার সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ তাহাও প্রতিবাদীর ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা গেলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ যে নিত্যপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব, তাহার অভাব, ইহাই অর্থতঃ বুঝা যায়। কারণ, নিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত ঐ উত্তর উক্তরূপে প্রযোজ্যতক হওয়ায় উহা সঙ্গত হইতে পারে না।

মহর্ষি প্রকারান্তরেও উক্ত প্রতিষেধের স্বব্যবহৃতক সমর্থন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন, “অনৈকান্তিকত্বাচ্চাৰ্থপত্তেঃ”। ভাষ্যকার প্রথমে উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উভয় পক্ষে তুল্য। কারণ, বিপরীত ভাবেও প্রত্যবস্থান হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবাদী “শব্দো নিত্যঃ অস্পর্শত্বাৎ গগনবৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে বাদীও তখন তাঁহার ঐ বাক্য অবলম্বন করিয়া, তাঁহার ত্রায় বলিতে পারেন যে, যদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যতাপ্রযুক্ত এবং আকাশের ত্রায় শব্দ নিত্য, ইহা বল, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নজ্ঞত্বপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায়। সুতরাং তোমার নিজ পক্ষের হানি অর্থাৎ অভাব সিদ্ধ হওয়ায় তুমি আর নিজ পক্ষ সিদ্ধ করিতে পার না। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত “অনৈকান্তিকত্ব” শব্দের অর্থ উভয় পক্ষে তুল্য। ভাষ্যকার পরে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থপত্তি যে

ব্যভিচারবশতঃ ও অনৈকান্তিক, ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, বিপর্যয়মাত্রবশতঃ এই অর্থাপত্তি ঐকান্তিক অর্থাপত্তিও নহে। অর্থাৎ উহা অনৈকান্তিক (ব্যভিচারী) বলিয়া প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্যাভাস। কারণ, ঐরূপ স্থলে বাদীর কথিত অর্থের বিপর্যয় বা বৈপল্যোক্ত্যমাত্রই থাকে। বাদীর কথিত কোন অর্থের তাঁহার অনুরূপ সেই বিপরীত অর্থের ব্যাপ্তি থাকে না। সুতরাং উহা প্রকৃত অর্থাপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ইহা একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, কেহ ঘন প্রস্তরের পতন হয়, এই কথা বলিলে, দ্রব জলের পতন হয় না, ইহা ঐ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় না। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে “ঘন” শব্দের দ্বারা প্রস্তরে পতনের অনুরূপ গুরুত্বের আধিক্যমাত্র সূচিত হয়। উহার দ্বারা দ্রব জলের গুরুত্বই নাই, সুতরাং উহার পতন হয় না, ইহা বক্তার বিবক্ষিত নহে এবং তাহা সত্যও নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে ঐরূপ অনুরূপ অযোগ্য অর্থের কল্পনা না করিলেও ঐ বাক্যার্থ বোধের উপপত্তি হওয়ায় অর্থাপত্তির দ্বারা ঐরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হওয়ায় উহা প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে; উহাকে বলে অর্থাপত্যাভাস। এইরূপ পূর্বোক্ত “অর্থাপত্তিসম” প্রতিবেদ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহাও অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়া প্রকৃত অর্থাপত্তিই নহে। সুতরাং তদ্বারা ঐরূপ অনুরূপ অর্থের যথার্থ বোধ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের বাক্য দ্বারাও অর্থতঃ তাঁহার নিজ পক্ষহানিরও যথার্থ বোধ হইতে পারে। সুতরাং প্রতিবাদী কখনই তাঁহার নিজপক্ষ সিদ্ধ করিতে পারেন না, ইহাই মহর্ষির চরম বক্তব্য। সূত্রে “অনৈকান্তিকত্ব” শব্দের দ্বারা মহর্ষি ব্যভিচারিত্ব অর্থও প্রকাশ করিয়া “অর্থাপত্তিসম” প্রতিবেদ স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপত্তি যে ব্যাপ্তিশূন্য, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থাপত্তির যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা উহাতে নাই, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তাজহানিও যে, উক্ত উক্তরের দৃষ্টত্বের মূল, ইহাও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে এবং প্রথমে স্বব্যাবহৃতকত্বরূপ অসাধারণ দৃষ্টত্বমূলও এই সূত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। “তাকিকরক্ষা”-এর বরদরাজও ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে “অনর্থাপপত্তা-বর্থাপত্তাভিমানাৎ” (২.৪) এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃত অর্থাপত্তিই ব্যভিচারিত্ব ঋণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা “অর্থাপত্তিসম” প্রতিবেদ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহারই ব্যভিচারিত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং সেই সূত্রের সহিত এই সূত্রের কোন বিরোধ নাই, ইহা এখানে প্রণিধান করা আবশ্যিক। উদ্যোতকরও এখানে ঐ কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং তিনিও এই সূত্রে “অনৈকান্তিকত্ব” শব্দের দ্বারা ব্যভিচারিত্ব অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যে উহার দ্বারা প্রথমে উভয়পক্ষতুল্যতা অর্থও গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারাও উক্তরূপ উক্তরের স্বব্যাবহৃতকত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও এখানে বুঝা আবশ্যিক ॥২২॥

সূত্র । একধর্মোপপত্তেরবিশেষে সর্বাংশেবিশেষপ্রসঙ্গাৎ
সদ্ভাবোপপত্তেরবিশেষসমঃ ॥২৩॥৪৮৪॥

অনুবাদ । এক ধর্মের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই ধর্মের সদ্ভাবশতঃ (ঐ উভয় পদার্থের) অবিশেষ হইলে সদ্ভাবের (সত্তার) উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থেই সত্তারূপ এক ধর্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষ হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) অবিশেষসম প্রতিষেধ ।

ভাষ্য । একো ধর্মঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বং শব্দঘটয়োৰূপপদ্যতে - ইত্যবিশেষে উভয়োৰনিত্যত্বে সর্বস্বাবিশেষঃ প্রসজ্যতে : কথং ? সদ্ভাবোপপত্তেঃ । একো ধর্মঃ সদ্ভাবঃ সর্বস্যোপপদ্যতে । সদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্বাংশেবিশেষপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যবস্থানমবিশেষসমঃ ।

অনুবাদ । একই ধর্ম প্রযত্নজনক শব্দ ও ঘটে আছে, এ জন্ম অবিশেষ হইলে (অর্থাৎ) শব্দ ও ঘট, এই উভয়ের অনিত্যত্ব হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ প্রসক্ত হয় । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু “সদ্ভাবে”র অর্থাৎ সত্তার উপপত্তি (বিত্তমানতা) আছে । (তাৎপর্য) একই ধর্ম সত্তা সকল পদার্থের উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সকল পদার্থেই উহা আছে । সত্তার উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) অবিশেষসম প্রতিষেধ ।

টিপ্পনী । মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা “অবিশেষসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । সূত্রে “অবিশেষে” এই পদের পূর্বে “সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত । এবং পূর্ববৎ “অবিশেষসম” এই পদের পূর্বে “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহারও এখানে বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকারও শেষে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন । ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত উদাহরণস্থলেই এই “অবিশেষসম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা,—কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজনকত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে,

তোমার সাধাধর্ম্য বা পক্ষ যে শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘট, এই উভয়ে তোমার কথিত হেতু প্রযত্নজন্যতরূপ একই ধর্ম্য বিদ্যমান আছে বলিয়া, তুমি ঐ উভয় পদার্থের অবিশেষ বলিতেছ অর্থাৎ ঘটের ত্রায় শব্দেরও অনিত্যত্ব সমর্থন করিতেছ। কিন্তু তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক ? উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “অবিশেষসম” প্রতিষেধ। প্রতিবাদী কেন ঐরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন ? তাঁহার অভিমত হেতু বা আপাদক কি ? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“সদ্ভাবোপপত্তেঃ।” অর্থাৎ যেহেতু সকল পদার্থেই “সদ্ভাব” অর্থাৎ সত্তা বিদ্যমান আছে। “সদ্ভাব” শব্দের দ্বারা সৎ পদার্থের ভাব অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্য বুঝা যায়। সূতরাং উহা দ্বারা সত্তারূপ ধর্ম্য বুঝা যায়। সূত্রে “উপপত্তি” শব্দও সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “তাকিক-রক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সূত্রে “সদ্ভাব” শব্দের দ্বারা এখানে সাধারণ ধর্ম্যমাত্রই বিবক্ষিত। সূতরাং প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্যও উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যখন সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি একই ধর্ম্য সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছে, ইহা বাদীরও স্বীকৃত, তখন তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই অবিশেষ কেন হইবে না ? ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, যদি সকল পদার্থের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষই স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে আর বিশেষ করিয়া শব্দে অনিত্যত্বের সাধন ব্যর্থ। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, যদি সমস্ত পদার্থেরই একত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ না থাকায় অনুমানই হইতে পারে না। আর যদি একধর্ম্যবস্তুরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই একজাতীয়ত্ববশতঃ পূর্ববৎ অনুমান প্রবৃতি হইতে পারে না। আর যদি একাকার-ধর্ম্যবস্তুরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অনিত্যতাবশতঃ বিশেষ করিয়া শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান-প্রবৃতি হইতে পারে না। “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অবিশেষ প্রদর্শন করিয়া, ঐ পক্ষত্রয়েই দোষ সমর্থন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্তরূপ ত্রিবিধ অবিশেষ গ্রহণ করিয়া উক্ত পক্ষত্রয়ে দোষ বলিয়াছেন। এই “জাতি”র প্রয়োগ স্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া, বাদীর অনুমান ভঙ্গ করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। তাই বৃত্তিকার এই “জাতি”কে বলিয়াছেন, “প্রতিকূলতর্ক-দেশনাভাসা”। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে উক্ত জাতি স্থলে বাদীর হেতুর অসাধকত্বই প্রতিবাদীর আশোপা। সূতরাং তাঁহারা ইহাকে বলিয়াছেন,—“অসাধকত্বদেশনাভাসা”। মহর্ষির প্রথমোক্ত “সাধর্ম্যাসমা” জাতিও সাধর্ম্যমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় তাহা হইতে এই “অবিশেষসমা” জাতি ভিন্ন হইবে কিরূপে ? এতদ্বস্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন এক পদার্থের সাধর্ম্য গ্রহণ করিয়া “সাধর্ম্যাসমা” জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্য গ্রহণ করিয়া এই “অবিশেষসমা” জাতির প্রয়োগ হয়। সূতরাং “সাধর্ম্যাসমা” জাতি হইতে ইহার ভেদ আছে ৷২৩৷

ভাষ্য । অশ্রোতরং—

অনুবাদ । এই “অবিশেষসম” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র । কচিৎকর্মোপপত্তেঃ কচিচ্চানুপপত্তেঃ

প্রতিষেধাভাবঃ ॥২৪॥৪৮৫॥*

অনুবাদ । কোন সাধর্ম্য অর্থাৎ প্রযত্নজন্য প্রভৃতি সাধর্ম্য বিद्यমান থাকিলে সেই ধর্মের অর্থাৎ উহার ব্যাপক অনিত্যত্ব ধর্মের উপপত্তিবশতঃ এবং কোন সাধর্ম্য অর্থাৎ সত্তা প্রভৃতি সমস্ত সং পদার্থের সাধর্ম্য বিद्यমান থাকিলেও সেই ধর্মের অর্থাৎ অনিত্যত্ব ধর্মের অনুপপত্তিবশতঃ (পূর্বসূত্রোক্ত) প্রতিষেধ হয় না । [অর্থাৎ প্রযত্নজন্যরূপ সাধর্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় । কিন্তু সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট না হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না । কারণ, সাধর্ম্যমাত্রই সাধ্যসাধক হয় না । সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্যই উহার সাধক হয় ।]

ভাষ্য । যথা সাধ্যদৃষ্টান্তয়োরেকধর্ম্যস্য প্রযত্নানন্তরীয়কত্বশ্চোপপত্তেরনিত্যত্বং ধর্ম্মান্তরমবিশেষো নৈবঃ সর্বভাবানাং সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং ধর্ম্মান্তরমস্তি, যেনাবিশেষঃ স্যাৎ ।

•অথ মতগনিত্যত্বমেব ধর্ম্মান্তরং সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং ভাবানাং সর্বত্র স্যাদিতি—এবং খলু বৈ কল্যাণানে অনিত্যাঃ সর্বে ভাবাঃ সদ্ভাবোপপত্তেরিতি পক্ষঃ প্রাপ্নোতি । তত্র প্রতিজ্ঞার্থব্যতিরিক্তমন্যদাহরণং নাস্তি । অনুদাহরণশ্চ হেতুর্নাস্তি । প্রতিজ্ঞেকদেশস্য চোদাহরণত্বমনুপপন্নং, নহি সাধ্যমুদাহরণং ভবতি । সতশ্চ নিত্যানিত্যভাবানিত্যত্বানুপপত্তিঃ । তস্মাৎ সদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্বা-বিশেষপ্রসঙ্গ ইতি নিরতিথেয়মেতদ্বাক্যমিতি । সর্বভাবানাং সদ্ভাবোপপত্তেরনিত্যত্বমিতি ক্রবতাহনুজাতঃ শব্দস্যানিত্যত্বং, তত্রানুপপন্নঃ প্রতিষেধ ইতি ।

* কচিৎ সাধর্ম্যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদে স'ত শব্দাদেবর্গাদিনা সহ ঐক্যত্বাৎ ধর্ম্মান্তরানিত্যত্বশ্চোপপত্তেঃ, কচিৎ সাধর্ম্যে শব্দস্য ভাবমাত্রেন সহ সত্তাদৌ স'ত ভাবমাত্রধর্ম্মানুপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাব ইতি সোজন্য এতদ্বাক্যং ভবতি—অবিনাভাবসম্পন্নঃ সাধর্ম্যং গমকং, নতু সাধর্ম্যমাত্রমিতি ।—তাৎপর্যটীকা ।

অনুবাদ। যেমন সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে অর্থাৎ পূর্বোক্ত উদাহরণে শব্দ ও ঘটে প্রযুক্ত্যনুসঙ্গরূপ একধর্মের উপপত্তি (সত্তা) বশতঃ অনিত্যরূপ ধর্মাস্তর অবিশেষ আছে, এইরূপ সমস্ত সৎপদার্থের সত্তার উপপত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্মের ব্যাপক ধর্মাস্তর নাই, যৎপ্রযুক্ত (সমস্ত সৎপদার্থের) অবিশেষ হইতে পারে।

(পূর্বপক্ষ) সমস্ত পদার্থের সর্বত্র সত্তার ব্যাপক অনিত্যত্বই ধর্মাস্তর হউক, ইহা যদি মত হয় ? (উত্তর) এইরূপ কল্পনা করিলে সত্তার উপপত্তিপ্রযুক্ত সকল পদার্থ অনিত্য, ইহাই পক্ষ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ হেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব প্রতিবাদীর সাধ্য হয়)। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার্থ ব্যতিরিক্ত অত্র উদাহরণ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তশূণ্য হেতুও হয় না। প্রতিজ্ঞার একদেশের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার্থের মধ্যে কোন পদার্থের দৃষ্টান্তত্বও উপপন্ন হয় না। যেহেতু সাধ্যধর্মী দৃষ্টান্ত হয় না। পরন্তু সৎপদার্থের নিত্যানিত্যত্ববশতঃ অর্থাৎ সৎপদার্থের মধ্যে আকাশাদি অনেক পদার্থের নিত্যত্ব এবং তদ্ভিন্ন পদার্থের অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ থাকায় (সমস্ত সৎপদার্থের) অনিত্যত্বের উপপত্তি হয় না। অতএব সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত সৎপদার্থেই সত্তারূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ-প্রসঙ্গ, এই যে উক্ত হইয়াছে, এই বাক্য নিরর্থক অর্থাৎ উহার প্রতিপাত্ত অর্থ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না হওয়ায় উহা নাই। (পরন্তু) সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সত্তারূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া সমস্ত সৎপদার্থের অনিত্যত্ব, ইহা যিনি বলিতেছেন, তৎকর্তৃক শব্দের 'অনিত্যত্ব' স্বীকৃতই হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিষেদ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পননী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত "অবিশেষদম" প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। মুদ্রিত তাৎপর্যটীকাগ্রন্থ এবং আরও কোন পুস্তকে "কচিৎকর্ম্মানুপপত্তেঃ কচিচ্চোপপত্তেঃ" এইরূপ সূত্রপাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। "তार्কিকরক্ষা" গ্রন্থ বরদরাজ ও "অবীক্ষানয়নতত্ত্ববোধ" গ্রন্থে বঙ্কমান উপাধ্যায়ও ঐরূপ সূত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে "কচিৎকর্ম্মানুপপত্তেঃ" এইরূপ সূত্রপাঠও দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্যটীকায় বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা "কচিৎকর্ম্মোপপত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্রপাঠই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। "শ্রায়বার্ত্তিক," "শ্রায়সূচীনিবন্ধ" ও "শ্রায়সূত্রোক্তারে"ও উক্তরূপ সূত্রপাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর অভিমত হেতু গ্রহণ করিয়া ক্রমানুসারে প্রথমে তৎকর্ম্মের উপপত্তি এবং পরে উহার অনুপপত্তিই বলা উচিত। অসংস্কৃত ভট্ট ও বৃত্তিকার বিখ্যাত প্রভৃতিও উক্ত ক্রমানুসারেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া

গিয়াছেন। সুতরাং উক্ত সূত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যানুসারে সূত্রের প্রথমে “কচিৎ” এই শব্দের দ্বারা বাদীর গৃহীত প্রযত্নজন্য প্রভৃতি সাধর্ম্যই বিবক্ষিত এবং “তদ্ব্য” শব্দের দ্বারা ঐ সাধর্ম্যের ব্যাপক ঘটধর্ম অনিত্যত্ব বিবক্ষিত। কোন সাধর্ম্য অর্থাৎ প্রযত্নজন্য প্রভৃতি সাধর্ম্যরূপ হেতু বিদ্যমান থাকিলে, সেখানে উহার ব্যাপক অনিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহাই সূত্রোক্ত “কচিৎকর্মোপপত্তেঃ” এই প্রথম বাক্যের তাৎপর্যার্থ। পরে “কচিৎ” এই শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্যই বিবক্ষিত এবং “অনুপপত্তি” শব্দের দ্বারা উক্ত সাধর্ম্যের ব্যাপক ধর্মের অসত্তাই বিবক্ষিত। সুতরাং সত্তাদি সাধর্ম্যরূপ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও সমস্ত সংপদার্থে উহার ব্যাপক কোন ধর্ম থাকে না, ইহাই “কচিচ্চানুপপত্তেঃ” এই দ্বিতীয় বাক্যের তাৎপর্যার্থ। ভাষ্যকারও ঐ ভাবে মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উদাহরণে বাদীর সাধর্ম্য শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘটে প্রযত্নজন্যরূপ সাধর্ম্য বা একধর্ম আছে বলিয়া, যেমন ঐ উভয়ের অনিত্যত্বরূপ ধর্মাস্তর আছে এবং উহাই ঐ উভয়ের অবিশেষ বলিয়া সিদ্ধ হয়, এইরূপ সমস্ত সংপদার্থে সদ্ভাব বা সত্তারূপ সাধর্ম্য বা একধর্ম থাকিলেও উহার ব্যাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, যাহা সমস্ত সংপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। তাৎপর্য এই যে, বাদী যে প্রযত্নজন্যরূপ সাধর্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার সাধর্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্য, অনিত্যত্ব উহার ব্যাপক। কারণ, প্রযত্নজন্য পদার্থমাত্রই যে অনিত্য, ইহা সর্বসম্মত। সুতরাং বাদীর ঐ হেতুর দ্বারা ঘটের ত্রায় শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ অনিত্যত্ব শব্দ ও ঘটের অবিশেষ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সমস্ত সংপদার্থের সত্তারূপ সাধর্ম্য বা একধর্ম গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা সমস্ত সংপদার্থেরই অবিশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, ঐ সাধর্ম্য তাঁহার অভিमत কোন অপর ধর্মবিশেষের ব্যাপ্য নহে, সুতরাং উহার ব্যাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, যাহা সমস্ত সংপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। ভাষ্যে “সদ্ভাবোপপত্তিনিমিত্তং” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—“সদ্ভাবব্যাপকমিত্যর্থঃ”। সদ্ভাব বলিতে সত্তা। উহার ব্যাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, ইহা বলিলে প্রতিবাদীর গৃহীত ঐ সত্তারূপ সাধর্ম্যে তাঁহার আপাদিত কোন ধর্মাস্তররূপ অবিশেষের ব্যাপ্তি নাই, ইহাই বলা হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্তরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে সরলভাবে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “কচিৎ” অর্থাৎ কার্যত্ব বা প্রযত্নজন্য প্রভৃতি হেতুতে “তদ্ব্য” অর্থাৎ সেই হেতুর ধর্ম ব্যাপ্তি প্রভৃতি আছে এবং “কচিৎ” অর্থাৎ সত্তা প্রভৃতিতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি হেতু ধর্ম নাই, অতএব প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধের অভাব অর্থাৎ উহা অসম্ভব। ফলকথা, প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্যে কোন অবিশেষের ব্যাপ্তি না থাকায় উহার দ্বারা সমস্ত সংপদার্থের অবিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা ঐ সত্তাদি সাধর্ম্যে না থাকায় যুক্তানুগাহনিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর ঐ উত্তর দৃষ্ট। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের অসাধারণ দৃষ্টান্তমূল ঐ যুক্তানুগাহনিই প্রদর্শন করিয়াছেন। অব্যাবাহিকত্ব বাহা সাধারণ দৃষ্টান্তমূল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, প্রতিবাদী যদি যে কোন সাধর্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা

পূর্বোক্ত আপত্তির সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা সাধন করিবেন, তাহার অভাবও সাধন করা যাইবে। সুতরাং তিনি কিছুই সাধন করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ সর্বত্রই বাদী তাঁহার জ্ঞায় সত্তা প্রভৃতি কোন সাধন্যামাত্র গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা তাঁহার সাধ্যের অভাবের সাধন করিলে, তিনি কখনই নিজ সাধ্য সাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার নিজের ঐ উত্তর নিজেরই বাধাতক হইবে।

সর্বানিত্যবাদী বৈনাশিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে সত্তাবশতঃ সকল পদার্থই অনিত্য। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন,—“যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং”। সুতরাং সত্তাহেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, উহাই সত্তার ব্যাপক ধর্মাস্তর এবং সকল পদার্থের অবিশেষ, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে সত্তার ব্যাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, যাহা সমস্ত পদার্থের অবিশেষ হইতে পারে, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন না। তাই ভাষ্যকার পরে উক্ত মতানুসারে এখানে বৌদ্ধ প্রতিবাদীর ঐ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, তদন্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থে সত্তা আছে বলিয়া সমস্ত পদার্থ অনিত্য, ইহাই প্রতিবাদীর পক্ষ বা সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিন্তু প্রতিবাদী উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে পারেন না। কারণ, সকল পদার্থই অনিত্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে সকল পদার্থই তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ হয়। সুতরাং উহা ভিন্ন কোন দৃষ্টান্ত না থাকায় সত্তা হেতু তাঁহার ঐ সাধ্যের সাধক হয় না। কারণ, দৃষ্টান্তশূন্য কোন হেতুই হয় না। প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্যধর্মী, তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্ত স্থলে অনিত্যত্বকপে সমস্ত পদার্থই প্রতিবাদীর সাধ্যধর্মী। সুতরাং কোন পদার্থই তিনি দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রতিবাদী বৌদ্ধ মতানুসারে যদি বলেন যে, ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ যে অনিত্য, ইহা ত সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং তাহাই দৃষ্টান্ত আছে। যাহা বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই অনিত্য বলিয়া স্বীকৃতই আছে, তাহা সাধ্যধর্মী বা প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত হইলেও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ভাষ্যকার এ জন্য পরে আবার বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব থাকায় সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ অনিত্য বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ আছে, তদ্রূপ আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ নিত্য বলিয়াও প্রমাণসিদ্ধ আছে। সুতরাং প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা হেতু সেই সমস্ত নিত্য পদার্থেও বিদ্যমান থাকায় উহা অনিত্যত্বের ব্যতিচারী। সুতরাং উহার দ্বারা তিনি সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। আকাশাদি সমস্ত নিত্য পদার্থের নিত্যত্বসাধক প্রমাণের খণ্ডন করিতে না পারিলে তাঁহার ঐ হেতুর দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব তাঁহার পূর্বোক্ত ঐ বাক্য নিরর্থক। কারণ, তাঁহার ঐ বাক্যের যাহা অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য, তাহা কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটপটাদি অসংখ্য পদার্থ অনিত্য বলিয়া সর্বসম্মত থাকায় তদদৃষ্টান্তে আমার পূর্বোক্ত অনুমানই ত সকল পদার্থের অনিত্যত্বসাধক প্রমাণ আছে। আমার ঐ প্রমাণের খণ্ডন ব্যতীতও ত বাদী কোন পদার্থের নিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন না। ভাষ্যকার এ জন্ত সর্বশেষে উক্ত স্থলে বাদীর চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্ত

পদার্থেরই অনিত্যত্ব স্বীকার করিলে শব্দের অনিত্যত্বও স্বীকৃত হওয়ায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার ঐ অনুমানকে সকল পদার্থের অনিত্যত্বের সাধক প্রমাণই বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্দেরও অনিত্যত্বসাধক প্রমাণই প্রদর্শন করায় তিনি আর বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, বাদী যে, শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকারই করিতেছেন। সুতরাং বাদীর প্রদর্শিত প্রমাণেরও তিনি প্রতিষেধ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার উক্তরূপ প্রতিষেধ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার পরে এই কথার দ্বারা অন্তভাবে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর যে, স্বব্যাপাতক, সুতরাং উহা অসহস্র, ইহাও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত সর্বানিত্যত্ববাদও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পূর্বেরই উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ড, ১৫৩—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৪।

অবিশেষসম-প্রকরণ নমাস্ত ॥ ১০ ॥

সূত্র। উভয়কারণোপপত্তৈরুপপত্তিসমঃ ॥২৫॥৪৮-৬॥

অনুবাদ। উভয় পক্ষের অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের “কারণের” (হেতুর) উপপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। বদ্যানিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে শব্দো নিত্যত্ব-
কারণমপ্যুপদ্যতেহস্মাৎস্পর্শত্বমিতি নিত্যত্বমপ্যুপপদ্যতে। উভয়স্থানিত্যত্ব-
নিত্যত্বস্ত চ কারণোপপত্ত্যা প্রত্যবস্থানমুপপত্তিসমঃ।

অনুবাদ। যদি শব্দের অনিত্যত্বের “কারণ” অর্থাৎ সাধক হেতু আছে, এ জ্ঞাত শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে এই শব্দের স্পর্শশূন্যরূপ নিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে, এ জ্ঞাত নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। উভয়ের (অর্থাৎ উক্ত স্থলে) অনিত্যত্বের ও নিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি (সত্তা) প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিসম প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি ক্রমাহুসারে এই সূত্রের দ্বারা “উপপত্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রে “উভয়” শব্দের দ্বারা বাদীর সাধাধর্মরূপ পক্ষ এবং তাহার অভাবরূপ প্রতিপক্ষই বিবক্ষিত। “কারণ” শব্দের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সত্তা। পূর্ববৎ “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদীর পক্ষের দ্বারা তাঁহার প্রতিপক্ষেরও সাধক হেতুর সত্তা আছে বলিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “উপপত্তিসম” প্রতিষেধ। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত সূত্রেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী

যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্বসাধক (কার্যত্ব) হেতু আছে বলিয়া শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দের নিত্যত্বও উপপন্ন হয় । কারণ, শব্দ আকাশাদি নিত্য পদার্থের ত্রায় স্পর্শশূন্য । সুতরাং শব্দ স্পর্শশূন্যত্বরূপ নিত্যত্বসাধক হেতুও আছে । উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ অনিত্যত্ব এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ নিত্যত্ব, এই উভয়েরই সাধক হেতুর সম্ভাব্যরূপ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের ত্রায় তাঁহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু আছে বলিয়া প্রত্যবস্থান করায় উহা “উপপত্তিসম” প্রতিষেধ । উক্তরূপ বাদীর অনুমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । তাই উক্ত “উপপত্তিসমা” জাতিকে বলা হইয়াছে—বাধ ও সংপ্রতিপক্ষ, এই অন্ততর-দেশনাত্মক । পূর্বোক্ত “প্রকরণসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর ত্রায় প্রতিবাদীও অত্র হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং নিজপক্ষ নির্ণয়ের অভিমান-বশতঃ বাদীর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন এবং সেই স্থলে বাদীও ঐরূপ করায় তাঁহার উত্তরও “প্রকরণসমা” জাতি হয় । কিন্তু এই “উপপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী হেতু ও দৃষ্টান্তাদির দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করেন না । কেবল নিজপক্ষে অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষেও অত্র হেতুব দ্বারাই বাদীর অনুমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করেন । সুতরাং পূর্বোক্ত “প্রকরণসমা” জাতি হইতে এই “উপপত্তিসমা”র বিশেষ থাকায় ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি বলিয়াই কথিত হইয়াছে । উদ্যোতকরও এখানে ইহাই বলিয়াছেন ।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে ‘তार्কিকরক্ষা’কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহার সাধ্যসিদ্ধির জন্য প্রমাণ অর্থাৎ হেতু বলিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার পক্ষের ত্রায় আমার পক্ষেও কোন প্রমাণ থাকিবে ? আমি তোমার পক্ষকেই দৃষ্টান্ত করিয়া, অনুমান দ্বারা আমার পক্ষেরও সমপ্রমাণত্ব সাধন করিব । সুতরাং তোমার ঐ অনুমানে বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ-দোষ অনিবার্য্য । প্রতিবাদী উক্তরূপে নিজপক্ষেও কোন প্রমাণের সম্ভাবনা দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে “উপপত্তিসম” প্রতিষেধ । পূর্বোক্ত “সাধর্ম্ম্যসমা”, “বৈধর্ম্ম্যসমা” ও “প্রকরণসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করিয়া, তদ্বারাই নিজ সাধকের উপপাদন করেন । কিন্তু এই “উপপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষে কোন সিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করেন না । কিন্তু তাঁহার নিজ পক্ষেও যে কোন প্রমাণ বা হেতু আছে, ইহাই অনুমান দ্বারা সমর্থন করেন । সুতরাং ইহা ভিন্ন প্রকার জাতি । পূর্বোক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্তই উদয়নাচার্য্য এই “উপপত্তিসমা” জাতির উক্তরূপেই স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শব্দর মিশ্র

১ । অন্তঃপক্ষেহপি কিমপি প্রমাণমুপপৎনতে ।

ত্বংপক্ষবদ্বিতি প্রাপ্তিরূপপত্তিসমো মতঃ ৥২৪॥

যথা অনিত্যঃ শব্দঃ কার্য্যবাদিত্বাঙ্তে বদ্যানিত্যে প্রমাণং কার্য্যত্বমন্তীতঃ নিত্যঃ শব্দস্তর্হি নিত্যত্বপক্ষেহপি কিঞ্চিৎ প্রমাণং ভবিষ্যতি, বাদিপ্রতিবাদিনোরন্তরোক্তত্বাৎ ত্বংপক্ষমংপক্ষয়োঃস্তত্রত্বাৎ প্রকৃতসন্দেহবিষয়ত্বাদ্বিপ্রতিপত্তিবিষয়ত্ব বা ত্বংপক্ষবৎ । তথাচ বাধঃ প্রতিরোধো বেতি । ইয়ং প্রতিধর্ম্মসমপ্রকরণসমভ্যাং ভিত্তিতে, অত্র প্রমাণশ্চৈ-
বোপপাদনাত তত্র সিদ্ধেন প্রমাণেন সাধ্যোপপাদনাত । অন্ত্যঃ সামান্ত্রতঃ প্রমাণসম্ভাবনা দ্বারং ।—তार्কিকরক্ষা ।

ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্ত মতানুসারেই ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এবং তাৎপর্যটীকাকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রতিবাদীর পক্ষে স্পর্শশূন্যতারূপ হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক ॥২৫॥

ভাষ্য। অস্যোত্তরং—

অনুবাদ। এই “উপপত্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। উপপত্তিকারণাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ ॥২৬॥৪৮৭॥

অনুবাদ। উপপত্তির কারণের অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের উপপত্তিসাধক হেতুরও স্বীকারবশতঃ (পূর্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। উভয়কারণোপপত্তেরিতি ক্রবতা নানিত্যত্বকারণোপপত্তেরনিত্যত্বং প্রতিষিধ্যতে। যদি প্রতিষিধ্যতে নোভয়কারণোপপত্তিঃ স্যাৎ। উভয়কারণোপপত্তিবচনাদনিত্যত্বকারণোপপত্তিরভ্যনুজ্ঞায়তে। অভ্যনুজ্ঞানাদনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ।

ব্যাঘাতাৎ প্রতিষেধ ইতি চেৎ? সমানো ব্যাঘাতঃ। একস্য নিত্যত্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ব্যাহতং ক্রবতোক্তঃ প্রতিষেধ ইতি চেৎ? স্বপক্ষপরপক্ষয়োঃ সমানো ব্যাঘাতঃ। স চ নৈকতরস্য সাধক ইতি।

অনুবাদ। “উভয় পক্ষের ‘কারণের’ অর্থাৎ সাধক হেতুর উপপত্তিবশতঃ” এই কথা যিনি বলেন, তৎকর্তৃক অনিত্যত্বের সাধক হেতুরও উপপত্তিবশতঃ অনিত্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না। যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি থাকে না। উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি কখন প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি স্বীকৃত হইতেছে। স্বীকারবশতঃ (পূর্বোক্ত) প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না।

(পূর্বপক্ষ) ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধপ্রযুক্ত (পূর্বোক্ত) প্রতিষেধ হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) ব্যাঘাত সমান। বিশদার্থ এই যে, (পূর্বপক্ষ) যিনি একই পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ ব্যাহত বলেন, তৎকর্তৃক প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, ইহা যদি বল? (উত্তর) স্বপক্ষ ও পরপক্ষে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ তুল্য। (সুতরাং) সেই ব্যাঘাতও একতর পক্ষের সাধক হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বসূত্রোক্ত “উপপত্তিসম” প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে অর্থাৎ উহার অদ্বৈতত্ব সমর্থন করিতে পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাধক হেতুরই সত্তা স্বীকার করায় পূর্বোক্ত প্রতিষেধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রতিষেধ করিতে প্রতিবাদী যখন “উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তিবশতঃ” এই কথা বলেন, তখন পূর্বোক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সাধক হেতুরও সত্তাবশতঃ তিনি অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, যদি তিনি শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে অনিত্যত্বের সাধক হেতু নাই, ইহাই তাঁহাকে বলিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার পূর্বকথিত উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সত্তা থাকে না। কিন্তু তিনি যখন উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সত্তা বলিয়াছেন, তখন শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতুর সত্তা তিনি স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আর শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। তাঁহার ঐ প্রতিষেধ উপপন্ন হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া অর্থাৎ অভাব সমর্থন করিয়া, বাদীর অমুমানের বাধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শন করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে, ইহা স্বীকার করায় শব্দে যে অনিত্যত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ উক্তর তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল হওয়ায় উহা বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতু স্বীকার করিয়া অনিত্যত্বও স্বীকার করিব এবং ঐ অনিত্যত্বের প্রতিষেধও করিব, ইহা কখনই সম্ভব হয় না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উক্তরূপ বিরোধ সূচনা করিয়া, প্রতিবাদীর উক্তরূপ উক্তর যে স্বব্যাঘাতক হওয়ায় অদ্বৈতত্ব, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ববৎ স্বব্যাঘাতকত্বই ইহার সাধারণ চরিত্রমূল। এবং ভাষ্যকারের মতামুসারে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী স্পর্শশূন্যত্বকে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতুরূপে প্রদর্শন করিলে, তাঁহার ঐ হেতুতে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। কারণ, স্পর্শশূন্য পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ হেতুর যুক্তাজহীনত্ববশতঃ যুক্তাজহানিও তাঁহার ঐ উক্তরের চরিত্র মূল বৃদ্ধিতে হইবে। বরদরাজ তাঁহার মতেও যুক্তাজহানি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আমি ব্যাঘাতবশতঃই উক্তরূপ প্রতিষেধ বলিয়াছি। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে, শব্দে যেমন অনিত্যত্বের সাধক হেতু আছে, তদ্রূপ নিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে। কিন্তু একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। সুতরাং ঐ ব্যাঘাত বা বিরোধের পরিহারের জন্ত শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্বই স্বীকার্য্য, ইহাই আমার বক্তব্য। ভাষ্যকার পরে এখানে প্রতিবাদীর ঐ কথারও উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহার উক্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘাত স্বপক্ষে ও পরপক্ষে সমান। সুতরাং উহাও একতর পক্ষের সাধক হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন শব্দে অনিত্যত্ব থাকিলে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না, তদ্রূপ নিত্যত্ব থাকিলেও অনিত্যত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদী যেমন ঐ ব্যাঘাত পরিহারের জন্ত শব্দের অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্ব স্বীকার করিবেন, তদ্রূপ বাদীও

শব্দের নিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়া অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন। কারণ, তাহা হইলেও উক্ত ব্যাঘাত বা বিরোধ থাকে না। সুতরাং উক্ত ব্যাঘাত, শব্দের নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপ কোন এক পক্ষের সাধক হয় না। অর্থাৎ কোন পক্ষের সাধক প্রকৃত প্রমাণ ব্যতীত কেবল উক্ত ব্যাঘাত-প্রযুক্ত যে কোন এক পক্ষের প্রতিষেধ করিয়া অপর পক্ষের নির্ণয় করা যায় না ॥২৬॥

অনুপপত্তিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১১॥

সূত্র । নির্দিষ্টকারণাভাবেহ্যুপলন্তাদুপলন্ধি-

সমঃ ॥২৭॥৪৮৮॥

অনুবাদ । নির্দিষ্ট কারণের অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুর অভাবেও (সাধ্য ধর্মের) উপলন্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলন্ধিসম প্রতিষেধ ।

ভাষ্য । নির্দিষ্টস্য প্রযত্নানন্তরীয়কত্বস্যানিত্যত্বকারণস্যাভাবেহপি বায়ুনোদনাদ্'বৃক্ষশাখাভঙ্গস্য শব্দস্যানিত্যত্বমুপলভ্যতে । নির্দিষ্টস্য সাধনস্যাভাবেহপি সাধ্যধর্মোপলক্ষ্য প্রত্যবস্থানমুপলন্ধিসমঃ ।

অনুবাদ । নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্তুরূপ অনিত্যত্বসাধক হেতুর

১। “নোদন” শব্দের অর্থ সংযোগবিশেষ । উহা ক্রিয়াবিশেষের কারণ । বাণ নিঃক্ষেপ করিলে উহার প্রথম ক্রিয়া “নোদন”জন্ত । মহর্ষি কণাদ “নোদনাদান্যমিযোঃ কর্ম” ইত্যাদি (৩১১১) সূত্রের দ্বারা ইহা বলিয়াছেন । বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়ার কারণ বর্ণনায় বহু সূত্রে “নোদন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং “অভিঘাত” শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে । “ভাষাগরিচ্ছেদে” বিশ্বনাথ পঞ্চানন শব্দজনক সংযোগবিশেষের নাম “অভিঘাত” এবং শব্দের অজনক সংযোগবিশেষের নাম “নোদন” ইহা বলিয়াছেন । কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, বেগজনিত যে সংযোগবিশেষ বিভাগের জনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম “অভিঘাত” । এবং গুরুত্বাদি যে কোন কারণজন্ত যে সংযোগবিশেষ বিভাগের অজনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম “নোদন” । “স্তায়কঙ্গলী”কার শ্রীধর ভট্ট উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“নোদ্যানোদকয়োঃ পরস্পরবিভাগং ন করোতি যৎ কর্ম, তন্ত কারণং নোদনং” । (প্রশস্তপাদভাষ্য, ৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । “নুদ” ধাতুর অর্থ প্রেরণ । সুতরাং যাহা প্রেরক, তাহাকে বলে নোদক এবং যাহা প্রের্য, তাহাকে বলে নোদ্য । প্রবল বায়ুসংযোগে বৃক্ষের শাখাভঙ্গ স্থলে বায়ু নোদক এবং শাখা নোদ্য । ঐ স্থলে বৃক্ষের শাখায় যে ক্রিয়া জন্মে, তাহা ঐ শাখা ও বায়ুর বিভাগ জন্মায় না । কারণ, তখনও বায়ুর সহিত ঐ শাখার সংযোগ বিদ্যমানই থাকে । সুতরাং বায়ু ও শাখার ঐ সংযোগ তখন ঐ উভয়ের পরস্পর বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ না হওয়ায় ভাব্যকার উহাকে “নোদন” বলিতে পারেন । কারণ, যে ক্রিয়া নোদ্য ও নোদকের পরস্পর বিভাগ জন্মায় না, তাহার কারণ সংযোগবিশেষই “নোদন” । উহা অন্ত কোন পদার্থের বিভাগজনক ক্রিয়ার কারণ হইলেও “নোদন” হইতে পারে । “মুদাতেহেনন” এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে ঐরূপ সংযোগবিশেষ অর্থে “নোদন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।

অভাবেও অর্থাৎ প্রযত্নজন্য হেতু না থাকিলেও বায়ুর নোহন অর্থাৎ বিজাতীয় সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দের অনিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। নির্দিষ্ট সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্য ধর্মের উপলব্ধি-প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপলব্ধিসম প্রতিষেধ।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা “উপলব্ধিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সূত্রে “কারণ” শব্দের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। বাদী নিজ পক্ষ সাধনের জন্ত যে হেতুর নির্দেশ বা উল্লেখ করেন, তাহাই তাঁহার নির্দিষ্ট কারণ। পূর্ববৎ এই সূত্রেও “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার বা অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত। এবং “উপলব্ধিঃ” এই পদের পূর্বে “সাধ্যধর্মশ্চ” এই পদের অধ্যাহারও মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার শেষে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্যধর্মের উপলব্ধি-প্রযুক্ত যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “উপলব্ধিসম” প্রতিষেধ। ভাষ্যকার প্রথমে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্নজন্যরূপ যে অনিত্যত্বসাধক হেতু, তাহা না থাকিলেও বায়ুর সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য যে শব্দ জন্মে, তাহার অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজন্যত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার নির্দিষ্ট বা কথিত হেতু যে প্রযত্নজন্যত্ব, তাহা বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য শব্দে নাই। কারণ, ঐ শব্দ কোন ব্যক্তির প্রযত্নজন্য নহে। কিন্তু ঐ শব্দেও তোমার সাধ্যধর্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হইতেছে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু না থাকিলেও তাহার সাধ্যধর্মের উপলব্ধি বা নিশ্চয় হয়, সেই হেতু সেই সাধ্যধর্মের সাধক বলি যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্ন-জন্যত্ব হেতু শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না, উহা অসাধক। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থান “উপলব্ধিসম” প্রতিষেধ বা “উপলব্ধিসমা” জাতি। আপত্তি হইতে পারে যে, অনিত্য পদার্থমাত্রই প্রযত্নজন্য, ইহা ত বাদী বলেন নাই। যে যে পদার্থ প্রযত্নজন্য, সে সমস্তই অনিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃই বাদী ঐরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ঐ হেতুতে ব্যভিচার নাই। কারণ, কোন নিত্য পদার্থই প্রযত্নজন্য নহে। অতএব বাদীর উদাহরণ-বাক্যানুসারে উক্ত স্থলে তাঁহার বক্তব্য যাহা বুঝা যায়, তাহাতে প্রতিবাদী ঐরূপ দোষ বলিতেই পারেন না। সুতরাং উক্তরূপে এই “উপলব্ধিসমা” জাতির উত্থানই হয় না। কারণ, ঐরূপে উহার উত্থানের কোন বীজ নাই। বার্তিককার উদ্যোতকর এইরূপ চিন্তা করিয়া, এখানে অত্ন ভাবে উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দমাত্রকেই বাদীর সাধ্যধর্মী বলিয়া আরোপ করিয়া, তন্মধ্যে বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্য ধ্বগ্নাত্মক শব্দে বাদীর ঐ হেতু নাই, ইহাই প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ যদিও বাদী উক্ত স্থলে “শব্দোহনিত্যঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দকেই সাধ্যধর্মী বা পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শব্দমাত্রকেই পক্ষরূপে

গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ আরোপ করিয়া, প্রতিবাদী সেই পক্ষের অন্তর্গত ধ্বংসাত্মক শব্দবিশেষে বাদীর হেতু নাই, ইহা প্রদর্শনপূর্বক বাদীর হেতুতে ভাগাসিদ্ধিদোষের আরোপ করেন। পক্ষের অন্তর্গত কোন পদার্থে হেতু না থাকিলে তাহাকে “ভাগাসিদ্ধি” বা অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বলে। ফলকথা, উদ্যোতকরের মতে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞার্গ্য ব্যতিরিক্ত পক্ষকেও তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ বলিয়া আরোপ করিয়া, তাহাতে বাদীর কথিত হেতুর অভাব প্রদর্শনপূর্বক ভাগাসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবন করিলে, তাঁহার সেই উত্তরের নাম “উপলক্ষিসমা” জাতি। উদ্যোতকর উক্ত স্থলে ইহার আরও দুইটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেই স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ আরোপের বীজ বা মূল কি? তাহা তিনি কিছু বলেন নাই।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের বাখ্যানুসারে “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহার প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ কোন অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে তাঁহার কোন অবধারণে তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম উপলক্ষিসমা জাতি^১। যেমন কোন বাদী “পর্য্যতো বহিমান্” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল পর্য্যতেই বহি আছে, অথবা পর্য্যতমাত্রেই অবশ্য বহি আছে? কেবল পর্য্যতেই বহি আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, অন্তর্য্যও বহির প্রত্যক্ষ হয়। এবং পর্য্যতমাত্রেই অবশ্য বহি আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, কদাচিৎ বহিশূন্য পর্য্যতও দেখা যায়। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষে সাধ্য বহি না থাকিলেও পক্ষ বা ধর্ম্মী পর্য্যতের উপলক্ষি হওয়ায় বাদীর ঐ অনুমানে বাধদোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে বাদী “ধূমাৎ” এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্য্যতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্য্যতমাত্রেই ধূম আছে? কিন্তু পর্য্যতে নক্ষাদিরও উপলক্ষি হওয়ায় কেবল ধূমই আছে, ইহা বলা যায় না। এবং কদাচিৎ ধূমশূন্য পর্য্যতেরও উপলক্ষি হওয়ায় পর্য্যতমাত্রেই ধূম আছে, ইহাও বলা যায় না। ঐ পক্ষে ধূম হেতুর অভাবেও পক্ষ বা ধর্ম্মী পর্য্যতের উপলক্ষি হওয়ায় বাদীর উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি কেবল ধূমবত্তাপ্রযুক্তই পর্য্যত বহিমান্? ইহাই তাৎপর্য্য? কিন্তু আলোকাদিপ্রযুক্তও পর্য্যতে বহির অনুমান হওয়ায় ইহা বলা যায় না। কারণ, ধূম হেতুর অভাবেও পর্য্যতে সাধ্য বহির অনুমানরূপ উপলক্ষি হওয়ায় কেবল ধূম হেতুতে ঐ সাধের ব্যাপ্তি নাই, ইহা অব্যাপ্তি দোষ। এইরূপ কোন স্থলে অতিব্যাপ্তিদোষ দ্বারাও প্রতিবাদী প্রভাবস্থান করিলে তাহাও “উপলক্ষিসমা” জাতি হইবে। “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থ উদয়নাচার্য্য উক্ত জাতির পঞ্চ প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্ভাব্য পঞ্চ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—(১) সাধাধর্ম্ম না থাকিলেও ধর্ম্মী বা পক্ষের উপলক্ষি হওয়ায় বাধদোষ হয়। (২) হেতু না থাকিলেও ধর্ম্মী

বা পক্ষের উপলক্ষি হওয়ায় স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। (৩) সাধ্যধর্ম ও হেতু, এই উভয় না থাকিলেও ধর্মী বা পক্ষের উপলক্ষি হওয়ায় বাধ ও স্বরূপাসিদ্ধি, এই উভয় দোষ হয়। (৪) হেতু না থাকিলেও কোন স্থলে সাধ্যধর্মের উপলক্ষি হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হয়। (৫) সাধ্যধর্ম না থাকিলেও কোন স্থলে হেতু থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। উদয়নাচার্য্য ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ পূর্বোক্তরূপে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্ত মতানুসারেই সংক্ষেপে এই “উপলক্ষিসম” জাতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যে কোন অবধারণ তাৎপর্য্য না থাকিলেও উহা সমর্থন করিয়া উক্ত-রূপ প্রত্যবস্থান করেন, উহাই উক্ত জাতির উৎপত্তির বীজ ॥ ২৭॥

ভাষ্য। অশ্রোতরং—

অনুবাদ। এই “উপলক্ষিসম” প্রতিষেধের উত্তর—

সূত্র। কারণান্তরাদপি তদ্ব্যমোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ॥

॥২৮॥৪৮৯॥

অনুবাদ। “কারণান্তর”প্রযুক্তও অর্থাৎ অন্য জ্ঞাপক বা সাধক হেতুপ্রযুক্তও “তদ্ব্যমের” অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের উপপত্তি হওয়ায় (পূর্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। “প্রযত্নানন্তরীয়কত্বা”দিতি ক্রবতা কারণত উৎপত্তিরভি-
ধীয়তে, ন কার্য্যস্য কারণনিয়মঃ। যদি চ কারণান্তরাদপ্যুৎপদ্যমানস্য
শব্দস্য তদনিত্যত্বমুপপদ্যতে, কিমত্র প্রতিষিধ্যত ইতি।

অনুবাদ। “প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ” এই হেতু-বাক্যবাদী কর্তৃক কারণজ্ঞাত উৎপত্তি
কথিত হয়, কার্য্যের কারণ-নিয়ম কথিত হয় না। (অর্থাৎ উক্ত বাদী বর্ণাজ্ঞক শব্দের
অনিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ হেতুর দ্বারা ঐ শব্দ যে প্রযত্নরূপ কারণজ্ঞাত,
ইহাই বলেন। কিন্তু সমস্ত শব্দই প্রযত্নজ্ঞাত, আর কোন কারণে কোন শব্দই
জন্মে না, ইহা তিনি বলেন না)। কিন্তু যদি কারণান্তরপ্রযুক্তও জায়মান শব্দবিশেষের
সেই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয়, তাহা হইলে এই স্থলে কি প্রতিষিদ্ধ হয়? অর্থাৎ তাহা
হইলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কিছুই না থাকায় তিনি প্রতিষেধ করিতে
পারেন না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “উপলক্ষিসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন।
পূর্ববৎ এই সূত্রেও “কারণ” শব্দের দ্বারা জ্ঞাপক বা সাধক হেতুই বিবক্ষিত। বাদীর প্রযুক্ত
হেতু হইতে ভিন্ন হেতুর দ্বারাও সাধ্যধর্মের উপপত্তি বা সিদ্ধি হওয়ায় পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ

হয় না, ইহাই স্বার্থ^১। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থলে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যতা সাধন করিবার জন্য “প্রযত্নানন্তরীণকথাৎ” এই হেতু-বাক্যের দ্বারা প্রযত্নরূপ কারণজন্য ঐ শব্দের উৎপত্তি হয়, সূত্রাং উহা অনিত্য, ইহাই বলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার সমস্ত শব্দেই প্রযত্নই কারণ, ইহা তিনি বলেন না। ঐরূপ কারণ-নিয়ম তাঁহার বিবক্ষিত নহে। সূত্রাং তাঁহার ঐ হেতু বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য ধ্বজাত্মক শব্দে না থাকিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য ঐ শব্দও কারণজন্য এবং সেই কারণজন্য-রূপ অত্র হেতুর দ্বারা উহারও অনিত্যতা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যে সর্বত্র “কারণ” শব্দের অর্থ—জনক হেতু। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্য যে সমস্ত ধ্বজাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহারও যে কারণান্তর আছে, ইহা বাদীও স্বীকার করেন; তিনি উহার প্রতিবেধ করেন না। এবং সেই কারণান্তরজন্য প্রভৃতি হেতুর দ্বারা যে, ঐ সমস্ত শব্দেরও অনিত্যতা সিদ্ধ হয়, ইহাও বাদী স্বীকার করেন এবং প্রতিবাদীও ঐ সমস্তই স্বীকার করিতে বাধ্য। সূত্রাং উক্ত স্থলে তিনি কিসের প্রতিবেধ করিবেন? তাঁহার প্রতিবেধা কিছুই নাই। এই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—“কিমত্র প্রতিবিধাতে।” ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী ঐরূপ প্রতিবেধ করিতে পারেন না। ঐরূপ প্রতিবেধ করিলে তিনি পরে বাদীর হেতুর ছষ্টত্ব সাধন করিতে যে অন্তর্য্যয়ন প্রয়োগ করিবেন, তাহাতেও বাদী তাঁহার আশ্রয় প্রতিবেধ করিতে পারেন। এবং উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে নানারূপ অবধারণতাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করিলে, বাদীও প্রতিবাদীর বাক্যে পূর্ববৎ নানারূপ অবধারণতাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া ঐরূপ নানা দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন। সূত্রাং প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর স্বব্যাবৃত্তক হওয়ায় উহা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। বরদরাজ তাঁহার পূর্বোক্ত মতানুসারে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা অত্র হেতু-প্রযুক্তও সাধ্যাদিক্তি হয়, এই কথা বলিয়া বাদীর হেতুতে অবধারণের অস্বীকার প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা বাদীর সাধ্যাদি পদার্থেও অবধারণের অস্বীকার সূচনা করিয়াছেন। এই “উপলক্ষিসমা” জাতি কোন সাধ্যম্ম বা বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির লক্ষণাক্রান্ত হইবে কিরূপে? এতদন্তরে উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, যাহা অহেতু বা অসাধক, তাহার সহিত সাধ্যম্ম্যপ্রযুক্তই প্রতিবাদী ঐরূপ প্রত্যাবস্থান করায় ইহাও “জাতি”র লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥২৮॥

উপলক্ষিসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥২৮॥

ভাষ্য। ন প্রাপ্তচারণাদ্বিদ্য়মানস্য শব্দস্যানুপলক্ষিঃ।
কস্মাৎ? আবরণাদ্যনুপলক্ষেঃ। যথা বিদ্যমানশ্লোদকাদেরর্থশ্চা-
বরণাদেরনুপলক্ষিনৈবং শব্দশ্চাগ্রহণকারণেনাবরণাদিনাহনুপলক্ষিঃ। গৃহেত

১। স্বার্থক “কারণান্তরাদপি” জাপকান্তরাদপি “তদ্ব্যপ্তোপপত্তেঃ” সাধ্যম্ম্যোপপত্তের প্রতিবেধ ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

চৈতদন্থাগ্রহণকারণমুদকাদিবৎ, ন গৃহ্যতে । তস্মাদ্ভুদকাদিবিপরীতঃ শব্দো-
হনুপলভ্যমান ইতি ।

অনুবাদ । উচ্চারণের পূর্বের বিদ্যমান শব্দের অনুপলক্টি (অশ্রবণ) হইতে
পারে না । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলক্টি হয় না ।
(তাৎপর্য) যেমন বিদ্যমান জলাদি পদার্থের আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলক্টি
(অপ্রত্যক্ষ) হয়, এইরূপ শব্দের অগ্রহণকারণ অর্থাৎ অশ্রবণের প্রয়োজক
আবরণাদিপ্রযুক্ত অনুপলক্টি হয় না । জলাদির ন্যায় এই শব্দের অগ্রহণকারণ
অর্থাৎ অশ্রবণের প্রয়োজক আবরণাদি গৃহীত হউক ? কিন্তু গৃহীত হয় না,
(অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ জলাদির অপ্রত্যক্ষের প্রয়োজক আবরণাদির যেমন প্রত্যক্ষ
হইতেছে, ওদ্রুপ উচ্চারণের পূর্বের শব্দের অশ্রবণের প্রয়োজক আবরণাদির
প্রত্যক্ষ হয় না) অতএব অনুপলভ্যমান শব্দ জলাদির বিপরীত অর্থাৎ জলাদির
তুল্য নহে ।

সূত্র । তদনুপলক্কেরনুপলভ্যাদভাবসিকৌ তদ্বিপরী-
তোপপত্তেরনুপলক্কিসমঃ ॥২৯॥৪৯০॥

অনুবাদ । সেই আবরণাদির অনুপলক্কির অনুপলক্কিপ্রযুক্ত অভাবের সিদ্ধি
হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলক্কির অভাব যে আবরণাদির উপলক্কি, তাহা সিদ্ধ
হওয়ায় তাহার বিপরীতের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সেই আবরণাদির অভাবের
বিপরীত যে, আবরণাদির অস্তিত্ব, তাহার সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২১)
অনুপলক্কিসম প্রতিষেধ ।

ভাষ্য । তেষামাবরণাদীনামনুপলক্কিনোপলভ্যতে । অনুপলভ্য-
মাস্তীত্যভাবোহন্থাঃ সিধ্যতি । অভাবসিকৌ হেতুতাবান্তদ্বিপরীত-
মস্তিত্বমাবরণাদীনামবধার্যতে । তদ্বিপরীতোপপত্তের্যপ্রতিজ্ঞাতং
“ন প্রাপ্তোচ্চারণাদ্বিদ্যমানন্থ শব্দন্থানুপলক্কিরিত্যে”তম সিধ্যতি । সোহয়ং
হেতু“রাবরণাদ্যনুপলক্কে”রিত্যাবরণাদিষু চাবরণাদ্যনুপলক্কৌ চ সময়ানুপ-
লক্ক্যা প্রত্যবস্থিতোহনুপলক্কিসমো ভবতি ।

অনুবাদ । সেই আবরণাদির অনুপলক্কি উপলক্ক হয় না । অনুপলক্কিপ্রযুক্ত
“নাই” অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলক্কি নাই, এইরূপে উহার অভাব সিদ্ধ হয় ।
অভাবসিদ্ধি হইলে হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত হেতু যে

আবরণাদির অনুপলকি, তাহার অভাব (আবরণাদির উপলকি) সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আবরণাদির অভাবের বিপরীত আবরণাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। তাহার বিপরীতের অর্থাৎ আবরণাদির অস্তিত্বের উপপত্তি (নিশ্চয়) বশতঃ “উচ্চারণের পূর্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলকি হইতে পারে না” এই বাক্যের দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হয় না। সেই এই হেতু (অর্থাৎ) “আবরণাদ্যনুপলক্যেঃ” এই হেতুবাক্য আবরণাদি বিষয়ে এবং আবরণাদির অনুপলকি বিষয়ে তুল্য অনুপলকিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যবস্থানের বিষয় হওয়ায় (২০) অনুপলকিসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে “অনুপলকিসম” প্রতিষেধ বলে।

টিপ্পনী। ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা “অনুপলকিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। কিরূপ স্থলে ইহার প্রয়োগ হয়? ইহার দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কি? ইহা প্রথমে না বলিলে ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে তাহা প্রকাশ করিয়া, এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই প্রথম কথার তাৎপর্য এই যে, শব্দনিত্যবাদী যীমাংসক, শব্দের নিত্য পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও উহা বিদ্যমান থাকায় তখনও উহার শ্রবণ হউক? কিন্তু যখন উচ্চারণের পূর্বে শব্দের শ্রবণ হয় না, তখন ইহা স্বীকার্য যে, তখন শব্দ নাই। সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না। এতদ্বত্তরে বাদী যীমাংসক বলিলেন যে, উচ্চারণের পূর্বেও শব্দ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তখন উহা অথ কোন পদার্থ কর্তৃক আবৃত থাকে, অথবা তখন উহার শ্রবণের অথ কোন প্রতিবন্ধক থাকে। সুতরাং তখন সেই আবরণাদিপ্রযুক্ত শব্দের শ্রবণ হয় না। যেমন ভূগর্ভে জ্বালাদি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এতদ্বত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, বিদ্যমান জ্বালাদি অনেক পদার্থের যে আবরণাদিপ্রযুক্তই প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বীকার্য। কারণ, তাহার আবরণাদির উপলকি হইতেহে। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অশ্রবণের প্রয়োজক বা শ্রবণপ্রতিবন্ধক যে, কোন আবরণাদি আছে, তাহার ত উপলকি হয় না। যদি সেই আবরণাদি থাকে, তবে তাহার উপলকি হউক? কিন্তু উপলকি না হওয়ায় উহা নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনুপলভ্যমান শব্দ অর্থাৎ তোমার মতে উচ্চারণের পূর্বে বিদ্যমান শব্দ জ্বালাদির সদৃশ নহে। অতএব তখন তাহার অনুপলকি বা অশ্রবণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের ঐ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া, পরে প্রশ্নপূর্বক “আবরণাদ্যনুপলক্যেঃ” এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদী যীমাংসক নৈয়ায়িকের ঐ কথার সহস্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের আবরণাদির উপলকি হয় না বলিয়া যদি অনুপলকিবশতঃ উহার অভাব নির্ণয় হয়, তাহা হইলে ঐ

আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহারও নির্ণয় হয়। কারণ, সেই অনুপলব্ধিও ত উপলব্ধি হয় না। সুতরাং আবরণাদির যে অনুপলব্ধি, তাহারও অনুপলব্ধি প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হইলে আবরণাদির উপলব্ধিই সিদ্ধ হইবে। কারণ, আবরণাদির অনুপলব্ধির যে অভাব, তাহা ত আবরণাদির উপলব্ধি। উহা সিদ্ধ হইলে আবরণাদির সত্তাও সিদ্ধ হইবে। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণাদি নাই, ইহা সমর্থন করা যায় না অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, উহা সমর্থন করিতে “আবরণাদ্যানুপলব্ধিঃ” এই বাক্যের দ্বারা যে অনুপলব্ধিরূপ হেতু কথিত হইয়াছে, উহা অসিদ্ধ। উক্ত স্থলে জাতিবাদী মীমাংসক প্রথমে পূর্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া, পরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত ঐ হেতুতে অসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন করেন। পরে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির অনুপলব্ধি থাকিলেও উহার অভাব অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধি নাই, সুতরাং আমার ঐ হেতু অসিদ্ধ নহে। তাহা হইলে তখন জাতিবাদী উক্ত হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ অনুপলব্ধি থাকিলেও যদি উহার অভাব না থাকে, তাহা হইলে অনুপলব্ধি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ার সাধ্যক হইতে পারে না। সুতরাং উহার দ্বারা প্রতিবাদী তাঁহার নিজ সাধ্য যে আবরণাদির অভাব, তাহাও সিদ্ধ করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে শকনিত্যত্ববাদের উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে “অনুপলব্ধিগম” প্রতিষেধ বা “অনুপলব্ধিগম” জাতি বলে।

মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকে শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় নিজেই উক্ত জাতির পূর্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন এবং খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে ইহা যে, “জাতি” বা জাত্যন্তর, তাহা বলেন নাই। এখানে জাতির প্রকারভেদ নিরূপণ করিবার জন্ত যথাক্রমে এই সূত্রের দ্বারা উক্ত “জাতি”র লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত স্থানানুসারেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে সূত্রের প্রথমোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা আবরণাদিকেই গ্রহণ করিয়া, “তদনুপলব্ধেরনুপলব্ধাৎ” এই বাক্যের দ্বারা সেই আবরণাদির অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ উহারও অনুপলব্ধি, ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে ঐ অনুপলব্ধি বা অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণাদির অনুপলব্ধিও নাই, এইরূপে উহার অভাব সিদ্ধ হয়, এই কথা বলিয়া সূত্রোক্ত “অভাবসিদ্ধৌ” এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভাবসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হইলে আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির অস্তিত্ব, তাহা নিশ্চিত হয়—এই কথা বলিয়া, পরে সূত্রোক্ত “তদ্বিপরীতোপপত্তেঃ” এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত বাক্যে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের সম্মত যে আবরণাদির অভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে উক্ত জাতিবাদী মীমাংসকের চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবরণাদির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির অস্তিত্ব, তাহার উপপত্তি অর্থাৎ নিশ্চয় হওয়ার নৈয়ায়িক যে “উচ্চারণের পূর্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলব্ধি হইতে পারে না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাঁহার কথিত হেতু যে, আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহা নাই। অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত তাহারও অভাব

অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধি সিদ্ধ হওয়ায় আবরণাদির সত্তাও সিদ্ধ হইয়াছে। সূত্রায় ঐ আবরণাদিপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বে বিদ্যমান শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলা যাইতে পারে। ফলকথা, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক “আবরণাদ্যনুপলব্ধিঃ” এই হেতুবাচ্যের দ্বারা অনুপলব্ধিকেই আবরণাদির অভাবের সাধক বলিলে, উহা ঐ অনুপলব্ধিও অভাবের সাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আবরণাদি বিষয়ে যেমন অনুপলব্ধি, তদ্রূপ আবরণাদির অনুপলব্ধি বিষয়েও অনুপলব্ধি আছে। উভয় বিষয়েই ঐ অনুপলব্ধি তুল্য। সূত্রায় আবরণাদির সত্তাও স্বীকার্য হইলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার্থ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার সর্বশেষে ইহাই বলিয়া সূত্রোক্ত “অনুপলব্ধিসম” প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের অভাব বলিলেও প্রতিবাদী সর্বত্রই উক্তরূপ জাতান্তর করিতে পারেন। উচ্চারণের পূর্বে অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও প্রতিবাদী ঐ অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা নাই অর্থাৎ উপলব্ধি আছে, ইহা বলিয়া পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন। এবং চার্ল্যাক অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত ঈশ্বর নাই, ইহা বলিলে ঐ অনুপলব্ধির অনুপলব্ধি গ্রহণ করিয়াও প্রতিবাদী উক্তরূপ জাতান্তর করিতে পারেন। সূত্রায় সূত্রের প্রথমোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা অন্ত্যাত্ম পদার্থও গৃহীত হইয়াছে। অন্ত্যাত্ম কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥২৯॥

ভাষ্য । অশ্রোতরং ।

অনুবাদ । এই “অনুপলব্ধিসম” প্রতিষেধের উত্তর ।

সূত্র । অনুপলস্তাত্মকত্বাদনুপলব্ধেরহেতুঃ ॥৩০॥৪৯১॥

অনুবাদ । অহেতু অর্থাৎ অনুপলব্ধি, আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব সাধনে হেতু বা সাধক হয় না, যেহেতু অনুপলব্ধি অনুপলস্তাত্মক অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব মাত্র ।

ভাষ্য । আবরণাদ্যানুপলব্ধির্নাস্তি, অনুপলস্তাদিত্যেহেতুঃ । কস্মাৎ ? অনুপলস্তাত্মকত্বাদনুপলব্ধেঃ । উপলস্তাভাবমাত্রত্বাদনুপলব্ধেঃ । যদস্তু তদনুপলব্ধের্বিসয়ঃ, উপলব্ধ্যা তদস্তুতি প্রতিজ্ঞায়তে । যন্মাস্তু তদনুপলব্ধের্বিসয়ঃ, অনুপলভ্যমানং নাস্তুতি প্রতিজ্ঞায়তে । সোহয়-
মাবরণাদ্যানুপলব্ধেরনুপলস্ত উপলব্ধ্যভাবেহনুপলব্ধৌ স্ববিষয়ে প্রবর্তমানো
ন স্বং বিষয়ং প্রতিষেধতি । অপ্রতিষিদ্ধা চাবরণাদ্যানুপলব্ধির্হেতুত্বায় কল্পতে ।
আবরণাদীনি তু বিদ্যমানত্বাদনুপলব্ধের্বিসয়াস্তেষামনুপলব্ধ্যা ভবিতব্যং । যতানি

নোপলভ্যন্তে, তদুপলক্কেঃ স্ববিষয়-প্রতিপাদিকায়। অভাবাদনুপলস্তাদনুপ-
লক্কের্ব্বিষয়ো গম্যতে ন সন্ত্যাবরণাদীনি শব্দশ্রাংগ্রহণকারণানীতি।
অনুপলস্তানুপলক্কিঃ সিধ্যতি বিষয়ঃ স তস্মেতি।

অনুবাদ। আবরণাদির অনুপলক্কি নাই, যেহেতু (উহার) উপলক্কি হয় না—ইহা অহেতু, অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলক্কির যে অনুপলক্কি, তাহা ঐ অনুপ-
লক্কির অভাব সাধনে হেতু হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু
অনুপলক্কি “অনুপলস্তাত্মক” (অর্থাৎ) অনুপলক্কি উপলক্কির অভাবমাত্র। যাহা
আছে, তাহা উপলক্কির বিষয়, উপলক্কির দ্বারা তাহা আছে, এইরূপে প্রতিজ্ঞাত
হয়। যাহা নাই, তাহা অনুপলক্কির বিষয়, অনুপলভ্যমান বস্তু “নাই” এইরূপে
প্রতিজ্ঞাত হয়। সেই এই আবরণাদির অনুপলক্কির অনুপলস্ত উপলক্কির অভাবাত্মক
অনুপলক্কিরূপ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান হইয়া নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না
অর্থাৎ ঐ অনুপলক্কির অভাব-সাধনে হেতু হয় না। কিন্তু অপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ
পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত আবরণাদির অনুপলক্কি, (আবরণাদির অভাবের
সম্বন্ধে) হেতুত্বে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আবরণাদির যে অনুপলক্কি, তাহা আবরণাদির
অভাব সাধনে হেতু হয়। আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ অর্থাৎ সত্তা
বা ভাবত্ববশতঃ উপলক্কির বিষয়, (সুতরাং) সেই আবরণ প্রভৃতির উপলক্কি
হইবে, অর্থাৎ তাহা উপলক্কির যোগ্য। যেহেতু সেই আবরণাদি উপলক্ক হয়
না, অতএব নিজ বিষয়ের প্রতিপাদক উপলক্কির অভাবরূপ অনুপলস্তপ্রযুক্ত
‘শব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণাদি নাই’—এইরূপে অনুপলক্কির বিষয় সিদ্ধ
হয়। “অনুপলস্ত”প্রযুক্ত অর্থাৎ উপলক্কির অভাবসাধক প্রমাণপ্রযুক্ত কিন্তু
(আবরণাদির) অনুপলক্কি সিদ্ধ হয়, (কারণ) তাহা তাহার (অনুপলস্তের) বিষয়
অর্থাৎ অনুপলক্কিই উপলক্কির অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়, সুতরাং তদ্বারা তাহার
বিষয়সিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত আবরণাদি অভাব সিদ্ধ হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত “অনুপলক্কিসম” প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের
দ্বারা বলিয়াছেন যে, অনুপলক্কি আবরণাদির অনুপলক্কির অভাবের অর্থাৎ আবরণাদির উপলক্কির
সাধনে হেতু হয় না। কারণ, অনুপলক্কি অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলক্কি উপলক্কির অভাবাত্মক।
তাত্বেকার মহর্ষির ঐ হেতুবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে হেতু অনুপলক্কি, উপলক্কির
অভাব মাত্র, অর্থাৎ উহা উপলক্কির অভাব ভিন্ন কোন ভাব পদার্থ নহে। তাৎপর্য্যটীকাকার

বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার “মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়া অনুপলকি যে নিজের অভাবরূপ নহে, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, পূর্বোক্ত জাতিবাদীর তাহাই অভিযত। কিন্তু জাতিবাদীর যে তাহাই অভিযত, ইহা ত বুঝিতে পারি না। হুত্রে “আত্মনু” শব্দের অর্থ স্বরূপ। ভাষ্যকার “মাত্র” শব্দের দ্বারা হুত্রোক্ত “আত্মনু” শব্দার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়েও কোম স্থলে “ধ্বন্যাত্মক” শব্দ বলিতে “ধ্বনিমাত্র” বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভাষ্যকার এখানেও স্বরূপ অর্থই “মাত্র” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথা এখানে আমরা বুঝিতে পারি না। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়েও শব্দানিত্যত্ব পরীক্ষায় জাতিবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে এইরূপ হুত্র বলিয়াছেন^১। সেখানে ভাষ্যকার সংক্ষেপে মহর্ষির যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তদনুসারে এখানেও তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যাও লিখিত হইয়াছে। এখানেও তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যসন্দর্ভের উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা সরল ভাবে তাঁহার মূল যুক্তি কি বুঝা যায়, ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক।

ভাষ্যকার সেই মূল যুক্তি প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, বাহ্যতে অস্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। সুতরাং উপলব্ধি হেতুর দ্বারা তাহাই “অস্তিত্ব” এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ উপলব্ধিহেতুর দ্বারা সেই পদার্থেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়। এবং যে পদার্থ নাই, তাহা অনুপলব্ধির বিষয়। সুতরাং অনুপলভ্যমান বস্তু “নাস্তি” এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতু দ্বারা তাহারই নাস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার করিলে কেন উপলব্ধি হয় না, ইহা বক্তব্য। সুতরাং পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই বলিতে হইবে যে, যে পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। অস্তিত্ব বলিতে বুঝা যায় সত্তা, উহা ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম। কারণ, ভাব পদার্থই “সৎ” এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এ জন্ত ভাব পদার্থকেই বলে “সৎ”। অভাব পদার্থে “সৎ” এইরূপ প্রতীতি জন্মে না। এ জন্ত উহা সৎ নহে, তাই উহাকে বলে “অসৎ”। ভাষ্যকার নিজেও “সৎ” ও “অসৎ” শব্দের দ্বারা ভাব ও অভাব পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৪—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অভাব পদার্থে সত্তা না থাকায় অভাবত্ব বা অসত্তাবশতঃ উহার উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। এবং পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই বক্তব্য। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়েও উক্ত হুত্রের ভাষ্যে “সেইমতাবত্মোপলভ্যতে” এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত জাতিবাদীর মতে আবরণাদির অনুপলব্ধি যে, অভাবত্ববশতঃই অর্গাৎ সত্তা না থাকায় উপলব্ধির

১। অনুপলভ্যাত্মকত্বানুপলব্ধিহেতুঃ। ২। ২. ২১ হুত্র।

অনুপলভ্যতে তদস্তি, যন্মোপলভ্যতে তন্নাস্তীতি। অনুপলভ্যাত্মকমসদ্বিত্তি ব্যবস্থিতং। উপলব্ধ্যভাবানুপলব্ধিরিত্তি, সেইমতাবত্মোপলভ্যতে। সচ্চ খণ্ডাবরণং, তন্মোপলব্ধা ভবিতব্যং ন চোপলভ্যতে, তন্নাস্তীতি।—ভাষ্য। দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিষয় হয় না, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবরণাদির যে অনুপলকি, তাহা উপলকির বিষয় হয় না, অর্থাৎ উপলকির অযোগ্য, ইহা পূর্বোক্ত জাতিবাদীর স্বীকার্য। কারণ, আবরণাদির যে অনুপলকি, তাহা ত উপলকির অভাবস্বরূপ। সুতরাং উহাতে অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা না থাকায় উহা উপলকির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং উহার যে অনুপলকি, তাহা উহার অভাব সাধনে হেতু হয় না। কারণ, যে পদার্থ উপলকির যোগ্য, তাহারই অনুপলকি তাহার অভাব সাধনে হেতু হয়। মহর্ষি এই তাৎপর্য্যই সূত্র বলিয়াছেন,—“অনুপলন্তা অকৃত্বাদনুপলকেরহেতুঃ।” ভাষ্যকার পরে মহর্ষির ঐ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, সেই এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত জাতিবাদীর কথিত আবরণাদির অনুপলকির অনুপলকিরূপ যে হেতু, উহা জাতিবাদীর মতানুসারে উহার নিজ বিষয় যে, উপলকির অভাবরূপ অনুপলকি অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলকি, তাহাতে প্রবর্তমান হইলে উহা ঐ নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না। অর্থাৎ যে অনুপলকি অনুপলকিরও বিষয় নহে, তাহাকে পূর্বোক্ত জাতিবাদী অনুপলকির বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার অভাব সাধন করিবার জন্য যে অনুপলকিকে হেতু বলিয়াছেন, উহা ঐ অনুপলকির অভাব যে আবরণাদির উপলকি, তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, ঐ অনুপলকি উপলকির অভাবস্বরূপ, সুতরাং উহা উপলকির অযোগ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“উপলক্যভাবেহনুপলকৌ”। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত যে আবরণাদির অনুপলকি, যাহা পূর্বোক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহা আবরণাদির অভাব সাধনে হেতু হইতে পারে। কারণ, আবরণাদি সংপদার্থ, উহা উপলকির যোগ্য। ভাষ্যকার পরে ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ উপলকির বিষয় হয় অর্থাৎ উপলকির যোগ্য। ভাষ্যে “বিদ্যমানত্ব” শব্দের দ্বারা সত্তা অর্থাৎ ভাবত্বই বিবক্ষিত। ভাষ্যকার অন্ততঃ ভাব পদার্থ বলিতে “বিদ্যমান” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলকথা, আবরণ প্রভৃতি ভাব পদার্থ বলিয়া উপলকির যোগ্য। ভূগর্ভস্থ জগাদি এবং ঐরূপ আরও অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষ-প্রতিবক্ষক আবরণাদির উপলকি হইতেছে। সুতরাং শব্দের উচ্চারণের পূর্বে উহার অংশপ্রতিবক্ষক আবরণাদি থাকিলে অবশ্য তাহারও উপলকি হইবে। কিন্তু যখন তাহার উপলকি হয় না, তখন নিজ-বিষয়প্রতিপাদক উপলকির অভাবরূপ অনুপলকি প্রযুক্ত সেই অনুপলকির বিষয় অর্থাৎ ঐ হেতুর সাধ্য বিষয় যে উপলভ্য বস্তুর অভাব, তাহা সিদ্ধ হয়। কিরূপে সিদ্ধ হয়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, শব্দের অংশবণপ্রযোজক আবরণাদি নাই। অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণের পূর্বে উহার অংশবণপ্রতিবক্ষক আবরণাদি থাকিলে ভাব পদার্থ বলিয়া তাহা উপলকির যোগ্য, সুতরাং তাহার উপলকি না হওয়ায় অনুপলকি হেতুর দ্বারা উহার অভাব সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ আবরণাদির অভাব অনুপলকির সাধ্য বিষয়। ভাষ্যকার এখানে সাধ্যরূপ বিষয় তাৎপর্য্যই আবরণাদির অভাবকে অনুপলকির বিষয় বলিয়াছেন। পূর্বে “নাস্তি” এইরূপ প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিশেষ্যরূপ বিষয়-তাৎপর্য্য অনুপলভ্যমান বস্তুকে অনুপলকির বিষয় বলিয়াছেন। সুতরাং উদ্দেশ্যতা ও সাধ্যতা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন প্রকার বিষয়তা যে ভাষ্যকারেরও সম্মত, ইহা বুঝা যায়। নতঃ এখানে ভাষ্যকারের পূর্বাপর উক্তির সামঞ্জস্য হয় না।

তাৎপর্যটীকাকারও এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অনুপলভ্যঃ প্রতিবেদকঃ প্রমাণাদনুপলক্কের্যো বিষয় উপলভ্যভাবঃ স গম্যতে ন সন্ত্যাবরণাদীনি শব্দস্তগ্রহণকারণানীতি”।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি যে প্রমাণ দ্বারা আবরণাদির উপলব্ধির নিষেধ বা অভাব বুঝা যায়, সেই উপলব্ধিনিষেধক প্রমাণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবরণাদির অভাবের সাধক হয়? এ জন্ত ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, অনুপলভ্যপ্রযুক্ত কিন্তু অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয়। এখানে “অনুপলভ্য” শব্দের দ্বারা উপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণই বিবক্ষিত এবং “অনুপলব্ধি” শব্দের দ্বারা আবরণাদির অনুপলব্ধি বিবক্ষিত। অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ দ্বারা ঐ অনুপলব্ধিই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, সেই অনুপলব্ধিই তাহার অর্থাৎ অনুপলভ্যের (অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণের) বিষয় অর্থাৎ সাধ্য। তাৎপর্য্য এই যে, আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ বা হেতুর দ্বারা উহার বিষয় বা সাধ্য যে আবরণাদির অনুপলব্ধি, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ হয়। পরে উহার দ্বারা আবরণাদির অভাব সিদ্ধ হয়। আবরণাদির অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আবরণাদির অভাবের সাধক হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন^১।

মূলকথা, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত জ্ঞানবাদীর মতানুসারেই বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি যখন উপলব্ধির অভাবাত্মক, তখন উহা অসৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগ্যই নহে। সূত্রোক্ত অভাবত্ববশতঃ উহার উপলব্ধি হয় না। অতএব উহার অনুপলব্ধির দ্বারা উহার অভাব যে উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আবরণাদি সংপদার্থ অর্থাৎ ভাব পদার্থ। সূত্রোক্ত তাহা উপলব্ধির যোগ্য। অতএব অনুপলব্ধির দ্বারা উহার অভাব সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরল ভাবে ইহাই তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। তবে জ্ঞানবাদী যদি পরে আবরণাদির অনুপলব্ধিরূপ অভাব পদার্থও উপলব্ধির যোগ্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি আর উহার অনুপলব্ধিও বলিতে পারিবেন না। মহর্ষি পরবর্তী সূত্রের দ্বারা শেষে তাহাই বলিয়াছেন ॥৩০॥

সূত্র । জ্ঞানবিকল্পানাঞ্চ ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাত্মম্ ।

॥৩১॥৪৯২॥

অনুবাদ । এবং প্রতি শরীরে “জ্ঞানবিকল্প” অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের ভাব ও অভাবের সংবেদন (উপলব্ধি) হওয়ায় অহেতু [অর্থাৎ আবরণাদির

১। তৎ কিমিদানীং সাক্ষাদনুপলভ্যনিষেধকং প্রমাণমুপলভ্যভাবং গময়তি? নেতাহ—“অনুপলভ্যত্বপূর্ণলব্ধিনিষেধকং প্রমাণাদনুপলব্ধিরাবরণস্ত সিধ্যতি। কস্মাদিত্যত আহ “বিষয়ঃ স ততোপলব্ধিনিষেধকপ্রমাণস্তানুপলব্ধিঃ—ততস্তাবরণাভাব ইতি দৃষ্টব্যং।—তাৎপর্য্যটীকা।

অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ার তাহাতে পূর্বোক্ত জাতিবাদীর কথিত অনুপলব্ধি অসিদ্ধ, সুতরাং উহা আবরণাদির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না] ।

ভাষ্য । অহেতুরিতি বর্ততে । শরীরে শরীরে জ্ঞানবিকল্পানাং ভাবা-
ভাবৌ সংবেদনীয়ৌ, অস্তি মে সংশয়জ্ঞানং নাস্তি মে সংশয়জ্ঞানমিতি । এবং
প্রত্যক্ষানুমানাগম-স্মৃতি-জ্ঞানেষু । সেয়মাবরণাদ্যনুপলব্ধিরূপলব্ধ্যভাবঃ
স্বসংবেদ্যো—নাস্তি মে শব্দশ্রাবণাদ্যনুপলব্ধিরিতি, নোপলভ্যন্তে শব্দ-
শ্রাবণকারণান্ধ্যাবরণাদীনীতি । তত্র যদুক্তং তদনুপলব্ধেরনুপলভ্য-
দভাবসিদ্ধিরিত্যেতন্মোপপদ্যতে ।

অনুবাদ । “অহেতুঃ” এই পদ আছে অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে “অহেতুঃ” এই
পদের অনুবৃত্তি এই সূত্রে বুঝিতে হইবে । প্রত্যেক শরীরে সর্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের
ভাব ও অভাব সংবেদনীয় অর্থাৎ মনের দ্বারা বোধ্য । যথা—আমার সংশয়জ্ঞান
আছে, আমার সংশয়জ্ঞান নাই । [অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয়রূপ জ্ঞান জন্মিলে সমস্ত
বোদ্ধাই ‘আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হইয়াছে’, এইরূপে মনের দ্বারা ঐ জ্ঞানের সত্তা
প্রত্যক্ষ করে এবং ঐ জ্ঞান না জন্মিলে ‘আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হয় নাই’ এইরূপে
মনের দ্বারা উহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ করে] এইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দবোধও
স্মৃতিক্রম জ্ঞানসমূহে বুঝিতে হইবে । (অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানেরও ভাব ও অভাব
সমস্ত বোদ্ধাই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে) । সেই এই আবরণাদির অনুপলব্ধি
(অর্থাৎ) উপলব্ধির অভাব স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজের মনোগ্রাহ্য । যথা—‘আমার
শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলব্ধি নাই’, ‘শব্দের শ্রাবণপ্রয়োজক আবরণাদি
উপলব্ধি হইতেছে না’ । (অর্থাৎ উক্তপ্রকারে সমস্ত বোদ্ধাই শব্দের আবরণাদির
অনুপলব্ধির অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে) । তাহা হইলে
‘সেই অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত অভাব-সিদ্ধি হয়’ এই যে উক্ত হইয়াছে,
ইহা উপপন্ন হয় না ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “অনুপলব্ধিসম” প্রতিবেদের যে উত্তর বলিয়াছেন,
উহা তাঁহার নিজসিদ্ধান্তানুসারে প্রকৃত উত্তর নহে । কারণ, তাঁহার নিজমতে অনুপলব্ধি অভাব
পদার্থ হইলেও মনের দ্বারা উহার উপলব্ধি হয় । উহা উপলব্ধির অযোগ্য পদার্থ নহে । তাই
মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার ঐ নিজসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, তদনুসারে পূর্বোক্ত “অনুপলব্ধি-

সম” প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বসূত্র হইতে “অহেতুঃ” এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, শব্দের আবরণাদির অনুপলক্ষিত যে অনুপলক্ষি, তাহা ঐ অনুপলক্ষির অভাব সাধনে হেতু হয় না। কেন হেতু হয় না? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যে বিকল্প অর্থাৎ সর্বপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞান, তাহার ভাব ও অভাবের সংবেদন অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষরূপ উপলক্ষি হইয়া থাকে। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইলেও অন্ত্যন্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে। মহর্ষি “জ্ঞানবিকল্প” বলিয়া সর্বপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিতে প্রথমতঃ সংশয়রূপ জ্ঞান ও উহার অভাব যে প্রকারে মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বলিয়া প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান স্থলেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন। পরে প্রকৃত স্থলে মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, উচ্চারণের পূর্বে কেহই শব্দের আবরণাদির উপলক্ষি করে না, এ জন্ত ‘আমার শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলক্ষি নাই’, ‘শব্দের অশ্রবণ-প্রয়োজক কোন আবরণাদি উপলক্ষি হইতেছে না’ এইরূপে সকলেই মনের দ্বারা ঐ আবরণাদির অনুপলক্ষিকেও প্রত্যক্ষ করে। উহা সকলেরই স্বসংবেদ্য। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানবাদী যে শব্দের আবরণাদির অনুপলক্ষিতও অনুপলক্ষি বলিয়াছেন, তাহা নাই। কারণ, উহার উপলক্ষিই হইয়া থাকে। সুতরাং উহা আবরণাদির উপলক্ষি সাধনে হেতু হয় না। যাহা নাই, যাহা অলৌক, তাহা কখনই হেতু বলা যায় না। পূর্বোক্তরূপ জ্ঞানবিকল্পের ভাব ও অভাব যে সমস্ত শরীরী বোদ্ধাই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, সুতরাং ঐ মানস প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি সূত্রশেষে বলিয়াছেন—“অধ্যাত্মঃ”। অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে ঐ প্রত্যক্ষ জন্মে। শরীরশূন্য মুক্ত আত্মার ঐ প্রত্যক্ষ জন্মে না। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “আত্মনু” শব্দের দ্বারা শরীরই গ্রহণ করিয়া “অধ্যাত্মঃ” এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“শরীরে শরীরে”। “শরীরে শরীরিণাং” এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটিকায় “শরীরে শরীরে” এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত দেখা যায়। প্রত্যেক শরীরের নিজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই ঐ প্রত্যক্ষ জন্মে; কেবল কোন ব্যক্তিবিশেষেরই জন্মে না—ইহাই উক্ত পাঠের দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং উহাই মহর্ষির এখানে বক্তব্য। নচেৎ “অধ্যাত্মঃ” এই পদ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন থাকে না। “আত্মনু” শব্দের শরীর অর্থেও প্রমাণ আছে। “তদাত্মানং স্বজাম্যহং”—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রয়োগও আছে। পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানের যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম অনুব্যবসায়। মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা ঐ অনুব্যবসায় যে তাঁহার সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভট্ট কুমারিল উক্ত মত অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব মতই সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্ত সেই বিষয়ে “জ্ঞাততা” নামে একটি ধর্ম জন্মে, উহার অপর নাম “প্রাকট্য”। তদ্বারা সেই জ্ঞানের অনুমান হয়। বস্তুতঃ কোন জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ জন্মে না। জ্ঞানমাত্রই অতীন্দ্রিয়। “শ্রায়কুশুমাজ্জি” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বিশদ বিচার দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, পূর্বোক্ত গোতমমত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সেখানে পরে

তিনি মহর্ষি গোতমের এই সূত্রটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন^১। মূলকথা, উচ্চারণের পূর্বে শব্দের যে কোন আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা সকলেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ অনুপলব্ধির দ্বারা আবরণাদির অভাবই সিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত জাতিবাদী মীমাংসক আবরণাদির সত্তা সিদ্ধ করিতে পারেন না। আবরণাদির অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধি গ্রহণ করিয়া তিনি আবরণাদির উপলব্ধিও সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, ঐ আবরণাদির অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় উহার অনুপলব্ধি অসিদ্ধ। পূর্বোক্ত জাতিবাদী যদি ইহা অস্বীকার করিয়াই উক্তরূপ প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে তুল্যভাবে তাঁহার ঐ উত্তরে দোষ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন করা যায়। কারণ, তিনি যখন বলিবেন যে, আমার এই উত্তরে কোন দোষের উপলব্ধি না হওয়ায় কোন দোষ নাই, তখন তুল্যভাবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, দোষের অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি না হওয়ায় অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত দোষের উপলব্ধি আছে, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত দোষ আছে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ঐ উত্তর স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসহ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। পূর্বোক্তরূপে স্বব্যাঘাতকত্বই এই “অনুপলব্ধিসমা” জাতির সাধারণ ছষ্টত্বমূল।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে এই “অনুপলব্ধিসমা” জাতির অর্থ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, ইহার বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহর্ষির সূত্রে “অনুপলব্ধি” শব্দটী উপলক্ষণ বা প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, দ্বেষ অদ্বেষ, ক্রুতি, অক্রুতি, শক্তি, অশক্তি, উপপত্তি, অনুপপত্তি, ব্যবহার, অব্যবহার, ভেদ ও অভেদ, ইত্যাদি বহু ধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ধর্ম্ম নিজের স্বরূপে তদ্রূপে বর্ত্তমান আছে অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান নাই, এইরূপ বিকল্প করিয়া উভয় পক্ষেই উহার নিজস্বরূপের ব্যাঘাতের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যাবস্থান করিলে তাহাকে বলে “অনুপলব্ধিসমা” জাতি। “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ নানা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়পরীক্ষায় “বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তেঃ” এবং “অব্যবস্থাস্থানি ব্যবস্থিত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ” (১৩.৪) এই সূত্র দ্বারা এবং পরে “অনুদত্তস্মাৎ” ইত্যাদি সূত্র (২.২.৩১) এবং “অনিয়মে নিয়মান্নানিয়মঃ” (২২.৫৫) এই সূত্রের দ্বারা এই “অনুপলব্ধিসমা” জাতিরই উদাহরণবিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বরদরাজ বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে এই জাতির পূর্বোক্তরূপেই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই মতে পূর্বোক্ত উদাহরণে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক উচ্চারণের পূর্বে অনুপলব্ধিবশতঃ শব্দ নাই, এই কথা বলিলে বাদী মীমাংসক যদি বলেন যে, ঐ অনুপলব্ধি কি নিজের স্বরূপে তদ্রূপে অর্থাৎ অনুপলব্ধি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে ? অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকে না ? ইহা বক্তব্য। অনুপলব্ধিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে না, ইহা বলিলে উহাকে অনুপলব্ধিই বলা যায় না। কারণ, যাহা স্বরূপে বর্ত্তমান নাই, তাহা কোন পদার্থই হয় না। সুতরাং উহা অনুপলব্ধিস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ অনুপলব্ধিরও

১। অথ তথাপি জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিত্যত্র কিং প্রশংসা? প্রত্যক্ষমেব। যদসুত্রয়ং “জ্ঞানাবকল্পানাঞ্চ ভাবাভাব-সংবেদনাদধ্যাক্ষ”মিতি।—শ্রীমদ্রহস্যমঞ্জলি, চতুর্থ স্তবক, চতুর্থকারিকা/ব্যাখ্যার শেষ।

কখনও উপলব্ধি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হইলে উহার অনুপলব্ধি-স্বরূপেরই ব্যাঘাত হয়। সুতরাং বাহ্য সত্তা অনুপলব্ধিস্বরূপেই ব্যবস্থিত, তাহাতে সত্তা অনুপলব্ধিই আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে সেই অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা সত্তা নিজেরও অভাবরূপ, অর্থাৎ উপলব্ধিস্বরূপ, ইহাও স্বীকার্য্য হওয়ায় উহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধিও সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত তখন শব্দের সন্তাও সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বে শব্দ নাই, ইহা বলা যায় না। উক্ত স্থলে যীমাংসকের এইরূপ প্রত্যবস্থান “অনুপলব্ধিময়া” জাতি। পূর্বোক্ত “তদনুপলব্ধেরনুপলব্ধাৎ” ইত্যাদি (২২শ) লক্ষণসূত্রেরও উক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। উক্ত সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থলে শব্দই গ্রহণ করিতে হইবে এবং “বিপরীত” শব্দের দ্বারা উক্ত স্থলে শব্দের উপলব্ধি বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকারও পূর্বোক্ত জাতিবাদীর অভিমত উক্তরূপ যুক্তি অনুসারেই জাতিবাদীর মতে অনুপলব্ধি নিজের অভাবরূপ অর্থাৎ উপলব্ধিরূপ, ইহা বলিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ ভাবে জাতিবাদীর অভিযতের ব্যাখ্যা না করায় তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যব্যাখ্যায় ঐরূপ কথা কেন বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ অত্র ভাবে পূর্বোক্ত জাতিবাদীর যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি স্বরূপে অনুপলব্ধি, এই কথার অর্থ কি? অনুপলব্ধি স্বয়ং অনুপলব্ধিরূপ, ইহাই অর্থ হইলে তাহা স্বীকার্য্য। যদি বল, অনুপলব্ধি নিজবিষয়ক অনুপলব্ধি, ইহাই অর্থ; কিন্তু ইহা বলাই যায় না। কারণ, অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাবাত্মক। সুতরাং অভাব পদার্থ হওয়ায় উহার বিষয় থাকিতে পারে না। জ্ঞানের জ্ঞায় অভাবের কোন বিষয় নাই। অনুপলব্ধি স্বরূপে অনুপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ নিজবিষয়ক অনুপলব্ধি না হইলে, উহার অনুপলব্ধিস্ব থাকে না, উহার স্বরূপের ব্যাঘাত বা বিরোধ হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঘট পদার্থের কোন বিষয় না থাকায় উহা নিজবিষয়ক নহে, তাই বলিয়া কি উহা ঘট নহে? তাহাতে কি উহার ঘটস্বরূপের ব্যাঘাত হয়? তাহা কখনই হয় না ॥৩১॥

অনুপলব্ধি-সম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৩॥

সূত্র। সাধর্ম্যাতুল্যধর্মোপপত্তেঃ সর্বানিত্যত্ব-

প্রসঙ্গাদনিত্যসমঃ ॥৩২॥৪৯৩॥

অনুবাদ। সাধর্ম্যপ্রযুক্ত (সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের) তুল্য ধর্মের সিদ্ধি-বশতঃ সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (২২) অনিত্যসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য। অনিত্যেন ঘটেন সাধর্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইতি ক্রবতোহস্তি

ঘটেনানিত্যেন সৰ্ব্ভাবানাং সাধৰ্ম্যমিতি সৰ্বস্যানিত্যত্বমনিষ্টং সম্পদ্যতে, সৌহৰমনিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানাদনিত্যসম ইতি ।

অনুবাদ । অনিত্য ঘটের সহিত সাধৰ্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা যিনি বলেন, তাঁহার অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থের সাধৰ্ম্য আছে, এ জন্য সমস্ত পদার্থের অনিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার অস্বীকৃত অনিত্যত্ব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্বের আপত্তি হয় । অনিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ সেই ইহা (২২) “অনিত্যসম” প্রতিষেধ ।

টিপ্পনী । মহর্ষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা “অনিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নজ্ঞাত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ কোন বাদী ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া ঘট ও শব্দের প্রযত্নজ্ঞাত্বরূপ সাধৰ্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ সাধৰ্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা ঘটের ত্রায় শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সহিত প্রযত্নজ্ঞাত্বরূপ সাধৰ্ম্যপ্রযুক্ত যদি শব্দে তুল্যধর্ম্ম অর্থাৎ অনিত্যত্বের উপপত্তি বা সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হউক ? কারণ, অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সম্ভা প্রভৃতি সাধৰ্ম্য আছে । সুতরাং ঘটের ত্রায় সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না ? কিন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব পূর্বোক্ত বাদীর অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত । সুতরাং তিনি প্রতিবাদীর ঐ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিতে পারিবেন না । উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উহার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম অনিত্যসম প্রতিষেধ । ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি স্থলেই “অনিত্যসম” প্রতিষেধ হয় । সূত্রে মহর্ষির “সর্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ” এইরূপ উক্তির দ্বারাও তাহাই বুঝা যায় । বার্তিককার উদ্যোতকেরও ইহাই মত বুঝা যায় । কারণ, পূর্বোক্ত “অবিশেষসমা” জাতি হইতে এই “অনিত্যসমা” জাতির ভেদ কিরূপে হয় ? এতদ্বস্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “অবিশেষসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সামান্যতঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু এই “অনিত্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বিশেষ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন । সুতরাং ভেদ আছে ।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য স্বল্প বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে সাধৰ্ম্য শব্দটি উপলক্ষণ । উহার দ্বারা বৈধৰ্ম্যও বিবক্ষিত । এবং সূত্রে মহর্ষির “সর্বানিত্যত্ব-প্রসঙ্গাৎ” এই বাক্যও প্রদর্শন মাত্র । অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থে অনিত্যত্বই সাধ্যধর্ম্ম, সেই স্থল গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উদাহরণ প্রদর্শনার্থ ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন । উহার দ্বারা সকল পদার্থের সাধ্যধর্ম্মবস্ত প্রসঙ্গই মহর্ষির বিবক্ষিত । “তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজ ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় সূচনার জন্তই পূর্বে বলিয়াছেন,—

“তুলাধর্মোপপত্তেঃ”। কেবল অনিত্যত্বধর্মই মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে তিনি “অনিত্যত্বোপপত্তেঃ” এই কথাই বলিতেন। সুতরাং “তুলাধর্ম” শব্দের দ্বারা বাদীর দৃষ্টান্তের সহিত তাঁহার সাধাধর্মের তুলাধর্ম সাধাধর্মবস্তুরই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা কোন ধর্ম্যোতে তাঁহার সাধাধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার কথিত এই সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত যদি তোমার সাধাধর্ম্যোতে তোমার দৃষ্টান্তের তুলাধর্ম অর্থাৎ তোমার অভিমত সাধাধর্ম্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার ঐ দৃষ্টান্তের কোন সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সকল পদার্থই তোমার ঐ সাধাধর্ম্যবিশিষ্ট হউক? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “অনিত্যসমা” জ্ঞাতি। উক্ত মতে কোন বাদী “পূর্বতো বহিমান্ ধূমাং যথা মহানসং” এইরূপ প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী যদি বলেন যে, মহানসের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সমতা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত সমস্ত পদার্থই মহানসের ত্রায় বহিমান্ হউক? এইরূপ উত্তরও “অনিত্যসমা” জ্ঞাতি। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যাসূ-সারে উক্তরূপ উত্তর জাত্যুত্তর হইতে পারে না অথবা অশ্রু জ্ঞাতি স্বীকার করিতে হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহাই বলিয়া প্রাচীন ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মতে “অনিত্যসমা” জ্ঞাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সমস্ত পদার্থেরই বাদীর সাধাধর্ম্যবস্তুর আপত্তি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত বিপক্ষেয়ও সপক্ষত্বাপত্তি সমর্থন করেন, উহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু “অবিশেষসমা” জ্ঞাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য নহে। সুতরাং ঐ উভয় জ্ঞাতির ভেদ আছে ॥৩২॥

ভাষ্য। অস্মোত্তরং।

অনুবাদ। এই “অনিত্যসমা” প্রতিষেধের উত্তর।

সূত্র। সাধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ

প্রতিষেধ্যসাধর্ম্যাৎ ॥৩৩॥৪৯৪॥

অনুবাদ। সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত “প্রতিষেধে”র অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না, যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত (তাহার প্রতিষেধক বাক্যের) সাধর্ম্য আছে।

ভাষ্য। প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বযুক্তং বাক্যং পক্ষনিবর্তকং প্রতিপক্ষলক্ষণং প্রতিষেধঃ। তস্য পক্ষেণ প্রতিষেধেয় সাধর্ম্যং প্রতিজ্ঞাদিযোগঃ। তদ-
যদ্যনিত্যসাধর্ম্যাদনিত্যত্বস্যাসিদ্ধিঃ, সাধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধস্থাপ্যাসিদ্ধিঃ,
প্রতিষেধেয় সাধর্ম্যাদিতি।

অনুবাদ । পক্ষনিষেধক প্রতিপক্ষলক্ষণ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত বাক্য “প্রতিষেধ”, অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ বাক্যই সূত্রোক্ত “প্রতিষেধ” শব্দের অর্থ । প্রতিষেধ্য পক্ষের সহিত অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত তাঁহার সাধর্ম্য প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত হইবে । তাহা হইলে যদি অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্য-প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সিদ্ধি না হয়—সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অসিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না,—যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত (উহার) সাধর্ম্য আছে ।

টিপ্পনী । পূর্বসূত্রোক্ত “অনিত্যত্বম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন,—“প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ” । অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্বোক্তরূপ উত্তর করিলে তাঁহার প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না । যে বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপক বাক্যের প্রতিষেধ করেন, এই অর্থে প্রতিবাদীর সেই বাক্যই সূত্রে “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । ভাষ্যকার প্রথমেই উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পক্ষের নিবর্তক অর্থাৎ বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের নিষেধক প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত যে বাক্য, তাহাই সূত্রোক্ত “প্রতিষেধ” । উহাকে “প্রতিপক্ষ”ও বলে, তাই বলিয়াছেন—“প্রতিপক্ষলক্ষণং” । প্রতিবাদী বাদীর নিজপক্ষস্থাপক যে বাক্যকে প্রতিষেধ করেন, উহাই তাঁহার প্রতিষেধ্য বাক্য । উহা বাদীর পক্ষস্থাপক বলিয়া “পক্ষ” নামেও কথিত হয় । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“পক্ষণ প্রতিষেধ্যেন” । ভাষ্যকারের মতে সূত্রে “প্রতিষেধ্য” শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর ঐ বাক্যই গৃহীত হইয়াছে । জয়ন্ত ভট্টও উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন । প্রতিবাদী বাদীর ঐ বাক্যের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ অসাধকত্ব সাধন করিতে পরে বলেন যে, তোমার এই বাক্য অসাধক অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাদক নহে ; যেহেতু উহাতে অসাধকের সাধর্ম্য আছে ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ করিয়াই বাদীর ঐ বাক্যের প্রতিষেধ করেন এবং তাহাই করিতে হইবে । নচেৎ প্রতিবাদীর অস্ত্র কোন কথায় মধ্যস্থগণ উহা স্বীকার করিবেন না । ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐরূপ বাক্যই তাঁহার প্রতিষেধক বাক্য । বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্য যেমন প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত, তদ্রূপ প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত । সুতরাং প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তত্বরূপ সাধর্ম্য আছে । তাহা হইলেও প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্যের কেন সিদ্ধি হয় না ? মহর্ষি ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“সাধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ” । অর্থাৎ যে হেতু উক্ত প্রতিবাদীর মতে সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসিদ্ধি হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী অনিত্য বস্তুটির সহিত সকল পদার্থেরই সম্বন্ধি কোন সাধর্ম্য আছে বলিয়া, সকল পদার্থই বস্তুটির দ্বারা অনিত্য হইবে ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করায় তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, বস্তুটির সহিত সাধর্ম্যপ্রযুক্ত শব্দে অনিত্যত্ব সাধ্যের সিদ্ধি হয় না । কারণ, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় । মহর্ষি প্রথমে “সাধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ” এই বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদীর

ঐ বক্তব্য বা অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রতিবাদী ঐরূপ বলিলে তাঁহার প্রতিবেদক বাক্যের ও সিদ্ধি হয় না, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য। কারণ, তাঁহার নিজ মতানুসারে তিনি অসাধকের সাধর্ম্যপ্রযুক্তও অসাধকত্ব সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে সাধর্ম্যপ্রযুক্ত কোন সাধাসিদ্ধি হয় না। প্রতিবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যে স্থলে আমার পূর্বোক্তরূপ কোন অনিষ্টাপত্তি হয়, সেই স্থলেই আমি সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধাসিদ্ধি স্বীকার করি না। কারণ, ঐরূপ স্থলে তাহা করা যায় না। কিন্তু যে স্থলে কোন অনিষ্টাপত্তি হয় না, সেই স্থলে কেন উহা স্বীকার করিব না? এ জ্ঞাত মহর্ষি পরে চরম হেতু বলিয়াছেন, “প্রতিবেদ্যসাধর্ম্যং”। অর্থাৎ তুল্যভাবে প্রতিবাদীর প্রতিবেদক বাক্যও অসাধকত্বের আপত্তি হয়। কারণ, প্রতিবেদ্য বাক্যের সহিত উহার সাধর্ম্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে তুল্যভাবে বাদীও বলিতে পারেন যে, তোমার এই প্রতিবেদক বাক্যও অসাধক হউক? যদি অসাধকের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক হয়, তাহা হইলে আমার বাক্যের ত্রায় তোমার বাক্যও কেন অসাধক হইবে না? কারণ, তোমার মতে আমার বাক্য অসাধক এবং আমার বাক্যের সহিত তোমার বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-যুক্তরূপ সাধর্ম্যও আছে। অতএব তোমার ত্রায় আমিও ঐরূপ আপত্তি সমর্থন করিতে পারি। কিন্তু ঐ আপত্তি তোমার ইষ্ট নহে। অতএব তোমার বাক্যও উক্তরূপ আপত্তিবশতঃ অসাধকের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আমার বাক্যও অসাধকত্ব সিদ্ধ হয় না—ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তোমার ঐ প্রতিবেদকবাক্যেরও সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ তুমি ঐ বাক্যের দ্বারা আমার বাক্যের প্রতিবেদ করিতে পার না, ইহাও তোমার স্বীকার্য্য। অতএব স্বব্যবাহতকত্ববশতঃ তোমার ঐ উত্তর জাতান্তর, ইহা স্বীকার্য্য। মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকা ও “ত্রায়স্বত্রোক্তার” প্রভৃতি কোন কোন পুস্তকে উদ্ধৃত সূত্রশেষে “প্রতিবেদ্যসামর্থ্যাচ্চ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু “ত্রায়বার্ত্তিক”, “ত্রায়সূচীনিবন্ধ” ও “ত্রায়মঞ্জরী” প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত সূত্রপাঠে “চ” শব্দ নাই ॥৩৩॥

**সূত্র । দৃষ্টান্তে চ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞাতস্য ধর্মস্য
হেতুত্বাত্ম্য চোভয়থাভাবান্নাবিশেষঃ ॥৩৪॥৪৯৫॥**

অনুবাদ । এবং দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্মের সাধনরূপে প্রজ্ঞাত ধর্মের হেতুত্ব-বশতঃ এবং সেই ধর্মের (হেতুর) উভয় প্রকারে সম্ভাবশতঃ অবিশেষ নাই। [অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্ম্য হেতু প্রযত্নজন্যত্ব হইতে প্রতিবাদীর অভিমত সম্ভা প্রভৃতি সাধ্যধর্মের বিশেষ আছে। কারণ, উহা সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, উহা অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্টই নহে।]

ভাষ্য । দৃষ্টান্তে যঃ খলু ধর্মঃ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞায়তে, স হেতু-
ত্বেনাভিধীয়তে । স চোভয়থা ভবতি, কেনচিৎ সমানঃ কুতশ্চিদ্ভিশিষ্টঃ ।
সামান্য্যং সাধর্ম্ম্যং বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্ম্যং । এবং সাধর্ম্ম্যাবিশেষো হেতু-
র্নাবিশেষণ সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রং বা । সাধর্ম্ম্যমাত্রং বৈধর্ম্ম্যমাত্রঞ্চাপ্রিত্য
ভবানাহ সাধর্ম্ম্যাতুল্যধর্ম্মোপপত্তেঃ সর্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাদনিত্য-
সম ইতি, এতদযুক্তমিতি । অবিশেষসমপ্রতিষেধে চ যদুক্তং তদপি
বেদিতব্যম্ ।

অনুবাদ । যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যসাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয়-
বশতঃ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্যরূপে প্রজ্ঞাত হয়, সেই ধর্ম্ম হেতুরূপে কথিত হয় অর্থাৎ
ঐরূপ ধর্ম্মবিশেষকেই হেতু বলে । সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ হেতু, উভয় প্রকারে হয় ।
(১) কোন পদার্থের সহিত সমান, (২) কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট । সমানতা-
প্রযুক্ত সাধর্ম্ম্য, এবং বিশেষপ্রযুক্ত বৈধর্ম্ম্য । (অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্ম্য
হেতু নামে হেতু উভয় প্রকার হয়) এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ হেতুলক্ষণাক্রান্ত
সাধর্ম্ম্য বিশেষ হেতু হয়, অবিশেষে সাধর্ম্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্ম্যমাত্র হেতু হয় না ।
সাধর্ম্ম্যমাত্র এবং বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে আশ্রয় করিয়া আপনি “সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত তুল্যধর্ম্মের
উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তিপ্রযুক্ত অনিত্যসম”, ইহা অর্থাৎ
মহর্ষি গোতমের ঐ সূত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত । এবং “অবিশেষসম”
প্রতিষেধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিবে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষেধের যে উত্তর
কথিত হইয়াছে, তাহাও এখানে উত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা “অনিত্যসমা” জাতির সাধারণ ছষ্টত্বমূল স্বব্যাঘাতকত্ব
প্রদর্শন করিয়া, পরে এই সূত্রের দ্বারা উহার অসাধারণ ছষ্টত্বমূল যুক্তাজহানিও প্রদর্শন করিয়াছেন ।
মহর্ষির বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত “অনিত্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সকল পদার্থের
সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ঐ
সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্ম্য নহে, উহা সাধর্ম্ম্যমাত্র । সুতরাং উহা অনিত্যত্বের
সাধক হেতুই হয় না । কারণ, উহাতে প্রকৃত হেতুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা নাই । কিন্তু উক্ত
স্থলে বাদী যে, শব্দে অনিত্যত্ব সাধন করিতে প্রযত্নজগত্বরূপ সাধর্ম্ম্যকে হেতু বলিয়াছেন, উহাতে
অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি থাকায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হেতু হয় । মহর্ষি ইহাই সমর্থন করিতে প্রকৃত
হেতুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধোর সাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্যরূপে
ব্যর্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাই হেতু । যেমন “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ অনুমানে প্রযত্নজগত্ব ।

ঐ স্থলে দৃষ্টান্ত পদার্থ ঘটানিতে ঐ প্রযুক্তজ্ঞাত সাধার্ম্য অনিত্যত্বের সাধন অর্থাৎ ব্যাপ্য বলিয়া যথার্থরূপে জ্ঞাত। কারণ, ঘটাদি পদার্থে প্রযুক্তজ্ঞাত আছে এবং অনিত্যত্বও আছে, ইহা বুঝা যায় এবং কোন নিত্য পদার্থে প্রযুক্তজ্ঞাত আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। সুতরাং ব্যাভিচারজ্ঞান না থাকায় ঘটাদি দৃষ্টান্ত পদার্থে সহচার জ্ঞানজন্য প্রযুক্তজ্ঞাত যে, অনিত্যত্বের সাধন বা ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়—উহার নাম অবয়বব্যাপ্তিনিশ্চয়। এইরূপ ঐ স্থলে যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে অর্থাৎ নিত্য, সে সমস্ত পদার্থ প্রযুক্তজ্ঞাত নহে—যেমন আকাশ, এইরূপে বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ হেতু যে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়। উহার নাম ব্যাভিচারক ব্যাপ্তিনিশ্চয়। ওই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন যে, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলে ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে ঐ প্রযুক্তজ্ঞাত হেতু সাধর্ম্য হেতু। কারণ, উহা শব্দ ঘটাদির সমান ধর্ম্য বলিয়া জ্ঞাত হয়। এবং আকাশাদি কোন নিত্য পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে ঐ হেতুই বৈধর্ম্য হেতু। ভাষ্যকারের মতে যে ঐ একই হেতু দৃষ্টান্তভেদে পূর্বোক্ত উভয় প্রকারে সাধর্ম্য হেতু এবং বৈধর্ম্য হেতু হয় এবং ঐ স্থলে হেতুবাক্যও সাধর্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্য হেতু নামে দ্বিবিধ হয়, ইহা প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় দ্বারা বুঝা যায় (প্রথম খণ্ড, ২৪৮—৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্যোতকর প্রভৃতি ভাষ্যকারের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখানে এই সূত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের উক্ত মত যে, মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহাও সমর্থন করা যায়। মহর্ষি বলিয়াছেন, সেই হেতু উভয় প্রকারে হয়। ভাষ্যকার উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থের সহিত সমান এবং কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত। যেমন শব্দে পূর্বোক্ত প্রযুক্তজ্ঞাতরূপ হেতু ঘটের সহিত সমান, এবং আকাশ হইতে ব্যাবৃত্ত। যে ধর্ম্য যাহাতে নাই, সেই ধর্ম্যকে সেই পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত ধর্ম্য বলে, এবং উহাকেই সেই পদার্থের বৈধর্ম্য বলে। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের “সূক্তি” টীকার প্রারম্ভে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ইতরব্যাবৃত্ত ধর্ম্যকেই বৈধর্ম্য বলিয়াছেন। ঐ ইতরব্যাবৃত্তরূপ বিশেষ-বশতঃই সেই ধর্ম্য ইতরের বৈধর্ম্য হয়। ভাষ্যকার ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন, “বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্যং”। ফলকথা, পূর্বোক্ত যে সাধর্ম্যবিষয় অর্থাৎ সাধার্ম্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধার্ম্যবিশেষ, তাহাই হেতু এবং উহা কোন পদার্থের বৈধর্ম্য হইলেও উহা হেতু হয়, কিন্তু সাধার্ম্যের ব্যাপ্তিশূন্য সাধর্ম্য মাত্র অথবা বৈধর্ম্য মাত্র হেতু নহে। ভাষ্যকার পরে ইহা বলিয়া, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সকল পদার্থের সাধর্ম্য সত্তা ও প্রেময়ত্বাদি ধর্ম্যকে গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি সমর্থন করেন, ঐ সাধর্ম্য যে অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পরে উহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বাদীর বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি কেবল সাধর্ম্য ও কেবল বৈধর্ম্য অর্থাৎ অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিশূন্য সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া মহর্ষি গোতমের “সাধর্ম্যাতুল্যধর্ম্যোপাপত্তেঃ” ইত্যাদি (৩২শ) সূত্রোক্ত জাত্যন্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত। এখানে ভাষ্যকারের

এই কথায় মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা যে বৈধর্ম্যও গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন বৈধর্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়াও যে প্রতিবাদী উক্ত জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন, ইহা ভাষ্যকারেরও সম্মত বুঝা যায়। পূর্বেও স্থলে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমিও কোন সাধর্ম্য মাত্র গ্রহণ করিয়া তদ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতেছি না। কিন্তু ঘটের সাধর্ম্য প্রযুক্তজ্ঞত্ব আছে বলিয়া ঘটের ত্রায় শব্দ অনিত্য, ইহা বলিলে ঘটের সহিত সত্তাদি সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি হয়। সুতরাং ঘটের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য। মহর্ষি এই জ্ঞত্ব সূত্রশেষে বলিয়াছেন যে, অবিশেষ নাই। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্ম্য প্রযুক্তজ্ঞত্ব এবং প্রতিবাদীর গৃহীত সাধর্ম্য সত্তাদিতে বিশেষ আছে। বাদীর গৃহীত ঐ সাধর্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া উহা বিশেষ হেতু। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সত্তাদি সাধর্ম্য ঐরূপ না হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না। সুতরাং প্রতিবাদীর ঐ আপত্তি সমর্থনে তাঁহার কোন প্রমাণই নাই। প্রমাণ ব্যতীত তিনি ঐরূপ আপত্তি সমর্থন করিতেই পারেন না। তিনি যদি পরে বাধ্য হইয়া আবার সত্তাদি সাধর্ম্যকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, উহা দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আবার বলিব, উহা অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। উহা সাধর্ম্য হেতুও নহে, বৈধর্ম্য হেতুও নহে। পরন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে প্রতিবাদী কোন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কারণ, সমস্ত পদার্থই তাঁহার প্রতিজ্ঞার্থ। পরন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হইবে। সুতরাং প্রতিবাদী আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারিবেন না। পূর্বেও “অবিশেষমা” জাতির উত্তরসূত্রের ভাষ্য ভাষ্যকার এই যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাও এখানে এই “অনিত্যসমা” জাতির উত্তর বৃষ্টিতে হইবে। ভাষ্যকার নিজেও পরে এখানে তাহাও বলিয়াছেন ॥৩৪॥

অনিত্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৫॥

সূত্র । নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপ-
পত্তেন্নিত্যসমঃ ॥৩৫॥৪৯৬॥

অনুবাদ । নিত্য অর্থাৎ সর্বদা অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৩) নিত্যসম প্রতিষেধ।

ভাষ্য । অনিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিজ্ঞায়তে । তদনিত্যত্বং কিং শব্দে নিত্যমথানিত্যং ? যদি তাবৎ সর্বদা ভবতি, ধর্ম্মস্ত সদাভাবাঙ্কিম্মিণোহপি

সদাভাব ইতি নিত্যঃ শব্দ ইতি । অথ ন সর্বদা ভবতি, অনিত্যত্বস্বাভাবা-
নিত্যঃ শব্দঃ । এবং নিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানান্নিত্যসমঃ ।

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইতেছে । সেই অনিত্যত্ব কি
শব্দে নিত্য অথবা অনিত্য ? অর্থাৎ সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্বদা থাকে
অথবা সর্বদা থাকে না ? যদি সর্বদা থাকে, ধর্মের সর্বদা সত্তাবশতঃ ধর্মীরও
অর্থাৎ শব্দেরও সর্বদা সত্তা স্বীকার্য, এ জন্ত শব্দ নিত্য । আর যদি সর্বদা না
থাকে অর্থাৎ কোন সময়ে শব্দে অনিত্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে অনিত্যত্বের
অভাববশতঃ শব্দ নিত্য, (অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য)
নিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ (২৩) নিত্যসম প্রতিষেধ ।

টিপ্পনী । ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা “নিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে ।
পূর্ববৎ এই সূত্রেও “প্রত্যবস্থানং” এই পদের অনুবৃত্তি বা অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত । ভাষা-
কার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন । তাৎপর্য্য
এই যে, কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দে অনিত্যত্ব সংস্থাপন
করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার প্রতিজ্ঞার্থ যে, শব্দের অনিত্যত্ব, তাহা কি শব্দে সর্বদাই
বর্তমান থাকে ? অথবা সর্বদা বর্তমান থাকে না ? যদি বল, সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে
ধর্মী শব্দও সর্বদা বর্তমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য । কারণ, ধর্মী না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে ধর্ম
থাকিতে পারে না । সুতরাং শব্দের সর্বদা সত্তা স্বীকার্য্য হওয়ায় শব্দ নিত্য, ইহাই স্বীকার্য্য ।
আর যদি বল, অনিত্যত্ব সর্বদা শব্দে বর্তমান থাকে না, তাহা হইলেও শব্দ নিত্য, ইহা স্বীকার্য্য ।
কারণ, যে সময়ে শব্দে অনিত্যত্ব নাই, তখন তাহাতে নিত্যত্বই আছে । কারণ, অনিত্যত্বের অভাবই
নিত্যত্ব । উক্তরূপে নিত্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শব্দে নিত্যত্ব সমর্থন করিয়া প্রত্যবস্থান করার উদ্দেশ্যে
বলে “নিত্যসম” প্রতিষেধ । পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হইলে আর তাহাতে
অনিত্যত্বের সাধন করা যায় না, ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য । সুতরাং বাদীর উক্ত
অনুমান বাধ অথবা সংপ্রতি-পক্ষদোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । তাই
বৃত্তিকার প্রভৃতি এই জাতিকে বলিয়াছেন,—“বাধসংপ্রতিপক্ষাত্তরদেশনাতাসা” । সূত্রে “নিত্যং”
ইহার ব্যাখ্যা সর্বদা । “অনিত্যত্বাভাব” শব্দের অর্থ অনিত্যত্ব ।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে এই “নিত্যসমা” জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় বহু
প্রকারে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া, ঐ সমস্তই “নিত্যসমা” জাতি বলিয়াছেন এবং
তদনুসারে মহর্ষির এই সূত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কারণ, তাঁহার উদ্ভাবিত
সেই সমস্ত প্রত্যবস্থান অন্য কোন জাতির লক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায় জাত্যন্তর হইতে পারে না, অথচ
উহা সঙ্কল্পও নহে । কিন্তু অন্যান্য জাতির আশ্রয়ই স্বাব্যাহাতক উত্তর । “ভাট্টিকরক্ষা”কার

বরদ্বার উক্ত মতানুসারে এই “নিত্যসমা” জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরে আরও কএক প্রকার প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দের অনিত্যত্ব যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে ঐ নিত্য ধর্ম অনিত্যত্ব শব্দকে কিরূপে অনিত্য করিবে? বাহা স্বয়ং নিত্য, তাহা অপরকে অনিত্য করিতে পারে না। রক্তবর্ণ জ্বাপুপ্পের সম্বন্ধবশতঃ স্ফটিক মণি রক্ত হইতে পারে, কিন্তু নীল হইতে পারে না। যদি বল, ঐ অনিত্যত্বও অনিত্য, সুতরাং উহার সম্বন্ধবশতঃই শব্দ অনিত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে যেমন রক্তজ্বাপুপ্পের সম্বন্ধবশতঃ স্ফটিক মণিতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়, তদ্রূপ, ঐ অনিত্যত্বের সম্বন্ধবশতঃ শব্দ অনিত্য, এইরূপ ভ্রম হয়, ইহা স্বীকার্য। কারণ, অত্র পদার্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত যে জ্ঞান, তাহা ভ্রমই হইয়া থাকে। আর যদি তদাকার বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ তদাকারত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ঘটাকার দ্রব্যের সম্বন্ধ হইলে তৎপ্রযুক্ত পটেরও ঘটত্বাপত্তি হয়। পরন্তু অনিত্য বস্তু কি অপর অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধপ্রযুক্ত অনিত্য অথবা স্বভাবতঃই অনিত্য। প্রথম পক্ষে অনবস্থাদোষ। কারণ, সেই অপর অনিত্য বস্তুও অপর অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধপ্রযুক্ত অনিত্য, এইরূপই বলিতে হইবে। স্বভাবতঃই অনিত্য, এই দ্বিতীয় পক্ষে ঘটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব হইতে পারে না। কারণ, অনিত্যত্ব ঘটাদির স্বভাব বলা যায় না। কারণ, নিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। উহা অভাব পদার্থ। উহা ঘটাদি দ্রব্যের স্বভাব বলিলে তাহাতে ভাবরূপ দ্রব্যত্বের ব্যাঘাত হয়। এইরূপ কোন বাদী “শব্দো নিত্যঃ” এইরূপ প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দ যে নিত্যত্বের সম্বন্ধবশতঃ নিত্য, ঐ নিত্যত্ব শব্দ হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? ভিন্ন বলিলে ভিন্নত্ব ধর্মের সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, ইহা বক্তব্য। সেই ভিন্নত্ব ধর্মও অপর ভিন্নত্ব ধর্মের সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, এইরূপ বলিতে হইবে। সুতরাং অনবস্থাদোষ। নিত্যত্ব ধর্মকে শব্দ হইতে অভিন্ন, ইহা বলিলে ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে একটা মাত্রই পদার্থ, ইহা স্বীকার্য। তন্মধ্যে নিত্যত্বধর্ম মাত্রই স্বীকার করিলে শব্দরূপ ধর্মী না থাকায় উক্ত অনুমানে আশ্রয়সিদ্ধি দোষ। আর যদি ধর্মী শব্দ মাত্রই স্বীকার্য হয়, অর্থাৎ নিত্যত্ব ধর্মই না থাকে, তাহা হইলে সাধ্য ধর্মের অভাববশতঃ বাধদোষ। এইরূপ “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্ব কি শব্দে উৎপন্ন হয়? অথবা উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন হইলেও উহা কি শব্দের সহিত উৎপন্ন হয় অথবা শব্দের পূর্বে অথবা শব্দের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়? শব্দরূপ কারণ পূর্বে না থাকায় শব্দের সহিত অথবা শব্দের পূর্বেই তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না। শব্দের পরে তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন হয়, এই তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলে অনিত্যত্বের উৎপত্তির পূর্বে শব্দের নিত্যতা স্বীকার্য। তাহা হইলে আর উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করা যায় না। আর যদি ঐ অনিত্যত্বের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও শব্দের নিত্যতা স্বীকার্য। কারণ, তাহা হইলে শব্দও উৎপন্ন হয় না, উহাও সর্বদা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ বাদী “ঘটঃ” এই বাক্যের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটত্বের সম্বন্ধবশতঃই ঘট। কিন্তু ঐ ঘটত্ব কি নিত্য অথবা অনিত্য? নিত্য হইলে

নিত্যধর্মের আশ্রয় বলিয়া ঘটও নিত্য হটক ? অনিত্য হইলে উহার জাতিত্ব বাধাত হয় । কারণ, ঘটাদি জাতি নিত্য, ইহাই সিদ্ধান্ত । বরদরাজ এই সমস্ত প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, “ইত্যাদি সূত্রতাৎপর্যার্থঃ” ।

“সর্বদর্শনসংগ্রহঃ” পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে মাধবাচার্য্যও মাধবমতের ব্যাখ্যায় এই “নিত্যসমা” জাতির উল্লেখ করিয়া, উদয়নাচার্য্যের মতানুসারেই ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন । তিনি সেখানে বরদরাজের “তর্কিকরক্ষা”র কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, পরে উদয়নাচার্য্যের “প্রবোধসিদ্ধি”র সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারেই জাতির ত্রিবিধ ছষ্টত্বমূল প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং জাতিত্ব বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারমূলক মতই যে পরে অত্র সম্প্রদায়ও গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য । অশ্রোত্তরং ।

অনুবাদ । এই “নিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর ।

সূত্র । প্রতিষেধে নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে-
নিত্যত্বোপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ ॥৩৬॥৪৯৭॥

অনুবাদ । প্রতিষেধ্য পদার্থে সর্বদা “অনিত্যভাব” অর্থাৎ অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হওয়ায় প্রতিষেধ হয় না ।

ভাষ্য । প্রতিষেধে শব্দে নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবাদিত্যুচ্যমানেন্নুজ্জাতং শব্দস্যানিত্যত্বং । অনিত্যত্বোপপত্তেঃ নানিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিষেধো নোপপদ্যতে । অথ নাভ্যুপগম্যতে নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবাদিতি হেতুর্ন ভবতীতি হেতুভাবাৎ প্রতিষেধানুপপত্তিরিতি ।

উৎপন্নস্য নিরোধাদভাবঃ শব্দস্যানিত্যত্বং, তত্র পরি-
প্রশ্নানুপপত্তিঃ । সোহয়ং প্রশ্নঃ, তদনিত্যত্বং কিং শব্দে সর্বদা ভবতি ?
অথ নেত্যানুপপন্নঃ । কস্মাৎ ? উৎপন্নস্য যো নিরোধাদভাবঃ শব্দস্য
তদনিত্যত্বম্ । এবঞ্চ সত্যধিকরণাধেয়-বিভাগো ব্যাঘাতান্নাস্তীতি । নিত্য-
নিত্যত্ববিরোধোচ্চ । নিত্যত্বমনিত্যত্বঞ্চ একস্য ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাবিতি
বিরুদ্ধ্যেতে ন সম্ভবতঃ । তত্র যদুক্তং নিত্যমনিত্যত্বস্য ভাবান্নিত্য এব,
তদবর্ত্তমানার্থমুক্তমিতি ।

অনুবাদ । প্রতিষেধ্য শব্দে অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য শব্দে সর্বদা অনিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত, এই কথা বলিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐ হেতু বলিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হয় । অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুক্তই ‘শব্দ অনিত্য নহে’ এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না । আর যদি স্বীকৃত না হয় অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি শব্দে সর্বদা অনিত্যত্বের সত্তা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সর্বদা অনিত্যত্বের সত্তা—এই হেতু নাই, সুতরাং হেতুর অভাববশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না ।

উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত অভাব অনিত্যত্ব । তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উপপত্তি হয় না । বিশদার্থ এই যে, সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্বদা থাকে অথবা সর্বদা থাকে না ? এইরূপ সেই এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত যে অভাব অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তির পরে উহার ধ্বংস হওয়ায় উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা (শব্দের) অনিত্যত্ব । এইরূপ হইলে ব্যাঘাতবশতঃ আধারাধেয় বিভাগ নাই । [অর্থাৎ শব্দের অভাব বা ধ্বংসই যখন উহার অনিত্যত্ব, তখন শব্দ ঐ অনিত্যত্বের আধার হইতে পারে না, সুতরাং ঐ অনিত্যত্বও শব্দে আধেয় হইতে পারে না । কারণ, শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব যখন জন্মে, তখন শব্দই থাকে না । অতএব পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না] ।

নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধপ্রযুক্তও (পূর্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না) । বিশদার্থ এই যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একই ধর্ম্মীর ধর্ম্মবয়, ইহা বিরুদ্ধ হয়, সম্ভব হয় না অর্থাৎ একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া থাকিতে পারে না । তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে—‘সর্বদা অনিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত (শব্দ) নিত্যই,’ তাহা অবর্ত্তমানার্থ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ কথার অর্থ অবর্ত্তমান বা অসৎ অর্থাৎ উহার কোন অর্থই নাই ।

টীপনী । পূর্বনৃত্তোক্ত “নিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই নৃত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধ হয় না । অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে শব্দ অনিত্য নহে, এইরূপ যে প্রতিষেধ প্রতিবাদীর অভিমত, তাহা উপপন্ন হয় না । কেন হয় না ? তাই প্রথমে বলিয়াছেন, “প্রতিষেধো নিত্যানিত্যত্বাবাৎ” । উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্দই বাদীর সাধ্যধর্ম্মা । সুতরাং অনিত্যত্বরূপে শব্দই প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য ধর্ম্মা । তাই ঐ তাৎপর্য্যে নৃত্তে উক্ত স্থলে শব্দই “প্রতিষেধ্য” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য শব্দে নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই অনিত্যত্ব (অনিত্যত্ব) থাকিলে উক্ত প্রতিষেধ কেন উপপন্ন হয় না ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি

পরে বলিয়াছেন,—“অনিত্যোহনিত্যত্বোপপত্তেঃ”। অর্থাৎ তাহা হইলে অনিত্য শব্দে অনিত্যত্বের উপপত্তি অর্থাৎ স্বীকারপ্রযুক্ত উক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে মহর্ষি ঐ বাক্যের দ্বারা অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের উপপত্তিই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে শব্দে সর্বদা অনিত্যত্ব আছে, ইহাই হেতু বলিলে শব্দের অনিত্যত্ব তাঁহার স্বীকৃতই হয়। সুতরাং তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। আর যদি প্রতিবাদী শব্দে সর্বদা অনিত্যত্ব আছে, ইহা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ঐ হেতু তাঁহার মতেও নাই। সুতরাং হেতুর অভাববশতঃও তাঁহার ঐ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি তাঁহার ঐ হেতু স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার ‘শব্দ অনিত্য নহে’, এই প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হয়; আর যদি ঐ প্রতিজ্ঞা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ হেতু ব্যাহত হয়। ফল কথা, প্রতিবাদীর ঐ উক্তর উক্তরূপে স্বব্যবহৃতক হওয়ায় উহা সম্ভব নহে, উহা জাত্যন্তর। বরদ্বার প্রভৃতি কেহ কেহ এই সূত্রে “অনিত্যোহনিত্যত্বোপপত্তেঃ” এইরূপই পাঠ গ্রহণ করিয়া, অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদীর কৃত যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না, এইরূপেই সূত্রের ঐ শৈবোক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে উক্ত ব্যাখ্যাস্তরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে নিজ স্বতন্ত্রভাবে উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, শব্দে অনিত্যত্ব কি সর্বদাই থাকে অথবা সর্বদাই থাকে না? এইরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। কারণ, শব্দের উৎপত্তির পরে তাহার নিরোধ অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়, তাহাই শব্দের অনিত্যত্ব। অর্থাৎ উৎপত্তির পরে শব্দের ধ্বংসনামক অভাবই উহার অনিত্যত্ব। তাহা হইলে শব্দ ও অনিত্যত্বের আধারাধেয়ভাবই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দের ধ্বংসের সহিত শব্দের প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধবশতঃই শব্দের ধ্বংস বা শব্দের অনিত্যত্ব, এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু একই সময়ে শব্দ ও উহার ধ্বংসের সম্ভা ব্যাহত বা বিরুদ্ধ বলিয়া, ঐ উভয়ের আধারাধেয়-ভাব সম্ভবই হয় না। প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন কালীন পদার্থের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের ধ্বংসরূপ যে অনিত্যত্ব, তাহা শব্দে বর্তমানই না থাকায় উহা কি শব্দে সর্বদা বর্তমান থাকে অথবা সর্বদা বর্তমান থাকে না, এইরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। যাহা শব্দে বর্তমানই থাকে না, শব্দ যাহার আধারই নহে, তদ্বিষয়ে ঐরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অনিত্যত্ব, নিরোধ ও ধ্বংসভাব একই পদার্থ। অনিত্যত্বপ্রযুক্ত অভাব, ইহা যে বলা হয়, উহা ব্যবহার মাত্র। শব্দের পক্ষে সেই অনিত্যত্ব শব্দে থাকে না, অর্থাৎ শব্দ উহার আধার নহে। শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব উহার প্রতিযোগি শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। বস্তুতঃ শব্দের আধার আকাশই উহার ধ্বংসের আধার। ভাষ্যকার পরে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধবশতঃও পূর্বোক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, একই ধর্ম্মাভে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা সম্ভব হয়

না। সূত্ৰাৎ শব্দক নিত্য বলিলে অনিত্য বলা যাইবে না। অনিত্য বলিলেও নিত্য বলা যাইবে না। সূত্ৰাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, শব্দে সৰ্বদাই অনিত্য থাকিলে তৎপ্রযুক্ত শব্দ নিত্যই হয়, এই কথাই কোন অৰ্থ নাই। কারণ, শব্দে সৰ্বদা অনিত্য থাকিলে তাহার নিত্য অসম্ভব। যাহা অসম্ভব, তাহা কোন বাক্যার্থ হইতে পারে না। প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমিও একই শব্দের নিত্য ও অনিত্য স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তুমি শব্দ অনিত্য, এই কথা বলায় তোমার পক্ষেই শব্দের নিত্যত্বপন্থি প্রকাশ করিয়া উক্ত বিরোধদোষ প্রদৰ্শনই আমার উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত উদ্যোতক বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথিত ঐ দোষ বাদীর পক্ষ-দোষও নহে, হেতু-দোষও নহে। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ উদ্ভাবন করেন নাই। তবে তিনি বিরোধ-দোষের উদ্ভাবন করিলে তাহার উত্তর পূৰ্বেই কথিত হইয়াছে। সে উত্তর এই যে, তাঁহার পূৰ্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ উক্ত স্থলে আরও যে প্রত্যবস্থান প্রদৰ্শন করিয়া উহাকেও “নিত্যসম” জাতি বলিয়াছেন, এই সূত্ৰের দ্বারা তাহারও উত্তর সূচিত হইয়াছে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন এবং সংক্ষেপে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। যেমন প্রতিবাদী যখন বাদীকে বলিবেন যে, তোমার এই বাক্য অথবা হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অসাধক, তখন প্রতিবাদীর ত্রায় বাদীও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অসাধকত্ববিশিষ্ট হইলে তাহাকে অসাধক বলে। কিন্তু ঐ অসাধকত্ব কি তদাকার অথবা তদাকার নহে? এবং উহা কি ধৰ্ম্মী হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? অথবা উহা কি কার্য্য অথবা অকার্য্য; কার্য্য হইলে উহা কোন্ সময়ে জন্মে ইত্যাদি। ফল কথা, প্রতিবাদীর নিজের পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তিনিও উহার কোন পক্ষই সমৰ্গন করিতে না পারিয়া নিরস্ত হইবেন। সৰ্ব্বত্র ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিভাব স্বীকার না করিলে তাঁহারও হেতু ও সাধ্য থাকিবে না। উহা স্বীকার করিলেও প্রতিবাদীর ঐ সমস্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হইবে না। সৰ্ব্বত্র প্রতিবাদীর অভিমত হেতুতে তাঁহার সাধাধৰ্ম্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাজহানি প্রযুক্তও তাঁহার ঐ সমস্ত উত্তর সহজ হইতে পারে না। সাধারণ ছুট্‌ত্বমূল স্বব্যাবাহিকত্ব সৰ্ব্বত্রই আছে ॥৩৭॥

নিত্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৭॥

সূত্র । প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ ॥৩৭॥৪৯৮॥

অনুবাদ । প্রযত্নকার্য্যের অনেকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রযত্নসম্পাদ্য পদার্থের নানা-বিধত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) কার্য্যসম প্রতিষেধ ।

ভাষ্য । প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি । যন্ত প্রযত্ন-নন্তরমাত্মলাভস্তৎ খল্বভূত্বা ভবতি, যথা ঘটাদিকার্য্যং । অনিত্যমিতি চ ভূত্বা ন ভবতীত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে । এবমবস্থিতে প্রযত্নকার্য্যানেকত্বা-

দিতি প্রতিষেধ উচ্যতে । প্রযত্নানন্তরমাত্মলাভঃ চ দৃষ্টো ঘটাদীনাম্ ।
ব্যবধানাপোহাচ্চাভিব্যক্তিরব্যবহিতানাম্ । তৎ কিং প্রযত্নানন্তরমাত্মলাভঃ
শব্দস্বাহোহভিব্যক্তিরিতি বিশেষো নাস্তি । কার্য্যাবিশেষেণ প্রত্যবস্থানং
কার্য্যসমঃ ।

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যেহেতু (শব্দে) প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব আছে । প্রযত্নের
অনন্তর যে বস্তুর আত্মলাভ হয়, তাহা (পূর্বে) বিদ্যমান না থাকিয়া জন্মে, যেমন
ঘটাদি কার্য্য । “অনিত্য” এই শব্দের দ্বারাও উৎপন্ন হইয়া থাকে না অর্থাৎ
বিনষ্ট হয়, ইহা বুঝা যায় । এইরূপে (বাদী) অবস্থিত হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে
হেতু ও উদাহরণাদি প্রদর্শনপূর্বক বাদী শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে
(প্রতিবাদী কর্তৃক) প্রযত্নকার্য্যের অনেকত্ব, এই হেতুপ্রযুক্ত প্রতিষেধ কথিত
হয় । যথা—প্রযত্নের অনন্তর ঘটাদি কার্য্যের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিও দৃষ্ট
হয় । ব্যবধানের অপোহ অর্থাৎ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণপ্রযুক্ত ব্যবহিত পদার্থ-
সমূহের অভিব্যক্তিও দৃষ্ট হয় । তবে কি প্রযত্নের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ
(উৎপত্তি) হয় ? অথবা অভিব্যক্তি (উপলব্ধি) হয় ? ইহাতে বিশেষ নাই,
[অর্থাৎ প্রযত্নদ্বারা পূর্বে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা যেমন বলা হইতেছে,
তদ্রূপ, প্রযত্নদ্বারা বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি । শব্দে
এমন কোন বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক ধর্ম্ম নাই, যদ্বারা উহা প্রযত্নদ্বারা উৎপন্নই হয়,
ইহা নির্ণয় করা যায়] কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) কার্য্যসম
প্রতিষেধ ।

টিপ্পনী । মহর্ষি এই শ্লোক দ্বারা “কার্য্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । ইহাই তাঁহার
কথিত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে সর্বশেষোক্ত চতুর্বিংশ জাতি । পূর্ববৎ এই শ্লোকেও
“প্রত্যবস্থানং” এই পদের অনুবর্ত্তি বা অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত । প্রথমে বাদী যে নিজপক্ষ
স্থাপন করেন, তাহাকে বলে বাদীর অবস্থান । পরে প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ বা উত্তর,
তাহাকে বলে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান । বাদী প্রথমে কিরূপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ নিজপক্ষ
স্থাপনরূপ অবস্থান করিলে প্রতিবাদী এই শ্লোকোক্ত প্রতিষেধ বলেন, অর্থাৎ কিরূপ স্থলে
এই “কার্য্যসম” জাতির প্রয়োগ হয়, ইহা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ভাষ্যকার উক্ত প্রতিষেধের স্বরূপ
বাস্তব করিয়াছেন । বাদী প্রথমে “অনিত্যঃ শব্দঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করিয়া পরে
“প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিলেন । পরে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে
বলিলেন যে, প্রযত্নের অনন্তর যে বস্তুর আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্বে বিদ্যমান না
থাকিয়া জন্মে, যেমন ঘটাদি কার্য্য । অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য পূর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না ।

কর্তার প্রযত্নজন্য পূর্বে অসৎ বা অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং শব্দও যখন প্রযত্নের অনন্তর উৎপন্ন হয়, তখন উহাও উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থাকে না। প্রযত্নজন্য অবিদ্যমান শব্দেরই উৎপত্তি হয়। অতএব শব্দ অনিত্য। যাহা উৎপন্ন হইয়া চিরকাল থাকে না অর্থাৎ কোন কালে বিনষ্ট হয়, ইহাই অনিত্য শব্দের অর্থ। উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংসই তাহার অনিত্যত্ব, ইহা পূর্বসূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। বাদী উক্তরূপে “প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব” হেতু ও ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বরূপ নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কুস্তকার প্রভৃতি কর্তার প্রযত্নবিশেষের অনন্তর অর্থাৎ উজ্জ্বল অবিদ্যমান ঘটাদি কার্যের উৎপত্তি দেখা যায়। কিন্তু প্রযত্নবিশেষপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে বিদ্যমান ব্যবহৃত পদার্থের অভিব্যক্তিও দেখা যায় অর্থাৎ উহাও স্বীকার্য। যেমন ভূগর্ভে জলাদি বহু পদার্থ বিদ্যমানই আছে ; কিন্তু মৃত্তিকার দ্বারা ব্যবহৃত বা আচ্ছাদিত থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। মৃত্তিকারূপ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ করিলে তখন ঐ সমস্ত বিদ্যমান পদার্থেরই অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রযত্নকার্য্য অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ কাহারও প্রযত্ন ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, তাহা অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার। কারণ, তন্মধ্যে কোন পদার্থ পূর্বে বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু কর্তার প্রযত্নবিশেষজন্য তাহার উৎপত্তি হয় এবং কোন পদার্থ পূর্বে বিদ্যমানই থাকে,—কিন্তু প্রযত্নবিশেষজন্য ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে তখন তাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং বস্তুর প্রযত্নবিশেষপ্রযুক্ত বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। প্রযত্নের অনন্তর কি ঘটাদি কার্যের ত্রায় অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয় অথবা ভূগর্ভস্থ জলাদির ত্রায় বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। অর্থাৎ শব্দে এমন কোন বিশেষ বা বিশেষক ধর্ম নাই, যদ্বারা অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, এই পক্ষেরই নির্ণয় করা যায়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে বলে “কার্য্যাসম” প্রতিষেধ বা “কার্য্যাসমা” জাতি। ভাষ্যকার উক্তরূপে ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, কার্য্যের অবিশেষপ্রযুক্ত ঐরূপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহার নাম “কার্য্যাসম”। তাৎপর্য্য এই যে, সূত্রে “প্রযত্নকার্য্য” শব্দের দ্বারা প্রযত্ন ব্যতীত যাহার প্রকাশ হয় না, সেই সমস্ত পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, এবং “অনেকত্ব” শব্দের দ্বারা অনেক-প্রকারত্বই মহর্ষির বিবক্ষিত। অর্থাৎ প্রযত্ন ব্যতীত যে সমস্ত পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ হয় না, তন্মধ্যে অবিদ্যমান বহু পদার্থের উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বহু পদার্থের অভিব্যক্তি, এই উভয় প্রকারই আছে। সুতরাং প্রযত্নকার্য্য পদার্থগুলি অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার, এক প্রকার নহে। তন্মধ্যে ভূগর্ভস্থ জলাদি পদার্থরূপ যে সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ প্রযত্নকার্য্য, তাহার সহিত শব্দের কোন বিশেষ প্রমাণ নিক না হওয়ায় অবিশেষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী শব্দে ঐ সমস্ত প্রযত্নকার্য্যের সাম্য সমর্থন করিয়া উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করায় উহার নাম “কার্য্যাসম”।

তাৎপর্য্যটীকাকার উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীর হেতু যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব, তাহা কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি অথবা প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধি।

প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি বলিলে ঐ হেতু অসিদ্ধ। কারণ, প্রকল্পজ্ঞ যে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহা নির্ণীত বা সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধিই বাদীর হেতু পদার্থ, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু বিদ্যমান পদার্থেরও যখন প্রযত্নজ্ঞ অভিযুক্তি হইয়া থাকে, তখন শব্দ যে ঐরূপ বিদ্যমান পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত না হইলে বাদীর ঐ হেতুর দ্বারা শব্দ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষাকারও এখানে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তি হয়? অথবা অভিযুক্তি হয়? এইরূপ সংশয় ব্যক্ত করিয়া প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। “শ্রামজ্ঞা”কার জয়ন্ত ভট্টও এখানে প্রতিবাদীর উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিতে শব্দ উক্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত “সংশয়সমা” জাতি হইতে এই “কার্য্যসমা” জাতির বিশেষ কি? এতদ্বত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, “সংশয়সমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্যবিশেষের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন। কিন্তু এই “কার্য্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু পদার্থের বিকল্প করিয়া অর্থাৎ প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি অথবা অভিযুক্তি, এইরূপ বিকল্প করিয়া উহার নিরূপণ দ্বারা প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তি হয়? অথবা অভিযুক্তি হয়? এইরূপ সংশয় সমর্থন করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত “সংশয়সমা” জাতি হইতে এই “কার্য্যসমা” জাতির বিশেষ আছে। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্বই বাদীর অভিমত হেতু। কিন্তু প্রতিবাদী উহা অসিদ্ধ বলিয়া প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধিকেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া উক্ত হেতুতে “অনৈকান্তিকত্ব” দোষের উদ্ভাবন করেন। উক্তরূপ স্থলেই প্রতিবাদীর ঐরূপ প্রত্যবস্থানকে “কার্য্যসমা” প্রতিষেধ বলা হইয়াছে। উদ্যোতকর ইহা বক্ত করিয়া বলিয়াছেন। তিনি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর “অনৈকান্তিকদেশনা”র উল্লেখ করিয়া উহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা অনৈকান্তিক, অর্থাৎ বাদীর সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্বের ব্যতিকারী। কারণ, প্রযত্নের অনন্তর যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা অনিত্য ও নিত্য, এই দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। বিদ্যমান অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর যদি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্বই বাদীর হেতু পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা শব্দে অসিদ্ধ। সুতরাং উহার দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই পক্ষে বাদীর হেতুতে প্রতিবাদীর অসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনকে উদ্যোতকর বলিয়াছেন—“অসিদ্ধদেশনা”। উদ্যোতকর পরে পূর্বোক্ত “সাধর্ম্ম্যসমা” ও “সংশয়সমা” জাতি হইতে এই “কার্য্যসমা” জাতির ভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, উভয় পদার্থের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত “সংশয়সমা” জাতির প্রয়োগ হয়। এই “কার্য্যসমা” জাতি ঐরূপ নহে। এবং বাদীর যাহা অভিমত হেতু নহে, তাহাই বাদীর অভিমত হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া এই “কার্য্যসমা” জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত “সাধর্ম্ম্যসমা” জাতির ঐরূপে প্রয়োগ হয় না। বস্তুতঃ “সংশয়সমা” জাতিরও ঐরূপে প্রয়োগ হয় না।

মহানৈমিত্তিক উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যাসূত্রে “ভাষিকরক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু অথবা পক্ষ অথবা দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থের অসিদ্ধতা প্রকাশ করিয়া পরে নিজে উহার সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহাতেও ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহার পূর্বোক্ত হেতু প্রভৃতির অসিদ্ধতা সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেই স্থলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “কার্য্যাসম” প্রতিষেধ। যেমন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে কার্য্যত্ব অসিদ্ধ। উহার সাধক হেতু যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব, তাহাও উহার ব্যভিচারী। কারণ, ভূগর্ভস্থ জলাদিতে প্রযত্নের অনন্তর অস্তিত্ব ব্যক্তি আছে। তাহাতে কার্য্যত্ব অর্থাৎ প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিমত্ব নাই। সুতরাং শব্দে ঐ কার্য্যত্ব হেতুর কোন অব্যভিচারী সাধক না থাকায় উহা অসিদ্ধ। এইরূপ বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘটকে অনিত্যত্বরূপে অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদী যদি ঐ অনিত্যত্বের সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহাতে অনিত্যত্বের ব্যভিচার সমর্থন করিয়া, ঐ পক্ষ এবং দৃষ্টান্তেরও অসিদ্ধি সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরও সেখানে “কার্য্যাসম” প্রতিষেধ হইবে। মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা উক্তরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায়? ইহা বুঝাইতে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, সূত্রে “প্রযত্নকার্য্য” শব্দের দ্বারা যাহা প্রযত্নের কার্য্য অর্থাৎ বিষয় হয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হয় অথবা গ্রাহ্য বলিয়া প্রযত্নের বিষয় হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উহার দ্বারা বাদীর হেতুর ত্রায় পক্ষ ও দৃষ্টান্তও বুঝা যাইবে। সর্বত্র বাস্তব সত্তা ও অসত্তাই ঐ সমস্ত পদার্থের অনেকত্ব। অথবা পূর্বোক্ত স্থলে জন্তুত্ব ও বাজ্যত্বরূপ নানাত্বই উহার অনেকত্ব। সেই অনেকত্ব-প্রযুক্ত ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “কার্য্যাসম” প্রতিষেধ, ইহাই সূত্রার্থ।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমে সূত্রোক্ত “প্রযত্নকার্য্য” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রযত্নসম্পাদ্য, এবং “অনেকত্ব” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন অনেকবিষয়ত্ব। কিন্তু পরে তিনি অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রযত্নরূপ যে কার্য্য অর্থাৎ কর্তব্য যে সমস্ত প্রযত্ন, তাহার অনেকত্ব অর্থাৎ অনেকপ্রকারত্ববশতঃ যে সমস্ত প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে “কার্য্যাসম”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত জাতি ভিন্ন আরও যে নানাপ্রকার স্বব্যাপাতক উত্তর হয়, তাহাকেই মহর্ষি সর্বশেষে “কার্য্যাসম” নামক প্রতিষেধ বলিয়াছেন। জিগীষু প্রতিবাদী বাদীকে নিরস্ত করিতে আরও অনেক প্রকারে প্রযত্ন করেন। সুতরাং তাঁহার ঐ বিষয়ে প্রযত্নের অনেকপ্রকারত্ববশতঃ আরও অনেক প্রকার জাত্যুত্তর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। মহর্ষি সেই সমস্ত না বলিলে তাঁহার ব্যক্তব্যের নুনতা হয়। সুতরাং তাঁহার এই সূত্রের উক্তরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহাই বৃত্তিকারের শেষে উক্তরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যার মূলযুক্তি। বৃত্তিকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সূত্রোক্ত জাতি “আকৃতিগণ”। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ইহার সমানাকার বা তুল্য অনেক জাতি, যাহা মহর্ষির অগ্রাণু সূত্রে উক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত জাতিও সংগৃহীত হইয়াছে। বৃত্তিকার ইহার উদাহরণস্বরূপে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যেখানে বাদীর

পক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিয়া বলেন যে, তোমার পক্ষেও কোন দোষ থাকিতে পারে। তোমার পক্ষে যে কোন দোষই নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকায় সর্বদা উহার শঙ্কা বা সন্দেহ থাকিবেই। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরকে বৃত্তিকার বলিয়াছেন,—“শিশাচী-সমা” জাতি। যেমন শিশাচীর প্রদর্শন করিতে না পারিলেও অনেকে উহার শঙ্কা করে, তদ্রূপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিলেও উহার শঙ্কা করায় উক্তরূপ জাতির নাম বলা হইয়াছে—“শিশাচীসমা”। বৃত্তিকার এইরূপ “অনুপকারসমা” ইত্যাদি নামেও অল্প জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত জাতিই মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। “জায়স্বত্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার নিজমত বুঝা যায় যে, মহর্ষির অনুক্ত আরও বহুপ্রকারে যে সমস্ত জাত্যন্তর হইতে পারে, তাহাও মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত অনুক্ত জাতির সামান্য নাম “কার্য্যসমা” এবং বিশেষ নাম “শিশাচীসমা”, “অনুপকারসমা” ইত্যাদি। অবশ্য বৃত্তিকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যায় অনুক্ত সর্বপ্রকার জাতিরই এই সূত্রের দ্বারা সংগ্রহ হয়। এবং প্রতিবাদী বাদীর হেতু প্রভৃতিতে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করিলে উদয়নাচার্য্য উহাকেও “প্রসঙ্গসমা” জাতি বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি তাহা না বলায় তাঁহাদিগের মতে উহা এই সূত্রোক্ত আকৃতিগণের অন্তর্ভুক্ত, ইহাও (পূর্ববর্তী নবম সূত্রের ব্যাখ্যায়) বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই সূত্রের উক্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা এই জাতিকে আকৃতিগণও বলেন নাই। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝাও যায় না। অত্যাশ্চর্য্য বহু প্রকারে অনেক জাত্যন্তর সম্ভব হইলেও সেই সমস্তেরই “কার্য্যসমা” এই নামকরণও সংগত হয় না। তাহা হইলে মহর্ষির পূর্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য জাত্যন্তরকেও “কার্য্যসমা” বলা যাইতে পারে। সুধীগণ প্রণিধান করিয়া এই সমস্ত কথা চিন্তা করিবেন।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ এই “কার্য্যসমা” জাতির অগ্ররূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদরাজ সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পরে “বৌদ্ধাস্ত” বলিয়া যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্য-টীকাকার “কীর্ত্তিরপাহ” বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার অগ্ররূপও কেবল “কীর্ত্তি” বলিয়া প্রথ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যেন উহার বহু কীর্ত্তি স্বীকার করিলেও উহাকে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সে বাহাই হউক, ধর্ম্মকীর্ত্তি যে গ্রন্থে উক্ত কারিকাটি বলিয়াছেন, তাহা এখন আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার “জায়বিন্দু” গ্রন্থের সর্বশেষে তিনি সংক্ষেপে জাতির স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত জাতির বিভাগ ও বিশেষলক্ষণাদি বলেন নাই। উক্ত কারিকার দ্বারা তাঁহার সমস্ত “কার্য্যসমা”

প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝা যায় যে, সাধাধর্ম অনিত্যত্বের সহিত অনুরূপ অর্থাৎ ব্যাপ্তিবশতঃ কার্য্য সামান্য অর্থাৎ সামান্যতঃ কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিলে প্রতিবাদী যদি ঐ কার্য্যত্ব হেতুর সম্বন্ধি-ভেদপ্রযুক্ত ভেদ বলিয়া ঐ হেতু পক্ষে নাই অর্থাৎ উহা পক্ষে অসিদ্ধ, এইরূপ দোষ বলেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তরের নাম “কার্য্যসম” প্রতিষেধ। যেমন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের যে কার্য্যত্ব, তাহা অন্তরূপ অর্থাৎ যুক্তিকা ও দণ্ডদিপ্রযুক্ত। কিন্তু শব্দের যে কার্য্যত্ব, তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ব্যাপ্তিপ্রযুক্ত। সুতরাং উক্ত স্থলে কার্য্যত্বের সম্বন্ধি যে ঘট ও শব্দ, তাহার ভেদপ্রযুক্ত কার্য্যত্ব ভিন্ন। অর্থাৎ ঘটে যে কার্য্যত্ব আছে, তাহা শব্দে নাই। সুতরাং ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যে কার্য্যত্বকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা শব্দে না থাকায় উহা স্বরূপাসিদ্ধ। পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। সুতরাং উক্ত কার্য্যত্বহেতু শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হয় না। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থানই উক্ত স্থলে “কার্য্যসম” প্রতিষেধ। তাৎপর্য্য-টীকাকার প্রথমে এইরূপে উক্ত মতের প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত মতপ্রতিপাদক একটি কারিকার পূর্ব্বাঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—“তৎকার্য্যসমমিতি ভদন্তেনোক্তং”। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির কারিকাও উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদি “কার্য্যসমা” জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মকীর্ত্তি যে আমাদিগের জৈবরসাধক অনুমানের (ক্ষিতিঃ সাকর্ষকা কার্য্যত্বাৎ) খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যত্ব হেতুর ভেদ সমর্থন করিয়া দোষ বলিয়াছেন, উহাও তাঁহার এই কার্য্যসমা জাতি, অর্থাৎ উহাও তাঁহার জাতান্তর, সহস্র নহে, ইহা তাঁহার নিজেরই স্বীকার্য্য হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার পরে কার্য্যত্ব হেতুর স্বরূপ যে অভিন্ন, সর্ব্বত্রই উহা একরূপ, ইহাও প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে চরমকথা বলিয়াছেন যে, যদি “কার্য্যসমা” জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত “উৎকর্ষসমা” ও “অপকর্ষসমা” জাতি হইতে উহার ভেদ থাকে না। সুতরাং মহর্ষি গৌতমোক্ত “কার্য্যসমা” জাতিই অসংকীর্ণ অর্থাৎ অন্যান্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া উহাই গ্রাহ্য। “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজও এইরূপ বলিয়া এবং উহা বুঝাইয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বাহ্যভাষ্যে এখানে তাঁহাদিগের কথা সংক্ষেপেই লিখিত হইল ॥৩৭॥

ভাষ্য। অশ্রোতরং।

অনুবাদ। এই “কার্য্যসম” প্রতিষেধের উত্তর।

সূত্র। কার্য্যাত্মত্বে প্রযত্নাহেতুত্বমনুপলঙ্কি-
কারণোপপত্তেঃ ॥৩৮॥৪৯৯॥

অনুবাদ। কার্য্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য বা জন্তু পদার্থ না হইয়া
অভিব্যক্ত্য পদার্থ হইলে (শব্দের অভিব্যক্তিতে) অনুপলঙ্কি-কারণের অর্থাৎ

অনুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত প্রযত্নের হেতু নাই। [অর্থাৎ যে পদার্থের অনুপলব্ধির প্রয়োজক কোন আবরণ থাকে, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত প্রযত্ন আবশ্যক হয়। সুতরাং সেখানে উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের যে হেতু, তাহা উহার অনুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণ না থাকায় উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্ন হেতু হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের উৎপত্তিই হয়, তাহাতেই প্রযত্ন হেতু।]

ভাষ্য। সতি কার্য্যানুত্ত্রে অনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ প্রযত্নস্বাহেতুত্বং শব্দশ্চাভিব্যক্তৌ। যত্র প্রযত্নানন্তরমভিব্যক্তিস্তত্রানুপলব্ধিকারণং ব্যবধান-
মুপপদ্যতে। ব্যবধানাপোহাচ্চ প্রযত্নানন্তরভাবিনোহর্থশ্চোপলব্ধিলক্ষণাহ-
ভিব্যক্তির্ভবতীতি। নতু শব্দশ্চানুপলব্ধিকারণং কিছুপপদ্যতে।
যস্মৈ প্রযত্নানন্তরমপোহাচ্ছব্দশ্চোপলব্ধিলক্ষণাহভিব্যক্তির্ভবতীতি। তস্মা-
দুৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। কার্যের তেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য বা জ্ঞান পদার্থ না হইলে অনুপলব্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনুপলব্ধিপ্রয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের হেতু নাই। (তাৎপর্য) যে পদার্থ বিষয়ে প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলব্ধিপ্রয়োজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে। কারণ, ব্যবধানের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্নের অনন্তরভাবী অর্থাৎ প্রযত্নব্যক্ত পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের অনুপলব্ধিপ্রয়োজক কিছু অর্থাৎ কোন আবরণ নাই, যাহার প্রযত্নের অনন্তর অর্থাৎ প্রযত্নজ্ঞান অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। অতএব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না।

টিপ্পনো। মহর্ষি এই সূত্রদ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত “কার্যাসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া জাতি নিরূপণ সমাপ্ত করিয়াছেন। “কার্য্যানুত্ত” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় কার্যভিন্নত্ব। কার্য শব্দের অর্থ এখানে জ্ঞান পদার্থ। সুতরাং যাহা জ্ঞান নহে, কিন্তু ব্যক্ত, তাহাকে কার্য্যানু বলা যায়। পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর মতে শব্দ প্রযত্নজ্ঞান, কিন্তু প্রতিবাদীর মতে উহা প্রযত্নব্যক্ত। অর্থাৎ বক্তার প্রযত্নবিশেষ দ্বারা বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না। সুতরাং প্রতিবাদীর মতে শব্দ কার্য্যানু। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কার্য্যানু থাকিলে অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া অভিব্যক্তিই স্বীকার করিলে শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্নের হেতু নাই অর্থাৎ উহাতে প্রযত্ন হেতু হইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিতে যে প্রযত্নের হেতু, তাহা

অনুপলব্ধির কারণের অর্থাৎ যে আবরণপ্রযুক্ত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, সেই আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণই না থাকায় আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত যে প্রযত্নের হেতু, তাহা শব্দের অভিব্যক্তিতে নাই। সুতরাং শব্দ প্রযত্নবাক্য, ইহা বলা যায় না। ভাষাকারের ব্যাখ্যামুসারে মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার উক্তরূপই তাৎপর্য বুঝা যায়। ভাষাকার পরে এই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে প্রযত্নজ্ঞাত অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলব্ধিপ্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে। কারণ, সেই আবরণের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্নবাক্য সেই পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্য এই যে, ঐরূপ স্থলে সেই আবরণের অপসারণের জন্যই প্রযত্ন আবশ্যক হয়। তাহার পরে সেই বিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রযত্ন হেতু হয়। যেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও মুক্তিকারূপ ব্যবধান বা আবরণবশতঃ উহার প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু প্রযত্নবিশেষের দ্বারা ঐ আবরণের অপসারণ করিলেই সেই বিদ্যমান জলাদি পদার্থের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রযত্ন হেতু হয়। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের ঐরূপ কোন আবরণ নাই, প্রযত্নবিশেষের দ্বারা যাহার অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তি হইবে। অতএব বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহা বলা যায় না। সুতরাং বক্তার প্রযত্নবিশেষজ্ঞাত বিদ্যমান শব্দের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্বীকার্য। ফলকথা, যেখানে পদার্থের কোন ব্যবধান বা আবরণ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, সেখানে প্রযত্নজ্ঞাত উহার অভিব্যক্তি সমর্থন করা যায় না। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের আবরণ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই।

তাৎপর্যটীকাকার এই সূত্রের তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “কার্য্যাত্ত্ব” হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্তিরূপ কার্য্য হইতে উৎপত্তিরূপ কার্য্যের ভেদ থাকায় অভিব্যক্তির প্রতি প্রযত্নের হেতু নাই। কেন হেতু নাই? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“অনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ”। মহর্ষির তাৎপর্য এই যে, অনুপলব্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনুপলব্ধিপ্রযোজক আবরণাদির সত্তা থাকিলেই তৎপ্রযুক্ত অভিব্যক্তির প্রতি প্রযত্নের হেতু হইতে পারে। কিন্তু শব্দের অনুপলব্ধি বা অশ্রবণের প্রযোজক কোন আবরণাদি নাই। তাৎপর্যটীকাকার মহর্ষির সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের পরে “প্রযত্নশ্রুতিব্যক্তিহেতুত্বং শ্রুতং” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া, ঐরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝা যায়। তিনি “সতি কার্য্যাত্ত্ব” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভেরও উক্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর্তব্য, ইহাও বলিয়াছেন এবং পরে ভাষ্যে “যত্র” ও “তত্র” শব্দের বিপরীত ভাবে যোজনা করিয়া “তত্র”

১। কার্য্যাত্ত্ব উৎপত্তিলক্ষণ অস্তিত্বভিব্যক্তিলক্ষণ কার্য্য প্রযত্নশ্রুতিব্যক্তি প্রত্যাহেতুত্বং। কস্মাদভিব্যক্তি প্রতি হেতুত্বং ন ভবতীত্যত আহ অনুপলব্ধিকারণশ্রবণাদেবোপপত্তেরভিব্যক্তিহেতুত্বং শ্রুতং, এবং নাতীতি ব্যতিরেকপরং জ্ঞেয়ং। “সতি কার্য্যাত্ত্ব” ইতি ভাষ্যং সূত্রবদ্যোজনীয়ং। “যত্র প্রযত্নানন্তর”মিত্যত্র “যত্রতত্রয়ো”বাচ্যাসঃ। তত্র প্রযত্নানন্তরমভিব্যক্তির্ভিন্নানুপলব্ধিকারণং ব্যবধানমুপপদ্যতে। কস্মাদনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ প্রযত্নশ্রুতিব্যক্তিমিত্যত আহ “ব্যবধানাপোহাচ্ছে”তি। চো হেতুর্থে। প্রযত্নানন্তরতাবিন ইতি বিষয়েণ বিবক্ষিতমুপলক্ষণমিতি ইত্যাদি। —তাৎপর্যটীকা।

অর্থাৎ সেই বিষয়ে প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়, যে বিষয়ে অনুপলক্ষিপ্ৰয়োজক আবরণ থাকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ঐরূপই তাৎপর্য হইলে তিনি প্রথমে “তত্র” না বলিয়া “যত্র” বলিবেন কেন? এবং তাঁহার উক্ত সন্দর্ভের ঐরূপ ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজনই বা কি? ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন। পরন্তু ভাষ্যকার তাৎপর্যটীকাকারের জ্ঞান সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের পরে উক্ত বাক্যের অধ্যাহার না করায় সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় তাঁহারও যে উক্তরূপই তাৎপর্য, ইহা কিরূপে বুঝিব, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় “শব্দজ্ঞাভিব্যক্তৌ” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। মহর্ষির বক্তব্যানুসারে উহা তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। কারণ, শব্দের আবরণ না থাকায় শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযত্নের হেতু নাই, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সূত্রে মহর্ষির নিবেদ্য যে প্রযত্ন হেতু, তাহা অনুপলক্ষিপ্ৰয়োজক আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত, ইহাই মহর্ষি পরে ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, প্রয়োজকের অভাববশতঃই প্রযোজ্য প্রযত্ন-হেতুত্বের অভাব সমর্থন করিয়াছেন। সূত্রে অনেক স্থলে ঐরূপ একদেশীয়ও সূত্রকারের অভিপ্রেত থাকে। সুতরাং ভাষ্যকার সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের পরে উহার সংগতির জ্ঞাত অথ কোন বাক্যের অধ্যাহার করেন নাই। জ্ঞানমঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট কিন্তু পূর্বোক্ত সূত্রপাঠ অসংগত বুঝিয়া ‘অনুপলক্ষিকারণানুপপত্তেঃ’ এইরূপই সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত পাঠে উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অনুপলক্ষিপ্ৰয়োজক আবরণাদির অনুপপত্তি অর্থাৎ অসম্ভাবশতঃ শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযত্নের হেতু নাই, এইরূপে সরল ভাবেই মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত হওয়ায় সরল ভাবেই সূত্রার্থ সংগত হয়। কিন্তু আর কেহই ঐরূপ সূত্রপাঠ গ্রহণ করেন নাই। “অনুপলক্ষিকারণোপপত্তেঃ” এইরূপ সূত্রপাঠই ভাষ্যকার প্রভৃতির পরিগৃহীত।

ফলকথা, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষের খণ্ডন দ্বারা উৎপত্তি পক্ষের সমর্থন করিয়া, পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু “প্রযত্নানন্তরীণকত্ব” যে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি,— অভিব্যক্তি নহে, এবং ঐ হেতু বাদীর গৃহীত সাধ্যধর্মী শব্দে সিদ্ধ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যভিচার দোষ খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, শব্দে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিম্বরূপ হেতু সিদ্ধ হওয়ায় উহাতে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ নাই। প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি বাদীর অভিমত হেতুই নহে, সুতরাং ব্যভিচারদোষের আপত্তিরও কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, বাদী যাহা হেতু বলেন নাই, তাহা কেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ করিয়া তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত হেতু ছষ্ট হয় না। পরন্তু প্রতিবাদী যদি ঐরূপ আরোপ করিয়াই ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি যে, পরে বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে হেতু বলিবেন, তাহাতেও ঐরূপ আরোপ করিয়া ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করা যাইবে। সুতরাং তাঁহার নিজের সেই হেতুরও ছষ্ট সিদ্ধ হইলে তিনি আর তদ্বারা বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার ঐ উক্ত স্বব্যাহতক হওয়ায় উহা সঙ্কট হইতেই পারে না। উহা জাত্যন্তর, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য। পূর্ববৎ স্বব্যাহতকত্বই এই “কার্য্যসমা” জ্ঞাতির সাধারণ ছষ্টমূল।

মহর্ষির শেখোক্ত এই “কার্য্যসমা” জাতি আকৃতিগণ, এই মতেও বৃত্তিকার বিখ্যাত এই শ্রুতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও প্রকৃতার্থ-ব্যাখ্যা বলিয়া বুঝা যায় না। তবে গৌতমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির আন্তর্গণিক ভেদ যে বহু প্রকারে সম্ভব হয় অর্থাৎ উহা অনন্ত প্রকার, ইহা উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণও বলিয়াছেন। সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও “সাধর্ম্ম্যসমা” প্রভৃতি জাতির প্রকার-ভেদ যে, অতি বহু, ইহা বলিয়া গিয়াছেন^১। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য গৌতমের শ্রুতের ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ সমস্ত জাতির বহু প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় যে জগতের মিথ্যা সমর্থন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিতে মাধব সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ঐ মিথ্যা কি মিথ্যা অথবা সত্য? জগতের মিথ্যা মিথ্যা হইলে জগতের সত্যত্বই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐ মিথ্যা সত্য হইলে ব্রহ্ম ও মিথ্যা, এই সত্যত্ব-স্বীকারে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়। এতদ্ব্যতীত উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারেই অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মাধব সম্প্রদায়ের ঐ উত্তরকে “নিত্যসমা” জাতি বলিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত মাধব সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ঐ উত্তর জাত্যন্তর নহে। কারণ, জাত্যন্তরের যে সমস্ত ছষ্টদ্বন্দ্বল, তাহা কিছুই উহাতে নাই। “সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে” মাধবমতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য মাধব সম্প্রদায়ের ঐ কথাও বলিয়াছেন। মাধবসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য মহানৈয়ায়িক ব্যাসভীষ্ম “শ্রীমদ্রামায়ণ” গ্রন্থে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। পরে অদ্বৈতবাদী মহানৈয়ায়িক মধুসূদন সরস্বতী “অদ্বৈতসিদ্ধি” গ্রন্থে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ বৃত্তিতে হইলে গৌতমোক্ত “জাতি”-তত্ত্বও সম্যক বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও অত্যাবশ্যকবশতঃ পূর্ব্বোক্ত “জাতি”তত্ত্বের বিশেষ চর্চা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্ত উক্ত বিষয়ে নানা মত ভেদও হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সমস্ত মত ও উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। অতঃপর “কথাভাসে”র কথা বলিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

কার্য্যসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৩॥

ভাষ্য। হেতোশ্চেনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে, অনৈকান্তিকত্বাদসাধকঃ
শ্রাদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদসাধকং^২—

অনুবাদ। যদি হেতুর অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকান্তিকত্ব

১। জাতয়ো দ্বয়গাভাসান্তাঃ সাধর্ম্ম্যসমাদয়ঃ।

তাসাং প্রপঞ্চো বহুধা ভূত্বাদিহ নোদিতঃ।—

ভামহপ্রণীত কাব্যালঙ্কার, ৫ম পঃ, ২২শ।

২। তদন্তঃ শ্রুতাবতারপরঃ ভাষ্য—“হেতোশ্চেনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে” প্রতিবাদিনা—“অনৈকান্তিকত্বা-
দসাধকঃ শ্রাদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদসাধকং” বাদিনো বচনং “প্রতিবেদ্যেহপি সমানোদোষঃ” ইত্যাদি তাৎপর্য্যসীকা।

(ব্যভিচারিণ) উপপাদন করেন, অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয় । কিন্তু যদি অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত (বাদীর বাক্য) অসাধক হয়, (তাহা হইলে)—

সূত্র । প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ ॥৩৯॥৫০০॥

অনুবাদ । প্রতিষেধেও (প্রতিষেধক ব্যাক্যেও) দোষ সমান, অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাত্যন্তররূপ প্রতিষেধবাক্যও অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয় ।

ভাষ্য । প্রতিষেধোহপ্যনৈকান্তিকঃ, কিঞ্চিৎ প্রতিষেধতি কিঞ্চিন্নেতি । অনৈকান্তিকত্বাদসাধক ইতি । অথবা শব্দস্থানিত্যত্বপক্ষে প্রযত্নানন্তর-মুৎপাদো নাভিব্যক্তিরিতি বিশেষহেতুভাবঃ । নিত্যত্বপক্ষেহপি প্রযত্নানন্তর-মভিব্যক্তির্নোৎপাদ ইতি বিশেষহেতুভাবঃ । সোহয়মুভয়পক্ষসমো বিশেষ-হেতুভাব ইত্যুভয়মপ্যনৈকান্তিকমিতি ।

অনুবাদ । “প্রতিষেধ”ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিক । (কারণ) কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না । অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক । [অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও বাদীর কথিত হেতু বা বাক্যের অসাধকত্ব সাধন করিতে পারে না । কারণ, ঐ বাক্য নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ না করায় সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক নহে । অতএব প্রতিষেধের পক্ষে উহা ঐকান্তিক হেতু নহে, উহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী ।]

অথবা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি, অভিব্যক্তি নহে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই । নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি, উৎপত্তি নহে, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই । সেই এই বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষে তুল্য, এ জন্য উভয়ই অর্থাৎ বাদীর বাক্যের ন্যায় প্রতিবাদীর বাক্যও অনৈকান্তিক ।

টিপ্পনী । মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির নিরূপণ করিয়া, পরে এই সূত্র হইতে ৫ সূত্রের দ্বারা “কথাভাস” প্রদর্শন করিয়াছেন । তাই শেষোক্ত এই প্রকরণের নাম “কথাভাস”-প্রকরণ । বাদী ও প্রতিবাদীর শ্রায়াভূত যে সমস্ত বিচারবাক্য তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা একত্বের জয়লাভের যোগ্য, তাহার নাম “কথা” । উহা “বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামে ত্রিবিধ (প্রথম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয়ও হয় না, একত্বের জয়লাভও হয় না, হইতেই পারে না, সেই স্থলে তাঁহাদিগের ঐ বিচারবাক্য “কথা” নহে, তাহাকে বলে “কথাভাস” । এই কথাভাসে বাদীর প্রথমোক্ত বাক্য হইতে ছয়টি পক্ষ হইতে পারে । এ জন্য, ইহার অপর নাম “ষট্‌পক্ষী” ।

“বধাৎ পক্ষাণাং সমাহারঃ” এই বিগ্রহবাক্যানুসারে “ষট্পক্ষী” শব্দের অর্থ ষট্পক্ষের সমাহার। বিরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর “ষট্পক্ষী”রূপ “কথাভাস” হয়, ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই শ্রুতের দ্বারা বাদীর বক্তব্য তৃতীয় পক্ষটী প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্বোক্ত কোন প্রকার জাত্যন্তর করেন, তাহা হইলে বাদী তখন সহস্রের দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে তাঁহার জয়লাভ হইবে, তত্ত্বনির্ণয়ও হইতে পারে। কিন্তু বাদীও যদি সহস্র করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিবাদীর শ্রায় জাত্যন্তরই করেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ফলদ্বয়ের মধ্যে কোন ফলই হইবে না। পরন্তু ঐরূপ স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে প্রতিবাদীর শ্রায় বাদীও নিগৃহীত হইবেন। স্মতরাং ঐরূপ বার্থ ও নিগ্রহজনক বিচার একেবারেই অকর্তব্য, ইহা উপদেশ করিবার জন্তই মহর্ষি গৌতম শিষ্যগণের হিতার্থ পরে এখানে পূর্বোক্ত “কথাভাস” বা “ষট্পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন^১।

প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিলে বাদী বিরূপে জাত্যন্তর করিতে পারেন? অর্থাৎ বাদী বিরূপ উত্তর করিলে তাঁহার জাত্যন্তর হইবে? মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে শ্রুত বলিয়াছেন, “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ।” অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীকে যদি বলেন যে, তোমার প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিকত্বদোষ তুলা, তাহা হইলে বাদীর ঐ উত্তর জাত্যন্তর হইবে। মহর্ষি এই শ্রুতের দ্বারা তাঁহার পূর্বোক্ত “কার্য্যসমা” জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদীর জাত্যন্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শব্দ অনিত্য পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই বাদীর হেতু বলিয়া সমর্থন করিয়া, তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যতিচারিত্ব দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে সেখানে বাদী মহর্ষির পূর্বশ্রুত সছত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ”—তাহা হইলে উহা বাদীর জাত্যন্তর হইবে। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ত এই শ্রুতের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকান্তিকত্ব উপপাদন করেন, তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত উহা অসাধক হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর হেতু অনিত্যরূপ সাধ্যধর্মের ব্যতিচারী হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না, স্মতরাং বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যও সেই বাক্যার্থের ব্যতিচারী হওয়ায় উহাও তাঁহার নিজ পক্ষের সাধক হয় না, ইহাই উক্ত স্থলে জাত্যন্তরবাদী প্রতিবাদীর কথা, উহাই তাহার প্রতিষেধক বাক্য এবং উহাই উক্ত বিচারে দ্বিতীয় পক্ষ। বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যই এখানে “পক্ষ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়া, পরে উক্ত স্থলে বাদীর জাত্যন্তররূপ তৃতীয় পক্ষের প্রকাশ করিতে “যদি অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্য অসাধক

১। সহস্রত্বং জাতীনামুচ্ছারে তত্ত্ব-নির্ণয়ঃ। জয়েত্তরব্যবহেতি সিধ্যোদেত্তৎ ফলদ্বয়ং।

পণ্ডসম্প্রদায়গত্যাঃ শ্রায়ন্তথা নিফলাঃ কথাঃ। ইতি দর্শয়িতুং শ্রুতৈঃ ষট্পক্ষীমাহ গৌতমঃ।

অসহস্ররূপা সা ত্রৈব্যা পরিশিষ্টতঃ।—তর্কিকরক্ষা।

হয়"—এই কথা বলিয়া এই শব্দের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীকে বলিতে পারেন যে, অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক হইলে তোমার পূর্বোক্ত যে প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও অসাধক। কারণ, উহাও ত অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা বাদীর বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবের সমর্থন করেন, এই অর্থে শব্দে "প্রতিষেধ" শব্দের অর্থ প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধক বাক্য। প্রতিবাদী উহাকে অনৈকান্তিক বলিবেন কিরূপে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদীর ঐ প্রতিষেধক বাক্য বাদীর হেতুর বা বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিলেও নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ করে না, ইহা প্রতিবাদীরও অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং বাদী তাহাকে বলিতে পারেন যে, তোমার ঐ বাক্য যখন নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক নহে, তখন উহা প্রতিষেধমাত্রের সাধক না হওয়ায় সামান্যতঃ প্রতিষেধের পক্ষে উহা অনৈকান্তিক। উহা যদি সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক হইত, তাহা হইলে অবশ্য উহা প্রতিষেধ-সাধনে ঐকান্তিক হেতু হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় উহাও অনৈকান্তিক, সুতরাং উহা বস্তুতঃ প্রতিষেধক বাক্যই নহে। অতএব উহা আমার হেতু বা বাক্যেরও সাধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে প্রকারান্তরে প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব প্রদর্শন করিতে অন্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অথবা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে যেমন বিশেষ হেতু নাই, তদ্রূপ নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী পূর্বোক্ত "প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব" হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলেন যে, প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে উৎপত্তি হয়, অভিব্যক্তি হয় না, ইহা অসিদ্ধ। কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা হয় নাই। উহার সাধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। সুতরাং তুল্যভাবে বাদীও পরে বলিতে পারেন যে, তোমার অভিমত যে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ, তাহাতে ত প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা হয় নাই। অতএব বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষেই তুল্য। সুতরাং আমার বাক্য অনৈকান্তিক হইলে তোমার বাক্যও অনৈকান্তিক হইবে। কারণ, তোমার প্রতিষেধক বাক্যও প্রযত্নের অনন্তর শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষেরই সাধন করিতে পারে না। কারণ, শব্দের উৎপত্তি পক্ষেও প্রযত্নের সাফল্য উপপন্ন হয়। শব্দের উৎপত্তি সাধনে আমি যেমন কোন বিশেষ হেতু বলি নাই, তদ্রূপ তুমিও শব্দের অভিব্যক্তি-সাধনে কোন বিশেষ হেতু বল নাই। সুতরাং তোমার কথিত যুক্তি অনুসারে আমার বাক্য ও তোমার বাক্য, এই উভয়ই অনৈকান্তিক, ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারের চরম ব্যাখ্যায় মহর্ষির এই শব্দের উক্তরূপই তাৎপর্য্য। ফলকথা, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উত্তরের স্থায় বাদীর উক্তরূপী উত্তরও জাত্যন্তর ৩৯৮

সূত্র । সর্বত্রৈবং ॥৪০॥৫০১॥

অনুবাদ । সর্বত্র অর্থাৎ “সাধর্ম্যাসমা” প্রভৃতি সর্বপ্রকার জাতি স্থলেই এইরূপ অর্থাৎ বাদীর পূর্বোক্ত উত্তরের তুল্য অসহ্যের সম্ভব হয় ।

ভাষ্য । সর্বত্রৈব “সাধর্ম্যাসমা” প্রভৃতিষু প্রতিষেধহেতুযু যত্রাবিশেষো দৃশ্যতে তত্রোভয়োঃ পক্ষয়োঃ সমঃ প্রসজ্যত ইতি ।

অনুবাদ । “সাধর্ম্যাসমা” প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষেধহেতুতে অর্থাৎ সর্বপ্রকার জাত্যন্তর স্থলেই যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, সেই বিষয়ে উভয় পক্ষে তুল্য অবিশেষ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ বাদী যে অবিশেষ দেখেন, সেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করেন ।

টিপ্পনী । প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল কি পূর্বোক্ত “কার্যাদমা” জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী উক্তরূপে জাত্যন্তর করিলে “কথাভাস” হয় ? অতঃ কোন জাতির প্রয়োগস্থলে উহা হয় না ? তাই মহর্ষি পরে এখানেই এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী পূর্ববৎ কোন প্রকার জাত্যন্তর করিতে পারেন । সুতরাং সর্বত্রই উক্তরূপে “কথাভাস” হয় । প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিলে বাদী যে সর্বত্রই পূর্বোক্ত স্থলের ত্রায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে । কারণ, সর্বত্র উহা সম্ভব হয় না । তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “এবং” শব্দের অভিমতার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিলে বাদী সেখানে যে বিষয়ে যে অবিশেষ বুঝেন, সেখানে সেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া জাত্যন্তর করেন । যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বাক্যে নিজবাক্যের সহিত অনৈকান্তিকত্বরূপ অবিশেষ বুঝিয়াই তুল্যভাবে উহারই আপত্তি প্রকাশ করেন । এইরূপ অতঃ জাতির প্রয়োগস্থলে অন্তরূপ অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন । ফলকথা, প্রতিবাদীর জাত্যন্তরের পরে বাদীও জাত্যন্তর করিলে সর্বত্রই কথাভাস হয়, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য । যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ কার্যাদ্ভাবটবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, যদি ঘটের সাধর্ম্য কার্যাদ্ভাবপ্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের সাধর্ম্য অমূর্ত্তত্বপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য হউক ? উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ উত্তর জাত্যন্তর, উহার নাম “সাধর্ম্যাসমা” জাতি । মহর্ষি গোতম পূর্বোক্ত তৃতীয় সূত্রের দ্বারা উক্ত জাতির যে সহ্যের বলিয়াছেন, তদ্বারাই উহার খণ্ডন করা বাদীর কর্তব্য । কিন্তু বাদীর ঐ সহ্যের ক্ষুণ্ণি না হইলে তিনি যদি পরাজয়-ভয়ে নীরব না থাকিয়া বলেন যে, শব্দ যদি আকাশের সাধর্ম্য অমূর্ত্তত্বপ্রযুক্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দ আকাশের ত্রায় বিভূও হউক ? উক্ত স্থলে বাদীর ঐ উত্তরও জাত্যন্তর । উক্ত স্থলে বাদী শব্দ

অবিদ্যমান ধর্ম বিভূত্বের আপত্তি প্রকাশ করার তাঁহার ঐ উত্তরের নাম “উৎকর্ষণমা” জাতি । সুতরাং উক্ত স্থলেও “কথাভাস” হইবে । এইরূপ উক্ত স্থলে এবং অগ্রাণ্ড স্থলে বাদী আরও অনেক প্রকার জাতান্তর করিতে পারেন এবং পূর্ববৎ ঘটপক্ষীও হইতে পারে । সুতরাং সেই সমস্ত স্থলেও “কথাভাস” হইবে । “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ ইহার অগ্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি ঐ স্থত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত “ঘটপক্ষী”রূপ কথাভাস প্রদর্শন করিয়া, তাহার পরেই তাঁহার বলা উচিত । তিনি “ঘটপক্ষী” প্রদর্শন করিতে তৃতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়াই মধ্যে এই স্থত্রটি বলিয়াছেন কেন ? এতদ্বারা বুদ্ধিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, “ত্রিপক্ষী” প্রভৃতি সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি এখানেই এই স্থত্রটি বলিয়াছেন । অর্থাৎ কোন স্থলে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ বাদীর পূর্বোক্তরূপ জাতান্তরের পরে প্রতিবাদী আর কোন উত্তর করিতে অসমর্থ হইলে সেখানেই বিচারের সমাপ্তি হইবে । তাহা হইলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর ঐ পর্য্যস্ত বিচারবাক্যও “কথাভাস” হইবে, উহার নাম “ত্রিপক্ষী” । আর যদি প্রতিবাদী ঐ স্থলে আবার পূর্ববৎ কোন জাতান্তর করেন এবং বাদী তাহার কোন প্রকার উত্তর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সেখানেই ঐ বিচারের সমাপ্তি হওয়ায় ঐ পর্য্যস্ত বিচার বাক্যও “কথাভাস” হইবে, উহার নাম “চতুপক্ষী” । এইরূপে বাদীর বাক্য হইতে ক্রমশঃ ঘটপক্ষ পর্য্যস্ত হইতে পারে । তাই মহর্ষি পরে ক্রমশঃ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পক্ষের প্রকাশ করিয়া “ঘটপক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন । ষষ্ঠ পক্ষের পরে মধ্যস্থগণ আর ঐরূপ ব্যর্থ বিচার শ্রবণ করেন না । তাঁহারা তখন নিজের উদ্ভাব্য নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিয়া বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই পরাজয় ঘোষণা করেন । সেখানেই ঐ কথাভাসের সমাপ্তি হয় । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৪০॥

সূত্র । প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধ-

দোষবদোষঃ ॥৪১॥৫০২॥

অনুবাদ । প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ “প্রতিষেধে”র সম্বন্ধে বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ যে প্রতিষেধ, তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের আয় দোষ । (অর্থাৎ বাদীর ঐ তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যও অনৈকান্তিক । প্রতিবাদী পুনর্ব্বার এইরূপ উত্তর করিলে উহা উক্ত স্থলে চতুর্থ পক্ষ) ।

ভাষ্য । যোহয়ং প্রতিষেধেহপি সমানো দোষোহনৈকান্তিকত্ব-
মাপাদ্যতে সোহয়ং প্রতিষেধস্ত প্রতিষেধেহপি সমানঃ ।

তত্রানিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাদিত্যে সাধনবাদিনঃ স্থাপনা

প্রথমঃ পক্ষঃ । প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসম ইতি দূষণবাদিনঃ প্রতিষেধহেতুনা দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ । স চ প্রতিষেধ ইত্যুচ্যতে । তস্মাচ্চ প্রতিষেধেহপি সমানো দোষ ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো বিপ্রতিষেধ উচ্যতে । তস্মিন্ প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেহপি সমানো দোষোহ-
নৈকান্তিকত্বং চতুর্থঃ পক্ষঃ ।

অনুবাদ । এই যে, “প্রতিষেধে”ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব (বাদী কর্তৃক) আপাদিত হইতেছে, সেই এই দোষ প্রতিষেধের প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিষেধক বাদীর বাক্যেও সমান । অর্থাৎ বাদীর অভিমত যুক্তি অনুসারে তাঁহার নিজবাক্যও অনৈকান্তিক । সেই স্থলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ “কথাভাস” স্থলে (১) “অনিত্যঃ শব্দঃ প্রগল্ভানন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সাধনবাদীর স্থাপনা অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক “অনিত্যঃ শব্দঃ” ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রথম পক্ষ । (২) “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ” এই (৩৭শ) সূত্রোক্ত প্রতিষেধহেতুর দ্বারা (“কার্য্যসম” নামক জাত্যন্তরের দ্বারা) দূষণবাদীর (প্রতিবাদীর) দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যন্তররূপ বাক্যই ঐ স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ । তাহাই “প্রতিষেধ” ইহা কথিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যন্তরই এই সূত্রে “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । (৩) “প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ” এই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ঐ সূত্রোক্ত বাদীর প্রতিষেধক বাক্য, সেই ইহার অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রতিবাদীর বাক্যরূপ দ্বিতীয় পক্ষের “বিপ্রতিষেধ” উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই সূত্রে “বিপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত বাদীর বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে । (৪) সেই প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধেও অর্থাৎ বাদীর ঐ বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষেও সমান দোষ অনৈকান্তিকত্ব, অর্থাৎ প্রতিবাদীর এইরূপ বাক্য চতুর্থ পক্ষ ।

টিপ্পনী । পূর্বস্বত্বের দ্বারা বাদীর যে উত্তর কথিত হইয়াছে, তদন্তরে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমার প্রতিষেধের যে বিপ্রতিষেধ আপনি বলিতেছেন, তাহাতেও ঐ প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ অর্থাৎ অনৈকান্তিকত্বদোষ । তাৎপর্য্য এই যে, আমার প্রতিষেধক বাক্য যেমন নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে উহা ঐকান্তিক নহে—অনৈকান্তিক, ইহা আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে তদ্রূপ আপনার ঐ প্রতিষেধক বাক্যও নিজের স্বরূপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে ঐকান্তিক নহে; সুতরাং অনৈকান্তিক, ইহাও স্বীকার্য্য । সুতরাং উক্ত বাক্যের দ্বারাও আপনি আমার বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না । মহর্ষি এই স্বত্বের

দ্বারা উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত “কথাভাগ” স্থলে প্রতিবাদীর এই উত্তরই চতুর্থ পক্ষ। সূত্রে “প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত জাতান্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। পরে “বিপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা বাদীর পূর্বোক্ত জাতান্তররূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। প্রতিবাদী তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের ত্রায় দোষ অর্থাৎ অনৈকান্তিকত্বদোষ, ইহা বলিলে তাঁহার ঐ উত্তর হইবে চতুর্থ পক্ষ। সর্বোপায়ে বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক “অনিত্যঃ শব্দঃ” ইত্যাদি ত্রায়বাক্য প্রথম পক্ষ। ভাষ্যকার পরে এখানে যথাক্রমে ঐ পক্ষচতুষ্টয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন ॥৪:॥

**সূত্র । প্রতিষেধঃ সদোষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতি-
ষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥৪২॥৫০৩॥**

অনুবাদ । প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রতিবাদী তাঁহার পূর্ব-
কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ “প্রতিষেধ”কে বাদীর কথানুসারে অনৈকান্তিক বলিয়া স্বীকার
করিয়াই প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাৎ বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক
বাক্যেও তুল্য দোষপ্রসঙ্গ “মতানুজ্ঞা ।” (অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে নিজ পক্ষে
অনৈকান্তিকত্ব দোষ স্বীকার করিয়া বাদীর পক্ষেও ঐ দোষের প্রসঙ্গন বা আপত্তি
প্রকাশ করায় তাঁহার “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান হয় । উক্ত স্থলে পরে বাদীর
এইরূপ উত্তর পঞ্চম পক্ষ) ।

ভাষ্য । “প্রতিষেধঃ” দ্বিতীয় পক্ষঃ “সদোষমভ্যুপেত্য” তদ্বন্ধার-
মকৃত্বানুজ্ঞায় “প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে” তৃতীয়পক্ষে সমানমনৈকান্তিকত্ব-
মিতি সমানং দূষণং প্রসজ্যতে। দূষণবাদিনো মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি
পঞ্চমঃ পক্ষঃ ।

অনুবাদ । প্রতিষেধকে (অর্থাৎ) দ্বিতীয় পক্ষকে সদোষ স্বীকার করিয়া
(অর্থাৎ) তাহার উদ্ভার না করিয়া, মানিয়া লইয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে (অর্থাৎ)
তৃতীয় পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব সমান, এইরূপে তুল্য দূষণপ্রসঙ্গনকারী অর্থাৎ বাদীর
কথিত তৃতীয় পক্ষও অনৈকান্তিক, এইরূপ আপত্তিপ্রকাশকারী দূষণবাদীর
(প্রতিবাদীর) “মতানুজ্ঞা” প্রসক্ত হয়, ইহা পঞ্চম পক্ষ ।

টিপ্পনী । পূর্বসূত্রের দ্বারা প্রতিবাদীর যে উত্তর (চতুর্থ পক্ষ) কথিত হইয়াছে, তদন্তরে
বাদীর যাহা বক্তব্য (পঞ্চম পক্ষ), তাহা এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সূত্রে “প্রতিষেধ”
শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাতান্তররূপ প্রতিষেধক বাক্য। “প্রতিষেধ-

বিপ্রতিষেধ” শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ” এই (৩৯শ) সূত্রোক্ত বাদীর উত্তরবাক্য। বাদী ঐ তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক বাক্যে প্রতিবাদীর গ্রাহ্য যে অনৈকান্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, প্রতিবাদী উহার খণ্ডন না করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়াই বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ উত্তরবাক্যেও তুল্যভাবে ঐ দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, ইহাই ঐ স্থলে বাদীর বক্তব্য পঞ্চম পক্ষ। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় আক্ষিকে “স্বপক্ষে দোষাত্মাপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা” এই (২০শ) সূত্রের দ্বারা মহর্ষি “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থানের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। তদনুসারেই এখানে মহর্ষি বাদীর পূর্বোক্তরূপ উত্তর (পঞ্চম পক্ষ) প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদী মধ্যস্থগণের নিকটে বলিবেন যে, আমি প্রতিবাদীর পক্ষেও যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছি, তাহা তিনি খণ্ডন করেন নাই। তিনি ঐ দোষ খণ্ডনে সমর্থ হইলে অবশ্যই তাহা করিতেন। সুতরাং তিনি যে তাঁহার পক্ষেও ঐ দোষ স্বীকার করিয়াই তুল্যভাবে আমার পক্ষেও ঐ দোষ বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বীকার্য্য। সুতরাং তাঁহার পক্ষে “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তাঁহার নিগ্রহ স্বীকার্য্য। জয়ন্ত ভট্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি অপরকে চোর বলিলে, সেই অপর ব্যক্তি যে চোর নহেন, ইহাই তাঁহার প্রতিপন্ন করা কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া যদি সেই ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমিও চোর, তাহা হইলে তাঁহার নিজের চোরত্ব স্বীকৃতই হয়। সুতরাং সে স্থলে তিনি অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার নিজ পক্ষে বাদীর কথিত দোষ খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া, উহা মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তুল্যভাবে ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় তিনি নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে ঐ নিগ্রহস্থানের নাম “মতানুজ্ঞা” ইহা মনে রাখিতে হইবে ॥৪২॥

সূত্র । স্বপক্ষ-লক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতু-নির্দেশে পরপক্ষদোষাত্ম্যপগমাৎ সমানো দোষঃ ॥

॥৪৩॥৫০৪॥

অনুবাদ । “স্বপক্ষলক্ষণে”র অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত নিজপক্ষ হইতে উদ্ভিত দোষের (প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষোক্ত দোষের) “অপেক্ষা”প্রযুক্ত অর্থাৎ সেই দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, “উপপত্তি”প্রযুক্ত “উপসংহার” করিলে অর্থাৎ “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ” এই কথা বলিয়া বাদী প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষ প্রদর্শন করিলে এবং হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ উক্ত উপসংহারে অনৈকান্তিকত্ব হেতু বলিলে পরপক্ষের দোষের স্বীকারবশতঃ

অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, নিজ পক্ষেও তাহা স্বীকার করায় সমান দোষ। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাদীর পক্ষেও “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হয়। প্রতিবাদীর এই উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ)।

ভাষ্য। স্থাপনাপক্ষে প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাদিতি দোষঃ স্থাপনা-
হেতুবাদিনঃ স্বপক্ষলক্ষণো ভবতি। কস্মাৎ? স্বপক্ষসমুৎপত্তাৎ।
সোহয়ং স্বপক্ষলক্ষণং দোষমপেক্ষমাণোহনুকৃত্যানুজ্ঞায় প্রতি-
ষেধেহপি সমানো দোষ ইত্যুপপদ্যমানং দোষং পরপক্ষে
উপসংহরতি। ইথঞ্চানৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি হেতুং
নির্দিশতি। তত্র স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষয়োপপদ্যমানদোষোপসংহারে
হেতুনির্দেশে চ সত্যেনৈব পরপক্ষদোষোহভ্যুপগতো ভবতি।
কথং কৃত্বা? যঃ পরেণ প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাদিত্যাদিনাহনৈকান্তিক-
দোষ উক্তস্তমনুকৃত্য প্রতিষেধেহপি সমানো দোষ ইত্যাহ।
এবং স্থাপনাং সদোষামভ্যুপেত্য প্রতিষেধেহপি সমানং দোষং প্রসজ্জয়তঃ
পরপক্ষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষো ভবতি। যথাপরশ্চ প্রতিষেধং
সদোষামভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেহপি সমানো দোষপ্রসঙ্গে
মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি তথাহিঅপি স্থাপনাং সদোষামভ্যুপেত্য
প্রতিষেধেহপি সমানং দোষং প্রসজ্জয়তো মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি।
স খল্বয়ং ষষ্ঠঃ পক্ষঃ।

তত্র খলু স্থাপনাহেতুবাদিনঃ প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম-পক্ষাঃ। প্রতিষেধ-
হেতুবাদিনো দ্বিতীয়-চতুর্থ-দ্বিষ্ঠ-পক্ষাঃ। তেনাং সাধবসাধুতারাং মীমাংস-
মানায়াং চতুর্থবিষ্ঠয়োরর্থাবিশেষাৎ পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। চতুর্থপক্ষে সমান-
দোষত্বং পরস্ফোচ্যতে প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষ-
বদদোষ ইতি। যষ্ঠেহপি পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো
দোষ ইতি সমানদোষত্বমেবোচ্যতে, নার্থবিশেষঃ কশ্চিদস্তি। সমান-
তৃতীয়পঞ্চময়োঃ পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ। তৃতীয়পক্ষেহপি প্রতিষেধেহপি
সমানো দোষ ইতি সমানত্বমভ্যুপগম্যতে। পঞ্চমপক্ষেহপি

প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দোষ প্রসঙ্গেহত্য়াপগম্যতে ।
নার্থবিশেষঃ কশ্চিছুচ্যত ইতি । তত্র পঞ্চমষষ্ঠপক্ষয়োর্থাবিশেষাৎ
পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ । তৃতীয়-চতুর্থয়োর্মতানুজ্ঞা । প্রথমদ্বিতীয়য়োর্বিশেষ-
হেতুভাব ইতি যট্ পক্ষ্যামুভয়োরসিদ্ধিঃ ।

কদা যট্ পক্ষী ? যদা প্রতিষেধেহপি সমানো দোষ ইত্যেবং
প্রবর্ততে । তদোভয়োঃ পক্ষয়োঃসিদ্ধিঃ । যদা তু কার্য্যানুত্রে প্রযত্না-
হেতুত্বমনুপলক্ষিকারণোপপত্তিরিত্যনেন তৃতীয়পক্ষো যুজ্যতে, তদা
বিশেষহেতুবচনাৎ প্রযত্নানন্তরমাত্মলাভঃ শব্দস্য নাভিব্যক্তিরিতি সিদ্ধঃ
প্রথমপক্ষো ন যট্ পক্ষী প্রবর্তত ইতি ।

ইতি শ্রীবাৎসর্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চমাধ্যায়স্তাদ্যমাহ্নিকম্ ॥

অনুবাদ । “স্থাপনাপক্ষে” (বাদীর কথিত প্রথম পক্ষে) “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ”
ইত্যাদি সূত্রোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষ, স্থাপনার
হেতুবাদীর (প্রথমে নিজপক্ষস্থাপনকারী বাদীর) “স্বপক্ষলক্ষণ” হয় । (প্রশ্ন)
কেন ? (উত্তর) যে হেতু স্বপক্ষ হইতে সমুৎখিত হয় । (অর্থাৎ বাদী পক্ষ স্থাপন
করিলেই প্রতিবাদী বাদীর ঐ স্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দোষের আপত্তি প্রকাশ
করায় ঐ স্বপক্ষ হইতেই উক্ত দোষের উৎখিত হয় । সুতরাং ঐ তাৎপর্য্যে সূত্রে
“স্বপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর কথিত ঐ দোষই গৃহীত হইয়াছে) । সেই
এই বাদী “স্বপক্ষলক্ষণ” দোষকে অপেক্ষা করতঃ (অর্থাৎ) উদ্ধার না করিয়া স্বীকার
করিয়া “প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ” এই বাক্যের দ্বারা উপপদ্যমান দোষকে
পরপক্ষে অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে উপসংহার করিতেছেন । এইরূপই প্রতিষেধ অর্থাৎ
প্রতিষেধক বাক্য অনৈকান্তিক, এই হেতু নির্দেশ করিতেছেন । “স্বপক্ষলক্ষণে”র
অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্বোক্ত দোষের অপেক্ষা (স্বীকার) প্রযুক্ত সেই উপ-
পদ্যমান দোষের উপসংহার এবং হেতুর নির্দেশ হইলে এই বাদী কত্ৰক পরপক্ষের
দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে তাঁহার নিজের কথিত দোষ সীকৃত হয় । (প্রশ্ন)
কেমন করিয়া ? (উত্তর) পরকত্ৰক অর্থাৎ প্রতিবাদী কত্ৰক “প্রযত্নকার্য্যা-
নেকত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে অনৈকান্তিকত্বদোষ উক্ত হইয়াছে, সেই দোষকে
উদ্ধার না করিয়া (বাদী) “প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ” ইহা বলিয়াছেন । এইরূপ

ইহিলে স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজ পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষ-প্রসঙ্গনকারীর (বাদীর) পর-পক্ষ স্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। (তাৎপর্য) যেমন প্রতিষেধকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধেও তুল্যদোষপ্রসঙ্গরূপ “মতানুজ্ঞা” পরের অর্থাৎ প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়, তদ্রূপ স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজের পক্ষস্থাপক বাক্যকে সদোষ স্বীকার করিয়া প্রতিষেধেও (প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও) তুল্য দোষপ্রসঙ্গনকারী এই বাদীর সম্বন্ধেও “মতানুজ্ঞা” প্রসঙ্গ হয়। সেই ইহা ষষ্ঠ পক্ষ অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ।

তন্মধ্যে (পূর্বোক্ত ষট্‌পক্ষের মধ্যে) স্থাপনার হেতুবাদীর অর্থাৎ প্রথমে নিজ পক্ষস্থাপক বাদীর—প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ। প্রতিষেধ-হেতুবাদীর অর্থাৎ জাত্যন্তরবাদী প্রতিবাদীর দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ। সেই ষট্‌পক্ষের সাধুতা ও অসাধুতা মীমাংসামান ইহিলে চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষের অর্থের অবিশেষপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দোষের প্রসঙ্গ হয়। (কারণ) চতুর্থ পক্ষে “প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধের দোষের ত্রায় দোষ” এই বাক্যের দ্বারা (প্রতিবাদী কর্তৃক) পরের অর্থাৎ বাদীর সম্বন্ধে সমানদোষত্ব কথিত হইতেছে। ষষ্ঠ পক্ষেও “পরপক্ষ-দোষের স্বীকারবশতঃ সমান দোষ,” এই বাক্যের দ্বারা সমানদোষত্বই কথিত হইতেছে, কোন অর্থবিশেষ নাই। তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষপ্রসঙ্গ সমান। (কারণ) তৃতীয় পক্ষেও “প্রতিষেধেও দোষ তুল্য” এই বাক্যের দ্বারা সমানত্ব স্বীকৃত হইতেছে। পঞ্চম পক্ষেও প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে সমান-দোষ-প্রসঙ্গ স্বীকৃত হইতেছে। কোন অর্থ বিশেষ কথিত হইতেছে না। তন্মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পক্ষেরও অর্থের অবিশেষপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দোষ-প্রসঙ্গ। তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষে মতানুজ্ঞা। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব, এ জন্ম ষট্‌পক্ষী স্থলে উভয়ের অসিদ্ধি, অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পক্ষসিদ্ধি হয় না।

(প্রশ্ন) কোন্ সময়ে ষট্‌পক্ষী হয়? (উত্তর) যে সময়ে “প্রতিষেধেও সমান দোষ” এইরূপ উত্তর প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাদীও ঐরূপ জাত্যন্তর করেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু যে সময়ে “কার্য্যাত্তে প্রযত্নাহেতুত্ব-মনুপলক্ষিকারণোপপত্তেঃ” এই (৩৮শ) সূত্রের দ্বারা অর্থাৎ মহর্ষির ঐ সূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয় অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর জাত্যন্তর খণ্ডন করিতে

তৃতীয় পক্ষে ঐ সূত্রোক্ত সত্ত্বত্তরই বলেন, সেই সময়ে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হইয়া যায়। (সূত্রাং) “ষট্‌পক্ষী” প্রবৃত্ত হয় না।

শ্রীবাৎশ্রায়নপ্রণীত শ্রায়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিক সমাপ্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি শেষে এই শব্দের দ্বারা উক্ত “কথাভাস” স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ষষ্ঠ পক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“পরপক্ষদোষাত্ম্যপগমাৎ সমানো দোষঃ”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা এই যে, আমি বাদীর পক্ষে যে দোষ বলিয়াছি, বাদীও আমার শ্রায় ঐ দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া, আমার পক্ষেও আবার ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় সমান দোষ। অর্থাৎ আমার নায় বাদীর পক্ষেও “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তিনিও নিগৃহীত হইবেন। উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীর কথিত দোষ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব? ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি শব্দের প্রথমে বলিয়াছেন,—“স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতুনির্দেশে।” স্বপক্ষ বলিতে এখানে বাদীর পক্ষ, অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি স্থাপনাবাক্য। বাদী ঐ স্বপক্ষ বলিলে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি (৩৭শ) সূত্রোক্ত জাত্যন্তরের দ্বারা বাদীর হেতু এবং স্বপক্ষরূপ বাক্য যে অনৈকান্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, তাহাই ভাষ্যকারের মতে শব্দে “স্বপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পূর্বাচার্য্যগণ বিষয় অর্থেও “লক্ষণ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে স্বপক্ষ বাহার লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়, ইহা “স্বপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। সূত্রাং স্বপক্ষকে বিষয় করিয়াই যে দোষের উত্থান হয় অর্থাৎ বাদী প্রথমে স্বপক্ষ না বলিলে প্রতিবাদী যে দোষ বলিতেই পারেন না, এই তাৎপর্য্যে উক্ত দোষকে “স্বপক্ষলক্ষণ” বলা যায়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“স্বপক্ষসমুৎপত্তাৎ।” জয়ন্ত ভট্টও লিখিয়াছেন,—“তল্লক্ষণস্তৎসমুৎথান-স্তদ্বিষয়ঃ।” কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, বরদরাজ এবং বর্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর জাত্যন্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষকেই সূত্রোক্ত “স্বপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত “স্বপক্ষলক্ষণে”র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের

১। স্বপক্ষলক্ষণ লক্ষ্যতে তদুৎথানত্বজ্ঞাতিঃ স্বপক্ষলক্ষণা অনৈকান্তিকত্বোদ্যতাবনলক্ষণা, তামভূতপেতা, অনুদ্ধূতা, প্রতিষেধেপি জাতিলক্ষণে সমানোহনৈকান্তিকত্বদোষ ইত্যুপপদ্যমানঃ স্বপক্ষেহপি দোষঃ পরপক্ষে জাতিবাদিপক্ষে সাধনবাহ্যুপসংহারতি, তত্র চানৈকান্তিকং হেতুং ক্রান্তে ইত্যাদি তাৎপর্য্যটীকা। স্বপক্ষো মূলসাধনবাহ্যুক্তঃ প্রযত্নানন্ত-রীয়কত্বানিত্যঃ শব্দ ইতি। তল্লক্ষণস্তৎসমুৎথানস্তদ্বিষয়ঃ “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বা”দিত্তি প্রতিষেধঃ। তমপেক্ষমাণ-স্তমমুচ্ছ্যত্যানুজ্ঞায় প্রবৃত্তঃ “প্রতিষেধেপি সমানো দোষ” ইত্যুপপদ্যমানঃ পরপক্ষেহনৈকান্তিকত্বদোষোপসংহারস্তত্চ হেতুনির্দেশ ইত্যননৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি—শ্রায়দর্শনী।

“স্ব”শব্দেন বাদী নির্দিষ্টতে। তন্ত পক্ষঃ স্থাপনা, তৎ লক্ষ্যকৃত্য প্রবৃত্তো দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ স্বপক্ষলক্ষণঃ, তস্তাপেক্ষা-ইত্যুপগমঃ। ততঃ পরপক্ষেহপ্যুপপত্ত্যুপসংহারে “প্রতিষেধেপি সমানো দোষ” ইতি পরাপাদিতদোষোপসংহারে এবাদ্বাদিত্তি হেতুনির্দেশে চ ক্রিয়মাণে সমানো মতানুজ্ঞাদোষ ইতি।—তार्কিকরক্ষা।

অথবা তাঁহার কথিত ঐ জাত্যন্তররূপ দ্বিতীয় পক্ষের যে অপেক্ষা অর্থাৎ স্বীকার, তাহাই “স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষা”। ভাষ্যকার “অনুদ্ব্যুত অমুজ্জায়” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রোক্ত “অপেক্ষা” শব্দের স্বীকার অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। বরদরাজ উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে অপেক্ষা শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সমাদর। তাহাতেও স্বীকার অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু “অযীক্ষানয়তত্ত্ববোধ” গ্রন্থে বর্ধমান উপাধ্যায় এখানে “অপেক্ষা” শব্দের উপেক্ষা অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘বাদী প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ জাত্যন্তরকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ উহার খণ্ডন না করিয়া, উহার পরে “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ” এই উপপত্তির উপসংহার করিলে অর্থাৎ উক্ত দোষ প্রদর্শন করিলে, তাহাতেও প্রতিবাদীর কথিত দুষণরূপ হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ তাহাতেও কোন দোষ না বলিয়া পঞ্চম পক্ষে যে “মতানুজ্ঞা” নামক দোষ বলিয়াছেন, তাহা বাদীর পক্ষেও সমান। সমান কেন? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন, “পরপক্ষদোষাত্মপগমাৎ” অর্থাৎ যেহেতু চতুর্থপক্ষস্থ প্রতিবাদী বাদীর তৃতীয় পক্ষে যে দোষ বলিয়াছেন, তাহা পঞ্চমপক্ষস্থ বাদী স্বীকারই করিয়াছেন।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “উপপত্তি” ও “উপসংহার” শব্দের দ্বারা পরপক্ষে পূর্বোক্ত “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ” এই সূত্রোক্ত উপপদ্যমান দোষের উপসংহার, এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দোষ কেন? এ বিষয়ে বাদী হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধও অনৈকান্তিক। বাদীর ঐরূপ উক্তিই সূত্রে “হেতুনির্দেশ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, “স্বপক্ষলক্ষণে”র অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্বোক্ত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদী প্রতিবাদীর পক্ষেও উপপদ্যমান দোষের উপসংহার করিলে এবং তাহাতে হেতু বলিলে বাদী কর্তৃক প্রতিবাদীর পক্ষে কথিত দোষ স্বীকৃতই হয়। কারণ, প্রতিবাদী দ্বিতীয়পক্ষস্থ হইয়া প্রথমে “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রোক্ত যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছেন, বাদী তাহার উদ্ধার না করিয়া “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ” এই কথা বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে বাদী তাঁহার নিজের স্থাপনাকে সদোষ বলিয়া মানিয়া লইয়াই প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় প্রতিবাদীর পক্ষের স্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। অর্থাৎ বাদী যে কারণে প্রতিবাদীর সম্বন্ধে “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, ঐ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান

১। স্বপক্ষঃ স্থাপনাবাদিন আদাঃ পক্ষঃ, তল্লক্ষণো দ্বিতীয়ঃ পক্ষো জাত্যন্তরং, স্বপক্ষলক্ষণায়ত্বাৎ, তস্তাপেক্ষা উপেক্ষা অনুজ্জায়ঃ তদনন্তরমুপপত্তেঃ “প্রতিষেধেপি সমানো দোষঃ” ইত্যন্তা উপসংহারে প্রতিপাদনবিষয়ে যো দুষণরূপো হেতুর্ময়া নির্দিষ্ট উক্তচতুর্থকক্ষায়েন, তত্র দোষমনুজ্ঞা দ্বয়া পঞ্চমকক্ষায়েন যো মতানুজ্ঞারূপো দোষ উক্তঃ স তথাপি সমানস্তথাপি মতানুজ্ঞা। কুতঃ? “পরপক্ষদোষাত্মপগমাৎ”। তৃতীয়কক্ষায়াং চতুর্থকক্ষায়েন ময়া যো দোষ উক্তস্তথা তদুপগমাদিতি সূত্রার্থঃ।—অযীক্ষানয়তত্ত্ববোধ।

হয়। ভাষাকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর ঐ শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ।

পূর্বোক্ত ষট্ পক্ষের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ বাদীর পক্ষ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ প্রতিবাদীর পক্ষ। “পক্ষ” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যবিশেষই উক্ত স্থলে গৃহীত হইয়াছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে যথাক্রমে উক্ত ষট্ পক্ষ প্রদর্শন করিতেছি।

১। সর্বাগ্রে বাদী বলিলেন,—“শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি। বাদীর ঐ স্থাপনাবাক্যই প্রথম পক্ষ।

২। পরে প্রতিবাদী সত্ত্বত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া, পূর্বোক্ত “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি (৩৭শ) সূত্রোক্ত জাত্যন্তর করিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন যে, প্রযত্নের অনন্তর শব্দের কি উৎপত্তিই হয়, অথবা অভিব্যক্তি হয়? প্রযত্নের অনন্তর শব্দের উৎপত্তি কিন্তু অসিদ্ধ। কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করা হয় নাই। সূত্রাত্ম শব্দের অনিত্যত্ব-সাধনে প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি হেতু হইতে পারে না। যাহা অসিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না। অতএব বাদী প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই হেতু বলিয়াছেন। কারণ, শব্দে উহা সিদ্ধ, উহা আমারও স্বীকৃত। কিন্তু উহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। কারণ, অনেক বিদ্যমান পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি হয়। অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। সূত্রাত্ম প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিও শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে হেতু হয় না। অতএব বাদীর ঐ সমস্ত বাক্য দ্বারাও শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্ত অর্থে তাঁহার ঐ সমস্ত বাক্যও অনৈকান্তিক। যে বাক্যোক্ত হেতু অনৈকান্তিক, সেই বাক্যও অনৈকান্তিক হইবে। প্রতিবাদীর এই জাত্যন্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ।

৩। পরে বাদী সত্ত্বত্তরের দ্বারা উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব-দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন,—“প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ”। অর্থাৎ বাদী বলিলেন যে, যদি অনৈকান্তিক বলিয়া আমার ঐ বাক্য সাধক না হয়, তাহা হইলে আপনার যে, প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও আমার বাক্যের অসাধকত্বের সাধক হয় না। কারণ, আপনার ঐ প্রতিষেধক বাক্যও ত অনৈকান্তিক। বাদীর এইরূপ জাত্যন্তর উক্ত স্থলে তৃতীয় পক্ষ।

৪। পরে প্রতিবাদী উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ নিজবাক্যে বাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন,—“প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদোষঃ।” অর্থাৎ আমার প্রতিষেধক বাক্যের যে বিপ্রতিষেধ, অর্থাৎ আপনার “প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ” এই বাক্য, তাহাতেও আপনার কথিত দোষের তুল্য দোষ। অর্থাৎ তাহাও আমার প্রতিষেধক বাক্যের দ্বারা অনৈকান্তিক। প্রতিবাদীর এইরূপ জাত্যন্তর, উক্ত স্থলে চতুর্থ পক্ষ।

৫। পরে বাদী তাঁহার নিজবাক্যে প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়া বলিলেন যে, আপনার নিজের প্রতিবেদক বাক্যে আমি যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ বলিয়াছি, তাহা আপনি মানিয়া লইয়া, আমার পক্ষেও ঐ দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধে “মতাহুজ্জা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হইয়াছে। অতএব আপনি মধ্যস্থগণের বিচারে নিগৃহীত হইবেন।

৬। পরে প্রতিবাদীও তুল্যভাবে বলিলেন যে, আপনিও আপনার প্রথম পক্ষরূপ নিজবাক্যে আমার কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়া লইয়া, আমার কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ প্রতিবেদক বাক্যেও “প্রতিবেদেহপি সমানো দোষঃ” এই কথা বলিয়া অর্থাৎ আপনার তৃতীয় পক্ষের দ্বারা ঐ অনৈকান্তিকত্ব দোষের আপত্তি প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধেও “মতাহুজ্জা” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হইয়াছে। অতএব মধ্যস্থগণের বিচারে আপনিও কেন নিগৃহীত হইবেন না? প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ।

পূর্বোক্ত ষট্‌পক্ষী স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই মতসিদ্ধি হয় না। সুতরাং উহার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়ও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না। অতএব উহা নিষ্ফল। ভাষ্যকার পরে ইহা বুক্তির দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত ষট্‌পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ সাধু এবং কোন্ পক্ষ অসাধু, ইহা মীমাংসমান হইলে অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্তৃক বিচার্য্যমাণ হইলে, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, প্রতিবাদীর কথিত চতুর্থ পক্ষ ও ষষ্ঠ পক্ষে অর্থের বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, প্রতিবাদী চতুর্থ পক্ষে “প্রতিবেদ-বিপ্রতিবেদে প্রতিবেদদোষবদদোষঃ” এই বাক্যের দ্বারা বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষে সমানদোষত্ব বলিয়াছেন এবং ষষ্ঠ পক্ষেও তিনি “পরপক্ষদোষাত্ম্যপগমাৎ সমানো দোষঃ” এই কথা বলিয়া বাদীর পঞ্চম পক্ষে সমানদোষত্বই বলিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইরূপ বাদীর কথিত তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষেও “প্রতিবেদেহপি-সমানো দোষঃ” এই বাক্যের দ্বারা দোষের সমানত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং পঞ্চম পক্ষেও “প্রতিবেদ-বিপ্রতিবেদে সমানো দোষপ্রসঙ্গঃ” ইহা বলিয়া তুল্যদোষপ্রসঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই। এইরূপ বাদীর পঞ্চম পক্ষ ও প্রতিবাদীর ষষ্ঠ পক্ষে কোন অর্থ বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত-দোষ। বাদীর তৃতীয় পক্ষ ও প্রতিবাদীর চতুর্থ পক্ষে মতাহুজ্জাদোষ। কারণ, নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে তুল্যভাবে ঐ দোষের প্রসঙ্গকে “মতাহুজ্জা” নামক নিগ্রহস্থান বলে। বাদীর প্রথম পক্ষ ও প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতু নাই। অর্থাৎ বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, তাঁহার অভিমত হেতু যে শব্দে অসিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্তির অনন্তর শব্দের যে উৎপত্তিই হয়, অভিযুক্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষে প্রতিবাদীও প্রবৃত্তির অনন্তর শব্দের অভিযুক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। অতএব উক্ত ষট্‌পক্ষী স্থলে পুনরুক্ত-দোষ, মতাহুজ্জা-দোষ এবং বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই পক্ষসিদ্ধি হয় না। উদ্যোতকর পরে ইহার হেতু বলিয়াছেন,—“অযুক্তবাদিত্বাৎ”। অর্থাৎ

উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই অযুক্তবাদী। সুতরাং উক্ত স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে উভয়েই নিগৃহীত হইবেন।

কোন সময়ে উক্ত “ষট্‌পক্ষী” প্রবৃত্ত হয়? অর্থাৎ উক্তরূপ ষট্‌পক্ষীর মূল কি? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায় “প্রতিষেধেহপি সমানো দোষঃ” এই কথা বলিয়া জাত্যন্তর করেন, সেই সময়েই ষট্‌পক্ষী প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ বাদীর উক্ত জাত্যন্তরই উক্ত স্থলে ষট্‌পক্ষীর মূল। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষে ঐ জাত্যন্তর করাতেই প্রতিবাদীও চতুর্থ পক্ষে ঐরূপ জাত্যন্তর করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ঐরূপ চতুর্থ পক্ষের অবসরই হইত না; ভাষ্যকার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাদীর পূর্বোক্ত “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি প্রথম পক্ষের পরে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত “প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রোক্ত জাত্যন্তর করিলে বাদী যে উত্তরের দ্বারা উহার খণ্ডন করিবেন, তাহা মহর্ষি পরে “কার্য্যাত্ত্বে প্রযত্নাহেতুত্বমমূলপলঙ্কি-
কারণোপপত্তেঃ” এই (৩৮শ) সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। বাদী মহর্ষি-কথিত ঐ সহস্রের বলিলে প্রযত্নের অনন্তর শব্দের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ার তদ্বারা তাঁহার প্রথম পক্ষই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং তখন আর প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ চতুর্থ পক্ষের প্রবৃত্তি সম্ভবই হইবে না। অতএব ঐ স্থলে পূর্বোক্তরূপে ষট্‌পক্ষীর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিলে বাদী মহর্ষি-কথিত সহস্রের দ্বারাই উহার খণ্ডন করিবেন। তাহা হইলে আর পূর্বোক্তরূপে “ষট্‌পক্ষী”র সম্ভাবনাই থাকিবে না। পূর্বোক্তরূপ ষট্‌পক্ষী বা কথাভাস একেবারেই নিষ্ফল। কারণ, উহার দ্বারা কোন তত্ত্ব-নির্ণয়ও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না; সুতরাং উহা কর্তব্য নহে। মহর্ষি ইহা উপদেশ করিবার জন্তই জাতি নিরূপণের পরে এই প্রকরণের দ্বারা ঐ বার্থ “ষট্‌পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু কোন স্থলে প্রতিবাদী জাত্যন্তর করিলে পরে সহস্রের স্ফূর্তি না হওয়ার বাদীও জাত্যন্তর করিলে পরে সহস্রের শ্রবণের সম্ভাবনা করিয়া ঐ স্থলে মধ্যস্থগণ ষট্‌পক্ষী পর্য্যন্তই শ্রবণ করিবেন। তাহার পরে তাঁহারা বাদী ও প্রতিবাদীকে ঐ বার্থ বিচার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, উভয়েরই পরাজয় ঘোষণা করিবেন। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ সূচনার জন্তও এখানে ষট্‌পক্ষী পর্য্যন্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং উক্তরূপে শতপক্ষী ও সহস্রপক্ষী প্রভৃতি কেন হইবে না? এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না। তবে কোন স্থলে যে পূর্বোক্তরূপে “ত্রিপক্ষী” প্রভৃতি হইতে পারে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি ॥৪৩॥

ষট্‌পক্ষীরূপ কথাভাস-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৭॥

এই আন্বিকের প্রথম তিন সূত্র (১) সংপ্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (২) জাতিষট্‌কপ্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৩) প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিযুগনদ্ধবাহিবিকল্পোপক্রমজাতিদ্বয়-প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (৪) যুগনদ্ধবাহিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টাস্তসমজাতিদ্বয়প্রকরণ। পরে দুই

সূত্র (৫) অনুপত্তিসমপ্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৬) সংশয়সম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৭) প্রকরণসম প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (৮) অহেতুসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (৯) অর্থাপত্তিসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১০) অবিশেষসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১১) উপপত্তিসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১২) উপলব্ধিসম প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (১৩) অনুপলব্ধিসম প্রকরণ। পরে তিন সূত্র (১৪) অনিত্যসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১৫) নিত্যসম প্রকরণ। পরে দুই সূত্র (১৬) কার্যাসম প্রকরণ। তাহার পরে পাঁচ সূত্র (১৭) কথাভাস-প্রকরণ।

১৭ প্রকরণ ও ৪৩ সূত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্গিক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় আঙ্কিক ।

ভাষ্য । বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোবিকল্পান্নিগ্রহস্থান-বহুত্বমিতি সংক্ষেপে-
গোক্তং, তদিদানীং বিভজনীয়ম্ । নিগ্রহস্থানানি খলু পরাজয়বস্তূন্যপ-
রাধাধিকরণানি প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাপ্রয়াগি,—তত্ত্ববাদিনমতত্ত্ববাদিন-
কাভিসংপ্লবন্তে ।

অনুবাদ । বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ অর্থাৎ বাদী ও
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধজ্ঞানরূপ ভ্রম ও অজ্ঞতার নানাপ্রকারতাপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থানের
বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা এখন বিভজনীয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত
নিগ্রহস্থানের বিভাগাদির দ্বারা সেই বহুত্ব প্রতিপাদনীয় । নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়-
বস্ত (অর্থাৎ) অপরাধের আশ্রয়, প্রায়শঃ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বাপ্রিত,—তত্ত্ববাদী ও
অতত্ত্ববাদী পুরুষকে অর্থাৎ “কথা” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে ।

টিপ্পনী । “জাতি”র পরে “নিগ্রহস্থান” । ইহাই গৌতমোক্ত চরম পদার্থ । মহর্ষি গৌতম
প্রথম অধ্যায়ের শেষে “বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিষ্চ নিগ্রহস্থানং” (২।১৯) এই সূত্রের দ্বারা
বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলিয়া সর্বশেষ সূত্রের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর
বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বহুপ্রকারতাবশতঃ ঐ নিগ্রহস্থান যে বহু, ইহা সংক্ষেপে
বলিয়াছেন । কিন্তু সেখানে ইহার প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলেন নাই । এই অধ্যায়ের
প্রথম আঙ্কিকে তাঁহার পূর্বোক্ত “জাতি” নামক পঞ্চদশ পদার্থের সবিশেষ নিরূপণপূর্বক শেষে
অবসর-সংগতিবশতঃ এই দ্বিতীয় আঙ্কিকে তাঁহার পূর্বোক্ত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের সবিশেষ
নিরূপণ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন । ফলকথা, পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের
প্রকারভেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলাই মহর্ষির এই শেষ আঙ্কিকের প্রয়োজন । তাই ভাষ্যকার
প্রথমে ঐ প্রয়োজন প্রকাশ করিয়াছেন ।

ভাষ্যকার পরে এখানে নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য পরিচয় প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন
যে, নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়বস্ত অর্থাৎ “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর
বাস্তব পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ । তাৎপর্যাটীকাকার ভাষ্যকারের ঐ কথার উদ্দেশ্য
যাক্ত করিয়াছেন যে,^১ বাহাদিগের মতে বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দুষণপ্রকার বাস্তব

১ । তত্র য এবমাহঃ—সর্বোহয়ং সাধনদুষণপ্রকারো বুদ্ধাক্রোড়ে ন বাস্তব ইতি তান্ প্রত্যাহ—“পরাজয়-
বস্তূনী”তি । পরাজয়ো বসতোমিতি পরাজয়স্থানানীত্যর্থঃ । কালনিকড়ে কল্পনায়ঃ সর্বত্র স্থলভূত্যাং সাধনদুষণ-
ব্যবস্থা ন স্তাদিতি ভাবঃ । নিগ্রহস্থানানি পর্যায়াস্তুরেণ পঠয়তি “অপরাধে”তি ।—তাৎপর্যাটীকা ।

নহে, ঐ সমস্তই কাল্পনিক, সেই বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার নিগ্রহস্থানগুলিকে বলিয়াছেন পরাজয়বস্তু। বাদী অথবা প্রতিবাদীর পরাজয় সাহায্যে বাস করে অর্থাৎ সাহা পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ, ইহাই ঐ কথাই অর্থ। “বস”ধাতুর উত্তর “তুন্”প্রত্যয়নিম্পন্ন “বস্তু” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সূচনা করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দুষণপ্রকার এবং জয়-পরাজয়াদি সমস্তই বাস্তব, ঐ সমস্ত কাল্পনিক নহে। কাল্পনিক হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দুষণের ব্যবস্থা বা নিয়ম হইতে পারে না, সুতরাং জয়পরাজয়ব্যবস্থাও হইতে পারে না। কারণ, কল্পনা সর্বত্রই সুলভ। সাহায্য জয় হইয়াছে, তাহারও পরাজয় কল্পনা করিয়া পরাজয় ঘোষণা করা যায়। তাহা হইলে কুত্ৰাপি জয় পরাজয় নির্ণয় হইতেই পারে না। সুতরাং নিগ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধই নির্ণীত হয়, ইহাই স্বীকার্য। ভাষ্যকার তাঁহার বিবক্ষিত এই অর্থই ব্যক্ত করিতে পরে আবার বলিয়াছেন,—“অপরাধাধিকরণানি”। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধের স্থান। উহার মধ্যে “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অধিকাংশ নিগ্রহস্থানই প্রতিজ্ঞাদি কোন অবয়বকে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব হয়, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—“প্রায়শ্চিন্ত্যবয়বশ্রয়ানি”। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

এখন এই “নিগ্রহস্থান” শব্দের অন্তর্গত “নিগ্রহ” শব্দের অর্থ কি? এবং কোথায় কাহার বিরূপ নিগ্রহ হয়, এই সমস্ত বুঝা আবশ্যক। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় দ্বারা বুঝা যায়, “নিগ্রহ” শব্দের অর্থ পরাজয়। উদয়নাচার্য্য ঐ পরাজয় পদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, “কথা”স্থলে যে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের অহঙ্কার খণ্ডিত হয় নাই, তৎকর্তৃক যে অপরের অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবাদীর অহঙ্কারের খণ্ডন, তাহাই তৎকর্তৃক অপরের পরাজয় এবং উহারই নাম নিগ্রহ। “বাদ,” “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামে যে ত্রিবিধ কথা, তাহাতেই নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। অত্ৰা “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান নহে। উদয়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ এবং শঙ্কর মিশ্রও পূর্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন^১। প্রশ্ন হয় যে, জিগীষাশূন্য শিষ্য ও গুরুর কেবল তৎ-নির্ণয়োদ্দেশ্যে যে “বাদ” নামক কথা হয়, তাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই অহঙ্কার না থাকায় পূর্বোক্ত পরাজয়রূপ নিগ্রহ কিরূপে হইবে? জিগীষা না থাকিলে সেখানে ত জয় পরাজয় বলাই যায় না। ত্রায়দর্শনের সর্বপ্রথম সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় বার্তিককার উদ্যোতকর উক্তরূপ প্রশ্নের

১। অখণ্ডিতাহঙ্কৃতিঃ পরাহঙ্কারখণ্ডনঃ।

নিগ্রহস্তন্নিমিত্তস্ত নিগ্রহস্থানতোচ্যতে ॥

অত্র কথায়ামিত্যুপস্কর্তব্যং। অত্যা ইতি প্রসঙ্গঃ। যথোক্তমাচার্য্যোঃ—“কথায়ামখণ্ডিতাহঙ্কারেণ পরাহঙ্কার-খণ্ডনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহ” ইতি।—তর্কিকরক। অখণ্ডিতাহঙ্কারিণঃ পরাহঙ্কার-শাতনমিহ পরাজয়ঃ, স এব নিগ্রহঃ। স এভেষু প্রতিজ্ঞাহান্যাদিষু বসতীতি নিগ্রহস্ত পরাজয়স্ত স্থানসূত্রায়কমিতি যাবৎ। অত্ৰেব কথাবাহানামমীমাংসা নিগ্রহস্থানত্বং।—বাদিবিনোদ।

অবতারণা করিয়া,^১ তদন্তরে বলিয়াছেন যে, “বাদ”কথাতে শিষ্য বা আচার্য্যের বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বই অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে না পারাই নিগ্রহ। বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে “খলীকার” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যোতকরও পরে (১৭শ স্তরের বার্তিকে) “খলীকার” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, “বাদ”কথাতে কাহারও পরাজয়-রূপ নিগ্রহ না হইলেও বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্বরূপ নিগ্রহকে গ্রহণ করিয়াই নিগ্রহস্থান বলা হইয়াছে। “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় জিগীষু বাদী বা প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত পরাজয়-রূপ নিগ্রহই হয় এবং তাহাতে যথাসম্ভব “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্তই ঐ নিগ্রহের স্থান বা কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু “বাদ”নামক কথায় ঐ সমস্তই নিগ্রহস্থান হয় না। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

নিগ্রহস্থানগুলি বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই নিগ্রহের কারণ হয়। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষই প্রমাদবশতঃ যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা প্রয়োগ করিয়া এবং যাহা প্রযোজ্য, তাহার প্রয়োগ না করিয়া নিগ্রহের যোগ্য হন। উদ্যোতকর প্রথমে বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন যে, বিচারকর্তা বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি-মূলক নিগ্রহ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সেই বিচাররূপ কৰ্ম্ম এবং তাহার কারণ যে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য, তাহার নিগ্রহ হয় না। কারণ, সেই কৰ্ম্ম ও করণের কোন অপরাধ নাই। সেই কৰ্ম্ম ও করণ নিজ বিষয়ে প্রযুক্ত্যমান হইলে তখন উহা সেই বিষয়ের সাধনে সমর্থই হয়। কিন্তু বিচারকর্তা বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষ তাঁহাদিগের সাধনীয় বিষয়ের সাধনে অসমর্থ কৰ্ম্ম ও করণকে গ্রহণ করায় তাঁহাদিগেরই নিগ্রহ হয়। তাঁহাদিগের সেই প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা আশ্রয়িত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি-দোষের অর্থাৎ ভ্রম ও অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞাদির দোষ বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ নাই। “প্রতিজ্ঞাদিদোষ” ইহা ভাক্ত প্রয়োগ। অবশ্য “অজ্ঞান” প্রভৃতি কোন কোন নিগ্রহস্থান বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষেরই আশ্রয়িত ধৰ্ম্ম বলিয়া, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধেই সেই পুরুষকে নিগৃহীত করে। নিগ্রহস্থানগুলি যে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকারও এখানে শেষে বলিয়াছেন,—“তত্ত্ববাদিনমতত্ববাদিনঞ্চাভিসংপ্লবস্তে”। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি প্রায় সৰ্ব্বত্র যিনি অতত্ত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি অসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেই নিগৃহীত করে এবং কদাচিৎ যিনি তত্ত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিগৃহীত করে। কারণ, কদাচিৎ তিনিও প্রতিবাদীর কথিত দুষণাভাসের খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া নিগৃহীত হন। একই স্থলে তাঁহাদিগের বহু নিগ্রহস্থানও হইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার “অভিসংপ্লবস্তে” এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

১। কঃ পুনঃ শিষ্যাচার্য্যোনিগ্রহঃ? বিবক্ষিতার্থপ্রতিপাদকত্বমেব!—শ্রাব্যবার্তিক। উত্তরঃ বিবক্ষিতার্থপ্রতিপাদকত্বমেব খলীকার ইতি!—ভাৎপর্য্যটিকা।

বহু পদার্থের সংকরই “অভিপ্রাণঃ,” ইহা অন্ততঃ ভাষ্যকারের নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই বুঝা যায়।
(প্রথম খণ্ড, ১১২-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। তেষাং বিভাগঃ—

অনুবাদ। সেই নিগ্রহস্থানসমূহের বিভাগ—

সূত্র। প্রতিজ্ঞাহানিঃ, প্রতিজ্ঞান্তরং, প্রতিজ্ঞা-
বিরোধঃ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং, নিরর্থক-
মবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং, ন্যানমধিকং, পুন-
রুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা, বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা,
পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং, নিরনুযোজ্যানুযোগোহপ-
সিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি ॥১॥৫০৫॥

অনুবাদ। (১) প্রতিজ্ঞাহানি, (২) প্রতিজ্ঞান্তর, (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ,
(৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, (৫) হেত্বন্তর, (৬) অর্থান্তর, (৭) নিরর্থক, (৮)
অবিজ্ঞাতার্থ, (৯) অপার্থক, (১০) অপ্রাপ্তকাল, (১১) ন্যান, (১২) অধিক,
(১৩) পুনরুক্ত, (১৪) অননুভাষণ, (১৫) অজ্ঞান, (১৬) অপ্রতিভা, (১৭)
বিক্ষেপ, (১৮) মতানুজ্ঞা, (১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, (২০) নিরনুযোজ্যানু-
যোগ, (২১) অপসিদ্ধান্ত, (২২) হেত্বাভাস—এই সমস্ত নিগ্রহস্থান।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার পূর্বকথিত “নিগ্রহস্থান” নামক চরম পদার্থের বিশেষ লক্ষণগুলি
বলিবার জন্ত প্রথম এই সূত্রের দ্বারা সেই নিগ্রহস্থানের বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ বলিতে
পদার্থের প্রকারভেদের নাম কীর্তন। উহাকে পদার্থের বিশেষ উদ্দেশ্য বলে। উদ্দেশ্য ব্যতীত
লক্ষণ বলা যায় না। তাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি দ্বাবিংশতি
প্রকার নিগ্রহস্থানের বিশেষ নাম কীর্তনরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া, দ্বিতীয় সূত্র হইতে যথাক্রমে
এই সূত্রোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়াছেন। অনেকের মতে এই সূত্রে “চ”
শব্দের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থানের সমুচ্চয় সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র
প্রভৃতি মহর্ষির সর্বশেষ সূত্রোক্ত “চ” শব্দের দ্বারাই অন্ততঃ সমুচ্চয় বুঝিতে বলিয়াছেন,
পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে “ভার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন
যে, এই সূত্রে “চ” শব্দটি “তু” শব্দের সমানার্থক। উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, যথোক্ত
লক্ষণাক্রান্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান। কিন্তু কথামধ্যে বাদী বা প্রতিবাদী
সহসা অপস্মাদি পীড়াবশতঃ নীরব হইলে অথবা ভূতাবেশাদিবশতঃ প্রলাপ বলিলে অথবা

প্রতিবাদী কর্তৃক দোষোদ্ভাবনের পূর্বেই অতি শীঘ্র নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজ বাক্য আচ্ছাদন করিয়া, মিথ্যে অথবা বালি অথবা প্রতিবাদীর উত্তর বলিবার পূর্বেই পার্থক্য অথবা কোন তৃতীয় কাক্সি তাঁহার বক্তব্য উত্তর বদ্বিয়া দিলে, সেখানে কাহারও কোন নিগ্রহস্থান হইবে না। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর “অনুভাষণ” ও “অপ্রতিভা” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, ঐরূপ স্থলে উহা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক হয় না, অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে তাঁহাদিগের কোন অপরাধ নির্ণয় করা যায় না। “বাদিবিনাদ” গ্রন্থে শব্দ মিশ্র ও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কথা ভিন্ন অত্র অর্থাৎ লৌকিক বিবাদাদি স্থলেও যে উক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন।

পূর্বোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপ না বুঝিলে সমস্ত কথা বুঝা যায় না। তাই আবশ্যক বোধে এখানেই অতি সংক্ষেপে উহাদিগের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছি।

বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, পরে যদি প্রতিবাদীর কথিত দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের উক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজ পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় (১) “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি ঐরূপ স্থলে ঐ উদ্দেশ্যে নিজের কথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে (২) “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। সেখানে নিজপক্ষের পরিত্যাগ না হওয়ায় “প্রতিজ্ঞাহানি” হয় না। বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার কথিত হেতু যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেখানে (৩) “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিলে তখন উহার খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া বাদী যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অস্বীকার করেন অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই, এইরূপ কথা বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৪) “প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যতিচার দোষ প্রদর্শন করিলে বাদী যদি উক্ত দোষ নিবারণের জন্য তাঁহার পূর্বোক্ত সেই হেতুতেই কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৫) “হেতুস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে, মধ্যে যদি কোন অসম্বন্ধার্থ বাক্য অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের (৬) “অর্থান্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে অর্থশূন্য অর্থাৎ যাহা কোন অর্থের বাচক নহে, এমন শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (৭) “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী কর্তৃক যে বাক্য তিনবার কথিত হইলেও অতি ছুর্ত্বার্থ বলিয়া মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেইরূপ বাক্য-প্রয়োগ বাদীর পক্ষে (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। যে পদসমূহ অথবা যে বাক্য-সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের অর্থ নাই অর্থাৎ সেই পদসমূহ অথবা বাক্যসমূহ মিলিত হইয়া কোন একটা অর্থবোধ জন্মায় না, তাদৃশ পদসমূহ অথবা

বাক্যসমূহের প্রয়োগ (৯) “অপার্থক্য” নামক নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়ব বাক্য অথবা অতীত বক্তব্য যে কোন বাক্যের নির্দিষ্ট ক্রম লঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ যে কালে যাহা বক্তব্য, তাহার পূর্বেই তাহা বলিলে (১০) “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাঁহাদিগের নিজসম্মত যে কোন একটা অবয়বও কথিত না হইলে অর্থাৎ সমস্ত অবয়বের প্রয়োগ না করিলে (১১) “ন্যূন” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনে বিনা প্রয়োজনে হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য একের অধিক বলিলে অথবা দুঃখাদিও একের অধিক বলিলে (১২) “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান হয়। নিপ্রয়োজনে কোন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি হইলে (১৩) “পুনরুক্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষ-স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত বাক্যার্থ বা তাঁহার দুষণীয় পদার্থের প্রত্যুচ্চারণ অর্থাৎ অনুভাষণ করিয়া উহার খণ্ডন করিবেন। কিন্তু বাদী তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ তাঁহার বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাঁহার দুষণীয় পদার্থের অনুভাষণ না করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৪) “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী তিন বার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ বাদীর সেই বাক্যার্থ বুঝিলে প্রতিবাদী যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৫) “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিলেও এবং তাহার অনুভাষণ করিলেও যদি উত্তরকালে তাঁহার উত্তরের ক্ষুণ্ণি বা জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেখানে (১৬) “অপ্রতিজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষস্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাজয় সম্ভাবনা করিয়া, আমার বাড়িতে অমুক কার্য আছে, এখনই আমার যাওয়া অত্যাবশ্যক, পরে আসিয়া বলিব, এইরূপ কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আরকু কথার উল্ল করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৭) “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা স্বীকার করিয়া গইয়াই বাদীর পক্ষে তত্ত্বল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৮) “মতানুসার” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি উহার উদ্ভাবন করিয়া, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, ইহা না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (১৯) “পর্যাবৃত্ত্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই নিগ্রহস্থান পরে মধ্যস্থগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ ইহা মধ্যস্থগণেরই উদ্ভাব্য। যাহা যেখানে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া প্রতিবাদী অথবা বাদী যদি তাঁহার প্রতিবাদীকে এই নিগ্রহস্থান দ্বারা তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, এই কথা বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২০) “নিরন্তরোক্ত্যনুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, উহার সমর্থন করিতে পরে যদি উহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেখানে (২১) “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথম অধ্যায়ে “সব্যভিচার” প্রভৃতি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস ঘেরূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই সমস্ত (২২) হেত্বাভাস সর্বত্রই নিগ্রহস্থান হয়।

পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানগুলির মধ্যে “অনুভাষণ”, “অজ্ঞান”, “অপ্রতিজ্ঞা”, “বিক্ষেপ”, “বীজ-

মুক্তা” এবং “পর্যায়পেক্ষণ”, এই ছয়টি বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতামূলক। উহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। এ জন্ত ঐ ছয়টি নিগ্রহস্থান অপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। কারণ, সেগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক। তাই সেগুলি বিপ্রতিপত্তিনিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারও ইহা বলিয়াছেন। তবে ভাষ্যকারের মতে “অপ্রতিপত্তি” বলিতে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবরূপ অজ্ঞতা নহে, কিন্তু সেই অজ্ঞতামূলক নিজ কর্তব্যের অকরণই অপ্রতিপত্তি। জয়ন্ত ভট্ট ও ভাষ্যকারের মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। কিন্তু অত্র মতে মহর্ষি বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অপ্রতিপত্তির অনুমাপক নিগ্রহস্থানগুলিকেই “অপ্রতিপত্তি” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর আত্মগত ভ্রমজ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি এবং জ্ঞানের অভাবরূপ অপ্রতিপত্তি, তাহা অপরে উদ্ভাবন করিতে পারে না, উদ্ভাবিত না হইলেও তাহা নিগ্রহস্থান হয় না। সুতরাং বাদী বা প্রতিবাদীর ঐ বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তির যাহা অনুমাপক লিঙ্গ, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই উক্ত মতে মহর্ষির পূর্বোক্ত সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহের মূল কারণের অনুমাপক হইয়া, তদ্বারা পরম্পরায় নিগ্রহের অনুমাপক হয়, এ জন্ত শব্দের মিশ্র প্রভৃতি কেহ কেহ “নিগ্রহস্থান” শব্দের দ্বারা নিগ্রহের স্থান অর্থাৎ অনুমাপক, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

“তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ মহর্ষির কথিত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতিতে মহর্ষির পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণের সমন্বয় জন্ত বলিয়াছেন যে, মহর্ষির “বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ নিগ্রহস্থানং” এই সূত্রে “বিপ্রতিপত্তি” ও “অপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা “কথা”স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্ত্বের অপ্রতিপত্তিই অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞতাই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু উহা বাদী বা প্রতিবাদীর আত্মগত ধর্ম বলিয়া, অত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় উহা উদ্ভাবন করিতে পারে না, উহা উদ্ভাবনের অযোগ্য। সুতরাং স্বরূপতঃ উহা নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। অতএব ঐ অপ্রতিপত্তি বা প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞতার দ্বারা উহার অনুমাপক লিঙ্গই লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মহর্ষির পূর্বোক্ত ঐ সূত্রে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শব্দে লক্ষণার দ্বারা প্রথমে তত্ত্বের অপ্রতিপত্তি বুঝিয়া, পরে আবার লক্ষণার দ্বারা উহার অনুমাপক লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। উক্তরূপে “লক্ষিত-লক্ষণা”র দ্বারা যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্ত্ব অপ্রতিপত্তির লিঙ্গ অর্থাৎ যদ্বারা সেই অপ্রতিপত্তি অনুমিত হয়, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির পূর্বোক্ত ঐ সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইলে মহর্ষির কথিত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্তই পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণাক্রান্ত হয়। নচেৎ ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। সুতরাং মহর্ষিও তাহা বলিতে পারেন না। অতএব মহর্ষির পূর্বোক্ত সূত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু মহর্ষির পূর্বোক্ত সূত্রের দ্বারা তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে হয় না এবং উক্ত ব্যাখ্যায় ঐ সূত্রে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দ এবং “চ” শব্দের প্রয়োগও সার্থক হয় না। ভাষ্যকার ও বার্তিককার

প্রভৃতিও মহর্ষির শ্রুতানুসারে বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই উভয়কেই নিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অসম্ভব ভট্ট ভাষ্যকারের মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা বস্তুতঃ সাধন নহে, কিন্তু তত্ত্বল্য বলিয়া প্রতীত হওয়ায় সাধনাভাস নামে কথিত হয়, তাহাতে সাধন বলিয়া যে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি এবং যাহা দূষণ নহে, কিন্তু দূষণাভাস, তাহাতে দূষণ বলিয়া যে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি, তাহাই বিপ্রতিপত্তি। এবং আরম্ভ বিষয়ে যে অনারম্ভ অর্থাৎ নিজ কর্তব্যের অকরণ, তাহা অপ্রতিপত্তি। বাদী নিজ পক্ষ সাধন করিলে তখন উহার খণ্ডনই প্রতিবাদীর কর্তব্য, এবং প্রতিবাদী খণ্ডন করিলে তখন উহার উদ্ধার করাই বাদীর কর্তব্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে ঐ নিজ কর্তব্য না করাই তাঁহাদিগের অপ্রতিপত্তি। বিপরীত বুলিয়া অথবা স্বাকর্তব্য না করিয়া, এই দুই প্রকারেই বাদী ও প্রতিবাদী পরাজিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই উভয়ই তাঁহাদিগের পরাজয়ের মূল কারণ। বার্তিককার উদ্যোতকরও মহর্ষির শ্রুতাক্ত “বিপ্রতিপত্তি” ও “অপ্রতিপত্তি” এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ। যদি বল, “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান কথিত হওয়ায় নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ, ইহা উপপন্ন হয় না, এতদ্বস্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহার ভেদ-বিস্তর বিবক্ষাবশতঃই অর্থাৎ ঐ দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানের আরও অনেক প্রকার ভেদ বলিবার সম্ভব মহর্ষি পরে উহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাও উদাহরণ মাত্র; সুতরাং উহার ভেদ অনন্ত। অর্থাৎ ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থানের আন্তর্গতিক ভেদ অনন্ত প্রকার সম্ভব হওয়ায় নিগ্রহস্থান অনন্ত প্রকার।

বৌদ্ধসম্প্রদায় গোতমোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা উহার মধ্যে অনেক নিগ্রহস্থানকে বালকের প্রলাপতুল্য বা উন্নতপ্রলাপ বলিয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন এবং শাস্ত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ করাও নিতান্ত অনুচিত বলিয়া মহর্ষি গোতমকে উপহাসও করিয়াছেন। পরবর্তী প্রখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর “অসাধনান্ধবচন” অর্থাৎ যাহা নিজপক্ষসাধনের অঙ্গ নহে, তাহাকে সাধন বলিয়া উল্লেখ করা এবং “অদোষোদ্ভাবন” অর্থাৎ যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করা, ইহাই নিগ্রহস্থান। ইহা ভিন্ন আর কোন নিগ্রহস্থান যুক্তিসম্মত না হওয়ায় তাহা স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি নিশ্চয় উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত কথার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেও প্রথমে ধর্মকীর্তির “অসাধনান্ধবচনং” ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত কথার দ্বারাই সংক্ষেপে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু

১। অসাধনান্ধবচনমদোষোদ্ভাবনং দ্বয়োঃ।

নিগ্রহস্থানমন্তু ন যুক্তমিতি নৈবাতে।

ধর্মকীর্তির “প্রমাণবিশিষ্টা” নামক যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল, তাহাতেই তিনি উক্ত কারিকা ও উক্ত বিষয়ে বিচার প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয়। কিন্তু ঐ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় ভাষায় উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ আছে। বেহ বেহ তাহা হইতে মূল উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

উদ্যোতকৰ ধৰ্মকীৰ্ত্তিৰ কোন কাৰিকা উদ্ধৃত করেন নাই, তিনি তাঁহাৰ নামও করেন নাই। জয়ন্ত ভট্ট ধৰ্মকীৰ্ত্তিৰ উক্ত কাৰিকা উদ্ধৃত কৰিয়া প্রথমে উদ্যোতকৰ ও বাচস্পতি মিশ্ৰেৰ ত্ৰায় বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ নিগ্রহস্থান যে দ্বিবিধ, ইহা ত মহৰ্ষি গৌতমও “বিপ্রতিপত্তিৰ প্রতিপত্তিষ্চ নিগ্রহস্থানং” (১২।১৯) এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা বলিয়াছেন। পরন্তু মহৰ্ষিৰ ঐ সূত্রোক্ত সামান্য লক্ষণেৰ দ্বাৰা সৰ্ব্বপ্রকাৰ নিগ্রহস্থানই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ধৰ্মকীৰ্ত্তিৰ কথিত লক্ষণেৰ দ্বাৰা তাহা হয় না। কাৰণ, যেখানে বাদী বা প্রতিবাদীৰ উত্তৰেৰ স্ফূৰ্ত্তি না হওয়ায় তাঁহাৰা কেহ পরাজিত হইবেন, সেখানে তাঁহাৰ “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে যাঁহাৰ উত্তৰেৰ স্ফূৰ্ত্তি হয় না, তিনি ত যাঁহা দোষ নহে, তাহা দোষ বলিয়া উদ্ভাবন করেন না এবং যাঁহা সাধনেৰ অঙ্গ নহে, তাহাও সাধন বলিয়া উল্লেখ করেন না। সুতরাং সেখানে ধৰ্মকীৰ্ত্তিৰ মতে তিনি কেন পরাজিত হইবেন? তাঁহাৰ অপরাধ কি? যদি বল, ধৰ্মকীৰ্ত্তি যে “অদোষোদ্ভাবন”কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, উহাৰ দ্বাৰা কোন দোষেৰ উদ্ভাবন না করা, এই অৰ্থও তাঁহাৰ বিবক্ষিত। সুতরাং যে বাদী বা প্রতিবাদী উত্তৰেৰ স্ফূৰ্ত্তি না হওয়ায় কোন উত্তৰ বলেন না, সুতরাং কোন দোষোদ্ভাবন করেন না, তিনি ধৰ্মকীৰ্ত্তিৰ মতেও নিগৃহীত হইবেন। বস্তুতঃ যাঁহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভাবন এবং দোষেৰ অনুদ্ভাবন, এই উভয়ই “অদোষোদ্ভাবন” শব্দেৰ দ্বাৰা ধৰ্মকীৰ্ত্তি প্রকাশ কৰিয়াছেন, ইহা স্বীকাৰ্য্য। জয়ন্ত ভট্ট এই কথাৰও উল্লেখ কৰিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শকাস্ত্ৰেৰ দ্বাৰা গৌতমোক্ত “বিপ্রতিপত্তি” ও “অপ্রতিপত্তি”ই নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই স্বীকাৰ কৰিতে হইবে। কাৰণ, কোন দোষেৰ উদ্ভাবন না করা ত গৌতমোক্ত অপ্রতিপত্তিই। এইরূপ ধৰ্মকীৰ্ত্তিৰ প্রথমোক্ত “অসাধনাজবচনং” এই বাক্যেৰ দ্বাৰা সাধনেৰ অঙ্গ বা সাধনেৰ উল্লেখ না করাও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইলে উহাও ত অপ্রতিপত্তিই। অতএব শকাস্ত্ৰেৰ দ্বাৰা মহৰ্ষি অক্ষপাদপাদেৰ নিকটেই শিক্ষা কৰিয়া তাঁহাৰই কথিত “বিপ্রতিপত্তি” ও “অপ্রতিপত্তি”রূপ নিগ্রহস্থানদ্বয়কে ধৰ্মকীৰ্ত্তি উক্ত শ্লোকেৰ দ্বাৰা নিবন্ধ কৰিয়াছেন। তিনি কিছুমাত্র নূতন বুঝেন নাই ও বলেন নাই।

ধৰ্মকীৰ্ত্তি বলিয়াছেন যে, গৌতম প্রথমে সামান্যতঃ নিগ্রহস্থান। দ্বিবিধ বলিলেও পরে যে “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অযুক্ত। যেমন তাঁহাৰ প্রথমোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” কখনই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কাৰণ, বাদী বা প্রতিবাদীৰ প্রতিজ্ঞাবাক্য তাঁহাদিগেৰ নিঙ্গপক্ষ সাধনেৰ অঙ্গই নহে, উহা অনাবশ্যক। সুতরাং তাঁহাদিগেৰ প্রতিজ্ঞাবচনই নিগ্রহস্থান। কিন্তু প্রতিজ্ঞাৰ হানি নিগ্রহস্থান নহে। এবং যেকূপ স্থলে “প্রতিজ্ঞাহানি”ৰ উদাহরণ প্রদৰ্শিত হয়, সেখানে বস্তুতঃ বাদীৰ প্রতিজ্ঞাৰ হানিও হয় না। পরন্তু সেই স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুৰ প্রয়োগ কৰায় হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থানেৰ দ্বাৰাই নিগৃহীত হন, প্রতিজ্ঞাহানিৰ দ্বাৰা নিগৃহীত হন না। সুতরাং “প্রতিজ্ঞাহানি”ৰ অর্থ কোন স্থল বক্তব্য। কিন্তু তাহা নাই, অতএব “প্রতিজ্ঞাহানি” কোনরূপেই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। এইরূপ গৌতমোক্ত “প্রতিজ্ঞাস্তম্”ও নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কাৰণ, যিনি পূৰ্ব্বপ্রতিজ্ঞাৰ্থ সাধন

করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বলেন, তিনি ত উন্নত। তাঁহার ঐ উন্নতপ্রলাপ শাস্ত্রে লক্ষিত হওয়া উচিত নহে। এইরূপ অর্থশূন্য অবাচক শব্দ প্রয়োগকে যে “নিগ্রহক” নামে নিগ্রহস্থান বলা হইয়াছে, উহা ত একেবারেই অযুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐরূপ নিগ্রহক শব্দ প্রয়োগ করে, সে ত বিচারে অধিকারীই নহে। তাহার ঐরূপ উন্নতপ্রলাপকেও নিগ্রহস্থান বলা নিতান্তই অযুক্ত। আর তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন ছয়ভিগন্ধিবশতঃ হস্ত দ্বারা নিজের কপোল বা গণ্ডদেশ প্রভৃতি বাজাইয়া অথবা ঐরূপ অথ কোন কুচেষ্ঠার দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, সেই কপোলবাদন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলা উচিত। গৌতম তাহাও কেন বলেন নাই? তাহাও ত অর্থশূন্য শব্দ অথবা ব্যর্থ বস্তু। উহা করিলেও ত বাদী বা প্রতিবাদী সেখানে অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। এইরূপ আরও অনেক নিগ্রহস্থান বৌদ্ধসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

“ভায়মজ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট পরে যথাস্থানে ধর্মকীর্তির সমস্ত বথার উল্লেখ করিয়া চিার-পূর্বক সর্বত্রই তাহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরবর্তী সূত্রোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি”র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্যই তাহাদিগের স্বপক্ষসাধনের অঙ্গ। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতেই হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। নচেৎ হেতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা অসংগত ও অনাবশ্যক। অতএব প্রতিজ্ঞাবাক্যই যে, স্বপক্ষ সাধনের প্রথম অঙ্গ, ইহা স্বীকার্য। তাই উহা প্রথম অবয়ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মকীর্তি উহাকে অবয়বের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও পূর্বে অবয়ব ব্যাখ্যায় নানা যুক্তির দ্বারা উহার অবয়বত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগই নিগ্রহস্থান, অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাবাক্যের উচ্চারণ করিলেই নিগৃহীত হইবেন, ইহা নিতান্ত অযুক্ত। কিন্তু যে কোন রূপে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের ত্যাগ হইলে তাঁহারা নিজের প্রতিজ্ঞার্থ সিদ্ধ করিতে না পারায় অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং “প্রতিজ্ঞাহানি” অবশ্যই নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য। পরে ইহা পরিষ্কৃত হইবে। অবশ্য প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে তখন যদি বাদী ঐ দোষের উদ্ধারের জন্য কোন উত্তর না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি হেত্বাভাসের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু “প্রতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী সেই ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই কোন উত্তর বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করায় সেখানে তিনি “প্রতিজ্ঞাহানি”র দ্বারাই নিগৃহীত হন। কারণ, প্রতিবাদী সেখানে পরে তাঁহার সেই “প্রতিজ্ঞাহানি”রই উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহাকে নিগৃহীত বলেন। অতএব “প্রতিজ্ঞাহানি” নামে পৃথক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে এবং উক্ত যুক্তি অনুসারে তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

ধর্মকীর্তি ও তাঁহার সম্প্রদায় যে, গৌতমোক্ত “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থানকে উন্নতপ্রলাপ বলিয়াছেন, তদ্বৎ জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, “প্রতিজ্ঞাস্তর” স্থলে বাদী তাঁহার হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আর কোন পক্ষ না দেখিয়া কোন

বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সাধাসিদ্ধির অমুকুল বুঝিয়াই ঐ প্রতিজ্ঞাস্তরের প্রয়োগ করায় উহা কখনই তাঁহার উন্নত প্রলাপ বলা যায় না। আর উহাও যদি উন্নতপ্রলাপ হয়, তাহা হইলে তোমরা যে “উভয়াসিদ্ধ” নামক হেত্বাত্মক স্বীকার করিয়া উহার উদাহরণ বলিয়াছ—“অনিত্যঃ শব্দঃ চাক্ষুষত্বাৎ,” এই বাক্য কেন উন্নতপ্রলাপ নহে? শব্দের চাক্ষুষত্ব, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসিদ্ধ। তাই তোমরা উক্ত স্থলে চাক্ষুষত্বহেতু “উভয়াসিদ্ধ” নামক হেত্বাত্মক বলিয়াছ। কিন্তু কোন বালকও কি শব্দকে চাক্ষুষ পদার্থ বলে? তবে অমুন্যস্ত বাদী কেন ঐরূপ প্রয়োগ করিবেন? কোন বাদীই কোন স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ না করিলে বা ঐরূপ প্রয়োগ একেবারে অসম্ভব হইলে তোমরা কিরূপে উহা উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছ? তোমাদিগের কথিত ঐ বাক্য উন্নতপ্রলাপ নহে, কিন্তু মহর্ষি গোতমোক্ত “প্রতিজ্ঞাস্তর” উন্নতপ্রলাপ, ইহা বলা ভিক্ষুর পক্ষে নিজের দর্শনে অপূর্ব অমুরাগ অথবা গৌতমের দর্শনে অপূর্ব বিষেষ ত্রিগ্ন আর কিছুই নহে। জয়ন্ত ভট্ট গোতমোক্ত “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিতেও বৌদ্ধসম্প্রদায়কে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তোমরা এই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থানের স্পষ্ট উদাহরণ প্রদান কর এবং ক্রুদ্ধ না হও, তাহা হইলে বলি যে, তোমাদিগের সমস্ত বাক্যই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ। কারণ, বিজ্ঞানমাত্রবাদী তোমাদিগের মতে অর্থ বা বাহ্য পদার্থ অলৌকিক, কোন শব্দেরই বাস্তব বাচ্য অর্থ নাই, শব্দপ্রমাণও নাই। কিন্তু পরলোক-তত্ত্বদর্শী পরিগুদ্ধবোধী মহাবিদ্বান্ শাক্য ভিক্ষুগণও যেমন অর্থশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াও উন্নত নহেন, তদ্রূপ তোমাদাদিবশতঃ অত্র কোন বাদীও নিরর্থক ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ করিলে তাহাকেও উন্নত বলা যায় না। আর যে, কপোলবাদন ও গণ্ডবাদন প্রভৃতি কেন নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হয় নাই? ইহা বলিয়াছ, কিন্তু উহা ত বাক্যই নহে, উহা “কথা”-স্বভাবই নহে, সুতরাং উহার নিগ্রহস্থানত্ব বিষয়ে কোন চিন্তাই উপস্থিত হইতে পারে না। জয়ন্ত ভট্ট পরে উক্ত সম্প্রদায়কে তিরস্কার করিতেই বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর “কথা”র প্রসঙ্গেও যাহার মনে কপোলবাদন, গণ্ডবাদন প্রভৃতিও উপস্থিত হয়, তাহার মনে উহার অপেক্ষায় অতি জঘন্য ও আর কিছু উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র গোতমোক্ত “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থানের অত্মরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কপোলবাদন প্রভৃতি যে উহার লক্ষণাক্রান্তই হয় না, ইহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাস্করজ্ঞ “কথা” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর দুর্ব্বচন ও কপোলবাদন প্রভৃতিকেও নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

পূর্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শেষ কথা এই যে, যে ভাবে “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ঐ ভাবে ভেদ স্বীকার করিলে অসংখ্য নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয়। নিগ্রহস্থানের পরিগণনাই হইতে পারে না। এতদ্বস্তরে জয়ন্ত ভট্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকারেই সম্ভব হওয়ায় উহা যে অসংখ্য, ইহা গোতমেরও সম্মত। কিন্তু তিনি অসংকীর্ণ নিগ্রহস্থানের প্রকারভেদ বলিবার জগুই উহার দ্বাবিংশতি প্রকারভেদ বলিয়াছেন। একই স্থলে অনেক নিগ্রহস্থানের সঙ্কর হইলে সংকীর্ণ নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকার হইতে পারে।

সুতরাং পূর্বোক্ত “জাতি”র স্থায় “নিগ্রহস্থান”ও অনন্ত। বস্তুতঃ অসংখ্য নিগ্রহস্থানও আরও অনেক প্রকার হইতে পারে। মহর্ষি গোতমও সর্বশেষ সূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা তাহা সূচনা করিয়াছেন, ইহাও বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যাহারা উত্তমবুদ্ধি, তাঁহাদিগের পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান দৃষ্টব্য না হওয়ায় তাঁহারা অবশ্য নিগৃহীত হন না এবং যাহারা অধমবুদ্ধি, তাহারা “কথা”র কথিকারী না হওয়ায় তাহাদিগের পক্ষে নিগ্রহস্থানের কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু যাহারা মধ্যমবুদ্ধি এবং কথার অধিকারী, তাঁহাদিগের পক্ষে নিগ্রহস্থান সম্ভব হওয়ায় তাঁহারা নিগৃহীত হন। “কথা”স্থলে অনেক সন্ধ্যায় তাঁহাদিগেরও সভাক্ষেপ বা প্রমাদাদিবশতঃ এবং কোন স্থলে ভাবী পরাজয়ের আশঙ্কায় অনেক প্রকার নিগ্রহস্থান ঘটয়া থাকে। তাঁহাদিগের পক্ষে সভাক্ষেপ বা প্রমাদাদি অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ মধ্যমবুদ্ধি বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষামূলক “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথায় কাহারও পরাজয়রূপ নিগ্রহ অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে কোন নিগ্রহস্থানও অবশ্যই ঘটে। যে যে প্রকারে সেই নিগ্রহস্থান ঘটিতে পারে এবং কোন স্থলে সত্যই ঘটয়া থাকে, মহর্ষি তাহারই অনেকগুলি প্রকার প্রদর্শন করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় ও জয়-পরাজয় নির্ণয়ের উপায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তদ্বারা যাহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর ঐরূপ কোন নিগ্রহস্থান না ঘটে, তজ্জগৎ সতত তাঁহাদিগকে অবহিত থাকিবার জন্তও উপদেশ সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণিত চতুর্বিংশতি প্রকার “জাতি” ও দ্বাবিংশতি প্রকার “নিগ্রহস্থানে”র মধ্যে কোনটাই একেবারে অসম্ভব মনে করেন নাই। কারণ, সভামধ্যম মধ্যমবুদ্ধি বাদী ও প্রতিবাদীদিগের জিগীষামূলক বিচারে তাঁহাদিগের তৎকালীন বিচিত্র বুদ্ধি বা বিচিত্র অবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপেই জানেন। আর তিনি জানেন,—“কালো হৃদয়ঃ নিরবধির্বিপ্লবশ্চ পৃথ্বী” ১১।

ভাষ্য। তানীমানি দ্বাবিংশতিধা বিভজ্য লক্ষ্যন্তে।

অনুবাদ। সেই এই সমস্ত নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকারে বিভাগ করিয়া লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ পরবর্তী দ্বিতীয় সূত্র হইতে মহর্ষি তাঁহার বিভক্ত নিগ্রহস্থান-গুলির যথাক্রমে লক্ষণ বলিতেছেন।

সূত্র। প্রতিদৃষ্টান্ত-ধর্ম্যভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ॥

॥২॥৫০৬॥

অনুবাদ। স্বকীয় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মের স্বীকার প্রতিজ্ঞাহানি। অর্থাৎ বাদী নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম স্বীকার করিলে তৎপ্রযুক্ত তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

ভাষ্য। সাধ্যধর্ম্যপ্রত্যনীকেন ধর্মেন প্রত্যবস্থিতে প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্যঃ

স্বদৃষ্টান্তেহভ্যনুজানন্ প্রতিজ্ঞাং জহাতিতি (১) প্রতিজ্ঞাহানিঃ।
নিদর্শনং—‘ঐন্দ্রিয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটব’দিত্যে কৃতে অপার আহ,—দৃষ্ট-
মৈন্দ্রিয়কত্বং সামান্যে নিত্যে, কস্মিন্ন তথা শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতে ইদমাংহ
—যদৈন্দ্রিয়কং সামান্যং নিত্যং কামং ঘটো নিত্যোহস্তিতি । স খল্বয়ং
সাধকস্য দৃষ্টান্তস্য নিত্যত্বং প্রসঙ্গয়ন্ নিগমনান্তমেব পক্ষং জহাতি ।
পক্ষং জহৎ প্রতিজ্ঞাং জহাতিত্যাচ্যতে, প্রতিজ্ঞাপ্রয়ত্বাৎ পক্ষশ্চেতি ।

অমুবাদ । সাধ্যধর্মের বিরোধী ধর্মের দ্বারা (প্রতিবাদী) প্রত্যবস্থান করিলে
অর্থাৎ বাদীর হেতুতে কোন দোষ বলিলে (বাদী) স্বকীয় দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের
ধর্ম স্বীকার করত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন, এ জগৎ (১) “প্রতিজ্ঞাহানি” হয় ।

উদাহরণ যথা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপ্রযুক্ত শব্দ ঘটের আয় অনিত্য, এইরূপে (বাদী
নিজ পক্ষ স্থাপন) করিলে অপার অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, নিত্যসামান্যে অর্থাৎ
ঘটত্ব প্রভৃতি নিত্য জাতি পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্ট হয়, শব্দ কেন সেইরূপ নহে ?
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতির আয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দও কেন নিত্য হইবে না ?
এইরূপ প্রত্যবস্থান করিলে (বাদী) ইহা বলিলেন,—যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য
(ঘটাদি) নিত্য হয়, আচ্ছা ঘটও নিত্য হউক ? অর্থাৎ আমার নিজদৃষ্টান্ত
যে ঘট, তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করিব । সেই এই বাদী অর্থাৎ উক্ত স্থলে যিনি
ঐরূপ বলেন, তিনি সাধক দৃষ্টান্তের অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া গৃহীত নিজদৃষ্টান্ত ঘটের
নিত্যত্ব প্রসঙ্গন করায় নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষই ত্যাগ করেন । পক্ষ ত্যাগ করায়
প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন—ইহা কথিত হয় । কারণ, পক্ষ প্রতিজ্ঞাশ্রিত ।

টিপ্পনো । মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার প্রথমোক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থানের
লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন । ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের
পরে প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যধর্মের বিরুদ্ধ ধর্মের দ্বারা বাদীর হেতুতে কোন দোষ প্রদর্শন
করিলে, তখন যদি বাদী তাঁহার নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম স্বীকারই
করেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার সেই নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় “প্রতিজ্ঞাহানি”
নামক নিগ্রহস্থান হয় । যেহেতু কোন বাদী “শব্দোহনিত্য ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি ন্যায়বাক্য
প্রয়োগ করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলিলেন যে, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
হেতুর দ্বারা ঘটদৃষ্টান্তে শব্দকে অনিত্য বলিয়া সাধন করিতেছ, ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ত ঘটাদি
জাতিতেও আছে । কারণ, ঘটাদির আয় তদন্ত ঘটাদি জাতিরও প্রাপ্ত হইবে এবং ঐ জাতি
নিত্য বলিয়াই স্বীকৃত । তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হেতুর দ্বারা ঘটাদি জাতির আয়
শব্দের নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না ? যদি বল, অনিত্য ঘটাদি পদার্থেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকায়

উহা নিত্যত্বের ব্যভিচারী। তাহা হইলে উহা নিত্য ও অনিত্য, উভয় পদার্থেই বিদ্যমান থাকায় উহা অনিত্যত্বেরও ব্যভিচারী। সুতরাং ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহক হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে তখন বাদী যদি বলেন যে, আছে, ঘট নিত্য হউক। ইন্দ্রিয়গ্রাহক ঘটজ্ঞাপ্তি যখন নিত্য, তখন তদদৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়গ্রাহক ঘটকেও নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিব। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যার্থ যে অনিত্যত্ব, তাহার বিরুদ্ধ নিত্যত্ব ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ ঘটাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহক জ্ঞাপ্তিতে নিত্যত্ব ধর্ম প্রদর্শন করিয়া, বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিলে তখন বাদী, প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টান্ত যে, ঘটাদি জ্ঞাপ্তি, তাহার ধর্ম যে নিত্যত্ব, তাহা নিজ দৃষ্টান্ত ঘটে স্বীকার করায় এই সূত্রানুসারে তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, উক্ত স্থলে বাদীর দৃষ্টান্তহানিই হয়, প্রতিজ্ঞাহানি কিরূপে হইবে? তিনি ত তাঁহার “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিত্যাগ করেন না। এ জন্ত ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব স্বীকার করায় ফলতঃ তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমনবাক্য পর্য্যন্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। সুতরাং তিনি তখন প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন, ইহা কথিত হয়। কারণ, যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিজ্ঞাপ্রিত। এখানে বাদীর নিজ পক্ষের সাধন প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত ত্রায়বাক্যই “পক্ষ” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে ঐ ত্রায়বাক্যরূপ পক্ষ বলা যায় না। তাই ঐ পক্ষকে বলা হইয়াছে প্রতিজ্ঞাপ্রিত। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে বাদী প্রথমে অনিত্য ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহকরূপ হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে বাদী তখন তাঁহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় ঘটের ত্রায় শব্দ অনিত্য, এই কথা তিনি আর বলিতে পারেন না। পরন্তু ঘটের ত্রায় শব্দও নিত্য, ইহাই তাঁহার স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উক্ত স্থলে তিনি ঘট নিত্য হউক, এই কথা বলিয়া ফলতঃ তাঁহার পূর্বকথিত “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যরূপ পক্ষই পরিত্যাগ করায় তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” অবশ্যই হইবে।

কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদী উক্ত স্থলে স্পষ্ট কথায় শব্দ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরিত্যাগ না করায় তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” বলা যায় না। উক্ত স্থলে তাঁহার দৃষ্টান্তহানিই হয়। সুতরাং দৃষ্টান্ত-সিদ্ধি দোষপ্রযুক্তই তাঁহার নিগ্রহ হইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যদি স্পষ্ট কথায় বলেন যে, তাহা হইলে শব্দ নিত্যই হউক? শব্দকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিব? তাহা হইলেই বাদীর “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের যুক্তি সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টান্তের পরিত্যাগবশতঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসিদ্ধি না হওয়ার পক্ষ ত্যাগপ্রযুক্তই প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়, তাহা হইলে সমস্ত দোষ স্থলেই পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত

“প্রতিজ্ঞাহানি” স্বীকার করিতে হয়। উদ্যোতকর পরে তাঁহার উক্ত মতানুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,^১ সূত্রে “স্বদৃষ্টান্ত” শব্দের অর্থ এখানে স্বপক্ষ এবং “প্রতিদৃষ্টান্ত” শব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ। বাদীর সাধ্য ধর্ম্মই এখানে “স্বপক্ষ” শব্দের দ্বারা তাঁহার অভিমত এবং সাধ্যধর্ম্মশূন্য বিপক্ষই “প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা অভিমত। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে শব্দ বাদীর স্বপক্ষ এবং ঘটাদি জ্ঞাপ্তি প্রতিপক্ষ। সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী যদি শব্দ নিত্য হউক? এই কথা বলিয়া তাঁহার স্বপক্ষ শব্দে প্রতিপক্ষ জ্ঞাপ্তির ধর্ম্ম নিতান্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে মহর্ষির এই সূত্রানুসারে তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রদ্বারা সরলভাবে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার উদ্যোতকরের শ্রায় কষ্টকল্পনা করিয়া উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। “শ্রায়মঞ্জরী”কার জন্মস্ত তট্ট এবং “ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে”র “লঘুবৃত্তি”কার মনিতত্ত্ব সূরি প্রভৃতিও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য অন্ত্যস্ত দোষ স্থলেও বাদীর প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যরূপ পক্ষের পরিচয় প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে বাদী তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্ম স্বীকার না করায় তৎপ্রযুক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। যেখানে নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম্ম স্বীকার করায় পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ হয়, সেখানেই “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য, “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “প্রতিজ্ঞাহানি” শব্দ দ্বারা “প্রতিজ্ঞাহানি”র লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞার হানিই সূত্রার্থ। কিন্তু “প্রতিজ্ঞাহানি” শব্দের নিরুক্তির দ্বারা “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সিদ্ধ হইলেও মহর্ষি যখন “প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভানুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে” এই বাক্যও বলিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার “প্রতিজ্ঞাহানি”র লক্ষণ সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত স্থলে বাদী শব্দ নিত্য হউক? এই কথা বলিলে যেমন তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, তদ্রূপ ঘট নিত্য হউক? এই কথা বলিলেও তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উহা দ্বিতীয় প্রকার “প্রতিজ্ঞাহানি”। উদয়নাচার্য্যের কথানুসারে যদি মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের প্রদর্শিত উদাহরণদ্বয়ই সংগৃহীত হওয়ায় উভয় মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রে “প্রতিজ্ঞা” শব্দ ও “দৃষ্টান্ত” প্রভৃতি শব্দ প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর কথিত পক্ষ, সাধ্য, হেতু, দৃষ্টান্ত ও তদ্বিত্তি দুষণাদি সমস্তই বুঝিতে হইবে। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ মতানুসারে “তार्কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী অথবা প্রতিবাদী প্রথমে যে পক্ষ, সাধ্য, হেতু দৃষ্টান্ত ও দুষণ বলেন,

১। দৃষ্টান্তসাবস্তে (নিগমনে) ব্যবহৃত ইতি দৃষ্টান্তঃ, স্বচ্ছন্দো দৃষ্টান্তঃশ্চতি “স্বদৃষ্টান্ত”শব্দেন স্বপক্ষ এবান্তি-
বীজ্যতে। “প্রতিদৃষ্টান্ত”শব্দেন চ প্রতিপক্ষঃ, প্রতিপক্ষশ্চান্দো দৃষ্টান্তঃশ্চতি। এতদ্ব্যতঃ ভবতি,^২ পরপক্ষস্ত যো ধর্ম্ম-
স্তঃ স্বপক্ষ এবানুজ্ঞানাতীতি, ইত্যাদি।—শ্রায়বার্ত্তিক।

তদ্ব্যপেক্ষে পরে উহার যে কোন পদার্থের পরিভাগ করিলেই সেই স্থলে “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহ-স্থান হইবে। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের উক্তহানিই প্রতিজ্ঞাহানি। উক্তহানিই উহার সার্থক সামান্ত নাম। “প্রতিজ্ঞাহানি” এইটি উপলক্ষ্য নাম। ফলকথা, বাদী বা প্রতিবাদী কর্তৃক স্পষ্ট ভাষায় অথবা অর্থতঃ তাঁহাদিগের কথিত পক্ষ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের অথবা তাহাতে কথিত বিশেষণের পরিভাগ করিলেই সেই সমস্ত স্থলেই তদ্ব্যপেক্ষে “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণও “প্রতিজ্ঞাহানি” বলিয়া স্বীকার্য্য। বরদ্বার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া পঞ্চবিধ “প্রতিজ্ঞাহানি”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে স্বকীয় দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস গ্রহণ করিয়া সূত্রোক্ত “স্বদৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা স্বপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে “প্রতিদৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা পর-পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। বাহ্যভাষ্য “প্রতিজ্ঞাহানি”র অন্ত্যন্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। অন্ত্যন্ত কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ॥২॥

সূত্র । প্রতিজ্ঞাতার্থ-প্রতিষেধে ধর্মবিকল্পাত্তদর্থ- নির্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্ ॥৩॥৫০৭॥

অনুবাদ । প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ করিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞাতার্থের অসিদ্ধি সমর্থন করিলে ধর্মবিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ কোন ধর্মবিশেষকে সেই প্রতিজ্ঞাতার্থের বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়া (বাদী কর্তৃক) “তদর্থনির্দেশ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাতার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার সাধ্য নির্দেশ (২) প্রতিজ্ঞান্তর ।

ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাতার্থোহনিত্যঃ শব্দ ঐন্দ্রিয়কত্বাদৃষ্টব’দিত্যুক্তে যোহস্ম্য প্রতিষেধঃ প্রতিদৃষ্টান্তেন হেতুব্যভিচারঃ সামান্তমৈন্দ্রিয়কং নিত্যমিতি তস্মিংশ্চ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে, “ধর্মবিকল্পা”দিত্যি দৃষ্টান্ত-প্রতিদৃষ্টান্তয়োঃ সাধর্ম্যযোগে ধর্মভেদাৎ সামান্তমৈন্দ্রিয়কং সর্বগত-মৈন্দ্রিয়কত্বসর্বগতো ঘট ইতি ধর্মবিকল্পাৎ, “তদর্থনির্দেশ” ইতি সাধ্য-সিদ্ধার্থঃ । কথং ? যথা ঘটোহসর্বগত এবং শব্দোহপ্যসর্বগতো ঘটব-দেবানিত্য ইতি । তত্রানিত্যঃ শব্দ ইতি পূর্বা প্রতিজ্ঞা । অসর্বগত ইতি দ্বিতীয়া প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞান্তরং ।

তৎ কথং নিগ্রহস্থানমিতি ? ন প্রতিজ্ঞায়াঃ সাধনং প্রতিজ্ঞান্তরং, কিন্তু হেতুদৃষ্টান্তৌ সাধনং প্রতিজ্ঞায়াঃ । তদেতদসাধনোপাদানমনর্থক-মিতি, আনর্থক্যান্নিগ্রহস্থানমিতি ।

অনুবাদ । “প্রতিজ্ঞাতার্থ” (যথা)—শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ, যেমন ঘট, ইহা কথিত হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাদী কর্তৃক যে পদার্থ প্রতিজ্ঞাত হয়, ইহার যে প্রতিষেধ (অর্থাৎ) প্রতিদৃষ্টান্ত দ্বারা হেতুর ব্যভিচার (যেমন) সামাণ্য (জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ নিত্য । সেই “প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধ” প্রদর্শিত হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ হেতুতে তাহার সাধ্য ধর্ম অনিত্যত্বের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে । “ধর্মবিকল্পাৎ” এই বাক্যের অর্থ—দৃষ্টান্ত ও প্রতিদৃষ্টান্তের সাধর্ম্য সত্ত্বে ধর্মভেদপ্রযুক্ত । (যেমন পূর্বোক্ত স্থলে) সামাণ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ সর্বগত, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ ঘট অসর্বগত, এইরূপ ধর্মবিকল্পপ্রযুক্ত । “তদর্থনির্দেশ” এই বাক্যের অর্থ সাধ্যসিদ্ধার্থ নির্দেশ । (প্রশ্ন ১) কিরূপ ? অর্থাৎ পুনর্বীর বাদীর সেই নির্দেশ কিরূপ ? (উত্তর) যেমন ঘট অসর্বগত, এইরূপ শব্দও অসর্বগত ও ঘটের শ্রায়ই অনিত্য । সেই স্থলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে শব্দ অনিত্য, ইহা (বাদীর) প্রথম প্রতিজ্ঞা, শব্দ অসর্বগত, ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা (২) প্রতিজ্ঞান্তর ।

(প্রশ্ন) তাহা কেন নিগ্রহস্থান হইবে ? (উত্তর) প্রতিজ্ঞান্তর প্রতিজ্ঞার সাধন নহে, কিন্তু হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রতিজ্ঞার সাধন । সেই এই অসাধনের উপাদান নিরর্থক, নিরর্থকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান ।

টীকণী । “প্রতিজ্ঞাহানি”র পরে এই সূত্রের দ্বারা “প্রতিজ্ঞান্তর” নামক দ্বিতীয় প্রকার নিগ্রহস্থানের লক্ষণ কথিত হইয়াছে । ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থলেই যথাক্রমে সূত্রোক্ত “প্রতিজ্ঞাতার্থ” শব্দ, “প্রতিষেধ” শব্দ, “ধর্মবিকল্প” শব্দ এবং “তদর্থনির্দেশ” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, প্রথম কোন নৈয়ায়িক বাদী “শব্দোহনিত্য ইন্দ্রিয়কত্বদৃষ্টতঃ” ইত্যাদি গ্রাহব্য প্রয়োগ করিয়া শব্দ অনিত্যত্ব ধর্মের সংস্থাপন করিলেন । উক্ত স্থলে শব্দ অনিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরূপে শব্দই বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থ । পরে প্রতিবাদী মীমাংসক দ্বিতীয় পক্ষস্থ হইয়া বলিলেন যে, ঘটাদি জাতিও ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ, কিন্তু তাহা অনিত্য নহে—নিত্য । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ অনিত্যত্বের ব্যভিচার হওয়ার উহা অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না । উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতুতে প্রতিবাদী উক্তরূপে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেন, উহাই বাদীর প্রতিজ্ঞাতার্থের প্রতিষেধ । পরে উক্ত

ব্যভিচার নিরাকরণের উদ্দেশ্যে বাদী নৈয়ায়িক তৃতীয় পক্ষস্থ হইয়া বলিলেন যে, ঘটাদি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বটে, কিন্তু তাহা সৰ্ব্বগত অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ের সর্বাত্মক ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঘট সৰ্ব্বগত নহে—অসৰ্ব্বগত। এইরূপ শব্দও অসৰ্ব্বগত, এবং ঘটের জায়গাই অনিত্য। বাদী এই কথা বলিয়া তাঁহার নিজ দৃষ্টান্ত ঘট এবং প্রতিদৃষ্টান্ত জাতির যে অসৰ্ব্বগতত্ব ও সৰ্ব্বগতত্বরূপ ধর্মভেদ প্রকাশ করিলেন, ঐ ধর্মভেদই উক্ত স্থলে সূত্রোক্ত “ধর্মবিকল্প”। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “ধর্মবিকল্প” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—দৃষ্টান্ত ও প্রতিদৃষ্টান্তের সাধারণ্য সত্ত্বে ধর্মভেদ এবং পরে প্রকৃত স্থলে ঐ ধর্মবিকল্প ব্যক্ত করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতি সৰ্ব্বগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘট অসৰ্ব্বগত। অর্থাৎ জাতি ও ঘটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধারণ্য আছে এবং সৰ্ব্বগতত্ব ও অসৰ্ব্বগতত্বরূপ ধর্মভেদ আছে। সুতরাং উহা ধর্মবিকল্প। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত “তদর্থনির্দেশ” শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে “তদর্থ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সাধাসিদ্ধার্থ। অর্থাৎ বাদী তাঁহার সাধাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনর্বার যে নির্দেশ করেন, তাহাই সূত্রোক্ত “তদর্থনির্দেশ”। উক্ত স্থলে তাহা কিরূপ নির্দেশ? ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ত ভাষ্যকার নিজেরই প্রশ্নপূর্বক পরে বলিয়াছেন যে, যেমন ঘট অসৰ্ব্বগত, তদ্রূপ শব্দও অসৰ্ব্বগত ও ঘটের জায়গাই অনিত্য। উক্ত স্থলে “শব্দ অনিত্য” ইহা বাদীর প্রথম প্রতিজ্ঞা। “শব্দ অসৰ্ব্বগত” ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। ভাষ্যকার ঐ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই উক্ত স্থলে বাদীর “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কিন্তু বার্তিককার উক্ত স্থলে “অসৰ্ব্বগতঃ শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই “প্রতিজ্ঞাস্তর” বলিয়াছেন।

তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের গৃঢ় তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী মীমাংসক বাদীর হেতুতে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ ব্যভিচার নিরাকরণের জন্ত পরে “অসৰ্ব্বগতত্বে সতি ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্যই বাদীর বিবক্ষিত। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর বিবক্ষা এই যে, যাহা অসৰ্ব্বগত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা অনিত্য। ঘটাদি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও অসৰ্ব্বগত নহে। সুতরাং তাহাতে ঐ বিশিষ্ট হেতু না থাকায় প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ঐ ব্যভিচার নাই। কিন্তু প্রতিবাদী মীমাংসক শব্দকেও জাতির জায়গাই সৰ্ব্বগতই বলেন। কারণ, তাঁহার মতে বর্ণায়ুক শব্দের কোন স্থানবিশেষে উৎপত্তি হয় না। উহা সর্বদাই সর্বত্র বিদ্যমান আছে। সুতরাং উহা নিত্য বিভূ। তাহা হইলে বাদীর বিবক্ষিত ঐ বিশিষ্ট হেতু শব্দে না থাকায় উহা শব্দের অনিত্যত্বসাধক হয় না। যে হেতু প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ, তাহা সিদ্ধ না করিলে তাহাকে হেতু বলা যায় না। তাই বাদী নৈয়ায়িক শব্দ অসৰ্ব্বগতত্ব সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই পরে “শব্দোহসৰ্ব্বগতঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করায় উহা তাঁহার “প্রতিজ্ঞাস্তর”-নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী “অসৰ্ব্বগতত্বে সতি ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে তাঁহার “হেতুস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু বাদী তাহা করেন না। তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে “শব্দোহসৰ্ব্বগতঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যমাত্র প্রয়োগ করিয়াই বিরত হন। তাঁহার ঐ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হেতুশূন্য হইলেও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় উহা প্রতিজ্ঞাস্তর

বলা যায়। উক্ত স্থলে বাদী যখন প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই পরে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন উক্ত স্থলে তিনি তাঁহার হেতুর ব্যভিচারিণ্যপ্রযুক্ত নিগৃহীত হইবেন না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাস্তরপ্রযুক্তই নিগৃহীত হইবেন। “আধমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উক্ত স্থলে বাদীর ঐ প্রতিজ্ঞাস্তর নিগ্রহস্থান হইবে কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে প্রসঙ্গপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে যে, “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, উহার সাধন নাই। তাঁহার শেষোক্ত প্রতিজ্ঞাস্তর ঐ প্রতিজ্ঞার সাধন নহে। কিন্তু প্রকৃত নির্দোষ হেতু ও দৃষ্টান্তই উহার সাধন। তিনি তাহা না বলিয়া, যে প্রতিজ্ঞাস্তর গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অসাধনের গ্রহণ, স্মৃতরাং নিরর্থক। নিরর্থকত্ববশতঃ উহা তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে বাদী পরে “অসর্গগতঃ শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলিলেও উক্ত যুক্তিতে “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। এবং বাদী মীমাংসক “শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি ধ্বন্যাত্মক শব্দে নিত্য নাই বলিয়া অংশতঃ বাধদোষ প্রদর্শন করেন, তখন ঐ বাধদোষের উদ্ধারের জন্য বাদী মীমাংসক যদি “বর্ণাত্মকঃ শব্দোহনিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলেন, তাহা হইলে উহাও তখন তাঁহার “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার সাধ্যাধর্ম্মী শব্দে বর্ণাত্মকত্ব বিশেষণের উল্লেখ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা বলেন, উহা তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, স্মৃতরাং প্রতিজ্ঞাস্তর। উক্ত স্থলে তিনি তাঁহার প্রথম প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেও একেবারে নিজের পক্ষ বা কোন পদার্থের ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু প্রথম প্রতিজ্ঞার্থই ঐরূপ বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতরাং উক্ত স্থলে তাঁহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাকে একেবারে ত্যাগ করিলেই সেখানে “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু “প্রতিজ্ঞাস্তর” স্থলে বাদী নিজপক্ষ ত্যাগ না করায় পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ হয় না, ইহাই বিশেষ।

এইরূপ বাদী বা প্রতিবাদী যদি তাঁহাদিগের হেতু ভিন্ন সাধ্যাধর্ম্ম বা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যে কোন পদার্থেও কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পরে নিজের অনুমানের সংশোধন করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত স্থলেও তাঁহাদিগের “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। মহাতৈয়্যায়িক উদয়নাচার্য্যের স্বল্প বিচারানুসারে “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ উক্তরূপেই “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, তদনুসারে অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সূত্রে “প্রতিজ্ঞাতার্কন্তু” এই বাক্যটি প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমান প্রয়োগ স্থলে হেতু ভিন্ন সমস্ত পদার্থই বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির যুক্তি এই যে, বাদী বা প্রতিবাদী তাঁহাদিগের কথিত হেতু পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে সেখানে “হেতুস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা মহর্ষি পরে পৃথক্ উল্লেখ করায় উহা তাঁহার মতে “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সাধ্যাধর্ম্ম বা

দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অন্ত্য যে কোন পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে, সেই সমস্ত স্থলে যে নিগ্রহস্থান, তাহাও মহর্ষির মতে “প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কারণ, “হেতুস্তরে”র স্থায় “উদাহরণাস্তর” ও “উপনয়নাস্তর” প্রভৃতি নামে মহর্ষি পৃথক্ কোন নিগ্রহস্থান বলেন নাই। কিন্তু তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্তও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্ত দ্বারাও বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি বুঝা যায়। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তাঁহার নিগ্রহই ॥৩॥

সূত্র । প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ॥

॥৪॥৫০৮॥

অনুবাদ । প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ অর্থাৎ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ অথবা প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ (৩) “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” ।

ভাষ্য । “গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্য”মিতি প্রতিজ্ঞা । “রূপাদিতোহর্থান্তরস্থানুপলক্ষে”রিতি হেতুঃ । সোহয়ং প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ । কথং ? যদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং, রূপাদিতোহর্থান্তরস্থানুপলক্ষিনোপপদ্যতে । অথ রূপাদিতোহর্থান্তরস্থানুপলক্ষিগুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি নোপপদ্যতে । গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং, রূপাদিত্যশ্চার্থান্তরস্থানুপলক্ষির্বিরুদ্ধাভ্যুত্যাগে ব্যাহতে ন সম্ভবতীতি ।

অনুবাদ । ‘গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং’—ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য । ‘রূপাদিতোহর্থান্তরস্থানুপলক্ষে’—ইহা হেতুবাক্য । সেই ইহা প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের বিরোধ । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যদি দ্রব্য, গুণব্যতিরিক্ত অর্থাৎ রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন হয়, রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলক্ষি উপপন্ন হয় না । আর যদি রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলক্ষি হয়, তাহা হইলে গুণব্যতিরিক্ত দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ তাহার রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন, ইহা উপপন্ন হয় না । দ্রব্য গুণ হইতে ভিন্ন এবং রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলক্ষি বিরুদ্ধ হয় (অর্থাৎ) ব্যাহত হয়, সম্ভব হয় না ।

টিপ্পনী । এই সূত্র দ্বারা “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক তৃতীয় নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তদ্বারা সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন । যেমন কোন বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলেন,—“গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং” । বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ এই

যে, ঘটাদি দ্রব্য তাহার রূপরসাদি গুণ হইতে ভিন্ন, গুণ ও গুণী ভিন্ন পদার্থ। বাদী পরে হেতুবাক্য বলিলেন,—“রূপাদিতোহর্গাস্তত্ত্বানুপলব্ধেঃ”। অর্থাৎ যেহেতু রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থের উপলব্ধি হয় না; রূপাদি গুণেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু এখানে বাদীর ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া বিরুদ্ধ। কারণ, ঘটাদি দ্রব্যকে তাহার গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে ভিন্নরূপে উহার উপলব্ধিই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পরে আর উহার ঐরূপে অনুপলব্ধি বলা যায় না। কারণ, তাহা বলিলে আবার দ্রব্য ও গুণকে অভিন্নই বলা হয়। সুতরাং ঘটাদি দ্রব্য তাহার গুণ হইতে ভিন্ন এবং ঐ গুণ হইতে ভিন্ন দ্রব্যের অনুপলব্ধি, ইহা পরস্পর ব্যাহত অর্থাৎ সম্ভবই হয় না। অতএব উক্ত স্থলে বাদীর ঐ হেতুবাক্যের সহিত তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধবশতঃ উহা তাঁহার পক্ষে “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান।

বার্তিককার উদ্যোতকর এখানে এই সূত্র দ্বারা “প্রতিজ্ঞাবিরোধে”র অর্থ “হেতুবিরোধ” এবং “দৃষ্টান্তবিরোধ” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিও এই সূত্রের প্রথমোক্ত “প্রতিজ্ঞা” শব্দ ও “হেতু” শব্দকে প্রতিযোগী মাত্রের উপলক্ষণ বলিয়া, উহার দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি প্রতিযোগী পদার্থও গ্রহণ করিয়াছেন এবং সূত্রের “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” শব্দের অন্তর্গত “প্রতিজ্ঞা” শব্দকেও উপলক্ষণার্থ বলিয়া, উহার দ্বারা “হেতুবিরোধ” ও “দৃষ্টান্তবিরোধ” প্রভৃতিকেও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই সংগ্রহের জন্য সূত্রত্যাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যগত যে সমস্ত পদার্থের পরস্পর বিরোধ প্রভূত হয়, সেই সমস্ত বিরোধই নিগ্রহস্থান। উহা প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেতুবিরোধ, দৃষ্টান্তবিরোধ প্রভৃতি নামে বহুবিধ। বাদীর হেতুবাক্যের সহিত তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইলে উহা হেতুবিরোধ। উদ্যোতকর ইহার পৃথক উদাহরণ বলিয়াছেন। উক্ত মতে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণও “হেতুবিরোধ”। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য স্বচন-বিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদদ্বয়েরই পরস্পর বিরোধ হইলে, সেখানে উহা “প্রতিজ্ঞাবিরোধ”। উদ্যোতকর ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,—“শ্রমণা গভিনী” অর্থাৎ কোন বাদী “শ্রমণা গভিনী” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে উহার অন্তর্গত পদদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, শ্রমণা (মহ্যানিনী) বলিলে তাহাকে গভিনী বলা যায় না। গভিনী বলিলে তাহাকে শ্রমণা বলা যায় না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত দৃষ্টান্তের বিরোধ, দৃষ্টান্তাদির সহিত হেতুর বিরোধ, এবং প্রতিজ্ঞা ও হেতুর প্রমাণবিরোধও বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উক্তরূপ বহুপ্রকার বিরোধকেই এই সূত্র দ্বারা নিগ্রহস্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, তুল্য যুক্তিতে ঐ সমস্ত বিরোধও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত যুক্তি অনুসারে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সূত্রের প্রথমোক্ত “প্রতিজ্ঞা” শব্দ ও “হেতু” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যকালীন বাক্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর যে কোন নিজ বাক্যার্থবিরোধই “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান।

এখানে পূর্বপক্ষ এই যে, ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণে বাদীর নিজমতে তাঁহার হেতুই অদিক।

কারণ, যিনি ঘটাদি দ্রব্যকে রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থই বলেন, তাঁহার মতে উক্ত হেতুই নাই। উক্ত স্থলে বাদী যদি প্রমাণ দ্বারা উহা সিদ্ধ করেন, তাহা হইলেও উহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস। কারণ, যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন শব্দনিত্যবাদী মীমাংসক “শব্দো নিত্যঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া যদি “কার্য্যত্বাৎ” এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ঐ কার্য্যত্ব হেতু বিরুদ্ধ নামক হেতুভাস। কারণ, শব্দে নিত্যত্ব থাকিলে তাহাতে কার্য্যত্ব থাকিতে পারে না। কার্য্যত্ব নিত্যত্বের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্থলেও “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাস হওয়ার উহাই বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামে পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবশ্যক ও অযুক্ত। বৌদ্ধসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বারা এই “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থানেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন। পরে বাচস্পতি মিশ্র ও জয়স্ব ভট্ট প্রভৃতি তাঁহাদিগের সমস্ত কথারই প্রতিবাদ করিয়া সমাধান করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহাদিগের সমাধানের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে বাদীর হেতু বস্তুতঃ অসিদ্ধ বা বিরুদ্ধ হইলেও সেই হেতুভাস-জ্ঞানের পূর্ব্বই প্রতিজ্ঞাবিরোধের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন কেহ প্রথমে “অস্তি” বলিয়া, পরেই “নাস্তি” বলিলে তখনই ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ বুঝা যায়, তদ্রূপ উক্ত স্থলে ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে ঐ হেতুবাক্যের উচ্চারণ করিলেই তখন ঐ হেতুতে ব্যাপ্তি-চিহ্নের পূর্ব্বই ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাসের জ্ঞানস্থলে ব্যাপ্তি স্মরণের পরে তৎপ্রযুক্তই হেতুতে সাধোর বিরোধ প্রতীত হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে পূর্ব্ব-প্রতীত “প্রতিজ্ঞাবিরোধ”ই নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। কারণ, প্রথমেই উহার দ্বারা বাদীর বিপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ার উহার দ্বারা সেই বাদী নিগৃহীত হন। পরে হেতুভাসজ্ঞান হইলেও সেই হেতুভাস আর সেখানে নিগ্রহস্থান হয় না। কারণ, যেমন কাষ্ঠ ভস্মীকৃত হইলে তখন আর অগ্নি তাহার দাহক হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে বাদী পূর্ব্বই নিগৃহীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেখানে আর কিছু নিগ্রহস্থান হয় না। উদয়নাচার্য্যও “তাৎপর্য্য-পরিণুক্তি”গ্রন্থে পূর্ব্বই এই কথাই বলিয়াছেন,—“নহি মৃতোহপি মার্য্যতে”। অর্থাৎ যে মৃতই হইয়াছে, তাহাকে কেহ আর মারে না। ভাস্কর্য্যজের “শ্রাব্যসারে”র টীকাকার জয়সিংহ স্মরিও “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” ও “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাসের পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষই স্পষ্ট বলিয়াছেন^১। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞাবিরোধের সহিত হেতুভাসের সাংকর্য্যও স্বীকার করিয়া সংকীর্ণ নিগ্রহস্থানও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি অসংকীর্ণ “প্রতিজ্ঞাবিরোধে”রও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যেখানে প্রতিবাদী হেতুভাসের উদ্ভাবন না করিয়া, প্রথমে বাদীর প্রতিজ্ঞাবিরোধেরই উদ্ভাবন করিবেন, সেখানেও তদ্বারা তখনই সেই বাদীর নিগ্রহ স্বীকার্য্য। সুতরাং “প্রতিজ্ঞাবিরোধ”কেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য ॥৪৥

১। নবমঃ বিরুদ্ধো হেতুভাসো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেন্ন, বিরুদ্ধহেতুভাসে ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাবিরোধোহব্যর্থ্যতে, অত্র তু প্রতিজ্ঞাহেতুবচনপ্রণয়নাদেবেতি মহান্ ভবঃ :- শ্রাব্যসার টীকা।

সূত্র । পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসঃ ॥৫॥৫০৯॥

অনুবাদ । পক্ষের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার পক্ষ খণ্ডন করিলে (বাদী কর্তৃক) প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ অস্বীকার (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস ।

ভাষ্য । ‘অনিত্যঃ শব্দ ইন্দ্রিয়কত্বা’দিত্যুক্তে পরো ক্রয়াৎ ‘সামান্য-মৈন্দ্রিয়কং ন চানিত্যমেবং শব্দোহপ্যৈন্দ্রিয়কো ন চানিত্য’ ইতি । এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ক্রয়াৎ—‘কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব্দ’ ইতি । মোহয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থনিহুবঃ প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস ইতি ।

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ, ইহা (বাদী কর্তৃক) উক্ত হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ, কিন্তু অনিত্য নহে, এইরূপ শব্দও ইন্দ্রিয়গ্রাহ, কিন্তু অনিত্য নহে । এইরূপে বাদীর পক্ষ খণ্ডিত হইলে (বাদী) যদি বলেন,—“অনিত্যঃ শব্দঃ” ইহা আবার কে বলিয়াছে, অর্থাৎ আমি ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলি নাই । সেই এই প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ নিজ-কৃত প্রতিজ্ঞার অস্বীকার (৪) “প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস” নামক নিগ্রহস্থান ।

টিপ্পনী । “প্রতিজ্ঞাবিরোধে”র পরে এই সূত্রের দ্বারা “প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস” নামক চতুর্থ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, ঐ পক্ষের প্রতিষেধ করিলে, তখন বাদী যদি সেই দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থের “অপনয়ন” অর্থাৎ অপলাপ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার “প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্য ইন্দ্রিয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ জাতি নিত্য, এইরূপ শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ হইলেও নিত্য হইতে পারে । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ হেতুর দ্বারা শব্দ অনিত্য সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, উহা অনিত্যত্বের ব্যভিচারী । তখন বাদী প্রতিবাদীর কথিত ঐ ব্যভিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বলিলেন যে, ‘শব্দ অনিত্য, ইহা কে বলিয়াছে ? আমি ত উহা বলি নাই’ । উক্ত স্থলে বাদীর যে নিজ প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ বা অস্বীকার, উহা তাঁহার বিশ্বাসিত্যের অনুমানক হওয়ায় নিগ্রহস্থান হইবে । উহার নাম “প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস” । “প্রতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থ অথবা নিজের উক্ত যে কোন পদার্থ পরিত্যাগ করিলেও উহা অস্বীকার করেন না, কিন্তু “প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস” স্থলে উহা অস্বীকারই করেন । সুতরাং “প্রতিজ্ঞাহানি” ও “প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসে”র ভেদ আছে ।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে যেমন বাদী বা প্রতিবাদী নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেই “প্রতিজ্ঞাহানি” হইবে, তদ্রূপ নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের অপলাপ করিলেই “প্রতিজ্ঞাসম্মাস” হইবে। অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি কোন পদার্থের অপলাপ করিলেও উহাও প্রতিজ্ঞাসম্মাস বলিয়াই গ্রাহ্য। কারণ, তুল্য যুক্তিতে উহাও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। উক্ত মতানুসারে বরদরাজ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সূত্রে “পক্ষ” শব্দ ও “প্রতিজ্ঞাতার্থ” শব্দের দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের উক্ত মাত্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের প্রতিষেধ হইলে তাহার পরিহারের উদ্দেশ্যে সেই উক্ত পদার্থের সম্মাস বা অস্বীকারই প্রতিজ্ঞাসম্মাস, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত সূত্রার্থ। সেই উক্ত সম্মাস চতুর্বিধ, যথা—(১) কে ইহা বলিয়াছে? অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই। অথবা (২) আমি ইহা অপরের মত বলিয়াছি, আমার নিজমত উহা নহে। অথবা (৩) তুমিই ইহা বলিয়াছ, আমি ত বলি নাই। অথবা (৪) আমি অপরের কথারই অনুবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে ঐ কথা বলি নাই।

বৌদ্ধসম্প্রদায় এই “প্রতিজ্ঞাসম্মাস”কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সভামধ্যে সকলের সম্মুখে কোন্ বাদী ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরেই আবার উহা অস্বীকার করে ও করিতে পারে? ধর্ম্মকোত্তির পরে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে উক্ত বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় তিনি হেত্বাভাসের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। “প্রতিজ্ঞাসম্মাস” নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাবশ্যক। আর তাহা স্বীকার করিলে উক্তরূপ স্থলে বাদী যেখানে একেবারে নীরব হইবেন, সেখানে তাঁহার “তৃণোস্তাব” নামেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয় এবং কোন প্রলাপ বলিলে “প্রলপিত” নামেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয়। বাচস্পতি মিশ্র ধর্ম্মকোত্তির ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তদন্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী তাঁহার হেতুতে প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই পূর্বোক্তরূপে “প্রতিজ্ঞাসম্মাস” করেন। তিনি তখন মনে করেন যে, আমি এখানে আমার প্রতিজ্ঞার অপলাপ করিতে পারিলে প্রতিবাদী আর আমার হেতুতে পূর্ববৎ ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। আমি পরে অতঃপরই আবার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োগ করিব, যাহাতে আমার কথিত হেতু ব্যভিচারী হইবে না। সুতরাং উক্ত স্থলে কোন বাদীর ঐ “প্রতিজ্ঞাসম্মাস” তাঁহার প্রমাদমূলক মিথ্যাবাদ হইলেও উক্তরূপ উদ্দেশ্যে উহা কাহারও পক্ষে হইতে পারে, উহা অসম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত স্থলে তিনি যখন প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ উত্তর করেন, তখন সেখানে প্রতিবাদী আর তাঁহাকে সেই ব্যভিচার বা হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিয়া নিগৃহীত বলিতে পারেন না। সুতরাং তিনি আর তখন উহার উদ্ভাবনও করেন না। কিন্তু এখন তিনি বাদীর সেই “প্রতিজ্ঞাসম্মাসে”ই উদ্ভাবন করেন। পরন্তু পরে তিনি ঐ ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে গেলেও তৎপূর্বে বাদীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে বলিতেই হইবে এবং বাদী উহা অস্বীকার করিলে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাসম্মাসের উদ্ভাবনও

অবশ্য তখনই করিতে হইবে। নচেৎ তিনি বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার-দোষের সমর্থন করিতে পারেন না। সুতরাং পরে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে হইলে যখন তৎপূর্বে তাঁহার উক্ত “প্রতিজ্ঞাসম্মাস”র উদ্ভাবন অবশ্য কর্তব্য হইবে, তখন পূর্বে উদ্ভাবিত সেই “প্রতিজ্ঞাসম্মাস”ই উক্ত স্থলে বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। সেখানে হেত্বাভাস নিগ্রহস্থান হইবে না। প্রতিবাদীও পরে আর উহার উদ্ভাবন করিবেন না। কিন্তু উক্তরূপ স্থলে বাদীর তুষ্ণীস্তাব বা প্রলাপ দ্বারা তাঁহার হেতুর ব্যভিচার দোষের উদ্ধার সম্ভবই হয় না এবং তুষ্ণীস্তাব প্রভৃতি প্রতিবাদীর হেত্বাভাসোদ্ভাবনের পরেই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলা অনায়াসক। তাই মহর্ষি তাহা বলেন নাই। ৫।

সূত্র। অবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষ- মিচ্ছতো হেত্বন্তরং ॥৩॥৫১০॥

অনুবাদ। অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে বিশেষ ইচ্ছাকারীর “হেত্বন্তর” হয় (অর্থাৎ বাদী নির্কিশেষণ সামান্য হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ঐ হেতুতে ব্যভিচারাদিদোষ প্রদর্শন করিয়া যদি উহার খণ্ডন করেন, তখন বাদী সেই দোষের উদ্ধারের জন্ত তাঁহার পূর্বোক্ত হেতুতে কোন বিশেষণ বলিলে তাদৃশ বিশিষ্ট হেতুকখন তাঁহার পক্ষে “হেত্বন্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে।)

ভাষ্য। নিদর্শনং—‘একপ্রকৃতিদং ব্যক্ত’মিতি প্রতিজ্ঞা। কস্মা-
দ্বোতোঃ? একপ্রকৃतीনাং বিকারাণাং পরিমাণাৎ। সূত্রপূর্বকাণাং
শরাবাদীনাং দৃষ্টং পরিমাণং, যাবান্ প্রকৃতেবু্যহো ভবতি, তাবান্ বিকার
ইতি। দৃষ্টঞ্চ প্রতিবিকারং পরিমাণং। অস্তি চেদং পরিমাণং প্রতি-
ব্যক্তং। তদেকপ্রকৃतीনাং বিকারাণাং—পরিমাণাৎ পশ্যামো ব্যক্তমিদ-
মেকপ্রকৃতিতি।

অস্য ব্যভিচারেণ প্রত্যবস্থানং—মানাপ্রকৃतीনামেকপ্রকৃतीনাঞ্চ
বিকারাণাং দৃষ্টং পরিমাণমিতি।

এবং প্রত্যবস্থিতে আহ—একপ্রকৃতিসমন্বয়ে সতি শরাবাদিবিকা-
রাণাং পরিমাণদর্শনাৎ। সূত্র-দুঃখ-মোহসমন্বিতং হীদং ব্যক্তং পরিমিতং
গৃহ্যতে। তত্র প্রকৃত্যন্তররূপসমন্বয়াভাবে সত্যেকপ্রকৃতিত্বমিতি।

তদিদমবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষঃ ক্রবতো হেত্বন্তরং ভবতি

সতি চ হেতুস্তরভাবে পূর্বস্থ হেতোরসাধকত্বান্নিগ্রহস্থানং । হেতুস্তরবচনে সতি যদি হেতুর্থনিদর্শনো, দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে নেদং ব্যক্তমেকপ্রকৃতি ভবতি—প্রকৃত্যন্তরোপাদানাং । অথ নোপাদীয়তে—দৃষ্টান্তে হেতুর্থস্য-নিদর্শিতস্য সাধকভাবানুপপত্তেরানর্থক্যাদ্ধেতোরনিবৃত্তং নিগ্রহস্থানমিতি ।

অনুবাদ । “নিদর্শন” অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত “হেতুস্তর” নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ যথা—এই ব্যক্ত, এক প্রকৃতি, ইহা প্রতিজ্ঞা । (প্রশ্ন) কোন্ হেতু-প্রযুক্ত ? (উত্তর) একপ্রকৃতি বিকারসমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত । (উদাহরণ) মৃত্তিকাজাত শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দৃষ্ট হয় । প্রকৃতির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ উপাদান-কারণের সংস্থান যে পর্য্যন্ত হয়, বিকার অর্থাৎ তাহার কার্য্য শরাবাদি সেই পর্য্যন্ত হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিকারে ঐরূপ পরিমাণ হয় । প্রত্যেক বিকারে পরিমাণ দৃষ্ট ও হয় । (উপনয়) এই পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থেই আছে । (নিগমন) সুতরাং এক প্রকৃতি বিকারসমূহের পরিমাণপ্রযুক্ত এই ব্যক্ত এক প্রকৃতি, ইহা আমরা বুঝি । [অর্থাৎ সাংখ্যমতানুসারে কোন বাদী উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষের সংস্থাপন করিলেন যে, মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্ত জগতের মূল উপাদান এক, যে হেতু তাহাতে পরিমাণ আছে, যেমন একই মৃত্তিকাজাত ঘটাদি দ্রব্যের পরিমাণ আছে এবং উহার মূল উপাদান এক । ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই পরিমাণ আছে, সুতরাং তাহার মূল উপাদান এক । উহা অব্যক্ত ও মূল প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে] ।

ব্যভিচার দ্বারা ইহার প্রত্যবস্থান যথা—নানা প্রকৃতি ও এক প্রকৃতি বিকার-সমূহের পরিমাণ দৃষ্ট হয় । [অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাদী উক্তরূপে তাঁহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী উহার প্রত্যবস্থান করিলেন যে, পাথির ঘটাদি দ্রব্য এবং সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কারাদি দ্রব্যও পরিমাণ আছে, কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্য এক প্রকৃতি নহে, ঐ সমস্ত নানাজাতীয় দ্রব্যের উপাদান-কারণ ভিন্ন, অতএব বাদীর কথিত যে পরিমাণরূপ হেতু, তাহা তাঁহাব সাধ্য ধর্ম্ম একপ্রকৃতিত্বের ব্যভিচারী] ।

(প্রতিবাদী) এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাদীর উক্ত হেতুতে ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করিলে (বাদী) বলিলেন, যেহেতু একত্বভাবের সমন্বয় থাকিলে

১। হেতুঃ সাধনং, অর্থঃ সাধ্যঃ তে হেতুর্থো নিদর্শয়ত্বাৎ সাধকভাবেনৈতি নিদর্শনং । হেতুর্থোনিদর্শনো হেতুর্থনিদর্শনো দৃষ্টান্তঃ ।—তাৎপর্য্যটীকা ।

শরাদি বিকারের পরিমাণ দেখা যায় (অর্থাৎ) যেহেতু সুখ-দুঃখ-মোহ-সমস্তিত এই ব্যক্ত, পরিমিত বলিয়া গৃহীত হয়। তাহা হইলে অন্য প্রকৃতির রূপের অর্থাৎ অন্য উপাদানের স্বভাবের সমন্বয়ের অভাব থাকিলে একপ্রকৃতিই সিদ্ধ হয় [অর্থাৎ বাদী উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জন্ত পরে অন্য হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলেন,— “একস্বভাবসমন্বয়ে সতি পরিমাণাৎ”। পার্থিব ঘটাদি ও সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কারাদি বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিমাণ থাকিলেও এক স্বভাবের সমন্বয় নাই। সুতরাং তাহাতে উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাদীর বক্তব্য]।

অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বিশেষাংশু পরিমাণরূপ হেতু ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিবাদী কর্তৃক দূষিত হইলে বিশেষবাদীর অর্থাৎ উক্ত হেতুতে একস্বভাবসমন্বয়রূপ বিশেষণবাদী প্রতিবাদীর সেই ইহা “হেতুস্তর” হয়। হেতুস্তর থাকিলেও পূর্বহেতুর অসাধকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান হয়। হেতুস্তর-বচন হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ঐ বিশেষণবিশিষ্ট অন্য হেতু বলিলেও যদি “হেতুর্থনিদর্শন” অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি হয় না,—কারণ, অন্য প্রকৃতির অর্থাৎ সেই দৃষ্টান্তের অন্য উপাদানের গ্রহণ হইয়াছে। আর যদি দৃষ্টান্ত গৃহীত না হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তে অনির্দেশিত অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া অপ্রদর্শিত হেতুপদার্থের সাধকত্বের অনুপপত্তিবশতঃ হেতুর আনর্থক্যপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা “হেতুস্তর” নামক পঞ্চম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ স্থিতি হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“একপ্রকৃতিদং ব্যক্তমিতি প্রতিজ্ঞা”। অর্থাৎ সাংখ্যমতে সংস্থাপন করিবার জন্ত কোন বাদী উক্ত প্রতিজ্ঞাব্যবহার দ্বারা বলিলেন যে, এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতি। এখানে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ উপাদানকারণ। “এক প্রকৃতির্থন্তু” এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে ঐ “একপ্রকৃতি” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের মূল উপাদানকারণ এক। সাংখ্যমতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি জড় তত্ত্বের নাম ব্যক্ত এবং উহার মূল উপাদান অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত। ঐ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি এক। ব্যক্ত পদার্থমাত্রই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সুতরাং উহার মূল উপাদানও সুখদুঃখ-মোহাত্মক, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। তাই সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিই ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাব্যবহার প্রয়োগ করিয়া, বাদী হেতুবাক্য বলিলেন,—“পরিমাণাৎ”। বাদীর বক্তব্য এই যে, একই মুক্তিকা হইতে

ঘট ও শরাব প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য জন্মে, তাহাতে সেই উপাদানের পরিমাণের তুল্য পরিমাণ দেখা যায়। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই যখন পরিমাণ আছে, তখন ঐ হেতু ও উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত পদার্থ-মাত্রেরই মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। বাদী উক্তরূপে তাঁহার নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, মৃত্তিকানিশ্চিত ঘটাদি দ্রব্যে যেমন পরিমাণ আছে, তদ্রূপ সূবর্ণাদিনিশ্চিত অলঙ্কার-বিশেষেও পরিমাণ আছে। কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্যেরই উপাদান এক নহে। সূতরাং পরিমাণরূপ হেতু এক প্রকৃতিত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী উক্তরূপে বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে, তখন বাদী ঐ ব্যভিচারের উদ্ধারের জন্ত বলিলেন যে, একপ্রকৃতির সমন্বয় থাকিলে শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দেখা যায়। এখানে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ স্বভাব। অর্থাৎ বাদী উক্ত ব্যভিচার-দোষ নিবারণের জন্ত তাঁহার পূর্বকথিত পরিমাণরূপ হেতুতে এক-স্বভাব-সমন্বয়রূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পুনর্বীর হেতুবাক্য বলিলেন,—“একস্বভাবসমন্বয়ে সতি পরিমাণাৎ”। বাদীর বক্তব্য এই যে, যাহাতে একস্বভাবের সমন্বয় থাকিয়া পরিমাণ আছে, তৎসমস্তই একপ্রকৃতি। যেমন একই মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট ও শরাব প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেই সেই মৃত্তিকাস্বভাবের সমন্বয় আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যই সেই মৃৎপিণ্ড-স্বভাব এবং পরিমাণবিশিষ্ট, এবং তাহার উপাদানকারণ এক, তদ্রূপ এই ব্যক্ত জগতে সর্বত্রই একস্বভাবের সমন্বয় ও পরিমাণ আছে বলিয়া ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান এক, ইহা ঐ হেতুর দ্বারা অনুমানসিদ্ধ হয়। ব্যক্ত পদার্থমাত্রের কিরূপ একস্বভাবের সমন্বয় আছে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বাদীর কথা বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্ত জগৎ সুখদুঃখমোহসম্বিত ও পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত জড় জগতে সর্বত্রই সুখদুঃখ ও মোহ আছে, সমগ্র জগৎই সুখদুঃখমোহাত্মক, সূতরাং উহার মূল উপাদানও সুখদুঃখমোহাত্মক। তাহাই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত। তাহার কার্য্য ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই যখন সুখদুঃখ-মোহাত্মকত্বরূপ একস্বভাবের সমন্বয়বিশিষ্ট পরিমাণ আছে, তখন ঐ বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। পার্থিব ঘটাদি এবং সূবর্ণনিশ্চিত অলঙ্কারাদি বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিমাণ থাকিলেও সেই সমস্ত দ্রব্যেই মৃত্তিকা অথবা সূবর্ণের একস্বভাবের সমন্বয় নাই। সূতরাং সেই সমস্ত বিজাতীয় দ্রব্যসমূহ উক্ত বিশিষ্ট হেতু না থাকায় ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই। অবশ্য সেই সমস্ত বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে সুখদুঃখ-মোহাত্মকত্বরূপ একস্বভাবের সমন্বয় আছে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করিলে সেই সমস্ত দ্রব্যেরও মূল উপাদান যে, আমার সম্মত সেই

১। এবং প্রত্যবস্থিত প্রতিবাদিনি বাদী পক্ষাৎ পরিমিতত্বং হেতুং বিশিষ্ট, একপ্রকৃতিসমন্বয়ে সতি শরাবাদি-বিকারমাণং পরিমাণদর্শনাদিতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, একস্বভাবসমন্বয়ে সতীত্যর্থঃ।” “তদেবং বৈত্রেয়স্বভাবসমন্বয়ে সতি পরিমাণং তত্রৈকপ্রকৃতিত্বমেব, তদ্বৎ এক মৃৎপিণ্ড-স্বভাববু ঘটশরাবোলঙ্কারাদিষু। ঘটরচকারন্ত নৈকস্বভাবা মার্দবসৌবর্ণাদীনাং স্বভাবানাং ভেদাৎ।—তাৎপর্য্যটিকা।

ত্রিগুণাত্মক এক মূল প্রকৃতি, ইহাও তাঁহার স্বীকার্য। সুতরাং সেই সমস্ত দ্রব্যোও আমার সাধ্যার্থ থাকায় ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাদীর চরম বক্তব্য।

পূর্বোক্ত স্থলে বাদী শেষে উক্তরূপ অত্র বিশিষ্ট হেতুর প্রয়োগ করায় উহা তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। কেন উহা নিগ্রহস্থান হইবে? অর্থাৎ বাদী পরে অব্যভিচারী সৎ হেতুর প্রয়োগ করিয়াও নিগৃহীত হইবেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, বাদীর প্রথমোক্ত হেতুর অসাধকত্ববশতঃ উহা নিগ্রহস্থান হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে বাদীর প্রথমোক্ত হেতু তাঁহার সাধ্যসাধনে সমর্থ হইলে, পরে তাঁহার হেতুস্তর প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং তিনি যখন উক্তরূপ হেতুস্তর প্রয়োগ করেন, তখন উহাদ্বারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতু যে, তাঁহার সাধ্যসাধনে অসমর্থ, উহা ব্যভিচারী হেতু, ইহা তিনি স্বীকারই করায় অবশ্যই তিনি নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু তাঁহার প্রথমোক্ত হেতু ব্যভিচারী বলিয়া হেতুভাস হইলেও তিনি উক্ত স্থলে ঐ হেতুভাস দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাঁহার পক্ষে হেতুভাস নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, পরে তিনি তাঁহার উক্ত হেতুতে বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া বাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার-দোষ নিবারণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত স্থলে হেতুস্তর-প্রয়োগই তাঁহার বিপ্রতিপত্তির অনুমাপক হওয়ায় উহাই তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্যোতকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ইহাই বলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে নিগৃহীত হইলেও পরে অব্যভিচারী হেতুস্তরের প্রয়োগ করায় তখন তাঁহার কি জয়ই হইবে? এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী পরে হেতুস্তর প্রয়োগ করিলেও তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ তাঁহার পক্ষ-সিদ্ধিবশতঃ তিনি জয়ী হইবেন না। কারণ, উক্ত হেতুর দ্বারাও তাঁহার পক্ষ সিদ্ধি হয় না। কারণ, তিনি সমস্ত বিশ্বকেই একপ্রকৃতি বলিয়া সাধন করিতে গেলে তিনি কোন দৃষ্টান্ত বলিতে পারিবেন না। তাহা সাধ্যার্থী, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। সুতরাং যদি তিনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ত কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই পদার্থের “প্রকৃত্যন্তর” অর্থাৎ অত্র উপাদান স্বীকার করায় সেই পদার্থেই তাঁহার ঐ শেষোক্ত হেতুরও ব্যভিচারবশতঃ উহার দ্বারাও তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর তিনি যদি কোন দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া কেবল ঐ হেতুস্তরেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া নিদর্শিত না হয়, তাহা কখনও সাধক হইতে পারে না। সুতরাং তাহা অনর্থক বলিয়া ঐরূপ দৃষ্টান্তশূন্য ব্যর্থ হেতুপ্রয়োগকারী পরেও নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে পরেও নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে না ॥ ৬ ॥

সূত্র । প্রকৃতাদর্থাৎপ্রতিসম্বন্ধার্থমর্থান্তরং ॥৭॥৫১১॥

অনুবাদ । প্রকৃত অর্থকে অপেক্ষা করিয়া অপ্রতিসম্বন্ধার্থ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য অর্থের বোধক বচন (৬) অর্থান্তর ।

ভাষ্য । যথোক্তলক্ষণে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহে হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধৌ প্রকৃতাত্মাং ক্রিয়াং—নিত্যঃ শব্দোহস্পর্শাদিতি হেতুঃ । হেতুর্নাম হিনোতে-স্তনিপ্রত্যয়ে কৃদন্তং পদং । পদঞ্চ নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাঃ । (১) অভি-
ধেয়স্য ক্রিয়ান্তরযোগাদ্বিশিষ্যমাণরূপঃ শব্দো নাম, ক্রিয়াকারক-সমুদায়ঃ
কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ । (২) ক্রিয়াকালযোগাভিধায়াখ্যাতং ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ
কালভিধানবিশিষ্টং । (৩) প্রয়োগেষ্বর্থাৎভিদ্ভ্যমানরূপা নিপাতাঃ ।
(৪) উপসৃজ্যমানাঃ ক্রিয়াবদ্যোতকা উপসর্গা ইত্যেবমাদি । তদর্থান্তরং
বেদিতব্যমিতি ।

অনুবাদ । যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ স্থলে হেতুর দ্বারা সাধ্য-
সিদ্ধি প্রকৃত হইলে বাদী যদি বলেন, “নিত্যঃ শব্দঃ, অস্পর্শাদিতি হেতুঃ”, “হেতুঃ”
এই পদটি “হি” ধাতুর “তুন্” প্রত্যয়নিষ্পন্ন কৃদন্ত পদ । পদ বলিতে নাম, আখ্যাত,
উপসর্গ ও নিপাত, অর্থাৎ পদ ঐ চারি প্রকার । অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচ্য অর্থের
ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত “বিশিষ্যমাণরূপ” অর্থাৎ যাহার রূপভেদ হয়, এমন
শব্দ (১) নাম । কারকের সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিয়া ও কারকের সমুদায় (সমষ্টি) । (অর্থাৎ
কর্তৃকর্মাদি কারকের একত্বাদি সংখ্যা এবং জাত্যাতি ও কারক, “নাম” পদের অর্থ) ।
ক্রিয়া অর্থাৎ ধাত্বর্থ এবং কালের সম্বন্ধের বোধক পদ (২) আখ্যাত । কালভিধান-
বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে কালবাচক প্রত্যয়ার্থের অন্তরসম্বন্ধ আছে, এমন ধাত্বর্থমাত্রও
(“আখ্যাত” পদের অর্থ) । সমস্ত প্রয়োগেই অর্থবিশেষপ্রযুক্ত “ভিদ্ভ্যমানরূপ”
অর্থাৎ অর্থভেদ থাকিলেও যাহার কুত্রাপি রূপভেদ হয় না, এমন শব্দসমূহ
(৩) নিপাত । “উপসৃজ্যমান” অর্থাৎ “আখ্যাত” পদের সমীপে পূর্বের প্রযুক্তমান
ক্রিয়াদ্যোতক শব্দসমূহ (৪) উপসর্গ ইত্যাদি । তাহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর
শেষোক্ত এই সমস্ত বচন (৫) অর্থান্তর নামক নিগ্রহস্থান জানিবে ।

১। সূত্রে—প্রকৃতমর্থমপেক্ষা (প্রকৃতমর্থঃ প্রকৃতঃ) এই অর্থ লাগলোপে পঞ্চমী বিভক্তি বুঝিতে হইবে ।
বরণরাজ চরম কল্পে ইহাই বলিয়াছেন ।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা “অর্থাস্তর” নামক বর্ষ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রারম্ভে বাদলক্ষণসূত্রের ভাষ্য ভাষ্যকার যে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই লক্ষণাক্রান্ত পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ স্থল হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধিই প্রকৃত বা প্রস্তুত। বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনের আরম্ভ করিয়া, সেই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য অর্থের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর যাহা নিজপক্ষ-সাধন বা পরপক্ষসাধনের অঙ্গ অর্থাৎ উপযোগী নহে, এমন বাক্যই (৬) “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান। যেমন কোন নৈয়ায়িক “শব্দ অনিত্য” এই প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতুবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরে বলিলেন,—“সেই শব্দ আকাশের গুণ”। এখানে তাঁহার শেষোক্ত বাক্যের সহিত তাঁহার প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, উহা তাঁহার নিজপক্ষ সাধনে অঙ্গ বা উপযোগীই নহে। অতএব ঐ বাক্য তাঁহার পক্ষে “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান। উক্ত স্থলে বাদী নৈয়ায়িক তাঁহার নিজ মতানুসারেই ‘শব্দ আকাশের গুণ’ এই বাক্য বলায়, উহা তাঁহার পক্ষে “স্বমত” অর্থাস্তর। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ইহাকে স্বমত, পরমত, উভয়মত, অনুভয়মত—এই চতুর্বিধ বলিয়া ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণকে বলিয়াছেন “অনুভয়মত”। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে ভাষ্যকারের ঐ সমস্ত বাক্য বাদী মীমাংসক এবং প্রতিবাদী নৈয়ায়িক, এই উভয়েরই সম্মত নহে, উহা শাস্তিকসম্মত।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ দ্বারা এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন মীমাংসক বাদী “নিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন,—“অস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ”। পরে তিনি তাঁহার কথিত “হেতুঃ” এই পদটী “হি” ধাতুর উত্তর “তুন্”প্রত্যয়নিপ্পন্ন ক্রদন্ত পদ, ইহা বলিয়া, ঐ পদ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারি প্রকার, ইহা বলিলেন। পরে ঐ নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গের লক্ষণ বলিলেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাদী মীমাংসক শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিতে স্পর্শশূন্য হেতুর প্রয়োগ করিয়াই বুঝিলেন যে, সূত্র-হুংখাদি অনেক পদার্থও স্পর্শশূন্য, কিন্তু তাহা নিত্য নহে। অতএব স্পর্শশূন্য যে নিত্যত্বের ব্যভিচারী, ইহা প্রতিবাদী অবশ্যই বলিবেন। পূর্বোক্ত বাদী ইহা মনে করিয়াই পরে ঐ সমস্ত অসম্বন্ধার্থ বা অনুপযোগী বাক্য বলিলেন। প্রতিবাদী উহা শ্রবণ করিয়া, ঐ সমস্ত বাক্যার্থেরই কোন দোষ বলিয়া, সেই বিষয়েই বিচারারম্ভ করিলে বাদীর পূর্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার-দোষ প্রচ্ছাদিত হইয়া বাইবে, এবং তিনি চিন্তার সময় পাইয়া, চিন্তা করিয়া তাঁহার পূর্বোক্ত সাধ্যসিদ্ধির জন্য কোন অব্যভিচারী হেতুরও প্রয়োগ করিতে পারিবেন, ইহাই উক্ত স্থলে বাদীর গুঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদীর ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার সাধ্য সাধনের অঙ্গ না হওয়ায় উহা তাঁহার পক্ষে “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু তাঁহার সাধ্য-সাধনে সমর্থ হইলে তিনি কখনই পরে ঐ সমস্ত অনুপযোগী অতিরিক্ত বাক্য বলিতেন না। সুতরাং তাঁহার উক্ত হেতু যে তাঁহার সাধ্যসাধক নহে, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীও

বাদীর কথিত ঐ সমস্ত বাক্যার্থের বিচার করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে গেলে তাঁহার পক্ষেও “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই নিগ্রহীত হইবেন। বস্তুতঃ কোন বাদী যদি নির্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিয়াও পরে যে কোন দোষের আশঙ্কা করিয়া, ঐরূপ অল্পপযোগী কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানেও তাঁহার পক্ষে উহা “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, সেখানেও তিনি যাহা দোষ নহে, তাহা দোষ বলিয়া বুঝিয়া, ঐরূপ ব্যর্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উহাও তাঁহার বিপ্রতিপত্তির অল্পমাপক হওয়ায় নিগ্রহস্থান। সুতরাং হেতু ভাস হইতে পৃথক্ “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকোষ্ঠিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহার বচনও তিনি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। পূর্বে ইহা বলিয়াছি।

ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য “নাম” প্রভৃতি পদের লক্ষণ বলিতে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে হইলে অনেক বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত বুঝা আবশ্যক। সে সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা এখানে সম্ভব নহে। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। “বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুসা” গ্রন্থ নাগেশ ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের যেরূপ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত “তাৎপর্যটীকা” গ্রন্থে যথাযথ দেখিতে পাই না। অনেক সন্দর্ভ মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারোক্ত “ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ” এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া, পরে ঐ লক্ষণের দোষ প্রদর্শনপূর্বক সেই দোষবশতঃই “কারকসংখ্যাবিশিষ্টক্রিয়াকালযোগাভিধা-
যাখ্যাতং” এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের অত্র লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। পরে ঐ লক্ষণেরও দোষ প্রদর্শনপূর্বক সেই দোষবশতঃই পরে “ধাত্বর্ণমাভ্যুপা-
দিকালভিধানবিশিষ্টং” এই বাক্যের দ্বারা “আখ্যাত” পদের নির্দোষ চরম লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য বলিতে “আখ্যাত” পদের ঐরূপ লক্ষণত্রয় বলিবেন কেন? এবং যে লক্ষণদ্বয় ছুট, বৈয়াকরণ মতেও যাহা লক্ষণই হয় না, তাহাই বা বাদী কেন বলিবেন? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মহর্ষির “তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং” (৫৮শ) এই শব্দের ব্যাখ্যায় বার্তিককার উদ্যোতকর ভাষ্যকারের গ্রন্থ “নাম” পদের উক্ত লক্ষণ বলিয়া “যথা ব্রাহ্মণ ইতি” এই বাক্যের দ্বারা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে ঐ “নাম” পদের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ”। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে “অন্ত্যর্থমাহ” এই কথা বলিয়াই উদ্যোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্যোতকর সেখানে পরে “ক্রিয়াকালযোগাভিধায়ি ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতং পচতীতি যথা” এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের লক্ষণ ও উদাহরণ বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে “আখ্যাতলক্ষণমাহ” এই কথা বলিয়া উদ্যোতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে ভাষ্যকারও যে, “ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ” এইরূপ বিসর্গান্ত সন্দর্ভই বলিয়া

তদ্ব্যাহার তাঁহার পূর্বোক্ত “নাম” পদের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে “ক্রিয়াকাল” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা “আখ্যাত” পদের লক্ষণ বলিয়া “ধাত্বর্থমাত্রক” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহারও অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। নাগেশ ভট্টের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারাও ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। “কলা টীকা”কার বৈদ্যানাথ ভট্টও সেখানে ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে “অভিধেয়ন্ত” ইত্যাদি “বিশিষ্ট ইত্যন্তমুক্তা” এইরূপ লিখিয়াছেন। সুদ্রিত পুস্তকে “বিশিষ্টেত্যন্তং” এই পাঠ প্রকৃত নহে। ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের যেরূপ সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া, যেরূপে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুধীগণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।৫৮শ সূত্রে) উদ্যোতকের সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা এবং এখানে তাঁহার ভাষ্যব্যাখ্যা দেখিয়া, তিনি এখানে তাঁহার পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা কেন করেন নাই, তাহা চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার এখানে বাদীর বক্তব্য নামপদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দের অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য অর্থের ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হয়, সেই শব্দকে “নাম” বলে। ভাষ্যে “ক্রিয়ান্তর” শব্দের অর্থ ক্রিয়াবিশেষ। বাচস্পতি মিশ্রও “অন্তর” শব্দের বিশেষ অর্থ, ইহা বলিয়াছেন। “বৃক্ষস্তিষ্ঠতি” “বৃক্ষো তিষ্ঠতঃ” “বৃক্ষং পশুতি” ইত্যাদি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত “বৃক্ষ” প্রভৃতি শব্দের নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হওয়ার বিভক্ত্যন্ত “বৃক্ষ” প্রভৃতি শব্দ নামপদ। মহর্ষি গৌতমের সূত্রানুসারে ভাষ্যকার এবং বার্তিক-কারও বিভক্ত্যন্ত শব্দকেই পদ বলিয়াছেন এবং উপসর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার জন্ত ব্যাকরণশাস্ত্রে ঐ সমস্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও “সু” “ও” “জন্” প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি এবং তাহার লোপ অন্তর্নিহিত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া উপসর্গ এবং নিপাতেরও পদত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে নব্যটেনয়ানিকগণের মত পূর্বে বলিয়াছি (দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উপসর্গ এবং নিপাত পদ হইলেও কুত্রাপি কোন বিভক্তির প্রয়োগেই উহার রূপভেদ হয় না, এ জন্ত শাস্ত্রিকগণ উহাকে নামপদ বলেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পদ চতুর্বিধ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। “কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্যে” উক্ত শাস্ত্রিক মতের উল্লেখ এবং উক্ত চতুর্বিধ পদের পরিচয় কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার উক্ত মতানুসারেই বাদীর শেষোক্ত ঐ সমস্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সূত্রের বার্তিকে উদ্যোতকরও ঐরূপ সন্দর্ভ বলায় নামপদ ও আখ্যাত পদের উক্তরূপ লক্ষণাদি তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়, তাই নাগেশ ভট্ট উদ্যোত-করের উক্ত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। নাগেশ ভট্টের “সিদ্ধান্তমঞ্জুষা”র

১। পঞ্চমে স্মারভাষ্যোহপি ক্রিয়াকালযোগাভিধেয়াখ্যাতং, ধাত্বর্থমাত্রক কালভিধানবিশিষ্টমিতি। কালেনা-ভিধানেন কারকেন বিশিষ্টং ধাত্বর্থমাত্রমাখ্যাতার্থ ইতি তদর্থঃ। তন্ত্বেব ব্যাখ্যানং “ক্রিয়াপ্রধান”মিতি বার্তিককৃতাত্ম কৃতং। বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা, তিষ্ঠর্থনিরূপণ, ৮০৪ পৃষ্ঠা।

২। নামাখ্যাতরূপসর্গো নিপাতশ্চতুর্বিধঃ পদভেদানি ণ্যাদাঃ—ইত্যাদি কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্য।

“কুক্ষিকা” টীকায় ছর্ষলাচার্য্য উদ্যোতকের “ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় জাতি প্রভৃতিকেই ক্রিয়া শব্দের অর্থ বলিয়াছেন^১ এবং নাগেশ ভট্টের উদ্ধৃত বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভেও ঐরূপ ব্যাখ্যাই দেখা যায়। সুতরাং তদনুসারে এখানে ভাষাকারেরও তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, নামপদের দ্বারা জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্য, ইহার অন্ততম এবং তাহার আশ্রয় কর্তৃকর্মাদি যে কোন কারক এবং তদগত কোন সংখ্যার বোধ হওয়ায় ঐ সমষ্টিই নাম পদের অর্থ। ভাষাকার “ক্রিয়াকারকসমুদায়ঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষাকার পরে উক্ত স্থলে বাদ্যীর বক্তব্য “আখ্যাত” পদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, ক্রিয়া ও কালের সম্বন্ধবোধক পদ আখ্যাত। আখ্যাত বিভক্তিকেও আখ্যাত বা আখ্যাত প্রত্যয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত বিভক্ত্যন্ত পদকেই বলা হইয়াছে “আখ্যাত” নামক পদ। সেই সমস্ত বিভক্তির দ্বারা বর্তমানাদি কোন কালের এবং ধাতুর দ্বারা ধাত্বর্থরূপ ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় আখ্যাত পদ ক্রিয়া ও কালের সম্বন্ধের বোধক হয়। “ভুক্তা” ইত্যাদি ক্রদন্ত পদের দ্বারা ক্রিয়ার সহিত কালের সম্বন্ধ বোধ না হওয়ায় উহা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। ভাষাকার পরে আখ্যাত পদের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, কালভিধানবিশিষ্ট ধাত্বর্থমাত্রও উহার অর্থ। নাগেশ ভট্ট ভাষাকারোক্ত ঐ “অভিধান” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—কারক। তাঁহার মতে কর্তৃকর্মাদি কারকও প্রত্যয়ার্থ। কিন্তু “অভিধান” শব্দের কারক অর্থ প্রয়োগ দেখা যায় না। যদ্বারা কোন অর্থ অভিহিত হয়, এই অর্থে “অভিধান” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় বাচক শব্দ। পরন্তু কারক বলিতে ভাষাকার এখানে পূর্বে “কারক” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। নাগেশ ভট্টের মত সমর্থন করিতে “কলা” টীকাকার বৈদ্যানাথ ভট্ট বাংলায়ন ও উদ্যোতকের “ধাত্বর্থমাত্রঃ” এই বাক্যে “মাত্র” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সংখ্যা এবং “ধাত্বর্থমাত্রঃ” এই প্রয়োগে সমাহার হ্রস্বন্যাস বলিয়া, উহার দ্বারা ধাত্বর্থ এবং সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয় যে, ভাষ্যে কালবাচক আখ্যাত প্রত্যয়ই “কালভিধান” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। এবং যে মতে “স্থায়তে,” এবং “সুপাতে” ইত্যাদি ভাববাচ্য আখ্যাত প্রত্যয়ান্ত আখ্যাত পদের দ্বারা বর্তমান কালবিশিষ্ট ধাত্বর্থমাত্রেরই বোধ হয়, সেই মতানুসারেই ভাষাকার এখানে বলিয়াছেন যে, কালবাচক প্রত্যয়বিশিষ্ট অর্থাৎ সেই প্রত্যয়ার্থ কালের সহিত অন্বয়-সম্বন্ধযুক্ত ধাত্বর্থমাত্রও আখ্যাত পদের অর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, আখ্যাত পদের দ্বারা অনেক স্থলে কারক ও তদগত সংখ্যা প্রভৃতির বোধ হইলেও কোন মতে কোন কোন আখ্যাতে পদের দ্বারা যখন কেবল কাল-বিশিষ্ট ধাত্বর্থ মাত্রও বুঝা যায়, তখন তাহারও সংগ্রহের জন্তই আখ্যাত পদের পূর্বোক্তরূপ সামান্ত

১। ক্রিয়ন্তি,—ক্রিয়ানাম জাত্যাদিঃ, কারকং, কারকগতা সংখ্যা চ তদ্বিশিষ্টো নামার্থ ইত্যর্থঃ।—“কুক্ষিকা” টীকা।

২। অথ নামার্থমাহ “ক্রিয়েত্যাদি। ক্রিয়া জাত্যাদি। কারকং তদাশ্রয়ঃ। সচ ব্যক্তিগতসংখ্যায়তো নামার্থঃ।
—সিদ্ধান্তমঞ্জরী, ৮০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লক্ষণই কথিত হইয়াছে। “ধাত্বর্থবাত্তক্য” এই বাক্য “চ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যকার অত্র কারক প্রভৃতি অর্থেরও প্রকাশ করিয়াছেন। কালবাচক প্রত্যয়ের অর্থ কালের সহিত ধাত্বর্থের অর্থ-সম্বন্ধ হওয়ায় ঐরূপ পরস্পরা সম্বন্ধ ধাত্বর্থকে কালবাচক প্রত্যয়বিশিষ্ট বলা যায় এবং ঐরূপ বলিলে তদ্বারা কালবাচক আখ্যাত প্রত্যয়ান্ত ধাতুই আখ্যাত পদ, এইরূপ ফলিতার্থও সূচিত হয়। সুধীগণ এখানেও ভাষ্যকারের তাৎপর্য চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার পরে বাদীর বক্তব্য বলিতে অর্থভেদ হইলেও যে সমস্ত শব্দের কুত্রাপি কোন প্রয়োগে রূপভেদ হয় না, সেই সমস্ত শব্দ নিপাত, এবং যে সমস্ত শব্দ ক্রিয়াবিশেষের দ্যোতক এবং আখ্যাত পদের সমোপে, পূর্বে অর্থাৎ অব্যয়িত পূর্বে প্রযুক্ত্যমান হয়, তাহা উপসর্গ, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারোক্ত নিপাতগুণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেও বাচস্পতি মিশ্র সরল অর্থ ত্যাগ করিয়া অত্ররূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন? তাহাও সুধীগণ দেখিয়া বিচার করিবেন। “চ” “তু” প্রভৃতি নিপাত শব্দেরও অর্থ আছে। কিন্তু অব্যয় শব্দ বলিয়া উহার উক্তর সর্বত্র সমস্ত বিভক্তির লোপ হওয়ায় উহার রূপভেদ হয় না। উপসর্গগুলিরও উক্ত কারণে কুত্রাপি রূপভেদ হয় না। কিন্তু উপসর্গগুলি ক্রিয়াবিশেষের দ্যোতক মাত্র, উহার অর্থ নাই, এই মতান্তরই নিপাত হইতে উপসর্গের পৃথক নির্দেশ হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র এখানে উপসর্গেরও কোন স্থলে অধিক অর্থ এবং কোন স্থলে বিপরীত অর্থ বলিয়াছেন। উহাও মত আছে। বাহ্যভয়ে এখানে পূর্বোক্ত সমস্ত বিষয়ই সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে পারিলাম না। বিশেষ জিজ্ঞাসু নাগেশ ভট্টের “মঞ্জুসা” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন ॥৬॥

সূত্র। বর্ণক্রমনির্দেশবন্নিরর্থকং ॥৮॥৫১২॥

অনুবাদ। বর্ণসমূহের ক্রমিক নির্দেশের তুল্য বচন নিরর্থক, অর্থাৎ বাদী অথবা প্রতিবাদীর অর্থশূন্য বচন (৭) “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। যথাহনিত্যঃ শব্দঃ ক চ ত পা নাং, জ ব গ ড দ শ ত্বাং, বা ভ ঞ ঘ চ ধ য বদিত্তি, এবম্প্রকারং নিরর্থকং। অভিধানাভিধেয়ভাবানুপ-পত্তাবর্থগতেরভাবাদ্বর্ণা এব ক্রমেণ নির্দিষ্টান্ত ইতি।

অনুবাদ। যেমন “অনিত্যঃ শব্দঃ ক চ ত পা নাং, জ ব গ ড দ শ ত্বাং, বা ভ ঞ ঘ চ ধ য বৎ”, এবম্প্রকার বচন নিরর্থক নামক নিগ্রহস্থান। বাচ্যবাচক ভাবের

১। “কচতপাঃ” এইরূপ পাঠ অনেক পুস্তকে থাকিলেও “কচতপানাঃ” এইরূপ পাঠ উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বর্ণের অর্থশূন্যতা ব্যক্ত হয়। “শ্রায়মঞ্জরী”, “শ্রায়সার” এবং “ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে”র লঘুপুস্তি প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ পাঠই আছে। শ্রায়সারের টীকাকার জয়সিংহ সূরি লিখিয়াছেন,—“অত্র কচতপানাং শব্দোহনিত্য এতাবান্ পক্ষঃ।”

অনুপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থবোধ না হওয়ায় (উক্ত স্থলে) বর্ণসমূহই ক্রমশঃ নির্দিষ্ট (উচ্চরিত) হয় ।

টিপ্পনী । অর্থাস্তরের পর এই স্থলে দ্বারা “নিরর্থক” নামক সমস্ত নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । যে শব্দের কোন অর্থ নাই অর্থাৎ শক্তি, লক্ষণ অথবা কোন পরিভাষার দ্বারা যে শব্দের কোন অর্থ বুঝা যায় না, তাহাকে অর্থশূন্য শব্দ বলে । বাদী বা প্রতিবাদী ঐরূপ অর্থশূন্য শব্দের প্রয়োগ করিলে তদ্বারা কোন অর্থবোধ না হওয়ায় উহা সেখানে “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান । সে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ ? তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“বর্ণক্রমনির্দেশবৎ” । অর্থাৎ যেমন ক্রমশঃ উচ্চরিত বর্ণ মাত্র । ভাষাকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার বচন নিরর্থক । পরে উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বর্ণ কোন অর্থের বাচক নহে । সুতরাং ঐ সমস্ত বর্ণ এবং কোন অর্থের অভিধানাভিধেয়তা অর্থাৎ বাচকবাচ্যতা না থাকায় উহার দ্বারা “অর্থগতি” অর্থাৎ কোন অর্থ বোধ হয় না । সুতরাং উক্ত স্থলে কতকগুলি বর্ণমাত্রই ক্রমশঃ উচ্চরিত হয় । ঐরূপ নিরর্থক শব্দ প্রয়োগই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান । পূর্ব-সূত্রোক্ত “অর্থাস্তর” স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর অগম্যকার্য বচনগুলি প্রকৃত বিষয়ের অনুশ্রয়োগী হইলেও উহার অন্তর্গত কোন শব্দই অর্থশূন্য নহে । কিন্তু এখানে ভাষাকারোক্ত উদাহরণে ক্রমশঃ উচ্চরিত ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণের কোন অর্থ নাই । যে স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রমশঃ উচ্চরিত বর্ণসমূহেরও কোন অর্থ আছে এবং প্রকরণজ্ঞানাদিবশতঃ সেই অর্থের বোধ হয়, সেখানে সেই সমস্ত বর্ণের প্রয়োগ “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে না । কিন্তু অর্থশূন্য ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য ।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ নিরর্থক শব্দ প্রয়োগকে নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই । তাঁহার বলিয়াছেন যে, অর্থশূন্য শব্দ প্রয়োগ উন্মত্তপ্রলাপ । সুতরাং শাস্ত্রে উহার উল্লেখ করা বা উহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করা অযুক্ত । পরন্তু তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদীর নিরর্থক কপোলবাদন, গণ্ডবাদন, কক্ষতাড়ন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলিয়া কেন কথিত হয় নাই ? “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট এই সমস্ত কথার উত্তর দিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অনেক উপহাসও করিয়াছেন । তাঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি । কিন্তু “তাৎপর্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “বর্ণক্রম-নির্দেশবৎ” এই বাক্যে সাদৃশ্যার্থক ‘বতি’ প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চরিত নিরর্থক বর্ণসমূহ দৃষ্টান্ত-রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে । তাৎপর্য এই যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় যে নিরর্থক বর্ণোচ্চারণকে উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়াছেন, মহর্ষি তাহাকে নিগ্রহস্থান বলেন নাই । কিন্তু তত্ত্বল্য অবাচক শব্দপ্রয়োগই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির সূত্রার্থ । বাচস্পতি মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, যেমন কোন জাবিড় বাদী আৰ্য্যভাষা জানিয়াও অথবা তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার নিজ ভাষার দ্বারা সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্থের নিবটে শব্দের অনিত্য পক্ষের সংস্থাপন করিলে, সেখানে তাঁহার “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । কারণ, ঐ জাবিড় ভাষা বা সেই সমস্ত শব্দ পরে মনুষ্য-

কল্পিত, উহা প্রথম কোন অর্থবিশেষে জৈব কৰ্ত্তৃক সংকেতিত নহে। সুতরাং উহা কোন অর্থের বাচক নহে। “সাধুভিত্তিভাবিতব্যং নাপত্রংশিতং ন স্নেচ্ছিতং” এই শ্রুতি অনুসারে সাধু শব্দরূপ সংস্কৃত শব্দই অর্থভাষা, উহাই প্রথম অর্থবিশেষ-বোধের জন্ত জৈব কৰ্ত্তৃক সংকেতিত, অপত্রংশাদি শব্দ সাধু শব্দ নহে, ইহাই দিক্কাষ্ট। বাচস্পতি মিশ্র পরে বিচারপূর্বক এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই মতে অপত্রংশাদি শব্দ উচ্চরিত হইলে তদ্বারা সেই সাধু শব্দের অনুমান হয়। পরে সেই অস্মিত সাধু শব্দ দ্বারা তাহার অর্থবোধ হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের সেই সাধু শব্দের জ্ঞান হয় না, তাহারা সেই অপত্রংশাদি শব্দকে অর্থবিশেষের বাচক বলিয়া ভ্রমবশতঃই তদ্বারা সেই অর্থবিশেষ বুঝিয়া থাকে এবং সেই অর্থবিশেষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই সেই সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং উহা উন্নতপ্রলাপ বলা যায় না। কিন্তু ক চ ট ত প, ইত্যাদি নিরর্থক বর্ণসমূহের উচ্চারণ এবং কপোলবাদন প্রভৃতির দ্বারা কাহারই কোন অর্থের বোধ না হওয়ায় তাহা ঐরূপ নহে। সুতরাং উহা “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত শব্দ অর্থশূন্য বা অবাচক, কিন্তু তদ্বারাও কাহারও কোন অর্থ বোধ হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহার প্রয়োগ হয়, এমন শব্দের প্রয়োগই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান। অবশ্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতে অপত্রংশাদি শব্দেরও বাচ্য অর্থ আছে। কিন্তু উক্ত মতেও পূর্বোক্ত স্থলে “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজ পক্ষ-সমর্থনে তাহার অসামর্থ্য বুঝিয়াই, তখন সেই অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্তই অপরের অজ্ঞাত ভাষার দ্বারা নিজ বক্তব্য বলেন, অথবা তিনি সংস্কৃত ভাষাই জানেন না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তাহার সেই ভাষা-প্রয়োগের দ্বারা তাহার বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় উহা তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু যে স্থলে প্রথমে যে কোন ভাষার দ্বারা বিচার হইতে পারে অথবা অপত্রংশ ভাষার দ্বারা বিচার কর্তব্য, এইরূপ “সময়বন্ধ” বা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়, সেখানে বাদী বা প্রতিবাদী কাহারই পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থান হইবে না। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই প্রথম ঐরূপ ভাষাপ্রয়োগ স্বীকার করায় কেহই কাহারও অবাচক শব্দ প্রয়োগজন্ত বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান করিতে পারেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে এই কথা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষাকারেরও উক্তরূপ তাৎপর্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, এই জন্তই ভাষাকারও বলিয়াছেন,—“এবম্প্রকারং নিরর্থকং”। অর্থাৎ তিনি “ইদমেব নিরর্থকং” এই কথা না বলিয়া “এবম্প্রকারং নিরর্থকং” এই কথা বলায় তাহার মতেও তাহার প্রদর্শিত নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্তু তত্ত্বল্য অবাচক শব্দ প্রয়োগই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই তাহারও তাৎপর্য বুঝা যায়।

কিন্তু উদ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি পূর্বোক্তভাবে এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহাদিগের ব্যাখ্যার দ্বারা অর্থশূন্য ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণমাত্রের উচ্চারণ যে “নিরর্থক” নামক

নিগ্রহস্থান, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। উদ্যোতকর পরে “অপার্থক্য” হইতে ইহার ভেদ সমর্থন করিতে এই “নিরর্থক” স্থলে যে বর্ণমাত্রের উচ্চারণ হয়, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং এখানে ইহার নিগ্রহস্থান সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রকৃত পঞ্চাবয়ব বাক্যরূপ সাধনের গ্রহণ না করিয়া, কেবল নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণ করায় তিনি সাধ্য ও সাধন জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় নিগৃহীত হইবেন। উদয়নাচার্য্যের মতামুসারে “তর্কিকরূপা”কার বরদরাজও এখানে অনেক প্রকারে অবাচক শব্দের উদাহরণ প্রকাশ করিতে প্রথমে অর্থশূন্য বর্ণমাত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে তিনি স্লেচ্ছভাষা প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোম দাক্ষিণাত্য তাঁহার নিজ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্ঘ্যের নিকটে নিজ ভাষার দ্বারা বক্তব্য বলিলে যে, তাঁহারও “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতদিগকেই কেন ঐ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে আর্ঘ্যভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ ও আর্ঘ্যের নিকটে কিরূপ আবিষ্কার নিজ ভাষায় নিজ পক্ষ স্থাপন বলিয়াছেন, ইহা চিস্তনীয় ॥৮॥

সূত্র । পরিষৎ-প্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবি- জ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থং ॥৯॥৫১৩॥

অনুবাদ । (বাদী কর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কর্তৃক যে বাক্য অবুদ্ধ হয়, তাহা (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ” অর্থাৎ “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান ।

ভাষ্য । যদ্বাক্যং পরিষদা প্রতিবাদিনা চ ত্রিরভিহিতমপি ন বিজ্ঞায়তে—
শ্লিষ্টশব্দমপ্রতীতপ্রয়োগমতিদ্রুতৌচ্ছরিতমিত্যেবমাদিনা কারণেন, তদবি-
জ্ঞাতার্থমসামর্থ্যসংবরণায় প্রযুক্তমিতি নিগ্রহস্থানমিতি ।

অনুবাদ । যে বাক্য (বাদিকর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ-প্রয়োগ, অতি দ্রুত উচ্ছরিত, ইত্যাদি কারণবশতঃ পরিষৎ ও প্রতিবাদী কর্তৃক বিজ্ঞাত হয় না অর্থাৎ প্রতিবাদী ও সভ্যগণ কেহই উহার অর্থ বুঝেন না, সেই বাক্য (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ,” অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, এ জগৎ নিগ্রহস্থান ।

১। যদা আবিড়ঃ স্বভাষয়া তদভাষানভিজ্ঞমর্থ্যং প্রতি শব্দানিত্যং প্রতিপাদয়তি, তদা নিরর্থকং নিগ্রহস্থানং, স খল্বাধ্যভাষাং জানমসামর্থ্যপ্রচ্ছাদনায় তদভাষানভিজ্ঞতয়া বা স্বভাষয়া সাধনং প্রযুক্তবান্ ইত্যাদি—তাৎপর্য্যটীকা ।
স্বভাষয়া প্রত্যবর্ত্তিত্বমানে দাক্ষিণাত্য তুণ্ডীয়াঃ এষ পরমার্থ্যস্তেভ্যস্তানামেবাবিশিয়াত ইতি গুহ্যং কথাব্যাসেন ।
—তর্কিকরূপা ।

টিপ্পন। এই সূত্রদ্বারা “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক অষ্টম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সূত্রে “ত্রিভিত্তিতঃ” এই বাক্যের পূর্বে “বাদিনা” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাঁহার যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষৎ অর্থাৎ সেই সভাস্থানে উপস্থিত সভ্যগণ ও প্রতিবাদী, কেহই তাহার অর্থ বুঝেন না, বাদীর সেই বাক্য তাঁহার পক্ষে “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান। এইরূপ প্রতিবাদীর ঐরূপ বাক্যও তুল্য যুক্তিতে ঐ নিগ্রহস্থান হইবে। বাদী তিনবার বলিলেও অন্য সকলে কেন তাহার অর্থ বুঝিবেন না? এবং না বুঝিলে তাহাতে বাদীর অপরাধ কি? উক্ত স্থলে তিনিই কেন নিগৃহীত হইবেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদীর সেই বাক্য শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত হইলে এবং তাহার প্রয়োগ অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ হইলে এবং অতি দ্রুত উচ্চারিত হইলে, ইত্যাদি কারণবশতঃ বাদীর ঐ বাক্যার্থ অন্য কেহ বুঝিতে পারেন না। এবং বাদী তাঁহার স্বপক্ষ সমর্থনে নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়াই সেই অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্য অস্ত্রের অবোধ্য ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন। প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ তাঁহার সেই বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া নিরস্ত হইবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। সূত্রাত্মক উক্তরূপ স্থলে বাদীর ছুরতিসন্ধিমূলক ঐরূপ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার বিপ্রতিপত্তি অথবা অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা তাঁহার পক্ষেই নিগ্রহস্থান হইবে। সূত্রাত্মক তিনিই নিগৃহীত হইবেন। যে কোনরূপে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্য বাদী ঐরূপ প্রয়োগ অবশ্যই করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে পরাজয় সম্ভাবনা স্থলে শেষে বাদী বা প্রতিবাদী অতি দুর্বোদ্ধার্থ কোন একটি বাক্যের উচ্চারণ করিয়াই সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারেন। সূত্রাত্মক বাদী ছুরতিসন্ধিবশতঃ ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাহা করিলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারোক্ত শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্যের উদাহরণ বলিয়াছেন,—“স্বৈতো ধাবতি”। “স্বৈত” শব্দের দ্বারা স্বৈত রূপ-বিশিষ্ট এই অর্থ বুঝা যায় এবং “স্বা X ইতঃ” এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বুঝিলে উক্ত বাক্যের দ্বারা, এই স্থান দিয়া কুকুর ধাবন করিতেছে, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রকরণাদি নিয়ামক না থাকিলে বাদীর বিবক্ষিত অর্থ কি? তাহা নিশ্চয় করা যায় না। এইরূপ বেদে যে “জফরী” ও “তুফরী” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা অপ্রতীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সকলে উহা বুঝিতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সমস্ত শব্দকেই এখানে “অপ্রতীত-প্রয়োগ” বলিয়াছেন।

কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পূর্বোক্তরূপ বাক্যকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন ; যথা—(১) কোন অসাধারণ শাস্ত্রমাত্রপ্রসিদ্ধ এবং (২) রূঢ় শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যৌগিক শব্দযুক্ত, এবং (৩) প্রকরণাদি-নিয়ামকশূন্য শ্লিষ্টশব্দযুক্ত। উন্মধ্যে বাদী যদি শীমাংশশাস্ত্রমাত্র প্রসিদ্ধ “স্বা”, “কপাল” ও “পুরোভাশ” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেন অথবা বৌদ্ধ শাস্ত্রমাত্র প্রসিদ্ধ “পঞ্চস্কন্ধ”, “দ্বাদশ আয়তন” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেহই তাহার অর্থ না বুঝেন, তাহা হইলে সেখানে বাদীর সেই বাক্য পূর্বোক্তপ্রকার “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক

নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু যে স্থলে নীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ বা বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মধ্যস্থ নাই এবং প্রতিবাদীও ঐ সমস্ত শাস্ত্র জানেন না, সেইরূপ স্থলেই বাদী ছরভিসন্ধিবশতঃ ঐরূপ প্রয়োগ করিলে তিনি নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যদি সেখানেও বাদী বা প্রতিবাদী কেহ দস্তপূর্বক অপরকে বলেন যে, আপনি যে কোন পরিভাষার দ্বারা বলিতে পারেন, তাহা হইলে সেখানে কেহ অন্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও তিনি নিগৃহীত হইবেন না। রূঢ় শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল বৌগিক শব্দের দ্বারা ছুর্ভোধার্থ বাক্য-রচনা করিয়া বলিলে সেই বাক্য দ্বিতীয় প্রকার “অবিজ্ঞাতার্থ”। “বাদি বিনোদ” গ্রন্থে শব্দর মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন,—“কশ্চপতনয়া-ধৃতি-হেতুরয়ং ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমাননামধেয়বান্ তৎকেতুমহাৎ”। “পর্কত” এই রূঢ় শব্দ গ্রহণ করিয়া সেখানে “পর্কতোহয়ং” এইরূপ প্রয়োগই বাদীর কর্তব্য, সেখানে তিনি ছরভিসন্ধিবশতঃ বলিলেন,—“কশ্চপতনয়া-ধৃতিহেতুরয়ং”। কশ্চপেয় তনয়া পৃথিবী, এ জন্ত পৃথিবীর একটা নাম কাশ্চপী। কশ্চপতনয়া পৃথিবীর ধৃতির হেতু অর্থাৎ ধারণকর্তা ভূধর অর্থাৎ পর্কত, ইহাই উক্ত বৌগিক শব্দের দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত। পরে “বহিমান্” এইরূপ প্রয়োগ বাদীর কর্তব্য হইলেও তিনি বলিলেন,—“ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমাননামধেয়বান্”। ত্রিনয়ন মহাদেব, তাঁহার তনয় কার্তিকেয়, তাঁহার যান অর্থাৎ বাহন ময়ূর ; সেই ময়ূরের একটা নাম শিখী। বহির একটা নামও শিখী। তাহা হইলে ময়ূরের নামের সমান নাম যাহার, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “ত্রিনয়নতনয়যানসমাননামধেয়” শব্দের দ্বারা বহি বুঝা যায়। পরে “ধূমবহ্নাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য না বলিয়া বাদী বলিলেন, “তৎকেতুমহাৎ”। ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত বহ্নিই বাদীর বুদ্ধিস্থ। বহ্নির কেতু অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্ন বা অনুমাপক ধূম। সুতরাং “তৎকেতু” শব্দের দ্বারা ধূম বুঝা যায়। প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ বাদীর ঐ বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়াই নিরস্ত হইবেন, এইরূপ ছরভিসন্ধিবশতঃই বাদী ঐরূপ প্রয়োগ করায় পূর্বোক্ত যুক্তিতে তিনিই উক্ত স্থলে নিগৃহীত হইবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে শব্দর মিশ্রের প্রদর্শিত পূর্বোক্ত উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত “বাদি বিনোদ” ও বিশ্বনাথবৃত্তি পুস্তকে সর্কাংশে প্রকৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। তৃতীয় প্রকার “অবিজ্ঞাতার্থে”র উদাহরণ “খেতো ধাবতি” ইত্যাদি শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্য। কিন্তু ভাষ্যকার যে অতি দ্রুত উচ্চারিত বাক্যকেও “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থানের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পূর্বোক্ত যুক্তিতে অবশ্য গ্রাহ্য। উদয়নাচার্য ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতির মতে এই সূত্রে ‘ত্রিঃ’ এই পদের দ্বারা বাদী তিনবারের অধিক বলিতে পারিবেন না, তিনবার মাত্রই তাঁহার বাক্য শ্রাব্য, এইরূপ নিয়ম স্থচিত হইয়াছে^১। কিন্তু ভাস্কর্য্যের “গ্রায়সারে”র মুখ্য টীকাকার ভূষণের মতে সভাগণের অল্পজ্ঞা হইলে তদনুসারে বাদী আরও অধিকবার বলিতে পারেন, ইহাই মহর্ষি গৌতমের ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচনেরও উহাই মত। বাচস্পতি মিশ্রের কথার

১। অতন্ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ নিয়ম ইত্যাদিচাৰ্ণ্যমাশয়ঃ। পরিষদমুজ্ঞাপতক্ষণং ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ ভূষণকরঃ। চতুরভিঃ খালেহপি ন কশ্চিদপ্যেব ইতি বদন্তত্রিলোচনস্তাপি স এবাভিপ্ৰায়ঃ।—ভার্কিকরক্ষা।

দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। উক্ত বিষয়ে আরও মতভেদ আছে। পূর্বস্বত্রোক্ত “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদী অবাচক শব্দেরই প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ তাঁহার উচ্চারিত শব্দ অর্থশূন্য। কিন্তু “অবিস্তারার্থ” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদীর উচ্চারিত শব্দ অর্থশূন্য নহে। অর্থাৎ তিনি বাচক শব্দেরই প্রয়োগ করেন, ইহাই বিশেষ ॥ ৯ ॥

সূত্র । পৌর্বাপর্যায়োগাদপ্রতিসম্বন্ধার্থমপার্থকং ॥

॥১০॥৫১৪॥

অনুবাদ । পূর্বাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অস্বয় সম্বন্ধের অভাব-বশতঃ অসম্বন্ধার্থ (৯) অপার্থক, অর্থাৎ ঐরূপ পদ বা বাক্য “অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য । যত্রানেকশ্চ পদশ্চ বাক্যশ্চ বা পৌর্বাপর্যেণাস্বয়যোগো নাস্তীত্যসম্বন্ধার্থত্বং গৃহ্যতে তৎসমুদায়ার্থস্থাপায়াদপার্থকং । যথা “দশ দাড়িমানি ষড়্পূপাঃ” । “কুণ্ডুমজাজিনং পললপিণ্ডঃ, অথ রৌরুকমেতৎ কুমার্যাঃ পায়ং, তস্তাঃ পিতা অপ্রতিশীন” ইতি ।

অনুবাদ । যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্বাপরভাবে অস্বয়-সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত অনেক পদার্থ বা অনেক বাক্যার্থের পরস্পর অস্বয়-সম্বন্ধ অসম্ভব, এ জন্ত অসম্বন্ধার্থত্বং গৃহীত হয়, সেই পদ বা বাক্য, সমুদায়ার্থের অপায়বশতঃ অর্থাৎ সেই সমস্ত নিরাকাজ্ঞ পদ বা বাক্য মিলিত হইয়া কোন একটি বাক্যার্থের বোধক হইতে না পারায় তাহা (৯) অপার্থক নামক নিগ্রহস্থান। যেমন “দশ দাড়িমানি” ও “ষড়্পূপাঃ” এই বাক্যদ্বয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থের পরস্পর অস্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা বাক্যাপার্থক। এবং “কুণ্ডং” “অজা” “অজিনং” “পললপিণ্ডঃ” “রৌরুকং” ইত্যাদি পদ। অর্থাৎ ঐ সমস্ত পদগুলির অর্থের পরস্পর অস্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা পদাপার্থক।

টিপ্পনী । এই সূত্রের দ্বারা “অপার্থক” নামক নবম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সৃষ্টিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পূর্বাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবে অস্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা অসম্বন্ধার্থ, ইহা বুঝা যায়, সেই স্থলে সেই সমস্ত পদ বা বাক্য “অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান। ঐ সমস্ত পদ বা বাক্যের অর্থ থাকিলেও উহাকে অপার্থক কিরূপে বলা যায়? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“সমুদায়ার্থস্থাপায়াৎ”। অর্থাৎ উহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত পদ ও

বাক্য মিলিত হইয়া কোন একটি বাক্যার্থ-বোধ জন্মায় না, এ জন্ত উহার নাম “অপার্থক” । বাচস্পতি মিত্র ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য বাক্ত করিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ-বোধনই অনেক পদ-প্রয়োগের প্রয়োজন এবং কোন মহাবাক্যার্থ-বোধনই অনেক বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন । কিন্তু যে সমস্ত পদ বা বাক্যের সমুদায়ার্থ নাই, বাহারা মিলিত হইয়া কোন বাক্যার্থ অথবা মহাবাক্যার্থ বোধ জন্মাইতে পারে না, সেই সমস্ত পদ ও বাক্য নিম্প্রয়োজন বলিয়া উহা “অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান । পূর্বোক্ত অপার্থক দ্বিবিধ,—(১) পদাপার্থক ও (২) বাক্যাপার্থক । তন্মধ্যে ভাষ্যকার প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ বাক্যাপার্থকেরই উদাহরণ বলিয়াছেন,—“দশ দাড়িমনি”, “ষড়পুপাঃ” । “দশ দাড়িমনি” এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়—দশটি দাড়িমফল এবং “ষড়পুপাঃ” এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, ছয়খানা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক । কিন্তু দশটি দাড়িমফলই ছয়খানা পিষ্টক, এইরূপ কোন অর্থ ঐ বাক্যদ্বয়ের দ্বারা বুঝা যায় না । ঐ বাক্যদ্বয়ের পরস্পর অন্বয়সম্বন্ধই নাই অর্থাৎ পূর্ববাক্যের অর্থের সহিত পরবাক্যের অর্থের বিশেষাবিশেষণভাবে অন্বয়-সম্বন্ধ না থাকায় ঐ বাক্যদ্বয় যে অসম্বন্ধার্থ, ইহা বুঝা যায় । সুতরাং উক্ত বাক্যদ্বয় নিরাকাজ্ঞ বলিয়া, উহার দ্বারা একটি সমুদায়ার্থের বোধ না হওয়ায় উহার একবাক্যতা সম্ভবই হয় না । এ জন্ত উক্ত বাক্যদ্বয় “অপার্থক” বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সুপ্রাচীন কাল হইতেই উহা “অপার্থকে”র উদাহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । ভাষ্যকার পরে “পদাপার্থকে”র প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে “কুণ্ডং” ইত্যাদি কতিপয় পদের উল্লেখ করিয়াছেন । ঐ সমস্ত পদেরও প্রত্যেকের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই । কারণ, ঐ সমস্ত পদ মিলিত হইয়া কোন একটি সমুদায়ার্থ বা বাক্যার্থের বোধক হয় না । সুতরাং ঐ সমস্ত পদেরও একবাক্যতা সম্ভব না হওয়ায় উহা অপার্থক বলিয়া কথিত হইয়াছে । পদসমূহ এবং বাক্যসমূহ পরস্পর সাকাজ্ঞ হইলেই তাহাদিগের সমুদায়ার্থের একত্ববশতঃ একবাক্যতা হয়, নচেৎ তাহা অপার্থক, ইহা মহর্ষি জৈমিনিও “অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাজ্ঞকৈবভিভাগে স্তাৎ” এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । পূর্বোক্ত পদগত ও বাক্যগত অপার্থকত্ব দোষ সর্বসম্মত । ভারতের কবিগণও উহার উল্লেখ করিয়াছেন* । সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও অপার্থকের পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন* ।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও পাণিনির “বুদ্ধিরাদৈচঃ” এবং “অগবনধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকং” (১.২.৪৫) এই সূত্রের ভাষ্যে “দশ দাড়িমনি” ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত

১। “ন চ সামর্থ্যমপোহিতং কচিৎ” ।—কিরাতার্জুনিয়—২।২৭। তথা কচিদপি সামর্থ্যং গিরাং অন্তোন্ত-সামর্থ্যং সাকাজ্ঞত্বাপোহিতং ন বর্জিতং । অতথা দশ দাড়িমাণিশব্দবদকবাক্যাতুন স্তাৎ । যথাহঃ—“অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাজ্ঞকৈবভিভাগে স্তাৎ” ইতি । মল্লিনাথকৃতাটীকা

২। সমুদায়ার্থশূন্যঃ বৎ তদপার্থকমিবাতে ।

দাড়িমনি দশপুপাঃ ষড়্ভিভাগে বিভাজিতাঃ ।—ভামহপ্রণীত কাব্যালঙ্কার, চতুর্থ পঃ, ৮ম শ্লোক ।

অপার্থকের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উহাকে “অনর্থক” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থ থাকিলেও অনর্থক কিরূপে হইবে? তাই তিনি সেখানে পরে বলিয়াছেন, “সমুদায়োহানর্থকঃ” অর্থাৎ প্রত্যেক পদ বা বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায় পদ বা সমুদায় বাক্যের কোন অর্থ না থাকায় সেই সমুদায়ই সেখানে অনর্থক। সেই সমস্ত পদার্থের পরস্পর সমন্বয় না থাকায় সেই সমুদায়ের কোন অর্থ নাই। তাই বলিয়াছেন, “পনর্থানাং সমন্বয়ান্ভাবাদানর্থক্যং”। শব্দর মিশ্র প্রভৃতি পূর্বোক্ত বিবিধ “অপার্থক”কেই অনাকাক্ষ, অযোগ্য এবং অনাসন্ন, এই তিন প্রকার বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নিরাকাক্ষ বাক্যসমূহ বা পদসমূহই মুখ্য অপার্থক। যেমন “দশ দাড়িমানি, ষড়পুংঃ” ইত্যাদি বাক্য এবং “কুণ্ডং” “অজা” “অজিনং” ইত্যাদি পদ। দ্বিতীয় অযোগ্য অপার্থক; যথা—“বহ্নিরমুখঃ” ইত্যাদি বাক্য। বহ্নি অমুখ হইতেই পারে না, সুতরাং যোগ্যতা না থাকায় উক্ত বাক্যের দ্বারা কোন বোধ জন্মে না। তৃতীয় অনাসন্ন অপার্থক। বাক্যের অন্তর্গত যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ বক্তার অভিপ্রেত, সেই পদদ্বয়ের সন্নিধান বা অব্যবধানকে “আসত্তি” বলে। উহা না থাকিলে তাহাকে বলে অনাসন্ন পদ। অনাসন্ন পদস্থলেও আসত্তিস্থানের অভাবে সমুদায়ার্থবোধ জন্মে না। যেমন “সরসি স্নাত ওদনং ভুক্তা গচ্ছতি” এইরূপ বক্তব্য স্থলে বক্তা বলিলেন, “ওদনং সরসি ভুক্তা স্নাতো গচ্ছতি”। উহা অনাসন্ন নামে তৃতীয় প্রকার পদার্থক। বস্তুতঃ ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে প্রণিধান করিলেও পূর্বোক্ত তিন প্রকার পদার্থক বুঝিতে পারা যায়। কারণ, “কুণ্ডং”, “অজা”, “অজিনং”, “পললপিণ্ডঃ” এই সমস্ত পদের পরস্পর আকাক্ষ না থাকায় উহা নিরাকাক্ষ “পদার্থক”। পললপিণ্ড শব্দের অর্থ মাংসপিণ্ড। বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত পদত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“রৌরু কং রুরসম্বন্ধি, পায়ং পায়মিত্যং অপ্রতিশীনো বৃদ্ধঃ”। উক্ত ব্যাখ্যাসূত্রে “রৌরু কং অজিনং” এইরূপ বাক্য বলিলে রুর অর্থাৎ মুগবিশেষদ্বন্দ্বী অজিন, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভে “অজিনং” এই পদটী “রৌরু কং” এই পদের সন্নিহিত বা অব্যবহিত না হওয়ায় উক্ত স্থলে ঐ পদদ্বয়ের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ অর্থের বোধ হয় না। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়কে অনাসন্ন পদার্থক বলা যায়। এবং স্তম্ভপায়িনী শিশুকুমারীর পিতা “অপ্রতিশীন” অর্থাৎ বৃদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং “স্তম্ভাঃ পিতা অপ্রতিশীনঃ” এই পদত্রয়কে অযোগ্য পদার্থক বলা যায়। উক্ত স্থলে ভাষ্যকারের উহাই বিবক্ষিত কি না, ইহা সুধীগণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিবেন।

পরন্তু উক্ত স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন এখানে মহাভাষ্যোক্ত দশ দাড়িমানি ইত্যাদি সন্দর্ভই যথাযথ উদ্ধৃত করেন নাই। এখানে বাৎস্তায়নের উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে

১। “যথা লোকেহর্থবন্তি চানর্থকানিচ বাক্যানি দৃশ্যন্তঃ”। অনর্থকানি—দশ দাড়িমানি ষড়পুংঃ; কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ, অধরৌরুকমেষতং, কুমার্যাঃ শৈশবকৃতস্ত, পিতা প্রতিশীনঃ”।—মহাভাষ্য। ক্ষাকৃতোহপতাং শৈশবকৃতঃ। নাগেশ ভট্টকৃত বিবরণ। “ন্য”শব্দেন পড়ণাকারং কাঠমুচ্যতে”।—বৈমিনীয়াত্মানানবিস্তর—১১২ পৃষ্ঠা।

“শৈবকৃতন্ত” এই পদ নাই। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে উক্ত পদের কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে বাংলান্নের উদ্ধৃত পাঠ বৈকল্পিক বোধ হয়, তাহা সর্ব্বাংশে মহাভাষ্যোক্ত পাঠের অনুরূপ নহে। বস্তুতঃ সূত্রিকাল হইতেই অপার্থকের উদাহরণরূপে “দশ দাড়িমনি” ইত্যাদি সন্দর্ভ কথিত হইয়াছে। নানা গ্রন্থে কোন কোন অংশে উহার পাঠভেদও দেখা যায়। সুতরাং ভাষ্যকার বাংলান্ন যেন, এখানে মহাভাষ্যোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পতঞ্জলির পূর্বে “অপার্থ”কের উদাহরণরূপে ঐরূপ সন্দর্ভ আর কেহই বলেন নাই, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সে যাহা হউক, মূল কথা, বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজের পক্ষস্থাপনাদি করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন পদসমূহ বা বাক্যসমূহের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উহা “অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উহার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় উহা নিস্প্রয়োজন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ইহার বিশেষ কি? নিরর্থক স্থলেও ত পরবোধনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত “নিরর্থক” স্থলে বর্ণমাত্র উচ্চারিত হয়, তাহার কোন অর্থই নাই। কিন্তু “অপার্থক” স্থলে প্রত্যেক পদেরই অর্থ আছে। অর্থাৎ “নিরর্থক” স্থলে অবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, কিন্তু “অপার্থক” স্থলে বাচক শব্দেরই প্রয়োগ হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত “অর্থান্তর” স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত বাক্যগুলি প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী না হইলেও তাহার অর্থের পরস্পর অসঙ্গ-সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অপার্থক স্থলে তাহা নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত “নিরর্থক” ও “অর্থান্তর” হইতে এই “অপার্থক” ভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থান ৥১০ ॥

অভিন্নতাকার্য্যপ্রতিপাদক-নিগ্রহস্থান-চতুষ্টিয়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

সূত্র । অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালঃ ॥১১॥৫১৫॥

অনুবাদ । অবয়বের বিপর্য্যাসবচন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-প্রয়োগের যে ক্রম যুক্তিসিদ্ধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া বিপরীতভাবে অবয়বের বচন (১০) অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ অপ্রাপ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানাং যথালক্ষণমর্থবিশাৎ ক্রমঃ । তত্রাবয়ব-বিপর্য্যাসেন বচনমপ্রাপ্তকালমসম্বন্ধার্থঃ নিগ্রহস্থানমিতি ।

অনুবাদ । প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহের লক্ষণানুসারে অর্থবিশতঃ ক্রম আছে। তাহা হইলে অবয়বের বিপরীতভাবে বচন অসম্বন্ধার্থ হওয়ায় “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

টিপ্পনী । এই সূত্র দ্বারা “অপ্রাপ্তকাল” নামক দশম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনের জন্ত যে প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ করিবেন,

তাহার লক্ষণ ও তদনুসারে তাহার ক্রম প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। বাদী বা প্রতিবাদী যদি সেই ক্রম লঙ্ঘন করিয়া, বিপরীত ভাবে কোন অবয়বের প্রয়োগ করেন অর্থাৎ প্রথম বক্তব্য প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিয়াই হেতুবাক্য বা উদাহরণাদি বাক্য বলেন অথবা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া, পরে উদাহরণবাক্য এবং তাহার পরে হেতুবাক্য বলেন অথবা প্রথমেই নিগমনবাক্য বলিয়া পরে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন, এইরূপে ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যে অবয়ববচন, তাহা “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান। কারণ, অপরের আকাজ্জানুসারেই তাঁহাকে নিজপক্ষ বুঝাইবাব জন্ত বাদীর পক্ষাবয়ব প্রয়োগ কর্তব্য। সুতরাং প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্যনির্দেশ করিয়া, পরে তাহার সাধক হেতু কি? এইরূপ আকাজ্জানুসারেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়া, হেতু বক্তব্য। পরে ঐ হেতু যে সেই সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য, ইহা কিরূপে বুঝিব? এইরূপ আকাজ্জানুসারেই উদাহরণবাক্যের প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টান্ত বক্তব্য। বাদী এইরূপে অপরের আকাজ্জানুসারেই যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিলেই ঐ সমস্ত বাক্যের পরস্পর অর্থসম্বন্ধ বুঝা যায়। কিন্তু উক্তরূপ ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যেচ্ছানুসারে বিপরীত ভাবে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ তাৎপর্য্যেই পরে বলিয়াছেন,—“অসম্বন্ধার্থঃ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বলিলে একের অর্থের সহিত দূরস্থ অপর অবয়বের অর্থের সম্বন্ধ-বোধ না হওয়ায় সেখানে ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা একটি মহাবাক্যার্থ-বোধ হয় না। সুতরাং সেখানে বাদীর ঐরূপ বচন তাঁহার প্রয়োজনসাধক না হওয়ায় উহা নিগ্রহস্থান।

বৌদ্ধসম্প্রদায় উক্ত নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অর্থবোধে পদের বর্ণাদিক্রমের অপেক্ষা থাকিলেও বাক্যের ক্রমের কোন অপেক্ষা নাই। দূরস্থ বাক্যের সহিতও অপর বাক্যের অর্থসম্বন্ধ থাকিতে পারে। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে (২।৯ সূত্রভাষ্যে) উক্ত বৌদ্ধ মতানুসারেই একটি প্রাচীন কারিকার^১ উল্লেখপূর্বক উক্ত মতানুসারে কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের ব্যাখ্যাত সূত্রার্থ যে সেখানে সূত্রার্থ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকারের নিজমতে যে, বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ করিলে, সেখানে পরস্পরের অর্থসম্বন্ধ থাকে না, ইহা এখানে তাঁহার পূর্বোক্ত কথার দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকর এবং জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিও এখানে বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অনেক স্থলে অর্থবোধে বাক্যের ক্রম আবশ্যক না হইলেও পরার্থানুমান-স্থলে যে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ কর্তব্য, তাহার ক্রম আবশ্যক। বস্তুতঃ যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ না করিলে তাহা “শ্রাস্ত”বাক্যই হয় না। রঘুনাথ নিরোমণিও শ্রাস্তবাক্যের লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বাদী বা প্রতিবাদী ক্রম লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বলিলে অবশ্যই নিগ্রহীত

১। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ্যকারের উক্ত “বস্ত্ত যেনার্থসম্বন্ধঃ” ইত্যাদি কারিকাসি কোন বৌদ্ধ-রচিত কারিকা মনে হয়। কিন্তু “শ্রাস্তমূত” গ্রন্থে বাসমতি “বার্ত্তিক” বলিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা কাত্যায়নের বার্ত্তিকও হইতে পারে।

হইবেন। ভাস্কর্য্যের “শ্রায়সারে”র প্রধান টীকাকার ভূষণ ও জয়সিংহ স্মৃতি প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে পূর্বে বাদী ও প্রতিবাদী শাস্ত্রোক্ত ক্রম রক্ষা করিয়াই বিচার করিব, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন, অর্থাৎ যাহাকে “নিয়মকথা” বলে, তাহাতেই কেহ ক্রম লঙ্ঘন করিলে তাঁহার পক্ষে “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অত্র স্থলে অর্থাৎ যাহাকে “প্রপঞ্চকথা” বা “বিস্তরকথা” বলে, তাহাতে কেহ ক্রম লঙ্ঘন করিলেও এই নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু কথা-মাত্রেরই যে সর্বত্র প্রতিজ্ঞাদি বাক্য ও অন্ত্যান্ত সাধন ও দুষণাদির ক্রম আবশ্যিক, ইহা সমর্থন করিয়া বরদরাজ প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতিও প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ক্রমের আবশ্যিকতা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদিগের সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

“প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “অবয়ব” শব্দের দ্বারা কেবল প্রতিজ্ঞাদি অবয়বই গৃহীত হয় নাই। উহার দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথা বা বিচার-বাক্যের অংশমাত্রই বিবক্ষিত। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী সাধন ও দুষণের ক্রম লঙ্ঘন করিলেও নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং সেই স্থলেও এই “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার্য্য। যেমন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। পরে তাঁহার প্রযুক্ত হেতু যে, সেই স্থলে হেত্বাভাস নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর উক্ত বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া, তিনি যে বাদীর কথা সমস্ত শুনিয়া, তাঁহার বক্তব্য ঠিক বুঝিয়াছেন, ইহা মধ্যস্থগণের নিকটে প্রতিপন্ন করিবেন। পরে বাদীর প্রযুক্ত হেতুর খণ্ডন করিয়া, প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন। পরে তাঁহার নিজের প্রযুক্ত হেতু যে, হেত্বাভাস নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। “জল্প”নামক কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর সাধন ও দুষণের উক্তরূপ ক্রম যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ ও বর্ণিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য উহা বিশদরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। “বাদিবিবাদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বাদী বা প্রতিবাদী উক্তরূপ ক্রমের লঙ্ঘন করিলেও সেখানে “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। যেমন প্রতিবাদী যদি প্রথমেই তাঁহার বক্ষ্যমাণ হেতুর দোষশূন্যতা প্রতিপাদন করিয়া, পরে সেই হেতুর প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেখানে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং এই সূত্রে “অবয়ব” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর কথার অংশমাত্রই বিবক্ষিত। বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই সূত্রের উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্তরূপ ব্যাখ্যায় “অপ্রাপ্তকাল” নামক নিগ্রহস্থানের আরও বহুবিধ উদাহরণ সংগৃহীত হওয়ায় পূর্বোক্ত “অপার্থক” হইতে ইহার পৃথক নির্দেশও সম্পূর্ণ সার্থক হয়, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যিক ॥১১॥

সূত্র । হীনমততমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং ॥১২॥৫১৬॥

অনুবাদ । অত্যন্তম অবয়ব অর্থাৎ যে কোন একটি অবয়ব কর্তৃকও হীন বাক্য

(১১) “ন্যূন” অর্থাৎ “ন্যূন” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানামন্ততমেনাপ্যবয়বেন হীনং ন্যূনং নিগ্রহ-
স্থানং । সাধনাভাবে সাধ্যাসিদ্ধিরিতি ।

অমুবাদ । প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহের মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব
কর্তৃকও হীন বাক্য “ন্যূন” নামক নিগ্রহস্থান হয় । (কারণ) সাধনের অভাবে
সাধ্যাসিদ্ধি হয় না ।

টিপ্পনী । এই সূত্রের দ্বারা “ন্যূন” নামক একাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে ।
বাদী ও প্রতিবাদী যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিবেন, তন্মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব ন্যূন
হইলেও সেখানে “ন্যূন” নামক নিগ্রহস্থান হয় । উহা নিগ্রহস্থান হইবে কেন, ইহা বুঝাইতে
ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধনের অভাবে সাধ্যাসিদ্ধি হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, নিজপক্ষ
স্থাপনায় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি অবয়বই মিলিত হইয়া সাধন হয় । সুতরাং উহার একটির
অভাব হইলেও মিলিত পঞ্চাবয়বরূপ সাধনের অভাবে সাধ্যাসিদ্ধি হইতে পারে না । সুতরাং
কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি সভাক্ষোভাদিবশতঃ যে কোন একটি অবয়বের প্রয়োগ না করেন,
তাহা হইলে সেখানে অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন । “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন
যে, বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ সিদ্ধান্তসিদ্ধ অবয়বের মধ্যেই যদি একটিমাত্রও ন্যূন হয়, তাহা
হইলে সেখানেই “অবয়বন্যূন” নিগ্রহস্থান হয় । সুতরাং যে বৌদ্ধসম্প্রদায় উদাহরণ এবং উপনয়,
এই দুইটি মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন এবং মৌমাংসকসম্প্রদায় যে প্রতিজ্ঞাদিত্রয় অথবা
উদাহরণাদিত্রয়কে অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাঁহাদিগের
অস্বীকৃত কোন অবয়বের প্রয়োগ না করায় তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে না । বরদ-
রাজ প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছেন । কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্তিককার ঐরূপ কথা বলেন নাই ।
পরন্তু বার্তিককার “প্রতিজ্ঞান্যূন”কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন । পরে তাহা ব্যক্ত
হইবে । পরন্তু ঐরূপ বলিলে যে স্থলে উদাহরণ-বাক্য ব্যতীতও ব্যাপ্তির বোধ হয়, বৌদ্ধসম্প্রদায়
যে স্থলে ঐ ব্যাপ্তিকে বলিয়াছেন “অন্তব্যাপ্তি,” সেই স্থলে উদাহরণবাক্য না বলিলেও “ন্যূন” নামক
নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাও বলা যায় । কিন্তু সে কথা কেহই বলেন নাই । মহানৈয়ায়িক
উদয়নাচার্য্য এই সূত্রেও “অবয়ব” শব্দের দ্বারা কথার অংশমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন । তদনুসারে
বরদরাজও এই সূত্রে “অবয়ব” দ্বারা কথারস্ত, বাদাংশ, বাদ এবং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়া
পূর্বোক্ত “ন্যূন” নামক নিগ্রহস্থানকে চতুর্বিধ বলিয়াছেন । তন্মধ্যে “জল্প” নামক কথায় বাদী
প্রথমে ব্যবহার-নিয়মাদি কথারস্ত না করিয়াই প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োগ করিলে, উহার নাম (১) কথারস্ত-
ন্যূন । হেতুর প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দোষত্ব প্রতিপন্ন না করিলে অথবা হেতুর প্রয়োগ না
করিয়াই প্রথমেই বক্ষ্যমাণ সেই হেতুর নির্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিলে উহার নাম (২) বাদাংশন্যূন ।
এইরূপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন না করিয়া, নিজ পক্ষ স্থাপনা করিলে অথবা নিজ-
পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিলে উহার নাম (৩) বাদন্যূন ।

প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোন অবয়ব না বলিলে উহার নাম (৪) অবয়বনূন। পূর্বোক্ত কোন স্থলেই “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান বলা যায় না। কারণ, কোন সিদ্ধান্তের বিবৃতি-চরণই “অপসিদ্ধান্ত” নহে। কিন্তু প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্বন্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পরে উহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্বক সেই আরও কথার প্রসঙ্গই “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ প্রভৃতি “প্রতিজ্ঞানূন”কে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। দিঙ্নাগ বলিয়াছেন যে, বাদীর নিজ সিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, উহা কোন বাচ্যরূপ অবয়ব নহে। সুতরাং “প্রতিজ্ঞানূন” বলিয়া কোন নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না। দিঙ্নাগের মতানুসারে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও তাঁহার “কাব্যালঙ্কার” গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন^১। উদ্যোতকর এখানে দিঙ্নাগের পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে বাদী নির্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিগৃহীত হইবেন কি না? নিগৃহীত হইলে সেখানে তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান কি? যদি বল, তিনি সেখানে নিগৃহীত হইবেন না, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যহীন হেতুবাক্য প্রভৃতিও অর্থসাধক হয়, ইহা স্বীকার করিয়া, সাধনের অভাবেও সাধ্যসিদ্ধি স্বীকার করিতে হয়। উদ্যোতকর পরে ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ত দিঙ্নাগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, এই যে কথা বলিতেছ, তাহা কিন্তু আমরা বুঝি না। কারণ, যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা সিদ্ধান্ত, আর যাহা প্রতিজ্ঞা, তাহা সাধ্যার্থ। সুতরাং সিদ্ধান্তপরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, ইহা কখনই বলা যায় না। তাৎপর্য এই যে, বাদীর প্রথম বক্তব্য সাধ্যার্থ বাচ্যবিশেষই প্রতিজ্ঞা। ঐ প্রতিজ্ঞার সাধন করিবার জন্তই হেতু ও উদাহরণ-বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করা হয়। ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ ব্যতীত অত্যাশ্রিত বাক্য কখনই সাধ্যসাধক হইতে পারে না। সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধনেরই অন্তর্গত। অতএব প্রতিজ্ঞাহীন অত্যাশ্রিত বাক্য কখনই সাধ্যসাধক না হওয়ায় “প্রতিজ্ঞানূন”ও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য। যিনি নির্দোষ হেতু প্রয়োগ করিয়াও এবং উদাহরণবাক্য প্রভৃতি বলিয়াও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন নাই, তিনিও ঐ নিগ্রহস্থানের দ্বারা অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন ॥ ১২ ॥

সূত্র । হেতুদাহরণাধিকমধিকং ॥১৩॥৫১৭॥

অনুবাদ । যে বাক্যে হেতু অথবা উদাহরণ অধিক অর্থাৎ একের অধিক বলা হয়, তাহা (১২) “অধিক” অর্থাৎ অধিক নামক নিগ্রহস্থান।

১. দৃশ্যনূনতাস্তিনূনং হেতুদিনাত্র চ ।

ভগ্ন লভ্যং কথ্যাস্ত নূনং নেষ্টং প্রতিজ্ঞয়া ॥ --“কাব্যালঙ্কার”, পঞ্চম পঃ, ২৮ ।

ভাষ্য । একেন কৃতত্বাদন্যতরস্থানর্থক্যমিতি । তদেতন্নিয়মাত্ম্যপ-
গমে বেদিতব্যমিতি ।

অনুবাদ । একের দ্বারাই কৃতত্ব (নিষ্পন্নত্ব) বশতঃ অন্যতরের অর্থাৎ দ্বিতীয়
অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্যের আনর্থক্য । সেই ইহা অর্থাৎ এই “অধিক” নামক
নিগ্রহস্থান, নিয়ম স্বীকার স্থলে জানিবে ।

টীপ্পনী । এই সূত্র দ্বারা “অধিক” নামক দ্বাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । বাদী
ও প্রতিবাদী পক্ষাবয়বের প্রয়োগ করিতে একের অধিক হেতুবাক্য অথবা একের অধিক উদাহরণ-
বাক্য বলিলে সেই পক্ষাবয়ব বাক্য “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান হয় । উহা নিগ্রহস্থান হইবে
কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একের দ্বারাই কর্তব্য কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হওয়ায়
অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্য অনর্থক । অর্থাৎ যে কণ্ঠের ক্রিয়া পূর্বেই নিষ্পাদিত হইয়াছে,
তাহাতে আবার অপর সাধন বলিলে, উহা সেখানে সাধনই না হওয়ায় উহা অনর্থক হয় । কিন্তু
যে স্থলে পূর্বে বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বলিব না, এইরূপ
নিয়ম স্বীকার করেন, সেই “নিয়মকথা”তেই এই নিগ্রহস্থান হইবে । অর্থাৎ ঐরূপ স্থলেই
সেই বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতু বা উদাহরণ-বাক্য বলিলে নিগ্রহীত হইবেন ।
ভাষ্যকারও এখানে ঐ কথা বলিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্র ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে
প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ, বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমার এই সাধ্য বিষয়ে কি কি সাধন
আছে ? সেই স্থলে সমস্ত সাধনই বাদীর বক্তব্য । কারণ, ঐরূপ স্থলে বাদী অন্তান্ত সাধন না
বলিলে তাঁহার নিগ্রহ হয় । সুতরাং সর্বত্রই একাধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ
দোষ নহে । পরন্তু কোন কোন স্থলে উহা কর্তব্য । জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে গরে
বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মকীর্ত্তিও “প্রপঞ্চকথাস্ত ন দোষঃ” এই বাক্যের দ্বারা ঐরূপই বলিয়াছেন ।
বাদী ও প্রতিবাদী নানা হেতু ও নানা উদাহরণাদির দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন
করিয়া যে বিচার করেন, তাহা “প্রপঞ্চকথা” ও “বিস্তরকথা” নামেও কথিত হইয়াছে । উহাতে
হেতু ও উদাহরণাদির আধিক্য দোষ নহে । কেহ কেহ উহাতেও দ্বিতীয় হেতু ও উদাহরণাদি
ব্যর্থ বলিয়া, উহা দোষ বলিয়াছেন । কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, সর্বত্রই বোধের দৃঢ়তা সম্পা-
দনের জন্ত হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিলে উহা দোষ হইতে পারে না । সুতরাং “অধিক”
নামক কোন নিগ্রহস্থান নাই । উদ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু-
বাক্যদ্বয় অথবা উদাহরণবাক্যদ্বয়ই এক অর্থের জ্ঞাপক, ইহা স্বীকার করিলেও একের দ্বারাই
যখন তাহা জ্ঞাপিত হয়, তখন অত্রের উল্লেখ ব্যর্থ । সুতরাং উহা অবশ্যই নিগ্রহস্থান । তাৎপর্য্য
এই যে, যিনি অজিজ্ঞাসিত জ্ঞাত অর্থেরই পুনর্জ্ঞাপন করেন, তিনি অবশ্যই অপরাধী । তবে
প্রতিবাদী বা মধ্যস্থগণের জিজ্ঞাসা স্থলে বাদী অপর হেতুবাক্য বা অপর উদাহরণবাক্য প্রয়োগ

করিলে সেখানে তজ্জন্ত উহার নিগ্রহ হইবে না। তাই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, পূর্কোক্তরূপ নিয়ম স্বীকার স্থলেই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান জানিবে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিব না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া, পরে ঐ স্বীকৃত নিয়মের পরিভাগ করিলে তৎপ্রযুক্তও বাদী বা প্রতিবাদী নিগ্রহাই হইবেন। বস্তুতঃ বাদী বা প্রতিবাদী পঞ্চাবয়ব আয়বাক্যের প্রয়োগ করিতে যদি সেই বাক্যের মধ্যেই একাধিক হেতু অথবা একাধিক উদাহরণবাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলেই সেই বাক্য “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা বুঝা যায়। উদ্যোতকরও ঐ ভাবেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের সূত্র বিচারানুসারে “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ প্রভৃতি দুষণাদির আবিষ্কার স্থলেও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্যের আধিক্যস্থলে পরবর্তী সূত্রোক্ত পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্য বা নিগমনবাক্য একের অধিক বলিলে সেই অধিকবচন পুনরুক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় সেখানে পুনরুক্তই নিগ্রহস্থান বলা যায়। কিন্তু হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য অধিক বলিলে তাহা পুনরুক্তলক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায় উহা “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য। যেমন “ধূমাং” বলিয়া আবার “আলোকাং” বলিলে অথবা “যথা মহানসং” বলিয়া আবার “যথা চন্দ্রং” বলিলে উহা শব্দপুনরুক্তও হয় না, অর্থপুনরুক্তও হয় না। সুতরাং উহা পুনরুক্ত হইতে ভিন্ন নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য। কিন্তু “যথা মহানসং” বলিয়া, পরে “মহানসবৎ” এই বাক্য বলিলে উহা পুনরুক্তের লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় “পুনরুক্ত” বলিয়াই স্বীকার্য। এইরূপ উপনয়বাক্য অধিক বলিলেও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বরদরাজ উহাকেও “হেতুধিক” বলিয়াই এই নিগ্রহস্থানমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ এই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে বাক্য অন্নিত অর্থাৎ অপূর্ণ বাক্যের সহিত সম্বন্ধার্থ এবং প্রকৃতোপযোগী এবং অপুনরুক্ত, এমন কৃতকর্তব্য বাক্যের উক্তিই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান। যে বাক্যের কর্তব্য বা ফলসিদ্ধি পূর্বেই অগ্র বাক্যের দ্বারা কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই বাক্যকে “কৃতকর্তব্য” ও “কৃতকার্য্যকর” বাক্য বলে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলে। সুতরাং পূর্ববাক্যের দ্বারা অনুবাদবাক্যের ফলসিদ্ধি না হওয়ায় উহা “কৃতকর্তব্য” বাক্য নহে। কৃতকর্তব্য বাক্যের প্রয়োগ করিলেও যদি ঐ বাক্য সম্বন্ধার্থ না হয়, তাহা হইলে উহা পূর্কোক্ত “অপার্থক” হয় এবং ঐ বাক্য প্রকৃতোপযোগী না হইলে উহা পূর্কোক্ত “অর্থান্তর” হয় এবং অপুনরুক্ত না হইলে পূর্কোক্ত “পুনরুক্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং পূর্কোক্ত “অপার্থক” প্রভৃতির ব্যবচ্ছেদের জন্ত পূর্কোক্ত বিশেষণত্রয়ের উল্লেখ কর্তব্য। বরদরাজ ঐরূপ “অনুবাদ” বাক্যের অধিক উক্তিও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নবানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি হেতুতে বার্থ বিশেষণের উক্তিকেও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন “নীলধূমাং” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করিলে সেখানে ধূমে নীলরূপ বার্থ বিশেষণের উক্তি।

রঘুনাথ শিরোমণির মতে নীলধুমত্বরূপে নীল ধূমেও বহির ব্যাপ্তি আছে। উহা ব্যাপ্তাদিক নহে' ১১৩।

স্বসিদ্ধান্তানুরূপ প্রয়োগাভাসনিগ্রহস্থানত্রিক প্রকরণ সমাপ্ত ৥ ৩ ৥

সূত্র । শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনং পুনরুক্তমন্ত্যানুবাদাৎ ॥

॥১৪॥৫১৮॥

অনুবাদ । অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দ অথবা অর্থের পুনরুক্তি (১৩) “পুনরুক্ত” অর্থাৎ “পুনরুক্ত” নামক নিগ্রহস্থান ।

ভাষ্য । অন্ত্যানুবাদাৎ—শব্দপুনরুক্তমর্থপুনরুক্তং বা । নিত্যঃ শব্দো নিত্যঃ শব্দ—ইতি শব্দপুনরুক্তং । অর্থপুনরুক্তং,—অনিত্যঃ শব্দো নিরোধধর্মাকো ধ্বনিরिति । অনুবাদে ত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ । যথা—“হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমন”মিতি ।

অনুবাদ । অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দপুনরুক্ত অথবা অর্থপুনরুক্ত হয় । যথা—“নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ” এইরূপ উক্তি শব্দপুনরুক্ত । “অনিত্যঃ শব্দঃ, নিরোধধর্মাকো ধ্বনিঃ” এইরূপ উক্তি অর্থপুনরুক্ত । কিন্তু অনুবাদ স্থলে পুনরুক্ত হয় না । কারণ, শব্দের অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তিবশতঃ অর্থ-বিশেষের বোধ জন্মে । যেমন “হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনং” এই সূত্রের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ।

টীপ্পনো । এই সূত্রের দ্বারা “পুনরুক্ত” নামক ত্রয়োদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও বিভাগ স্থচিত হইয়াছে । সপ্রয়োজন পুনরুক্তির নাম অনুবাদ, উহা পুনরুক্ত দোষ নহে । পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ আছে । মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । তদনুসারে ভাষ্যকারও এখানে পরে বলিয়াছেন যে, অনুবাদ স্থলে শব্দের পুনরাবৃত্তিরূপ অভ্যাসপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধ হইয়া থাকে । অর্থাৎ তজ্জন্মই পূর্বোক্ত শব্দের পুনরুক্তি করা হয় । সুতরাং উহা সপ্রয়োজন পুনরুক্তি বলিয়া দোষ নহে, উহার নাম অনুবাদ । ভাষ্যকার পরে মহর্ষি গৌতমের প্রথমাদ্যায়োক্ত “হেতুপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া নিগমনবাক্যকেই ইহার উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । ভাষ্যকারের মতে নিগমনবাক্যে

১। “নীলধুমত্বাদেকারীগীর্ষে তু” । রঘুনাথ শিরোমণিকৃত বিশেষব্যাপ্তিদীপ্তি । “বারীগীর্ষে তু”তি । বস্তুতঃ স্বমতে নীলধুমত্বমপি ব্যাপ্তিরেব । তাদ্রুপেণ হেতুপ্রয়োগে তু “অনিকে”নৈব নিগ্রহস্থানেন পূর্ববো নিগ্রহত ইতি ভাষ্যঃ ।—জগদীশী টীকা ।

পূর্বোক্ত হেতুবাক্যেরই পুনরুক্তি হইয়া থাকে (প্রথম খণ্ড, ২৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ। সুতরাং উহা পুনরুক্তিদোষ বা পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্তু নিপ্রয়োজন পুনরুক্তিই দোষ এবং উহাই নিগ্রহস্থান। এই পুনরুক্তি দ্বিবিধ, সুতরাং পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থানও দ্বিবিধ। যথা—শব্দপুনরুক্ত ও অর্থপুনরুক্ত। একার্থক একাকার শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে তাহাকে বলে শব্দপুনরুক্ত। যেমন কোন বাদী “নিত্যঃ শব্দঃ” বলিয়া প্রমাণ-বশতঃ আবারও “নিত্যঃ শব্দঃ” এই বাক্য বলিলে—উহা হইবে “শব্দপুনরুক্ত”। এবং “অনিত্যঃ শব্দঃ” বলিয়া, পরে উহার সমানার্থক বাক্য বলিলেন, “নিরোধধর্মকো ধ্বনিঃ।” ধ্বনিরূপ শব্দ নিরোধ অর্থাৎ বিনাশরূপ ধর্মবিশিষ্ট, এই অর্থ পূর্বেরই “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই বাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা সেই অর্থেরই পুনরুক্তি হইয়াছে, সুতরাং উহা অর্থপুনরুক্ত। এইরূপ “ঘটা ঘটঃ” এইরূপ বলিলে শব্দপুনরুক্ত হয় এবং “ঘটঃ কলসঃ” এইরূপ বলিলে অর্থপুনরুক্ত হয়। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যদিও শব্দপুনরুক্ত স্থলেও অর্থের পুনরুক্তি অবশ্যই হয়, তথাপি অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দপূর্বক। অর্থাৎ শব্দের পুনরুক্তি হইলে প্রথমে সেই শব্দেরই প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় উহা শব্দপুনরুক্তি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। আর ঐ শব্দপুনরুক্তির ব্যবহার জাত্যপেক্ষ। অর্থাৎ পূর্বোচ্চারিত সেই শব্দেরই পুনরুক্ত্যরণ হয় না, তাহা হইতে পারে না, কিন্তু তজ্জাতীয় শব্দেরই পুনরুক্তি হয়, তাই উহা শব্দপুনরুক্ত নামে কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

সূত্র। অর্থাদাপন্নস্য স্বশব্দেন পুনর্বচনং ॥১৫॥৫১৯॥

অনুবাদ। অর্থতঃ আপন্ন পদার্থের অর্থাৎ কোন বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, তাহার স্ব শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বারা পুনর্বচনও (১৩) পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। “পুনরুক্ত”মিতি প্রকৃতং। নিদর্শনং—“উৎপত্তি-ধর্মকত্বা-দনিত্য”মিত্যুক্তা অর্থাদাপন্নস্য যোহভিধায়কঃ শব্দন্তেন স্বশব্দেন ক্রিয়া-দনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যমিতি, তচ্চ পুনরুক্তং বেদিতব্যং। অর্থদম্প্রত্যয়ার্থে শব্দপ্রয়োগে প্রতীতঃ সৌহর্থোহর্থাপত্ত্যেতি।

অনুবাদ। “পুনরুক্ত” এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণগত। নিদর্শন অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত পুনরুক্তের উদাহরণ যথা—“উৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যং” এই বাক্য বলিয়া অর্থতঃ আপন্ন পদার্থের অর্থাৎ ঐ বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝা যায়, তাহার বাচক যে শব্দ, সেই “স্বশব্দ”র দ্বারা (বাদী) যদি বলেন, “অনুৎপত্তি-

ধর্ম্যকং নিত্যং”, তাহাও পুনরুক্ত জানিবে, (কারণ) অর্থবোধার্থ শব্দপ্রয়োগে সেই অর্থ অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে ।

টিপ্পনী । মহর্ষি পূর্বসূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ পুনরুক্ত বলিয়া, পরে আবার এই সূত্রদ্বারা তৃতীয় প্রকার পুনরুক্ত বলিয়াছেন । বাদী কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে উহার অর্থতঃই বাহা বুঝা যায় অর্থাৎ অর্থাপত্তির দ্বারাই যে অনুক্ত অর্থের বোধ হয়, বাহা তাহার বাচক শব্দরূপ স্বশব্দের দ্বারা আর বলা অনাবশ্যক, সেই অর্থের স্বশব্দের দ্বারা যে পুনরুক্তি, তাহাই তৃতীয় প্রকার পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান । পুনরুক্ত প্রকরণবশতঃ পূর্বসূত্র হইতে এই সূত্রে “পুনরুক্তং” এই পদটির অনুবৃ্ত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায় । তাই ঐ তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—“পুনরুক্ত-মিতি প্রকৃতং” । ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ দ্বারা সূত্রার্থ বর্ণনও করিয়াছেন । যেমন কোন বাদী “উৎপত্তিধর্ম্যকমনিত্যং” এই বাক্য বলিয়া, আবার যদি বলেন,—“অনুৎপত্তিধর্ম্যকং নিত্যং”, তাহা হইলে উহাও “পুনরুক্ত” হইবে । কারণ, উৎপত্তিধর্ম্যক বস্তুমাত্রই অনিত্য, এই বাক্য বলিলে উহার অর্থতঃই বুঝা যায় যে, অনুৎপত্তিধর্ম্যক বস্তু নিত্য । কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্যক বস্তু নিত্য না হইলে উৎপত্তিধর্ম্যক বস্তুমাত্র অনিত্য, ইহা উপপন্নই হয় না । সুতরাং অর্থাপত্তির দ্বারাই বাদীর অনুক্ত ঐ অর্থ প্রতীত হওয়ায় আবার স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ উহার অভিধায়ক “অনুৎপত্তিধর্ম্যকং নিত্যং” এই বাক্যের দ্বারা ঐ অর্থের পুনরুক্তি বার্থ । সুতরাং উহাও নিগ্রহস্থান । ভাষ্যকার পরে এই যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অর্থ-বোধার্থই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে । সুতরাং অর্থের বোধ হইয়া গেলে আর শব্দ প্রয়োগ অনাবশ্যক । পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর শেষোক্ত বাক্যার্থ—অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে । মহর্ষি গোতম অর্থাপত্তিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও প্রকৃত অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন । তাহার মতে উহা অনুমানের অন্তর্গত । এই অর্থাপত্তি “আক্ষেপ” নামেও কথিত হইয়াছে । তাই বরদরাজ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এই পুনরুক্ত ত্রিবিধ—(১) শব্দপুনরুক্ত, (২) অর্থপুনরুক্ত ও (৩) আক্ষেপপুনরুক্ত । বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পুনরুক্ত নামক একই নিগ্রহস্থান কথঞ্চিৎ আবাস্তরভেদবিবক্ষাবশতঃ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অর্থপুনরুক্ত হইতে ভিন্ন শব্দপুনরুক্ত উপপন্ন হয় না । কারণ, স্বার্থ শব্দ স্থলে শব্দের পুনরুক্তি হইলেও অর্থের ভেদ থাকায় শব্দপুনরুক্ত দোষ হয় না । জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মত স্বীকার করিয়াই সমাধান করিয়াছেন যে, যে বাদী নিজের অধিক শক্তি ধ্যানের ইচ্ছায় অর্থভেদ থাকিলেও আমি নিজের উক্ত কোন শব্দেরই পুনঃ প্রয়োগ করিব না, সমস্ত শব্দেরই একবার মাত্র প্রয়োগ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ প্রথমে উক্তরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া জল্পবিচারের আরম্ভ করেন, তিনি কোন শব্দের পুনঃ প্রয়োগ করিলে সেখানে “শব্দপুনরুক্তে”র দ্বারাও নিগৃহীত হইবেন, ইহা সূচনা করিবার জন্মই মহর্ষি অর্থপুনরুক্ত হইতে শব্দপুনরুক্তের পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ নিয়মকথাতেই সর্বপ্রকার পুনরুক্ত নিগ্রহস্থান হইবে,

অন্ততঃ উহা নিগ্রহস্থান হইবে না। বরদরাজ ইহা জয়ন্ত ভট্টের ত্রায় বিশ্বরূপের মত বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ভাস্কর্য্যের “তায়সারে”র টীকাকার জয়সিংহ স্মৃতিও উক্তরূপ দিকান্তই স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এখানে ঐরূপ কোন কথাই বলেন নাই। পরন্তু উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করেন না। কারণ, কোন বাদী পুনরুক্তি করিলেও তদ্বারা তাঁহার প্রকৃত বিষয়ের কোন বাধ বা হানি হয় না। পরন্তু পুনরুক্তির দ্বারা অপরে সেই বাক্যার্থ সম্যক বুঝিতে পারে। সুতরাং অপরকে বুঝাইবার উদ্যোগেই যে বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য, তাহাতে সর্বত্র পুনরুক্তির সার্থকতাও আছে। অতএব পুনরুক্তি কখনই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। উদ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে অর্থ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহারই পুনঃ প্রতিপাদনের জন্য পুনরুক্তি বার্থ। সুতরাং বৈয়র্থ্যবশতঃই পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই “বৈয়র্থ্য”শব্দের পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ প্রয়োজনবহুরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়া তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদী পুনরুক্তি করিলে সেখানে প্রতিবাদী উহার প্রয়োজন চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, প্রথমোক্ত বাক্য হইতে আপাততঃ প্রতীত অর্থও অপ্রতীত অর্থের ত্রায় মন করিয়া, কিছু নিশ্চয় করিতে পারেন না। সুতরাং বাদী তাঁহাকে পুনরুক্তির বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াও তখন তাঁহার পক্ষে প্রতিপাদক হন না। অর্থাৎ তখন তিনি সেই প্রতিবাদীকে তাঁহার সাধনের বিষয় সাধ্য পদার্থ নিঃসংশয়ে বুঝাইতে পারেন না। অতএব তাঁহার সেই পুনরুক্তির বিরুদ্ধ প্রয়োজনবহুরূপ বৈয়র্থ্য হয়। কারণ, বাদী তাঁহার সাধ্য বিষয়ের নিশ্চয়কে পুনরুক্তির প্রয়োজন মনে করিয়া পুনরুক্তি করেন, তদ্বারা প্রতিবাদীর সংশয়ই উৎপন্ন হইলে উহার প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়। অতএব পুনরুক্তি অবশ্যই নিগ্রহস্থান। মূলকথা, উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে “পুনরুক্ত” সর্বত্রই নিগ্রহস্থান। তবে কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থে যে “বাদ”বিচার হয়, তাহাতে “পুনরুক্ত” নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক কথাতেই পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে “পুনরুক্ত” নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ১৫।

পুনরুক্তিনিগ্রহস্থানপ্রকরণ সমাপ্ত ৪৪।

সূত্র। বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিভিহিতস্তা-

প্যপ্রত্যুচ্চারণমনুভাষণং ॥১৬॥৫২০॥

অনুবাদ। (বাদী কর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও সত্য বা মধ্যস্থকর্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের অপ্রত্যুচ্চারণ (১৪) “অনুভাষণ” অর্থাৎ “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য । “বিজ্ঞাতস্ত” বাক্যার্থস্ত “পরিষদা”, বাদিনা “ত্রিরভিহিতস্ত” য“দপ্রত্যুচ্চারণং”, তদননুভাষণং নাম নিগ্রহস্থানমিতি । অপ্রত্যুচ্চারণন্ কিমাশ্রয়ং পরপক্ষপ্রতিষেধং ক্রয়াৎ ।

অনুবাদ । বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাক্যার্থের যে অপ্রত্যুচ্চারণ, তাহা (১৪) “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান । (কারণ) প্রত্যুচ্চারণ না করিয়া (প্রতিবাদী) কোন্ আশ্রয়বিশিষ্ট পরপক্ষ প্রতিষেধ বলিবেন ? অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর সেই বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাহার উত্তরের আশ্রয়াভাবে তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না, সুতরাং বাদীর ঐরূপ বাক্যার্থের অনুবাদ না করা তাঁহার পক্ষে অবশ্যই নিগ্রহস্থান ।

টিপ্পনী । এই সূত্রের দ্বারা “অননুভাষণ” নামক চতুর্দশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । জিগীষু বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনাদি সমাপ্ত করিলে, জিগীষু প্রতিবাদী প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিগত সেই বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবেন । প্রতিবাদীর সেই অনুবাদের নাম প্রত্যুচ্চারণ এবং উহা না করার নাম অপ্রত্যুচ্চারণ । সেই অপ্রত্যুচ্চারণই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর পক্ষে “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান । অনুভাষণের অর্থাৎ অনুবাদের অভাব অথবা অনুবাদের বিরোধী কোন ব্যাপারই অননুভাষণ । বাদী তিনবার বলিলেও যদি প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণ কেহই তাঁহার বাক্যার্থ না বুঝেন, তাহা হইলে সেখানে বাদীর পক্ষেই “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । কিন্তু এই “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে মধ্যস্থগণ কর্তৃক বাদীর বাক্যার্থ বিজ্ঞাত হওয়ায় ইহা “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন । তাই মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন, “বিজ্ঞাতস্ত পরিষদা” । প্রতিবাদী বাদীর প্রথম বচনের দ্বারা তাঁহার বাক্যার্থ না বুঝিলে, বাদী তিনবার পর্য্যন্ত বলিবেন, ইহাই জয়ন্ত ভট্ট পূর্বে সমর্থন করিয়াছেন । এ বিষয়ে মতভেদও পূর্বে বলিয়াছি । বরদরাজ এখানে বলিয়াছেন যে, তিন বারের নূন বা অধিক বার বচনের নিষেধের জন্ত মহর্ষি এখানে “ত্রিঃ” এই পদটি বলেন নাই । কিন্তু যে কয়েকবার বলিলে উহা প্রতিবাদীর উচ্চারণ বা অনুবাদের যোগ্য হয়, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত । সূত্রে “বাদিনা” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত । বরদরাজ এখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, কদাচিৎ মন্যবুদ্ধি প্রতিবাদীকে বুঝাইবার জন্ত মধ্যস্থগণও বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করেন, ইহা সূচনা করিবার জন্ত মহর্ষি সূত্রে “বাদিনা” এই পদের উল্লেখ করেন নাই । উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং কোন কার্যব্যাসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়া কথার ভঙ্গ করিলে “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয় । এ জন্ত উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশ করেন না এবং কথাভঙ্গ করেন না, তাদৃশ প্রতিবাদী কর্তৃক উচ্চারণযোগ্য পূর্বোক্তরূপ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করাই “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান । বরদরাজও উক্ত মতানুসারেই এইরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

বৌদ্ধগম্পাদার এই “অনুভাষণ”কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, প্রতিবাদীর উত্তরের শুণ দোষ দ্বারাই তাঁহার অনুচর ও মূঢ় নিৰ্ণয় করা যায়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলেই যে, তিনি সজ্ঞাতর জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কেহ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে সমর্থ না হইলেও সজ্ঞাতর বলিতে সমর্থ, ইহা দেখা যায়। ঐক্লপ স্থলে তিনি সজ্ঞাতর বলিলে কখনই নিগৃহীত হইতে পারেন না। পরন্তু বাদীর হেতুমাত্রের অনুবাদ করিয়াও প্রতিবাদী তাঁহার খণ্ডন করিতে পারেন। বাদীর সমস্ত বাক্যার্থেরই অনুবাদ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। সুতরাং গৌতমোক্ত “অনুভাষণ” নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না। তবে যে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে সজ্ঞাতর বলিলেন, তাঁহার “খলীকার” মাত্র হইবে। বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্ব অর্থাৎ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াও এবং বুঝাইবার জ্ঞান কিছু বলিয়াও বুঝাইতে না পারাকে “খলীকার” বলে। উদ্যোতকরও এখানে “খলীকার” শব্দেই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, যেমন “বাদ”বিচারে কাহারও পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই, কিন্তু খলীকার মাত্রই নিগ্রহ, তদ্রূপ পূর্বোক্তরূপ স্থলেও প্রতিবাদীর খলীকার মাত্রই হইবে। কিন্তু তিনি পরে সজ্ঞাতর বলায় তাঁহার পরাজয়রূপ নিগ্রহ হইবে না। সুতরাং প্রতিবাদীর অনুভাষণ কোন স্থলেই তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলা যায় না। উদ্যোতকর এই বৌদ্ধমতের উল্লেখপূর্বক ইহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাঁহার উত্তরের বিষয়-পরিজ্ঞানের অভাবে উত্তরই হইতে পারে না। পরপক্ষ প্রতিবেধ-রূপ যে উত্তর, তাহার বিষয়রূপ আশ্রয় না বুঝিলে উত্তর বলাই যায় না। নির্বিষয় নিরাশ্রয় কোন উত্তর হইতে পারে না। যদি বল, প্রতিবাদী সেই উত্তরের বিষয় বুঝিয়াই উত্তর বলেন। কিন্তু তাহা হইলে তিনি তাহা উচ্চারণ করিবেন না কেন? তিনি উত্তরের বিষয়কে আশ্রয় করিয়া উত্তর বলেন, কিন্তু সেই বিষয়ের উচ্চারণ করেন না, ইহা ব্যাহত, অসম্ভব। কারণ, যাহা দৃশ্যীয়, তাহাই দৃশ্যের বিষয়। সুতরাং সেই দৃশ্যীয় বিষয়টী না বলিলে তাহার দৃশ্য বলাই যায় না। যদি বল, বাদীর সমস্ত বাক্য বা বাক্যার্থই প্রতিবাদীর দৃশ্যীয় নহে। কারণ, বাদীর যে কোন অবয়বের দৃশ্যের দ্বারাই যখন তাঁহার সাধন বা হেতু দৃষিত হইয়া যায়, তখন তাহার অল্প দোষ বলা অনাবশ্যক। অতএব প্রতিবাদীর যাহা দৃশ্যীয় বিষয়, তিনি কেবল তাহারই অনুবাদ করিবেন। নচেৎ তাঁহার অদৃশ্য বিষয়েরও অনুবাদ করিলে, দেখানে তাহার বিপরীতভাবে অনুভাষণও অপর নিগ্রহস্থান হইয়া পড়ে। উদ্যোতকর এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই পরে বলিয়াছেন যে, পূর্বে বাদীর সমস্ত বাক্যের উচ্চারণ কর্তব্য, পরে উত্তর বক্তব্য, ইহা প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই। কিন্তু প্রতিবাদীর যে কোনরূপে উত্তর যে অবশ্য বক্তব্য, ইহা ত সকলেরই স্বীকার্য। কিন্তু সেই উত্তরের বাহা আশ্রয় বা বিষয় অর্থাৎ প্রতিবাদীর যাহা দৃশ্যীয়, তাহার অনুবাদ না করিলে আশ্রয়ের অভাবে তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না। অতএব সেই উত্তর বলিবার জ্ঞান বাদীর কথিত সেই বিষয়ের অনুবাদ তাঁহার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যদি তাহারও অনুবাদ না করেন, তাহা চাইলে

ঐহার উত্তর বলাই সম্ভব না হওয়ায় সেইরূপ স্থলে ঐহার “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান অবশ্য স্বীকার্য। কল কথা, প্রতিবাদীর দুষণীয় বিষয়মাত্রের অনুবাদ না করাই “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান, সমস্ত বাক্যার্থের অনুবাদ না করা ঐ নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই উদ্যোক্তকরের শেষ কথার তাৎপর্য। বাচস্পতি মিশ্রও শেষে ঐ তাৎপর্যই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। অপর ভট্টও ইহাই বলিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এই “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থানকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—প্রতিবাদী (১) “যং”, “তং” ইত্যাদি সর্বনাম শব্দের দ্বারা ঐহার দুষণীয় বিষয়ের অনুবাদ করিলে অথবা (২) সেই দুষণীয় বিষয়ের আংশিক অনুবাদ করিলে, (৩) অথবা বিপরীত ভাবে অনুবাদ করিলে অথবা (৪) কেবল দুষণমাত্র বলিলে অথবা (৫) বুঝিয়াও সভাকোভাদিবশতঃ স্তম্ভিত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিলে “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। অন্তান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥১৬॥

সূত্র । অবিজ্ঞাতজ্ঞানং ॥১৭॥৫২১॥

অনুবাদ । এবং অবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে পূর্বসূত্রোক্ত বাদিবাক্যার্থের বিজ্ঞানের অভাব (১৫) “অজ্ঞান” অর্থাৎ “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান ।

ভাষ্য । বিজ্ঞাতশ্চ পরিষদা বাদিনা ত্রিরভিহিতশ্চ যদবিজ্ঞাতং, তদজ্ঞানং নাম নিগ্রহস্থানমিতি । অয়ং খল্ববিজ্ঞায় কশ্চ প্রতিষেধং ক্রয়াদিতি ।

অনুবাদ । বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাদিবাক্যার্থের যে “অবিজ্ঞাত” অর্থাৎ উক্তরূপ বাদিবাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা “অজ্ঞান” অর্থাৎ অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান । কারণ, ইনি অর্থাৎ প্রতিবাদী বিশেষরূপে না বুঝিয়া কাহার প্রতিষেধ (উত্তর) বলিবেন ?

টিপ্পন্য । এই সূত্রের দ্বারা “অজ্ঞান” নামক পঞ্চদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । সূত্রে ভাববাচ্য “জ্ঞ” প্রত্যয়নিপ্পন্ন “বিজ্ঞাত” শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত । তাহা হইলে “অবিজ্ঞাত” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব । ঐহাই “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান । কোন্ বিষয়ে কাহার বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব, ইহা বলা আবশ্যক । তাই মহর্ষি এই সূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন । তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত এবং পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভা কর্তৃক বিজ্ঞাত যে বাদীর বাক্যার্থ, তদ্বশে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান । পূর্বসূত্রানুসারে এখানে “বিজ্ঞাতশ্চ পরিষদা বাদিনা ত্রিরভিহিতশ্চ” এইরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় । প্রতিবাদীর পক্ষে ইহা নিগ্রহস্থান কেন হইবে ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে

বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী বিশেষরূপে বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে তিনি উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি নিরুত্তর হইয়া অবশ্য নিগৃহীত হইবেন। বাদীর কথিত বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞানই জন্মে না, ইহা বলা যায় না। কিন্তু যেখানে বাদীর বাক্যার্থের অন্তর্গত কোন পদার্থ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান জন্মিলেও সম্পূর্ণরূপে সেই বাক্যার্থের বোধ না হওয়ায় তিনি বাদীর পক্ষ বুঝিতে পারেন না এবং তজ্জন্ত উহার প্রতিষেধ করা সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই তাঁহার “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হয়। তাই মহর্ষিও স্থলে “অজ্ঞাতং” না বলিয়া “অবিজ্ঞাতং” বলিয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া “কি বলিতেছ, বুঝাই যায় না” ইত্যাদি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে তদ্বারা তাঁহার ঐ “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান বুঝিতে পারা যায়। পূর্বসূত্রোক্ত “অননুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানপ্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না। সুতরাং তিনি সেখানে বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও তাঁহার দুষ্টীয় পদার্থের অনুবাদ করেন না, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং তাহা এই “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন। আর যদি ঐরূপ স্থলেও তিনি নিজের অজ্ঞান-প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, অথবা অত্র কোন হেতুর দ্বারা তাঁহার বাদীর বাক্যার্থবিষয়ে অজ্ঞান বুঝা যায়, তাহা হইলে সেখানে “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থানই হইবে। উদ্যোতকর ইহাকে অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট ইহাকে স্বরূপতঃই অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। মহর্ষির পূর্বোক্ত “অপ্রতিপত্তি” শব্দের ব্যাখ্যাভেদ পূর্বেরই বলিয়াছি ৷১৭৷

সূত্র। উত্তরস্থা প্রতিপত্তির প্রতিভা ॥১৮॥৫২২॥

অনুবাদ। উত্তরের অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতিবাদীর উত্তরকালে উত্তরের অস্বীকৃতি বা অজ্ঞান (১৬) “অপ্রতিভা” অর্থাৎ “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। পরপক্ষ-প্রতিষেধ উত্তরং, তদ্যদা ন প্রতিপদ্যতে তদা নিগৃ-
হীতো ভবতি।

অনুবাদ। পরপক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের খণ্ডন উত্তর। যদি (প্রতিবাদী) তাহা না বুঝেন, অর্থাৎ উত্তরকালে তাহার স্বীকৃতি বা বোধ না হয়, তাহা হইলে নিগৃহীত হন।

টীকণী। এই স্থত্রের দ্বারা “অপ্রতিভা” নামক ষোড়শ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। উত্তরকালে উত্তরের স্বীকৃতি না হওয়াই “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিলেন এবং তাহার অনুবাদও করিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার উত্তরের স্বীকৃতি হইল না, তাই তিনি উত্তর বলিতে পারিলেন না, সেই স্থলে তাঁহার পক্ষে “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত “অজ্ঞান” ও “অননুভাষণ” হইতে এই “অপ্রতিভা” ভিন্ন প্রকার নিগ্রহস্থান। বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে “অজ্ঞান” ও

“অপ্রতিভা”র কোন ভেদ নাই এবং পূর্বোক্ত “অনুভাষণ”ও অপ্রতিভাবিশেষই। কারণ, “অনুভাষণ” স্থলেও প্রতিবাদী বস্তুতঃ অপ্রতিভার দ্বারাই নিগৃহীত হন। ‘শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথারও উল্লেখ করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের শক্তি বিচ্ছিন্ন। কোন পুরুষ তাঁহার দ্ব্য ও দুষণ বুঝিয়াও তাহার অনুভাষণ করিতে পারেন না। কারণ, বহু বাক্যপ্রয়োগে তাঁহার শক্তি নাই। সুতরাং সেখানে অপ্রতিভা না থাকিলেও যখন অনুভাষণ সম্ভব হয়, তখন “অনুভাষণ”কে অপ্রতিভাবিশেষই বলা যায় না, উহা পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য। এইরূপ কোন পুরুষ তাঁহার দ্ব্য বিষয় বুঝিলেন এবং তাহার অনুভাষণও করিলেন, কিন্তু তাঁহার দুষণের ক্ষুণ্ণি না হওয়ায় তিনি উহা খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাও দেখা যায়। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি “অপ্রতিভা”র দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় উহাই নিগ্রহস্থান হইবে। আর কোন স্থলে কোন পুরুষ মন্দবুদ্ধিবশতঃ তাঁহার দ্ব্য অর্থাৎ খণ্ডনীয় বাদীর বাক্যার্থ বা হেতু বুঝিতেই পারেন না, ইহাও দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে তিনি তদ্বিষয়ে “অজ্ঞান” দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় “অজ্ঞান”ই নিগ্রহস্থান হইবে। ঐরূপ স্থলে তিনি অজ্ঞানবশতঃ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে না পারিলেও বাদীর উচ্চারিত বাক্যমাত্রের উচ্চারণ করিতেও পারেন। সুতরাং সেখানে সর্বথা অনুভাষণ বলাও যায় না। তবে অজ্ঞান স্থলে অপ্রতিভাও অবশ্য থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অজ্ঞান ও অপ্রতিভার স্বরূপভেদ আছে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহা উক্তরের বিষয় অর্থাৎ বাদীর বাক্যার্থরূপ দ্ব্য পদার্থ, তাহার অজ্ঞানই “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান এবং সেট দ্ব্য বিষয় বুঝিয়াও তাহার অনুবাদ না করা “অনুভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান এবং তাহার অনুবাদ করিয়াও উক্তরের অজ্ঞান বা অক্ষুণ্ণিই “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান। ফলকথা, উক্তরের বিষয়-বিষয়ে অজ্ঞান এবং উক্তর-বিষয়ে অজ্ঞান; এইরূপে যথাক্রমে বিষয়ভেদে “অজ্ঞান” ও “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থানের স্বরূপভেদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার অসংকীর্ণ উদাহরণস্থলও আছে। কোন স্থলে পূর্বোক্ত “অজ্ঞান”, “অপ্রতিভা” ও “অনুভাষণের” সাঙ্কর্য্য হইলে বাদী যাহা নিশ্চয় করিতে পারেন, তাহারই উদ্ভাবন করিবেন।

প্রতিবাদীর অপ্রতিভা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়? ইহা বুঝাইতে উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় তাঁহার উক্তরের বোধ হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া এবং তাহার অনুবাদ করিয়া উক্তর করিবার সময়ে নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা ঐ ভাবে অত্র কাহারও বার্তার অবতারণা প্রভৃতি করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার যে উক্তরের ক্ষুণ্ণি হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উক্তরের ক্ষুণ্ণি হইলে তিনি কখনই উক্তর না বলিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন না। ভূষণ প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়া-ছিলেন যে, অপ্রতিভাবশতঃ প্রতিবাদী শ্লোক পাঠ বা অন্য কোন কথা বলিলে সেখানে ত “অর্থান্তর” বা “অপার্থক্য” প্রভৃতি কোন নিগ্রহস্থানই হইবে। সুতরাং “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদীর তুষ্টান্তবই নিগ্রহের হেতু। কিন্তু উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে

বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যই শ্লোক পাঠাদি করেন। “অর্থাস্তর” প্রভৃতি স্থলে বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন হয় না, তাহা উদ্দেশ্যও থাকে না। সুতরাং “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান, উহা হইতে ভিন্ন প্রকার। অপ্রতিভাবশতঃ তুষ্টীভাব হইলে সেখানে বাচস্পতি মিশ্র পরবর্তী সূত্রোক্ত “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। “অপ্রতিভা” স্থলে প্রতিবাদী একেবারে নীরব হইয়া কিরূপে সভামধ্যে বসিয়া থাকিবেন ? এতদন্তরে জয়ন্ত ভট্টও তুষ্টীভাব অস্বীকার করিয়া শ্লোক পাঠাদির কথাই বলিয়াছেন এবং তিনি প্রতিবাদীর আত্মাহ্বার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশক দুইটা শ্লোকও উদাহরণরূপে রচনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের “তায়মঞ্জরী” সর্বত্র তাঁহার একাধারে মহাকবি ও মহানৈয়ায়িকত্বের ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু বরদরাজ “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদীর তুষ্টীভাবও গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তুষ্টীভাবের তায় ভোজরাজের বার্তার অবতারণা, শ্লোকাদি পাঠ, নিজ কেশাদি রচনা, গগনস্থচন ও ভূতলবিলেখন প্রভৃতি যে কোন অগ্র কার্য্য করিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী নিগৃহীত হইবেন। রত্নিকার বিশ্বনাথও এখানে “থস্থচনের” উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরের ক্ষুণ্ণি না হইলে তখন উক্ত আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান বা আকাশের কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি কিছু বলাই গগনস্থচন বা “থস্থচন” বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং যিনি ঐ “থস্থচন” করেন, তিনি নিন্দাস্থচক “থস্থচি” নামেও কথিত হইয়াছেন। তাই বিচারস্থলে প্রতিবাদী বৈয়াকরণ প্রভৃতি “থস্থচি” হইলে সেখানে কর্মধারয় সমাসে “বৈয়াকরণ-থস্থচিঃ” ইত্যাদি প্রয়োগও হইয়াছে। বৈয়াকরণ প্রভৃতি প্রতিবাদী নিন্দিত হইলেই অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইলেই ঐরূপ কর্মধারয় সমাস হয়, নচেৎ ঐরূপ সমাস হয় না। ব্যাকরণ শাস্ত্রে এই “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থানকে গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ সমাস বিহিত হইয়াছে, ইহা সর্বসম্মত নিগ্রহস্থান। ধর্মকীর্ত্তিও “অদোষোদ্ভাবন” শব্দের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌতমোক্ত এই “অপ্রতিভা” শব্দকে গ্রহণ করিয়াই “বিচারে অপ্রতিভ হইয়াছেন” ও “অপ্রতিভ হইয়া গেলেন” ইত্যাদি কথার সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

সূত্র । কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ কথা-বিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ ॥

॥১৯॥৫২৩॥

অনুবাদ । কার্য্যব্যাসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়া অর্থাৎ কোন মিথ্যা কার্য্যের উল্লেখ করিয়া কথার ভঙ্গ (১৭) “বিক্ষেপ” অর্থাৎ “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য । যত্র কর্তব্যং ব্যাসঙ্গ্য কথাং ব্যবচ্ছিনত্তি,—ইদং মে করণীয়ং

বিদ্যতে, তন্নিম্নবসিতে পশ্চাৎ কথয়ামীতি বিক্ষেপো নাম নিগ্রহস্থানং ।
একনিগ্রহাবসানায়ং কথায়ং স্বয়মেব কথান্তরং প্রতিপদ্যত ইতি ।

অনুবাদ । যে স্থলে ইহা আমার কর্তব্য আছে, তাহা সমাপ্ত হইলেই পরে বলিব, এইরূপে কর্তব্য ব্যাসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া (প্রতিবাদী) কথা ভঙ্গ করেন, সেই স্থলে “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয় । (কারণ) কথা একনিগ্রহাবসান হইলে অর্থাৎ সেই আরক্ত কথা এক নিগ্রহের পরেই সমাপ্ত হইলে (প্রতিবাদী) স্বয়ংই অণু কথা স্বীকার করেন ।

টিপ্পনী । এই সূত্র দ্বারা “বিক্ষেপ” নামক সপ্তদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে । সূত্রে “কার্য্যবাসঙ্গঃ” এই পদে লাপ্ লাপে পঞ্চমো বিকৃতিঃ প্রয়োগ হইয়াছে । উহার মাতা “কার্য্যবাসঙ্গমুদ্ভাব্য” । তাৎপর্য্য এই যে, “জর” বা “বিতণ্ডা” নামক কথার আরম্ভ করিয়া বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি “আমার বাড়ীতে অমুক কার্য্য আছে, এখনই আমার যাওয়া অত্যাবশ্যক, সেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আসিাই পরে বলিব”, এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া ঐ আরক্ত কথার ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয় । কেন উহা নিগ্রহস্থান ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী অথবা প্রতিবাদীর এক নিগ্রহের পরেই সেই আরক্ত কথার সমাপ্তি হওয়ার তাঁহার নিজেই অণু কথা স্বীকার করেন । অর্থাৎ তখন কিছু না বলিয়া, পরে আবার বিচার করিব, ইহা বলিয়া, নিজেই সেই আরক্ত বিচারে নিজের নিগ্রহ স্বীকারই করার উহা অবশ্য তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান এবং উহা অবশ্য উদ্ভাব্য । নচেৎ অপরের অহঙ্কার খণ্ডন হয় না । অহঙ্কারী জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে অপরের অহঙ্কার খণ্ডনই নিগ্রহ এবং উহাই সেখানে অপরের পরাজয় নামে কথিত হয় । কোন কার্য্যবাসঙ্গের গ্রায়ে “প্রতিষ্ঠায় পীড়াবশতঃ আমার কর্তব্য রুদ্ধ হইতেছে, আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না” ইত্যাদি প্রকার কোন মিথ্যা কথা বলিয়া কথাভঙ্গ করিলে সেখানেও উক্ত “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । উদ্যোতকর প্রভৃতিও ইহার উদাহরণরূপে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন । অবশ্য উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ঐরূপ কোন কথা যথার্থই হইলে অথবা উৎকট শিরঃপীড়া দি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ কথার বিচ্ছেদ হইলে, সেখানে এই বিক্ষেপ নামক নিগ্রহস্থান হইবে না । কারণ, সেখানে বাদী বা প্রতিবাদীর কোন দোষ না থাকায় নিগ্রহ হইতে পারে না । কিন্তু বাদী বা প্রতিবাদী নিজের অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া “কথা”র ভঙ্গ করিলে, সেখানেই তাঁহার নিগ্রহ হইবে । সুতরাং সেইরূপ স্থলেই তাঁহার পক্ষে “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয় । কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ঐরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার পক্ষে “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে এবং উত্তর বলিতে না পারায় “অপ্রতিভা”র দ্বারাও তিনি নিগৃহীত হইবেন, “বিক্ষেপ” নামক পৃথক নিগ্রহস্থান স্বীকার করা অনাবশ্যক । এতদ্বস্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কথার আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-

বাক্য বা হেতুবাক্য বলিয়াই পরে নিজের সাধ্যসিদ্ধির অভিপ্রায় রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই স্থলেই “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু এই “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান স্থল বাদী বা প্রতিবাদী কথার আরম্ভকালেই পূর্বোক্তরূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া সভা হইতে পলায়ন করেন। সুতরাং “অর্থাস্তর” ও “বিক্ষেপ” তুল্য নহে এবং পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পূর্বপক্ষের অবগাদি করিয়া, পরে উত্তরের কালে উত্তরের ক্ষুণ্ণি না হওয়ায় পরাজিত হন। কিন্তু এই “বিক্ষেপ” স্থলে পূর্বপক্ষের স্থাপনাদির পূর্বেই তিনি পলায়ন করায় পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” হইতেও ইহার মহান বিশেষ আছে।

জয়ন্ত ভট্ট এইরূপ বলিলেও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কিন্তু বুঝা যায় যে, জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর কথারস্তর পরে কাহারও একবার নিগ্রহ হইলে, তখন তিনি তাঁহার শেষ পরাজয় সম্ভাবনা করিয়াই উক্ত স্থলে পূর্বোক্তরূপ কোন মিথ্যা কথা বলিয়া, সেই আরম্ভ কথার ভঙ্গ করেন এবং পরে অন্য “কথা” স্বীকার করিয়া যান। বস্তুতঃ মহর্ষিও উক্তরূপ কথার বিচ্ছেদকেই “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কথার আরম্ভ না হইলে তাহার বিচ্ছেদ বলা যায় না। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কথার স্বীকার করিয়া অর্থাৎ সাধন ও দুষণের উল্লেখ করিব, ইহা স্বীকার করিয়া বাদী অথবা প্রতিবাদী যদি তাঁহার প্রতিবাদীর দৃঢ়তা অথবা মধ্যস্থ সভাগণের কঠোরত্ব বুঝিয়া অর্থাৎ ঐ সভায় ঐ বিচারে তাঁহার পরাজয়ই নিশ্চয় করিয়া সহসা কোন কার্যব্যাসঙ্গের উদ্ভাবনপূর্বক সেই পূর্বস্বীকৃত কথার ব্যবচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, অপ্রতিভা-বশতঃ তুষাভাবও ইহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, এই স্থলে “কার্যব্যাসঙ্গাৎ” পদের দ্বারা যে কোনরূপে স্বীকৃত কথার বিচ্ছেদ মাত্রই বিবক্ষিত। সুতরাং উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কোন কার্যব্যাসঙ্গের উদ্ভাবন না করিয়া অপ্রতিভাবশতঃ একেবারে নীরব হইলেও তাঁহার “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু “অপ্রতিভা” নামক পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থান এইরূপ নহে। কারণ, সেই স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া শ্লোক পাঠাদি করেন। কিন্তু “বিক্ষেপ” স্থলে কেহ ঐরূপ করেন না। এবং “অর্থাস্তর” স্থলে প্রকৃত বিষয়-সাধনের অভিপ্রায় রাখিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, সেখানে কেহ কথা-ভঙ্গ করেন না। সুতরাং এই “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান “অর্থাস্তর” হইতে ভিন্ন। এবং ইহা “নিরর্থক” ও “অপার্থক্য”র লক্ষণাক্রান্ত হয় না এবং হেত্বাভাসের লক্ষণাক্রান্তও হয় না। সুতরাং “বিক্ষেপ” নামক পৃথক নিগ্রহস্থানই সিদ্ধ হয়। ধর্মকীর্তি এই “বিক্ষেপ”কে হেত্বাভাসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, কীর্তি যে ইহাকে হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতীব স্তুভাষিত। কোথায় হেত্বাভাস, কোথায় কার্যব্যাসঙ্গ, এই ধারণাই রমণীয়। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, কথাবিচ্ছেদরূপ “বিক্ষেপ” উক্ত স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে হেতুর কোন ধর্মও নাই। পরন্তু কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি নির্দোষ হেতুর প্রয়োগ করিয়াও পরে উহার

সমর্থনে অন্তর্ভুক্ত হইয়া সভা হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে সেখানে তিনি কি নিগৃহীত হইবেন না ? কেন নিগৃহীত হইবেন ? সেখানে ত তিনি কোন হেতুভাষা প্রয়োগ করেন নাই । অতএব হেতুভাষা হইতে ভিন্ন “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান অবশ্যই স্বীকার্য্য । উক্তরূপ স্থলে তিনি উহার দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন । বাচস্পতি মিশ্রের এই কথার দ্বারাও বাদী ও প্রতিবাদীর কথারস্তুর পরে কেহ নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়া চলিয়া গেলেও সেখানে তাঁহার “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহা বুঝা যায় । বস্তুতঃ কথারস্তুর পরে যে কোন সময়ে উক্তরূপে কথার বিচ্ছেদ হইলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হয় । তাই বরদরাজও বলিয়াছেন যে, “কথা”র আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্তই এই নিগ্রহস্থানের অবসর । অস্তুত্বের দ্বারা পূর্বপক্ষ শ্রবণাদির পূর্বেই প্রতিবাদীর পলায়ন স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হয়, ইহা আর কেহই বলেন নাই ॥১৯॥

উত্তরবিরোধিনিগ্রহস্থানচতুষ্ক প্রকরণ সমাপ্ত ॥১॥

সূত্র । স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষ-
প্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥২০॥৫২৪॥

অনুবাদ । নিজপক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে দোষের প্রসঙ্গন (১৮) “মতানুজ্ঞা” অর্থাৎ “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান ।

ভাষ্য । যঃ পরেণ চোদিতং দোষং স্বপক্ষেহভ্যুপগম্যানুদ্ধৃত্য বদতি—
ভবৎপক্ষেহপি সমানো দোষ ইতি, স স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে
দোষং প্রসঙ্গয়ন্ পরমতমনুজানাতিতি মতানুজ্ঞা নাম নিগ্রহস্থানমাপদ্যত
ইতি ।

অনুবাদ । যিনি নিজপক্ষে পরকর্তৃক আপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া (অর্থাৎ)
উদ্ধার না করিয়া বলেন, আপনার পক্ষেও তুল্য দোষ, তিনি নিজপক্ষে দোষের
স্বীকারপ্রযুক্ত পরপক্ষে দোষ প্রসঙ্গন করতঃ পরের মত স্বীকার করেন, এ জ্ঞাত
“মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন ।

টীপনী । এই সূত্র দ্বারা “মতানুজ্ঞা” নামক অষ্টাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে ।
নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের খণ্ডন না করিয়া, অপরের পক্ষেও সেই দোষ তুল্য বলিয়া
আপত্তি প্রকাশ করিলে, অপরের মতের অনুজ্ঞা অর্থাৎ স্বীকারই করা হয় । সুতরাং ঐরূপ স্থলে
“মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান হয় । কারণ, নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের উদ্ধার বা খণ্ডন
না করিলে, সেখানে সেই দোষ স্বীকৃতই হয় এবং তদ্বারা তিনি যে প্রকৃত উত্তর জানেন না,
ইহাও প্রতিপন্ন হয় । প্রথম আদিকে “জাতি” নিরূপণের পরে “কথাভাষা”র নিরূপণে মহর্ষি এই

“মতামুজ্জা”র উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাকার সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি এখানে ইহার একটা সুবোধ উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী বলিলেন, “ভবাংশ্চোরঃ পুরুষত্বাৎ”। তখন প্রতিবাদী বলিলেন,—“ভবানপি চোরঃ”। অর্থাৎ পুরুষ হইলেই যদি চোর হয়, তাহা হইলে আপনিও চোর। কারণ, আপনিও ত পুরুষ। বস্তুতঃ পুরুষত্বাই চোর নহে। সুতরাং পুরুষত্বরূপ হেতু চোরত্বের ব্যভিচারী। প্রতিবাদী ঐ ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করিলেই তাঁহাতে বাদীর আপাদিত চোরত্বদোষের খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, বাদীর কথিত পুরুষত্ব হেতুর দ্বারা যে চোরত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা বাদীও স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন না করিয়া, প্রতিকূল ভাবে “আপনিও চোর” এই কথার দ্বারা বাদীর পক্ষেও ঐ দোষ তুল্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ পক্ষে চোরত্ব দোষ, যাহা বাদীর মত, তাহার অনুজ্জা অর্গাৎ স্বীকারই করায় উক্ত স্থলে তাঁহার “মতামুজ্জা” নামক নিগ্রহস্থান হয়।

কিন্তু অত্র সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথাযুসারে তাঁহাতে চোরত্বের প্রদঙ্গ মাত্র অর্থাৎ আপত্তি মাত্রই করেন, উহার দ্বারা তাঁহার নিজের চোরত্ব বস্তুতঃ স্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ তখন তিনি উক্তরূপ আপত্তি সমর্থনের জন্ত নিজের চোরত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও পরে তিনি উহা স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ ভাবে আপত্তি প্রকাশ দ্বারা বাদীর হেতুতে ব্যভিচারের উদ্ভাবনই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং উক্ত স্থলে তিনি কেন নিগৃহীত হইবেন? উক্ত স্থলে বাদীই ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় নিগৃহীত হইবেন। উদ্যোতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি উক্ত বুদ্ধ মতের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদীর হেতু যে ব্যভিচারী, ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য উত্তর। প্রতিবাদী উহা বলিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত দোষের খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু তিনি যে উত্তর বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত উত্তর নহে, উহা উত্তরাভাস। উত্তর জানিলে কেহ উত্তরাভাস বলে না। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তর না বলায় তিনি যে উহা জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তিনি প্রকৃত উত্তর বলিতে পারিলে তাহা স্পষ্ট বথায় বলিবেন না কেন? অতএব উক্ত স্থলে তাঁহার ঐরূপ মতামুজ্জার দ্বারা উদ্ভাব্যমান তাঁহার উত্তর বিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহাই “মতামুজ্জা” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি উহার দ্বারা অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী ঐ ব্যভিচার দোষ বা হেতুভাসের উদ্ভাবন না করায় বাদী ঐ হেতুভাসের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না।

শৈবাচার্য্য ভাস্করজ্ঞ “শ্রীমসার” গ্রন্থে^১ গোতমের এই মত উদ্ধৃত করিয়াই এবং পূর্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই এই “মতামুজ্জা”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি নিজপক্ষে কিছুমাত্র

১। “স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতামুজ্জা”। যঃ স্বপক্ষে মনোগপি দোষঃ ন পরিহরতি, কেবলং পরপক্ষে দোষং প্রসঙ্গয়তি, ভবাংশ্চোর ইত্যুক্তে ভবানপি চোর ইতি তন্তেষং নিগ্রহস্থানঃ।—“শ্রীমসার”, অনুমান গরিচ্ছেদ।

দোষোদ্ধার করেন না, কেবল পরপক্ষে দোষই প্রসঙ্গন করেন, তাঁহার পক্ষে এই (মতানুজ্ঞা) নিগ্রহস্থান। “তাকিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ পরে ইহা ভূষণকারের (“ত্ৰায়সারে”র প্রধান টীকাকার ভূষণর) ব্যাখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াও ঐ ব্যাখ্যার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। উক্ত ব্যাখ্যায় বাদীর আপাদিত দোষের তুল্যদোষ প্রসঙ্গনের কোন কথা নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। কিন্তু প্রতিবাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর আপাদিত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদীর পক্ষেও ততুল্য দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেই তাঁহার “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহর্ষি গোতমের মত বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, তিনি পূৰ্ব্ব আঙ্কিকের শেষে কথাতাস নিরূপণ করিতে ৪২ সূত্রে বলিয়াছেন—“সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা” (৩৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাস্কর্যজ মহর্ষি গোতমের মতানুসারে নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিতেও অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন ॥২০॥

সূত্র । নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তস্থানিগ্রহঃ পর্য্যনু-

যোজ্যোপেক্ষণং ॥২১॥৫২৫॥

অনুবাদ । নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তের অনিগ্রহ অর্থাৎ যে বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হওয়ায় পর্য্যনুযোজ্য, তাঁহার অনিগ্রহ বা উপেক্ষণ অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে প্রতিবাদীর সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করা (১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ অর্থাৎ “পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য । পর্য্যনুযোজ্যো নাম নিগ্রহস্থানোপপত্ত্যা চোদনীয়ঃ । তস্মো-
পেক্ষণং নিগ্রহস্থানং প্রাপ্তোহসীত্যননুযোগঃ । এতচ্চ কস্মি পরাজয়
ইত্যনুযুক্তয়া পরিষদা বচনীয়ং । ন খলু নিগ্রহং প্রাপ্তঃ স্বকৌপীনং
বিরুণুয়াদিতি ।

অনুবাদ । “পর্য্যনুযোজ্য” বলিতে নিগ্রহস্থানের উপপত্তির দ্বারা “চোদনীয়” অর্থাৎ বচনীয় পুরুষ। তাহার উপেক্ষণ বলিতে “নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে” এই-
রূপ অনুযোগ না করা [অর্থাৎ যে বাদী অথবা প্রতিবাদীর পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতিবাদী তখনই প্রমাণ দ্বারা উহার উপপত্তি বা সিদ্ধি করিয়া অবশ্য বলিবেন যে, তোমার পক্ষে এই নিগ্রহস্থান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—সেই নিগ্রহস্থানপ্রাপ্ত বাদী বা প্রতিবাদীর নাম পর্য্যনুযোজ্য। তাহাকে উপেক্ষা করা অর্থাৎ তাঁহার সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করাই “পর্য্যনু-
যোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান] ইহা কিন্তু “কাহার পরাজয় হইল ?” এইরূপে

জিজ্ঞাসিত সভ্যগণ কর্তৃক বক্তব্য অর্থাৎ উদ্ভাব্য। কারণ, নিগ্রহপ্রাপ্ত পুরুষ নিজের গুহ্য প্রকাশ করিতে পারেন না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা “পর্যায়বোজ্যোপেক্ষণ” নামক উনবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন, নিগ্রহস্থানপ্রাপ্ত বাদী অথবা প্রতিবাদীর অনিগ্রহ সে কিরূপ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার “পর্যায়বোজ্য” শব্দ ও “উপেক্ষণ” শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিয়া তদ্ব্যবহারি উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী অথবা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রতিবাদী যদি অজ্ঞানবশতঃ যথাকালে সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করেন, তাহা হইলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাঁহার পক্ষে উহা “পর্যায়বোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান। যেমন কোন বাদী প্রথমে কোন হেতুভাস বা দৃষ্ট হেতুর দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেও প্রতিবাদী যদি যথাকালে সেই হেতুভাসের উদ্ভাবন করিয়া, আপনাতঃ পক্ষে হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থান উপস্থিত, সূত্রাতঃ আপনি নিগৃহীত হইয়াছেন, এই কথা না বলেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি নিগৃহীত হইবেন। কারণ, তিনি তাঁহার পর্যায়বোজ্য বাদীকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অবশ্যবক্তব্য পূর্বোক্ত কথা না বলিয়া অজ্ঞান বক্তব্য বলিয়া তদ্বারা বাদীর সেই হেতুভাসরূপ নিগ্রহস্থান বিষয়ে তাঁহার অপ্রতিপত্তি বা অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন হয় যে, পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন কে? উদ্ভাবিত না হইলে ত উহা নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিবাদীর জ্ঞান বাদীও ত উহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, উহা তাঁহার পক্ষে গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয়। আমি নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাহার উদ্ভাবন করিয়া আমাকে নিগৃহীত বলেন নাই, অতএব তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, এই কথা বাদী কখনই বলিতে পারেন না। কারণ, তাহা বলিলে তাঁহার নিজের নিগ্রহ স্বীকৃতই হয়। ভাষ্যকার উক্ত যুক্তি অনুসারেই পরে বলিয়াছেন যে, পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যস্থ সভ্যগণের নিকটে এই বিচারে কাহার পরাজয় হইয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তখন তাঁহারাই এই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। অর্থাৎ তখন তাঁহারা অপক্ষপাতে ঐকমত্যে বলিয়া দিবেন যে, এই বাদী এই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী যথাসময়ে তাহা বুঝিতে না পারায় তাহা বলেন নাই। সূত্রাতঃ ইহারই পরাজয় হইয়াছে। ইহার পক্ষে উহা “পর্যায়বোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, স্বয়ং সভাপতি অথবা বাদী ও প্রতিবাদী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত মধ্যস্থ সভ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে, তখন সেই প্রতিবাদীই উহার দ্বারা নিগৃহীত হইবেন। আর তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ “বাদ” নামক কথায় সভ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে সেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই নিগ্রহ হওয়ায় সেই সভ্যগণেরই জয় হইবে। বস্তুতঃ বাদ-বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর অহংকার না থাকায় তাঁহাদিগের পরাজয়রূপ নিগ্রহ হইতে পারে না। সভ্যগণের জয়ও সেখানে প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাচস্পতি মিশ্রেরও ঐরূপই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। পরন্তু “বাদ”বিচারে বাদী স্বয়ং উক্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও দোষ নাই।

কারণ, সেখানে তত্ত্ব নির্ণয়ই উদ্দেশ্য । সুতরাং তাহাতে কাহারই কোন দোষ গোপন করা উচিত নহে । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ কথা বলিয়াছেন । ভাষ্যে “কৌপীন” শব্দের অর্থ গুহ্য । অমর সিংহ নানার্থবর্ণে লিখিয়াছেন,—“অকার্য্যগুহ্যে কৌপীনে” ।

কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকেও নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই । তাঁহাদিগের কথা এই যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাঁহার পর্যাযুযোজ্য বাদকে নিগৃহীত না বলিলেও তিনি যখন অত্র উত্তর বলেন, তখন তাঁহার ঐ উপেক্ষা কখনও তাঁহার নিগ্রহের হেতু হইতে পারে না । উদ্যোতকর এই মতের উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর যাহা অবশ্যবক্তব্য উত্তর, যাহা বলিলেই তখনই বাদী নিগৃহীত হন, তাহা তিনি কেন বলেন না ? অতএব তিনি যে, অজ্ঞতাবশতঃই তাহা বলেন না, ইহা স্বীকার্য্য । কারণ, নিজের অবশ্যবক্তব্য সঙ্কল্পের স্ফূর্তি হইলে যিনি বিচারক, যিনি জিগীষু প্রতিবাদী, তিনি কখনই অত্র উত্তর বলেন না । সঙ্কল্প বলিতে পারিলে অসঙ্কল্প বলাও কোন স্থানেই কাহারই উচিত নহে । অতএব যিনি অবশ্যবক্তব্য সঙ্কল্প বলেন ন', তিনি যে উহা জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি অবশ্যই নিগৃহীত হইবেন । বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কোন বাদীর অনেক নিগ্রহস্থান উপস্থিত হয়, সেখানে প্রতিবাদী উহার মধ্যে যে কোন একটীর উদ্ভাবন করিলে তাঁহার এই নিগ্রহস্থান হইবে না । কিন্তু উদ্যোতকরের উক্ত যুক্তি অনুসারে উহা তাঁহার মত বলিয়া মনে হয় না । বাচস্পতি মিশ্রও ঐ কথা কিছুই বলেন নাই । ধর্ম্মকোষ্ঠি প্রভৃতি পূর্বোক্ত স্থলেও প্রতিবাদীর পক্ষে “অপ্রতিভা”ই বলিয়াছেন । কারণ, উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তরের স্ফূর্তি না হওয়াতেই প্রতিবাদী তাহা বলেন না । সুতরাং তিনি “অপ্রতিভার” দ্বারাই পরাজিত হইবেন, ইহা বলা যায় । উদ্যোতকর এই কথার কোন উল্লেখ করেন নাই । পরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট ঐ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যে স্থলে বাদী নির্দোষ হেতুর দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানেই পরে প্রতিবাদীর নিজ বক্তব্য উত্তরের স্ফূর্তি না হইলে তাঁহার পক্ষে “অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান হয় । কিন্তু যে স্থলে বাদী প্রথমে হেত্বাভাসের দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে তিনি প্রথমেই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদীর পর্যাযুযোজ্য । সুতরাং তখন প্রতিবাদী তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার সেই উপেক্ষার দ্বারা উদ্ভাব্যমান তাঁহার সেই উত্তরবিষয়ক অজ্ঞানই “পর্যাযুযোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিশেষ থাকাতেই উহা পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । উদ্যোতকর প্রভৃতির মতে “অপ্রতিভা”স্থলে প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি । পবন্ত এই “পর্যাযুযোজ্যোপেক্ষণ” মধ্যস্থ-গণেরই উদ্ভাব্য বলিয়াও অত্র সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে ইহার ভেদ পরিস্ফুটই আছে ॥২১॥

সূত্র । অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগো নিরনু-
যোজ্যানুযোগঃ ॥২২॥৫২৬॥

অনুবাদ । অনিগ্রহ স্থানে অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাতে নিগ্রহ-

স্থানের অভিযোগ অর্থাৎ তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া তাহার উদ্ভাবন (২০) নিরনু-
যোজ্যানুযোগ অর্থাৎ “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান ।

ভাষ্য । নিগ্রহস্থানলক্ষণস্য মিথ্যাধ্যবসায়াদনিগ্রহস্থানে নিগৃহীতোহ-
সীতি পরং ক্রবন্ নিরনুযোজ্যানুযোগান্নিগৃহীতো বেদিতব্য ইতি ।

অনুবাদ । নিগ্রহস্থানের লক্ষণের মিথ্যা অধ্যবসায় অর্থাৎ আরোপবশতঃ
নিগ্রহস্থান না হইলেও নিগৃহীত হইয়াছে, ইহা বলিয়া (বাদী বা প্রতিবাদী) নিরনু-
যোজ্যের অনুযোগবশতঃ নিগৃহীত জানিবে ।

টিপ্পনী । এই সূত্র দ্বারা “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক বিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত
হইয়াছে । যে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষের বস্তুতঃ কোন নিগ্রহস্থান হয় নাই অথবা সেই নিগ্রহ-
স্থান হয় নাই, তাঁহাকে ‘তুমি এই নিগ্রহস্থানের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছ’, ইহা বলা উচিত নহে । কারণ,
তিনি সেখানে নিরনুযোজ্য । তাঁহাকে অনুযোগ করা অর্থাৎ ঐরূপ বলা নিরনুযোজ্য পুরুষের অনু-
যোগ । তাই উহা “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামে নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে । যাহাতে বস্তুতঃ
নিগ্রহস্থানের লক্ষণ নাই, তাহাতে ঐ লক্ষণের আরোপ করিয়া, নিগ্রহস্থান বলিয়া উদ্ভাবন করিলে
এবং কোন বাদী অত্র নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও যে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে সেই
নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও তাঁহার পক্ষে এই “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হয় ।
অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত । তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার
সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যথাসময়ে যথার্থ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন হিল যে নিগ্রহস্থানের
উদ্ভাবন, তাহাই “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থান । ইহা যে পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” হইতে
ভিন্ন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থানের লক্ষণের আরোপবশতঃ এই
নিগ্রহস্থান হয় । পরবর্ত্তী বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহাকেও “অপ্রতিভা”ই বলিয়াছেন । কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র
ভাষ্যকারোক্ত বৃত্তি সুবাক্ত করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্তরের অপ্রতিপত্তি
বা অজ্ঞানই “অপ্রতিভা” । কিন্তু যাহা উক্তর নহে, তাহাকে উক্তর বলিয়া যে বিপ্রতিপত্তি বা
ভ্রম, তৎপ্রযুক্ত এই নিগ্রহস্থান হয় । সূত্রায় পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” হইতে ইহার মহান
বিশেষ আছে । পরন্তু ইহা হেতুভাস হইতেও ভিন্ন । কারণ, হেতুভাস বাদীর পক্ষেই নিগ্রহস্থান
হয় । কিন্তু ইহা প্রতিবাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হয় । বাচস্পতি মিশ্র পরে এখানে ধর্মকোষ্ঠির
“অসাধনান্ধবচনং” ইত্যাদি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াও ধর্মকোষ্ঠির সম্প্রদায় যে, এই নিগ্রহস্থান স্বীকার
করিতে বাধ্য, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন ।

জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, “নঞ” শব্দের যে “পর্যাদাস” ও
“প্রসজ্যপ্রতিষেধ” নামে অর্থভেদ আছে, উহার ভেদ না বুঝিয়াই এই নিগ্রহস্থানকে “অপ্রতিভা”
বলা হইয়াছে । যে স্থলে ক্রিয়ার সহিতই নঞের সম্বন্ধ, সেখানে উহার ক্রিয়ান্বয়ী অত্যস্তাভাবরূপ
অর্থকে “প্রসজ্যপ্রতিষেধ” বলে । পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” শব্দের অন্তর্গত নঞের অর্থ প্রসজ্য-

প্ৰতিষেধ। তাহা হইলে উহাৰ দ্বাৰা বুঝা বস্তু, প্ৰতিজ্ঞাৰ অত্যন্ত ভাব। অৰ্থাৎ সত্যদোষের অক্ষুৰ্ণতা বা অজ্ঞানই “অপ্ৰতিভা”, কিন্তু অসত্যদোষের উদ্ভবনই “নিরনুযোজ্যানুযোগ”। সুতরাং যাহা দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া যে জ্ঞান, যাহা বিপ্ৰতিপত্তি অৰ্থাৎ উক্তজন্য ভ্রমজ্ঞান, তাহাই এই নিগ্রহস্থানের মূল, এ জ্ঞান ইহা বিপ্ৰতিপত্তিনিগ্রহস্থান। কিন্তু পূৰ্বোক্ত “অপ্ৰতিভা” অপ্ৰতিপত্তিনিগ্রহস্থান। সুতরাং উক্ত উভয় নিগ্রহস্থান এক হইতেই পারে না। কারণ, সত্যদোষের অজ্ঞান এবং অসত্যদোষের ভ্রমজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞান তত্ত্ব পৰ ধৰ্ম্ম কীৰ্ত্তি যে, “অসাধনান্ধবচন” এবং “অদোষোদ্ভাবন”কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্য “নঞ” শব্দের দ্বাৰা কেবল “প্ৰবজ্ঞাপ্ৰতিষেধ” অৰ্থ গ্ৰহণ করিলে যাহা সাধনের অন্ধ, তাহার অনুক্তি এবং দোষের উদ্ভাবন না করা, এই উভয়ই নিগ্রহস্থান বলা হয়। তাহা হইলে কেবল মূৰ্খতাই নিগ্রহস্থান হয়। সৰ্বদায় নিগ্রহস্থান হেতুভাসও নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। অতএব ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তির উক্ত বাক্য নঞোপপাদান অৰ্থও গ্ৰহণ করিয়া, উহাৰ দ্বাৰা যাহা বস্তুতঃ সাধনের অন্ধ নহে, তাহার বচন এবং যাহা বস্তুতঃ দোষ নহে, তাহাকে দোষ বলিয়া উদ্ভবন, এই উভয়ও তাহার মতে নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিত হইবে। সুতরাং অসত্য দোষের উদ্ভাবন যে নিগ্রহস্থান, ইহা ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তিও স্বীকৃত বুঝা যায়। তাহা হইলে পূৰ্বোক্ত “অপ্ৰতিভা” হইতে ভিন্ন “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামে নিগ্রহস্থান তাহারও স্বীকৃত। কারণ, সত্যদোষের অজ্ঞানই “অপ্ৰতিভা”। কিন্তু অসত্য দোষের উদ্ভাবনই “নিরনুযোজ্যানুযোগ”। অবশ্য এই স্থলেও প্ৰতিবাদীর সত্যদোষের অজ্ঞানও থাকেই, কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন পদার্থ যে অসত্যদোষের উদ্ভাবন, তাহাই উক্ত স্থলে পরে প্ৰতিবাদীর নিগ্রহের হেতু হওয়ার উহাই সেখানে তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকাৰ্য্য।

এখন এখানে বুঝা আবশ্যক যে, পূৰ্বোক্ত “ছল” ও “জাতি” নামক যে বিবিধ অসহৃত্তর, তাহাও এই “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ ইহাৰই প্ৰকাৰবিশেষ। কারণ, “ছল” এবং “জাতি”ও অসত্য দোষের উদ্ভাবন। তাই বাচস্পতি মিশ্রও এখানে লিখিয়াছেন, “অনেন সৰ্ব্বা জাতয়ো নিগ্রহস্থানত্বেন সংগৃহীতা ভবন্তি”। অৰ্থাৎ পূৰ্বোক্ত “সাধৰ্ম্ম্য-সমা” প্ৰভৃতি সমস্ত জাতিও অসত্যদোষের উদ্ভাবনরূপ অসহৃত্তর বলিয়া, উহাৰ দ্বাৰাও প্ৰতিবাদীর নিগ্রহ হয়। সুতরাং ঐ সমস্তও নিগ্রহস্থান। প্ৰকাৰান্তরে বিশেষরূপে উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জ্ঞানই পৃথক্ৰূপে প্ৰকাৰভেদে মহৰ্ষি উহাদিগের প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। ত্ৰায়দৰ্শনের সৰ্ব্বপ্ৰথম সূত্ৰের “বৃত্তি”তে বিশ্বনাথও ইহাই বলিয়াছেন^১। মহাত্মন্যায়িক উদয়নাচাৰ্য্য প্ৰভৃতি এই “নিরনুযোজ্যানুযোগ” নামক নিগ্রহস্থানকে চতুৰ্বিধ বলিয়াছেন^২। যথা,—(১) অশ্ৰান্তকালে

১। অত্র প্ৰমেয়ান্তঃপাতিবুদ্ধিরূপস্থাপি সংশয়াদেনিরনুযোজ্যানুযোগরূপনিগ্রহস্থানান্তঃপাতিনোচ্ছল-জাত্যোশ্চ প্ৰকাৰভেদেন প্ৰতিপাদনং শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যার্থমন্ত।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

২। অশ্ৰান্তকালে গ্ৰহণং হানাদ্যাত্মাস এষ চ।

ছলানি জাতয় ইতি চতশ্চেহন্ত বিধা মতাঃ ॥—তार्কিকরক্ষা।

গ্রহণ, (২) প্রতিজ্ঞাহাতিভাষ্য, (৩) ছল, (৪) জাতি। স্ব স্ব অবসরকে প্রাপ্ত না হইয়াই অথবা উহার অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অসময়ে নিগ্রহস্থানের যে উদ্ভাবন, তাহাই অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। যেমন বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনাদির পরে প্রতিবাদী তাঁহার হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করিয়াই বাদীর উত্তরের পূর্বেই যদি বলেন যে, তুমি এই ব্যভিচারদোষবশতঃ যদি তোমার কথিত হেতুকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর যদি ঐ হেতুতে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট কর, তাহা হইলে তোমার “হেতুস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। প্রতিবাদী এইরূপে অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলে উক্ত স্থলে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। কারণ, উহা তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। উহা প্রথম প্রকার “নিরন্তরযোগ্যযোগ” নামক নিগ্রহস্থান। সমস্ত নিগ্রহস্থানেই উদ্ভাবনের কালের নিয়ম আছে। তাহার লঙ্ঘন করিলে উহা নিগ্রহের হেতু হয়। সেই উদ্ভাবনকালের নিয়মানুসারেই নিগ্রহস্থানগুলি উক্তগ্রাহ্য, অনুক্তগ্রাহ্য ও উচ্যমানগ্রাহ্য, এই নামত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে। যে সমস্ত নিগ্রহস্থান উক্ত হইলেই পরে বুঝা যায়, তাহা উক্তগ্রাহ্য। আর উক্ত না হইলেও পূর্বেও যাহা বুঝা যায়, তাহা অনুক্তগ্রাহ্য। আর উচ্যমান অবস্থাতেই অর্থাৎ বলিবার সময়েই যাহা বুঝা যায়, তাহা উচ্যমানগ্রাহ্য। এইরূপ “প্রতিজ্ঞাহাতিভাষ্য” ও “প্রতিজ্ঞাস্তরাভাষ্য” প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার “নিরন্তরযোগ্যযোগ”। যাহা বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাহানি নহে, কিন্তু তত্তুল্য বলিয়া তাহার ত্রায় প্রতীত হয়, তাহাকে বলে প্রতিজ্ঞাহাতিভাষ্য। “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই আভাস সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। উহা বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে। সুতরাং প্রতিবাদী উহার উদ্ভাবন করিলেও তাঁহার পক্ষে “নিরন্তরযোগ্যযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তর্কিকরক্ষাকার বরদরাজ “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নের বর্ণিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির আভাসসমূহের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার জ্ঞানপূর্ণ তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতিবাহুল্যভয়ে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন ॥ ২২ ॥

সূত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যনিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গে-

ইপসিদ্ধান্তঃ ॥২৩॥৫২৭॥

অনুবাদ। সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত কোন সিদ্ধান্তবিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অনিয়মবশতঃ অর্থাৎ সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের

উক্তগ্রাহ্যঃ কেচিদন্তেঃশুস্তগ্রাহ্যস্তথাপরে।

উচ্যমানমগ্রাহ্য ইতি কালগ্রন্থা দ্বিতঃ ॥—তর্কিকরক্ষা।

বিপর্যয়প্রযুক্ত কথার প্রসঙ্গ (২৩) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান।

ভাষ্য। কশ্চিদিদং তথাভাবং প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্যয়া-
দনিয়মাৎ কথং প্রসঙ্গয়তোহপসিদ্ধান্তো বেদিতব্যঃ।

যথা ন সদাত্মানং জহাতি, ন সতো বিনাশো নাসদাত্মানং লভতে,
নাসদুৎপদ্যত ইতি সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য স্বপক্ষমবস্থাপয়তি—এক-
প্রকৃতিদং ব্যক্তং, বিকারাণাং সমন্বয়দর্শনাৎ। যদন্বিতানাং শরাবাদীনাং
দৃষ্টমেকপ্রকৃতিত্বং। তথা চায়ং ব্যক্তভেদঃ স্থখ-দুঃখমোহান্বিতে দৃশ্যতে।
তস্মাৎ সমন্বয়দর্শনাৎ স্থাদিভিরেকপ্রকৃতিদং বিশ্বমিতি।

এবমুক্তবানুযুজ্যতে—অথ প্রকৃতিবিকার ইতি কথং লক্ষিতব্য-
মিতি। যস্মাবস্থিতস্য ধর্ম্মান্তর-নিবর্ত্তো ধর্ম্মান্তরং প্রবর্ত্ততে, সা প্রকৃতিঃ।
যদ্ধর্ম্মান্তরং প্রবর্ত্ততে নিবর্ত্ততে বা স বিকার ইতি। মোহয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থ-
বিপর্য্যাসাদনিয়মাৎ কথং প্রসঙ্গয়তি। প্রতিজ্ঞাতং খল্বেনে—নাসদাবি-
র্ভবতি, ন সত্তিরোভবতীতি। সদসতোশ্চ তিরোভাবাবির্ভাবমন্তরেণ ন
কশ্চিৎ প্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্ত্যুপরমশ্চ ভবতি। যদি খল্ববস্থিতায়াং ভবিষ্যতি
শরাবাদিলক্ষণং ধর্ম্মান্তরমিতি প্রবৃত্তির্ভবতি, অভূদিতি চ প্রবৃত্ত্যুপরমঃ।
তদেতন্মুদ্রক্ষ্মাণামপি ন স্যাৎ।

এবং প্রত্যবস্থিতো যদি সতশ্চাত্মহানমসতশ্চাত্মলাভমভ্যুপেতি,
তদাস্থাপসিদ্ধান্তো নাম নিগ্রহস্থানং ভবতি। অথ নাভ্যুপেতি, পক্ষোহস্য
ন সিধ্যতি।

অনুবাদ। কোন পদার্থের তথাভাব অর্থাৎ তৎপ্রকারতা প্রতিজ্ঞা করিয়া,
প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ কথাপ্রসঙ্গনকারীর (২১) অপসিদ্ধান্ত
অর্থাৎ “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান জানিবে।

যেমন সৎবস্তু আত্মাকে ত্যাগ করে না (অর্থাৎ) সৎবস্তুর বিনাশ হয় না,
এবং অসৎ আত্মাকে লাভ করে না (অর্থাৎ) অসৎ উৎপন্ন হয় না—এই সিদ্ধান্ত

১। “অভ্যুপেত্য” ইত্যন্ত ব্যাখ্যানং “কশ্চিদিদং তথাভাবং প্রতিজ্ঞায়”তি। “প্রতিজ্ঞাতার্থ-বিপর্যয়া”দিতি
অভ্যুপেত্যার্থ-বিপর্যয়াং সিদ্ধান্তবিপর্য্যাদিত্যর্থঃ। তদেতৎ “দনিয়মাৎ”দিত্যন্ত ব্যাখ্যানং।—তাৎপর্য্যটীকা।

স্বীকার করিয়া (কোন সাংখ্যবাদী) নিজ পক্ষ সংস্থাপন করিলেন, যথা—(প্রতিজ্ঞা) এই ব্যক্ত একপ্রকৃতি, (হেতু) যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখা যায়। (উদাহরণ) মৃত্তিকাস্থিত শরাবাদির একপ্রকৃতিই দৃষ্ট হয়। (উপনয়) এই ব্যক্তভেদ সেইপ্রকার সুখদুঃখমোহান্বিত দৃষ্ট হয়। (নিগমন) সুখাদির সহিত সেই সমন্বয়দর্শনপ্রযুক্ত এই বিশ্ব এক-প্রকৃতি। এইরূপ বক্তা অর্থাৎ যিনি উক্তরূপে নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলেন, তিনি (প্রতিবাদী নৈয়ায়িক কর্তৃক) জিজ্ঞাসিত হইলেন,—প্রকৃতি ও বিকার, ইহা কিরূপে লক্ষণীয়? অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকারের লক্ষণ কি? (উত্তর) অবস্থিত যে পদার্থের ধর্ম্মান্তরের নিবৃত্তি হইলে ধর্ম্মান্তর প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রকৃতি। যে ধর্ম্মান্তর প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়, তাহা বিকার। সেই এই বাদী (সাংখ্য) প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ “কথা” প্রসঙ্গন করিলেন। যেহেতু এই বাদী কর্তৃক অসৎ আবির্ভূত হয় না এবং সৎ বস্তু তিরোভূত হয় না, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু সৎ ও অসতের তিরোভাব ও আবির্ভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির উপরম হয় না। (তাৎপর্য্য) অবস্থিত মৃত্তিকাতে শরাবাদিরূপ ধর্ম্মান্তর উৎপন্ন হইবে, এ জ্ঞাত প্রবৃত্তি অর্থাৎ সেই মৃত্তিকাতে শরাবাদির উৎপাদনে প্রবৃত্তি হয় এবং উৎপন্ন হইয়াছে, এ জ্ঞাত প্রবৃত্তির উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়। সেই ইহা মৃত্তিকার ধর্ম্মসমূহেরও হইতে পারে না [অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তে লোকের যেমন শরাবাদির জ্ঞাত প্রবৃত্তি ও উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ ঐ শরাবাদিরও উৎপত্তিরূপ প্রবৃত্তি ও বিনাশরূপ নিবৃত্তি যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত সিদ্ধান্তে মৃত্তিকার ধর্ম্ম শরাবাদিও ঐ মৃত্তিকার ন্যায় সৎ, উহারও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই]।

এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইয়া (বাদী সাংখ্য) যদি সৎবস্তুর বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহার “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইহার পক্ষ সিদ্ধ হয় না।

টিপ্পনী। এই সূত্র দ্বারা “অপসিদ্ধান্ত” নামক একবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত যে প্রকার, তৎপ্রকারে প্রথমে উহার প্রতিজ্ঞাই উহার স্বীকার এবং পরে তৎপ্রকারে প্রতিজ্ঞাত সেই সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরে উহার বিপরীত সিদ্ধান্তের স্বীকারই সূত্রে “অনিয়ম” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত “অনিয়মাৎ” এই পদের ব্যাখ্যারূপে বলিয়াছেন,—“প্রতিজ্ঞাতার্থ-বিপর্য্যয়াৎ”। বাদীর প্রতিজ্ঞাত সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয়ই প্রতিজ্ঞাতার্থবিপর্য্যয়,

তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরে সেই বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই আরও কথার প্রদত্ত করিলে তাঁহার “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাব্যকার প্রথমে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে কোন সাংখ্য বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যমতে সংবস্তুর বিনাশ নাই, অসত্তেরও উৎপত্তি নাই। কোন সাংখ্য উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলেন যে, এই ব্যক্ত জগৎ এক প্রকৃতি অর্থাৎ সমগ্র জগতের মূল উপাদান এক। কারণ, উপাদান-কারণের যে সমস্ত বিকার বা কার্য্য, তাহাতে উপাদানকারণের সমন্বয় দেখা যায়। যেমন একই মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য যে শরাব ও ঘট প্রভৃতি, তাহাতে সেই উপাদানকারণ মৃত্তিকার সমন্বয়ই থাকে অর্থাৎ সেই শরাবাদি জব্য সেই মৃত্তিকায়িতই থাকে এবং উহার মূল উপাদানও এক, ইহা দৃষ্ট হয়। এইরূপ এই যে ব্যক্তভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্ত পদার্থ বা জগৎ, তাহাও সুখঃখ-মোহাবিহিত দেখা যায়। অতএব সুখ, দুঃখ ও মোহের সহিত এই জগতের সমন্বয় দর্শনপ্রযুক্ত এই জগতের মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ যখন সুখঃখ-মোহাবিহিত, তখন তাহার মূল প্রকৃতি বা উপাদানও সুখঃখমোহাত্মক এক, ইহা পূর্বোক্তরূপে অনুমানসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ যে, সেই মূল প্রকৃতিতেই বিদ্যমান থাকে, ইহা সৎ, ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, অসৎ হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা মূল কারণে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, তাহারই অন্তরূপে প্রকাশ হইতে পারে। নঃচৎ সেই মূল কারণ হইতে তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না। সংকার্য্যবাদী সাংখ্য পূর্বোক্তরূপে নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক উহা খণ্ডন করিবার জন্ত বাদীকে প্রশ্ন করিলেন যে, প্রকৃতি ও তাহার বিকারের লক্ষণ কি? তদন্তরে বাদী সাংখ্য বলিলেন যে, যে পদার্থ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার কোন ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও অপর ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, সেই পদার্থই প্রকৃতি, এবং যে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয়, সেই ধর্ম্মই বিকার। যেমন মৃত্তিকা প্রকৃতি, ঘটাদি তাহার বিকার। মৃত্তিকা ঘটাদিরূপে পরিণত হইলেও মৃত্তিকা অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহাতে পূর্বধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ঘটাদিরূপ অন্ত্র ধর্ম্মের প্রবৃত্তি বা প্রকাশ হয়। বাদী সাংখ্য এইরূপ বলিলে তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, অসত্তের আবির্ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় না এবং সত্তের বিনাশ হয় না, ইহাই আপনার প্রতিজ্ঞাত বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু সত্তের বিনাশ ও অসত্তের উৎপত্তি ব্যতীত কাহারই ঘটাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি এবং উহার উপরম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে মৃত্তিকা অবস্থিত আছে, তাহাতে ঘটাদিরূপ ধর্ম্মান্তর উৎপন্ন হইবে, এইরূপ বুঝিয়াই বুঝিমান্ ব্যক্তি ঘটাদি নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া গেলে, উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া সেই কার্য্য হইতে উপরম অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। এই যে, সর্বলোকসিদ্ধ প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম, তাহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপরম হইতে পারে না। কারণ, মৃত্তিকাদি উপাদানকারণে ঘটাদি কার্য্য সর্বদাই বিদ্যমান থাকিলে ওদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সিদ্ধ পদার্থে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি অগোচর হইলে তাহার উপরমও বলা যায় না। আর উক্ত সিদ্ধান্তে কেবল যে, ঘটাদি কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, ইহা নহে, পরন্তু মৃত্তিকার ধর্ম্ম ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি ও

বিনাশরূপ যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রত্যক্ষনিষ্ঠ, তাহাও হইতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশ ভিন্ন আবির্ভাব ও তিরোভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই তৎপার্যই ভাষ্যকার এখানে আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথা বলিয়াছেন। ফল কথা, অন্যতর উৎপত্তি ও সত্যের বিনাশ স্বীকার না করিলে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম কোনরূপেই উপলব্ধ হইতে পারে না। প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের এই প্রতিবাদেব সহস্র করিতে অনর্থক হইয়া বাণী সাংখ্য শেষ যদি সত্য বিনাশ ও অন্যতর উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে “অপসিকান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণ, তিনি প্রথম সত্যের বিনাশ হয় না এবং অন্যতর উৎপত্তি হয় না, এই সাংখ্য সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্বক নিজস্ব স্থাপন করিয়া, পরে উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তাহা স্বীকার না করিলেও তাঁহার নিজ পক্ষ সিদ্ধ হয় না। তাঁহাকে সেখানেই কথা ভঙ্গ করিয়া নীরব হইতে হয়। তাই তিনি আরও কথার ভঙ্গ না করিয়া, তাঁহার স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াই সেই কথার প্রসঙ্গ বা অনুবর্তন করিলে “অপসিকান্ত” নামক নিগ্রহস্থান দ্বারা নিগৃহীত হইবেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে সংক্ষেপে সরলভাবে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী ‘আমি সাংখ্য মতেই বলিব,’ এই কথা বলিয়া কার্য্যমাত্রই সৎ, অর্থাৎ ঘটাদি সমস্ত কার্য্যই তাহার উপাদানকারণে বিদ্যমানই থাকে, এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, তাহা হইলে সেই বিদ্যমান কার্য্যের আবির্ভাবরূপ কার্য্যও ত সৎ, সুতরাং তাহার জ্ঞাত কারণ বাপার ব্যর্থ। আর যদি সেই আবির্ভাবেরও আবির্ভাবের জ্ঞাত কারণ বাপার আবশ্যক বল, তাহা হইলে সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ার অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। তখন বাদী যদি উক্ত অনবস্থাদোষের উদ্ধারের জ্ঞাত পরে আবির্ভাবকে অসৎ বলিয়া, উহার উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে “অপসিকান্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণ, তিনি প্রথম সাংখ্যমতানুসারে কার্য্যমাত্রই সৎ, অন্যতর উৎপত্তি হয় না, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, উহা সমর্থন করিতে শেষে বাধ্য হইয়া আবির্ভাবরূপ কার্য্যকে অসৎ বলিয়া বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বোক্তরূপ স্থলে “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাস অথবা পূর্বোক্ত “প্রতিজ্ঞাবিরোধ”ই নিগ্রহস্থান হইবে, “অপসিকান্ত” নামক পৃথক নিগ্রহস্থান কেন স্বীকৃত হইয়াছে? এতদ্বত্তরে উদ্ভাতকের তৎপার্য্য-বাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র যুক্তির দ্বারা বিচারপূর্বক বলিয়াছেন যে, যে স্থানে প্রতিজ্ঞার সহিত হেতুর বিরোধ হয়, সেখানেই “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাস বা “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিজ্ঞারূপ অর্থমোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত শেষোক্ত বিপরীত সিদ্ধান্তেরই বিরোধবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তবাদিতা-প্রযুক্ত বাদীর অসামর্থ্য প্রকটিত হওয়ায় এই “অপসিকান্ত” পৃথক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি এবং তাঁহাদিগের মতের প্রতিবাদও প্রকাশ করিয়াছি ৥২০৥

সূত্র । হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ ॥২৪॥৫২৮॥

অনুবাদ । “যথোক্তা” অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে যেকোন লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট (২২) হেত্বাভাসসমূহও নিগ্রহস্থান ।

ভাষ্য । হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি । কিং পুনর্লক্ষণান্তরযোগা-
দ্ব্যভাসা নিগ্রহস্থানত্বমাপন্য যথা—প্রমাণানি প্রমেয়ত্বমিত্যত আহ
যথোক্তা ইতি । হেত্বাভাসলক্ষণেনৈব নিগ্রহস্থানভাব ইতি ।

ত ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্দিষ্টা লক্ষিতাঃ পরীক্ষিতাশ্চেতি ।

অনুবাদ । হেত্বাভাসসমূহও নিগ্রহস্থান । তবে কি লক্ষণান্তরের সম্বন্ধবশতঃ
অর্থাৎ অতী কোন লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া হেত্বাভাসসমূহ নিগ্রহস্থানত্ব প্রাপ্ত হয় ?
যেমন প্রমাণসমূহ প্রমেয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এ জন্ত (সূত্রকার মহর্ষি) “যথোক্তাঃ” এই
পদটী বলিয়াছেন । (তাৎপর্য্য) হেত্বাভাসসমূহের লক্ষণপ্রকারেই নিগ্রহস্থানত্ব
অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাসসমূহের যেকোন লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেইরূপেই
ঐ সমস্ত হেত্বাভাস নিগ্রহস্থান হয় ।

সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ অর্থাৎ ত্রায়শাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ
উদ্দিষ্ট, লক্ষিত এবং পরীক্ষিত হইল ।

টিপ্পনী । মহর্ষি “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি যে দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে
হেত্বাভাসই চরম নিগ্রহস্থান । ইহা প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির ত্রায় “উক্তগ্রাহ্য” নিগ্রহস্থান হইলেও অর্থ-
দোষ বলিয়া প্রধান এবং অতী নিগ্রহস্থান না হইলে সর্বশেষে ইহার উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা স্মৃচনা
করিতেই মহর্ষি সর্বশেষে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । মহর্ষি সর্বপ্রথম সূত্রে ষোড়শ পদার্থের মধ্যে
হেত্বাভাসস্বরূপে ইহার পৃথক্ উল্লেখও করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে সেই
হেত্বাভাসকে পঞ্চবিধ বলিয়া যথাক্রমে সেই সমস্ত হেত্বাভাসের লক্ষণও বলিয়াছেন । কিন্তু সেই
সমস্ত হেত্বাভাসকে আবার নিগ্রহস্থান বলায় প্রশ্ন হয় যে, যেমন মহর্ষির কথিত প্রমাণ পদার্থ
প্রমেয়ের লক্ষণাক্রান্ত হইলে, তখন উহা প্রমেয় হয়, তদ্রূপ পূর্বোক্ত হেত্বাভাসসমূহও কি অতী
কোন লক্ষণাক্রান্ত হইলেই তখন নিগ্রহস্থান হয় ? তাহা হইলে সেই লক্ষণও এখানে মহর্ষির
বক্তব্য । এ জন্ত মহর্ষি এই সূত্রে শেষে বলিয়াছেন,—“যথোক্তাঃ” । অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাস-
সমূহ যে প্রকারে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উহার যেকোন লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপেই উহা
নিগ্রহস্থান হয় । সুতরাং এখানে আর উহার লক্ষণ বলা অনাবশ্যক । ভাষ্যকারও মহর্ষির উক্ত-
রূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহা হইলে মহর্ষি আবার প্রথমে হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ

করিয়াছেন কেন ? তাঁহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়া এখানে তাহার সমস্ত লক্ষণ বলিলেই ত হেত্বাভাসের তত্ত্বজ্ঞাপন হয় । এতদ্ব্যতীত মহর্ষির সর্ব-প্রথম সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ জিগীষাশূত্র ঞ্জর শিষ্য প্রভৃতির যে “বাদ” নামক কথা, তাহাতেও হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহা সূচনা করিবার জন্তই মহর্ষি পূর্বে নিগ্রহস্থান হইতে পৃথকরূপেও হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য সেখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে বলিয়াছেন যে, হেত্বাভাসের পৃথক উল্লেখের দ্বারা বাদবিচারে কেবলমাত্র হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানই যে উদ্ভাব্য, ইহাই স্থচিত হয় নাই । কিন্তু যে সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্ব-নির্ণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাই উহার দ্বারা স্থচিত হইয়াছে । তাহা হইলে হেত্বাভাসের ত্রায় “নূন”, “অধিক” এবং “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাও উহার দ্বারা স্থচিত হইয়াছে বুঝা যায় । সূচনাই সূত্রের উদ্দেশ্য । সূত্রে অতিরিক্ত উক্তির দ্বারা অতিরিক্ত তত্ত্বও স্থচিত হয় । বস্তুতঃ প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রারম্ভে বাদলক্ষণসূত্রে “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ” এবং “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদদ্বয়ের দ্বারাও যে, বাদবিচারে “নূন”, “অধিক” এবং “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য বলিয়া স্থচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারও সেখানে বলিয়াছেন এবং পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও যে বাদবিচার হইতে পারে, ইহাও পরে বলিয়াছেন । কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সেখানে ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারাও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদবিচারে “নূন” এবং “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানেরও উদ্ভাবন উচিত নহে । বস্তুতঃ যে বাদবিচারে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়, তাহাতে “নূন” এবং “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য, ইহাই সেখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় । নচেৎ সেখানে তাঁহার পূর্বোক্ত কথা সংগত হয় না (প্রথম খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । বাদবিচারে যে, “নূন” এবং “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য, ইহা বার্তিককার উদ্যোতকরও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতামুসারে “তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ “নূন”, “অধিক”, “অপসিদ্ধান্ত”, “প্রতিজ্ঞাবিরোধ”, “অননুভাষণ”, “পুনরুক্ত” ও “অপ্রাপ্তকাল”, এই সপ্তপ্রকার নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য বলিয়াছেন । তবে ঐ সপ্ত প্রকার নিগ্রহস্থান সেখানে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয় না, কিন্তু “হেত্বাভাস” ও “নিরনুযোজ্যানু-যোগ” এই নিগ্রহস্থানদ্বয়ই বাদবিচার-স্থলে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয়, ইহাও তিনি সর্বশেষে বলিয়াছেন । বাহ্যভয়ে এখানে তাঁহার সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না ।

মহর্ষির এই চরম সূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্থচিত হইয়াছে, ইহা অনেকের মত । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে সূত্রে “যথোক্তাঃ” এই পদের উপপত্তি হয় না । কারণ, সেই সমস্ত অনুক্ত নিগ্রহস্থানে যথোক্তত্ব নাই । কিন্তু মহর্ষির কঠোক্ত হেত্বাভাসেই তিনি যথোক্তত্ব বিশেষণের উল্লেখ করায় বৃত্তিকারোক্ত ঐ অনুপপত্তি হইতে পারে না । শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও এই সূত্রোক্ত “চ” শব্দের দ্বারা অনুক্ত সমুচ্চয়ের

কথা বলিয়াছেন। বরদরাজ ঐ “চ” শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তদোষ, উক্তিদোষ এবং আত্মাশ্রয়ত্বাদি তর্কপ্রতিবাদ, এই অন্তর্ভুক্ত নিগ্রহস্থানত্রয়ের সমুচ্চয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “বাদিবিবাদ” গ্রন্থে শব্দ মিশ্র ঐ “চ” শব্দের প্রয়োগে মহর্ষির উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। শৈবাচার্য্য ভাস্কর্য্য গৌতমের এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর দুর্ভেদন এবং কপোলবাদন প্রভৃতি এবং স্থলবিশেষে অপশব্দপ্রয়োগ প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছেন^১। সুতরাং তিনিও যে ঐ “চ” শব্দের দ্বারাই ঐ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু বরদরাজ যে, “দৃষ্টান্তভাস”কেও এই সূত্রোক্ত “চ” শব্দের দ্বারাই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থ হেতুশূন্য বা সাধ্যশূন্য হইলে তাহাকে বলে দৃষ্টান্তভাস, ইহা হেতুভাসেরই অন্তর্গত। তাই মহর্ষি গৌতম ত্ৰায়দৰ্শনে দৃষ্টান্তভাসের কোন লক্ষণ বলেন নাই। বরদরাজও পূর্বে হেতুভাসের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে এই কথা বলিয়াছেন^২ এবং পরে কোন্ হেতুভাসে কিরূপ দৃষ্টান্তভাস কিরূপে অন্তর্ভূত হয়, ইহাও বুঝাইয়াছেন। সুতরাং মহর্ষি হেতুভাসকে নিগ্রহস্থান বলিয়া তদ্ব্যবহারই পক্ষাভাস এবং দৃষ্টান্তভাসও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। বার্তিককারও পূর্বে (চতুর্থ সূত্রবার্তিকে) এই কথাই বলিয়া, মহর্ষি নিগ্রহস্থানের মধ্যে দৃষ্টান্তভাসের উল্লেখ কেন করেন নাই, ইহার সমাধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র সেখানে উদ্যোতকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির এই চরম সূত্রে “হেতুভাস” শব্দের অন্তর্গত “হেতু” শব্দের দ্বারা হেতু ও দৃষ্টান্ত, এই উভয়ই বিবক্ষিত বলিয়া “হেতুভাস” শব্দের দ্বারা “হেতুভাস” ও “দৃষ্টান্তভাস”, এই উভয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত অর্থ, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির ঐরূপ বিবক্ষার প্রয়োজন কি এবং উদ্যোতকের পূর্বোক্ত বাক্যের ঐরূপই তাৎপর্য্য হইলে তিনি পরে এই সূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা কেন করেন নাই? বাচস্পতি মিশ্রই বা কেন বৃষ্টবল্লনা করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন, ইহা সূধাগণ বিচার করিবেন।

ত্ৰায়শাস্ত্রে হেতু ও হেতুভাসের স্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাহার উদাহরণাদির ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃত ও দুঃসহ। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্ত বিষয়ে বহু স্বাক্ষর বিচার করিয়া গিয়াছেন। দিঙনাগ প্রভৃতির মতে পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্তা এবং বিপক্ষে অসত্তা, এই লক্ষণত্রয়বিশিষ্ট পদার্থই হেতু এবং ইহার কোন লক্ষণশূন্য হইলেই তাহা হেতুভাস। উক্ত মতানুসারে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভাস্কর্য্য ঐ কথাই বলিয়াছেন^৩। বসুবন্ধু ও দিঙনাগের হেতু প্রভৃতির ব্যাখ্যার উল্লেখপূর্বক

১। এতেন দুর্ভেদনকপোলবাদিত্রাদীনান্ সাধনানুপযোগিতেন নিগ্রহস্থানং বেদিতব্যং। নিয়মকথ্যাস্বপক্ষা-
দীনামপীতি।—“স্তায়সার”, অনুমান পরিচ্ছেদের শেষ।

২। ন সূত্রিঃ কিমিতি চেদদৃষ্টান্তভাস-লক্ষণম্।

অন্তর্ভাবো যতন্তেষাং হেতুভাসেষু পক্ষম্ ॥—বার্তিকরক্ষা।

৩। সন্ পক্ষে সদুশে সিদ্ধো ব্যাবৃত্তন্তদ্বিপক্ষতঃ।

হেতুত্রিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেতুভাসো বিপর্য্যয়াৎ ॥—কাব্যালঙ্কার, ৫ম পঃ, ২১শ।

উদ্যোতকর “শ্রায়বার্তিক”র প্রথম অধ্যায়ে (অবয়ব ব্যাখ্যায়) তাঁহাদিগের সমস্ত কথাই সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকরের হেত্বভাসের বহু বিভাগ এবং তাহার উদাহরণ ব্যাখ্যাও অতি ছুর্বোধ। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত প্রকাশ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও এখানেও বধ্যমতি তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৌদ্ধযুগে শৈবাচার্য্য ভাস্কর্য্যও তাঁহার “শ্রায়সারে” হেত্বভাসের বহু বিভাগ ও উদাহরণাদির দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহা বুঝিলেও ঐ বিষয়ে অনেক কথা বুঝা যাইবে। দিঙ্নাগ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রতিজ্ঞাভাস ও দৃষ্টান্তভাস প্রভৃতিরও বর্ণনাপূর্ব্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিঙ্নাগের ক্ষুদ্র গ্রন্থ “শ্রায়প্রবেশে”ও তাহা দেখা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শ্রায় তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক মহানৈয়ায়িকও বহু প্রকারে “প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতিরও বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে দিঙ্নাগের প্রদর্শিত উদাহরণ-বিশেষেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে তাঁহাদিগের কথা কিছু প্রকাশ করিয়াছি এবং “পক্ষাভাস” বা “প্রতিজ্ঞাভাস” প্রভৃতি যে হেত্বভাসেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তত্ত্বদর্শী মহর্ষি গোতম তাহার পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বলিয়াছি। জয়ন্ত ভট্টও সেখানে ঐ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ও ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার এখানে শেষে তাঁহার ব্যাখ্যাত সমস্ত শাস্ত্রার্থের উপসংহার করিতে বলিয়াছেন যে, সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দিষ্ট, লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইল। অর্থাৎ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই শ্রায়দর্শনের প্রতিপাদ্য। এবং উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদন বা তত্ত্বজ্ঞাপনই শ্রায়দর্শনের ব্যাপার। সেই ব্যাপার দ্বারাই এই শ্রায়দর্শন তাহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সুতরাং মহর্ষি গোতম সেই প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশপূর্ব্বক লক্ষণ বলিয়া অনেক পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। মহর্ষির কর্তব্য উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রায়দর্শনও সমাপ্ত হইয়াছে।

মহর্ষির শেষোক্ত দুই সূত্রে “কথকাত্মোক্তি-নিরূপ্য-নিগ্রহস্থানদ্বয়প্রকরণ” (৭) সমাপ্ত হইয়াছে এবং সপ্ত প্রকরণ ও চতুর্বিংশতি সূত্রে এই পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আন্বিক সমাপ্ত হইয়াছে। এবং বাচস্পতি মিশ্রের “শ্রায়সূচীনিবন্ধ” গ্রন্থানুসারে প্রথম হইতে ৫২৮ সূত্রে শ্রায়দর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রই যে, “শ্রায়সূচীনিবন্ধে”র কর্তা, ইহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি এবং তিনি যে, ঐ গ্রন্থের সর্ব্বশেষোক্ত শ্লোকের সর্ব্বশেষে “বস্তু-বস্তুবৎসরে” এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার ঐ গ্রন্থসমাপ্তির কাল বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রের প্রযুক্ত ঐ “বৎসর” শব্দের দ্বারা বাহারা শকাব্দ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মতানুসারেই আমি পূর্ব্বে কয়েক স্থলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী তাঁহার কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু “বৎসর” শব্দ দ্বারা অনেক স্থলে “সংবৎ”ই গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতি মিশ্র “শ্রায়সূচীনিবন্ধ” রচনা করেন, ইহা বুঝা যায় এবং তাহাই প্রকৃতার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কারণ, উদয়নাচার্য্যের “লক্ষণাবলী” গ্রন্থের শেষোক্ত

শ্লোকে তিনি ৯৩৬ শকাব্দে (১৮৪ খৃষ্টাব্দে) ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। এবং উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের “ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটিকা”র “ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” নামে যে টীকা করিয়াছেন, তাহার প্রারম্ভে তাঁহার “মাতঃ সন্ন্যস্তি”—ইত্যাদি প্রার্থনা-শ্লোকের দ্বারা এবং পরে তাঁহার অত্রাণ উক্তির দ্বারা তিনি যে বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পরে, তাঁহার ব্যাখ্যাত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য পরিণুক্তিরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই “ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-পরিণুক্তি” নামে টীকা করিয়াছেন এবং সেই পরিণুক্তির জন্যই প্রথমে সন্ন্যস্তী মাতার নিকটে ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এইরূপ আরও নানা কারণে বাচস্পতি মিশ্র যে উদয়নাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী, তাঁহার উভয়ে সমসাময়িক নহেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের “বস্তুক-বস্তুবৎসরে” এই উক্তির দ্বারা তিনি যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তই বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী মিথিলেশ্বরস্বরি স্মৃতিনিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র “ন্যায়সূত্রোনিবন্ধে”র রচয়িতা নহেন। তিনি পরে নিজমতানুসারে “ন্যায়সূত্রোদ্ধারে” নামে পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন^১। তাঁহার মতে ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা ৫৩১। অন্যান্য কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য ৥২৪৥

যোহক্ষপাদমুখিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাদবদতাং বরম্।

তস্য বাৎস্তায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্তায়নীয়ৈ ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

অনুবাদ। বক্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে যে গ্রায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, বাৎস্তায়ন, তাহার এই ভাষ্যসমূহ প্রবর্ত্তন করিলেন অর্থাৎ বাৎস্তায়নই প্রথমে তাহার এই ভাষ্য রচনা করিলেন।

শ্রীবাৎস্তায়নপ্রণীত ন্যায়ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, এই গ্রায়শাস্ত্র অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল। অর্থাৎ গ্রায়শাস্ত্র অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। অক্ষপাদ ঋষি ইহার কর্ত্তা নহেন, কিন্তু বক্তা। তিনি বক্তৃশ্রেষ্ঠ, সুতরাং গ্রায়শাস্ত্রের অতিদুর্কোষ তৎ সূত্র দ্বারা সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ। তাই ভগবদিচ্ছায় তাঁহাতেই এই গ্রায়শাস্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। ভাষ্যকার উক্ত শ্লোকের পরাধ্বনি তিনি যে, বাৎস্তায়ন নামেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে অক্ষপাদ ঋষির প্রকাশিত গ্রায়শাস্ত্রের এই ভাষ্যসমূহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অহর্য্যপতি গোতম মুনিরই নামান্তর অক্ষপাদ, ইহা “স্কন্দপুরাণে”র বচনানুসারে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি। সুপ্রাচীন

১। শ্রীবাচস্পতিমিশ্রের মিথিলেশ্বরস্বরিণা।

লিখ্যতে মুনিদুর্গ্যশ্রীগৌতমমতং মহৎ ॥—“ন্যায়সূত্রোদ্ধারে”র প্রথম শ্লোক।

ভাস কবি তাঁহার “প্রতিমা” নাটকে যে মেধাতিথির ত্রায়শাজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন^১, সেই মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতমেরই নামান্তর, ইহা পরে মহাভারতের বচন^২ দ্বারা বুঝিয়াছি। সুতরাং ভাস কবি যে মেধাতিথির ত্রায়শাজ্ঞ বলিয়া গৌতমের এই ত্রায়শাজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার প্রথম নাটক “মাণবিকাগ্নিমিত্রে” সৰ্ব্বাঙ্গে সসম্মানে যে ভাস কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যে খৃষ্টপূর্ববর্তী সুপ্রাচীন, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি এবং তিনি যে কোটিল্যেরও পূর্ববর্তী, ইহাও আমরা মনে করি। কারণ, ভাস কবির “প্রতিজ্ঞাযোগদ্ধায়ণ” নাটকের চতুর্থ অঙ্কের “নবং শরাবং সলিলস্ত পূর্ণং” ইত্যাদি শ্লোকটি কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দশম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোটিল্য সেখানে “অপীহ শ্লোকো ভবতঃ”—এই কথা বলিয়াই অন্য শ্লোকের সহিত ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভাস কবিও যে পরে তাঁহার স্বকৃত নাটকে অন্যের রচিত ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, ভাস কবি যে, খৃষ্টপূর্ববর্তী সুপ্রাচীন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই এবং তাঁহার সময়েও যে মেধাতিথির ন্যায়শাজ্ঞ বলিয়া গৌতমপ্রকাশিত এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল এবং ভারতে ইহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, ইহাও আমরা তাঁহার পুরোক্ত ঐ উক্তির দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাংলায়নও যে, খৃষ্টপূর্ববর্তী সুপ্রাচীন, এ বিষয়েও পূর্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সময় নির্ধারণ পক্ষে এ পর্য্যন্ত আর কোন প্রমাণ পাই নাই।

বাংলায়নের অনেক পরে বিজ্ঞানবাদী নব্যবৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়কালে মহানৈয়ায়িক উদ্যোতকর সেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণের প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া গৌতমের এই ন্যায়শাস্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার “ন্যায়বার্ত্তিক”র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—“যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ। কুতর্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ হেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ” ॥ টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে দিঙ্‌নাগ প্রভৃতিকেই উদ্যোতকরের বুদ্ধিহু কুতর্কিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি জীবিত না থাকিলে উদ্যোতকরের “ন্যায়বার্ত্তিক” নিবন্ধ তাঁহাদিগের অজ্ঞান নিবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। পরন্তু পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের ষাটশ সূত্রের বার্ত্তিক উদ্যোতকর দিঙ্‌নাগের প্রতিজ্ঞালক্ষণের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—“যত্ত্বু ত্রবীষি সিদ্ধান্তপরিগ্রহ এব প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি। সেখানে বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যত্ত্বু ত্রবীষি দিঙ্‌নাগ”। বাচস্পতি মিশ্রের ঐরূপ ব্যাখ্যানুসারে মনে হয় যে, উদ্যোতকর দিঙ্‌নাগ জীবিত থাকিতেই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উদ্যোতকর দিঙ্‌নাগের গুরু বসুবন্ধুর অনেক কথারও উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য অনেক ঐতিহাসিকের

১। রাবণঃ—ভোঃ কাশ্যপগোত্রোহস্মৈ, সাঃজাপাঙ্গং বেদমধ্যম্, মানবায়ঃ ধর্মশাস্ত্রং, মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং, বার্ষ্পত্যমর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথেরন্যায়শাস্ত্রং, প্রাচৈতন্য শাস্ত্রকল্পকং”।—প্রতিমা নাটক, পঞ্চম অঙ্ক।

২। মেধাতিথিরহাপ্রাজ্ঞা গৌতমস্তপসি হিঃ।

বিশ্বকোষ ভেদ কালেম পদ্মাঃ সংহাতিভ্রমঃ ॥—শাস্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্ব, ২৩ঃ অধ্যায়।

মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীই বসুবন্ধুর সময় এবং তাঁহার শিষ্য দিঙনাগ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই মত সত্য হইলে উদ্যোতকরও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেই দিঙনাগ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য “নাগবার্তিক” রচনা করেন, ইহাই অমরা মনে করি। (পূর্ববর্তী ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের ৩৩শ ও ৩৭শ স্তরের বার্তিকের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র “সুবন্ধু-সঙ্কণে” এবং “অত্র সুবন্ধুনা” এইরূপ উল্লেখ করার সুবন্ধু নামেও কোন বৌদ্ধ নৈমগ্নিক ছিলেন কি না? এইরূপ সংশয় আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মুদ্রিত পুস্তকে বসুবন্ধু হলে সুবন্ধু মুদ্রিত হইয়াছে অথবা বাচস্পতি মিশ্র যেমন ধর্মকীর্তিকে কীর্তি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রূপ বসুবন্ধুকে সুবন্ধু নামেও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই বুদ্ধিতে হইবে। উপসংহারে আরও অনেক বিষয়ে অনেক কথা লেখা ছিল, কিন্তু এই গ্রন্থের আর কলেবরবৃদ্ধি ত্রীভগবানের অভিপ্রেত না হওয়ায় তাঁহারই ইচ্ছানুসারে এখানেই নিবৃত্ত হইলাম। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে আরও গ্রন্থান্তরে যথামতি অন্যান্য কথা লিখিতে চেষ্টা করিব।

সুগমার্গ-দ্ব্যেক-বঙ্গাব্দে যো বঙ্গঙ্গ-বশোহরে ।
 গ্রামে ‘তালখড়ী’নাম্নি ভট্টাচার্যকুলোদ্ভবঃ ॥
 পিতা সৃষ্টিধরো নাম যস্য বিদ্বান্ মহাতপাঃ ।
 মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভুবি যা স্থিতা ॥
 সরোজবাসিনী পত্নী নিজমুক্তার্থমেব হি ।
 যং কাশীমানয়দ্বন্ধা পূর্বং পূর্বতপোপুণ্ড্রৈঃ ॥
 অশক্তেনাপি তেনেদং সভাষ্যং শ্রায়দর্শনম্ ।
 যথাকথঞ্চিদ্ব্যাখ্যাতং সর্বশক্তিমদিচ্ছয়া ॥
 পঠন্তু দোষান্ সংশোধ্য দোষজ্ঞা ইদমাদিতঃ ।
 পশ্যন্তু তত্তদগ্রন্থাংশ্চ টিপ্পন্যামুপদর্শিতান্ ॥
 সম্প্রদায়বিলোপেন বিকৃতং যৎ কচিৎ কচিৎ ।
 বাৎশ্রায়নীয়ং তদভাষ্যং সুধিয়ঃ শোধয়ন্তু চ ॥
 ভাষ্য-বার্তিক-তাৎপর্যটীকাদিগ্রন্থবর্জানাম্ ।
 পরিষ্কারে ন মে শক্তিরক্ষশ্চেব স্তুকরে ॥
 তত্র যশাঃ কৃপাবৃষ্টিঃ কেবলং মেহবলম্বনম্ ।
 পদে পদে কৃপামূর্ত্ত্যে নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধিপত্র

ষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	যে যুদ্ধি	যে বুদ্ধি
৯	উহার	উহার
	“হেয়ং তন্ত্ৰ	“হেয়ং তন্ত্ৰ
	সম্যাগ্	সম্যাগ্
২৫	“হমেবৈষ বৃণতে	“যমেবৈষ বৃণতে
২৬	“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”	মতান্তরে “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”
৩৩	ক্ষপয়িত্বাহ	ক্ষপয়িত্বা
৫৭	এই স্থলে	এই স্থত্রে
৬৬	“বৈয়াকরণলঘুশ্লোকা”	“বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুয়া”
৭৭	প্রমাণমাহ	প্রমাণমাহ
৮০	ত্রসরেণু রজঃ	ত্রসরেণু রজঃ
৮৫	ত্যাদি	ইত্যাদি
৯২	সৰ্ব্বাক্ষেপা	সৰ্ব্বাক্ষেপা
১০২	পত্রৈরমাণুর	ঐ পরমাণুর
১০৫	পরম্পরা	পরম্পরা
১১২	বিভাজ্যমান	বিভজ্যমান
১১৬	করিবার দ্বারাই	কারিকার দ্বারাই
১২৩	না হওয়ায়	না হওয়ায়
১২৭	তত্র সৰ্ব্বভাবা	তত্র ন সৰ্ব্বভাবা
১৩৭	স্থত্রে শেষে	স্থত্র-শেষে
১৩৮	জাগরিতাবস্থায়	জাগরিতাবস্থা
১৫৩	উপলব্ধি হয়	উপপত্তি হয়
১৫৪	দৃষ্টান্তরূপেই	দৃষ্টান্তরূপে
১৬০	সস্তানান্তচ্যুক্তানযুক্তা	সস্তানানিষ্টমা নাপি যুক্তঃ
১৬২	দৃষ্টান্তেন্দা	দৃষ্টান্তেন্দা
১৬৩	যথোক্তপঃ ।	যথোক্তপঃ ।
১৬৪	এই পুস্তকের	ঐ পুস্তকের
	ক্ষেয়বিষয়ের	ক্ষেয়বিষয়ের কালভেদে

পৃষ্ঠাঙ্ক	অনুব্র	তত্ব
১৮৮	সমিধ প্রবন্ধঃ	সমাধি প্রবন্ধঃ
১৯০	ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যা
১৯৬	দেবতীর্থ	দেবতীর্থ
১৯৭	চণ্ডালাদিনিচজাতিরও	চণ্ডালাদির নীচজাতিজনক
২০১	যথাকালং	যথাকামং
২০৫	ধারণা ও ধ্যানের সমষ্টির	ধারণা ও ধ্যান, সমাধির
২১০	একবারে স্পষ্টার্থ	স্পষ্টার্থ
২১১	তত্ত্ব-জ্ঞাননির্ণয়রূপ	তত্ত্ব-নির্ণয়রূপ
২১৫	যথার্থরূপে অনুমত	যথার্থরূপে অনুমিত
২২৮	মহর্ষির	মহর্ষির
২২৯	ছরা	ছারা
২৬৮	শব্দ কি অনিত্য	শব্দ অনিত্য
২৭০	গো ব্যাপকত্ব	গোব্যাপকত্ব
২৭৮	সক্রিয়ত্ব	সক্রিয়ত্ব
২৯০	তদ্বষণ	তদ্বূষণ
২৯৭	এইরূপ বাদীর	এইরূপে বাদীর
২৯৮	উদ্ভাবনাই	উদ্ভাবনই
২৯৯	অপ্রাপ্তির পক্ষেও	অপ্রাপ্তিপক্ষেও
৩০৮	ভাষ্যকারও	ভাষ্যকারও
৩১০	“করাণাতাবাং”	“কারণাতাবাং”
৩৬৪	হওয়াব	হওয়ায়
	প্রমাণং	প্রমাণং
৩৭৩	র্নাবিশেষণ	র্নাবিশেষণ
৩৭১	শব্দ ঘটাদির	শব্দ ও ঘটাদির
৩৭৭	ধর্মের	ধর্মের
৩৭৪	প্রতিবাক্য	প্রতিজ্ঞাবাক্য
৩৮২	পদার্থের	পদার্থের
৪০৭	ইতি প্রসঙ্গাৎ	ইতি প্রসঙ্গাৎ
৪১৬	নিগ্রহস্থান	নিগ্রহস্থান
৪২৪	কোন পদার্থের	কোন উক্ত পদার্থের
৪৩৬	বলিয়াছেন	বলিয়াছেন

পৃষ্ঠাঙ্ক	অণ্ডক	শ্লোক
৪০৯	আখ্যাত-পদের	আখ্যাত-পদের
৪৫৩	আর বাহ	আর বাহ
	তদ্ব্যলম্ব্য	তদ্ব্যলম্ব্য
৪৫৪	এই সূত্র	এই সূত্র
৪৫৬	পুনরুক্ত	পুনরুক্ত
৪৫৯	বিকল্পপ্রয়োজনবত্ত	বিকল্পপ্রয়োজনবত্ত
৪৬৪	সাক্ষর্য	সাক্ষর্য
৪৬৭	“কার্যব্যাসঙ্গাৎ”পদের	“কার্যব্যাসঙ্গাৎ”এই পদের
৪৮৫	তায়শাঙ্গের	তায়শাঙ্গেরই

পারিশিষ্ট ।

প্রথম খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অণ্ডক	শ্লোক
(ভূমিকায়)	উদ্যোতকর	উদ্যোতকর
৯ ...	দুর্কথাঃ	দুর্কথাঃ
১৩/১৮ ...	তত্ত্ব-নির্ণায়	তত্ত্ব-নির্ণায়
২৪ ...	সিদ্ধান্তঃ	সিদ্ধান্তঃ
	আগচ্ছন্ত	আগচ্ছন্ত
৩৬ ...	ইচ্ছামঃ কিমপি	ইচ্ছামি কিমপি
৩৭ ...	টাকা হইতে পারিয়াছিল না ।	টাকা হয় নাই ।
	ইচ্ছাম ইতি ।	ইচ্ছামিতি ।
৩৯ ...	অনুসন্ধান দ্বারা ফলে	অনুসন্ধান দ্বারা
১৩৭ ...	এই মতটি জৈন গ্রন্থেও দেখা যায় ।	এই মতটি কেহ জৈন মতও বলেন, কিন্তু অনেক জৈন গ্রন্থে অন্তরূপ মত আছে ।

পৃষ্ঠাঙ্ক	অণ্ডক	শ্লোক
৪০৯	আখ্যাত-পদের	আখ্যাত-পদের
৪৫৩	আর বাহ	আর বাহ
	তদ্ব্যসঙ্গত	তদ্ব্যসঙ্গত
৪৫৪	এই সূত্র	এই সূত্র
৪৫৬	পুনরুক্ত	পুনরুক্ত
৪৫৯	বিকল্পপ্রয়োজনবশত	বিকল্পপ্রয়োজনবশত
৪৬৪	সাক্ষর্য	সাক্ষর্য
৪৬৭	“কার্যব্যাসঙ্গাৎ”পদের	“কার্যব্যাসঙ্গাৎ”এই পদের
৪৮৫	তায়শাস্ত্রের	তায়শাস্ত্রেরই

পারিশিষ্ট ।

প্রথম খণ্ডে—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অণ্ডক	শ্লোক
(ভূমিকায়)	উদ্যোতকর	উদ্যোতকর
৯	দুর্কথাঃ	দুর্কথাঃ
১৩/১৮	তত্ত্ব-নির্ণায়	তত্ত্ব-নির্ণায়
২৪	সিদ্ধান্তসং	সিদ্ধান্তসং
	আগচ্ছন্ত	আগচ্ছন্ত
৩৬	ইচ্ছামঃ কিমপি	ইচ্ছামি কিমপি
৩৭	টাকা হইতে পারিয়াছিল না।	টাকা হয় নাই।
	ইচ্ছাম ইতি।	ইচ্ছামীতি।
৩৯	অনুসন্ধান দ্বারা ফলে	অনুসন্ধান দ্বারা
১৩৭	এই মতটি জৈন গ্রন্থেও দেখা যায়।	এই মতটি কেহ জৈন মতও বলেন, কিন্তু অনেক জৈন গ্রন্থে অন্তরূপ মত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—

পৃষ্ঠাঙ্ক	অঙ্ক	শ্লোক
	২৫৭	পৃষ্ঠায় ভাষ্য (৪ পং) “কেন চ কল্পনানাগতঃ, কথমনাগতাপেক্ষাতীতসিদ্ধিরিতি নৈত- চ্ছক্যঃ”—এইরূপ পাঠান্তরই গ্রাহ্য।
	৩৫৬	পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে “প্রথমে ত্রিসূত্র ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন”—এই অংশ পরিত্যজ্য।
	৩৫৮	প্রমার কর্তা অর্থাৎ
		সর্বশেষে
		ভুক্তিপত্রের
	পরিণিষ্টে	অর্থাৎ প্রত্যেক কারণত্বের
		অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কারণত্বের

তৃতীয় খণ্ড—

দ্বিতীয় সূচীপত্রে—।/০	কণাদসূত্রের প্রতিবাদ।	কণাদসূত্রের
	সমালোচনা ও	সমালোচনা ও প্রতিবাদ
	পুণ্যবাদী	শূন্যবাদী—
৭৪	“অবিভাগাদিতি	“ন কস্মাবিভাগাদিতি
৩৫৮	শিশোর্যতঃ ॥	শিশোর্যতঃ ॥

চতুর্থ খণ্ড—

৪৪	তৎকারিত্বা	তৎকারিত্বা
	বশ	বশতঃ
	সম্পাদনভূত	সম্পাদনভূতি
৬১	কল্পান্তরাণুপ	কল্পান্তরাণুপ
৩১০	বার্ত্তিককার কাভ্যাঘন	বার্ত্তিককার কুমারিল

